স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের

স্মৃতিমালা, তাঁর পত্র ও রচনাসংগ্রহ

সংকলক ও সম্পাদক
স্বামী চেতনানন্দ ও স্বামী বিমলাত্মানন্দ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিমালা, তাঁর পত্র ও রচনাসংগ্রহ

সংকলক ও সম্পাদক

স্বামী চেতনানন্দ ও স্বামী বিমলাত্মানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী মুমুক্ষানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩
e-mail : info@udbodhan.org

প্রথম প্রকাশ
স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি
৪ মাঘ ১৪১৭
18 January 2011

দ্বিতীয় সংস্করণ
মহালয়া
স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জন্মতিথি
১০ আশ্বিন ১৪১৮
27 September 2011

1M1C

অক্ষর বিন্যাস
উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ

ISBN : 978-81-8040-543-3

মুদ্রক ঃ
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০, দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের দুই সুলেখক সন্ন্যাসী স্বামী চেতনানন্দ ও স্বামী বিমলাত্মানন্দ পৃথক পৃথগ্‌ভাবে বর্তমান পুস্তকের সংকলক ও সম্পাদক। স্বামী চেতনানন্দ তল্লিখিত 'ভূমিকায়' এবং স্বামী বিমলাত্মানন্দ তল্লিখিত 'প্রস্তাবনায়' তাঁহাদের দ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত অংশের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। স্বামী চেতনানন্দের 'ভূমিকা'টি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী বিষয়ক বহুতথ্য সম্বলিত একটি মনোরম চরিত্র চিত্রণ। এই ভূমিকা ছাড়াও তিনি পূজ্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর সম্বন্ধে তাঁহার ভক্ত ও সজ্জনগণ কর্তৃক লিখিত কতকগুলি স্মৃতিকথা উপহার দিয়াছেন, সেগুলি অন্যান্য স্মৃতিকথার ন্যায় যথাস্থানে পরিবেশিত হইয়াছে।

স্বামী বিমলাত্মানন্দের গ্রন্থাংশে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ, তাঁহার দ্বারা লিখিত প্রবন্ধের ও চিঠিপত্রের সংকলন প্রভৃতি অবশিষ্ট সবকিছুই স্থান পাইয়াছে। উভয় লেখকের একনিষ্ঠশ্রমের ফসল গ্রন্থাকারে পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া আমরা তৃপ্তিবোধ করিতেছি এবং তাঁহাদের উভয়কে আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থটির নির্দেশিকা প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীদিলীপ কুমার চক্রবর্তী। তাঁহাকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে গ্রন্থখানির পঠন-পাঠন ও মনন-অনুধ্যানের মাধ্যমে পাঠকদের হৃদয়ে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জন্ম-কর্ম তত্ত্বতঃ স্ফুরিত হউক— তাঁহার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি
[illegible] মাঘ ১৪১৭
উদ্বোধন কার্যালয়
বাগবাজার, কলকাতা

স্বামী মুমুক্ষানন্দ
প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমার অসীম কৃপায় তাঁদের প্রিয় সন্তান 'শশী'র—শশী মহারাজের বই 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিমালা, তাঁর পত্র ও রচনা-সংগ্রহ'টির প্রথম সংস্করণ মাত্র একবছরের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত ও ভাবানুরাগীদের কাছে বইটি সাদরে গৃহীত হয়েছে। এইটি আমাদের দ্বিতীয় সংস্করণ সত্বর প্রকাশ করার কাজে উদ্যোগী করেছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকটির অন্যতম সংকলক ও সম্পাদক স্বামী বিমলাত্মানন্দ পুস্তকটিতে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুগুলি সংযোজন করেছেন ঃ

এক ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজের পরামর্শ অনুযায়ী এই সংস্করণে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ' নামক জীবনীটি। এটি উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত "শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা" থেকে সংকলিত। তবে পাঠকদের সুবিধার জন্য এটিকে তিনি চলতি ভাষায় রূপান্তরিত করে দিয়েছেন।

দুই ঃ রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত হিন্দি পত্রিকা 'বিবেক জ্যোতি'তে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল—সেগুলির বঙ্গানুবাদও এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তিন ঃ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর দুটি ইংরেজি ভাষণের বাংলা অনুবাদও সন্নিবেশিত করেছেন এই সংস্করণে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে এই সংস্করণটি পূর্বের ন্যায় সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

পুস্তকটির প্রথম ও দ্বিতীয়—উভয় সংস্করণ প্রকাশে অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য রমা আর্ট প্রেসে কর্মরত সকলবন্ধুকে এবং উদ্বোধন কার্যালয়ের সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

১০ আশ্বিন, ১৪১৮ — স্বামী মুমুক্ষানন্দ
২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১ — প্রকাশক
মহালয়া
(স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জন্মতিথি)

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব

চতুর্থ পর্ব

পঞ্চম পর্ব

ভূমিকা

"মানস সরোবর" নামটি বড়ই কবিত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। সরোবরে ঢেউ উঠে, ফুল ফোটে, হংস হংসী সাঁতার কাটে। বাইরের মানস-সরোবরের সঙ্গে আমাদের ভিতরের মানস-সরোবরের মিল আছে। সরোবরে যেমন তরঙ্গগুলি উঠে ও নামে, তেমনি মানুষের মানসপটে বৃত্তিগুলি অনবরত উঠছে এবং সেগুলি আবার মনের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। ঐ বৃত্তিগুলি অবচেতন মনে স্তরে স্তরে জমে থাকে। এই সুপ্ত বৃত্তিগুলিই পরে রূপ নেয় স্মৃতিরূপে। যেমন ঢেউ-এর পর ঢেউ, তেমনি বৃত্তির পর স্মৃতি, আবার স্মৃতির পর বৃত্তি। এই জড়ানো বৃত্তি ও স্মৃতি নিয়ে মানবজীবন এগিয়ে চলে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য শশীভূষণ (পরবর্তী কালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন কতকগুলি মূল্যবান স্মৃতি। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন বা লোকমুখে তাঁর দিব্যজীবনকথা শুনেছিলেন—তাঁদের স্মৃতিচারণের ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মানস-সরোবরে যে সুন্দর চারিত্রিক গুণগুলি নানা রঙের ফুলরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছিল এবং যে পরমহংস সেখানে সদা বিরাজ করতেন—এই স্মৃতিগুলিই তার সাক্ষ্য।

মরমিয়া সাধকদের মুখে আমরা শুনি—"সেবা বন্দি ঔর অধীনতা এই সে মিলি রঘুরাঈ।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের গুরুসেবা, গুরুপূজা ও বন্দনা এবং গুরুর প্রতি আনুগত্য রামকৃষ্ণ সংঘে প্রবাদ হয়ে রয়েছে ও থাকবে। তাঁর অতুলনীয় গুরুসেবার নিদর্শনস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের সন্ন্যাসকালে শশী মহারাজকেই "রামকৃষ্ণানন্দ" নাম দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর তিনিই সর্বপ্রথম বরানগর মঠে গুরুপূজা প্রবর্তন করেন। পরিশেষে গুরুর প্রতিটি আদেশ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পালন করে দেখালেন গুরুর উপর অধীনতা বা আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা।

মানুষের প্রকৃত ভালোবাসা প্রকাশ পায় কথায় নয়—কাজে। এই কাজই নিঃস্বার্থে সেবা। শ্রীরামকৃষ্ণ গরমকালে জলে বরফ মিশিয়ে খেতে পছন্দ

করতেন। যুবক শশী বরানগর থেকে বরফ কিনে কাপড়ে বেঁধে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুর বরফ পেয়ে খুব খুশি। তারপর ঠাকুরের ক্যানসার হলে শশী বি.এ. পড়া ছেড়ে দিয়ে আহার-নিদ্রা ভুলে কাশীপুরে দিনরাত গুরুসেবায় মগ্ন হলেন। বাপের অনুরোধেও বাড়ি যেতে অস্বীকার করলেন। শেষে বাপ যখন গুরুর নিন্দা করেন, তখন শশী বাপকে কেটে ফেলার হুমকি দেন। সাধক পিতা নিষ্ঠাবান পুত্রের গুরুভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে আনন্দে ঘরে ফিরে যান।

রামায়ণে আমরা হনুমানের দাস্যভক্তির কথা শুনেছি, কিন্তু শশী মহারাজ দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। আমরা দেখি শশী মহারাজ কাশীপুরে ঠাকুরের পিছনে কয়েকটা বালিশ দিয়ে নিজে পিঠ লাগিয়ে উহা ঠেসে বসে থাকতেন যাতে ঠাকুর বসে খেতে পারেন। তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করতেন যাতে ঠাকুর একটু ঘুমাতে পারেন। আমরা দেখি ঠাকুরের শরীর গেলে "হরি ওঁ" ধ্বনিতে গুরুর সমাধি ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন এবং পরিশেষে ঠাকুরের প্রজ্বলিত চিতার পাশে দাঁড়িয়ে তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করছেন। তারপর গুরুর অস্থি ও ভস্ম কলসিতে পুরে মাথায় করে তিনি কাশীপুর বাগানে এনে ঠাকুরের শোয়ার জায়গায় রাখলেন। জন্মাষ্টমীর দিন কাঁকুড়গাছিতে ঠাকুরের আংশিক অস্থি সমাহিত প্রসঙ্গে লাটু মহারাজ বলেছেন ঃ "শশীভাই নিজে মাথায় করে কলসি নিয়ে গেলো। সেখানে কলসির উপর মাটি ফেলতে দেখে শশীভাই কেঁদে উঠলো, বললে, 'ওগো, ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে।' শশীভায়ের কথা শুনে সকলের চোখে জল এসেছিলো।"

১৮৮৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত হলো প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় যেমন চলছিল, তেমনি শশী মহারাজ শুরু করলেন গুরুর অস্থিপূজা, ভোগ নিবেদন, শয়ান দেওয়া প্রভৃতি। তারপর ১৮৯২ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থানান্তরিত হলো বরানগর থেকে আলমবাজারে। এই দুই মঠে সুদীর্ঘ ১২ বছর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গুরুসেবা ও পূজায় মগ্ন হয়ে রইলেন। কিভাবে তিনি ঠাকুরকে জীবন্ত জ্ঞানে সেবা করেছেন—সেসব অপূর্ব কাহিনি এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্মৃতিকথাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে ফিরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে পাঠালেন মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের প্রতিভূ করে। তাঁর কাছে গুরুর আদেশ ও স্বামীজীর আদেশ ভিন্ন ছিল না। তিনি চলে গেলেন দক্ষিণ ভারতে

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ ১৪ বছর (১৮৯৭-১৯১১) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জীবন দিয়ে দেখালেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ।

ভবভূতি উত্তররামচরিতে লোকোত্তর চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥" এ উক্তি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের চরিত্রেও ফুটে উঠেছে। তিনি আদর্শের সঙ্গে আপস করতে পারেননি। তাঁর কাছে যেসব সাধু ব্রহ্মচারী থাকত, তাদের তিনি শেখাতেন কিভাবে ঠাকুরের সেবা করতে হয়। কেউ ভুল করলে তিনি তাদের প্রতি কঠোর বাক্য এমনকি আঘাতও করেছেন। তিনি বলতেন ঃ "কামার প্রথম লোহাকে আগুনে পুড়িয়ে তারপর ঐ লোহার নরম তালকে নেহাইয়ে ফেলে পিটিয়ে shape দেয়। তেমনি যে কোন জিনিসের ঠিক ঠিক আকৃতি দিতে হলে কামারের মতোই করতে হয়। তোমরাও তো কিছু জান না, তাই তোমাদের ভালোর জন্যই এমনি শাসন করতে হয়।" কথায় বলে—"শাসন করা তারই শোভা পায় যে ভালোবাসে।" তিনি যাদের শাসন করতেন, তাদের দারুণ ভালোবাসতেন। এক সঙ্গে খেতে বসে যদি কোন ভালো জিনিস পেতেন, নিজে না খেয়ে তাদের খাওয়াতেন।

মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যুবকদের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও পবিত্র হবার উপদেশ দিতেন। কতিপয় হোমরা চোমরা ধনী ব্যক্তি ঐসব শুনে একটু ভীত হলেন এবং ভাবলেন যে এইবার যুবকরা সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তাদের পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হবে। তাঁরা শশী মহারাজকে ঐরূপ ত্যাগের কথা শেখাতে বারণ করলেন এবং বললেন যে ঐরূপ শিক্ষা দিলে তাঁরা তাঁকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করবেন। শশী মহারাজ পরে জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, "আমি কি এমন কিছু শেখাব যা ঠাকুরের শিক্ষার বিপরীত! কখনই আমি ওসব বলব না। আমি ওসব হোমরাচোমরাদের গ্রাহ্য করি না।"

শাস্ত্রে আছে—"ভাবেন লভতে সর্বং ভাবেন দেবদর্শনম্। ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ভাবাবলম্বনম্ ॥—ভাবের দ্বারাই এ জগতে সমস্ত লাভ করা যায় এবং ভাবের দ্বারাই দেবতা দর্শন হয়। ভাবেতেই পরম জ্ঞান লাভ হয়। অতএব সর্বতোভাবে ভাবকেই আশ্রয় করা কর্তব্য।" এই ভাব বা দৃঢ় অনুরাগ (passion) না থাকলে অধ্যাত্মজীবন নীরস ও শুষ্ক বলে বোধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রিয় শিষ্য শশীর চোখে অনুরাগ অঞ্জন লাগিয়ে দিয়েছিলেন; তাই তিনি মাদ্রাজে ব্রহ্মচারী তেজনারায়ণকে (পরে স্বামী শর্বানন্দ) বলেন, "বাবা, এই যে ঠাকুরের

প্রতিকৃতি দেখছো এ শুধু ছবি নয়; সত্যি সত্যি ঠাকুর এখানে জীবন্ত রয়েছেন। আর তাই বিশ্বাস করে তুমি সব কাজ করবে।"

এই জীবন্ত দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আত্মবৎ সেবা করতেন। মাদ্রাজে রাতের গরমে ঘুম হচ্ছে না অনুভব হওয়ায় তিনি ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের ছবিকে বাতাস করতে শুরু করলেন। বৃষ্টির দরুন ছাদে ফাটল দিয়ে ঠাকুরের বিছানায় জল পড়ছে দেখে ছাতি ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। কখনও ঠাকুরকে গরম দুধ খাওয়াবেন বলে দুধের বাটি নিয়ে ঠাকুর ঘরে ছুটছেন। গরমের তাপে হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। শরীরের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই। সাধারণত পূজারি ঠাকুরকে একবারেই ভোগ নিবেদন করে; কিন্তু তাঁর ভাবের পূজা ছিল স্বতন্ত্র। তিনি ঠাকুরকে গরম লুচি খাওয়াবেন বলে—এক একখানা লুচি ভেজে ঠাকুরের সামনে প্লেটে রাখতেন। ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করতেন যাতে ঠাকুরের খালি পেটে পিত্ত না পড়ে বা তিনি ক্ষুধায় কাতর না হন। আমাদের কাছে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের এসব কাহিনি রূপকথার মতো মনে হয়, কারণ আমাদের তাঁর মতো চোখও নেই, ভাবও নেই।

এ জগৎ মায়ার রাজ্য—যা সত্য ও মিথ্যার দ্বারা সৃষ্ট। এখানে perfect বলে কোন বস্তু বা ব্যক্তি নেই। সব আপেক্ষিক। তাই মানুষ perfection ভালোবাসে। আমরা চাই perfect পিতামাতা, perfect স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, perfect বাড়ি, গাড়ি। আমরা চাই perfect গুরু, ডাক্তার, শিক্ষক, বন্ধু। এই perfection আমাদের অন্তরে। স্বামীজী বলেছেন, "Religion is the manifestation of perfection already in man." ক্রাইস্টও বলেছেন, "Be ye perfect—just as your Father in heaven is perfect." কোন জিনিস বা মানুষকে perfect বা ঠিক ঠিক করতে হলে চাই সময়, সংযম, আন্তরিকতা ও কুশলতা। নিজেকে ও অপরকে perfect করবার জন্য খাটতে খাটতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনসন্ধ্যা অকালে ঘনিয়ে আসে।

ভক্তের ভগবানের প্রতি ভালোবাসা বিভিন্ন গ্রন্থে ও শাস্ত্রে দেখা যায়; কারণ ওসব শাস্ত্রগ্রন্থ তো মানুষেরই লেখা। কিন্তু ভগবানের ভক্তের প্রতি কী গভীর ভালোবাসা তা বড় সচরাচর দেখা যায় না। কারণ ভগবান তো নিজে কোন গ্রন্থ লেখেন না। ভাগবতে আছে ঃ ভগবান ভক্তকে ভক্তি দিতে কাতর হন, কারণ ভক্তি দিলে তাঁকে ভক্তের দাস হয়ে থাকতে হয়। ভক্ত ভালোবাসা দিয়ে

ভগবানকে এমনভাবে বেঁধে ফেলে যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ঈশ্বরকে সদা ভক্তের জন্য ভাবতে হয়। শুদ্ধাভক্তি লাভ করলে ভক্ত বুঝতে পারে ভগবান তাঁকে কতটা ভালোবাসেন। সেবক শশীর প্রতি ঠাকুরের ভালোবাসার এই ছবিটি আমাদের মানসপটে প্রায়ই প্রতিভাত হয়।

কাশীপুরের বাগানবাড়ি। শীতকাল। গভীর রাত্রি। ঘরের কোণে একটা কেরোসিনের হ্যারিকেন জ্বলছে। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের উপর চোখ রেখে নিদ্রাহীন চোখে বসে আছেন সেবক শশী। ঠাকুরের শৌচের পর তাঁর Chamber pot পরিষ্কার করবার জন্য শশী ঐ শীতের রাতে বাড়ির বাইরে গেলেন। ঠাকুর লক্ষ্য করলেন শশীর পরনে একখানি ধুতি এবং উহার অর্ধেক নিচে কোমরে জড়ানো আর বাকি অর্ধেক দিয়ে উপরের শরীর ঢাকা। শশী ঘরে ফিরে এসে দেখলেন যে অসুস্থ ঠাকুর দুর্বল শরীর নিয়ে বিছানা থেকে নেমে মেঝের উপর হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের অপর প্রান্তে হুকে ঝোলানো একটা শালের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

এই দৃশ্য দেখে শশী ভাবলেন যে তার সেবাপরাধ হয়েছে। ঠাকুরের শীত করছে তার আগে বোঝা উচিত ছিল। তাঁকে শালের জন্য আদেশ না করার দরুন শশী তিরস্কারের কণ্ঠে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কী করছেন? এখন কনকনে ঠাণ্ডা, আপনার বিছানা ছেড়ে উঠা উচিত হয় নি।" ঠাকুর তাঁর নিজের শালখানি হাতে করে উদ্বেগ ও স্নেহপূর্ণ দুর্বল কণ্ঠে বললেন, "আমি চাই নে তোর ঠাণ্ডা লাগুক। এটা নে।"

কী দারুণ দরদ! কী অপূর্ব ভালোবাসা! আমরা যাকে ভালোবাসি তাকে প্রিয় বস্তুটি দেই।

শশীর আত্মকথা ঃ "ঠাকুরের ব্যবহৃত শাল ব্যবহার করবার যোগ্যতা আমার নেই মনে করে উহা আমি পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দিয়েছিলাম।"

কাল সর্বগ্রাসী এবং স্মৃতিগ্রাসী। এই মূল্যবান স্মৃতিগুলি কালের চোখে ধুলা দিয়ে বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তকের পাতায় লুকিয়ে ছিল। যেসব প্রত্যক্ষদর্শী এসব ঘটনা লিখেছেন ও বলেছেন তাঁরা সত্যই ভাগ্যবান। তাঁদের মধ্যে অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে না দেখলেও তাঁর হাতে গড়া শিষ্যদের দিব্যজীবন দেখেছেন এবং ভাবী কালের মানুষের জন্য রেখে গেছেন এই অমূল্য স্মৃতিকণাগুলি। ইহাদের আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক মূল্য সত্যই তুলনাহীন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের

স্মৃতিমালা উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত রামকৃষ্ণ সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই দিব্য মানবের কথা ও কাহিনি মনন করে পাঠকবর্গ আনন্দিত হলে আমরা ধন্য হব।

সেন্ট লুইস, আমেরিকা
বিজয়া দশমী, ২১/১০/২০০৭

স্বামী চেতনানন্দ

ফটো তারিখ ঃ অক্টোবর ১৮৮৩ বা ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪-র পর
স্থান ঃ রাধাকান্ত মন্দিরের বারান্দা, দক্ষিণেশ্বর

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী (নভেম্বর ১৮৯৮)
স্থান ঃ বাগবাজার বোসপাড়া লেন (নিবেদিতার গৃহ)

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষের উত্তরের বারাণ্ডা

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী
(শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনস্থল)

দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দির

দক্ষিণেশ্বরে দ্বাদশ শিবমন্দির

মা ভবতারিণী (দক্ষিণেশ্বর)

বলরাম মন্দিরের বর্তমান ঠাকুরঘর

বলরাম মন্দির
(বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ)

বলরাম মন্দিরের রথ

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ

ধুনি প্রজ্বলনস্থল, আঁটপুর
(১৮৮৬-র ২৪ ডিসেম্বর তরুণ শশী কয়েকজন গুরুভাইয়ের সঙ্গে
ত্যাগব্রতের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন)

শ্রীরামানুজাচার্য
(১০১৭ - ১১৩৭)

শ্রী আদিকেশব পেরুমল মন্দির, শ্রীপেরুমবুদুর
(শ্রীরামানুজাচার্যের জন্মস্থান)

পচাইপ্পার কলেজ, মাদ্রাজ
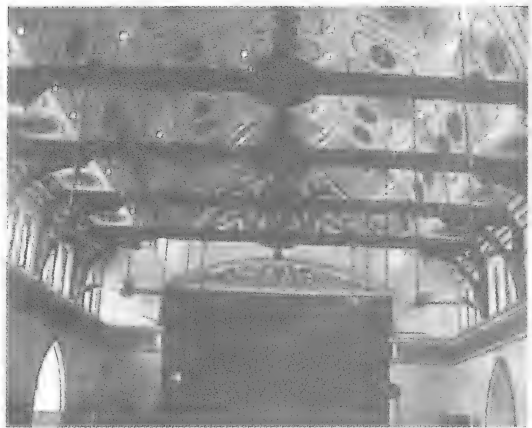
ত্রিবান্দম টাউন হল

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজির বক্তৃতা সফর
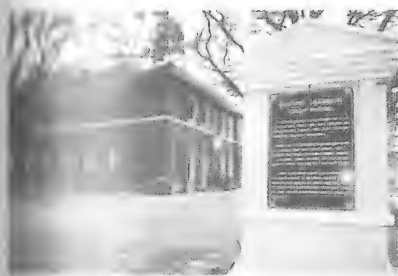
সেন্ট্রাল কলেজ, কে. আর.
সার্কেল, ব্যাঙ্গালোরে
২৫ জুলাই ১৯০৩

পূরণাইয়ার ছাত্রম, ব্যাঙ্গালোরে
৩ আগস্ট ১৯০৩

লণ্ডন (ইউনাইটেড) মিশন স্কুল,
ব্যাঙ্গালোরে ৪ আগস্ট ১৯০৩।

রঙ্গচারলু মেমোরিয়াল হল
(টাউন হল), মহীশূরে
অক্টোবর ১৯০৩
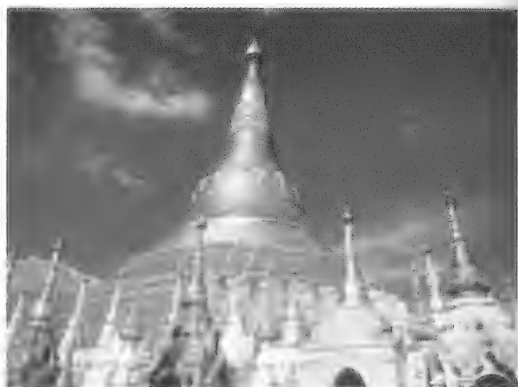
শ্বেডাগাঁও প্যাগোডা, রেঙ্গুন
এখানে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
মার্চ ১৯০৫ সালে এসেছিলেন

বুল টেম্পল
ব্যাঙ্গালোর

ফ্রেমজি কাওয়াসজি ইনস্টিটিউট, বম্বে

হিন্দু কলেজ, জাফনা, শ্রীলঙ্কা

আইস হাউস, মাদ্রাজ

ক্যাসল কারনন বা আইস হাউস
(বর্তমানে বিবেকানন্দ ইলম)

স্বামী ব্রহ্মানন্দজির সঙ্গে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (১৯০৮)

সমাধিস্থল, বেলুড় মঠ
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজির নশ্বরদেহ ২১ আগস্ট ১৯১১
এখানে অগ্নিতে সমর্পিত হয়

প্রস্তাবনা

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের উপর একটি বৃহৎ জীবনী, তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও তাঁর উপর স্মৃতিকথা প্রকাশিত হোক—আমেরিকার নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী তথাগতানন্দজী মহারাজ বার বার বলতেন। ২০০২ সালে তিনি এই মর্মে তদানীন্তন মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজীকে একটি চিঠি লেখেন। এ-বিষয়ে তিনি অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজীকে ভার দেন। তিনি আমাকে এই কাজের দায়িত্বভার নিতে বলেন। আমি রাজি হই।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর প্রবন্ধ (যেগুলি প্রকাশিত পুস্তকে সংযোজিত হয়নি) এবং তাঁর উপর স্মৃতিকথা সংগ্রহ করতে শুরু করি। দেখা গেল স্মৃতিকথাগুলি বেশির ভাগই ইংরেজি ভাষায় লেখা। এগুলি 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেগুলি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদের জন্য কয়েক জন সাধুভাই সাহায্য করেছেন—তাঁদের নাম দেওয়া আছে। 'উদ্বোধন' পত্রিকা ছাড়া 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলিও অনুবাদ করা হয়েছে। যখন এই কাজ আরম্ভ করি তখন বিভিন্ন পুস্তকে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের মাত্র পঁচাত্তরটি চিঠি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। তখন বেলুড় মঠের মিউজিয়ামেও মাত্র কয়েকটি চিঠি ছিল। পরে মিউজিয়ামে অনেক চিঠি পাওয়া গেল। যেগুলি বেশির ভাগই ইংরেজিতে লেখা। তার অনুবাদ করা হয়েছে। এছাড়া, মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত 'Consolations' নামে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের চিঠির 'পত্রাংশ' প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এর অনুবাদ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ স্বামী পরমানন্দজীকে (বসন্ত মহারাজকে) অনেক চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলি আমেরিকার লা ক্রেসেন্টার আনন্দ আশ্রমে ছিল। দুর্ভাগ্যবশত আনন্দ আশ্রমের মিউজিয়াম আগুনে পুড়ে যায়—সেইসঙ্গে চিঠিগুলি চিরতরে অবলুপ্ত হয়। কিন্তু এই চিঠিগুলি ছিল বাংলায় লেখা—তার পুরো ইংরেজি অনুবাদ 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি আবার বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। এছাড়া, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ রচিত 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ' এবং স্বামী প্রমেয়ানন্দ মহারাজ রচিত 'সেবাদর্শে

রামকৃষ্ণানন্দ' পুস্তক থেকেও অনেক স্মৃতিকথা সংগৃহীত হয়েছে। স্বামী অচলানন্দজীর একটি স্মৃতিকথা পাওয়া গেছে দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক প্রয়াত স্বামী গোকুলানন্দজীর কাছ হতে। এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের পরিমাণ বিশাল হয়ে দাঁড়াল। তখন স্বামী সুহিতানন্দজীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হলো যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ও চিঠিপত্র প্রথমে প্রকাশিত হোক। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর সুবৃহৎ জীবনী রচিত হবে।

বিভিন্ন জনের অনূদিত স্মৃতিকথাগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে। যথাসম্ভব ভাব বজায় রাখা ও ভাষা প্রাঞ্জল করা হয়েছে।

পুরো পাণ্ডুলিপি স্বামী সুহিতানন্দজী পড়েছেন। যখন সব প্রস্তুত, তখন আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দজী আরও কয়েকটি স্মৃতিকথা এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের উপর প্রাচীন সাধুদের কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্বোধন কার্যালয়ে দিয়েছিলেন। এগুলি নিয়ে তাঁর একটি বই-এর পরিকল্পনা ছিল। আমি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের উপর বই করছি জেনে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওইগুলি দিয়েছিলেন। সেগুলি পাওয়ার পর আবার এদিক-ওদিক করে তথ্যগুলি সাজানো হলো। এ-বিষয়ে স্বামী সুহিতানন্দজীর পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল। সব তথ্যগুলি সাজিয়ে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলো।

যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে বইটি সর্বাঙ্গসুন্দর করতে। বইটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগীদের ভালো লাগলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করব। ভবিষ্যতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর একটি বৃহৎ জীবনী লেখার ইচ্ছা রইল।

৭ অক্টোবর, ২০০৯ স্বামী বিমলাত্মানন্দ
বেলুড় মঠ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী গম্ভীরানন্দ

হুগলী জেলার ময়াল-ইছাপুর গ্রামবাসী বাপুলী-উপাধিধারী শ্রীযুত কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর তিন পুত্র ছিলেন—রামানন্দ, রাজচন্দ্র ও ঠাকুরদাস। রামানন্দের পুত্র গিরিশচন্দ্র ছিলেন শরৎচন্দ্র বা স্বামী সারদানন্দের পিতা এবং রাজচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন শশিভূষণ বা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র কলকাতায় বাটি নির্মাণ করে সেখানেই বাস করতে থাকেন; কিন্তু শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রামে থেকে যান। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অতি উন্নত তান্ত্রিক সাধক এবং কৌল সমাজে তন্ত্রবিদ্যার জন্য তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন; রাজা তাঁকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন এবং সাধনার জন্য যখন যা প্রয়োজন হতো তার ব্যবস্থা করে দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রামের অনতিদূরে ৺ঘণ্টেশ্বরের মহাশ্মশানে, কলকাতায় কেওড়াতলার শ্মশানে, অথবা রাজপ্রাসাদের পশ্চাতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধনায় রত থাকতেন। কালীঘাটে এক গভীর রাত্রে ৺কালিকাদেবী তাঁকে বালিকাবেশে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। শশিভূষণের জননী অতিশয় উদারহৃদয়া ও সরলা ছিলেন; তিনি এত লজ্জাশীলা ছিলেন যে, নিকট আত্মীয়ের সম্মুখেও ঘোমটা দিতেন। তাঁর বর্ণ ছিল গৌর এবং শশীও তাই পেয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহে নারায়ণ, মনসা, শীতলা, সিংহবাহিনী প্রভৃতি দেবদেবীর নিত্যপূজা হতো এবং প্রতিবৎসর কালীপূজা হতো।

শশিভূষণ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই (১২৭০ বঙ্গাব্দের ২৯ আষাঢ়, চান্দ্র আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে রবিবার, শেষরাত্রে ৪টা ৫৬ মিনিটে) স্বগ্রাম ইছাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রগাঢ় ধর্মভাবপূর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে বাল্যকাল অতিবাহিত করে শশী অতিশয় ভগবৎপরায়ণ হয়েছিলেন। শৈশবে পূজাদি অভ্যাসের ফলে পরবর্তী কালে একাসনে অষ্টপ্রহর অতিবাহিত করা তাঁর পক্ষে অতি সহজ ছিল। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠসমাপনান্তে তিনি ইংরেজি শিক্ষার জন্য কলকাতায় শরৎচন্দ্রের গৃহে আসেন এবং যথাসময়ে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করেন। এরপর আলবার্ট কলেজ থেকে এফ. এ.

পাস করে মেট্রোপলিটন কলেজে বি. এ. পড়েন। ছাত্রজীবনে শশী ও শরৎ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কেশবচন্দ্রের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন। উভয়েই সমাজের সদস্য হয়েছিলেন এবং শশী কিছুদিন কেশবচন্দ্রের পুত্রের গৃহশিক্ষকতা করেছিলেন। শৈশবের ন্যায় বাল্য ও যৌবনেও শশীর ধর্মভাব সুপরিস্ফুট ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আকৃষ্ট হয়ে তিনি আজীবন নিরামিষাহারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন ও শেষদিন পর্যন্ত তা প্রতিপালন করেন।

বাল্যকালে স্বাভাবিক পরিবেশের প্রভাবে এবং বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র সেনের আকর্ষণে শশীর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলেও সম্পূর্ণ শান্ত হলো না; বরং তাঁর বুভুক্ষা বৃদ্ধি পেল মাত্র। অবশেষে সহপাঠী কালী প্রসাদ চক্রবর্তী জানালেন যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ইন্ডিয়ান মিরর' নামক পত্রিকায় দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অপূর্ব বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে—একদিন তাঁর দর্শনের জন্য সেখানে যেতে হবে। সেই অনুসারে শরৎ ও শশী বন্ধুসহ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন।[১] যুবকদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি প্রীতিসহকারে গ্রহণ করলেন এবং কেশবচন্দ্রের সমাজে যাতায়াত আছে শুনে শশীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি সাকার ভালবাসেন কিংবা নিরাকার। শশী উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর আছেন কিনা তাই জানি না—তাঁর আবার সাকার না নিরাকার?" সরল ও নির্ভীক উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে ঠাকুর বলতে লাগলেন, "বাপ-মা আজকাল ছেলেদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়; যেই তারা স্কুল-কলেজ থেকে বেরোয়, অমনি অনেক ছেলে-মেয়ের বাপ হয়ে পড়ে। তখন পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য চাকরির সন্ধানে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।" অমনি উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন, "তা হলে কি, মশায়, বিয়ে করা অন্যায়? এটা কি ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ?" গৃহে একখানি বাইবেল সংরক্ষিত ছিল এবং উহার এক অংশে চিহ্ন দেওয়া ছিল; পরমহংসদেব ঐ প্রশ্নের উত্তরে পুস্তকটি খুলে চিহ্নিত অংশটি পাঠ করতে বললেন। তাতে লেখা ছিল, "অবিবাহিত ও বিধবাদিগকে আমি বলছি যে, বিবাহ না করাই ভাল—যেমন আমি নিজে অকৃতদার রয়েছি। কিন্তু তারা যদি সংযম অবলম্বন না করতে পারে, তবে বিবাহ করাই ভাল; কারণ

১ এই বিবরণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমরা ব্রহ্মচারী প্রকাশ প্রণীত 'স্বামী সারদানন্দ' (১৫-১৬ পৃঃ) অদ্বৈতাশ্রম থেকে প্রকাশিত 'Life of Sri Ramakrishna' (৪৭২ পৃঃ) ও ভগিনী দেবমাতা-রচিত 'Sri Ramakrishna and his Disciples' (৯৫ পৃঃ)—এই তিনটি বিবরণের মধ্যে যথাসাধ্য সামঞ্জস্য সাধন করে এটা লিখলাম।

বাসনার আগুনে পুড়ে মরা অপেক্ষা বিবাহ করাই উত্তম।" পাঠ শেষ হলে পরমহংসদেব বুঝিয়ে দিলেন যে, বিবাহই সর্বপ্রকার বন্ধনের মূল। জনৈক শ্রোতা পুনর্বার আপত্তি তুললেন, "আপনি কি তা হলে বলতে চান যে, বিয়ে করাটা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ? বিয়ে না করলে সৃষ্টি থাকবে কি করে?" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "তার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। যারা বিয়ে করতে চায় তারা করবে বইকি? ও আমাদের মধ্যে একটা কথা হয়ে গেল। আমার যা বলবার আমি বলেছি; তুমি ন্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে নিও।" সেদিন বিরুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যে যুবকদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করা হলো না; সুতরাং বিদায়কালে ঠাকুর শশী প্রভৃতিকে বলে দিলেন, "আবার এসো, কিন্তু একা একা; ধর্মের সাধন গোপনীয়।"

প্রথম দিনেই ঠাকুর শশীর মন জয় করে নিলেন। এই আকর্ষণের ফলে তিনি কলেজের ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কথামৃত পান করতে লাগলেন। প্রথমত তিনি অনেক কথা বলতেন; কিন্তু অতঃপর যুবকমনে বহু সন্দেহ উঠলেও এবং সন্দেহনিরসনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে গেলেও ঠাকুরকে ভগবৎপ্রসঙ্গে নিমগ্ন ও ভক্তপরিবেষ্টিত দেখে আর বিশেষ বাক্যস্ফূর্তি হতো না। তাঁকে দেখলেই ঠাকুর বলতেন, "বস, বস।" তিনিও বসতেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ ভাবে বসে থাকতে থাকতেও মনের সংশয় বিদূরিত হয়ে সে জায়গায় অপূর্ব শান্তি বিরাজ করত। ক্রমে সুযোগ বুঝে ঠাকুর তাঁর কাছে স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করে তাঁর হৃদয়-মন চিরতরে এক উচ্চতর স্তরে তুলে দিলেন। একদিন বস্তুবিশেষের সন্ধানে শশী দ্রুতপদে ঠাকুরের কক্ষ অতিক্রম করে যাচ্ছেন, এমন সময় ঠাকুর বলে উঠলেন, "তুই যাকে চাস— সে এই, সে এই, সে এই।" চকিতে শশীর দৃষ্টি অনুসন্ধেয় বস্তু হতে সদানন্দময় ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হলো। তিনি বুঝলেন, ঠাকুরই জীবনের একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু —আর সব অনুসন্ধান এই বৃহৎ অনুসন্ধানেরই রূপান্তর মাত্র।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে শশী ক্রমে নরেন্দ্রাদি যুবক ভক্তদের সঙ্গে পরিচিত ও প্রেমসূত্রে সংবদ্ধ হলেন। একসময়ে নরেন্দ্রের মুখে সুফী কাব্যের প্রশংসা শুনে মূল কাব্যপাঠের আগ্রহে তিনি ফারসী ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন। একদিন কালীবাড়িতে এতই মনোযোগসহকারে ঐ ভাষা আয়ত্ত করছিলেন যে, ঠাকুর তিন বার ডেকেও কোন উত্তর পেলেন না। অবশেষে শশী কাছে এলে তিনি জানতে চাইলেন, এত নিবিষ্টমনে কি করা হচ্ছিল।

ফারসী পড়ছিলেন শুনে তিনি সাবধান করে দিলেন, "অপরা বিদ্যায় ডুবে যদি পরা বিদ্যা ভুলে যাস তো তোর হৃদয় ভক্তিহীন হয়ে যাবে।" শশীর ফারসী পড়া আর অগ্রসর হলো না।

ঠাকুর বরফ খেতে ভালবাসতেন; তাই এক গ্রীষ্মের দিনে কলকাতায় বরফ কিনে শশী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। বরফ খণ্ডটিকে তিনি এতই যত্নসহকারে গামছা জড়িয়ে নিয়ে গেছলেন যে, তা গলতে পারেনি। ঠাকুর তাঁর ঐকান্তিকতা, বুদ্ধি এবং রৌদ্রে দেহ ঘর্মাক্ত ও মুখ শুষ্ক দেখে ব্যথিতকণ্ঠে তারিফ করে বললেন, "আহা, তোর বড় কষ্ট হয়েছে! দ্যাখ, যার হাতে জল গলে না, লোকে তাকে কৃপণ বলে; কিন্তু আমি দেখছি তুই কৃপণ নস, তুই দাতা!"

ফলত দক্ষিণেশ্বরে বারংবার যাতায়াত ও ঠাকুরের সেবাদির ফলে শশী তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এছাড়া এদের অলৌকিক সম্বন্ধ তো ছিলই। ঠাকুর বলেছিলেন, "শশী আর শরৎকে দেখেছিলাম ঋষি কৃষ্ণের (অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টের) দলে ছিল।"—('কথামৃত', ৪/৩৩০; অখণ্ড সং, পৃঃ ১০১৩)। শশীকে আদর করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকতে বলতেন; কিন্তু অধ্যয়নে নিরত এবং সাংসারিক অসচ্ছলতাবশত পাঠের জন্য অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত শশীর পক্ষে তা সম্ভব হতো না। কিন্তু ক্রমে এমন সময় উপস্থিত হলো যখন সাংসারিক চিন্তাকে ছাপিয়ে তাঁর হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেমই পূর্ণরূপে উদ্বেলিত হলো। ঠাকুর গলরোগ নিয়ে যখন শ্যামপুকুরে এলেন এবং পথ্য-প্রস্তুতির জন্য শ্রীশ্রীমাও সেখানে এলেন, তখন "রাত্রিকালে ঠাকুরের সেবা করবার লোকাভাব দূর করবার জন্য ভক্তগণ মনোনিবেশ করল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তখন ঐ বিষয়ের ভার নিজে নিয়ে রাত্রিকালে এখানে অবস্থান করতে লাগলেন এবং নিজ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করে গোপাল (ছোট), কালী, শশী প্রভৃতি কয়েকজন কর্মঠ যুবক-ভক্তকে ঐরূপে আকৃষ্ট করলেন।"—('লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ—দিব্যভাব', ১৫৬ পৃঃ)। অভিভাবক প্রথমে ততটা আপত্তি করেন নাই; কিন্তু পরে যখন কার্যে ব্যাপৃত থেকে শশী বাড়িতে আহার করতে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করলেন, তখন তিনি নানাবিধ বাধাসৃষ্টি করতে লাগলেন। শশী কিন্তু নিজ সঙ্কল্প ছাড়লেন না। তিনি তখন বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তাই জনৈক বৃদ্ধ প্রতিবেশী যখন উপদেশ দিলেন, "পরীক্ষাটা দিয়েই গুরুসেবা কর না", তখন শশীর উত্তর পেলেন, "আমি যদি তার আগে মরে যাই? ততদিন আমার মৃত্যু হবে না, একথা কি আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন?"

শ্যামপুকুরের পরে কাশীপুর। শশী এখানেও গুরুসেবায় নিযুক্ত রইলেন। ঠাকুরের অসুখ সম্বন্ধে শশী বলতেন, "জগতের দুঃখ দেখে যিশু ক্রুশ-বিদ্ধ হয়েছিলেন; ঠাকুরও জীবের দুঃখে রোগভোগ করছেন।" রোগের কারণ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত যাই থাকুক না কেন, সেবাকার্যে তিনি সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন। একদিন ঠাকুরের জামরুল খেতে ইচ্ছা হলো। তখন শীতকাল—জামরুল কিভাবে পাওয়া যাবে? শশী সংবাদ নিয়ে জানলেন যে, এক বাগানে তা আছে; অমনি তা সংগ্রহ করে আনলেন। জামরুল পেয়ে ঠাকুর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এমন সময় জামরুল কোথায় পেলি রে?" কোথায় আর পাবেন? ভগবান ঠাকুরের যেখানে অভিলাষ আর বীর ভক্ত যেখানে সেবক, সেখানে কোন্ বস্তু অলভ্য হয়?

ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত শশীর আহারাদি পর্যন্ত ভুল হয়ে যেত। কত দিন ঠাকুর তাঁকে বলতেন, "নেয়ে খেয়ে নাও, আমি এখন ভাল আছি—আমার এখন কোন দরকার নেই, খেয়ে এস।" এমন বহুবার হয়েছে, যখন শশীকে অবিরাম বীজন করতে দেখে ঠাকুর তাঁর হাত থেকে পাখা নিয়ে লাটুকে দিয়েছেন। দেহত্যাগের পূর্বে একদিন শশীকে তিনি স্নেহবিগলিত স্বরে বললেন, "দ্যাখ, তোরা এই সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস। তোরা যদি বলিস তা হলে একবার সেখানে দেখে আসি।" সকলেই বুঝলেন, ঠাকুর লীলাসংবরণের ইঙ্গিত করেছেন—আর যেন বলছেন যে, ভক্তের আকর্ষণই তাঁকে মর্তধামে ধরে রেখেছে।

ঠাকুরের সেবায় শশী কতখানি মগ্ন হয়েছিলেন এবং ঠাকুরকে কতখানি আপনার বলে গ্রহণ করেছিলেন, তা শেষদিনের নিদারুণ ঘটনাবলিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেদিন বিকালে সাত মাইল ছুটে ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে যখন জানলেন যে, ডাক্তার অন্যত্র গিয়েছেন, তখন আবার এক মাইল ছুটে গিয়ে পথে তাঁকে ধরলেন এবং ডাক্তার যদিও জানালেন যে, তাঁর তখনই কাশীপুরে যাওয়া অসম্ভব, কারণ অন্যত্র জরুরি কাজ আছে, তবুও শশী তাঁকে টেনে কাশীপুরে নিয়ে গেলেন। যথাবিধি পরীক্ষান্তে ডাক্তার চলে গেলে সেদিনও পূর্বানুরূপ দৈনন্দিন সেবাদি চলতে-লাগল—কেউই ভাবতে পারলেন না যে, শেষদিন সমাগত। অথবা অপরে যাই ভাবুক না কেন, শশী অন্তত চিন্তা করতে পারেননি যে, প্রিয়তমের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ আসন্নপ্রায়। সে রাত্রিতে ঠাকুর সাধারণ আহার অপেক্ষা একটু বেশিই খেলেন, শশী খাইয়ে দিলেন। মহাপ্রস্থানের

কোন ইঙ্গিত না পেয়ে তিনি ভাবলেন, ঠাকুর সে রাত্রে বরং একটু ভালই আছেন। এমনকি, পরিশেষে যখন সত্যই শেষমুহূর্ত এল, শশী তখনও মনে করলেন, ঠাকুরের গভীর সমাধি হয়েছে; কারণ তিনি দেখলেন, ঠাকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়ে এক আনন্দ-হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে—এত আনন্দোচ্ছ্বাস তিনি আগে কখনও দেখেননি। রাত্রিশেষে বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এসে যখন বললেন যে, মস্তক ও মেরুদণ্ডে ঘি মালিশ করলে সমাধিভঙ্গ হতে পারে, শশী তখন তাতেই প্রবৃত্ত হলেন; কিন্তু অবশেষে ডাক্তার এসে বলে গেলেন, আর আশা নেই। অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটার সময় ঠাকুরের পূতদেহকে মাল্য-চন্দন-পুষ্পে সাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো। বাস্তবকে বিশ্বাস করতে অপটু শশী চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রজ্বলিত চিতার পার্শ্বে বসে রইলেন। লাটু তাঁকে হাত ধরে টানলেন, নরেন ও শরৎ অনেক প্রবোধ দিলেন—শশী তখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ়! চিতা নির্বাপিত হলে তিনি নীরবে ভস্মাস্থি তুলে একটি তাম্রকলসীতে রাখলেন এবং তা মস্তকে বহন করে উদ্যানবাটিতে ঠাকুরের শয্যায় স্থাপন করলেন। শশীর বিশ্বাস—ঠাকুর যান নি; সুতরাং ঠাকুরের দ্রব্যাদি সযত্নে রক্ষিত হলো এবং ভস্মাস্থিপূর্ণ কলসীতে নিয়মিত পূজা চলতে লাগল।

ভস্মাবশেষ ঐ অবস্থায় সাত দিন থাকার পর রামচন্দ্র-প্রমুখ প্রবীণ ভক্তদের সিদ্ধান্তানুযায়ী তা কাঁকুড়গাছিতে নিয়ে যাবার কথা উঠল। নিরঞ্জন তাতে ঘোরতর আপত্তি তুললেন, আর শশী বললেন, "কলসী দেব না।" নরেন্দ্রের মধ্যস্থতায় তখনকার মতো বিবাদ মিটল এবং রামবাবুর প্রস্তাবই গৃহীত হলো; কিন্তু অপর সকলের অজ্ঞাতসারে শশী ও নিরঞ্জন অন্য এক পাত্রে "অর্ধেকেরও উপর ভস্মাবশেষ ও অস্থিনিচয় বার করে নিয়ে" তা বলরামবাবুর বাটিতে নিত্যপূজার জন্য পাঠিয়ে দিলেন ('উদ্বোধন', ১৭শ সংখ্যা, ৪৪০ পৃঃ)। এরপর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিনে প্রথম কলসীটি কীর্তনসহ রামবাবুর কলকাতার বাটি থেকে কাঁকুড়গাছির উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হলো—কীর্তনের পিছনে শশী অধিকাংশ পথ কলসীটি নিজ মাথায় বহন করে চললেন। অবশেষে কাঁকুড়গাছিতে যথোচিত পূজান্তে যখন তা সমাহিত করে তার উপর মাটি ফেলা হচ্ছিল, তখন শশী কেঁদে উঠলেন, "ওগো, ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে।" শশীর কথায় সকলেরই চোখে জল এলো—তাই তো, ঠাকুর যে সদা-বিদ্যমান, সদা-সচেতন!

তার পর শশীকে গৃহে ফিরে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে হলো; কিন্তু নরেন্দ্রাদির আহ্বান আবার তাঁকে কয়েক মাস পরেই বরাহনগর মঠে নিয়ে গেল।

এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদুকা-সম্মুখে অপর কয়েক জনের সঙ্গে সন্ন্যাসগ্রহণান্তে তিনি 'রামকৃষ্ণানন্দ' নামে পরিচিত হলেন। নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, তিনি স্বয়ং ঐ নাম গ্রহণ করবেন; কিন্তু শশীর সেবা ও ভক্তির দাবি মেনে নিয়ে তাঁকেই তা দিলেন।

বরাহনগরে আসার পর শশী মহারাজ নিত্য শ্রীগুরুর পূজাদি-অবলম্বনে একদিকে যেমন সকলের মনে গভীর ভক্তিভাব জাগাতেন, অপরদিকে তেমনি তাঁদের কায়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। মঠস্থাপনের পরেই দেখা গেল যে তীব্র বৈরাগ্য ও তীর্থদর্শন-অভিলাষে গুরুভ্রাতারা প্রায়ই এদিকে সেদিকে চলে যাচ্ছেন—কেবল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একমনে গুরুসেবায় নিযুক্ত আছেন। তখন অভাবের দিন। এক দ্বিপ্রহরে চারজন সন্ন্যাসী রিক্তহস্তে ভিক্ষা করে ফিরলেন—মঠের ভাণ্ডারও সেদিন শূন্য। অতএব আহারের আশা ত্যাগ করে সকলে 'দানাদের ঘরে' কীর্তনে মাতলেন। এদিকে শশী মহারাজের ভাবনা হলো, ঠাকুরকে কিছু না দিলে তো চলে না, তিনি অপরের অজ্ঞাতসারে পরিচিত এক প্রতিবেশীর কাছে গেলেন। ঐ বাড়ির অন্যান্য সকলেই মঠের বিরোধী; কাজেই প্রতিবেশী জানালা গলিয়ে পোয়াটাক চাল, কয়েকটি আলু ও একটু ঘি দিলেন। শশী মহারাজ তা রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিলেন এবং পরে ঐ প্রসাদের দ্বারা গোল গোল পিণ্ড পাকিয়ে 'দানাদের ঘরে' কীর্তনমগ্ন অভুক্ত গুরুভ্রাতাদের মুখে একটি একটি পিণ্ড গুঁজে দিলেন। এই অপূর্ব প্রসাদের আস্বাদে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই শশী, ঐ অমৃত কোথায় পেলে ভাই?" স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলেছিলেন, "শশী ছিল মঠের প্রধান খুঁটি। সে না থাকলে আমাদের মঠবাস অসম্ভব হতো। সন্ন্যাসীরা ধ্যানভজনে প্রায়ই ডুবে থাকত এবং শশী তাদের আহার প্রস্তুত করে অপেক্ষা করত; এমন কি, মাঝে মাঝে তাদের ধ্যান থেকে টেনে এনে খাওয়াত।"

বিশেষ কারণ না ঘটলে শশী মহারাজ মঠ ছেড়ে কোথাও যেতেন না। একবার ঠাকুরের ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মৃত্যুশয্যা থেকে তাঁকে স্মরণ করলে তিনি তাঁর গৃহে গিয়ে প্রায় একঘণ্টা ঠাকুরের কথায় কাটিয়েছিলেন। এই নিষ্ঠা লক্ষ্য করে আচার্য বিবেকানন্দ এক সময়ে লিখেছিলেন, "শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে! তাঁর দৃঢ়নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তিস্বরূপ।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতিকে যিশুখ্রিস্টের প্রতি ভক্তিপরায়ণ জেনে ধর্মান্তরিত করার লালসায় মুক্তিফৌজের (Salvation Army) দুই-একজন

বাঙালি প্রচারক একসময় মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন; কিন্তু অবশেষে বাইবেলে রামকৃষ্ণানন্দের ব্যুৎপত্তি-দর্শনে যুক্তির পথে কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা নেই বুঝে তাঁকে বিবিধ প্রলোভন দেখান। এতে তাঁর ধৈর্যের সীমা উল্লঙ্ঘিত হওয়ায় তিনি চিরতরে তাঁদেরকে তাড়িয়ে দেন।

অবসরবিনোদনের জন্য শশী মহারাজ এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করতেন—তিনি সময় পেলেই অঙ্ক কষতেন বা সংস্কৃত পড়তেন। মঠে সমাগত যুবকগণ তাঁর কাছে অধ্যয়নবিষয়ে প্রচুর উৎসাহ পেত। ঐ সময় স্বামী বিরজানন্দ, বোধানন্দ, বিমলানন্দ ও আত্মানন্দ মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন। শশী মহারাজ তাঁদের সঙ্গে ধর্মালাপ করতেন এবং ঠাকুরের সেবা ও মঠের খুঁটিনাটি কাজের সুযোগ দিতেন। বিরজানন্দকে গণিতে কাঁচা জেনে তিনি গ্রীষ্মের ছুটিতে মঠে থেকে তাঁর কাছে গণিত শিখতে বলেন। সেই মতো বিরজানন্দ সেখানে এলেন। কিন্তু তাঁর ভগবদ্‌ব্যাকুল মন তখন অধ্যয়ন অপেক্ষা ঠাকুরসেবা ও মঠের কাজেই অধিক মগ্ন হয়ে পড়ল; আর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দেরও তো খুব বেশি অবকাশ ছিল না। অতএব ছুটির মধ্যে আর বই খোলা হলো না; কিন্তু বিরজানন্দের বৈরাগ্যের উৎস খুলে গেল—তিনি কিছুদিন পরেই মঠে যোগ দিলেন।

মঠে ঠাকুরপূজাদি চালিয়ে যাওয়ার প্রায় সমস্ত দায়িত্ব স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিয়েছিলেন। ঠাকুরসেবার কোন প্রকার ত্রুটি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। রঙ্গপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ তা জানতেন; তাই মাঝে মাঝে তাঁকে উত্তেজিত করে মজা দেখতেন। একদিন জনৈক ভক্ত ঠাকুরপূজাকে শীতলাপূজাদির সঙ্গে তুলনা করে ব্যঙ্গ করে থাকলে ক্রুদ্ধ শশী মহারাজ ঘোষণা করলেন যে, তিনি ঐরূপ ভক্তের অর্থসাহায্য চান না। অমনি স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, "তবে ভিক্ষা করে নিয়ে আয়।" শশীও উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তাই করব।" স্বামীজী তখন কৃত্রিম কোপসহকারে যুক্তি দেখাতে লাগলেন যে, মঠের ভাইদের যে স্থলে অন্নবস্ত্রের অভাব, সে স্থলে পূজার জন্য অধিক খরচা করা অযৌক্তিক। তর্ক বেড়ে যাচ্ছে দেখে লাটু মহারাজ মধ্যস্থতা করতে অগ্রসর হলে স্বামীজী তাঁকে ধমক দিয়ে নিরস্ত করলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি কৌতুকপ্রদ কথা বলে ফেললেন, যাতে হাসির হিল্লোল উঠে সেদিনকার বিতর্ককে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ঠাকুরপূজা একটা দেখবার জিনিস ছিল। ঠাকুরকে তিনি শুধু বিধি-অনুযায়ী পূজা করেই তৃপ্ত হতেন না; তাঁকে জীবন্ত জেনে সেইরকম

সেবা করতেন। গ্রীষ্মে নিজের কষ্ট হলে তিনি পাখা নিয়ে ঠাকুরকে বাতাস করতেন এবং নিজে গলদঘর্ম হতে থাকলেও তাতেই আরাম বোধ করেন। ভোরে উঠে দায়ের উল্টা দিক দিয়ে তিনি ঠাকুরের জন্য দাঁতনকাঠি থেঁতো করে দিতেন। একদিন বাল্যভোগ দিতে গিয়ে দেখেন যে, সচ্চিদানন্দ (বুড়ো দাদা) তা ঠিকভাবে থেঁতো করেননি। অমনি মনে আঘাত পেয়ে সচ্চিদানন্দের সন্ধানে বের হলেন আর বলতে লাগলেন, "আজ তুই আমাদের ঠাকুরের মাড়ি দিয়ে রক্ত বের করেছিস!"

আলমবাজারে আসার পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দায়িত্ব বেড়েই চলল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এসে মঠের ভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এক হিসাবে মঠের কর্ণধার। তবে সুখের বিষয় এই যে, আলমবাজারে আসার পর এক বৎসর পরে মঠের আর্থিক অভাব অনেক কমে গিয়েছিল। এই মঠ থেকেও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিশেষ কোথাও যেতেন না—এমনকি উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ৺কাশীধামও তিনি দর্শন করেননি। একবার তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, কিন্তু চিন্তান্বিত গুরুভ্রাতাদিগকে তাঁর সন্ধানে দক্ষিণেশ্বর অতিক্রম করে যেতে হয়নি। দক্ষিণেশ্বরের ৺কালীমন্দির থেকেই সেবারে তিনি মঠে ফিরেছিলেন। আর একবার তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে তীর্থদর্শনে বের হয়েছিলেন; কিন্তু বর্ধমান জেলার মানকুণ্ডু পর্যন্ত পৌঁছিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সংবাদ পেয়ে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁকে নিয়ে আসেন।

মঠ-জীবনের দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও যুবক সন্ন্যাসীদের আনন্দের অভাব ছিল না। মঠের বাড়িটি ভূতের বাড়ি বলে ঐ অঞ্চলে সুপরিচিত ছিল। সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই বিষয় আলোচনা হতো এবং কেহ কেহ ভূতও দেখেছিলেন। এক গভীর রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে আছেন, এমন সময় শুনলেন ছাদে বিকট গড়গড় শব্দ হচ্ছে। শব্দ শুনে অনেকে ভয় পেলেন এবং রামকৃষ্ণানন্দকে বলতে লাগলেন, "ভাই, কোথায় নিয়ে এলে? এ যে সত্যই ভূতের ভাঁটা-খেলা চলছে।" তাতে উত্তেজিত শশী মহারাজ "তোর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করছি" বলে একটি বড় লাঠি-হাতে মার মার শব্দে দুপদুপ করে একেবারে ছাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেখেন ডাম্বেল ও লণ্ঠন রয়েছে। তখন সকলকে ডেকে বললেন, "ভূতে বুঝি আবার লণ্ঠন নিয়ে ভাঁটা খেলে?" অবশেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ওটা স্বামী সারদানন্দ ও সদানন্দের কীর্তি।

পূজায় প্রীতি থাকলেও জ্ঞানার্জনের প্রতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের একটা

স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল—তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আলমবাজারে দ্বিপ্রহরে আহারান্তে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলিকে অনুষ্টুপছন্দে সংস্কৃতে অনুবাদ করে 'বিদ্যোদয়' নামক পাক্ষিক সংস্কৃতপত্রে ছাপাতেন। এছাড়া 'ইনোসেন্ট এ্যাট হোম' ও 'ইনোসেন্ট এ্যাব্রড' ইত্যাদি হাস্যরসময় ইংরেজি গ্রন্থ উচ্চৈঃস্বরে পড়ে সকলকে আনন্দ দিতেন। সংস্কৃতের প্রতি তাঁর এমনই প্রীতি ছিল যে, একবার কাশীর প্রমদাদাসবাবুর কাছ থেকে যখন সংবাদ এল যে, মাসিক ৪০ টাকায় একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত পাওয়া যেতে পারে, তখন দারিদ্র্যবশত ঠাকুরের জন্য চার পয়সার মিছরি জোটানো কঠিন জেনেও তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হলেন! অবশ্য অন্য কারণে ঐ প্রস্তাব তখন কার্যকর হয় নি।

তাঁর গুণে মুগ্ধ স্বামীজী ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে আমেরিকার কাজের জন্য আহ্বান করেন; কিন্তু তখন তাঁর গায়ে চর্মরোগ—চুলকালে মাছের আঁশের মতো বের হতো এবং শীতকালে তা বাড়ত। অতএব তাঁর যাওয়া উচিত কিনা, এই বিষয়ে আলমবাজার মঠে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছে জেনে, স্বামীজী এক পত্রে লিখলেন, "শশী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বটে, কিন্তু তোমরা খালি শশীর আসা সম্ভব কিনা তাই বিচার করছ! ...শশীকে আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসি। He is the only faithful and true man there (ওখানে সে-ই একমাত্র বিশ্বস্ত ও খাঁটি লোক)।" শশীর তবু যাওয়া হলো না; কলকাতার তদানীন্তন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক জার্মান ডাক্তার সালজার মত দিলেন যে, শীতপ্রধান দেশে তাঁর যাওয়া চলবে না, গ্রীষ্মপ্রধান দেশই ভাল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অসীম রুদ্ধ ক্ষমতার দ্বারোদ্ঘাটনে আচার্য বিবেকানন্দ ঐভাবে তখন অসমর্থ হলেও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এবং আমেরিকা থেকে প্রথমবারে মঠে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই নিজ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করলেন। মাদ্রাজের ভক্তগণ সেখানে একটি মঠস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানালে স্বামীজী তাঁদের ব্রাহ্মণসুলভ নিষ্ঠা স্মরণ করে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কাছে আমার এমন একজন গুরুভাইকে পাঠাব, যে তোমাদের সর্বাধিক গোঁড়া ব্রাহ্মণের চেয়েও গোঁড়া, অথচ পূজা, শাস্ত্রজ্ঞান, ধ্যানধারণাদিতে অতুলনীয়।" তাঁর মনে তখন রামকৃষ্ণানন্দের কথাই জেগেছিল। আলমবাজারে এসে তিনি তাঁকে প্রথমে একটু পরীক্ষা করে দেখার জন্য বললেন, "শশী, তুই আমাকে খুব ভালবাসিস, না?" শশী মহারাজ যেই বললেন, "হ্যাঁ", অমনি স্বামীজী

আদেশ করলেন, "তবে চিৎপুরের ফৌজদারি বালাখানার মোড় থেকে ভাল টাটকা নরম পাঁউরুটি নিয়ে আয়।" শশী মহারাজের নিষ্ঠা থাকলেও শুচিবাই ছিল না; অধিকন্তু নেতার আদেশে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। তাই প্রকাশ্য দিবালোকে পাঁউরুটি কিনে আনলেন। নির্দেশপালনে তৎপর দেখে নেতা তাঁহাকে আদেশ করলেন, "ভাই, তোকে মাদ্রাজে যেতে হবে।" দ্বিরুক্তি না করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্মত হলেন এবং ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে জাহাজে করে স্বামী সদানন্দের সঙ্গে মাদ্রাজে পৌঁছলেন।

সেখানে তিনি প্রথমত আইস হাউস রোডে একটা ভাড়া-বাড়িতে ছিলেন; পরে স্বামীজীর ভক্ত এস. বিলগিরি আয়াঙ্গার মহাশয়ের 'আইস হাউস' নামক ত্রিতল ভবনের একতলার ঘরগুলি বিনা ভাড়ায় পেয়ে তাতে উঠে গেলেন। কলকাতা আসার পথে স্বামীজীর পাদস্পর্শে এই ভবনটি পবিত্রীকৃত হয়েছিল। বাড়িটির প্রকৃত নাম ছিল 'কাসল্ কার্নান'। কোনও আমেরিকান কোম্পানি বরফ রাখবার জন্য সমুদ্রকূলে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন; তাই তার নাম হয় 'আইস হাউস' বা বরফগৃহ। পরন্তু পরিকল্পনা কাজে পরিণত না হওয়ায় তা বাসগৃহরূপেই ব্যবহৃত হতে থাকে। বাড়ির প্রাচীরগুলি প্রশস্ত থাকায় তা গ্রীষ্মকালে বিশেষ আরামপ্রদ ছিল।

মাদ্রাজে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পটস্থাপনপূর্বক পূজাদি আরম্ভ করলেন; কিছুকাল পরেই বক্তৃতাদিও চলতে লাগল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে বাংলার স্থানে স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষসেবাকার্য আরম্ভ করলে তিনি ঐ কাজের জন্য পত্রিকায় আবেদন প্রকাশ করে ও অন্যান্য উপায়ে অর্থসংগ্রহে মন দিলেন। এইরূপে ক্রমেই তাঁর কার্যক্ষেত্রের প্রসার হতে লাগল। আবার মাদ্রাজের 'ইয়ং মেন্স হিন্দু অ্যাসোসিয়েশনে' তিনি ধারাবাহিকভাবে যে সকল বক্তৃতা দেন তা 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত হতে থাকলেন। এছাড়া নগরের বিভিন্ন স্থানে শাস্ত্রালোচনাও চলতে লাগল। এছাড়াও ত্রিপ্লিকেন ও মায়লাপুর অঞ্চলে গীতা ও উপনিষদ্ব্যাখ্যা, পুরাসোয়াকাম ও চিন্তাদ্রিপেটে গীতাব্যাখ্যা ও ওয়াই এম এইচ অ্যাসোসিয়েশনে 'যোগসূত্র' ব্যাখ্যা চলত। আবার প্রতি একাদশীতে মঠে ভজন হতো। এই বছর একবার ৺রামেশ্বরদর্শনে যাওয়া ছাড়া তিনি প্রায় সব সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাপ্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। উৎসবাদির আয়োজনও তিনিই করতেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ রবিবার মাদ্রাজ শহরে

শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রথম জন্মতিথি-উৎসব হয়, তাতে সর্বশ্রেণির হিন্দু, এমন কি মুসলমানরাও যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০২-এর জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর তাঁর উদ্যমে ও মাননীয় আনন্দ চার্লু মহাশয়ের পৌরোহিত্যে পাচাইয়াপ্পা কলেজে বিবেকানন্দ স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। পরবর্তী বছর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের মতো বিবেকানন্দোৎসবও নিয়মিতভাবে চলতে থাকে।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের শেষে ক্লাসের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে এগারোটা হলো। সাধারণত প্রত্যেক ক্লাসের জন্য দেড় ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু বিষয়বস্তু হৃদয়গ্রাহী হলে দু-ঘণ্টা বা ততোধিক সময়ও পার হয়ে যেত। শ্রোতা সাধারণত ২০ থেকে ৫০ জন হতো। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না; তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে শোনাচ্ছেন মনে করে শাস্ত্রপাঠ করতেন। কোন দিন দুর্যোগাদির জন্য শ্রোতা উপস্থিত না থাকলেও তিনি যথারীতি পাঠ করে মঠে ফিরতেন। এইভাবে তাঁর ঐকান্তিক উদ্যম ও উৎসাহ তখনকার দিনে পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত দক্ষিণের সমাজে কিভাবে নূতন ভাববন্যা এনেছিল তা সহজেই অনুমেয়। শুধু অনুমান কেন, প্রত্যক্ষত তার প্রমাণ পাওয়া যেত। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আমরা দেখতে পাই যে, নগরের বহির্ভাগেও বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে ছয়টি বিবেকানন্দ সোসাইটি তাঁর তত্ত্বাবধানে চলছে (যথা—বানিয়াম্বাদি, নিকুন্দি, আরাসামুখি, বারুর, কৃষ্ণগিরি ও ধরমপুরী)। এই সব সমিতিতে সাময়িক বক্তৃতা ও ক্লাসের সঙ্গে পূজা, ভজন ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্যদানের কাজ পরিচালিত হতো।

এই সকল উৎসব ও অন্যান্য কাজে তাঁর ঐকান্তিকতা ও ঠাকুরের প্রতি নির্ভরতা প্রতিপদে ফুটে উঠত। একবার শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসব প্রায় এসে পড়েছে, তখন দরিদ্রনারায়ণের সেবার কোন ব্যবস্থা হয়নি দেখে অধীর রামকৃষ্ণানন্দ মধ্যরাত্রে উঠে মঠের অলিন্দে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় রুদ্ধ আবেগে ধীর অথচ গম্ভীর পদক্ষেপে বিচরণ করতে লাগলেন। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে বুঝলেন, এই রাত্রে তিনি তাঁর প্রাণের বেদনা অন্তরের দেবতার শ্রীচরণে নিবেদন করছেন; কিন্তু কাছে যেতে সাহস হলো না। সৌভাগ্যক্রমে পরদিন জনৈক অনুরাগী প্রচুর অর্থ পাঠিয়ে দেওয়ায় উৎসব সর্বাঙ্গীণ সুসম্পন্ন হলো।

তিনি কিভাবে প্রতিকূল অবস্থায় তখন কাজ পরিচালনা করতেন তা অনুধাবন না করলে তাঁর এই কালের চরিত্রের দৃঢ়তা সহজে বোঝা যাবে না।

একদিন। কাজের শেষে ঘর্মাক্তকলেবরে মঠে ফিরে তিনি দেখলেন, ঠাকুরকে ভোগ দেবার মতো কিছুই নেই। তখন গায়ের কাপড় খুলে ফেলে বদ্ধদ্বার গৃহে ক্ষুব্ধ অভিমানে পুরুষসিংহ পাদচারণ করতে করতে ঠাকুরকে বললেন, "পরীক্ষা হচ্ছে? আমি তোমায় সমুদ্রের তীর থেকে বালি এনে ভোগ দেব এবং তাই প্রসাদ পাব। পেট নিতে না চায় আঙ্গুল দিয়ে ঠেলে সে প্রসাদ গলায় ঢোকাব।" ঠাকুরের দয়ায় সেদিন ততদূর অগ্রসর হবার আগেই গৃহদ্বারে করাঘাত হলো এবং তিনি দরজা খুলে দেখলেন যে, ঠাকুরের ভোগের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে এক ভক্ত উপস্থিত। আর একবার ঠাকুরের ভোগের সময় আগতপ্রায়, কিন্তু ঘি নেই। শশী মহারাজ চিন্তাকুল হৃদয়ে পায়চারি করছেন, এমন সময়ে তাঁর ক্লাসের জনৈক ছাত্র এসে জানালেন, তিনি মঠের কোনও একটা অভাব মিটাতে চান। রামকৃষ্ণানন্দ প্রথমত অস্বীকার করলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তির আগ্রহ দেখে পরে স্বীকৃত হয়ে ঘিয়ের অভাবের কথা জানালেন। ছাত্রটি সেইমাসে তা তো দিলেনই, পরে প্রতিমাসে তা পাঠাতে থাকলেন। বস্তুত খুব ঘনিষ্ঠভাবে যাঁরা মিশতেন তাঁরা ছাড়া অপর কেউ এসব কাজের কাহিনি জানতে পারতেন না। ভদ্রতা হিসাবে কেউ যদি জানতে চাইতেন মঠ চলে কি করে, তিনি নিরুদ্বেগে সহাস্যে উত্তর দিতেন, "ঠাকুর সব জুটিয়ে দেন।" তিনি আরও বলতেন, "অপরের সাহায্য ছাড়া যদি না চলে, তবে ভগবানের সাহায্যই চাওয়া উচিত।" সুতরাং তাঁর মান-অভিমান সব ছিল ঠাকুর-স্বামীজীকে নিয়ে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর নিজ জীবনের দুঃখ জানাতে গিয়ে তিনি একদিন স্বামীজীর চিত্রের দিকে তাকিয়ে সক্রোধে বলেছিলেন, "তুমিই তো আমায় এখানে পাঠিয়ে এই বিপদে ফেলেছ।" আবার তখনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে স্বামীজীর কাছে কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন।

সপ্তাহে এগারটি ক্লাস চালানো এবং মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাপ্রদান, দারিদ্র্যবশত ও তখনকার দিনে স্বল্পব্যয়ের যানবাহনের অভাবে এইসব কার্যক্ষেত্রে হেঁটে গিয়ে আশ্রমে নিজের রন্ধনাদির ব্যবস্থা করা—এই সমস্তের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করে তিনি বেদান্তপ্রচারে মত্ত হয়েছিলেন। কর্মক্লান্ত শরীরে মঠে ফিরে সব দিন রান্নার ইচ্ছা হতো না; তখন বাজার থেকে রুটি এনে তার দ্বারাই রাত্রের আহার শেষ করতেন। ক্লাসে যাবার সময় তাঁকে এক মাইল হেঁটে বাজারে যেতে হতো এবং তখনকার দিনের বাহন ঝটকাগাড়ি একা ভাড়া করবার সামর্থ্য না থাকায় দুই জনের সঙ্গে তাতে উঠতে হতো। সেই অপূর্ব বাক্সের মতো গাড়িতে তাঁর সবল, সুদীর্ঘ, স্থূল দেহখানিকে সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিয়ে কোন প্রকারে ন্যুব্জদেহে

বসে থাকতে হতো; আবার ঢালু বাক্স থেকে পড়ে যাবার ভয়ে সর্বদা সাবধান থাকতে হতো; এইভাবে কায়িক ও মানসিক ক্লেশের মধ্যে মাদ্রাজ-মঠের গোড়াপত্তন হয়। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, "স্বামীজী, এত ক্লেশ আপনি কিভাবে সহ্য করেন?" তিনি উত্তর দিতেন, "এ শরীরটা তো একটা যন্ত্র মাত্র, তাও আবার অচেতন; আর যন্ত্রীর জন্যই তো যন্ত্র, যন্ত্রীকে বাদ দিলে তার থাকা না থাকা দুই-ই সমান। মনে কর, একটা কলম যদি বলে, 'আমি শত শত চিঠি লিখেছি' তবে সত্যি কি তা তাই করেছে? সে তো কিছু লেখেনি, লিখেছে সে ব্যক্তি, যে তাকে ধরে আছে।"

এই নিরভিমান, নীরব কর্মীর সুযশ সুদূরবিস্তৃত হয়ে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোর শহরের উপকণ্ঠে আলসুরে নিয়ে গেছিল। আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হলে প্রায় চারহাজার ব্যক্তি পঞ্চাশটি কীর্তনের দল নিয়ে তাঁকে রেলস্টেশনে স্বাগত জানালেন এবং শোভাযাত্রা করে বাসস্থানে নিয়ে গেলেন। এই কালে তিনি তিন সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করে প্রায় বারটি বক্তৃতা দেন ও প্রত্যেকদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা করেন। সেই বছরই তাঁকে মহীশূর নগরেও শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহরূপে যেতে হলো। সেখানে তিনি পাঁচটি বক্তৃতা দেন। তার মধ্যে সংস্কৃত কলেজে সমাগত পণ্ডিতদের এক সভায় সুললিত সংস্কৃতে নির্ভীকচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুদারপন্থী পণ্ডিতসমাজে ঐ সময়ে ঐভাবে বক্তৃতা দেওয়া কেবল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বাঙ্গালোরে সে যাত্রায় যে উৎসাহ উদ্দীপিত হয়েছিল তার ফলে তাঁকে পরের বছরও সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা ও ক্লাস করতে হয়েছিল। এরপর তিনি অপর একজন সন্ন্যাসীকে সেখানে রেখে মাদ্রাজে ফিরে আসেন।

১৯০২ বা ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ত্রিবান্দ্রমে যান এবং একমাস অবস্থান করে জনসাধারণের মধ্যে চারটি বক্তৃতা করেন ও নগরের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র বাটিতে নিয়মিত গীতাব্যাখ্যা করেন। তার ফলস্বরূপ একটি বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হয়ে ঐ অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববর্তিকা দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত ছিল। পরে ১৯২৪ সালে সেখানে স্থায়ী মঠ স্থাপিত হয়। ত্রিবান্দ্রম থেকে তিনি কন্যাকুমারী দর্শনেও গেছিলেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন কলকাতায় আসেন তখন মেট্রোপলিটন কলেজে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর ঐ বছর এবং পরের বছর তাঁকে দক্ষিণাঞ্চলের বহু স্থানে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজের মায়লাপুর নামক পল্লিতে যে 'রামকৃষ্ণ বিদ্যার্থিভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়, তা বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলের এক সুবৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেও স্মরণ রাখতে হবে যে, তার পেছনে আছে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের হৃদয়বত্তা, অনুপ্রেরণা ও কর্মপ্রচেষ্টা। কোয়েম্বাটোরে একবার প্লেগের আক্রমণে একটি পরিবারের বয়স্ক সকলের প্রাণনাশ হয়ে কয়েকটি নিঃসহায় শিশুমাত্র অবশিষ্ট থাকলে, তা দেখে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠল এবং তিনি তাদের লালনপালনের ভার গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে 'রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম' স্থাপন করলেন এবং তিনি সর্বদা কার্যে ব্যস্ত থাকলেও তাঁর এই স্নেহের প্রতিষ্ঠানটিতে সপ্তাহে অন্তত একবার গিয়ে বালকদেরকে ধর্মশিক্ষা দিতেন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুনের শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক-সমিতি থেকে তাঁর কাছে আহ্বান আসে। সেই অনুসারে তিনি ২০ মার্চ রেঙ্গুনে পৌঁছে পাঁচ দিন অবস্থান করে পাঁচটি বক্তৃতা দেন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। একদিন ঠাকুরের জন্য চাঁপাফুলের সন্ধানে তিন-চার মাইল হেঁটে যাবার পথে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। শরৎচন্দ্র এই বৃথা শ্রমের তাৎপর্য জানতে চাইলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বুঝিয়ে দিলেন—

পূজা-উপাসনা সকলই গো ফাঁকি।
শুধু এই সুযোগে তোমারেই ডাকি।

রেঙ্গুনে কবি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

২৯ মার্চ মাদ্রাজে ফিরে সেই দিন সন্ধ্যায় তিনি বোম্বে শহরে ঠাকুরের উৎসব করাতে চললেন। সেখানে মাত্র প্রতি বুধবারে ঠাকুরের পূজাদি হতো—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বহস্তে নিত্যপূজার প্রবর্তন করলেন, উৎসব শেষে তিনি আবার মাদ্রাজে ফিরলেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা থেকে প্রথম বারে স্বদেশে ফিরলে স্বামী পরমানন্দের সঙ্গে শশী মহারাজ কলম্বো গিয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর সঙ্গে কান্ডী, অনুরাধাপুরম ও জাফনা ভ্রমণান্তে ভারতে এলেন। এরপর দক্ষিণদেশের কয়েকটি বিশেষ স্থান দেখে জুলাই মাসে মাদ্রাজে পৌঁছলেন। আগস্ট মাসে স্বামী অভেদানন্দকে নিয়ে তিনি মহীশূরে গেলেন এবং উভয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করলেন। সেই বারেই বাঙ্গালোরে বর্তমান আশ্রমগৃহের ভিত্তিস্থাপন হলো। তারপর অভেদানন্দ স্বামী

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলনার্থে পুরীধামে চলে গেলেন। দুই দিন পরে শশী মহারাজও সেখানে উপস্থিত হলেন এবং দীর্ঘকাল পরে এই অতিবাঞ্ছিত গুরুভ্রাতৃমিলনের আনন্দ কয়েক দিন উপভোগ করে মাদ্রাজে ফিরে আসলেন। ঐ বছর প্রেমানন্দজী তীর্থদর্শনমানসে মাদ্রাজে আসলে রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁর যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করে দিলেন এবং স্বয়ং তাঁর সঙ্গে কাঞ্চী, পক্ষিতীর্থ ও রামেশ্বরে গেলেন।

এরপর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রধান কাজ হলো মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে দুটি স্থায়ী মঠ গড়ে তোলা। বাঙ্গালোরে ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে মার্কিনদেশীয়া মহিলা ভগিনী দেবমাতা তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্য মাদ্রাজে এসে বাস করছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অর্থসংগ্রহার্থ তাঁকে নিয়ে বাঙ্গালোরে উপস্থিত হলেন। মাসাধিক কাল অবিরাম পরিশ্রমের ফলে বাটির কার্য আরম্ভ করার মতো যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হলে মহীশূর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সহযোগিতায় আশ্রমনির্মাণ আরম্ভ হলো। এই কঠোর পরিশ্রমের সময়ও তাঁর চিরাচরিত জীবনধারা অব্যাহতভাবেই প্রবাহিত হতো। নগরে সব সময়ে তাঁরা সফলকাম হতেন না; অনেক ক্ষেত্রেই কুবাক্য শুনতে হতো। তাসত্ত্বেও ধৈর্যসহকারে কার্যসমাপনান্তে আশ্রমে ফিরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের ভোগের জন্য তরকারি কুটতে বসতেন অথবা কোন কোন দিন সুগন্ধি পুষ্প চয়নান্তে দেবমাতার দ্বারা মালা গেঁথে সাদরে ঠাকুরকে পরিয়ে দিতেন। এইভাবে দিনের কর্ম প্রভুর চরণে অর্পণপূর্বক তিনি আপন মনকে মান-অভিমান ও সাফল্য-বৈফল্য থেকে মুক্ত রাখতেন।

মাদ্রাজ মঠের জন্যও তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না। স্থায়ী বাড়ির জন্য কিছু অর্থও সঞ্চিত হয়েছিল। এদিকে বিলগিরির দেহত্যাগের পরে সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। বাড়িটি নিলামে উঠল। তা ক্রয় করার মতো অর্থ মঠে নেই; অতএব বন্ধুরা চেষ্টা করলেন যাতে অন্তত কোনও ভক্তের হাতে তা যায়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মূল্য ক্রমেই বর্ধিত হয়ে ভক্তটির ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে লাগল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন কাছেই একখানি বেঞ্চিতে বসেছিলেন এবং জনৈক ভক্ত মাঝে মাঝে তাঁকে নিলামের অবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে দেখে ভক্তটি স্বভাবতই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যেমন সাক্ষিস্বরূপে বসেছিলেন তেমনি রইলেন এবং অনুদ্বেগে বললেন, "তুমি ভেবো না; বাড়ি কে কিনবে বা কে বেচবে তাতে

কিছু যায় আসে না। আমার অভাব অল্প। যেকোন জায়গায় মাথা গুঁজে আমি ঠাকুরের নাম ও গুণগান করে দিন কাটাতে পারি।" বাড়ি হস্তচ্যুত হয়ে গেল। নিরুপায় শশী মহারাজ ঠাকুরকে নিয়ে প্রাসাদেরই ক্ষুদ্র বহির্বাটিতে উঠে গেলেন।

সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিনের মধ্যেই জনৈক ভক্ত ব্রডিজ রোডের উপর একখণ্ড ভূমি দান করলেন এবং সংগৃহীত অর্থের দ্বারা বাটিনির্মাণ আরম্ভ হলো। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিজস্ব বাড়িতে ঠাকুরকে নিয়ে গেলেন। ঠাকুরের একটু স্থায়ী স্থান হওয়ায় সেদিন তাঁর আনন্দ আর ধরে না। তিনি সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এটি ঠাকুরেরই বাটি, একে সর্বথা ও সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং দেয়ালে পেরেক প্রভৃতি পুঁতে কোনও প্রকারে তার সৌন্দর্য নষ্ট করা চলবে না। মঠপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিকটস্থ ৺কপালীশ্বর শিবের মন্দিরে বিশেষ পূজা দেওয়া হলো, মঠে ভক্তদের মধ্যে পরিতোষপূর্বক প্রসাদবিতরণ হলো এবং অপরাহ্ণে সভায় স্যার পি এস শিবস্বামী আয়ার প্রভৃতি বক্তৃতা করলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনের সেটা এক অতি গৌরবময় দিন, আর ঐ দিনেই দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সাফল্যের জন্য প্রায় সবটুকু প্রশংসাই তাঁর প্রাপ্য। ভেবে অবাক হতে হয় যে, বরাহনগর ও আলমবাজারের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধজীবন শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ পূজারির হৃদয়ে কত শক্তিই লুকিয়ে ছিল! অন্তর্দ্রষ্টা বিবেকানন্দ সত্যই বলেছিলেন, "শশী খুব executive (কাজের লোক)।"

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ এসে দেখল তাঁর প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হতে চলেছে। কিন্তু এতে তিনি মোটেই গর্বানুভব করলেন না। তিনি জানতেন, তিনি ঠাকুরের শ্রীহস্তের যন্ত্রমাত্র এবং সঙ্ঘরূপী ঠাকুরের সেবায় তাঁর প্রাণ সমর্পিত। এই ভাবটি সকলের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করবার জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে দক্ষিণদেশে নিয়ে আসেন এবং তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অনায়াস ভ্রমণের জন্য অকাতরে শ্রম ও অর্থব্যয় করেন। এদিকে বাঙ্গালোরের আশ্রমবাটির কাজ শেষ হওয়ায় মহারাজ সেখানে গিয়ে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি তার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষে তাঁর পৌরোহিত্যে একটি বৃহতী সভা হয় এবং তাতে রাজ্যের দেওয়ান, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও ভগিনী দেবমাতা বক্তৃতা করেন। পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীশ্রীমা দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণে নির্গত হলে রামকৃষ্ণানন্দ সর্বপ্রযত্নে তাঁর দর্শনাদির ব্যবস্থা করে দেন। মাদ্রাজ ও মাদুরা দর্শনান্তে শ্রীশ্রীমা রামেশ্বরে যান

এবং শশী মহারাজের আগ্রহে ১০৮টি স্বর্ণ বিল্বপত্রের দ্বারা মহাদেবের পূজা করেন। পরে তিনি বাঙ্গালোরে গিয়ে নূতন মঠবাটিতে বাস করেন। ঐ সময় রামকৃষ্ণানন্দও সঙ্গে ছিলেন। তিনি প্রত্যহ সদ্যপ্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্প মাতৃচরণে অর্পণান্তে নতজানু হয়ে প্রণাম করতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরণস্পর্শে দক্ষিণদেশ পবিত্র হবে এবং তাঁদের দর্শন ও উপদেশে প্রারব্ধ কার্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হবে। এই উভয় সাধ তাঁর পূর্ণ হলো। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "এই আমার শেষ।" সে কথার অর্থ কত গভীর তা তখন কেউ অবধারণ করে নি। কিন্তু বিধাতা অচিরেই তা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি কলকাতা ফিরবার স্বল্পকাল পরেই শশী মহারাজের শরীর ভেঙে পড়ল। ইতঃপূর্বেই চোদ্দ বছর আপ্রাণ পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছিল; এখন বহুমূত্র, কাসি ও জ্বর তাঁকে আক্রমণ করল। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে তিনি বায়ুপরিবর্তনের জন্য বাঙ্গালোর আশ্রমে গেলেন; কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো না। প্রত্যুত ডাক্তার অভিমত প্রকাশ করলেন যে, তাঁর দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগ হয়েছে। অগত্যা গুরুভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণের পরামর্শে তাঁকে কলকাতায় আনা হলো। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন পুরীধামে ছিলেন। তিনি স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ও বললেন, "শশী, এসব কি? সব ঝেড়ে ফেলে দাও।" রামকৃষ্ণানন্দ উত্তর দিলেন, "রাজা, তুমি আশীর্বাদ করলেই হবে।" কে জানে কোন্ ভাষায় কি বলা হলো? মহারাজ ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করলে শশী মহারাজও তাই করলেন। তারপর নানা প্রকারে সমবেদনাপ্রদর্শনান্তে মহারাজ বললেন, "ডাক্তার কবিরাজ যেমনটি বলবে ঠিক তেমনটি করবে।" শশী মহারাজ এই আদেশ যেমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আদেশ অনুযায়ী সংসারের সমস্ত মায়িক সম্বন্ধও অচিরেই 'ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন'।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন রোগী কলকাতায় উদ্বোধন মঠে পৌঁছিলে অবিলম্বে বিজ্ঞ চিকিৎসক এনে তাঁকে দেখানো হলো। চিকিৎসক অভিমত দিলেন—শরীর তিন মাসের বেশি থাকবে না। তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেনও এসেছিলেন। সেন মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি স্বপ্নে শ্মশান, তুলসীকানন প্রভৃতি দেখেন কি?" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উত্তর দিলেন, "ও সব দেখি না; তবে ঠাকুর, মা, স্বামীজী, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি দেখি।" সবিস্ময়ে ভাবি, কি উচ্চসুরেই না তাঁর অবচেতনাও বাঁধা ছিল!

রোগের শেষ কয়দিন তিনি নিদারুণ কষ্টভোগ করেছিলেন। তাঁর গায়ে শুষ্ক শয্যাউজ হওয়াতে অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি বিছানায় গড়াগড়ি দিতেন ও ছটফট করতেন; কিন্তু তখনও তাঁর মুখে নির্গত হতো "জয় প্রভু, জয় গুরুদেব"। সেবক যথারীতি কাজ না করলে তিনি বিরক্ত হতেন সত্য, কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও তাঁর অসীম স্নেহের অভাব ছিল না। জনৈক সেবকের গামছা ও মাদুর নেই দেখে তা আনিয়ে দিয়ে তিনি তাকে সস্নেহে বললেন, "এই মাদুরে তুমি একটু শোও।" রাত্রিজাগরণে নিদ্রালু সেবক অচিরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও নিদ্রিত হলেন; নিদ্রান্তে সেবককে বললেন, "তোমাকে ঘুমুতে দিয়ে আমারও একটু ঘুম হলো।" "ভক্তের জাতি নাই"—ঠাকুরের এই কথা স্মরণ করে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণবংশজাত শশী মহারাজ এই সময়ে অব্রাহ্মণ সেবকের হস্তেও বিনা দ্বিধায় আহার করতেন; বলতেন, "তুমি ঠাকুরের ভক্ত ও ব্রহ্মচারী; তোমার হাতে খেতে আমার কোন আপত্তি নেই।" রথযাত্রার দিনে সেবকের হাতে কিছু পয়সা দিয়ে বললেন, "রথ দেখে এসো এবং দু-চার পয়সার কিছু কিনে এনো।" সেবক তাঁকে ফেলে যেতে আপত্তি করলে বললেন, "কাশীপুর বাগানে ঠাকুরও আমাকে রথযাত্রার দিন ঐরূপ করতে বলেছিলেন। ...রথযাত্রা দেখে তাঁর জন্য দুপয়সা দামের একটি ছুরি (লেবু কাটার জন্য) এনেছিলাম। তাতে প্রসন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এইগুলি মেনে চলতে হয়। গরিব লোকে দুপয়সা পাবার জন্য দোকান দেয়। এই সব মেলাতে দু-চার পয়সার কিছু কেনা উচিত'।"

বস্তুত শেষ কয়দিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনের সর্বপ্রকার মহত্ত্ব যেন অনাবৃতসৌন্দর্যে সকলের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছিল। স্বামী প্রেমানন্দ দুই-একদিন অন্তর বেলুড় থেকে তাঁকে দেখতে আসতেন। একদিন তিনি এসে শয্যাপার্শ্বে বসলে শশী মহারাজ তাঁর হাত-পা টিপে দিয়ে সেবা করলেন; কিন্তু তাতেও তৃপ্ত না হয়ে তাঁর জন্য সেবককে শুষ্ক মেওয়া দিতে বললেন। বাবুরাম মহারাজ নিঃশেষে তা খেয়ে চলে গেলে শশী মহারাজ পাত্রটি হাতে নিয়ে দেখলেন, কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা—মনের ভাব, প্রসাদ গ্রহণ করবেন। কিছুই নেই দেখে সেবককে এই বলে তিরস্কার করলেন যে, তিনি প্রেমানন্দকে যথেষ্ট ফল না দিয়ে অন্যায় করেছেন। অতঃপর শূন্য পাত্রটি তিনি মুছে সর্বাঙ্গে মাখলেন।

চিকিৎসায় কোনও ফল হচ্ছে না দেখে স্বামী সারদানন্দ একবার তাঁকে জানালেন যে, অপর একজন ডাক্তার একটু চেষ্টা করে দেখতে চান। উত্তরে

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলে পাঠালেন, "এ দেহমন-প্রাণ ঠাকুরের চরণে অর্পণ করেছি। তাঁর প্রতিনিধি রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ আছেন; তাঁদের নির্দেশ মতো চিকিৎসা যেন হয়। এই বিষয়ে আমার নিজের কোন মতামত নেই।"

শরীরত্যাগের দুই-তিন দিন পূর্বে সকালে আট-নয়টার সময় তিনি অকস্মাৎ ব্যস্তভাবে সেবককে বললেন, "ঠাকুর, মা, স্বামীজী এসেছেন; আসন পেতে দে;" সেবক কিছুই না বুঝিয়া স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। শশী মহারাজ আবার বললেন, "দেখতে পাচ্ছিস না? ঠাকুর এসেছেন—মাদুর পেতে দে, আর তিনটে তাকিয়া দে।" সেবক আদেশ পালন করলে শশী মহারাজ কোন অদৃশ্য দৃশ্যের দিকে নির্নিমেষনয়নে চেয়ে তিনবার প্রণাম করলেন এবং পরে বললেন, "তাঁরা চলে গেছেন।" শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। শশী মহারাজ তাঁকে দর্শন করতে চাইলেন; তাই স্বামী ধীরানন্দ তাঁকে আনতে যান; কিন্তু মা আসতে পারেননি। এক অলৌকিক সূক্ষ্ম দর্শনের কথা তিনি পরদিন পুলিনবাবুকে বলেন এবং ঐ বিষয়ে একটি গানরচনার অনুরোধ জানিয়ে গিরিশবাবুকে গানের এই প্রথম পঙ্‌ক্তিটি বলতে বলেন, "পোহাল দুঃখরজনী।" মহাকবি গান রচনা করে দিলেন এবং সুগায়ক পুলিনবাবুর মুখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মুদ্রিতনয়নে আবিষ্টমনে বেহাগরাগিণীতে অনেকক্ষণ ধরে এই সঙ্গীতটি শুনলেন—

"পোহাল দুঃখরজনী
গেছে 'আমি'-'আমি' ঘোর কুস্বপন;
নাই আর ভ্রম জীবন-মরণ;
হের জ্ঞান-অরুণ-বদন বিকাশে, হাসে জননী ॥
বরাভয়করা দিতেছে অভয়;
তোল উচ্চ তান, গাও জয় জয়;
বাজাও দুন্দুভি, শমনবিজয়; মার নামে পূর্ণ অবনী ॥
কহিছে জননী, 'কেঁদো না, রামকৃষ্ণপদ দেখ না।
নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা;
(হের) মম পাশে করুণার দুটি আঁখি ভাসে।
ভুবন-তারণ গুণমণি।' "

২১ আগস্ট (৪ ভাদ্র) মহাসমাধির কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি ঠাকুরের চরণামৃত পান করলেন। একটার সময় তাঁর মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং সর্বশরীর

পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল—মাথার চুলগুলি পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল। ১টা ১০ মিনিটে তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর মহাসমাধির সংবাদ পেয়ে বিষাদগম্ভীর স্বরে বললেন, "একটা দিকপাল চলে গেল; দক্ষিণ দিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।" আর মাদ্রাজের পাচাইয়াপ্পা কলেজে শোকসভায় নগরবাসীরা সমবেত হয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন—"দক্ষিণ ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জীবনপাত করেছেন। মাদ্রাজের হিন্দুসমাজ শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে স্বীকার করছে যে, তাঁর মহাপ্রয়াণে সমূহ ক্ষতি হয়েছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দাস্যভক্তির এক অপূর্ব অত্যুজ্জ্বল আদর্শ এ যুগের জন্য রেখে গেছেন। কি ঠাকুরঘরে, কি বক্তৃতামঞ্চে, কি লোক-ব্যবহারে—সর্বত্র অনন্যসাধারণ গুরুভক্তিই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রধান উৎস। ঠাকুরঘরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করতেন এবং পুষ্পচয়ন, পূজা, আরাত্রিক, প্রণামাদি প্রত্যেক কার্যে এত বিভোর হয়ে পড়তেন যে, উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যেও সে গভীর ভাব প্রসারিত হতো। একবার এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে দেখলেন, পূজান্তে তিনি ঠাকুরকে নিবিষ্টমনে পাখা করছেন এবং গম্ভীরস্বরে উচ্চারণ করছেন—'সৎ গুরু', 'সনাতন গুরু', 'পরম গুরু'। দীর্ঘকাল যাবৎ যদিও পূজারির দৃষ্টি আগন্তুকের প্রতি আকৃষ্ট হলো না, তথাপি ভদ্রলোকের অন্তর অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে উঠল; অতএব ভাবভঙ্গ না করেই তিনি উদ্দেশে প্রণামান্তে বিদায় নিলেন। আরাত্রিকের সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন 'জয় গুরু' উচ্চারণপূর্বক দীপারতি করতেন, তখন দর্শকের হৃদয়েও ভক্তির হিল্লোল উঠত, আর সে আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে তিনি অসীম তৃপ্তিলাভ করতেন। মাদ্রাজের অসহ্য গরমে স্থূলকায় শশী মহারাজের কষ্ট হতো; কিন্তু এর প্রতিকার ছিল অপরাহ্নে ও রাত্রে পাখা নিয়ে ঠাকুরকে বাতাস করা। ঠাকুরের প্রসাদ ভিন্ন তিনি কিছু গ্রহণ করতেন না। বহুমূত্র-রোগের সময় ডাক্তাররা রুটি খেতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে রুটি নিবেদন করা হয় না বলে তাঁর তা খাওয়া হলো না। মঠের নূতন বাড়ি হবার দুবছরের মধ্যেই ছাদ ফেটে বর্ষার জল পড়তে লাগল। একরাত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হলে ঠাকুরের শয়নঘরে গিয়ে রামকৃষ্ণানন্দ দেখলেন, তাঁর উপর জল পড়ছে। সেই সময়ে স্থানান্তরিত করলে পাছে ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে তিনি সারারাত্রি উপরে ছাতা ধরে বসে থাকলেন এবং ভোরে বৃষ্টির বিরাম হলে ঠাকুরকে অন্যত্র নিয়ে গেলেন। এটাই কি 'মৃন্ময়ে

চিন্ময়দর্শন?' একরাত্রে মশার কামড়ে ঘুম ভেঙ্গে রামকৃষ্ণানন্দ দেখলেন, মশারির মধ্যে মশা ঢুকেছে। তখনই মনে হলো, ঠাকুরেরও তো ঐরূপ নিদ্রার ব্যাঘাত হচ্ছে; অতএব সেখানেই মশা তাড়াতে চললেন। প্রসাদবিতরণে তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল; সমাগত ব্যক্তিকে তার কিছু না কিছু তিনি অবশ্যই দিতেন—এমনকি, মুটে-মজুর পর্যন্ত তাতে বঞ্চিত হতো না।

গুরুভ্রাতাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা পূজার আকারেই আত্মপ্রকাশ করত। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যাবার পথে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের জাহাজ মাদ্রাজে নোঙ্গর করবে জেনে শশী মহারাজ তাঁদের জন্য পনেরো সের ময়দা কিনে স্বহস্তে নিমকি, গজা প্রভৃতি আহার্য প্রস্তুত করলেন। তখন পাচক বা ভৃত্য ছিল না, রাখবার সামর্থ্যও ছিল না। পরে ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নিয়ে কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে তিনি নৌকাযোগে জাহাজের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন কলকাতায় প্লেগের আশঙ্কা ছিল বলে জাহাজের কাউকেও নামতে বা কাউকেও উঠতে দেওয়া হলো না। উপায়ান্তর না দেখে শশী মহারাজ বললেন, "মহাত্মাদ্বয়ের পদস্পর্শ হলো না; অন্তত তাঁদেরকে প্রদক্ষিণ করে যাই—মাঝিকে জাহাজ প্রদক্ষিণ করে যেতে বল।" আর একবার এর্ণাকুলমে জনৈক ভক্তের বাটিতে উপস্থিত হয়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জানতে চাইলেন, স্বামীজী যখন ঐ বাটিতে এসেছিলেন, তখন কোথায় শয়নোপবেশনাদি করেছিলেন। যখন জানলেন যে, তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ওটাই সেই স্থান, তখন তিনি ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে ও মস্তকে ধূলি ধারণ করে বললেন, "এটা পবিত্র স্থান।" স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিবার আগেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সেই রাত্রে ধ্যানযোগে শুনলেন, স্বামীজী সুপরিচিত স্বরে বলছেন, "শশী, শশী, আমি শরীরটা থুথুর মতো ফেলে দিয়েছি।" স্বামীজীর অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পরে (১৯১১ খ্রিঃ, ২৯ জানুয়ারি) তিনি তাঁর স্মরণে 'অনিত্যদ্রব্যেষু বিবিচ্য নিত্যং' ইত্যাদি যে সংস্কৃত স্তব রচনা করেছিলেন, তাতে তিনি তাঁকে নরহিতার্থ অবতীর্ণ নরাবতাররূপে অভিনন্দন জানিয়ে সর্বশেষে অমর প্রণামমন্ত্র সংযোজিত করেছিলেন—

নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দ-সুরয়ে।
সচ্চিৎসুখস্বরূপায় স্বামিনে ক্লেশহারিণে ॥

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মাদ্রাজ আগমন-উপলক্ষে স্বীয় কক্ষটি তাঁর উদ্দেশে সুসজ্জিত করে শশী মহারাজ বলেছিলেন, "ঠাকুর ও তাঁর

মানসপুত্র এ ঘরে থাকবেন; আমি প্রবেশপথে হলঘরে থেকে তাঁদের সেবা করব—এর চেয়ে আর অধিক কি চাই?" মহারাজের আগমনান্তে জনৈক ভক্ত যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "নূতন স্বামীজীর বক্তৃতাদি হবে কি?" তখন সহাস্যবদনে শশী মহারাজ জানালেন, "বক্তৃতায় আছে কি? এঁর মতো মানবের দর্শন-স্পর্শনেই অপরের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চারিত হয়।" ব্রহ্মানন্দজীর মাদ্রাজ মঠে অবস্থানকালে রামকৃষ্ণানন্দ প্রত্যহ আরাত্রিকের পর তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতেন এবং সাধু-ব্রহ্মচারী ও অপর সকলের মনে এই বিশ্বাস অঙ্কিত করে দিতেন যে, মহারাজের সেবার দ্বারা ঠাকুরেরই সেবা করা হয়। জনৈক ভক্ত একদা ঠাকুরের জন্য কিছু ফল ও ফুল আনলে রামকৃষ্ণানন্দ তা মহারাজকে নিবেদন করলেন এবং ভক্তটিকে পরে বুঝিয়ে দিলেন যে, মহারাজের মধ্য দিয়ে ঠাকুরই তা গ্রহণ করেছেন। মহারাজও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন ও তাঁর উপর অগাধ বিশ্বাস রাখতেন। একবার তিনি নবাগত একজন সাধুকে বলেছিলেন, "শশী মহারাজের সঙ্গে তিন বছর কাটাও, তাহলে সাধুজীবনে তোমার কিছু অপ্রাপ্য থাকবে না।"

শশী মহারাজ বাহিরের সৌন্দর্যে দৃষ্টিপাত না করে অন্তরের সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হতেন। সান্ধ্য সূর্যের শোভা কেউ তাঁকে দেখালে তিনি বলেছিলেন, "এই সময় ঈশ্বরের চিন্তা করা উচিত, তাঁর সৃষ্টির নহে।" হিমালয় সম্বন্ধে একদিন বলেছিলেন, "হিমালয় কি?—পাহাড়ের উপর পাহাড় স্তূপীকৃত! ... পৃথিবীতে দর্শনযোগ্য এমন কি আছে? ঈশ্বরই এই বিশ্বে একমাত্র দর্শনীয় বা চিন্তনীয়।" আর ছিল তাঁর বিনয় ও ঈশ্বরনির্ভরতা। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন ব্রহ্মানন্দজীকে মাদ্রাজে আনবার জন্য পুরীধামে যাচ্ছিলেন, তখন গাড়িতে তাঁর জন্য আসন সংরক্ষিত হয়নি। অনেক কষ্টে দ্বিতীয় এক প্রকোষ্ঠে উপরের একটি আসন পাওয়া গেল। ঐ কামরার নিচের আসনদ্বয়ে দুইজন ইংরেজ ছিলেন; তাঁরা তাঁর স্থূলতা ইত্যাদির উল্লেখপূর্বক নিজেদের মধ্যে বিরুদ্ধ ও সরহস্য সমালোচনা করতে থাকলেন, যেন এইরূপ স্থূলকায় একজন উপরের আসন গ্রহণ করলে তা ভেঙে পড়ে তাঁদের বিপদ ঘটতে পারে। স্টেশনে উপস্থিত দেবমাতা এতে প্রতিবাদ করলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বললেন, "তুমি ভেবো না, জগদম্বাই আমায় দেখবেন।" এদিকে যাত্রার সময় অতীত হলেও ট্রেন ছাড়ল না; শোনা গেল, ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়েছে, যাত্রীদিগকে গাড়ি বদলাতে হবে। নূতন গাড়িতে রেলকর্মচারী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জন্য একটি প্রথম শ্রেণির নিচের আসন স্থির করে দিলে তিনি সেখানে উপস্থিত দেবমাতাকে সহাস্যে

বললেন, "আমি তোমায় বলেছিলাম না, মা-ই আমার সব সুখ-সুবিধা করে দেবেন?"

তিনি সহজে কারও দোষগ্রহণ করতেন না। মাদ্রাজে জনৈক ধনবান ব্যক্তি কিছু অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তা আনার জন্য তাঁকে বহুবার ধনীর গৃহে যাতায়াত করেও ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়। সঙ্গী জনৈক ভক্ত এতে ধনীর প্রতি রুষ্ট হলে তিনি অম্লানবদনে বললেন, "আমরা আমাদের কর্তব্য করছি মাত্র।" শেষ যেবারে ভদ্রলোক স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, "আপনারা আর আসবেন না, যদি পারি কিছু পাঠিয়ে দেব," সেবারে সঙ্গীর ক্রোধ চরমে উঠায় তাঁর মুখ রক্তিম হলো। পরন্তু পথে এসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর স্কন্ধে হাত দিয়ে বললেন, "ভেতরে যদি আমরা ক্রোধ পোষণ করি, ওর অনিষ্ট হবে; অর্থ না দেওয়াতে আমাদের মনে যেন তার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব না জাগে।" একবার এক ভদ্রলোক তাঁকে ও একজন ব্রহ্মচারীকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যথাসময়ে উভয়ে উপস্থিত হয়ে দেখেন, গৃহস্বামী অনুপস্থিত। সংবাদ পেয়ে তিনি এসে সলজ্জভাবে যখন বললেন যে, নিমন্ত্রণের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, সুতরাং কোন আয়োজন হয় নাই, অদোষদর্শী রামকৃষ্ণানন্দ তখন তাঁর দ্বারা বাজার থেকে কিছু খাদ্য আনিয়ে তাই গ্রহণপূর্বক অম্লানবদনে মঠে ফিরলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বহির্গমনের সুযোগে দেবমাতা একবার তাঁর গৃহ পরিষ্কার করে ও বস্ত্রাদি ধৌত করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলেন। মঠে ফিরে তিনি যখন অনুসন্ধানের পর এটা দেবমাতার কার্য বলে জানলেন, তখন সন্তুষ্ট না হয়ে বরং এই বলে দেবমাতাকে সাবধান করে দিলেন যে, সন্ন্যাসীদের ব্যবহার্য শয্যা বা বস্ত্রাদি নারীর স্পর্শ করা অনুচিত—স্ত্রীলোক ভক্ত হলেও সন্ন্যাসী তার নিকট কোন ব্যক্তিগত সেবা নেবে না। অর্থসম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ সাবধান ছিলেন—তিনি তা স্পর্শ করতেন না, তাঁর প্রতিভূস্থানীয় অপরে অর্থগ্রহণ বা ব্যয়াদি করত।

মঠে যোগদান করার জন্য যেসব যুবক আসত তাদের প্রতি একদিকে তিনি যেমন ছিলেন সদয়, অপরদিকে তেমনি তাদের চরিত্রে সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ দৃঢ়াঙ্কিত করে দেবার জন্য তিনি ছিলেন কঠোর। জনৈক সন্ন্যাসীকে তিনি একদিন আন্দামানের একখানি পত্রে 'পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ' এই ঠিকানা লিখতে বললে সন্ন্যাসী শুধু 'পোর্ট ব্লেয়ার' লিখলেন। তাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে লেখকের সমুচিত শাস্তিবিধান করলেন। কিন্তু পরদিনই মঠে পাকা

আম এলে যখন সর্বোত্তম আমটি পরিবেশক তাঁর পাতে দিল, তখন তিনি তার স্বাদ গ্রহণ করে বললেন, "বা, বেশ মিষ্টি" এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটি উক্ত সন্ন্যাসীর পাতে তুলে দিলেন। পরে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, গুরু বা গুরুতুল্য ব্যক্তির নির্দেশ পালন না করলে আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি হয় না—এই জন্যই আগের দিন তাঁর কল্যাণার্থ তিনি ক্রোধ করেছিলেন। একটি যুবক ভবঘুরে বৈরাগীর দলে যোগ দেবার পর দুর্ব্যবহারে জর্জরিত হয়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আশ্রয়ভিক্ষা করে। তিনি আশ্রয় দিলেন বটে, কিন্তু সে দিন কয়েক পরেই পূর্বাভ্যাসবশত অনুমতি ব্যতিরেকেই অন্যত্র চলে গেল। পুনর্বার পূর্বেরই ন্যায় আশ্রমে এসে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তাকে আবার সুযোগ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এভাবে স্নেহের স্পর্শে যুবকটির মতিগতি পরিবর্তিত হলো এবং সে সুসংযত সন্ন্যাসজীবন অবলম্বন করল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নবাগতদের অন্তর দেখতেন, শুধু বাহিরের আচরণে ভ্রান্ত হতেন না। নবাগত এক যুবককে মঠের সকলেই ভালবাসতেন। তিনি তাকে স্নেহ করলেও তার সেবা গ্রহণ করতেন না। এতে সকলেই অবাক হতেন। অবশেষে একদিন সে মঠ ছেড়ে চলে গেলে তিনি মনোভাব খুলে বললেন, "ছেলেটা তমোগুণী। সে উপোস করে লুকিয়ে খায় আর ধ্যানের নাম করে মাদুর পেতে ঘুমায়। মন মুখ এক না হলে ধর্মপথে উন্নতি হয় না।" এক নবীন সাধু পূর্বাশ্রমে মাতৃদর্শনে গিয়ে বাড়ি থেকে কিছু নূতন বস্ত্র ও একখানি সিল্কের চাদর নিয়ে আসেন। শশী মহারাজ তাঁকে ঐ সকল ফেলে দিতে বলেন; কারণ স্বগৃহের প্রাচীন স্মৃতির সঙ্গে সন্ন্যাসীর মনকে বিজড়িত রাখা অন্যায়।

তাঁর নিজজীবনও সর্ববিষয়ে বড়ই সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। সকালে তিনি গীতা ও বিষ্ণু-সহস্রনাম নিয়মিত পাঠ করতেন। স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে তীর্থভ্রমণকালে মঠের বাইরে গিয়ে প্রথম রাত্রিতেই তিনি দেখলেন যে, গ্রন্থ দুখানি আনা হয় নাই। অমনি একজনের সাহায্যে তখনই বই দুখানি সংগ্রহ করলেন। তিনি সর্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গ করতে ভালবাসতেন এবং অপরেও তাতেই মগ্ন থাকুক, সেটাই ছিল তাঁর একান্ত চেষ্টা। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে যখন দেবমাতাকে নিয়ে তিনি বাঙ্গালোরে যান তখন দেবমাতার অসুখ হলে তাঁর পার্শ্বে বসে পুরাণাদি কথা শুনাতেন। তখন তাঁরা মহীশূররাজের অতিথিরূপে বাস করছিলেন। একদিন অনেক রাজকর্মচারী এসে ভগিনী দেবমাতার সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। এদিকে শশী মহারাজ কি এক অস্বস্তিতে অবিরাম উসখুস করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে দেবমাতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি অসুস্থ

বোধ কচ্ছেন?" তিনি অকপটে উত্তর দিলেন, "আমি ভালই আছি; কিন্তু তোমাদের আলোচনা আমার আদৌ ভাল লাগছে না।" সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎপ্রেমিক সন্ন্যাসীর এই স্বাভাবিক বিরক্তিতে আগন্তুক ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ না হয়ে প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করলেন।

উপদেশগ্রহণ বা শাস্ত্রব্যাখ্যাদি শ্রবণার্থ আগত ব্যক্তিদের আচরণের প্রতি তাঁর প্রখর দৃষ্টি থাকত এবং জিজ্ঞাসুসমুচিত ব্যবহারে ত্রুটি হলে তৎক্ষণাৎ তা সংশোধন করে দিতেন। জনৈক আগন্তুক মঠে এসে একদিন সংবাদপত্র খুলে পাঠ করতে থাকলে তিনি বললেন, "রেখে দাও তোমার কাগজ-পড়া। এসব পড়ার জায়গা তো ঢের আছে। মঠে এসেছ, এখন ভগবানের চিন্তা কর।" ধর্মপিপাসুদের কোনপ্রকার দুর্বলতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। একদিন এক ব্যক্তি লটারিতে কিছু অর্থলাভ করে পনেরোটা মুদ্রা মঠের সাহায্যে দান করতে চাইলে তা তিনি গ্রহণ করলেন না। নিন্দনীয় উপায়ে লব্ধ অর্থ দেবসেবায় ব্যয় করা তাঁর মতে গর্হিত ছিল।

পরধর্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধায় তাঁর অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ ছিল। বাইবেল তিনি অতি মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করে তার সমস্ত ভাবরাশি আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর বাইবেল-ব্যাখ্যাকালে প্রতি বাক্যে এত তেজ ও ভাব অনুস্যূত থাকত যে, খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরাও মুগ্ধ হতেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্ন্যাসী বলে সুপ্রথিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অনেক ক্ষেত্রে গির্জায় গিয়ে বেদির সম্মুখে খ্রিস্টানী রীতিতে নতজানু হয়ে প্রার্থনাদির দ্বারা মাদ্রাজবাসীকে চমৎকৃত করতেন। এক সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টিতে আক্রান্ত কতিপয় মুসলমান ছাত্র মঠে আশ্রয় গ্রহণ করলে তিনি তাদের সঙ্গে মহম্মদের বাণী নিয়ে এমন হৃদয়গ্রাহী আলোচনা আরম্ভ করলেন যে, ছাত্রেরা তাতে আকৃষ্ট হয়ে এক সপ্তাহ যাবৎ প্রতি সন্ধ্যায় ঐ বিষয়ে আরও আলোচনা শুনতে তাঁর কাছে আসতে লাগল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একাধারে উপদেষ্টা, বক্তা ও লেখক ছিলেন। তিনি বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃতে বহু বক্তৃতা করেছিলেন এবং প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। তার কিছু কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় তাঁর প্রণীত 'রামানুজচরিত' তাঁর প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং বাংলা ভাষায় তা এক অমূল্য সম্পদ। বস্তুত রামানুজ ও তাঁর শ্রীসম্প্রদায় সম্বন্ধে এটাই উক্ত ভাষায় একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। ইংরেজিতে যে বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে তন্মধ্যে 'Universe and Man' (বিশ্ব ও মানব), 'Sri Krishna the Pasto-

ral and King-maker' (রাখাল ও নৃপতিস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ), 'The Soul of Man' (মানবাত্মা) ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। প্রথম গ্রন্থে আছে বেদান্তের কয়েকটি স্থূল তত্ত্বের আলোচনা, দ্বিতীয় গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও দ্বারকালীলা এবং তৃতীয় পুস্তকে মানবের স্বরূপ আলোচনা।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দীর্ঘজীবী ছিলেন না—ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হবার আগেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করে গেছেন। কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনের মূল্য শুধু দীর্ঘতার পরিমাপে স্থিরীকৃত হয় না। বিশেষত অধ্যাত্মজগতে সময় অপেক্ষা ভগবদনুরক্তির গভীরতাই অধিক আদরণীয়। শশী মহারাজের জীবনে প্রতিভা ও অনুভূতি একত্র মিশ্রিত হয়ে এক অপূর্ব আদর্শের সৃষ্টি করেছিল। রামকৃষ্ণসংঘে তাই এই অমর জীবন চিরপ্রেরণা প্রদান করবে।

(শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, স্বামী গম্ভীরানন্দ, প্রথম ভাগ
চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৯, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃঃ ৩৪৬-৩৮৩।
সাধুভাষা হতে চলতি ভাষায় সংকলিত হয়েছে।)

প্রথম পর্ব

শশী প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

শশী আর শরৎকে দেখেছিলাম ঋষি কৃষ্ণের (অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টের) দলে ছিল। অপরা বিদ্যায় ডুবে যদি পরা বিদ্যা ভুলে যাস তো তোর হৃদয় ভক্তিহীন হয়ে যাবে।

আহা, তোর বড় কষ্ট হয়েছে। দ্যাখ, যার হাতে জল গলে না, লোকে তাকে কৃপণ বলে, কিন্তু আমি দেখছি তুই কৃপণ নস, তুই দাতা।

দ্যাখ, তোরা এই সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস। তোরা যদি বলিস তাহলে একবার সেখানে দেখে আসি।

(শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ,
১ম ভাগ; উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,
৪র্থ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৭৯, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫০, ৩৫২)

শশী তখন সবে ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসা করিতেছেন। তিনি তখন বিদ্যাসাগর কলেজে বি.এ. প্রথম বৎসর পড়েন। ঠাকুর এইবার তাঁহার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—সেই যে ছেলেটি যায়, কিছুদিন তার টাকায় মন এক-একবার উঠবে দেখছি। কিন্তু কয়েকটির দেখছি আদৌ উঠবে না। কয়েকটি ছোকরা বিয়ে করবে না।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম কথিত, অখণ্ড, রামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা,
বাংলাদেশ, ঢাকা সংস্করণ, ১৪১১ বাংলা, পৃষ্ঠা ৭০৮)

শ্রীশ্রীমায়ের শশী

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) স্থানীয় ভক্তসঙ্গে মাদ্রাজ স্টেশনে আসিয়া মাতাঠাকুরানিকে সম্বর্ধনা করিয়া লইয়া গেলেন। মঠের নিকট মায়লাপুর নামক স্থানে একখানি দ্বিতল বাটি শ্রীমার জন্য ভাড়া লওয়া হয়। প্রায় এক মাস এখানে থাকা হয়। যতদিন শ্রীমা রহিলেন, তাঁহার আদেশে শশী মহারাজ দুইবেলা মঠে না খাইয়া এখানেই আমাদের সঙ্গে খাইতেন।

রামকৃষ্ণানন্দজী এবং নির্মলানন্দজীর ভক্তি ও যত্নের প্রশংসা মা অকুণ্ঠভাবে করিয়াছেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অসুস্থতাহেতু মাদ্রাজ হইতে কলকাতায় আসিয়াছিলেন। মাতাঠাকুরানির জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে তিনি মাতৃভবনে দেহত্যাগ করেন। রামকৃষ্ণগতপ্রাণ এই সন্তানের লোকান্তর-গমনে মাতা একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—দক্ষিণেশ্বরে দেখেছি আসার পালা, আজ ঠাকুরের কাছে রাখাল আসছে, কাল নরেন আসছে, পরশু বাবুরাম; বেশ আনন্দের হাটবাজার। আর এখন সব যাচ্ছে, আজ যোগেন, কাল নরেন, পরশু শশী; এখন যাবার পালা। যোগেন যাবে, গোলাপ যাবে, গৌরদাসী যাবে, আমিও যাবো, এখন ভাঙা হাট।

(সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম,
২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলকাতা-৪, পৃঃ ২৯৯, ৩০৩, ৩০৭)

শশী মহারাজ আগেই রামনাদের রাজাকে মায়ের রামেশ্বর যাত্রার কথা জানাইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে রামেশ্বর দর্শন প্রসঙ্গে মা বলিয়াছিলেন—"রামেশ্বরে গেছি। শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) পূজার সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ১০৮ সোনার বেলপাতা। আমি সেই বেলপাতা দিয়ে পুজো করলাম। রামনাদের রাজা তার করেছিলেন—আমার গুরুর গুরু পরম গুরু যাচ্ছেন, যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—স্বামী ভূমানন্দ,
শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠ, ১০ রামকৃষ্ণ লেন, কলকাতা-৩
১ম মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃঃ ২১২-২১৩

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের এক উজ্জ্বল মুকুটমণি খসিয়া পড়িল—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী কলকাতায় 'উদ্বোধনে' মহাপ্রয়াণ করিলেন। দেহরক্ষার কয়েকদিন পূর্বে তিনি শ্রীমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং শ্রীমাকে লইয়া যাইবার জন্য জয়রামবাটীতে লোক আসিয়াছিল। কিন্তু অনেক ভাবিয়া তিনি যান নাই। রামকৃষ্ণানন্দজী দাক্ষিণাত্যে তাঁহার যে আপ্রাণ সেবা করিয়াছিলেন, তাহা তখনও তাঁহার চক্ষে জাজ্বল্যমান ছিল। এরূপ অনুরক্ত সন্তানের দেহত্যাগ তিনি জননী হইয়া কিরূপে দাঁড়াইয়া দেখিবেন? আর 'উদ্বোধনে'র মতো বাটিতে তিনি সদলবলে উপস্থিত হইলে রোগীর আরাম না হইয়া অসুবিধাই ঘটিবে। এই সমস্ত কথা ভাবিয়া তিনি আগত ব্যক্তিকে ফিরাইয়া দিলেন। তথাপি রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াই রামকৃষ্ণানন্দজী দিব্য চক্ষে শ্রীমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা এসেছেন!" পরে তাঁহার মনোভাব-অবলম্বনে গিরিশবাবু একখানি মাতৃসঙ্গীত রচনা করিয়া দিলে উহা শুনিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং অচিরে চিরকালের মতো চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সে সংবাদ জয়রামবাটীতে পৌঁছিলে শ্রীমা সকাতরে বলিলেন, "শশীটি আমার চলে গেছে, আমার কোমর ভেঙে গেছে।"

(শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, ১৯ পৌষ, ১৩৮১, পৃঃ ৩০৩)

আমাদের শশী

স্বামী বিবেকানন্দ

শশীর originality (মৌলিকতা) ভারি কম, তবে খুব good workman, persevering (ভালো কাজের লোক—অধ্যবসায়শীল), সেটা বড়ই দরকার; শশী খুব executive (কাজের লোক)...।

শশীকে আমি বিশ্বাস করি, ভালোবাসি। He is the only faithful and true man there (ওখানে সে-ই একমাত্র বিশ্বস্ত ও খাঁটি লোক)।

ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরানগর মঠে কত জপ-ধ্যান করতুম। তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেউ চান করে, কেউ না করে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে জপ-ধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের ভেতর কি

বৈরাগ্যের ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার হুঁশ ছিল না। শশী চব্বিশঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাকত এবং বাড়ির গিন্নির মতো ছিল। ভিক্ষাশিক্ষা করে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর জোগাড় ওই সব করত। এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেলা ৪/৫টা পর্যন্ত জপ-ধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে-হিঁচড়ে আমাদের জপ-ধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি!

খরচের অনটনের জন্য কখনও কখনও মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতুম। শশীকে কিন্তু কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজি করাতে পারতুম না। শশীকে আমাদের মঠে central figure (কেন্দ্রস্বরূপ) বলে জানবি।

(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, পৌষ, ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ৩৫৬; ৭ম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, পৃঃ ২১৭, ৯ম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, পৃঃ ১৫০-১৫১)

গুরুগত-প্রাণ শশী

স্বামী শিবানন্দ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রেম ও পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি ছিলেন। দেহ ও মনের এরূপ পবিত্রতা অতি বিরল দেখা যায়। তাঁর জীবন দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর যে ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল তা অসীম ও অসাধারণ। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মহাবীরের যে ভক্তি ছিল তার সাথেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের গুরুভক্তির তুলনা হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইদেরকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে শ্রদ্ধা করতেন। গুরুভাইদের প্রতি তাঁর প্রেম পূজার তুল্য ছিল। তাঁর নিকট উচ্চ নীচ, ধনী, দরিদ্র ভেদ ছিল না। সকলের কল্যাণের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত থাকতেন। প্রসারিত বাহুতে সকলকেই তিনি আলিঙ্গন করতেন এবং ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সকলকে তাঁর করুণা বিতরণ করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে সেবা করা এবং প্রত্যেককে অন্তঃস্থিত দেবত্ব বিকাশে সাহায্য করাই ছিল তাঁর জীবন ব্রত। এই ব্রতের বেদিতে তিনি নিজেকে বলিদান দিয়েছিলেন, যা তিনি অপরকে করতে বলতেন, তা তিনি স্বয়ং সর্বাগ্রে করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজের জন্যই তিনি এ ইহ জগতে আগমন করেন। সমগ্র প্রাণমন দিয়ে তিনি ইহ জীবনে ঠাকুরের সেবা

করেছিলেন। তাঁর নাম সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়েছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীগুরু মহারাজের পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীগুরুর সেবা ছাড়া তিনি অন্য কাজ করতেন না। তিনি গুরুগত প্রাণ ছিলেন। গুরু চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই তাঁর মনে স্থান পেত না। দক্ষিণ ভারতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে যে বিরাট কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তার ভিত্তি স্থাপিত হয় রামকৃষ্ণানন্দজীর বুকের রক্তে। যতই দিন যাবে ততই লোকে তাঁর প্রেম ও প্রভাব বুঝতে পারবে।

দক্ষিণের দিকপাল

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহাসমাধির সংবাদে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিষাদ গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, "একটি দিক্‌পাল চলে গেল। দক্ষিণ দিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।" মান্দ্রাজ মঠে তাঁর প্রসঙ্গে বলতেন, "শশী মহারাজ-এর প্রভাব দিগ্বিজয়ী শঙ্করের মতো এদেশে জ্বলজ্বল করছে।"

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মেদিনীপুর, ১৩৫৫, পৃঃ ৪)

শশী দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা

রামচন্দ্র দত্ত

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের গুরুসেবা তুলনা রহিত এবং অনুকরণীয়। যদ্যপি সেবা বলিয়া সংসারে কোন কথা থাকে তাহা হইলে শশী মহারাজই তাহা জানিতেন। যদ্যপি কাহাকেও সেবাইত বলিয়া কহা যায় তাহা হইলে শশীকেই সর্বাগ্রগণ্য কহা যাইবে। যদ্যপি অহেতুক ভক্তি কেহ দেখিতে চান তাহা হইলে তিনি শশীকেই তাহার আদর্শ দেখিবেন। শশীর গুণই সব; দোষ নাই। তবে মানুষ নির্দোষ হইতে পারে না, এইটি প্রবাদ আছে। শশী বিনা বিচারে, বিনা বাগ্ বিতণ্ডায়, স্বার্থপক্ষে দৃষ্টি না রাখিয়া এক মনে পরমহংসদেবের সেবা করিত। ইহাকে যদি দোষ কওয়া যায় এটি শশীর দোষ ছিল। হনুমানের দাস্যভক্তির কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি; শশী দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। এমন ভক্তচূড়ামণি আমরা পরমহংসদেবের একটি ভক্তকেও দেখি নাই। একথা আমরা

অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি না। যে কেহ পরমহংসদেবের নিকট গিয়াছেন সকলেই একটা স্বার্থের সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন; কিসে পরিত্রাণ পাইবে, কিসে সাধন ভজন হইবে, কিসে যোগমার্গে পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম হইবে, এইরূপ একটা না একটা ভাব সকলেরই ছিল। শশীর সে সকল কিছুই ছিল না। সে আত্মনিবেদন করিয়া নিষ্কাম ধর্মরূপ গুরুসেবা করিতে শিখিয়াছিল। সে তাহা জীবনে সাধন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে এবং যে কেহ শশীর এই দাস্যভক্তির উপাখ্যান শ্রবণ করিবে তাহারও সেই ভক্তি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মেদিনীপুর, ১৩৫৫, পৃঃ ৬)

শশী, তুই ভাই ধন্য! তুই যথার্থ সেবা শিক্ষা করিয়াছিলি! পৃথিবীর সারধর্ম—সারাৎসার কর্ম—গুরুসেবা। যদি দেখিবার কিছু থাকে, তা শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্ম! যদি করিবার কিছু থাকে, তাহা শ্রীগুরুর শ্রীচরণ-বন্দনা এবং যদি শ্রবণ করিবার কিছু থাকে, তাহা শ্রীগুরুর গুণগাথা! শশী, তুই তাহা করিয়াছিস—প্রাণ ভরিয়া, আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া করিয়াছিস। কখনও মনে হয়, তুই বুঝি জন্মান্তরে সেবা করিবি বলিয়া পঞ্চতপা করিয়াছিলি অথবা গলা কাটিয়া শোণিত দান করিয়াছিলি, তাই প্রভু তোর জন্য উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সেবা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তোর নিকট জড়বৎ শয়ন করিয়াছিলেন। তুই ভাই, মানব-দেহ ধারণ করিয়া প্রকৃত কর্তব্য কর্ম বুঝিয়াছিলি, তুই সেই নিমিত্ত প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র। তাঁহার দয়াতে তুই আজ সেবক-মণ্ডলীর শিরোমণি। প্রভু যেমন আমাদের গুরু—গুরু বলিয়া মনে স্পর্ধা হয়, তেমনি তুই তাঁহার সেবক, পরিচয় দিবার যোগ্য পাত্র, তুই অদ্বিতীয়।

মাতাঠাকুরানি যদিও নিকটে ছিলেন, তথাপি সেবার জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইত না। শশী সকল দিকে দৃষ্টি রাখিত। অন্যান্য সন্ন্যাসী ভক্তেরা পরমহংসদেবের সেবায় আত্ম-বিসর্জন দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের জপ-তপ* করিবার বড় বাসনা হইয়াছিল। কখনও কৌপীন পরিয়া, চিম্‌টা লইয়া, গাত্রে ভস্ম মাখিয়া সন্ন্যাসী সাজিতেন; কখনও ধুনি জ্বালাইয়া বসিতেন, কখনও উপবাসাদি নিয়ম করিয়া দিন যাপন করিতেন। শশীর এ সকল কিছুই ছিল না।

(উৎস ঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত,—রামচন্দ্র দত্ত অষ্টম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৪০২, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃঃ ১৭০-১৭১)

---

* শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশক্রমে তাঁহারা ইহা করিতেন।

কর্মবীর শশী মহারাজ

স্বামী প্রেমানন্দ

শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) কি ভয়ানক কর্মবীর! এঁদের সকল আদর্শ কাকে [illegible] না? এই যে মঠ, ঠাকুরবাড়ি দেখছিস এর গোড়া হচ্ছে শশী মহারাজ। যোগেন রাখালও নয়, শরৎ, বাবুরাম এমনকি স্বামীজীও নহে।

আমি জোর করে বলতে পারি একমাত্র শশী মহারাজ এর কারণ। আলমবাজার মঠে স্বামীজী প্রভৃতি ঠাকুর পূজায় আপত্তি তুললেন। একমাত্র শশী মহারাজই প্রতিবাদ করলেন। তিনি সেই ছেঁড়া মাদুরের উপর ঠাকুরের ছবি রেখে পূজা করতেন। একদিন স্বামীজী প্রভৃতি সবাই তো ঠাকুর পূজা তুলে দিবার জন্য রাগ করে বলরামবাবুর বাটি চলে গেলেন। একমাত্র শশী মহারাজই পূজার পক্ষপাতী; তিনিই আলমবাজার মঠে রইলেন। পরদিন বলরামবাবু আবার ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শশী মহারাজ ও স্বামীজীর সুখ্যাতি ঘরে ঘরে। আহা!

শশী মহারাজ ওদিককার দিক্‌পাল ছিলেন। মাদ্রাজীদের যে এত গোঁড়ামি, শূদ্রেরা থুতু ফেলবার জন্য হাতে ভাঁড় নিয়ে তবে রাস্তায় বেরোয়। যাদের দেশে এমনি গোঁড়ামি তিনি সেই দেশের ব্রাহ্মণকে দিয়ে শূদ্রদের পরিবেশন প্রীতির সহিত করাইয়াছেন।

আগে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হতো না, নিজেদের জন্যই রান্না হতো, পরে স্বামীজী প্রচলন করে দেন। শশী মহারাজের আমলে, ঠাকুরের পূজা আরও বেশি ভাবে হতো। এখন তো সব ছাঁটকাট দিয়ে পূজা হয়; আগে দাঁতন থেঁতলে তুলার মতোন করে দেওয়া হতো, এখন তো সব মানসিক দেওয়া হয়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মেদিনীপুর, ১৩৫৫, পৃঃ ৬-৭; প্রেমানন্দ, পৃঃ ৭৮

শশী ভাই-এর কথা

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

তার (শশী মহারাজ) চেয়ে বড় দাতা কে আছে! শশী ভাই তো হামাদের সব ভিক্ষা করে (তপস্যার সময়) খাইয়েছে। শশী ভায়ের শাঁক-ঘণ্টা নাড়ায় হামাদের দুবেলা দুমুটো জুটতো। যে এতগুলো লোককে দুবেলা খাওয়াতো তাকে তোমরা দাতা বলবে না?

বরানগর মঠে শশী ভাই এমনি আরতি করতো, কি বলবো? ঠাকুর ঘরটা তখন গম্ গম্ করতো। শশী ভাই মুখে 'জয় গুরুদেব! জয় গুরুদেব!' বলতো। ... হর্‌বখৎ শশীভায়ের চিন্তা ছিলো ঠাকুরের সেবা কেমনভাবে চলবে, কি কি দেওয়া হবে, আর কখন কোন্‌টা দেওয়া হবে। তাঁর পূজার সব কাজ সে নিজে হাতে করতো। ... হামাদের বলতো—তোদের কোন ভাবনা নেই, তোরা সাধন-ভজন নিয়ে পড়ে থাক। এঁর (অর্থাৎ ঠাকুরের) দৌলতে সব জুটে যাবে।

* * *

একদিন তো তিনি শশীভাইকে বড় আদর করলেন, বললেন—"দ্যাখ! তোরা এই সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস; তোরা যদি বলিস তাহলে একবার সেখানকে দেখে আসি।"

শশীভাইকে কতো দিন বলেছেন—"ওগো! নেয়ে খেয়ে নাও, আমি এখন ভালো আছি, আমার এখন কোন দরকার নেই, খেয়ে এসো।" তিনি কতোদিন তার হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে আমায় দিয়েছেন।

একজন ভক্ত সেইদিনই কোন এক বাগানে জাম্‌রুলের ফুল দেখতে পেয়ে শশীভাইকে সে খবর জানালে। শশীভাই সেইদিন সেই বাগান হোতে জাম্‌রুল পেড়ে নিয়ে এলো। জাম্‌রুল দেখে তিনি তো অবাক হোয়ে বললে—"এমন সময় জাম্‌রুল কোথায় পেলি রে?"

অনেকক্ষণ নাম কীর্তনের পর রাত একটার সময় তাঁর সমাধি ভাঙলো তখন একটু সুজির পায়েস খেলেন। শশীভাই তা খাইয়ে দিলে। তারপর হঠাৎ তাঁর সমাধি হোলো।

একটু পরেই ঠাকুরের ভক্ত (নেপালরাজের প্রতিনিধি) উপাধ্যায় এলেন। তিনি ঠাকুরের গায়ে মাথায় ঘি মাখাতে বললেন। শশীভাই ঠাকুরের গায়ে ঘি মাখালেন আর বৈকুণ্ঠবাবু ঠাকুরের পায়ে ঘি মালিশ করতে লাগলেন। তাতেও কিছু হোলো না।

শশীভাই একখানা পাখা হাতে নিয়ে চিতার কাছে বসে ছিলো, তার পাশে শরোট্‌ভাই ছিলো। শশীভাইকে হাম্‌নে তো হাত ধরে তুললুম, শরোট্‌ভাই আর লোরেনভাই তাকে কত বুঝালে, বাকি শশীভাই একটা কথাও বললে না। ...জানো। তাঁর অস্থি আর ভস্ম্ একটা কলসিতে পুরে শশীভাই মাথায় কোরে বাগানে এনেছিলো। যে বিছানায় তিনি শুতেন সেইখানে কলসিটি রেখে দেওয়া হোলো।

... জন্মাষ্টমীর আগের দিন হাম্‌নে রামবাবুর বাড়ি গেলুম, সেখান হোতে কাঁকুড়গাছির বাগানে গেলুম। পরের দিন সকালবেলা রামবাবুর বাড়ি থেকে কীর্তন করতে করতে সকলে মিলে কাঁকুড়গাছিতে গেলুম। শশীভাই নিজে মাথায় কোরে কলসি নিয়ে গেলো। সেখানে কলসির উপর মাটি ফেলতে দেখে শশীভাই কেঁদে উঠ্‌লো, বললে—"ওগো! ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে।" শশীভায়ের কথা শুনে সকলের চোখে জল এসেছিলো।

* * *

বরানগর মঠে একদিন গুরুভাইদের মধ্যে ঠাকুরঘর নিয়ে বড় কথা কাটাকাটি হয়েছিলো। সেদিন (গৃহী) ভক্তদের মধ্যে কে নাকি ঠাট্টা করে বলেছিলো— "শালারা আর করবি কি? যেমন শীতলাঠাকুর বসায়, তেমনি ঠাকুরের ছবি বসিয়ে ঘণ্টা বাজাবি আর পুজুরিগিরি করবি।" (গৃহী) ভক্তটির ঐ কথা শুনে শশীভাই বড্ড চটে উঠে বলেছিলো—"এমন যে শালা বলে, তার পয়সায় আমি মুতে দিই।" শশীভাইকে চটতে দেখলে লোরেনভাইয়ের বড় আমোদ লাগতো, তাই হাসতে হাসতে বললে—"যা শালা! ভিক্ষে করে তোর ঠাকুরকে খাওয়াগে যা।" লোরেনভাইকে ঐ কথা বলতে শুনে শশীভায়ের মনে বড্ড দুঃখু হলো, বললে—"বেশ! তোমাদের এক পয়সা চাই না, আমি ভিক্ষে কোরে ঠাকুরকে খাওয়াবো।" তাতে লোরেনভাই হাসতে লাগলো, বললে— "কিরে! ভিক্ষে কোরে তোর ঠাকুরকে লুচি ভোগ দিতে পারবি তো?" শশীভাই (উত্তেজিত হইয়া) বললেন—"হাঁ পারবো, সেই ভোগের লুচি আবার তোকে খেতে দেবো।" তখন স্বামীজী (উত্তেজনার ভান করিয়া) বললে—"তা কখনই

হোতে পারে না; আমরা শালা খেতে পাচ্ছি না, আর তোর ঠাকুর লুচিভোগ খাবে? ফেলে দেবো এমন ঠাকুরকে, জানিস? তুই যদি ফেলতে না পারিস আমি নিজের হাতে সে ঠাকুরকে ফেলে দেবো?" এই বোলে (কৃত্রিম রোষভরে যেন) লোরেনভাই তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরের দিকে যেতে লাগলো। শশীভাইও লাফিয়ে উঠে ইংরেজিতে কি বললেন। হাসিঠাট্টার ব্যেপারে এমন তক্‌রার হোতে দেখে হামার মনে বড্ড দুঃখু হলো। হাম্‌নে লোরেনভাইকে বললুম—"কেনো ভাই! শশীর সাথে তুমি বাদ সাধছো? তোমার মতে তুমি চলো, শশীভাইকে তার মতে চলতে দাও।" লোরেনভাই হামাকেও দাবড়ি দিয়ে উঠলো। দাবড়ানি শুনে যেই একটা কড়া কথা বলতে গেছি, অমনি লোরেনভাই হেসে উঠলো। এমন হাসলে যে, শশীভাইও হেসে ফেললে। দু-মিনিটের মধ্যে সব গলাগলি বসে ঠাকুরপুজোর ব্যবস্থা করতে লেগে গেলো।

বরানগর মঠে শশীভাই এমনি আরতি করতো, কি বলবো! ঠাকুরঘরটা তখন গম্ গম্ করতো। শশীভাই মুখে 'জয় গুরুদেব! জয় গুরুদেব! বলতো, আর কালীভাই একটা স্তোত্র পাঠ করতো। কুছুদিন পরে কালীভাই তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) পূজার মন্তর সব তৈরি কোরে ফেললে। তখন থেকে সেই মন্তর পড়ে পুজো হোতে লাগলো।... হামাদের আয় কুছু ছিলো না, বাকি ঠাকুরের ভোগে সব ভালো ভালো ফল দেওয়া হোতো। এই না দেখে ওখানকার (বরানগরের) লোক সব বলতো—এরা মাটির ভেতর থেকে ঘড়া ঘড়া মোহর পেয়েছে; নৈলে এতো ফুর্তি কোরে ভোগ লাগায়? হর্‌বখৎ শশীভায়ের চিন্তা ছিলো ঠাকুরের সেবা কেমনভাবে চলবে, কি কি দেওয়া হবে, আর কখন কোন্‌টা দেওয়া হবে। তাঁর পূজার সব কাজ সে নিজে হাতে করতো।... হামাদের বলতো—তোদের কোন ভাবনা নেই, তোরা সাধন-ভজন নিয়ে পড়ে থাক।

একদিন শশীভাই বুড়ো বাবাকে ঠাকুরের দাঁতনকাঠি দিতে বললে। বুড়ো বাবা জানতো না যে, ঠাকুরের দাঁতনকাঠি থেঁতো করে দেওয়া হয়। তাই সে একটা আস্ত দাঁতনকাঠি ঠাকুরের ঘরে দিয়ে এলো। বাল্যভোগ দেবার সময় শশীভাই তা দেখে বুড়ো বাবাকে কি বকুনিটাই দিলে!—"শালা! আজ তুই আমাদের ঠাকুরের মাড়ি দিয়ে রক্ত বের কোরেছিস; আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।" এই বলে শশীভাই তার দিকে ছুটে এলো। হাম্‌নে তো তখুনই বুড়ো বাবাকে বললুম—"পালিয়ে যা, দেখছিস কি?" হামার কথা শুনে বুড়ো বাবা পালিয়ে গেলো। তাকে ধরতে না পেরে শশীভাই আবার একটা দাঁতনকাঠি

খুন খেঁতো কোরে ঠাকুরঘরে দিয়ে এলো। দেখো তো, শশীভাই কেমন মন নিয়ে তাঁর পূজা করতো!

একবার খুব মজা হয়েছিল। সকালে ঠাকুরের বাল্য-ভোগের জন্য হালুয়া তৈরি করতে গিয়ে শশী মহারাজ দেখেন—কড়া অপরিষ্কার। রাত্তিরে লাটু মহারাজ ছোলা সিদ্ধ করে রেখেছিলেন, তা আর পরিষ্কার করা হয় নি। কড়া মেজে হালুয়া তৈরি করে ঠাকুরকে বাল্যভোগ দিতে দেরি হয়ে যাবে, এই জন্য সেদিন শশী মহারাজ লাটু মহারাজকে যা-তা বলে গালি দিয়েছিলেন। কারণ ঠাকুরের সেবার কোনরূপ ক্রুটি হলেই তিনি অধৈর্য হয়ে পড়তেন। গালাগালি খেয়ে লাটু মহারাজ বললেন—"হামি মাকে পত্র দিব; তোমার বাবা-মা আউর হামার বাবা-মা কি আলাদা আছে?"

দেখিতে দেখিতে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ আসিয়া গেল। সেই বৎসর মঠের দুইজন প্রধান পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যু হয়। প্রথমে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে বলরাম বাবু দেহত্যাগ করেন এবং একমাস যাইতে না যাইতে ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উদরী রোগে পরলোক গমন করেন। ...সুরেশবাবুর অসুখ শুনে শশীভাই একদিন হামাকে নিয়ে মঠ থেকে গাড়ি করে তাঁকে দেখতে গেলো। শশীভাইকে দেখে সুরেশবাবু বললেন—"দেখ্। তোর হাতে ৫০০্ টাকা দিচ্ছি, তুই সেই টাকায় একটা ঠাকুরঘর বানাস।" সেকথা শুনে শশীভাই তাঁকে বললে—"তুই কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই! আগে অসুখ থেকে বেঁচে ওঠ, তারপর টাকা দিস্, এখন তোর টাকা আমি নেবো না।" সুরেশবাবু অনেকবার বললেন, বাকি শশীভাই টাকা নিলো না। আর তিনিও ভালো হোলেন না। শুনেছি, সে টাকা তিনি মরবার আগে কার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। পরে সেই টাকা দিয়ে ঠাকুরঘরেতে (বেলুড় মঠের ঠাকুর ঘরের সম্বন্ধে ইহা বলিয়াছেন) মার্বেল পাথর বসানো হোলো।... লোরেন ভাইয়ের সঙ্গে অনেকে মঠ থেকে বেরিয়ে গেলো অর্থাৎ তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। শশীভাই সেখানে (অর্থাৎ বরানগর মঠে) রয়ে গেলো, হামনে ঘুসুড়িতে মায়ের বাড়িতে চলে গেলুম।

বিবেকানন্দভাই আলমবাজার মঠে বসে একদিন শশীভাইকে বলেছিলো, "শশী, তুই আমাকে খুব ভালোবাসিস্—না?" শশীভাই যেই বললে—"হাঁ, তোমাকে খুব ভালোবাসি।" অমনি স্বামীজী তাকে বললে—"যা বলবো তাই করবি?"—"হ্যাঁ"। "তবে চিৎপুরের ফৌজদারী বালাখানার মোড় থেকে ভালো টাটকা নরম পাউরুটি নিয়ে আয়।" বিবেকানন্দভায়ের ইচ্ছে হোলো শশীভাইকে

পরীক্ষা কোরবে। সে তো বামুনের ছেলে! তার ছুঁই ছুঁই ভাব আছে কি না দেখবে। বাকি শশীভায়ের নিষ্ঠা থাকলেও শুচিবাই ছিলো না। তাই সে হাসতে হাসতে বিকেল পাঁচটার সময় সব লোকের সামনে দিয়ে পাউরুটি কিনে আনলে। পাউরুটি দেখে বিবেকানন্দভাই ভারী খুশি হোলো। শেষে তাকে খুব আদর কোরে বললে—"ভাই! তোকে যে মাদ্রাজ যেতে হবে।" কোন ওজর-আপত্তি না কোরে শশীভাই মাদ্রাজ চলে গেলো। সাধু হয়ে কাশী পর্যন্ত দেখবার অপেক্ষা করলে না। লোরেনভায়ের উপর এমন তার ভালোবাসা!

আলমবাজার মঠ হোতে শশীভাই মাদ্রাজ চলে গেলে বাবুরামভাই ঠাকুরসেবার ভার নিয়েছিলো আর তুলসীভাই মঠের সব আনা-নেওয়া করতে লেগে গেলো।

মাদ্রাজ হইতে শশী মহারাজকে কলকাতায় আনা হইলে লাটু মহারাজ প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেন। অনেক সময় লোক পাঠাইয়া খবরাখবর লইতেন। এক একদিন শশী মহারাজের সম্বন্ধে বলিতে বলিতে লাটু মহারাজ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। একদিন তো বলিয়াই ফেলিলেন—"শশী মহারাজের সেবা করলেই ঠাকুরের সেবা করা হোলো।" ২১ আগস্ট, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে শশী মহারাজ যেদিন রামকৃষ্ণধামে চলিয়া যান, সেইদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"শশী টাকাকে পয়সার মতো জ্ঞান করতো, জানো চন্দর! রাখালভায়ের মুখে শুনেছি—সে যখন মাদ্রাজ গিয়েছিলো তখন শশী যে তাকে কুথায় রাখবে, কুথায় বসাবে, তা ঠিক করতে পারতো না, ঐ নিয়ে সদাই ভাবিত হোয়ে থাকতো। রাখালভাইকে তো সে ফাস্টো ক্লাশ ছাড়া চড়তেই দিতো না। অনেক টাকা খরচ হচ্ছে বলে রাখালভাই তাকে কতো বোঝাতো! বাকি শশীভাই বলতো, "তুমি হামাদের রাজা, রাজার মতোন মান্যি তোমায় নিতে হবে।" স্বামীজীর পর রাখালকে সে খুব মানতো।

(শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৮, পৃঃ ১৪৮, ২৫৩, ২২৮, ২৩০, ২৩১, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৭, ২৫১-২৫৩, ২৬০-২৬২, ২৮১-২৮৩, ৩৯৫-৩৯৬)

শশী মহারাজের স্মৃতি

স্বামী অভেদানন্দ

আমার মন দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির কালীবাড়িতে পরমহংসদেবকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। হতাশ মন লইয়া পথের পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। বাগবাজারে খালের পোলের উপর দিয়া বারাকপুর ট্রাঙ্করোড দিয়া উত্তর দিকে ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। অনেক দূর গমন করিয়া একজন পথিককে দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির কালীবাড়ি কোন্ পথে জিজ্ঞাসা করিলাম। পথিকটি উত্তরে বলিল ঃ "সে তো এদিকে নয়, গঙ্গার ধারে। তুমি পথ ভুলেছ"। তখন আমি ঐ নির্দিষ্ট পথ ধরিয়াই গঙ্গাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে আড়িয়াদহ গ্রামের মধ্য দিয়া কালীবাড়ির উত্তরদিকের ফটকে (gate) আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং বেলতলা ও পঞ্চবটীর পাশ দিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। সেখানকার কোন কর্মচারীকে পরমহংসদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি ঐ কালীবাড়িতে একটি ঘরে থাকেন। কিন্তু সেইদিন তিনি কলকাতায় গিয়াছেন এবং তাঁহার ঘর তালাবন্ধ রহিয়াছে। তখন বেলা প্রায় ১১টা এবং প্রখর রৌদ্রতাপে প্রাতঃকাল হইতে নগ্নপদে ভ্রমণ করিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। পরমহংসদেব নাই শুনিয়াই হতাশ হইয়া ঘরের উত্তর দিকে সিঁড়িতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম তখন কি প্রকারে কলকাতায় ফিরিয়া যাইব। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, শরীর পথশ্রান্ত, সঙ্গে পয়সা নাই, বাড়িতে কাহাকেও বলিয়া আসা হয় নাই, দক্ষিণেশ্বরেও কেহ পরিচিত নাই, হাঁটিয়া তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফিরিয়া যাইবার শক্তিও নাই। এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম এবং ব্যাকুল-হৃদয়ে এইদিক-সেইদিক তাকাইতে লাগিলাম যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। বাগানের ফটকের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি এমন সময় এক যুবক ছাতা হাতে করিয়া আমার দিকে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল ঃ "পরমহংসদেব আছেন?" আমি বলিলাম ঃ "না, তিনি কলকাতায় গেছেন।" যুবক আমার কথা শুনিয়া একটু হতাশ হইয়া পড়িল। তখন দুইজনের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল। আমার দুরবস্থা দেখিয়া ও কলকাতায় ফিরিয়া যাইবার কথা শুনিয়া যুবক আশ্বাস দিয়া বলিল ঃ "এখুনি কলকাতায় ফিরে

যাবে কেন? এখানে গঙ্গায় স্নান করে মা কালীর প্রসাদ পাও ও বিশ্রাম কর, পরে কলকাতায় যাবে।" আমি বলিলাম ঃ "আমি বাড়িতে কাকেও বলে আসিনি। পিতামাতা আমায় অন্বেষণ করে কষ্ট পাবেন"। যুবক উত্তরে বলিল ঃ "আমিও তো বাড়িতে কাকেও কিছু না বলে কলকাতা থেকে পদব্রজে এখানে এসেছি। পিতামাতা একটু ভাবলো তো আর কি হবে! আমার সঙ্গে এস, গঙ্গায় স্নান করবে।" আমি বলিলাম ঃ "আমার কাপড়-গামছা তো নাই"। "এখানে একখানা কাপড় পাওয়া যেতে পারে।" যুবকটি ইতঃপূর্বে দুই-তিনবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পরমহংসদেবের দর্শনলাভ করিয়াছিল এবং রামলালদাদা প্রভৃতি মন্দিরের পূজারি ও কর্মচারীদের নিকট পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং আমার স্নানাহারের কোন অসুবিধা হইল না। যুবককে পাইয়া আমার অশান্ত প্রাণ শান্ত এবং সকল দুঃখকষ্ট দূর হইল। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের কি অপার করুণা—ইহা ভাবিতে ভাবিতে আমার হৃদয় আনন্দসাগরে মগ্ন হইল!

আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যুবকের নাম শশিভূষণ চক্রবর্তী এবং কলেজের ছাত্র। যুবকের পরিচয় লাভ করিয়া মনে আনন্দ হইল। এই শশিভূষণ পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

সেইদিন হইতে শশিভূষণ আমাকে আপন সোদর ভ্রাতার তুল্য ভালোবাসিত এবং তাঁহার ভালোবাসা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

যাহা হউক, শশিভূষণের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া মা কালীর প্রসাদ পাইয়া তৃপ্ত হইলাম। পরে বৈকালে কলকাতায় ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলাম। তখন শশিভূষণ আমাকে বলিল ঃ "পরমহংসদেবকে দর্শন না করে বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত নয়। এমন সুযোগ জীবনে আবার ঘটবে কিনা তার কি নিশ্চয়তা আছে। যখন এত কষ্ট স্বীকার করে তাঁর দর্শনের জন্য এখানে এসেছ, তখন অপেক্ষা করাই ভালো।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "পরমহংসদেব তাহলে আসবেন? আর যদি আজ না আসেন?" শশিভূষণ বলিল ঃ "তিনি নিশ্চয়ই সন্ধ্যার পর কলকাতা থেকে ফিরে আসবেন। তিনি কলকাতায় কারও বাড়িতে রাত্রিযাপন করেন না।" আমি ভাবিতে লাগিলাম ঃ "পিতামাতাকে না বলে আমি কখনও এভাবে কোথায়ও যাই না। তাঁদের না জানিয়ে বাড়ি থেকে এতদূর চলে এসেছি। না জানি তাঁরা কত রকম চিন্তায় অধীর হয়ে আমায় খুঁজছেন এবং কোথাও আমার সন্ধান না পেয়ে সম্ভবত রোদন করছেন। এখানে সমস্ত দিন তো কেটে গেল, এখন আমার বাড়িতে ফিরে যাওয়াই উচিত। যদি আমি এখানে রাত্রিযাপন

তবে তাহলে মায়ের প্রাণে অত্যন্ত মর্মবেদনা দেওয়া হবে"। এইরকম কত চিন্তা ও কল্পনা মনের মধ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিল, কোন কিছুই স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না। আবার মনে হইতে লাগিল আমি যোগশিক্ষা করিবার জন্য গুরুর অন্বেষণে বাহির হইয়াছি, যোগীগুরু না পাইলে প্রাণে শান্তি পাইব না। সুতরাং যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছি তখন পরমহংসদেবের দর্শন না পাইয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইলে পুনরায় হয়তো দর্শন করিবার জন্য এইখানে আসিতে হইবে। কিন্তু সেই সুযোগ আবার কতদিনে ঘটিবে এবং কত বাধাবিঘ্নও আসিতে পারে তাহা কে বলিতে পারে। 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' এই কথা শাস্ত্রে আছে, সুতরাং আমার কি করা কর্তব্য। পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বাড়ি ফিরিয়া যাইব—না পরমহংসদেবকে দর্শন করিবার জন্য কালীবাড়িতেই আজ রাত্রিযাপন করিব? এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে আমার চিত্ত দোলায়মান হইল। আমি পূর্বের ন্যায় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলাম। আমার অবস্থা হইল কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুনের ন্যায়। ভীষণ সমস্যায় পতিত হইয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলাম—কর্তব্য কি। শশিভূষণ আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া বলিল ঃ "ভাই, এত ভাবনা কিসের জন্য? এই দেখ আমিও পিতামাতাকে না বলে এখানে এসেছি। আজ রাত্রে এখানেই থাকব। তোমার অবস্থা আমারই মতো। পিতামাতা একটু চিন্তা করে কাতর হবে, তারপর যখন তোমাকে নিকটে পাবে তখন আবার আনন্দিত হবে। তুমি যখন এখানে সমস্ত দিন কাটালে তখন আর অল্পক্ষণের জন্য কেন বাড়ি ফিরে যাবে। এখানে রাত্রিযাপন করে আগামিকাল প্রাতে কলকাতায় ফিরে যাবে। আজ আমার সঙ্গে এই পবিত্র স্থানেই রাত্রিযাপন কর"।

শশিভূষণের উপদেশে আমার বাড়ির ও মাতাপিতার চিন্তা প্রশমিত হইল এবং স্থির করিলাম যোগী পরমহংসদেবকে দর্শন না করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইব না, সুতরাং অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার ঘটুক। অতঃপর শান্ত মনে আমি পরমহংসদেবের দর্শনাভিলাষে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমশ সূর্য অস্তাচলে গমন করিল এবং সন্ধ্যার অন্ধকার আসিয়া সমগ্র পৃথিবী আবৃত করিল। এইদিকে দক্ষিণেশ্বরে দেব-দেবীর মন্দিরে আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শশিভূষণ আমাকে লইয়া কালীমন্দিরে ভবতারিণীর আরাত্রিক দেখিতে চলিল। এইরূপ জাগ্রত মা কালীর আরাত্রিক দর্শন করিয়া আমি মনে-প্রাণে অভূতপূর্ব শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। আরাত্রিকের পর মা কালীকে প্রণাম করিয়া শশিভূষণের সঙ্গে পরমহংসদেবের ঘরের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া

বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। শশিভূষণ নানান প্রসঙ্গ করিয়া আমার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে মা কালীর পূজারি রামলালদাদা শীতলভোগের প্রসাদ দুইখানি লুচি ও একটু চিনি শশিভূষণ ও আমাকে দিয়া জলযোগ করিতে বলিলেন। প্রসাদ পাইয়া দুইজনে মন্দিরে শয়ন করিলাম।

এমন সময় দূরে একখানি ছ্যাকড়া গাড়ির চাকার ঘরঘর শব্দ শুনিয়া শশিভূষণ ও রামলালদাদা বলিলেন ঃ "এবার পরমহংসদেবকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি আসছে। তিনি কলকাতায় গৃহস্থবাড়িতে কোনদিন রাত্রিযাপন করেন না।" তখন আমরা সকলেই পরমহংসদেবের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমশ ছ্যাকড়া গাড়ি পরমহংসদেবের ঘরের উত্তর-পূর্বদিকে সিঁড়ির ধারে আসিয়া থামিল। শশিভূষণ, রামলালদাদা ও আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। আমার বুকের ভিতর দুরদুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরমহংসদেব গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া উত্তরদিকের বারান্দার সিঁড়ির উপর দিয়া দক্ষিণে বারান্দায় প্রবেশ করিবার দ্বার দিয়া আসিতেছেন এবং গুরুগম্ভীর স্বরে "কালী কালী কালী" তিনবার উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার ঘরের মধ্যে পাতা ছোট একটি তক্তপোশে উপবেশন করিলেন। পশ্চাতে তাঁহার সেবক (লাটু মহারাজ) পরমহংসদেবের গামছা ও বটুয়া (যাহাতে এলাইচ প্রভৃতি মুখশুদ্ধি থাকিত) লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। পরমহংসদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদা (মা কালীর পূজারি) ও শশিভূষণ ঘরে প্রবেশ করিয়া পরমহংসদেবের শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন এবং আমার আগমনের বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। আমি ভয়ে ও ভক্তিতে নির্বাক হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি। তখন মনে কোনপ্রকার প্রশ্নই উঠিতেছে না, অথচ কত কিছু ভাবিয়া চলিয়াছি। এমন সময় রামলালদাদা আমার নিকট আসিয়া বলিলেন ঃ "পরমহংসদেব তোমায় আহ্বান করছেন"। আমি অগত্যা ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম ও পরমহংসদেবের শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলাম। শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর হইয়া যেন পরমশান্তির স্রোতে ভরিয়া গেল। পরমহংসদেব সস্নেহে আমাকে মাদুরের উপর উপবেশন করিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "তুমি কে? বাড়ি কোথায়? নাম কি? তুমি কি জন্য এত কষ্ট করে এখানে এসেছ? কি চাও? ইত্যাদি"। আমি ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলাম ঃ "আমার যোগ শিক্ষা করার ইচ্ছা। আপনি কি আমায় যোগসাধনা শিক্ষা দেবেন?" পরমহংসদেব এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন ঃ "তোমার এই অল্প বয়সে যোগসাধন করার ইচ্ছা হয়েছে—এটি খুব ভালো

লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে এক বড় যোগী ছিলে। একটু বাকি ছিল। এই তোমার শেষ জন্ম। হ্যাঁ, আমি তোমায় যোগ শিক্ষা দেব। আজ রাত্রিতে বিশ্রাম কর, কাল প্রাতে আবার এসো"। আমি শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া পরমহংসদেবের শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করিয়া তাঁহার ঘর হইতে বারান্দায় আসিলাম।

ইতোমধ্যে শশিভূষণ পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বারান্দায় আসিয়া রামলালদাদা ও আমার সঙ্গে বারান্দার মাদুরে শয়ন করিলেন। আমার চক্ষে নিদ্রাদেবী কিছুতেই আবির্ভূতা হইলেন না। সমস্ত রাত্রি নানাপ্রকার চিন্তায় অভিভূত হইয়া নিস্তব্ধে রাত্রিযাপন করিলাম। ক্রমে প্রাতঃকালে বিহঙ্গমকূলের কূজনে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্তে পরমহংসদেবের বিষয়ে ধ্যান করিতে লাগিলাম এবং কখন তাঁহার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে তাহা ভাবিতে লাগিলাম। মনের মধ্যে তখন এক পবিত্র ভাব ও অব্যক্ত আনন্দের হিল্লোল বহিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে রামলালদাদা আমায় পরমহংসদেবের ঘরে যাইতে বলিলেন। আমি প্রবেশ করিয়া পরমহংসদেবের চরণে প্রণাম করিলাম এবং তাঁহার আদেশে মাদুরে উপবেশন করিলাম। পরমহংসদেব আমার দিকে চাহিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "তুমি কতদূর পড়েছ?"

আমি বলিলাম ঃ "আজ্ঞে, এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়ছি।"

পরমহংসদেব ঃ "তুমি সংস্কৃত জান? কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়েছ?"

আমি ঃ "আমি রঘুবংশ, কুমারসম্ভবাদি কাব্য এবং ভগবদ্গীতা, পাতঞ্জলদর্শন, শিবসংহিতা প্রভৃতি পড়েছি।"

পরমহংসদেব "বেশ, বেশ" বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পরে আমায় ঘরের উত্তরদিকের বারান্দায় লইয়া গেলেন। সেখানে একটি তক্তপোশ পাতা ছিল; তিনি তাহার উপর আমায় সস্নেহে বসিতে আদেশ করিলেন। আমি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলে পরমহংসদেব আমায় জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন। আমি জিহ্বা বাহির করিলে তিনি তাঁহার দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা জিহ্বায় একটি মূলমন্ত্র লিখিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণহস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থলে ঊর্ধ্বদিকে শক্তি আকর্ষণ করিয়া মা কালীর ধ্যান করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। আমি ধ্যান করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম।

* * *

(শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর) একদিন নরেন্দ্রনাথ আসিয়া হুট্‌কো গোপাল ও আমাকে সঙ্গে লইয়া শরতের (সারদানন্দ) বাড়িতে যাইতে চাহিল। আমরা তাহাই করিলাম। শরতের বাড়িতে যাইয়া তাহাকে বরাহনগর-মঠে স্থায়িভাবে যাইয়া থাকিতে বলিলাম। শরৎ আমাদের সহিত যাইতে সম্মত হইল। শশীও (রামকৃষ্ণানন্দ) সেই বাড়িতে থাকিত। তাহার সহিত দেখা করিয়া তাহাকেও আমাদের সহিত যাইয়া বরাহনগর-মঠে অন্তত সেইদিন থাকিতে বলিলাম। শশী সম্মত হইল। সুতরাং শরৎ ও শশীকে লইয়া নরেন্দ্রনাথ, হুট্‌কো গোপাল ও আমি বরাহনগর-মঠে উপস্থিত হইলাম। শরৎ ও শশী সেইদিন মঠে থাকিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথও সেইদিন রাত্রে বরাহনগর-মঠে থাকিয়া গেল। শশী কিন্তু আর বাড়িতে ফিরিতে চাহিল না, সে আমাদের সহিতই মঠে থাকিয়া গেল। শরৎ সেইদিন বাড়িতে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু সামান্য কয়দিন পরেই বাড়ি ছাড়িয়া আমাদের সহিত বরাহনগর-মঠে থাকিয়া গেল। ক্রমে নরেন্দ্রনাথ, যোগীন, নিরঞ্জন, রাখাল প্রভৃতিও একেবারে বাড়ি হইতে চলিয়া আসিয়া আমাদের সহিত বরাহনগর-মঠে বাস করিতে লাগিল। আমাদের আনন্দের তখন আর সীমা রহিল না। আমরা পরে বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের ভবিষ্যৎ সংঘ-জীবনের সংগঠন বরাহনগর-মঠ হইতেই শুরু হইয়াছিল। আমাদের সকলেরই মনে ছিল যে, মহাসমাধির পূর্বে একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "তুই ছেলেদের একত্রে রাখিস্ ও দেখাশোনা করিস্"। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নির্দেশ স্মরণ করাইয়া নরেন্দ্রনাথকেই সকলের প্রধান করিয়া তাহার নির্দেশ-অনুসারে চলিতাম এবং মঠে নিয়মিতভাবে ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, কীর্তনাদি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতাম। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের আশা-ভরসা ও সুখ-সান্ত্বনার স্থল। তখন সকলের জীবন অতিশয় দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্রের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইলেও একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে জীবনে সহায়-সম্বল করিয়া মনের আনন্দেই দিন যাপন করিতাম। অবশ্য খাওয়া-পরার তখন অত্যন্ত কষ্ট ছিল। তারকদাদা, আমি, লাটু, গোপালদাদা প্রভৃতি সকলে ভিক্ষায় বাহির হইয়া সামান্যভাবে যে চাউল প্রভৃতি পাইতাম তাহাই পালা করিয়া রান্না করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম। কোন কোন দিন শাক্-সবৃজি কোনরূপ না পাইয়া তেলাকুচার পাতা আনিয়া সিদ্ধ করিতাম ও তাহা দিয়া ভাত খাইতাম। অবশ্য আহার আমাদের একবেলাই জুটিত। সকলের পরনে কাপড় ছিল না। একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপীন করিয়া আমরা তাহাই পরিতাম এবং আর একখানি মাত্র কাপড় আমরা রাখিয়া দিতাম, কেহ কোথাও

গেলে সেইখানি পরিয়াই বাহির হইত। সেই সব দুঃখ-কষ্টের দিনের কথা আর কি বলিব। তবে এখন সেই সব দিনের কথা মনে হইলে মন আনন্দে ভরিয়া ওঠে।

এইখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, একটি নির্দিষ্ট ঠাকুর-ঘরের কথা তখন আমরা প্রায়ই মনে করিতাম। সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও সেকথা আমাদের বলিতেন। অবশ্য বরাহনগর-মঠ ভাড়া করা হইলে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত বিছানা, পাদুকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কাশীপুরের বাগান হইতে আনিয়া নূতন বরাহনগর-মঠে রাখিয়াছিলাম। ছোট গোপাল ও গোপালদাদাই একটি গাড়ি করিয়া ঐ সকল খাট-বিছানা ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া আসিল এবং সুন্দরভাবে একটি ঘরে সাজাইয়া রাখিল। ঐ ঘরটিকেই অবশ্য আমরা ঠাকুর-ঘর মনে করিতাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানার সম্মুখে বসিয়া ধ্যান ধারণা ও কীর্তনাদি করিতাম। সুরেশচন্দ্র মিত্র, বলরাম বসু ও অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে বরাহনগর-মঠে আসিয়া আমাদের সহিত কিছুক্ষণ থাকিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয়কথা আলোচনা ও কীর্তন করিতেন।

ক্রমে শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) আসিয়া যে ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের খাট, বিছানা, পাদুকা ও অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ছিল সেইখানেই সেইগুলি আরো ভালোভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিল এবং খাটের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো স্থাপন করিয়া নিত্য-নিয়মিতভাবে পূজা, আরাত্রিক ও স্তবপাঠাদি করিতে আরম্ভ করিল। স্তবপাঠ ও কীর্তনের সময় আমরা ও অন্যান্য সকলে যোগদান করিতাম। ক্রমশ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবদ্দশায় আমরা যেইরূপ তাঁহাকে সেবা-শুশ্রূষাদি করিতাম, শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) ঐ নির্দিষ্ট ঠাকুর-ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর সামনে সেইরূপই করিতে লাগিল। আমরা ভিক্ষা ও রন্ধন করিয়া অগ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দিতাম ও পরে আনন্দে সকলে একত্রে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতাম। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের সময় আমরা সকলে 'জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব' এই নাম করিতাম এবং আরাত্রিকের পর 'গুরুগীতা' হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতাম।

(আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৬৪, পৃঃ ২১-২৯, ১৩৬-১৩৮)

পিতা-পুত্র সংবাদ

শ্রীম

শ্রীযুক্ত শশীর বাবা আসিয়াছেন। বাবা মঠ থেকে ছেলেকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সময় প্রায় নয় মাস ধরিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া শশী তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ইনি কলেজে বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এন্ট্রান্সে জলপানি পাইয়াছিলেন। বাপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু সাধক ও নিষ্ঠাবান। ইনি বাপ-মায়ের বড় ছেলে। তাঁহাদের বড় আশা যে, ইনি লেখাপড়া শিখিয়া রোজগার করিয়া তাঁদের দুঃখ দূর করিবেন। কিন্তু ভগবানকে পাইবার জন্য ইনি সব ত্যাগ করিয়াছিলেন। বন্ধুদের কেঁদে কেঁদে বলতেন, "কি করি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হায়, মা বাপের কিছু সেবা করতে পারলাম না। তাঁরা কত আশা করেছিলেন। মা আমার গয়না পরতে পান নাই; আমি কত সাধ করেছিলাম, আমি তাঁকে গয়না পরাব। কিছুই হলো না! বাড়িতে ফিরে যাওয়া যেন ভার বোধ হয়। গুরু মহারাজ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন; আর যাবার জো নাই!"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বধামে গমন করিবার পর শশীর পিতা ভাবিলেন, এবারে বুঝি বাড়ি ফিরিবে। কিন্তু কিছুদিন বাড়ি থাকার পর, মঠ স্থাপিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই মঠে কিছুদিন যাতায়াতের পর, শশী আর মঠ হইতে ফিরিলেন না। তাই পিতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে লইতে আসেন। তিনি কোন মতে যাবেন না। আজ বাবা আসিয়াছেন শুনিয়া আর একদিক দিয়া পলায়ন করিলেন, যাতে তাঁহার সঙ্গে দেখা না হয়।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম কথিত, অখণ্ড রামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ঢাকা সংস্করণ ১৪১১ বাংলা, পৃঃ ১১৫০)

শশিভূষণ—রামকৃষ্ণানন্দ

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল

গুরুভক্তির মূর্ত প্রতীক শশিভূষণের জন্মস্থান হুগলী জেলার ময়ালগ্রাম। ভৈরব তুল্য পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন—শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে দেবীপ্রসাদে শশীকে পাইয়াছি। এ জন্য শশিভূষণ বাল্যাবধি দৈবী গুণসম্পন্ন। জোষ্ঠতাত (শরতের পিতা)-র স্নেহপালিত হইয়া বি-এ পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। প্রাণের টানে যখন তখন দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন; এক আলয়ে অবস্থান করিয়াও কে কখন (শরৎ, শশী) ঠাকুরের নিকট আসিবেন, তাহা পরস্পর জানিতে পারেন নাই।

ঠাকুর বলেন—শশী ঋষি কৃষ্ণের পার্ষদ। এক দিন তাঁর মুখে বাইবেল ব্যাখ্যা শুনিয়া ঠাকুর কহেন—"সখি! যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি।" জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে আসিলে, তাঁহার আরক্তিম মুখ দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে স্বহস্তে ব্যজন করেন এবং আমাদেরও বাতাস করিতে বলেন। ইহাই বোধ হয়—সেবাকল্পে তালবৃন্ত ধারণের সূত্রপাত। স্বস্তিবোধ করিয়া উড়ানীপ্রান্ত হইতে একখণ্ড বরফ বাহির করিয়া বলেন—বরানগর বাজার হতে আপনার নিমিত্ত আনিয়াছি। প্রভু তাহাতে সানন্দে কহেন—এই গরমে মানুষ গলে যায়, কিন্তু শশীর ভক্তি-হিমে বরফ গলে নাই।

বি.এ. পরীক্ষার ফির টাকা জমা দিবার পর যেমন শুনিলেন—ঠাকুর অসুস্থ, অমনই পরীক্ষা বিসর্জন দিয়া প্রভুর সেবায় আত্মনিবেদন করেন। কাশীপুর উদ্যানে যদিও অনেকগুলি মহামনা যুবক পর্যায়ক্রমে পরিচর্যা করিতেন, শশিভূষণের সে ভাব ছিল না; ছায়ার মতো পার্শ্বে থাকিয়া অবিরাম ব্যজন করিতেন, এ জন্য অতি অল্পসময়ের মধ্যে স্নানাহার সারিয়ে লইতেন। সঙ্গীদের অবসর মতো সাধনে রত দেখিলে বলিতেন—"প্রত্যক্ষ দেবতা ছাড়িয়া অদৃশ্য দেবতা ধ্যানে কি ফল?"

ছায়া-শরীর পরিহারে বিশ্ব চৈতন্যে মিলাইলেও তদ্গতপ্রাণ শশিভূষণ প্রভুর লীলা দেহকে জীবন্ত জাগ্রতবোধে তখনও ব্যজন করিতে থাকেন; এমনকি, বহ্নিহোমকালেও নিষ্ঠাভক্তিপ্রভাবে ইষ্ট দেবতাকে বহ্নি-মধ্যে বিদ্যমান দেখিয়া

শীতলতা সম্পাদনে ব্যজননিরত। তবে শশী কি বাতুল? না, না! পাণ্ডুরোগে যাবতীয় পদার্থ যেমন পীতবর্ণ দেখায়, তেমনই একনিষ্ঠ শশিভূষণ প্রভুকে সদা-সর্বত্র বিদ্যমান দেখিতেন। অথবা তাঁহার অক্ষি-মণিতে অনিমিষে বিরাজ করায় শশী সকল ক্ষেত্রেই প্রভুর সন্দর্শন করিতেন।

ঠাকুর বলিতেন, কোথায় কিছু নাই রে প্যালা—শাঁক বাজিয়ে করলি গোল। দেখা যায়, শশী তাহাই করিলেন—জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব বলে ঘণ্টা নেড়ে শশী ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিলেন। বলরামমন্দির হতে প্রভুর চিন্ময় অস্থিপাত্র আনীত হইল, সেই সঙ্গে কোশাকুশি আদি পূজার দ্রব্য সবই জুটিয়া গেল। বস্তুত শশী যদি মিলন মন্দিরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করিতেন, তা হলে কাহাকে কেন্দ্র করিয়া ত্যাগী ও গৃহী ভক্তেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইত এবং উত্তরকালে বেলুড়ে ও নানা স্থানে কি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইত? সুতরাং শশিভূষণকে মঠ-প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আকাশবৃত্তির উপর যাহাদের নির্ভর, তাদের পূজোপকরণের যত ঘটা সহজেই অনুমিত হয়; সুতরাং গাছের ফুল ও গঙ্গার জল দিয়াই পূজা হইত। বিশেষত্ব এই যে, প্রভু যে ফুলগুলি ভালোবাসিতেন, কষ্টসাধ্য হইলেও শশীর তাহাতে ত্রুটি ছিল না; এ জন্য দূর সাতপুকুরের বাগান হতে নাগকেশর চাঁপা আনয়ন, আবার গোলাপ ও গুলচি ফুল চয়নকালে কুকুরে কামড়ালেও ভ্রূক্ষেপ নাই। নৈবেদ্যের মধ্যে আদা, ছোলা ও বাতাসা, তবে ভক্তগণ মিষ্টান্নাদি আনিলে সে দিন ঠাকুরের মুখ বদলান হইত। কি করে উপযুক্ত সময়ে প্রভুকে জলযোগ করাব এবং তাঁর সন্তানদেরও প্রসাদ দিব, এ জন্য সকল দিকেই ত্বরান্বিত। সাধ বটে—বিভিন্ন বর্ণের এক একটি ফুল দিয়া ঠাকুরকে সাজান, কিন্তু জলপানীয় দানে পাছে বিলম্ব হয়, তাই দৈবযোগে এক দিন বিজড়িত ইয়ারিং জবাফুলকে পৃথক্‌করণে কালহরণ ভাবিয়া এই ন্যাও ঘোড়ার ডিম বলিয়া এমন ব্যাকুলভাবে ফুল দেন, যাহাতে মনে হইল—প্রাণের আবেগে শশী আজ যেন প্রভুর পরাপূজা করিল এবং ভাবগ্রাহী জনার্দন যেন সানন্দে পূজা লইলেন; দৃশ্যটি জীবনে ভুলিব না। আবার সন্ধ্যারতিকালে "জয় গুরু, জয় গুরু" বলে এমন উদ্দাম নৃত্য করিতেন, ভয় হইত, পাছে বা ঘরের মেঝে ভেঙে পড়ে।

সেবাকার্যে ব্যস্ত কর্মবীরের ধ্যানধারণার অবসর হইত না; কিন্তু দৈবযোগে ধ্যানে বসিলে আর নিস্তার নাই—একেবারেই সমাধি! অগ্নিপার্শ্বে উপবেশনে দেহ যেমন তাপমান হয়, শশিভূষণের সঙ্গে ধ্যানকালে তাঁহার অধ্যাত্মপ্রভাবে চঞ্চলমতি আমাদেরও চিত্ত স্থির হইত। শাস্ত্রচর্চায় তাদৃশী অনুরাগ ছিল না,

বলিতেন শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা প্রভুরই কৃপায় স্ফুরণ হইবে। তীর্থযাত্রায় স্পৃহা ছিল না। কহিতেন—"প্রত্যক্ষ দেবতা ছাড়িয়া কেন দুঃখভ্রমণ করিব?" এ জন্য কখনও তীর্থদর্শনে যান নাই। কঠোর যোগীর অন্তরে কোন দিনও বাসনা জাগে নাই যে, কেহ তাঁহার সেবা করে, বলিতেন, "প্রভুর সেবা কর, কৃতার্থ হবে।" বিষম কম্পজ্বরে অভিভূত হইলে—প্রলাপের মতো বলিতেন হতভাগারা এখনও প্রভুর পূজারতি করিল না ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে যদি কেহ ভাগ্যবলে রামকৃষ্ণময় হইয়া থাকে, সে একমাত্র শশিভূষণ। এজন্যই তাঁহার 'রামকৃষ্ণানন্দ' নাম ধারণ সার্থক হইয়াছে।

প্রভুর প্রতিনিধি জ্ঞানে স্বামীজীর উপর প্রগাঢ় ভক্তি, তাই তাঁহার অনুরোধে মাদ্রাজ যাইতে হয়, উদ্দেশ্য দক্ষিণাপথে প্রভুর ভাব প্রচার। অপরিচিত দেশে কোন সংস্থান না থাকিলেও, তাঁহার নিষ্ঠাপ্রভাবে অল্পকালমধ্যে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্মাণদোষে মন্দিরটি ভূমিসাৎ হইলে, অনুযোগ করায় কহেন, প্রভুর মহিমা প্রচারে এ দেশে আসিয়াছি, মন্দির বা মান-যশের জন্য তো আসি নাই। বাহিরে মন্দির তুলিলে কি ফল—যদি লোক-হৃদয়ে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা না হয়। ভূতমার্গী হইলেও মদ্রবাসীরা তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই মঠ প্রাঙ্গণে প্রভুর প্রসাদ গ্রহণে দ্বিধা করেন নাই।

প্রস্ফুটিত পুষ্প-সৌরভ যেমন চারিদিকে বিস্তার পায়, শশিভূষণের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি-সৌরভ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। তীর্থোপলক্ষে আমরা দাক্ষিণাত্যভ্রমণে দেখিয়াছি, মাদ্রাজ শহরে তো কথাই নাই, ভিজাগপটাম হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর এবং মালাবারের কুইলন শহর পর্যন্ত শিক্ষিতমাত্রেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

এইরূপে গুরুগতপ্রাণ শশিভূষণ বহু লোকের ইতর বাসনা ক্ষয়কল্পে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া ক্ষয়রোগে মহাসমাধিতে শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে বিশ্রাম লভিয়াছেন।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, প্রকাশক ঃ সুধীর সান্ন্যাল, ২০ বোস পাড়া লেন, কলকাতা-৩, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩২২-৩২৬)

শীতলতা সম্পাদনে ব্যজননিরত। তবে শশী কি বাতুল? না, না! পাণ্ডুরোগে যাবতীয় পদার্থ যেমন পীতবর্ণ দেখায়, তেমনই একনিষ্ঠ শশিভূষণ প্রভুকে সদা-সর্বত্র বিদ্যমান দেখিতেন। অথবা তাঁহার অক্ষি-মণিতে অনিমিষে বিরাজ করায় শশী সকল ক্ষেত্রেই প্রভুর সন্দর্শন করিতেন।

ঠাকুর বলিতেন, কোথায় কিছু নাই রে প্যালা—শাঁক বাজিয়ে করলি গোল। দেখা যায়, শশী তাহাই করিলেন—জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব বলে ঘণ্টা নেড়ে শশী ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিলেন। বলরামমন্দির হতে প্রভুর চিন্ময় অস্থিপাত্র আনীত হইল, সেই সঙ্গে কোশাকুশি আদি পূজার দ্রব্য সবই জুটিয়া গেল। বস্তুত শশী যদি মিলন মন্দিরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করিতেন, তা হলে কাহাকে কেন্দ্র করিয়া ত্যাগী ও গৃহী ভক্তেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইত এবং উত্তরকালে বেলুড়ে ও নানা স্থানে কি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইত? সুতরাং শশিভূষণকে মঠ-প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আকাশবৃত্তির উপর যাহাদের নির্ভর, তাদের পূজোপকরণের যত ঘটা সহজেই অনুমিত হয়; সুতরাং গাছের ফুল ও গঙ্গার জল দিয়াই পূজা হইত। বিশেষত্ব এই যে, প্রভু যে ফুলগুলি ভালোবাসিতেন, কষ্টসাধ্য হইলেও শশীর তাহাতে ত্রুটি ছিল না; এ জন্য দূর সাতপুকুরের বাগান হতে নাগকেশর চাঁপা আনয়ন, আবার গোলাপ ও গুলচি ফুল চয়নকালে কুকুরে কামড়ালেও ভ্রূক্ষেপ নাই। নৈবেদ্যের মধ্যে আদা, ছোলা ও বাতাসা, তবে ভক্তগণ মিষ্টান্নাদি আনিলে সে দিন ঠাকুরের মুখ বদলান হইত। কি করে উপযুক্ত সময়ে প্রভুকে জলযোগ করাব এবং তাঁর সন্তানদেরও প্রসাদ দিব, এ জন্য সকল দিকেই ত্বরান্বিত। সাধ বটে—বিভিন্ন বর্ণের এক একটি ফুল দিয়া ঠাকুরকে সাজান, কিন্তু জলপানীয় দানে পাছে বিলম্ব হয়, তাই দৈবযোগে এক দিন বিজড়িত ইয়ারিং জবাফুলকে পৃথক্করণে কালহরণ ভাবিয়া এই ন্যাও ঘোড়ার ডিম বলিয়া এমন ব্যাকুলভাবে ফুল দেন, যাহাতে মনে হইল—প্রাণের আবেগে শশী আজ যেন প্রভুর পরাপূজা করিল এবং ভাবগ্রাহী জনার্দন যেন সানন্দে পূজা লইলেন; দৃশ্যটি জীবনে ভুলিব না। আবার সন্ধ্যারতিকালে "জয় গুরু, জয় গুরু" বলে এমন উদ্দাম নৃত্য করিতেন, ভয় হইত, পাছে বা ঘরের মেঝে ভেঙে পড়ে।

সেবাকার্যে ব্যস্ত কর্মবীরের ধ্যানধারণার অবসর হইত না; কিন্তু দৈবযোগে ধ্যানে বসিলে আর নিস্তার নাই—একেবারেই সমাধি! অগ্নিপার্শ্বে উপবেশনে দেহ যেমন তাপমান হয়, শশিভূষণের সঙ্গে ধ্যানকালে তাঁহার অধ্যাত্মপ্রভাবে চঞ্চলমতি আমাদেরও চিত্ত স্থির হইত। শাস্ত্রচর্চায় তাদৃশী অনুরাগ ছিল না,

বলিতেন—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা প্রভুরই কৃপায় স্ফুরণ হইবে। তীর্থযাত্রায় স্পৃহা ছিল না। কহিতেন—"প্রত্যক্ষ দেবতা ছাড়িয়া কেন দুঃখভ্রমণ করিব?" এ জন্য কখনও তীর্থদর্শনে যান নাই। কঠোর যোগীর অন্তরে কোন দিনও বাসনা জাগে নাই যে, কেহ তাঁহার সেবা করে, বলিতেন, "প্রভুর সেবা কর, কৃতার্থ হবে।" বিষম কম্পজ্বরে অভিভূত হইলে—প্রলাপের মতো বলিতেন—হতভাগারা এখনও প্রভুর পূজারতি করিল না ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে যদি কেহ ভাগ্যবলে রামকৃষ্ণময় হইয়া থাকে, সে একমাত্র শশিভূষণ। একারণে তাঁহার 'রামকৃষ্ণানন্দ' নাম ধারণ সার্থক হইয়াছে।

প্রভুর প্রতিনিধি জ্ঞানে স্বামীজীর উপর প্রগাঢ় ভক্তি, তাই তাঁহার অনুরোধে মাদ্রাজ যাইতে হয়, উদ্দেশ্য দক্ষিণাপথে প্রভুর ভাব প্রচার। অপরিচিত দেশে কোন সংস্থান না থাকিলেও, তাঁহার নিষ্ঠাপ্রভাবে অল্পকালমধ্যে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্মাণদোষে মন্দিরটি ভূমিসাৎ হইলে, অনুযোগ করায় কহেন, প্রভুর মহিমা প্রচারে এ দেশে আসিয়াছি, মন্দির বা মান-যশের জন্য তো আসি নাই। বাহিরে মন্দির তুলিলে কি ফল—যদি লোক-হৃদয়ে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা না হয়। ছুতমার্গী হইলেও মদ্রবাসীরা তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই মঠ প্রাঙ্গণে প্রভুর প্রসাদ গ্রহণে দ্বিধা করেন নাই।

প্রস্ফুটিত পুষ্প-সৌরভ যেমন চারিদিকে বিস্তার পায়, শশিভূষণের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি-সৌরভ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। তীর্থোপলক্ষে মাসত্রয় দাক্ষিণাত্যভ্রমণে দেখিয়াছি, মাদ্রাজ শহরে তো কথাই নাই, ভিজাগপটাম হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর এবং মালাবারের কুইলন শহর পর্যন্ত শিক্ষিতমাত্রেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

এইরূপে গুরুগতপ্রাণ শশিভূষণ বহু লোকের ইতর বাসনা ক্ষয়কল্পে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া ক্ষয়রোগে মহাসমাধিতে শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে বিশ্রাম লভিয়াছেন।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, প্রকাশক ঃ সুধীর সান্যাল, ২০ বোস পাড়া লেন, কলকাতা-৩, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩২২-৩২৬)

দ্বিতীয় পর্ব

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনকথা

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

১৭৮৫ শকের সরস বরষা। মাঠে শ্যামল শস্য ক্ষেত্র, উপবনে মালতী ফুলের মধুগন্ধ, আকাশে বর্ষণপর জলদজালের গুরু গম্ভীর গর্জন, এই বিচিত্র সৌন্দর্যময়ী বরষার এক শুভদিনে বঙ্গ-সংসার আলো করিয়া শশী মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। শশী মহারাজের পিতার নাম শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য, তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেণির তান্ত্রিক সাধক ছিলেন।

বাল্যকালে শশী মহারাজ এলবার্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। ঐ স্কুলের ছাত্রগণের একটি সমিতি ছিল; পূজনীয় শশী মহারাজও ঐ সমিতির অন্যতম সভ্য ছিলেন। একবার সমিতির বার্ষিক উৎসবের সময় স্থির হইল যে, উহার সভ্যগণ দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির বাগানে গিয়া আনন্দোৎসব করিবে। একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া বালকগণ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইল। তখন মধ্যাহ্ন কাল। বিস্তৃত উদ্যানে ছুটাছুটি, বৃক্ষারোহণ প্রভৃতি বালসুলভ ক্রীড়াদি করিয়া অপরাহ্ণে তাহারা পরমহংসদেবের শ্রীচরণ সমীপে উপনীত হইলে তিনি তাহাদিগকে সস্নেহে আহ্বান করিলেন। শশী মহারাজের খুল্লতাত পুত্র পূজনীয় শরৎ মহারাজও ঐ সময়ে তাহাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনিও এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন। যাহাদিগকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় মহাপুরুষ ব্যাকুল কণ্ঠে বাতাস বেদনাময় করিয়া তুলিতেন, তাহাদের অন্যতম এই বালক দুইটিকে পাইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্তায়, আদর আপ্যায়নে, প্রেমে ভালোবাসায় তাঁহারাও তৎপ্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। তখন হইতে পূজনীয় শশী মহারাজ ও শরৎ মহারাজ প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম, তারক, নিরঞ্জন, যোগেন, শারদা, সুবোধ, হরি, গঙ্গাধর, হরিপ্রসন্ন প্রভৃতি অন্যান্য বালক ভক্তগণও উহার দুই তিন বৎসর পূর্বে ও পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে আসিয়া মিলিত হন। এই সমস্ত বালক ভক্তকে লইয়া শ্রীভগবান দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধাসনে বসিয়া যুগচক্র নির্মাণে তখন হইতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহার অমানব ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি ঈশ্বরীয় ভাবসমূহ তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারণ পূর্বক ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের ঘাতসহ করিয়া তাঁহাদিগকে বজ্র-উপাদানে তিনি

গঠন করিতেছিলেন। যাঁহার যেমন ভাব—তাঁহাকে সেইরূপ শিক্ষাদান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সর্বভাবসমন্বয়ের অঙ্গরূপে এক একটি জীবনকে নিখুঁতভাবে গড়িতে লাগিলেন। অন্যান্য ভাবের সহিত কাহাকেও জ্ঞান, কাহাকেও বৈরাগ্য, কাহাকেও প্রেম, কাহাকেও স্থৈর্য, কাহাকেও মাধুর্য এইরূপ দৈবী সম্পত্তি তিনি সকল সন্তানের মধ্যে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে বিতরণ করিতেছিলেন। আমাদের মনে হয়, পূজনীয় শশী মহারাজ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন শ্রীগুরুর অতুলনীয় পরাভক্তি। কারণ এই সময় হইতে তাঁহার জীবনে ঐ ভাবের যে অঙ্কুর উদ্গত হইতে দেখা গিয়াছিল, উত্তর জীবনে তাহা ফুলফলে বিকশিত হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন গলরোগে পীড়িত তখন শশী মহারাজ সংসার ত্যাগ করিয়া প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। এই সেবার ভাব জীবনে কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। শ্রীভগবান স্থূল শরীর ত্যাগ করিলে তাঁহার অস্থিসম্পুট কৌটা বরাহনগরের নব প্রতিষ্ঠিত মঠে স্থাপনা করিয়া পূর্বের মতোই নিষ্ঠার সহিত তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন। শুধু শ্রীভগবানের সেবা নয়, তাঁহার সন্তানগণের সেবাও ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান সাধনা। স্বামীজী বলিতেন, "শশী ছিল মঠের প্রধান স্তম্ভ, সে না থাকলে মঠ চলা অসম্ভব হতো। ভিক্ষে শিক্ষে করে ঠাকুরের ভোগরাগ ও সকলের খাওয়া দাওয়া জোগাড় করা থেকে রাঁধাবাড়া সকলকে খাওয়ানো পর্যন্ত সব কাজ তাকে দেখতে হতো। আমরা ভোর তিনটার সময় উঠতুম, তারপর কেউ স্নান করতে, কেউ বা অমনিই ঠাকুরঘরে গিয়ে জপ ধ্যানে বসে যেতো। এমন অনেক দিন গিয়েছে যে ভোর চারটে পাঁচটার সময় থেকে সন্ধ্যে চার পাঁচটা পর্যন্ত জপধ্যান চলছে। শশী খাবার নিয়ে বসে থাকতো, তখন আমাদের জপধ্যানে এত মন গিয়েছে যে বিশ্ব থাক্ বা না থাক্ কিছুই গ্রাহ্য নেই।" বাস্তবিক, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ তখন ঈশ্বর লাভের জন্য উন্মাদ-প্রায় হইয়াছিলেন। "কেহ কেহ কয়েক প্রহর নিস্পন্দভাবে বসিয়া ভগবৎধ্যান করিতেছেন, কেহ বা অধ্যাত্ম সংগীত গাহিতে গাহিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া অন্তরে চিদানন্দ সুখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইত যেন তাঁহারা সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন ও জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডের ন্যায় দেহটাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। সে সময়ে তাঁহাদের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। মৃত্যুই যদি হয় তাহাতে ক্ষতি কি? কেহ কেহ শ্মশানে রাত্রি যাপন করিতে ও চিতানলের শত শত লেলিহান জিহ্বাস্পর্শে কেমন করিয়া এ নশ্বর মানবদেহের শেষ চিহ্ন চিরদিনের

আত্মা শরাবক্ষ হইতে লুপ্ত হয় তাহা দেখিতে দেখিতে মৃত্যু চিন্তা হইতে ক্রমে মৃত্যুঞ্জয়ের চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাইতেন। আবার কেহ বা সত্যলাভের দৃঢ় সংকল্প লইয়া প্রতি রজনী একটি প্রকাণ্ড ধুনি জ্বালাইয়া তাহার নিকট বসিয়া থাকিতেন।" শশী মহারাজের কোমল প্রাণ তাঁহাদের এই কঠোরতায় বড়ই ব্যথিত হইত। ব্যথিত হইত ইহার জন্য যে, এইরূপ ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে তাঁহার গুরুভাইগণের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাই তিনি তাঁহাদের কাহাকেও ধরিয়া স্নান করাইতেন, কাহাকেও বা জোর করিয়া খাওয়াইতেন, আশ্রমের কাজ নিজেই বেশির ভাগ করিয়া তাঁহাদিগকে সাধন ভজন করিবার অবসর দিতেন।

পূজনীয় শশী মহারাজ যে ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিতেন তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্থূল শরীরে অবস্থান কালে যেরূপ একনিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহার শরীরত্যাগের পরও ঠিক সেইরূপ অস্তিত্ববোধে তিনি তাঁহার সেবা করিতেন। দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে এই বিষয়টি পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। স্বামী সচ্চিদানন্দ (বুড়োবাবা) কোন সময়ে আমাদের বলিয়াছিলেন, "একদিন শশী মহারাজ ঠাকুরের দাঁতন কাঠি থেঁতো করে দিতে আমায় বলেন। থেঁতো করে দিলে তিনি দেখে বল্‌লেন, 'খুব নরম হওয়া চাই, তা না হলে ঠাকুরের মাড়িতে লাগবে'।"... শশী মহারাজ একবার আমায় ঠাকুরের পান সাজবার ভার দিয়েছিলেন। একদিন পানে চুন বেশি হওয়ায় তিনি আর আমাকে পান সাজতে দিতেন না। দু-তিন মাস অন্য সকলের পান সেজে অভ্যস্ত হলে পর তবে আবার আমায় ঠাকুরের পান সাজতে দেন।... একবার খুব মজা হয়েছিল, সকালে ঠাকুরের বাল্যভোগের জন্য হালুয়া তৈরি করতে গিয়ে শশী মহারাজ দেখেন, কড়া অপরিষ্কার, রাত্তিরে লাটু মহারাজ ছোলা সিদ্ধ করে খেয়েছিলেন তা আর পরিষ্কার করা হয় নি। কড়া মেজে হালুয়া তৈরি করে ঠাকুরকে বাল্যভোগ দিতে দেরি হয়ে যাবে, এইজন্য তিনি সেদিন লাটু মহারাজকে যা তা বলে গালাগালি করতে লাগলেন। কারণ, ঠাকুরের সেবার কোনরূপ সামান্য ত্রুটি হলেই তিনি একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়তেন। গালাগালি খেয়ে লাটু মহারাজ বললেন, "হামি মাকে পত্র দিব; তোমার বাবা মা আউর হামার বাবা মা কি আলাদা আছে?"

মাদ্রাজে থাকিবার সময় শশী মহারাজ কখনও কখনও ঠাকুরের জন্য স্টোভে

খাবার তৈরি করিতেন। ঠাকুরের সম্মুখে থালা রাখিয়া স্টোভে একখানি করিয়া লুচি ভাজিতেন এবং গরম গরম সেই লুচিখানি আনিয়া ঠাকুরের পাতে দিতেন। গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ন দিবার পর খুব গরম বোধ হইলে শশী মহারাজ পুনরায় ঠাকুরঘর খুলিয়া সারা রাত্রি শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতেন। ঠাকুরকে এইরূপ জাগ্রত ও জীবন্ত দেখিয়া তিনি আজীবন মন প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার সেবা করিয়া গিয়াছেন।

বরাহনগর মঠে আসিবার পূর্বে যুবক সন্ন্যাসিগণ অভাব কি বস্তু তাহা জানিতেন না। মঠে যোগদান করিয়াই তাঁহারা ভীষণ অভাবের মধ্যে পড়িলেন। সাধারণত দৃষ্ট হয়, অভাবে উদার মানবমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সহোদর সহোদরা, পিতাপুত্র, স্বামী স্ত্রী প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও অভাবের তাড়নায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু দীর্ঘকাল অভাবের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিবারের সপ্রেম সম্বন্ধ ঈষন্মাত্রও সঙ্কুচিত হয় নাই, বরং রবির খরতাপে কমলদল যেরূপ বিকশিত হয়, এই দুঃখের সংস্পর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ-তনয়গণেরও প্রেমসরোজ তদ্রূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, মঠে তখন সামান্য কিছু ভালো জিনিস আসিলে, তাহা খাওয়াইবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে মারামারি উপস্থিত হইত। কেহ খাইবে না অথচ সকলেই বলে 'তুমি খাও'। শেষে সকলে মিলিয়া কোন একজনকে ধরিয়া জোর করিয়া তাঁহার মুখে খাবার গুঁজিয়া দিতেন। বিস্তারই প্রেমের স্বভাব—তাই দেখিতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের এই ভ্রাতৃপ্রেম সংঘের আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, সকল দেশের সকল জাতির নিতান্ত হীনজনকেও একান্ত আপনার বোধে আজ স্পর্শ করিতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, অদ্ভুত ছিল—শশী মহারাজের নিষ্ঠা। প্রবল বৈরাগ্যবশত বরাহনগর মঠে তখন কেহ বড় একটা স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া একে একে সকলেই পাহাড় পর্বত ও তীর্থাদিতে সাধন ভজন করিতে যাইতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—শশী মহারাজ প্রায় সুদীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে একটিবারের জন্যও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন নাই। আবার অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সেবা-পূজাকে তিনি প্রাণের সহিত ভালোবাসিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থিসম্পুট যে 'আত্মারামের কৌটা'কে একদিনের জন্যও ছাড়িয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের অনুরোধে অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিয়া ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি মাদ্রাজ গমন করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের

স্বামী মহারাজকে মাদ্রাজ পাঠাইবার উদ্দেশ্য—দাক্ষিণাত্যবাসীরা অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির, ধর্মজীবনে যে যতই উন্নত হোক না কেন, আচার নিষ্ঠার সামান্য ব্যতিক্রম হইলেই তাহার উপর উহাদের সমস্ত ভক্তি একেবারে 'চটিয়া' যায়। তাই স্বামীজী মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের সময় জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন—

"I shall send you one who is more orthodox than your most orthodox men of the South and who is at the same time unique and unsurpassed in his worship and meditation of God."

"আমি তোমাদের এখানে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাইব যিনি এ দেশের সব চাইতে গোঁড়া হইতেও অধিকতর গোঁড়া। শুধু গোঁড়াই নহেন আবার ধ্যান জপ বা পূজা অর্চনায় যাঁহার সমকক্ষ লোক দৃষ্ট হয় না।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে আসিলেন কিন্তু এখানে প্রচারকার্য তাঁহার বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। স্বামী বিবেকানন্দ অগ্নিময় বক্তৃতা-শক্তিতে মাদ্রাজে উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া গেলেন, কিন্তু হুজুগ আর কয়দিন স্থায়ী হয়! ধীরে ধীরে উহা স্তিমিত হইতে লাগিল। তাহার উপর ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিগণ এখানে বহুদিন হইতে প্রবলভাবে খ্রিস্ট মহিমা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের অসত্যতা, মূর্তিপূজার অকিঞ্চিৎকরতা প্রভৃতি সনাতন ধর্মের উপর অশ্রদ্ধার ভাব চতুর্দিকে ছড়াইতে ছিল। শুধু পাদ্রিগণকে দোষী করিলে সত্যের অপলাপ হয়। হিন্দু-পারিয়াগণের উপর মাদ্রাজবাসী উচ্চবর্ণের অনুদার এবং নিষ্ঠুরাচরণও তাঁহাদের স্বদেশের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। উচ্চবর্ণেরা ইংরেজি শিক্ষা ও পাদ্রিপ্রচারিত ধর্মের বিশ্বাসী হইয়া হিন্দুধর্মের উপর শ্রদ্ধাহীন, পারিয়াগণও উচ্চবর্ণের বহু শতাব্দব্যাপী কঠোর অত্যাচারে তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ বীতরাগ—এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হিন্দুধর্মের সত্যতা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বমতসমন্বয় ভাব এবং শ্রীবিবেকানন্দের সার্বভৌম বেদান্ত, নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা ও অস্পৃশ্যতা-বর্জন প্রভৃতি মহদুদার মতবাদ প্রচার করা কতদূর কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। এই মহাকার্য সাধনের জন্য তাঁহাকে কিরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিতে হইত তাহা জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী মাদ্রাজবাসীর লেখনী হইতে উদ্ধৃত হইল—

"His classes were scattered in the different parts of the city and to many of these he used to go on foot for a long time. On certain days of the week he had to lecture more than twice or thrice and would return to the Math quite tired, unfit to cook his food even. I have known days when a loaf of bread pur-

খাবার তৈরি করিতেন। ঠাকুরের সম্মুখে থালা রাখিয়া স্টোভে একখানি করিয়া লুচি ভাজিতেন এবং গরম গরম সেই লুচিখানি আনিয়া ঠাকুরের পাতে দিতেন। গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ন দিবার পর খুব গরম বোধ হইলে শশী মহারাজ পুনরায় ঠাকুরঘর খুলিয়া সারা রাত্রি শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতেন। ঠাকুরকে এইরূপ জাগ্রত ও জীবন্ত দেখিয়া তিনি আজীবন মন প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার সেবা করিয়া গিয়াছেন।

বরাহনগর মঠে আসিবার পূর্বে যুবক সন্ন্যাসিগণ অভাব কি বস্তু তাহা জানিতেন না। মঠে যোগদান করিয়াই তাঁহারা ভীষণ অভাবের মধ্যে পড়িলেন। সাধারণত দৃষ্ট হয়, অভাবে উদার মানবমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সহোদর সহোদরা, পিতাপুত্র, স্বামী স্ত্রী প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও অভাবের তাড়নায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু দীর্ঘকাল অভাবের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিবারের সপ্রেম সম্বন্ধ ঈষন্মাত্রও সঙ্কুচিত হয় নাই, বরং রবির খরতাপে কমলদল যেরূপ বিকশিত হয়, এই দুঃখের সংস্পর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ-তনয়গণেরও প্রেমসরোজ তদ্রূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, মঠে তখন সামান্য কিছু ভালো জিনিস আসিলে, তাহা খাওয়াইবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে মারামারি উপস্থিত হইত। কেহ খাইবে না অথচ সকলেই বলে 'তুমি খাও'। শেষে সকলে মিলিয়া কোন একজনকে ধরিয়া জোর করিয়া তাঁহার মুখে খাবার গুঁজিয়া দিতেন। বিস্তারই প্রেমের স্বভাব—তাই দেখিতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের এই ভ্রাতৃপ্রেম সংঘের আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, সকল দেশের সকল জাতির নিতান্ত হীনজনকেও একান্ত আপনার বোধে আজ স্পর্শ করিতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, অদ্ভুত ছিল—শশী মহারাজের নিষ্ঠা। প্রবল বৈরাগ্যবশত বরাহনগর মঠে তখন কেহ বড় একটা স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া একে একে সকলেই পাহাড় পর্বত ও তীর্থাদিতে সাধন ভজন করিতে যাইতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—শশী মহারাজ প্রায় সুদীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে একটিবারের জন্যও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন নাই। আবার অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সেবা-পূজাকে তিনি প্রাণের সহিত ভালোবাসিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থিসম্পুট যে 'আত্মারামের কৌটা'কে একদিনের জন্যও ছাড়িয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের অনুরোধে অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিয়া ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি মাদ্রাজ গমন করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের

শশী মহারাজকে মাদ্রাজ পাঠাইবার উদ্দেশ্য—দাক্ষিণাত্যবাসীরা অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির, ধর্মজীবনে যে যতই উন্নত হোক না কেন, আচার নিষ্ঠার সামান্য ব্যতিক্রম হইলেই তাহার উপর উহাদের সমস্ত ভক্তি একেবারে 'চটিয়া' যায়। তাই স্বামীজী মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের সময় জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন—

"I shall send you one who is more orthodox than your most orthodox men of the South and who is at the same time unique and unsurpassed in his worship and meditation of God."

"আমি তোমাদের এখানে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাইব যিনি এ দেশের সব চাইতে গোঁড়া হইতেও অধিকতর গোঁড়া। শুধু গোঁড়াই নহেন আবার ধ্যান জপ ও পূজা অর্চনায় যাঁহার সমকক্ষ লোক দৃষ্ট হয় না।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে আসিলেন কিন্তু এখানে প্রচারকার্য তাঁহার বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। স্বামী বিবেকানন্দ অগ্নিময় বক্তৃতা-শক্তিতে মাদ্রাজে উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া গেলেন, কিন্তু হুজুগ আর কয়দিন স্থায়ী হয়! ধীরে ধীরে উহা স্তিমিত হইতে লাগিল। তাহার উপর ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিগণ এখানে বহুদিন হইতে প্রবলভাবে খ্রিস্ট মহিমা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের অসত্যতা, মূর্তিপূজার অকিঞ্চিৎকরতা প্রভৃতি সনাতন ধর্মের উপর অশ্রদ্ধার ভাব চতুর্দিকে ছড়াইতে ছিল। শুধু পাদ্রিগণকে দোষী করিলে সত্যের অপলাপ হয়। হিন্দু-পারিয়াগণের উপর মাদ্রাজবাসী উচ্চবর্ণের অনুদার এবং নিষ্ঠুরাচরণও তাঁহাদের স্বদেশের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। উচ্চবর্ণেরা ইংরেজি শিক্ষা ও পাদ্রিপ্রচারিত ধর্মের বিশ্বাসী হইয়া হিন্দুধর্মের উপর শ্রদ্ধাহীন, পারিয়াগণও উচ্চবর্ণের বহু শতাব্দব্যাপী কঠোর অত্যাচারে তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ বীতরাগ—এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হিন্দুধর্মের সত্যতা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বমতসমঞ্জসা ভাব এবং শ্রীবিবেকানন্দের সার্বভৌম বেদান্ত, নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা ও অস্পৃশ্যতা-বর্জন প্রভৃতি মহদুদার মতবাদ প্রচার করা কতদূর কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। এই মহাকার্য সাধনের জন্য তাঁহাকে কিরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিতে হইত তাহা জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী মাদ্রাজবাসীর লেখনী হইতে উদ্ধৃত হইল—

"His classes were scattered in the different parts of the city and to many of these he used to go on foot for a long time. On certain days of the week he had to lecture more than twice or thrice and would return to the Math quite tired, unfit to cook his food even. I have known days when a loaf of bread pur-

chased from bakeries was his simple meal for the night, that was because there was little energy left in him for cooking or there were no food-stuffs in the Math."

—"শহরের বিভিন্ন স্থানে তিনি ক্লাস করিতেন, অনেকগুলি ক্লাসে তাঁহাকে বহুদিন হাঁটিয়া যাইতে হইত। কোন কোন সময় তিনি প্রত্যহ দুই তিনটি বক্তৃতা দিতেন, বক্তৃতা করিয়া এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া মঠে ফিরিতেন যে, তখন আর রান্না করিবার সামর্থ থাকিত না। আমি জানি, এমন দিনও গিয়াছে যে এক টুকরা পাঁউরুটি খাইয়া তিনি রাত্রির আহার শেষ করিতেন। পরিশ্রান্ত হইয়াই যে তিনি রান্না করিতেন না এমন নহে, অনেক সময় মঠে খাইবার মতো কিছু থাকিতও না।"

পূজনীয় শশী মহারাজ যখন মাদ্রাজে ছিলেন তখন মঠের জনৈক সন্ন্যাসীর তাঁহার নিকট থাকিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। একদিন তিনি দেখেন, শশী মহারাজ খুব পরিশ্রম করিয়া আসিয়া পরিধেয় বস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া মাদুরে শুইয়া পড়িলেন। দুই এক মিনিট পরেই হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া স্বামীজীকে যেন সম্মুখে দেখিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ্ দেখিনি কোথায় পাঠিয়ে দিলি, খেটে খেটে প্রাণটা গেল, তোর জন্যই তো মাদ্রাজে এসেছি, আর পারি না"—বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গ হইয়া ঠিক যেন তাঁহার পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "ভাই আমি বুঝিনি, না বুঝে তোমায় এসব কথা বলে ফেলেছি, মাপ করো। তুমি যা বলবে, ভাই, আমি তাই করতে প্রস্তুত।"

মাদ্রাজে প্রথম কয়েক বৎসর, দারুণ অভাবের মধ্যে সহায়হীন অবস্থায় শশী মহারাজকে কাজ করিতে হইয়াছিল। এমন দিনও গিয়াছে যখন নিজের পরিমিত অত্যাবশ্যকীয় আহার্য থাকা তো দূরের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যভোগের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাও জুটিত না। একদিন ভোগের সময় দেখিলেন, ঠাকুরের রুটিতে মাখাইবার জন্য এতটুকুও ঘি নাই। টাকা পয়সাও নাই যে, সামান্য ঘি কিনিয়া আনিয়া সেই দিনের মতো ঠাকুরের ভোগ চালাইয়া দেন। এইরূপ নিরুপায় ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় একটি মাদ্রাজি ভক্ত আসিয়া বলিল, "স্বামীজী, সম্প্রতি অফিসে আমার পদবৃদ্ধি হয়েছে, আমার সাংসারিক অবস্থাও এখন সচ্ছল, ঠাকুরের সেবার জন্য আমি মাসিক কিছু কিছু দিতে চাই।" শশী মহারাজ উত্তর করিলেন, "না, না, তুমি কোথায় পাবে?" ভক্তটি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিল, "স্বামীজী, ভগবানের সেবা হতে দয়া করে আমায় বঞ্চিত করবেন না।" এই বলিয়া ঠাকুরের সেবার জন্য সেদিন তিনি কিছু ঘি কিনিয়া আনিলেন।

এইরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাস, নির্ভরতা, ত্যাগ ও তপস্যা লইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রায় পনের বৎসর কাল মাদ্রাজে ধর্মপ্রচার করিয়া ছিলেন। শুনিয়াছি, বক্তৃতাকালীন তাঁহার আল্‌খাল্লার দুই পকেটে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার ছবি থাকিত। তিনি দুই পকেটে হাত রাখিয়া বক্তৃতা করিতেন এবং বলিতেন, "ঠাকুর ভিতর হতে যেমন বলান গ্রামোফনের মতো আমি তেমনিই বলে যাই, এতে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই।" পূর্বেই বলিয়াছি, বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া শশী মহারাজ শহরের বিভিন্ন স্থানে ক্লাস করিতেন। নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক পাঁচ মিনিট পূর্বে তিনি ক্লাসে প্রবেশ করিয়া, ছাত্র সংখ্যা অতি অল্প হইলেও অধ্যাপনা করিতেন। কোন সময়ে এরূপও হইয়াছে যে, তিনি ব্যতীত ক্লাসে আর কেহই উপস্থিত নাই, তবুও তিনি বিরক্ত হইতেন না; ঐ সময় ধ্যান জপ করিয়া শান্ত মনে মঠে ফিরিয়া আসিতেন।

তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। জনৈক মাদ্রাজবাসী বলেন—

His method of teaching was unique. It was more or less conversational—instead of being stiff or formed, it appealed direct to the heart owing to the sincerity with which it was uttered. Time flew past, the minutes grew into hours, but we who were listening to his sublime discourses were enjoying a supreme happiness and felt not how time flew away. Great truth, complicated questions, controversial problems and all the heights and depths of ethics were discussed but in most simple manner possible, so that, even a child might understand them.

—"অন্য সকলের শিক্ষাদান প্রণালী হইতে পূজনীয় শশী মহারাজের শিক্ষা দিবার ধারার একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি কথোপকথনচ্ছলে উপদেশ দিতেন, সুতরাং উহা মোটেই 'কট মট' হইত না, বরং তাঁহার সরল হৃদয়ের কথাগুলি সকলের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিত। তাঁহার উচ্চভাবপূর্ণ উপদেশাবলী শুনিয়া আমরা হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিতাম। সময় কোন্ দিক দিয়া কখন চলিয়া যাইত কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। মহান তত্ত্ব, জটিল প্রশ্ন, কঠিন সমস্যা এবং দর্শনশাস্ত্রের উচ্চ ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলি তিনি এরূপ সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, একটি বালকও অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিত।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতাবলী উত্তরকালে সংগৃহীত হইয়া "The Universe and Man" 'Sri Krishna the Pastoral' 'Sri Krishna the King

maker' এবং 'The Soul of Man' প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়ে নিবদ্ধ হইয়াছে; ইহা ব্যতীত 'শ্রীরামানুজ চরিত' নামক মূল বঙ্গভাষায় তিনি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মাদ্রাজে যে সমস্ত ভাগ্যবান যুবক পূজনীয় শশী মহারাজের নিকট উপদেশ গ্রহণ ও ধর্মশিক্ষা করিবার জন্য আসিত তিনি তাহাদের হৃদয়ে ত্যাগের আগুন জ্বালিয়া দিতেন। ইহাতে যুবকগণের অভিভাবক মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; তাঁহারা শশী মহারাজকে সংবাদ পাঠাইলেন—যদি তিনি তাঁহার উপদেশের ভাবধারা পরিবর্তিত না করেন, তবে আর তাঁহারা তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করিবেন না। সিংহশিশুকে আঘাত করিলে সে যেমন গর্জন করিয়া উঠে, এই শাসনবাক্য শ্রবণে শশী মহারাজও তদ্রূপ বজ্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন—

Am I to preach other than what I have learned from my Master? Certainly I won't do that. I care a fig for the big wigs. They are at liberty to do whatever they like. If I am ousted to-day from this castle I shall very gladly find accommodation in a pale of one of my students' houses. I am a sannyasin and do not know where my next meal would come from.

—"গুরু মহারাজের নিকট যাহা শিখিয়াছি তাহার বিপরীত শিক্ষা আমায় দিতে হইবে? কখনই নহে। হোম্‌রা চোম্‌রা লোকদের আমি গ্রাহ্যই করি না। তাহাদের যাহা খুশি তাহাই করিতে পারে। আজ যদি আমি এই 'ক্যাসল'* হইতে বিতাড়িত হই, আমার কোন ছাত্রের বাড়ির এক কোণে আমি আনন্দে আশ্রয় লইব। আমি সন্ন্যাসী—কল্যকার ভিক্ষা কোথা হইতে জুটিবে তাহা আমি জানি না।"

এই মহাপুরুষের শুভেচ্ছা ও নিষ্কাম কর্ম উচ্চপদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। সংসারে যাহাদের আপনার বলিতে কেহ নাই, উদরপূর্তি কাহাকে বলে যাহারা কখনো জানে না, লাঞ্ছনা ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছাড়া ভালোবাসা কি বস্তু যাহারা জীবনে একদিনের জন্যও অনুভব করে নাই, সেই সমস্ত হতভাগ্যদের জন্যও তাঁহার করুণ হৃদয় সর্বদাই বিগলিত হইত। একবার কোয়েম্বাটুরে (Coimbatore) প্লেগ হইয়া একটি দরিদ্র পরিবার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়। কয়েকটি অনাথ শিশু ব্যতীত সেই সংসারে আর কেহই ছিল

* তখন মাদ্রাজ-মঠ Castle Carnan নামক ভাড়া বাড়িতে ছিল।

না। শশী মহারাজ তাঁহার বিশাল বক্ষে বালকগণকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের শিক্ষা প্রভৃতির সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের বর্তমান বিরাট Ramakrishna Students' Home-এর (শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী ভবন) ভিত্তি এইরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানব-দুঃখে যাঁহার প্রাণ নিরন্তর ক্রন্দনশীল, সংসারের সকল হিয়ার দারুণ মর্মবেদনা যাঁহার বক্ষ বিক্ষোভিত করে সেই রোদনপর মহাপ্রাণকে কে না শ্রদ্ধা করে? হয়তো স্থূলভাবে তিনি কাহারও কোন উপকারে আসেন না, হয়তো একটি কপর্দক দিয়াও তিনি কাহাকেও সাহায্য করিতে পারেন না, শুধু চোখের জল, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও অনাথশরণের পাদপদ্মে ব্যাকুল প্রার্থনাই তাঁহার একমাত্র দান, তবুও তিনি জগতের যে-কোন শ্রেষ্ঠ দানী হইতেও মহৎ। তাই দেখিতে পাই, অনাথ পিণ্ডদ শ্রাবস্তিপুরের নগরদ্বারে দাঁড়াইয়া যখন বলিলেন—

ওগো পৌরজন, কর অবধান,
ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ তিনি, বুদ্ধ ভগবান
দেহ তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে।

তাঁহার কথা শুনিয়া—

ফেলি দিল পথে বণিক ধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি রতন কণিকা,
কেহ কণ্ঠহার, মাথার মণিকা
কেহ গো।
ধনী স্বর্ণ আনে থালি পুরে পুরে
সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দূরে
ভিক্ষু কহে, ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহ গো।
ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোন ভেট
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট
আননে।

তখন—

দীন নারী এক ভূতল শয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ,

সে আসি নমিল সাধুর চরণ
কমলে।
অরণ্য আড়ালে রহি কোন মতে
এক মাত্র বাস, নিল গাত্র হতে
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে
ভিক্ষু উর্ধ্বভুজে করে জয়নাদ
কহে ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ
মহা ভিক্ষুকের পূরাইলে সাধ
পলকে।

সেই অতি দরিদ্রা রমণী উলঙ্গিনী হইয়া, নিজ দেহ অরণ্য-আড়ালে কোন মতে লুকাইয়া তাহার শতছিন্ন বসনখানি ভিক্ষুকের পাদপদ্মে ফেলিয়া দিল, তাই উহা ভগবানের পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য; কিন্তু যাহার তাহাও নাই, শুধু চোখের দু-ফোঁটা অশ্রু যাহার বাকি আছে, অপরের ব্যথার তাপে তাহাই যদি বিগলিত হইয়া সকলের অলক্ষ্যে ঝরিয়া পড়ে, তবে সেই দুইটি অশ্রুবিন্দু নারায়ণের বক্ষে কৌস্তুভ মণিরূপে চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। এইরূপ বিশ্বব্যাপী মহাপ্রাণ লইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

He thought that his salvation consisted in the salvation of humanity and with this end in view, he toiled and moiled to remove the misery of people, who had fallen from the high ideal of life enjoined in Scriptures.

"সমগ্র মানবের মুক্তিতেই তাঁহার মুক্তি—পূজনীয় শশী মহারাজ এইরূপ বিশ্বাস করিতেন; সেইজন্য শাস্ত্রকথিত মানবজীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে যাহারা বিচ্যুত হইয়াছে তাহাদের দুঃখ দূরীকরণ মানসে তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন।"

ব্যক্তিগত মুক্তি সমষ্টিগত মুক্তির অপেক্ষা করে কি-না তাহা বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু হৃদয় বিচার মানে না। তর্ক, যুক্তি, বিচারের কোলাহল দমিত করিয়া, হৃদয়ের ক্রন্দনরোল চিরদিন ভুবন ভরিয়া রাখে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিশ্বজননীর সন্তানসন্ততির জন্য যৎসামান্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, লোকচক্ষে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে, অনাথিনীর জীর্ণ মলিন বসন মানব-সাধারণের চক্ষে অতি তুচ্ছ; কিন্তু তাহা পাইয়াই—

চলিল সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ নখর
আলোকে।

তদ্রূপ শশী মহারাজেরও সমস্ত জীবনব্যাপী অতি দীন মানবপূজা সকলের চক্ষে উপেক্ষিত হইলেও নারায়ণের হৃদয়ে চিরদিন বিপুল পুলকের সঞ্চার করিবে।

আর দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাদ্রাজ কাহিনি শেষ করিব। নিম্নলিখিত ঘটনাটি তাঁহার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রেম ও অপূর্ব স্নেহের পরিচায়ক। তখন, পূজনীয় বুড়ো বাবা (স্বামী সচ্চিদানন্দ) পরিব্রাজক ভাবে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া মাদ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; শশী মহারাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কয়েক মাস মাদ্রাজে থাকিবার পর রামেশ্বর দর্শন করিয়া বুড়ো বাবা মঠে ফিরিয়া আসিতে উৎসুক হইলেন। যাত্রার দিন স্থির হইল। বুড়ো বাবা বলিতেন, "ঐদিন খুব ভোরে উঠে শশী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজোর পর আমাকে বললেন, 'এদিকে এস।' আমি নিকটে গেলে আমার কপালে দইয়ের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন, আসন পেতে খেতে বসালেন। আমি যখন খাচ্ছি তখন দেখি দোরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি কাঁদছেন। দুই চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে, মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাবার সময় মা যেমন কাঁদে। আমি তো অবাক! খাওয়া দাওয়া শেষ হলে শশী মহারাজ আমাকে নিয়ে স্টেশনে গেলেন, একখানি ইন্টার ক্লাসের টিকিট কেটে আমায় গাড়িতে বসালেন, তখনও তিনি কাঁদছেন। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলে আমি দেখলুম, যতক্ষণ আমায় দেখা গেল, ততক্ষণ তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন।"

বুড়ো বাবার মাদ্রাজে অবস্থান কালে আর একটি ঘটনার বিষয়ে আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম। পূজনীয় শশী মহারাজ ও বুড়ো বাবা একই ঘরে রাত্রে শয়ন করিতেন। একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ শশী মহারাজ "দীনু" "দীনু" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন (বুড়ো বাবা তখন "দীননাথ" নামে পরিচিত ছিলেন।) বুড়ো বাবা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলে তিনি বলিলেন, "দেখ দীনু, স্বপ্ন দেখলুম যেন নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ) আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে— "শশী, থুতুর মতো আমি শরীরটাকে ফেলে দিয়ে এসেছি।" ইহাতে তাঁহাদের উভয়েরই মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তাহার পরের দিন স্বামীজীর দেহত্যাগের নিদারুণ সংবাদ লইয়া

যখন বেলুড়-মঠ হইতে 'তার' আসিল, তখন স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে প্রচার কার্যে কখনও কখনও মাদ্রাজের বাহিরে ব্যাঙ্গালোর, ট্রিভাঙ্কোর, বোম্বাই, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানেও গমন করিতে হইত। ১৯০৩ সালে তিনি বেদান্ত সোসাইটির সভ্যগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মহীশূরের রাজধানী ব্যাঙ্গালোর গমন করেন। তথায় তিনি জনসাধারণের নিকট 'Message of Sri Ramakrishna to the World', 'What is Yoga' ও 'Vedanta' সম্বন্ধে ইংরেজিতে এবং পণ্ডিতবর্গের সম্মুখে সংস্কৃত ভাষায় একটি চিত্তগ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে শশী মহারাজ স্বামী আত্মানন্দকে সঙ্গে লইয়া ব্যাঙ্গালোর আসিয়া তথায় একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯০৬ সালে স্বামী অভেদানন্দের সহিত তিনি আর একবার ব্যাঙ্গালোর যান এবং ১৯০৮ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত শেষবার তথায় গমন করিয়া বর্তমান ব্যাঙ্গালোর মঠের উদ্বোধন কার্যে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে জুলাই মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সোলাপুর যান। ঐ সালের শেষাশেষি তিনি প্রচারকার্যে রেঙ্গুন গমন করেন। ১৯০৫ সালের প্রারম্ভে, শশী মহারাজ পুনরায় ধর্মপ্রচারকরূপে বোম্বাই যান এবং তাহার কিছুদিন পরে তিনি ঐ কার্যে রাজমহেন্দ্রি, ত্রিচিনাপল্লি, শ্রীরঙ্গম, পদুকোটি-নেটিভ-স্টেটে গমন করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তিনি রাজোচিত সম্মানলাভ করিয়া মাদ্রাজ মঠে ফিরিয়া আসেন।

এতদিনে সেই কর্মক্লান্ত শরীরে চিরবিশ্রাম সুখলাভের সময় আসিল। ইতঃপূর্বেই বহুমূত্র পীড়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষয়কাশ আসিয়া তাঁহার শেষ দিন আরও আসন্ন করিয়া তুলিল। গুরুভ্রাতাগণ শশী মহারাজকে কলকাতায় আনিয়া তাঁহার চিকিৎসাভার সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও কবিরাজগণের উপর অর্পণ করিলেন। কিন্তু প্রভু যাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন জগতের কোন কিছুই সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের গতিপথে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-শাখা-মঠে যখন শশী মহারাজ রোগশয্যায় শায়িত তখন একদিন গভীর রাত্রে তাঁহার জনৈক সেবককে বলিলেন, "আমি ঠাকুরের গান শুনবো।" তখনই শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশবাবুর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি গান রচনা করিয়া দিলেন, সুগায়ক পুলিনবাবু আসিয়া সেই গান গাহিলেন—

পোহাল দুখ রজনী
গেছে 'আমি' 'আমি' ঘোর কুস্বপন
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ
জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে
হাসে জননী।
বরাভয়করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়
বাজাও দুন্দুভি শমন বিজয়
মার নামে পূর্ণ অবনী।
কহিছে জননী—কেঁদ না
রামকৃষ্ণ পদ দেখ না
হের মোর পাশে করুণায় দুটি আঁখি ভাসে
ভুবন তারণ গুণমণি।

গান শুনিয়া শশী মহারাজ বলিলেন, "আমি ঠিক এই ভাবের গানই শুনতে চেয়েছিলুম।"

তারপর মহাপ্রয়াণের দিন ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হইল। ২১ আগস্ট ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ (১৮৩৩ শকে) বেলা ১টা ১০ মিনিটের সময় পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীগুরুর অভয় পাদ-পদ্মে চিরকালের জন্য মিলিত হইলেন।

* * *

ফুলের গাছ যেমন অপরের জন্যই অঙ্কুরিত হয়, অপরের জন্যই মঞ্জুরিত হয়, অপরের জন্যই মুকুলিত হইয়া পুষ্পদান করে, তাহার নিজের কোন স্বার্থ নাই, নিজের জন্য সে কোন দিন কিছুই চাহে না, তাহার কাজ সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের অলক্ষিতে পুষ্পিত হওয়া, আর প্রভাতে হাসিমুখে সেই পুষ্পভার নিঃশেষে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ঢালিয়া দেওয়া, সারা জীবন অন্যের সুখের জন্যই সে যেমন বাঁচিয়া থাকে, তদ্রূপ শশী মহারাজের এই অমূল্য মানব-জীবন আমাদের সুখ, আনন্দ ও আদর্শ দান করিয়াই চলিয়া গিয়াছে, দলিত হইয়াও উহা কণ্টকবিদ্ধ করে নাই, কেবল গন্ধই দান করিয়াছে।

(উদ্বোধন ২৮ বর্ষ, ১১, ১২ সংখ্যা)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বংশ-পরিচয়

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর মজিলপুর গ্রামে কালীপ্রসাদ বাপুলি নামে জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কোন অজ্ঞাত কারণে বর্ধমানের তদানীন্তন মহারাজা তাঁহাকে হুগলী জেলার অন্তর্গত ময়াল ইছাপুর গ্রামে কিঞ্চিৎ জায়গীর প্রদান করেন। সেই অবধি ইছাপুর গ্রাম এই বংশের বাসভূমি হয়। কালীপ্রসাদের তিন সন্তান ছিলেন—রামানন্দ, রাজচন্দ্র ও ঠাকুরদাস। রামানন্দ বাপুলি পত্নী বিয়োগের পর স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া জনাই গ্রামে বাস করেন। রামানন্দের পুত্র গিরিশচন্দ্র ছিলেন শরৎচন্দ্রের পিতা। শরৎচন্দ্রই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী সারদানন্দ নামে সুপরিচিত। গিরিশচন্দ্র ১৮৬২ সনে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে স্বীয় বসতবাটি নির্মাণ করেন। তিনি তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের ঔষধালয়ের অংশীদার ছিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্রের অনুরোধে পণ্ডিতগণের অনুমতিক্রমে পূর্বোপাধি পরিত্যাগ করিয়া চক্রবর্তী উপাধি গ্রহণ করেন।

রামানন্দ বাপুলি স্বগ্রাম ইছাপুর ত্যাগ করিলেও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় রাজচন্দ্র ও ঠাকুরদাস পিত্রালয়েই বাস করিতে লাগিলেন। রাজচন্দ্রের একমাত্র পুত্র ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের চারিপুত্র—শশিভূষণ, রামভূষণ, নীরদভূষণ ও ক্ষীরোদভূষণ এবং চারি কন্যা—নবকুমারী, কুসুমকুমারী, ননীবালা ও শৈলবালা। ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শশিভূষণই রামকৃষ্ণসঙ্ঘের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে পরিচিত। শশিভূষণের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র একজন বিশিষ্ট তন্ত্রসাধক ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ উন্নত স্থূল শরীর, রক্তচন্দন-চর্চিত প্রশস্ত ললাট, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, পরিধানে কাষায় বস্ত্র, সুদীর্ঘ কেশ এবং শ্মশ্রু ও গুম্ফমণ্ডিত মুখমণ্ডল ছিল বলিয়া তাঁহাকে প্রাচীন ঋষির মতো দেখাইত। তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়নে এবং তান্ত্রিক সাধনায় তাঁর দিনগুলি অতিবাহিত হইত। সেইজন্য তখনকার তান্ত্রিক সমাজে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। সাধনার অনুকূল জানিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অধিকাংশ সময় ইছাপুরে বাস করিতেন। বিশেষ বিশেষ রজনীতে তিনি কখনও নদীপুলিনে, কখনও বট, অশ্বত্থ, বিল্ব বা নিম্ব বৃক্ষমূলে জপ-ধ্যানে কাটাইতেন। স্বগ্রামের অনতিদূরে অবস্থিত ঘণ্টেশ্বরের মহাশ্মশান তাঁহার সাধনাস্থল ছিল। কলকাতায়

আসিলে কালীঘাটের সন্নিকটে কেওড়াতলার শ্মশানে যাইয়া তিনি জপ-ধ্যান করিতেন।

শুনা যায় এক নিশীথ রাত্রে উক্ত শ্মশান হইতে প্রত্যাগমনকালে কালীমন্দির ঘাটপার রাস্তার মোড়ে তিনি একটি কিশোরী বালিকা দেখিতে পান। অন্ধকার জনশূন্য পথে বালিকা ইতস্তত করিতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রে কে মা তুমি একা এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ?" কিশোরী তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। এই সময় মন্দিরের সিংহদ্বার বন্ধ থাকে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত। নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই কিশোরীমূর্তি অন্তর্হিত হইলেন। আশ্চর্যান্বিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র তথায় বসিয়া পড়িলেন ও ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার ইষ্টদেবী বালিকাবেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

পাইকপাড়ার স্বনামধন্য রাজা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। বাংলার সিদ্ধতান্ত্রিক পণ্ডিতপ্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন রাজা ইন্দ্রনারায়ণের গুরু। কিন্তু রাজা স্বীয় গুরুর প্রধান শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্রকেও গুরুবৎ ভক্তি করিতেন। রাজপ্রাসাদের পশ্চাতে অবস্থিত উদ্যানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন, হোমকুণ্ড, যূপকাষ্ঠ প্রভৃতি তন্ত্রসাধনার সকল উপকরণ সদা প্রস্তুত থাকিত। ঈশ্বরচন্দ্র তথায় তন্ত্রসাধনায় নিমগ্ন হইতেন। সাধনার নিমিত্ত যখন যে দুষ্প্রাপ্য বস্তুর প্রয়োজন হইত, রাজা তাহা সযত্নে সংগ্রহ করিয়া দিতেন। চৌরঙ্গীতে রাজার যে বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, তথায় ঈশ্বরচন্দ্র অনেক সময় অবস্থান করিতেন। গিরিশচন্দ্রও সাধকশ্রেষ্ঠ জগন্মোহনের শিষ্য ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পুত্র শরৎচন্দ্র যখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পূতস্পর্শে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেন, তখন তাঁহার পিতা একদিন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কাশীপুর বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লইয়া যান। উদ্দেশ্য ছিল, সাধন-রহস্যের কতকগুলি কঠিন প্রশ্ন করাইয়া পরমহংসদেবকে অপ্রতিভ করাইবেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্য বিফল হইল। সাধক জগন্মোহন শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দুই চারিটি কথা বলিয়াই বুঝিলেন এ জ্বলন্ত বহ্নি। অন্তরালে তিনি গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, "শরৎচন্দ্র যে মহৎ আশ্রয় পেয়েছে, আমি তাকে তা কোনমতেই ত্যাগ করতে বলতে পারবো না।" সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্রও শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শশিভূষণ ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাতাপিতা আশা করিয়াছিলেন পুত্র শিক্ষা

সমাপনান্তে অর্থোপার্জন করিয়া গৃহের অর্থকষ্ট দূর করিবে। কিন্তু পুত্র বি-এ পরীক্ষা না দিয়াই সংসার ত্যাগ করিয়া ১৮৮৬ সনের শেষভাগে বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন। মাতাপিতার আশা নির্মূল হইল। ঈশ্বরচন্দ্র বরাহনগর মঠে আসিয়া পুত্রকে কখনও মিষ্ট বাক্যে বুঝাইতেন, কখনও বা ভয় দেখাইতেন। পিতৃ বাক্যে কর্ণপাত না করিলেও গৃহের অর্থাভাবের দুশ্চিন্তা তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিত। তিনি অনেক সময় সজল নয়নে স্বীয় বন্ধুদিগকে বলিতেন, "আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি। হায়! আমি অভাবগ্রস্ত মাতাপিতার কোন সেবা করতে পারলাম না! আমার উপর তাঁরা খুব ভরসা করেছিলেন। অর্থাভাবে আমার মা কোন অলঙ্কার ব্যবহার করতে পারেন নি। মায়ের জন্য কিছু অলঙ্কার করাবার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করবার এখন আর উপায় নেই। গৃহে প্রত্যাবর্তন আমার পক্ষে অসম্ভব। শ্রীগুরুদেব আমাকে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমি সংসারে প্রবেশ করব না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম অসুখের সময় শশিভূষণ গৃহ ছাড়িয়া কাশীপুর বাগানে বাস ও গুরুসেবা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর উক্ত বাগান বাড়ি ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তখন শশী এবং অন্যান্য বালক শিষ্যগণ মাতাপিতার অনুরোধে কিছুদিনের জন্য গৃহে ফিরিয়া যান। বরাহনগরে মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে শশী প্রথমে মঠে যাতায়াত এবং কয়েক দিন পরে স্থায়ী ভাবে মঠে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় পিতা আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন। কিন্তু শশী আর গৃহে ফিরিয়া যান নাই। ১৮৮৭ সনের ৯ এপ্রিল পিতা একই উদ্দেশ্যে মঠে আসেন। পিতার আগমনের সংবাদ পাইয়া শশী গোপনে মঠ হইতে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলাইয়া যান; তিনি পিতার সহিত দেখা করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। একদিন মঠে পুত্র পিতাকে বলিয়াছিলেন, "সংসার ও গৃহ আমার নিকট শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যতুল্য।" আর একদিন পিতা পুত্রকে গৃহে ফিরাইবার জন্য অনেক বোঝাইতে ছিলেন। পুত্র যখন কিছুতেই বুঝিলেন না তখন পিতা দুঃখে ও ক্রোধে শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিলেন। শিবতুল্য গুরুর নিন্দা শ্রবণে পুত্রের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি পিতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিলেন! ধর্মপ্রাণ সাধক পিতা পুত্রের গুরুভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে আনিবার চেষ্টা ত্যাগ করিলেন।

শশীর পিতা হতাশ হইয়া মঠের উপরের বারান্দায় শ্রীম-এর সহিত কথা

পায়চারী করিতে লাগিলেন। তিনি নিরাশ হৃদয়ে বলিলেন, "এখানকার অধ্যক্ষ কে? নরেন্দ্র একাই সকল অনর্থের কারণ। কিছুদিনের জন্য ছেলেরা গৃহে ফিরিয়া লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়েছিল।" তিনি শ্রীম-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনিই ঠিক করেছেন। আপনি সংসার ও ঈশ্বর উভয়েরই সেবা করছেন। এরা কি আপনার মতো ধর্ম সাধন করতে পারে না? আমি শশীকে এরূপই করতে বলি। সে বাড়িতে থাকুক এবং এখানেও আসুক। আপনি জানেন না ওর মা ওর জন্য কত কাঁদে!" তিনি আরও বলিলেন, "আপনি যদি সাধুপুরুষের সৎসঙ্গের কথা বলেন, আমি একটি ভালো সাধুর অনুসন্ধান দিতে পারি। শশী তাঁর কাছে যাক।" সে যাহাই হউক, পরে পিতার মন পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং পুত্রের আধ্যাত্মিক উন্নতি দর্শনে পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বরাহনগর মঠে, আলমবাজার মঠে এবং বেলুড় মঠে যাতায়াত করিতেন এবং মঠের সন্ন্যাসিগণের প্রতি প্রীতিপরায়ণ ছিলেন।

তান্ত্রিক সাধন-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য শরৎচন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট যথাবিধি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের ভক্তিমতী শিষ্যা যোগীনমাও ঐ সঙ্গে অভিষিক্তা হন। এই অভিষেক-কার্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রীমার অনুমোদন ছিল। শরৎচন্দ্রের ডায়েরিতে উল্লেখ আছে "১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ১৯ নভেম্বর, ১৩০৭ সাল ৪ অগ্রহায়ণ, কার্তিক কৃষ্ণা চতুর্দশী, অধিবাস। পরদিবস রাত্রে অভিষেক।" তান্ত্রিকপ্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। গুরু লোকান্তরিত হওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্রই বাংলার তান্ত্রিক মহলে প্রখ্যাত হইলেন। শরৎচন্দ্র তন্ত্রসাধনায় পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্রের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাত্রে পিতৃব্যের সহিত মিলিত হইয়া শরৎচন্দ্র মহাদেবী মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা এবং তৎপরে এক বিরাট দুর্গাসপ্তশতী হোমের অনুষ্ঠান করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে নবনির্মিত বেলুড় মঠে প্রথম প্রতিমায় দুর্গাপূজা হয়। পূজায় সমারোহ ও অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হইল না। তন্ত্রধারক হইলেন ঈশ্বরচন্দ্র। শ্রীশ্রীমা পূজার কয়েকদিন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান-বাড়িতে মহিলা ভক্তগণের সহিত বিরাজ করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে মঠে পশুবলি নিষিদ্ধ হইল। অতঃপর ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে মঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশ্রীকালীপূজাও সম্পন্ন হইল। স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ মঠে উপস্থিত থাকিয়া পূজার সকল আয়োজন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র খুব নিষ্ঠাবান, ধর্মানুষ্ঠানপরায়ণ এবং পূজাপাঠে সুদক্ষ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

সকল প্রকার পূজাদির মন্ত্র তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। বিশেষ পূজাদিতে স্বয়ং ব্রতী হইলে যথানিয়মে পূর্বদিন হইতে সংযম করিতেন; এমনকি, পূজাকালে পাছে মূত্রত্যাগের জন্য উঠিতে হয় সেইজন্য খানিকটা লঙ্কাবাটা খাইয়া আসনে বসিতেন। মঠে পূজাদির পুঁথিখানি তাঁহার নির্দেশমতো সঙ্কলিত হইয়াছিল।

শশিভূষণের মাতাপিতা বৃদ্ধ বয়সে কিছুকাল কাশীবাস করিয়াছিলেন। শরতের পিতা গিরিশচন্দ্রও কাশীবাসী ছিলেন এবং ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ১১ নভেম্বর উত্থান একাদশীর দিন উক্ত মোক্ষক্ষেত্রে প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর সময় ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রাম ইছাপুরে ছিলেন। ইহার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা শৈলবালা ইহধাম ত্যাগ করেন। কন্যাশোকে বৃদ্ধ পিতার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। অন্তরের সন্তাপ বাহিরে জ্বররূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এই অসুস্থ অবস্থায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু-সংবাদে ঈশ্বরচন্দ্র অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি বালকের মতো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে রমেশ, দাদা আর নেই।" ঐদিন সন্ধ্যায় কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষীরোদভূষণকে কহিলেন, "আমাকে বাহিরে নিয়ে চল। অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখব।" অরুন্ধতী সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠ নামক তারকার পার্শ্বস্থিত একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। হিন্দুশাস্ত্রমতে এই ক্ষুদ্র তারকা যাঁহার দৃষ্টিগোচর না হয়, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে বাহিরে আনিলেন। কিন্তু পিতা অরুন্ধতী দেখিতে পাইলেন না। তখন ঈশ্বরচন্দ্র কহিলেন, "তোমরা প্রস্তুত হও; আমার আর সাতদিনের বেশি নয়।" সাধক ঈশ্বরচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইল। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর ত্রয়োদশ দিবসে জ্ঞাতিভোজনের দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে পূর্বাকাশ রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইলে উদীয়মান ব্রহ্মমূর্তির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ঈশ্বরচন্দ্র ৬৬ বৎসর বয়সে অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম ১৮ মে, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ এবং মৃত্যু ২৬ নভেম্বর, ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাতা ভবসুন্দরী দেবী ১২৫৩ সালে (১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ) ২২ অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩২ সালে (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) ২৪ আষাঢ় প্রায় আশি বৎসর বয়সে কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। তিনি অতিশয় সরল, সাদাসিধে, নিরীহ, উদাসীন রমণী ছিলেন। তিনি এত লজ্জাশীলা ছিলেন যে, পরমাত্মীয়গণের সম্মুখে, এমনকি জ্যেষ্ঠ পুত্র শশীর সম্মুখেও ঘোমটা দিতেন। সংসারে সব কাজের মধ্যেও তিনি খুব নির্লিপ্ত থাকিতেন। তিনি গৌরবর্ণা

ছিলেন। এবং তৎপুত্র শশীও তাঁহার মতো গৌরবর্ণ ছিলেন। তাঁহাদের গৃহে নারায়ণ, মনসা, শীতলা ও সিংহবাহিনী প্রভৃতি দেবতার নিত্যপূজা হইত। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর বাড়িতে কালীপূজা হইত। একবার তাঁহার মধ্যমা কন্যার ও কনিষ্ঠ পুত্রের রক্তামাশয় অর্শরোগ হয়। জননী ভবসুন্দরী পুত্রকন্যার আরোগ্য মানসে কালীর কাছে ডান হাত বাঁধা দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার পুত্রকন্যা আরোগ্য লাভ করেন। সেই অবধি তিনি বাম হাতে খাইতেন, ডান হাতে খাইতেন না।

সম্ভবত ১৯১০ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুরীধামে 'শশী নিকেতনে' ছিলেন। সেই সময় শশী মহারাজের মাতাঠাকুরানী কিছুদিন পুরীবাস করেন। তিনি দীর্ঘাঙ্গী এবং প্রাচীনা হইলেও সুস্থ ও কৃশ ছিলেন। তাঁহার সরল ব্যবহার এবং সুমিষ্ট আলাপে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনিও শ্রীশ্রীমহারাজের আদর আপ্যায়নে পরম পরিতুষ্টা হন এবং দর্শনাদির সকল সুবিধা ও সুব্যবস্থা হওয়ায় অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

রামকৃষ্ণানন্দজীর অন্তিম অসুখের সময় ভবসুন্দরী দেবী পুত্রকে প্রায়ই দেখিতে আসিতেন। মাতা আসিলেই পুত্র স্বীয় মস্তক বাড়াইয়া দিয়া বলিতেন, "মা, মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ কর।"

সন্ন্যাসী পুত্রের মৃত্যুকালে মাতা ভবসুন্দরী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আহারান্তে তিনি দ্বিপ্রহরে নিদ্রা যাইতেছেন। দিবানিদ্রা সাধারণত গভীর হয় না। তিনি স্বপ্নে দেখেন, কয়েকজন গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী এসে তাঁহাকে তুলে আছাড় মারিলেন। ইহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় তিনি বিষণ্নমনা হইলেন। সন্ন্যাসী পুত্রের কুশল জানিবার জন্য তাঁহার মন উতলা হইল। বৈকালে দুঃসংবাদ আসিল সেই দ্বিপ্রহরে প্রায় এক ঘণ্টা পরে সন্ন্যাসী পুত্র পরমধামে গমন করিয়াছেন। পুত্রের মহাসমাধির সময়ই মাতা এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। মাতাপুত্রের সম্বন্ধ সত্যই অবিচ্ছেদ্য। এমন সাধক পিতা ও সরলা মাতা না হইলে কি এমন সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে? স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মতো দেবোপম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা, জনক ধন্য এবং ধরণী পুণ্যবতী হয়।

(উদ্বোধন ৪৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যেমন দেখেছি

স্বামী বিরজানন্দ

১৮৯১ সালের গোড়ার দিকে এক দুপুরে কলেজ থেকে পালিয়ে বরানগর মঠে প্রথম গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিল আমার কয়েকজন বন্ধু ও সহপাঠী। আমরা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) দর্শন পেয়েছিলাম। তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী শিষ্য আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন—"কোত্থেকে আসছ, কি কর, কোথায় থাক, মঠের কথা কি করে জানলে?" আমাদের বৃত্তান্ত শুনে তাঁরা খুব খুশি হলেন, খুব উৎসাহ দিলেন। তাঁদের দেখে আমাদেরও এক নতুন revelation (জ্ঞানোদয়) হলো। মনে হতে লাগলো জগৎ ছাড়া কোথায় যেন এসেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের সঙ্গে আলাপাদি করে আমরা মুগ্ধ হলুম। ৪টার সময় ঠাকুর ঘর খোলা হলে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে আমরা সেদিন বিদায় নিলুম। তাঁরা সকলে বললেন, "এখানে মাঝে মাঝে আসবে।"

সেই থেকে ছুটি পেলেই আমরা মাঝে মাঝে বরাহনগরে যেতে লাগলুম। শশী মহারাজকে দেখলেই ভয় হতো। সর্বদা যেন ভাবে গরগর থাকতেন। খুব কড়া লোক ছিলেন। আমাদের পাঠ্যবিষয়েও নানা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। পড়াশুনা এড়াতে আমরা মঠে আসছি কিনা দেখতেন। আমরা যদি ঠিকমতো তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম না বা আমরা যদি তাঁর দেওয়া কোন অঙ্কের সঠিক উত্তর দিতে পারতাম না, তিনি আমাদের বকতেন। বলতেন পড়াশুনায় অবহেলা করা উচিত নয়। সেজন্য আমরা তাঁকে ভয় করতুম। একদিন আমায় ধরেছেন। আমি গোড়া থেকেই তাঁকে বলে রাখলুম, অন্য সব বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, কেবল অঙ্কের প্রশ্ন করবেন না, ওতে আমি বড় কাঁচা। শশী মহারাজ বললেন, তুমি গ্রীষ্মের বন্ধের দেড়মাস এখানে এসে থাক। আমি এমন অঙ্ক শিখিয়ে দেব যে ফেল করার ভয় থাকবে না। আমি বললুম—বাবাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। বাবাকে সব বলাতে তিনি রাজি হলেন। বললেন—বেশতো, যাও না। গ্রীষ্মের ছুটি হলে বইটই দপ্তরে বেঁধে মঠে হাজির হলুম। সকলে ভারী খুশি। মঠে গিয়ে বইটই পড়াশুনা সব কিন্তু ভুল হয়ে গেল।

ঠাকুরের কাজ এবং ওঁদের সেবা করতেই ভরপুর হয়ে গেলুম। তখন তো চাকর-বাকর ছিল না। আমি ওঁদের সব কাজেই সাহায্য করতুম। পুকুর থেকে জল আনা, ফুল তোলা, বাসন মাজা ইত্যাদি নানা কাজে ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তন্ময় ভাবে কোথা দিয়ে কেটে যেত। কেমন যেন একটা নেশার ঘোরে দেড়মাস চলে গেল। শশী মহারাজ একদিনও জিজ্ঞাসা করলেন না, কই দেখি কি বই তোমার। আমারও কোন হুঁশ ছিল না।

মঠ, বরাহনগরে পরামানিক ঘাট রোডে টাকীর মুন্সীদের ঠাকুর বাড়ির পশ্চাৎ (পশ্চিম) ভাগের ভগ্ন জীর্ণ বাড়ির উপর তলায় ভিতরের অংশে ছিল। রাস্তার উপর একটা দরজা দিয়ে ঢুকে একটু খোলা জমি পার হলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে কাঠের রেলিং ও থামওয়ালা বারান্দার দক্ষিণদিকের সামনের বড় ঘরটায় আমি যাবার আগে ভাড়া ছিল; পরে এমনি খোলা পড়ে থাকতো। ভিতরের মঠের অংশ বাহির রাস্তা হতে দেখা যেত না, খুব নির্জন ছিল। এখন সমস্ত বাড়ি ভূমিসাৎ হয়েছে—বাইরের অংশ ছাড়া। ভিতরের মঠের অংশের কোন ফটো পাওয়া যায় না। পেছনের দিকে শাক-সবজির বাগান, সজনে গাছ, একটি বেলগাছ ও কয়েকটি নারিকেল ও আমের গাছ ছিল। একটি পুষ্করিণীও ছিল। বাগানে শাক-সবজি বড় বিশেষ কিছু হতো না—ডেঙ্গো ডাঁটা, ২/৪টা কুমড়ো, শশা, কলা ইত্যাদি। এক উড়ে মালি ছিল, তাকে কেলো বলে ডাকতো। তরকারি কিছু না থাকলে শশী মহারাজ মাঝে মাঝে বাগানে ঢুকে ডেঙ্গো, কুমড়ো শাক, সজনে ডাঁটা বা পাতা ফুল যা পেতেন নিমেষের মধ্যে ছিঁড়ে বঁটি দিয়ে কেটে নিয়ে আসতেন। আর কেলো মালি উড়ে ভাষায় "আরে আরে কি কর, কি কর, ওসব খা দিল, নিও না, নিও না" বলে পিছু পিছু তাড়া করতো, কখনো গাল পাড়তো, চেঁচাতো। কিন্তু শশী মহারাজ কিছুই ভ্রূক্ষেপ করতেন না। উপরে দৌড়ে আপনার মনে চলে আসতেন। এই নিয়ে সকলে মিলে খুব হাসিফুর্তি হতো। যাহোক মঠের সকলের সঙ্গে কেলো মালির বেশ প্রীতির ভাব ছিল। যখন সুবিধা হতো তাকে প্রসাদ মিষ্টান্নাদি দেওয়া হতো।

হলঘরের দেওয়ালে নানা দেবদেবীর, অবতারদের ও ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবি টাঙ্গানো ছিল। ঠাকুরঘরে ধুনো দিয়ে সেগুলির সম্মুখে শশী মহারাজ সন্ধ্যার সময় এক হাতে ধুনচিতে ধুনো জ্বেলে ও অপর হাতে একটি আলো নিয়ে "জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব" বলে ধুনো দেখিয়ে ফিরতেন। আমি মঠে যোগ দেবার পর শশী মহারাজ আমাকে এই কাজটি করতে দিয়েছিলেন।

হলঘরের একধারে একটি কাঠের তক্তপোশের উপর খানিকটায় সংস্কৃত, বাংলা ও কিছু ইংরেজি বই উপর উপর সারি করে রাখা ছিল। বাকিটায় বাঁয়াতবলা, মৃদঙ্গ, খোল, করতাল থাকতো। কাছের দেওয়ালে পেরেকে টাঙ্গানো তানপুরা। হলঘরই সাধুদের শয়নঘর ছিল। দর্শক ও ভক্তেরা এলে, বসে কথাবার্তা হতো। পরন্তু উহা সব কাজেই ব্যবহার করা হতো। বিছানার মধ্যে মাদুর ও একটি করে ছোট বালিশ, এক একজনের সারি সারি পাতা থাকতো। আগন্তুকদের জন্য বা অন্যত্র বিছানার জন্য ২/৪ খানি মাদুর ছিল বা তারা মেঝেতেই বসতেন।

ঠাকুরঘরে মাঝখানে ঠাকুরের বিছানা ভূমির উপর মাদুর, গদি, বালিশ, চাদর দিয়ে করা ছিল ও ঠাকুরের ফটো ছিল। বিছানার পাদদেশে ঠাকুরের অস্থির তাম্রকৌটা ও পাদুকা চৌকিতে রাখা ছিল। কোষাকুষি ও তাম্রকুণ্ডের সামনে বসে শশী মহারাজ নিত্য পূজাদি করতেন। শশী মহারাজের সন্ধ্যায় আরতি করা একটা অপূর্ব ব্যাপার ও দেখবার জিনিস ছিল। যখন তিনি ধূপধুনা খোলকরতাল বাদ্যের মধ্যে আরতির শেষভাগে চামর ব্যজন করতে করতে ভাবে উন্মত্ত হয়ে 'জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব' বলে ভীষণ হুঙ্কার দিয়ে তালে তালে উদ্দাম নৃত্য করে একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত নেচে নেচে ঘুরে ফিরতেন তখন সকলের মধ্যে কী এক অপূর্ব ভক্তিভাবের আবেশ হতো তা কথায় প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত বাড়িটা মনে হতো যেন কাঁপছে। তাঁর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল দিয়ে যেন রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে, চেহারা যেন সাক্ষাৎ অগ্নি-স্বরূপ! সে হুঙ্কার ও নৃত্য যেন আর থামে না। যে খোল বাজাতো তার হাত আর যেন চলে না। দর্শকরা পাশে ঠাকুরের ভাঁড়ার ঘর হতে তাঁর সঙ্গে সমস্বরে "জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব" উচ্চারণ করতে করতে আবেগে নৃত্য করতেন। পরে সকলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে গুরুগীতা হতে "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥" ইত্যাদি কয়েকটি শ্লোক ও শেষে পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দজী বিরচিত একটি স্তবের শেষ অংশ— "নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ। ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ" আবৃত্তি করতেন ও "জয় শ্রীগুরুমহারাজজীকী জয়" বলে শেষ করতেন। প্রথম প্রথম ৺কাশীর বিশ্বনাথের আরতির "ভজ শিব ওঁকার" ইত্যাদি স্তবটি সকলে সুর করে খোলকরতাল সহকারে গাইতেন, চামর ব্যজনের সময় থেকে "জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব" বলে মাতামাতি হতো।

তখন মঠে এক রাঁধুনি ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন চাকর ছিল না। একজন ভারী গঙ্গা হতে রাঁধবার ও খাবার জল মাটির কলসির বাঁকে করে এনে দিত। শশী মহারাজ ঠাকুরের সেবার ও পূজার জোগাড়ের সমস্ত কাজ, বাজার করা, ঝাঁট দেওয়া, রান্নার তরকারি কোটা, ঠাকুরের ভোগের বাসন মাজা, পুকুর হতে মুখ হাত পা ধোবার জল তোলা, তেলবাতি করা—প্রায় একাই সেরে নিতেন। অন্যেরা কিছু কিছু তাতে সাহায্য করতেন। আমি মঠে গিয়ে এইসব কাজের যতটা পারতুম ভোর হতে রাত্রে শোয়া পর্যন্ত দিনরাত করতুম।

ঠাকুরের ভোগের পর সকলের যখন খাওয়া শেষ হতো, তখন শশী মহারাজ ঠাকুর ঘরে যেতেন এবং ঠাকুরকে একটি বড় তালপাখার হাওয়া করতেন। গরমকালে বিকাল ৪টা অব্দি চলত। আলমবাজারে মঠ যাওয়ার পরও তিনি এই অভ্যাসটি নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে আমিও ওনাকে বিশ্রাম দিয়ে এই কাজটি করতুম।

মঠের সন্ন্যাসিগণ অনেক সময় ধ্যানজপ, শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা, সঙ্গীত ও ভজন করতেন, কখনও একলা, কখনও পাঁচজন মিলে। তারক মহারাজ কখনো কখনো বাঁয়াটা নিয়ে আপনার ভাবে একলা গাইতেন ও নাচতেন। তাঁর গলা খুব মিষ্টি ছিল। মেয়ের মতো গলা ছিল। স্থানীয় লোকেরা ও পথচারীরা ভাবত মঠের সন্ন্যাসীরা মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করছে। পাড়ার লোকেরা তখন মঠের বিরুদ্ধে ছিল ও নানা মিছে অপবাদ রটনা করতো। যখন সাধুরা গঙ্গাস্নান করতে যেতেন দুষ্টু ছেলেরা 'বক' দেখাত ও বলত, ওরে সব রাজহংস যাচ্ছে। আর প্যাঁক প্যাঁক করত।

মঠের সন্ন্যাসীরা তখন কি কঠোর তপস্যা করতেন! সারদা মহারাজ বাহিরের দিকে নিচের স্যাঁতসেঁতে ঘরে কয়েকমাস নির্জনে দরজায় খিল দিয়ে মৌনী হয়ে সাধন-ভজন করেছিলেন, একটি কলা ও জলমাত্র খেয়ে। তাঁকে কশ্চিৎ কখনও দেখতে পাওয়া যেত।

কিছুকাল পরে তীর্থাদি ভ্রমণ করে পশ্চিম থেকে যোগেন মহারাজ, কালী মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও তুলসী মহারাজ মঠে ফিরে এলেন। কালী মহারাজ এলাহাবাদে ঝুসিতে অনেকদিন ধরে ছিলেন ও মাধুকরী করতেন। তিনি আসবার সময় এলাহাবাদের বসন্ত বলে একটি ১৭/১৮ বছরের ছেলেকে এনেছিলেন, ব্রহ্মচারী হবে বলে। কালী মহারাজ অধিকাংশ সময় দরজায় খিল দিয়ে সংস্কৃত চর্চা ও বেদান্ত গ্রন্থাদি পাঠ করতেন। পরে ঐ ঘরকে বলা হতো

'কালীতপস্বী'র ঘর। বসন্তেরও ওইদিকে খুব ঝোঁক ছিল ও তাঁর কাছে লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ পড়তো। কিন্তু শশী মহারাজ এসব পছন্দ করতেন না। ঠাকুরের সেবায় একটু ত্রুটি হলে তাকে তিরস্কার করতেন। বসন্ত বড় অভিমানী ছিল। তার বড় প্রাণে লাগতো, যদিও কারও কাছে কিছু বলতো না। এইরূপে বোধ হয় ৩/৪ মাস থাকবার পর বসন্ত হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়। সেই অবধি তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি, যদিও তার সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়েরা তার জন্য অনেক খোঁজ খবর করেছিলেন।

আমরা যখন বাড়ি থেকে মঠে যাতায়াত করতুম প্রায় সেই সময় বা তার কিছু পর থেকে আহিরীটোলার একটি যুবাদলও মঠে আসতো। কানাই ও নন্দ ঐ দলের মধ্যে প্রথম।[১] নিবারণ, চন্দ্র, কৃষ্ণলাল ও অন্যান্যরা পরে আসে।[২] তখন দেখেছি, যেসব যুবক মঠে যেত তাদের চেষ্টা থাকত কি কি কাজ করবার আছে খুঁজে দেখে নিয়ে তাতে লেগে যাওয়া, যে যত খাটতো তার তত যেন ফুর্তি। শশী মহারাজই তাদের জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন। তিনি কাজের ভাগ করে দিতেন। যুবকেরাও তা আনন্দের সঙ্গে করতেন। নিবারণ নামে যুবকটি ঠাকুরের নামে নতুন নতুন গান বাঁধতো এবং মঠে এলে খোল করতালের সঙ্গে সঙ্গীদের নিয়ে কীর্তন করতো। শশী মহারাজও তাতে যোগ দিতেন।

সন্ন্যাসীদের যৎসামান্য কাপড়চোপড় দড়ির আলনায় ঝোলানো থাকতো। অন্য কোন বাক্স ছিল না। মঠে অনেকেই বহুসময় কৌপীনমাত্র পরতেন, বাইরে গেলে বহির্বাস। শীতের সময় কোন ভক্ত গরম চাদর দিতেন। ভাঁড়ারের চালডাল প্রভৃতি কয়েকটা মাটির জালায় ও হাঁড়ি কলসিতে উপর উপর সাজানো থাকতো। যা ২/১ টাকার রেজগি ও পয়সা থাকতো তা ঐ ঠাকুরের কাপড়ের পেটরার পায়ার নিচের দিকে মাটিতেই থাকতো, দরকার মতো নিয়ে বাজারাদি করা হতো, ওর কোন হিসাবপত্র লেখার হাঙ্গামা ছিল না। আমি যাবার আগে

---

১ কানাই পরবর্তী কালে স্বামী নির্ভয়ানন্দ। স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। নন্দ আলমবাজার মঠে যোগদান করেছিল। স্বামীজীর সময়ের পরে কোন সামান্য বিষয় নিয়ে মঠের উপর অভিমান করে বাড়ি ফিরে যায়; বিবাহাদি না করে ঠাকুরের নাম নিয়ে কাটাতো। যদিও তার বহু বৎসর পর পর্যন্ত জীবিত ছিল। অনেকের উপরোধ সত্ত্বেও আর কখনো মঠে আসেনি।

২ চন্দ্র (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়) লাটু মহারাজের সঙ্গ বেশি করেছে এবং 'লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা' বইখানি বের করেছে (১৯৪০ সাল)।

কৃষ্ণলাল—স্বামী ধীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য।

নিবারণ দত্তের গানের প্রতিভা ছিল। গায়ক।

একবার নাকি কোন যুবক ব্রহ্মচারিভাবে কিছুদিন মঠে থেকে ঐ কয়েক গণ্ডা পয়সাই নিয়ে উধাও হয়েছিল! ঠাকুরের দুইবার জলখাবার ও দুইবার ভোগ দেবার সময় দিনে ৮টি পান সাজা হতো। চায়ের চলন ছিল না—তবে ম্যালেরিয়ায় বা সর্দিতে কেউ ভুগলে খেতেন। উহা পরে আলমবাজার মঠের সময় থেকে হয়।

নির্জনে সাধনভজন, জপধ্যান করে ভগবান লাভ করা সকলের আদর্শ ছিল এবং তাই তারা মঠে বা তীর্থাদি স্থানে কঠোর ভাবে থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করতেন। শশী মহারাজ ছিলেন এর ব্যতিক্রম। মঠে ঠাকুর ও তাঁর ছেলেদের ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া তাঁর পক্ষে ছিল অসহনীয়। তাঁর বার বছরের থাকাকালে কয়েক ঘণ্টার জন্যও তিনি কলকাতা যাননি। একবার মাত্র কোন কারণে কাউকে না বলে চলে গিয়েছিলেন। এঘটনায় তাঁর গুরুভাইদের মনে খুবই তোলপাড় হয়েছিল। তাঁরা তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁরা তাঁকে পরের দিনই দক্ষিণেশ্বরে পেয়েছিলেন এবং তাঁকে মঠে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আর একবারমাত্র তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন স্বামীজীর অভ্যর্থনা সভায়। যখন স্বামীজী শীলদের বাগানে ছিলেন, তখন শশী মহারাজ প্রত্যেকদিন যখন-তখন যেতেন। কয়েকঘণ্টা স্বামীজীর পুণ্যসঙ্গ করে মঠে ফিরে আসতেন।

মঠের সকলেই প্রাতে, স্নানের পর ও সন্ধ্যার সময় ছাড়াও রাত্রে গুপ্তভাবে বিছানায় বসে ধ্যানজপ করতেন। কেউ কেউ নিত্য ভাষ্যাদিসহ নিজে শাস্ত্রপাঠ করতেন, কোন বিশেষ স্থান নিয়ে তর্ক আলোচনাদিও চলতো। কেউ কেউ আবার বরানগর শ্মশানে সারারাত ধ্যান করতেন।

শ্মশানের পাশে একটা বেল গাছে ৪, ৫ এমনকি ৬/৭ পাতাযুক্ত বিল্বপত্র পাওয়া যেত। ওর প্রত্যেকটি পাতার বাহুল্য অনুসারে ১০০, ১০০০, ১লক্ষ বিল্বপত্র দানের সমতুল্য বলে খুঁজে খুঁজে উঠিয়ে নিয়ে আসতুম, তাতে শশী মহারাজ ভারী খুশি হতেন। ঐরূপ পাতা নিবেদন করে পরদিন আবার ধুয়ে পূজায় লাগাতে পারা যায় বলে সেইরূপ করা হতো।

স্বামীজীর আমেরিকা হতে ফেরার সময় মঠ আলমবাজারে ছিল। আমি কয়েকবছর বৃন্দাবনে বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে তপস্যা করছিলাম। স্বামীজী মঠে আসবার কয়েকদিন পরেই বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে আলমবাজারে পৌঁছেছিলাম। তখনও দেখি শশী মহারাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে ঠাকুরের পূজা ও সাধুদের সেবা করছেন। কেউ তাঁকে একাজ করতে বলেননি—নিজে

থেকেই সব করতেন। তিনি সর্বদাই ভাবে থাকতেন। ঠাকুরের পূজার সময় দেখেছি শশী মহারাজের অপূর্ব আকুলতা ও মগ্নতা। যাঁরা দেখেননি, তাঁদের কাছে ছিল অকল্পনীয়। ঠাকুরসেবায় তিনি বিন্দুমাত্র কোনপ্রকার দেরি বা ঢিলেমি সহ্য করতে পারতেন না। প্রত্যেকটি কাজ চটপটে ও ভালোভাবে হবে। এটি তিনি চাইতেন। কিন্তু আমি একটু নিড়বিড়ে ছিলুম। ঠাকুর ভাঁড়ারের সব কাজ যথাসাধ্য সাবধানে করতুম। কিন্তু তবুও এমন একটি দিনও যেত না যেদিন তাঁর ধমকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আড়াল করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বা কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে কাজ না করে গেছি। তবে শশী মহারাজ ধমকাতেও যেমন ছিলেন ভালোবাসাতেও তেমন। ঠাকুরের প্রসাদ বেরুলে 'খা' বলে সন্দেশ আমার মুখে গুঁজে দিতেন এবং অন্য হাতে আমার মুখে বা গায়ে হাত বুলাতেন।

স্বামীজী তখন আলমবাজার মঠে থাকতেন। সকাল ৮টা ৯টা আন্দাজ হলঘরে বা ভিতরদিকের বারান্দায় গীতা, উপনিষদ বা প্রশ্নোত্তরের ক্লাস করতেন। ব্রহ্মচারী ও সাধুরা উপস্থিত থাকতেন। স্বামীজীর গুরুভাইরাও ক্লাসে বসতেন ও শুনতেন। আমি বেশিরভাগ দিন উপস্থিত থাকতে পারতুম না। কারণ, ঠাকুর ঘরের কাজ শেষ হতো না। স্বামীজী তা লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন ক্লাসের সময় তিনি আমার খোঁজ করলেন। কালীকৃষ্ণ কোথায়? কেন সে আসে না? তাকে ডেকে আনগে। একজন এসে আমায় খবর দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে গেলুম। আমাকে দেখেই রেগে গেলেন। রাগতস্বরে বললেন ঃ "তুই আসিস না কেন? কি করছিলি? ঠাকুরের জন্য ভিজে ছোলার বোঁটা একটি একটি করে কাটছিলি বুঝি? ডাক শশীকে।" শশী মহারাজ এলে স্বামীজী উত্তেজিত ভাবে তাঁকে বললেন, "কিহে শশী, এসব ছেলেরা বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে তোমার ঠাকুরের ছোলার বোঁটা কাটবার জন্য এখানে এসেছে নাকি? ওসব চলবে টলবে না, জপধ্যান পাঠ সকলকে সময়ে করতে হবে। শুনতে পাচ্ছ?" ওঃ, স্বামীজীর কি বকুনি! সাংঘাতিক! থামতেই চায় না। শশী মহারাজ ঘাড় হেঁট করে চুপ করে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। একটি কথাও বললেন না। সেই থেকে তিনি আমার কাজ নিজেই অনেকটা করে নিতেন যাতে আমি সময়ে ক্লাসে যেতে পারি। আমিও আমার কাজগুলি যথাশীঘ্র সেরে নেবার চেষ্টা করতুম।

সময় বয়ে যায়। দিন চলে যায়। স্বামীজী শশী মহারাজকে মাদ্রাজে পাঠাবার

চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন তিনি তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, "শশী আমি আমার মাদ্রাজের বন্ধুদের কথা দিয়েছি যে আমি আমার একজন গুরুভাইকে ওখানে পাঠাব। আমি তোকে ঠিক করেছি। তোমাকে মাদ্রাজে যেতে হবে। আর সেখানে ঠাকুরের একটি মঠ তৈরি করতে হবে।" শশী মহারাজ কিছু বললেন না, কোন আপত্তি করলেন না। কি প্রচণ্ড তাঁর আনুগত্য! দীর্ঘ বার বছর ধরে তিনি ঠাকুরের সেবাকে অনির্বাণ দীপের মতো প্রজ্বলিত রেখেছিলেন। অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুর সেবা করেছিলেন। কোন তীর্থ বা প্রব্রজ্যাতেও যাননি যাতে তাঁর প্রিয়তম ঠাকুরের সেবায় কোন বিঘ্ন ঘটে। কি তাঁর অপূর্ব গুরুনিষ্ঠা! ঠাকুরের সেবা ছাড়া তিনি অন্য কিছু জানতেন না। তিনি স্বামীজীর অনুরোধকে ঠাকুরের আদেশ বলে মনে করেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন ও মাদ্রাজ যাবার প্রস্তুতি নিলেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অতুলনীয়। তাঁর কাছে ছিল স্বামীজীর ও ঠাকুরের আদেশ এক। এজন্যই তিনি স্বামীজীর আদেশকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তিনি স্বামীজীর আদেশের প্রতি গভীর আনুগত্য দেখিয়েছিলেন।

শশী মহারাজকে আমি শেষ দেখি ১৯০৪-১৯০৫ সালের মধ্যে। তিনি একবার মাদ্রাজ থেকে বেলুড় মঠে এসেছিলেন। বরানগরে যেমন তিনি আমাকে ভালোবাসতেন, ঠিক সেই একই ভালোবাসা তখন আমি পেয়েছিলাম। তাঁর শরীর যাবার আগে তিনি চিকিৎসার জন্য আর একবার মঠে এসেছিলেন। বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে ছিলেন। আমি তখন হিমালয়ে মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রমের দায়িত্বে ছিলাম। সেজন্য আমি তাঁকে দেখতে যেতে পারিনি। তাঁকে শেষবারের মতো দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদিও আমারও খুবই ইচ্ছা ছিল তাঁকে দেখবার। তাঁর চরিত্রের মাধুর্যের কথা বলব। আমি যখন 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদক ছিলাম, তখন শশী মহারাজ মাদ্রাজ থেকে তাঁর বক্তৃতার নোট পাঠাতেন পত্রিকাতে ছাপাবার জন্য। আমাকে সম্পাদনার পুরো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমি তাঁর প্রবন্ধের যা সম্পাদনা করতাম, তিনি আনন্দে তাতে সম্মতি দিতেন।

আমার মনের মণিকোঠায় আরও সব মধুর স্মৃতি আছে। এখনো সেগুলি আমার কাছে জীবন্ত। কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত ব্যক্তিগত—প্রকাশ করা উচিত হবে না। সেগুলি আমার মনে নীরব থাকাই ভালো। শশী মহারাজ কিভাবে আমার জীবনকে গঠন করেছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর অকৃত্রিম

থেকেই সব করতেন। তিনি সর্বদাই ভাবে থাকতেন। ঠাকুরের পূজার সময় দেখেছি শশী মহারাজের অপূর্ব আকুলতা ও মগ্নতা। যাঁরা দেখেননি, তাঁদের কাছে ছিল অকল্পনীয়। ঠাকুরসেবায় তিনি বিন্দুমাত্র কোনপ্রকার দেরি বা ঢিলেমি সহ্য করতে পারতেন না। প্রত্যেকটি কাজ চটপটে ও ভালোভাবে হবে। এটি তিনি চাইতেন। কিন্তু আমি একটু নিড়বিড়ে ছিলুম। ঠাকুর ভাঁড়ারের সব কাজ যথাসাধ্য সাবধানে করতুম। কিন্তু তবুও এমন একটি দিনও যেত না যেদিন তাঁর ধমকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আড়াল করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বা কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে কাজ না করে গেছি। তবে শশী মহারাজ ধমকাতেও যেমন ছিলেন ভালোবাসাতেও তেমন। ঠাকুরের প্রসাদ বেরুলে 'খা' বলে সন্দেশ আমার মুখে গুঁজে দিতেন এবং অন্য হাতে আমার মুখে বা গায়ে হাত বুলাতেন।

স্বামীজী তখন আলমবাজার মঠে থাকতেন। সকাল ৮টা ৯টা আন্দাজ হলঘরে বা ভিতরদিকের বারান্দায় গীতা, উপনিষদ বা প্রশ্নোত্তরের ক্লাস করতেন। ব্রহ্মচারী ও সাধুরা উপস্থিত থাকতেন। স্বামীজীর গুরুভাইরাও ক্লাসে বসতেন ও শুনতেন। আমি বেশিরভাগ দিন উপস্থিত থাকতে পারতুম না। কারণ, ঠাকুর ঘরের কাজ শেষ হতো না। স্বামীজী তা লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন ক্লাসের সময় তিনি আমার খোঁজ করলেন। কালীকৃষ্ণ কোথায়? কেন সে আসে না? তাকে ডেকে আনগে। একজন এসে আমায় খবর দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে গেলুম। আমাকে দেখেই রেগে গেলেন। রাগতস্বরে বললেন ঃ "তুই আসিস না কেন? কি করছিলি? ঠাকুরের জন্য ভিজে ছোলার বোঁটা একটি একটি করে কাটছিলি বুঝি? ডাক শশীকে।" শশী মহারাজ এলে স্বামীজী উত্তেজিত ভাবে তাঁকে বললেন, "কিহে শশী, এসব ছেলেরা বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে তোমার ঠাকুরের ছোলার বোঁটা কাটবার জন্য এখানে এসেছে নাকি? ওসব চলবে টলবে না, জপধ্যান পাঠ সকলকে সময়ে করতে হবে। শুনতে পাচ্ছ?" ওঃ, স্বামীজীর কি বকুনি! সাংঘাতিক! থামতেই চায় না। শশী মহারাজ ঘাড় হেঁট করে চুপ করে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। একটি কথাও বললেন না। সেই থেকে তিনি আমার কাজ নিজেই অনেকটা করে নিতেন যাতে আমি সময়ে ক্লাসে যেতে পারি। আমিও আমার কাজগুলি যথাশীঘ্র সেরে নেবার চেষ্টা করতুম।

সময় বয়ে যায়। দিন চলে যায়। স্বামীজী শশী মহারাজকে মাদ্রাজে পাঠাবার

চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন তিনি তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, "শশী আমি আমার মাদ্রাজের বন্ধুদের কথা দিয়েছি যে আমি আমার একজন গুরুভাইকে ওখানে পাঠাব। আমি তোকে ঠিক করেছি। তোমাকে মাদ্রাজে যেতে হবে। আর সেখানে ঠাকুরের একটি মঠ তৈরি করতে হবে।" শশী মহারাজ কিছু বললেন না, কোন আপত্তি করলেন না। কি প্রচণ্ড তাঁর আনুগত্য! দীর্ঘ বার বছর ধরে তিনি ঠাকুরের সেবাকে অনির্বাণ দীপের মতো প্রজ্বলিত রেখেছিলেন। অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুর সেবা করেছিলেন। কোন তীর্থ বা ভ্রমণেও যাননি যাতে তাঁর প্রিয়তম ঠাকুরের সেবায় কোন বিঘ্ন ঘটে। কি তাঁর অপূর্ব গুরুনিষ্ঠা! ঠাকুরের সেবা ছাড়া তিনি অন্য কিছু জানতেন না। তিনি স্বামীজীর অনুরোধকে ঠাকুরের আদেশ বলে মনে করেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন ও মাদ্রাজ যাবার প্রস্তুতি নিলেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অতুলনীয়। তাঁর কাছে ছিল স্বামীজীর ও ঠাকুরের আদেশ এক। এজন্যই তিনি স্বামীজীর আদেশকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তিনি স্বামীজীর আদেশের প্রতি গভীর আনুগত্য দেখিয়েছিলেন।

শশী মহারাজকে আমি শেষ দেখি ১৯০৪-১৯০৫ সালের মধ্যে। তিনি একবার মাদ্রাজ থেকে বেলুড় মঠে এসেছিলেন। বরানগরে যেমন তিনি আমাকে ভালোবাসতেন, ঠিক সেই একই ভালোবাসা তখন আমি পেয়েছিলাম। তাঁর শরীর যাবার আগে তিনি চিকিৎসার জন্য আর একবার মঠে এসেছিলেন। বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে ছিলেন। আমি তখন হিমালয়ে মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রমের দায়িত্বে ছিলাম। সেজন্য আমি তাঁকে দেখতে যেতে পারিনি। তাঁকে শেষবারের মতো দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদিও আমারও খুবই ইচ্ছা ছিল তাঁকে দেখবার। তাঁর চরিত্রের মাধুর্যের কথা বলব। আমি যখন 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদক ছিলাম, তখন শশী মহারাজ মাদ্রাজ থেকে তাঁর বক্তৃতার নোট পাঠাতেন পত্রিকাতে ছাপাবার জন্য। আমাকে সম্পাদনার পুরো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমি তাঁর প্রবন্ধের যা সম্পাদনা করতাম, তিনি আনন্দে তাতে সম্মতি দিতেন।

আমার মনের মণিকোঠায় আরও সব মধুর স্মৃতি আছে। এখনো সেগুলি আমার কাছে জীবন্ত। কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত ব্যক্তিগত—প্রকাশ করা উচিত হবে না। সেগুলি আমার মনে নীরব থাকাই ভালো। শশী মহারাজ কিভাবে আমার জীবনকে গঠন করেছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর অকৃত্রিম

ভালোবাসা ও স্নেহছায়ায় আমার প্রথম আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে উঠেছিল বলে আজ আমি এতদূর এসেছি। কে জানে আমার জীবন অন্য খাতে বইত যদি না শশী মহারাজের অধীনে আমার জীবন গঠিত হতো।

[*The Vedanta Kesari, July 1952, p. 133-143*
অনুবাদক ঃ স্বামী বিমলাত্মানন্দ, অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ,
উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৮৯, পৃঃ ২২-২৪, ৩০-৩৯, ৮৬]

[স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ (১৮৭৩-১৯৫১) ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সেবা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট মহারাজ (১৯৩৮-১৯৫১)। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট (১৯০৬-১৯১৩) এবং ইংরেজি মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সুবৃহৎ ইংরেজি জীবনী (চার খণ্ডে) তাঁরই সম্পাদনায় মায়াবতী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামীজীর রচনাবলী ইংরেজিতেও তাঁরই উদ্যমে ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। শ্যামলাতাল বিবেকানন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। (১৯১৫) তাঁর রচিত 'পরমার্থ প্রসঙ্গ' অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার সমাধানমূলক পুস্তক।]

রামকৃষ্ণানন্দ প্রসঙ্গ

স্বামী সচ্চিদানন্দ

(আলমবাজার মঠে থাকাকালীন)

স্বামীজী প্রথমবার আমেরিকা হইতে আসিবার পূর্বে আমি শশী মহারাজের সহিত প্রায় দেড়-দুই বৎসর থাকিয়া তাঁহাকে যেভাবে দেখিয়াছি এবং তাঁহার সম্বন্ধে আমার যতদূর মনে আছে যথাসাধ্য লিখিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূল শরীর ত্যাগের পূর্বে যেভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন পরেও সেইভাবেই বরাবর তাঁহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। সকালবেলা ঘর পরিষ্কার করিবার সময়ে আমার সহিত তাঁহার একবার বচসা হয়। তাঁহার বিরক্তির কারণ আমি বুঝিতে না পারায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ও তিনি বলিয়াছিলেন, "ঘর ঝাড়ু দিবার সময় জল ছিটাইয়া না লইলে ধূলা ঠাকুরের শরীরে লাগিয়া যায়।" একদিন তিনি আমাকে মুখ ধুইবার দাঁতন থেঁতো করিয়া দিতে বলেন। আমি থেঁতো করিয়া দিলে তিনি তাহা হাতে লইয়া আমাকে ফেরত দেন এবং বলেন, "দাঁতন খুব নরম হওয়া চাই, তাহা না হইলে তাঁহার মাড়িতে লাগিবে।" আর একদিন আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার বাসন মাজিতেছিলাম, তাহাতে বাসনে বাসনে লাগিয়া শব্দ হইতে ছিল। তিনি তাহা শুনিতে পাইয়া আমাকে বলিলেন, "ঠাকুরের ঘরের সম্মুখে ওরূপ শব্দ যেন না হয়। ওসব শব্দ তিনি পছন্দ করিতেন না।" তাঁহার ঠাকুর সেবার প্রতি এতটা আগ্রহ ছিল যে যদি কখনও কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হইত তাহা হইলে উন্মাদের মতো হইয়া যাইতেন এবং আমার দেখিয়া মনে হইত যেন তিনি হৃদয়ে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেছেন। একদিন আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পান তৈয়ারি করিবার ভার দিলেন। সে পান তিনি খাইয়া বলিলেন, "পানে চুন বেশি হইয়াছে।" তাহার পরও আমি কয়েকদিন পান তৈয়ারি করিলাম বটে, কিন্তু তিনি বলিলেন "তোমার পান তৈয়ারি করা উচিত নহে।" তখন অভেদানন্দ স্বামীকে আমি পান বলাতে তিনি বলিলেন, "আমি তৈয়ারি করিয়া দিব।" তাহাতেও চুন বেশি হওয়াতে তিনি বলিলেন, "তুমি বাহিরের পান তৈয়ার করিবে।" মাস দুই তিন আমার দ্বারা অনেকগুলি করিয়া বাহিরের পান তৈয়ারি করাইয়া একদিন বলিলেন, "এখন হইতে তুমি ঠাকুরের পান তৈয়ারি করিবে।" সেই দিন

ঠাকুরের একটি প্রসাদী ফুলের মালা দিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি এইটি ধারণ কর।" ঠাকুরকে শয়ন করাইবার সময় হাওয়া করিয়া মশারি খাটাইবার ভার আমার উপর দিয়াছিলেন। একদিন আমি ঠাকুরকে হাওয়া করিয়া শয়ন দিয়া মশারি ফেলিয়া খাইতে গিয়াছি, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মশারি ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছ?" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ মহারাজ, ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি।" তাহার পর হইতে আমাকে আর মশারি ফেলিতে দেন নাই। না দেওয়ার কারণ আমার এই মনে হইয়াছিল যে তিনি যতটা সময় হাওয়া করিতেন আমি সে তুলনায় কম হাওয়া করিয়াছিলাম বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। আর একদিন সকালে ঠাকুরের হালুয়া তৈয়ারি করিতে গিয়াছিলেন। যাইয়া দেখিলেন কড়া অপরিষ্কার। কড়াতে লাটু মহারাজ লঙ্কা ফোড়ন দিয়া ছোলা সিদ্ধ খাইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া লাটু মহারাজকে বাপান্ত করেন। তখন লাটু মহারাজ তাঁহার কাছে আসিয়া বলেন, "শশী, আমি শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরানীকে চিঠি লিখি, তোর মা-বাপ আর আমার মা-বাপ কি আলাদা?" তখন তাঁহার (শশী মহারাজের) এতদূর কষ্ট হইয়াছিল যে সাম্যাবস্থা লাভ করিতে কয়েকদিন সময় লাগিয়াছিল। তাহার কারণ আমি বুঝিলাম ঠাকুরের বাল্যভোগের বিলম্ব হওয়ায় সেবাপরাধ হইয়াছে। তিনি দৃষ্টি দোষও মানিতেন। আমাকে বলিয়াছিলেন যাহারা লোভী তাহাদিগকে ঠাকুরের ভোগের জিনিস দেখাইবে না; বিশেষ করিয়া দুই একজনের নামও আমাকে বলিয়াছিলেন। রোজ সকালে তিনি ফুল তুলিতে যাইতেন এবং আমাকেও রাত্রি থাকিতে সঙ্গে যাইতে হইত। ফুল তুলিয়া আনিয়া ফুলের সাজি রাখিয়া ঠাকুরের ঘরের কাছে আসিয়া জোড় হস্তে বলিতেন, "ঠাকুর একটু জমি করিয়া দাও। ফুল গাছ করিয়া তোমার পূজা করি।" একদিন ফুল তুলিয়া আসিয়া দেখিলেন ফুল কম হইয়াছে, তজ্জন্য আমার উপর এত উগ্র ব্যবহার করিলেন যে আমাকে প্রায় মারিতে উঠিলেন। আমি সরিয়া যাওয়াতে তিনি নিজের মুখ নিজেই চড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে মুখ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। পরে তাঁহার এত কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হইল যে ওরূপ কষ্ট আর কখনও দেখি নাই। আর একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি দক্ষিণেশ্বরের বাগান হইতে যুঁইফুল তুলিয়া আনিবে। তাহা দিয়া ঠাকুরের গোড়ে মালা করিয়া দিব। আমি কয়েকদিন আনিবার পর মালিরা আমাকে ফুল তুলিতে নিষেধ করিল। নিষেধ সত্ত্বেও আমি দুই-একদিন ফুল তুলিয়া আনিলাম। এবং তাঁহাকে বলিলাম, মালিরা ফুল দিতে নারাজ। তাহারা আমাকে ফুলও তুলিতে নিষেধ করে। আমি আর

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে ফুল তুলিতে যাইব না, তিনি তখন মহেন্দ্র মাস্টারকে দিয়া বলিতে বলেন যাহাতে ফুল তুলিতে আসিলে যেন কোনরূপ আপত্তি না করা, খাজাঞ্চি মালিদের সেইরূপ অনুমতি করিয়া দেয়। তাহার বলা সত্ত্বেও আমি আর কখনও সেখানে যাই নাই। তাহার পর হইতে তিনি নিজেই যাইতেন এবং খাজাঞ্চি মালিদিগকে বলিয়া দেওয়াতে আমরা নির্বিঘ্নে ফুল তুলিয়া আনিতাম। আর একটি বাগান হইতে আমি রাত্রি থাকিতে ফটক পার হইয়া ফুল তুলিয়া আনিতাম। মালি টের পাওয়াতে আমাকে আর ফুল আনিতে দিত না। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "উড়ে মালি আর আমাকে ফুল তুলিতে দেয় না।" তাহাতে তিনি বাবুরাম মহারাজকে বলেন, "ভাই, তুমি কোনরকমে বাগানের উড়ে মালিকে গিয়া রাজি করাও।" বাবুরাম মহারাজ মালিকে একখানা নূতন কাপড় দিয়া রাজি করাইয়া আমাকে বলেন, "যাও ফুল লইয়া আইস"। আমি কয়েকমাস ফুল আনিবার পর সে মালি দেশে চলিয়া যায়। নূতন মালি আসিয়া আবার ফুল তুলিতে দেয় না। তখন যোগীন-স্বামী ও অন্যান্য সকলে বলিলেন, "ফুল কিনিয়া পূজা হইবে।" তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন না, তখন আবার অন্য বাগান খুঁজিতে হইল এবং এভাবে যাহা পাওয়া যাইত তাহার দ্বারাই তিনি পূজা করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বটুয়ার মশলা উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া বাছিয়া রাখা হইত। তিনি জোয়ান ধুইয়া একটি একটি করিয়া বাছিয়া রাখিতেন। যাহাতে কাঁকর না থাকে ইহা তিনি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতেন এবং আমি যেন তাড়াতাড়ি না করি তাহাও দেখিতেন।

আমি যে ঘরে যেখানে শুইতাম তাহার পাশের দেওয়ালে একটা বড় মাকড়সা ডিম বুকে করিয়া থাকিত। আমি তখন জীবহিংসা করিতে অসম্মত ছিলাম। মাকড়সার ডিম ফুটিয়া ক্রমাগত দেওয়াল ভর্তি হইয়া যাইতেছে তাহা আমি দেখিতাম। এমন সময়ে একদিন শরৎ মহারাজ ঘরে আসিয়া সেইটি দেখিয়া আমাকে বলিলেন, "শশী যদি আসিয়া দেখে তবে তোমাকে মজা দেখাইয়া দিবে।" আমি সে বিষয়ে কোন কথাই বলিলাম না। তাহার পর অন্য কেহ আসিয়া আমার অজ্ঞাতে সে সব মারিয়া ফেলে। তাহার দু-একদিন পরে চৌকাঠ হইতে বিছার ছানা আনিয়া শশী মহারাজ আমার সামনে মারিতে থাকেন, সঙ্গে শিবানন্দ স্বামীও ছিলেন। ঠাকুর ঘরের পাশেই আমার ঘর ছিল। কাজেই বাচ্চা ক্রমান্বয়ে ঠাকুরের ঘরে যাইয়া তাঁহার অশান্তি উৎপাদন করিবে এই জন্যই শরৎ মহারাজ আমাকে উপরিউক্ত কথাগুলি বলিয়া ছিলেন। তাহার পর হইতে শনিবার ও মঙ্গলবার শশী মহারাজ বাজার হইতে কই মাছ আনিয়া

আমাকে কাটিতে বলিতেন আর নিজে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেন আমি কি করি। আমার বিশেষ কষ্ট হইত। তখন তিনি বলিতেন, "কেমন জীব হিংসা করিবে না?" আমি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম।

আলমবাজার মঠে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্য টাটকা গঙ্গাজলে স্নান করাইতেন। ইহা দেখিয়া আমি বলিয়াছিলাম, 'ইহাতে গঙ্গার উপর আমার অবিশ্বাস আসে।" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'টাটকা জল দ্বারাই স্নান করান চাই। তোমার যদি অসুবিধা হয় আমি স্নান করিবার সময় লইয়া আসিব, তোমাকে আনিতে হইবে না।"

ঠাকুরের ব্যবহারের জিনিস সব একটি টিনের ভাঙা পেটরাতে থাকিত। তাহার ভিতর ইন্দুর ঢুকিয়া বাহ্যে প্রস্রাব করিয়া সমস্ত জিনিস পত্রে দাগ লাগাইয়া দিয়াছিল। একদিন আমার কয়েকটি মার্বেল পাথরের বাটির দরকার হইয়াছিল। কোন বিশেষ দিনেতেই সেগুলি ব্যবহার হইত। আমি তাঁহাকে বলাতে তিনি বলিলেন, "এই পেটরা হইতে বাহির করিয়া ধুইয়া তাঁহার জন্য তরকারি প্রভৃতি দিও।" আমি পেটরা খুলিয়া দেখি সমস্ত বাটি ও থালাতে দাগ লাগিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে বলায় তিনি মহা দুঃখিত হইয়া নিকটবর্তী কোন দোকানে যাইয়া ভাঙা টিন দিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে এরূপ একটি বাক্স তৈয়ারি করাইয়া সেইদিনই সমস্ত জিনিসপত্র তাহাতে পুরিয়া তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখেন।

তাহার দুই-তিন দিন পরে আমাকে বলিলেন, "তুমি এই সমস্ত রক্ষার ভার লও।" তাহাতে আমি বলিলাম, "আমার কোন ঠিকানা নাই, কোথায় থাকি, কোথায় যাই। কাজেই আমি এ সমস্ত ভার লইতে পারিব না।" আমি যতদিন তাঁহার সঙ্গে ছিলাম, সেবার কাজ ছাড়িয়া কখনও তাঁহাকে কলকাতায় রাত্রিবাস করিতে দেখি নাই।

প্রত্যহ ঠাকুরের বাল্যভোগ ও জলখাবার কিনিয়া আনা হইত। আমাকে বলিতেন যে, "সন্দেশ না চাখিয়া আনিও না কারণ বাসি ছানার সন্দেশ টক হয়। এ বিষয়ে কখনও ভুল না হয়। বাজার হইতে যেসব তরকারি চাল, ডাল ইত্যাদি ভালো তাহাই লইয়া আসিবে। তাহাতে মূল্য বেশি দিতে হয় সেও ভালো।" বাছিয়া বাছিয়া ভালো জিনিস কিনিয়া আনাতে আলমবাজারের লোকেরা বলিত, "এ সাধুদের জ্বালায় বাজারে ভালো জিনিস পাইবার উপায় নাই। পাহাড় জঙ্গল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোধ হয় ইহারা কোথায় অনেক টাকা পাইয়াছে। তাহা দিয়া সেরা সেরা জিনিস কিনিয়া খায়।"

আমি একবার মাহেশের রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে নৌকায় আসিতে অনেক রাত্রি হয়, সেজন্য আমায় এত ভর্ৎসনা করেন যে আমার বিশেষ কষ্ট হয়। ভর্ৎসনার কারণ বুঝিলাম আমি ঠাকুর সেবার কাজ ফেলিয়া রথ দেখিতে গিয়াছিলাম।

একদিন রাত্রিতে শীতকালে শশী মহারাজের কিছুতেই নিদ্রা হইতেছিল না। তাঁহার অত্যন্ত শীত করিতেছিল। তখন তাঁহার মনে হইল বোধ হয় ঠাকুরের শয়নের সময় তাঁহার গায়ে লেপ দেওয়া হয় নাই, ভুল হইয়াছে। তখনই ঠাকুরঘর খুলিয়া দেখেন, ঠাকুরের শীতবস্ত্র দেওয়া হয় নাই। তখন ঠাকুরের গায়ে লেপ দিয়া নিজে শীত মুক্ত হন এবং নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে পারেন।

আর একদিন দুপুরবেলা দোতলার বাহিরের বৈঠকখানায় খাওয়া-দাওয়ার পরে মহাভারতের 'মোক্ষপর্বাধ্যায়' পাঠ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে সকলে জোরে জোরে কথা কহিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে আমি বলিলাম, "ঠাকুরের শয়নের সময়ে গোলমাল করা ভালো নহে।" তখন তিনি বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছিস।" সেই দিন হইতে আর ঐ সময়ে ওখানে কাহাকেও কোনো গোলমাল করিতে দিতেন না।

মাদ্রাজ মঠে থাকাকালীন

স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা হইতে আসিবার সময় আমি মায়াবতী ছিলাম। পরে স্বামীজী মায়াবতী গিয়া ফিরিয়া আসিবার পরে আমার শরীর খারাপ হওয়াতে আমিও পাহাড় হইতে নামিয়া কনখলে আসি। তাহার পর মনে হইল এখন মঠে যাইলে দ্বারকা রামেশ্বর প্রভৃতি দর্শন হইবে না। সুতরাং ঐ সকল তীর্থগুলি দর্শন করিয়া পরে কলকাতায় গিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হইব। এই সময় মাদ্রাজে শ্রীযুত শশী মহারাজের সঙ্গে আমায় পাঁচ-ছয় মাস থাকিতে হয়। কারণ সে সময় রামেশ্বর যাইবার রেলপথটি তৈয়ারি হইতে ছিল, চালু হয় নাই। কাজেই গাড়ি না চলা পর্যন্ত আমাকে মাদ্রাজে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার মধ্যে যে সকল ভাব আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা যতদূর আমার মনে আছে লিখিতে চেষ্টা করিলাম। ১৯০২ সালের মে অথবা জুনে আমি মাদ্রাজে পৌঁছাই। এই সময় শশী মহারাজ ঐ প্রদেশেই কোথায় গিয়েছিলেন, আমার যাইবার কয়েকদিন পরেই ফিরিয়া আসেন। বসন্ত (পরমানন্দ) ও আর একটি ব্রহ্মচারী সেই সময়ে মাদ্রাজ মঠে ছিল। শশী মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি

দুধ খাও তো?" আমি বলিলাম, "পাইলে খাই না পাইলে খাই না।" তখন তিনি আমার জন্য এক পোয়া করিয়া নিত্য দুধের ব্যবস্থা করেন, সেখানে গিয়া দেখিলাম কলকাতায় অবস্থান কালে তিনি যেমন দিবারাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবামাত্র লইয়া তন্ময় হইয়াই থাকিতেন এখানে সেরূপ নহে। এখানে ক্লাসাদি ও পাঠাদিতেই অধিক ব্যস্ত থাকিতেন। তবে কলকাতার মতো এখানেও বেশি বেশি ফুল দিয়া পূজা করিতে ভালোবাসিতেন। তজ্জন্য আমাকে ভোর রাত্রে উঠিয়া কোন কোন বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে হইত। এই সময় স্বয়ং পাক করিয়া পূজাতে ঠাকুরের ভোগ দিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নের পর প্রসাদ পাইয়া ক্লাস করিতে যাইতেন। কখনও কখনও আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তরকারিও নিজেই কুটিতেন। এই সময় গীতা ও উপনিষদের ক্লাস হইত। ক্লাস করিয়া ফিরিবার সময় ঐ শহরের হালুইকরের দোকান হইতে ক্ষীরের পেঁড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কিনিয়া আনিতেন; তাহাই ঠাকুরের ভোগ দিতেন—অন্য মিষ্টি দিতেন না। তখন আর অত বাছাবাছি করিতেন না। কিন্তু দৃষ্টি দোষটা পূর্বাপেক্ষা বেশি মানিতেন বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল। যখন ঠাকুর ঘরে ভোগ লইয়া যাওয়া হইত, তখন যাহাতে কেহ না দেখিতে পায় সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতেন। এমনকি কাঁচা তরকারি কাটিবার সময়ে পাছে অপরে দেখিতে পায় এজন্য দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতেন। একদিন দরজা খুলিয়া তরকারি কাটিতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠেন। তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। রান্নাঘরের দিকে কেহ যাইতেই পারিত না। একদিন আমি স্নানাদি করিয়া ঠাকুর ঘরে যাই, ফিরিবার সময় ঠাকুরের দিকে পিছন করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা দেখিয়া তিনি এত রাগিয়া ছিলেন যে পারেন তো আমায় মারেন আর কি!

মাদ্রাজে তাঁহাকে অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এক সময় তিনি Upanishad Publisher (উপনিষদ প্রকাশক)-দিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাদের translation (অনুবাদ) করিয়া দিতেছি, তোমরা আমাকে কিছু কিছু করিয়া টাকা দিও। এই কথা শুনিয়া তাঁহারাই মঠের জন্য monthly subscription (মাসিক চাঁদা)-এর ব্যবস্থা করিয়া দেন। রামনাদের মহারাজা শশী মহারাজের খরচের জন্য টাকা দিতেন। কিন্তু সেই টাকা যাহারা শশী মহারাজকে লইয়া গিয়াছিল (আলাসিঙ্গা, জি.জি. প্রভৃতি) তাহারা কিছু অংশ খরচ করিয়া ফেলিত; বাকিটা তাহাকে দিত। অর্থাভাবে সময়ে সময়ে ঋণগ্রস্ত হইয়াও তাঁহাকে

মঠ চালাইতে হইয়াছিল। মাদ্রাজ মঠেও তিনি অতি গোপনে মহাষ্টমীর দিন ৺মহামায়ীকে মৎস্যাদি ভোগ দিতেন। সে প্রসাদ আমাকে দিয়াছিলেন অন্য কাহাকেও দেন নাই।

তাঁহার ভিতর প্রেমের ভাব খুব বেশি ছিল। তিনি ও আমি একঘরে এক তক্তপোশে শুইতাম। পরমানন্দ নিচে শুইতেন। এই দেখিয়া আর একখানি খাট জোগাড় করিয়া আনেন। কিন্তু মশারি একটি ব্যতীত ছিল না। তখন আর একটি মশারি সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সমস্ত মাদ্রাজ শহরে কোথাও মশারি পাওয়া গেল না। একটি দোকানে একখানি মাত্র মশারির কাপড় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেলাই করিবার লোক না পাওয়ায় তিনি নিজেই সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও তাঁহাকে ঐ কাজে সহায়তা করি।

রামেশ্বর হইতে ফিরিবার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাছে টাকা কড়ি আছে তো?" আমি বলিলাম, "যাহা ছিল রামেশ্বর যাইতে খরচ হইয়া গিয়াছে।" তখন তিনি বলিলেন "কলকাতা যাইবার ভাড়া তো চাই" আমি বলিলাম "তাহা ভিক্ষা করিয়া জোগাড় করিয়া লইব।" তাহাতে তিনি অসম্মত হন ও বলেন, "গাড়িভাড়া আমিই জোগাড় করিয়া দিব।"

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে একদিন রাত্রে শুইয়া আছি। কিছুক্ষণ পরে শশী মহারাজ আমাকে ডাকিলেন, "দীনবন্ধু, দীনবন্ধু"। আমি বলিলাম "কেন মহাশয় ডাকিতেছেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি দেখিলাম নরেন (স্বামীজী) আমার সামনে দাঁড়াইয়া আমায় বলিতেছে, 'দেখ শশী, আমি শরীরটাকে থুথু ফেলিবার মতো ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি।' " এই ব্যাপারে আমিও কিছু বুঝিলাম না, তিনিও কিছু বুঝিতে পারিলেন না। সেদিন রাত্রে কিন্তু আর ঘুম হইল না। মনটা আমার খারাপ হইয়া রহিল। পরদিন সন্ধ্যার পর আলাসিঙ্গা প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত একটি টেলিগ্রাম লইয়া উপস্থিত হইল। উহা বেলুড় মঠ হইতে গিয়াছিল। উহাতে স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির সংবাদ ছিল। ঐ সংবাদ পাইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। শশী মহারাজ আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "এসব তো হইয়াই থাকে"। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনারা ঠাকুরকে লইয়া অনেকটা ভোগ করিয়াছেন। আমরা তো ইঁহাকে লইয়াছিলাম। যাক শ্রীশ্রীঠাকুরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।"

ইহারই কিছুদিন পরে পঞ্জিকা দেখিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "আগামিকল্য দিন ভালো আছে, তুমি কি কলকাতায় রওনা হইবে?" আমি বলিলাম, "যে

আজ্ঞা মহাশয়।" তাহার পরদিন ভোরে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দিয়া আমার খাইবার জন্য একখানি ঠাঁই করিয়া আমাকে বলিলেন, "এদিকে এস।" আমি কাছে যাইলে আমার কপালে দই দিয়া একটি ফোঁটা দিলেন। তাহার পর ঠাকুর প্রণাম করিয়া আসিতে বলিলেন। আমি প্রণাম করিয়া আসিলে আমায় প্রসাদ পাইতে বলিলেন। আমি প্রসাদ পাইলাম। তিনি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দেখিয়া মনে হইল যেন মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইতেছেন। আমি তো অবাক। আমার খাওয়া শেষ হইবার পরে একখানা গাড়ি আনাইলেন। তাহাতে আমি ও তিনি উঠিয়া স্টেশনের দিকে চলিলাম। স্টেশনে গিয়া ইন্টার ক্লাসের একখানা টিকিট কিনিয়া ট্রেনের কাছে আসিলেন। পরে একখানি কম্পার্টমেন্টে উঠিয়া নিজের বস্ত্রাঞ্চলে স্থানটি পরিষ্কার করিলেন এবং খাবার যাহা কিছু লইয়া গিয়াছিলেন তাহা সেখানে রাখিয়া আমার বিছানা পাতিয়া দিলেন। টিকিটখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এস, গাড়িতে উঠ।" আমি গাড়িতে উঠিলাম। তিনি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার পরই গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, ইহা আমি দেখিতে পাইলাম। এরূপ বাৎসল্যভাব একমাত্র স্বামীজীর মধ্যেই দেখিয়াছিলাম।

(শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর-প্রসঙ্গ, স্বামী কমলেশ্বরানন্দ।
প্রথম প্রকাশ ঃ ফাল্গুন ১৩৮৪, পৃঃ ৪০-৫০)

স্মৃতির আলোকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী শুদ্ধানন্দ

সম্ভবত ১৮৯০ সাল থেকে আমি বরানগর মঠে যাতায়াত আরম্ভ করি। বরানগর মঠে স্বামী বিবেকানন্দ তখন গুরুভাইদের সাথে ছিলেন না, তিনি তখন নির্জনে তপস্যারত।

শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় বরানগরে ও পরে আলমবাজারে। ১৮৯৭ সালের মে মাসে আমি আলমবাজার মঠে যোগদান করি। কিন্তু ইতোমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে শশী মহারাজ মাদ্রাজে চলে গেছেন। তিনি মাদ্রাজে ১৪ বছর (১৮৯৭-১৯১১) থেকে দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনকে সংগঠিত এবং পরিচালিত করেছিলেন। কিন্তু ঐ সময়কালের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকবার কলকাতায় এসেছিলেন এবং আমার তাঁর সাথে বেলুড় মঠ অথবা কলকাতায় কয়েকবার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৯০১ সালে প্রথম বেলুড় মঠে এসেছিলেন। স্বামীজী তখন মঠে ছিলেন। তিনি বেলুড় মঠে দ্বিতীয়বার এসেছিলেন ১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামীজীর মহাসমাধির পর। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখনও আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন নি। যেহেতু আমি বেলুড় মঠে ভীষণ পেটের রোগে ভুগছিলাম, সেহেতু প্রবীণ সাধুদের উপদেশানুসারে কলকাতার পূর্বাশ্রমে এক সপ্তাহের জন্য ছিলাম। একদিন আমার আত্মীয়দের আমন্ত্রণে স্বামী তুরীয়ানন্দজী, ত্রিগুণাতীতানন্দজী, অদ্ভুতানন্দজী এবং সারদানন্দজীসহ সঙ্ঘের সকল সন্ন্যাসিগণ আহার গ্রহণ করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী সে সময় বেলুড় মঠে ছিলেন। কিন্তু বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি আমার পূর্বাশ্রমে আসেন নি। ১৯০৪ সালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কলকাতায় তৃতীয়বার আসেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী পরমানন্দ। ১৯০৬ সালে চতুর্থবার মঠে তার আগমন ঘটে। স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পঞ্চমবার মঠে তিনি আসেন যখন পূর্ণানন্দ মঠে যোগদান করার মনস্থ করেন। তখন আমি উড়িষ্যার কোঠারে ছিলাম। শ্রীশ্রীমাও সে সময় কোঠারে ছিলেন।

১৯১১ সালের জানুয়ারি মাসে শশী মহারাজের ব্যবস্থাপনায় আমি দক্ষিণ

ভারতের তীর্থক্ষেত্রগুলি দর্শন করে এপ্রিল মাসে মঠে ফিরি এবং জুলাই মাসে বারাণসীতে কর্মিরূপে প্রেরিত হই। এই সময়েই শশী মহারাজ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁকে কলকাতায় নব নির্মিত 'উদ্বোধন' বাড়িতে আনা হয়। সেখানেই আমি তাঁকে শেষ দর্শন করি।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার জাহাজে করে আমেরিকা যাত্রা করেন, সেই জাহাজ ১৮৯৯ সালের জুন মাসে মাদ্রাজ বন্দরে নোঙর করল। জাহাজ কর্তৃপক্ষের আদেশে স্বামীজী জাহাজ ছেড়ে বন্দরে যাবার অনুমতি পান নি। শশী মহারাজ এবং স্বামী নির্ভয়ানন্দ নৌকাযোগে স্বামীজীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

যে সকল সন্ন্যাসিবৃন্দ মাদ্রাজে তাঁর সাথে কাজ করেছেন বা সাক্ষাৎ করেছেন, এখন আমি তা বলার চেষ্টা করব। যে সন্ন্যাসীরা বা তাঁর সহকর্মীরা কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ্য ঃ

(ক) স্বামী নির্ভয়ানন্দ—মাদ্রাজে তাঁর প্রথম পর্বের কাজে এক বছর ছিলেন।

(খ) স্বামী সদানন্দ, (গ) স্বামী শঙ্করানন্দ, (ঘ) স্বামী পরমানন্দ—যিনি দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

(ঙ) স্বামী অচলানন্দ—এক বৎসর ছিলেন। (চ) স্বামী উমানন্দ (যোগীন) ছয় বৎসর কাল অবস্থান করেন। (ছ) স্বামী যোগেশ্বরানন্দ (সুরেশ, রামচন্দ্র দত্তের শিষ্য।)

(জ) স্বামী ধ্যানানন্দ (রুদ্র)—দীর্ঘকাল ছিলেন (ঝ) ব্রঃ প্রকাশ (স্বামী সারদানন্দের ভ্রাতা)—এক বছর ছিলেন।

(ঞ) স্বামী সচ্চিদানন্দ (বুড়ো বাবা)—ছয়মাস কাল ছিলেন।

(ট) স্বামী আত্মানন্দ, (ঠ) স্বামী বোধানন্দ, (ড) স্বামী বিমলানন্দ (ঢ) স্বামী শর্বানন্দ (ণ) ব্রঃ ব্রজেন (যিনি স্বামীজীর সেবকবৃন্দের একজন ছিলেন), (ত) ব্রঃ সুরেন্দ্র বিজয় এবং (থ) স্বামী সচ্চিদানন্দ (মতি)

বরানগর মঠে শশী মহারাজ আমাকে পঞ্চদশী এবং মিসেস হ্যারিয়েট বিচার স্টোয়ের "আঙ্কল টম্‌স কেবিন" পাঠ করতে বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন এক তিথি পূজার রাত্রে শশী মহারাজ পূজারি এবং ফকিরবাবু (জ্ঞানেশ্বর ভট্টাচার্য) তন্ত্রধারক হন। দশ-মহাবিদ্যার পূজা চলাকালীন নৈবেদ্য অর্পণ করার সঙ্গে মন্ত্রের উচ্চসুরে বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। মা

কালীর পূজার সময় স্বামী শিবানন্দ "শ্মশানে কেন মা গিরি কুমারী" গানটি গাইলেন। আমি এসব গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রাত গভীর হওয়ায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী আমাকে ঘুমুতে বললেন। পরের দিন প্রত্যুষে আমি হোমানুষ্ঠান দেখলাম। ওই সময় মঠবাসীরা কীর্তন করলেন, "বল ভাই হরি ওম্ রামনাম।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার প্রতি শশী মহারাজের প্রগাঢ় ভক্তি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার স্মরণে আছে যে তিনি কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলার সময়ও সামনে একটি ঘড়ি রাখতেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে পূজা করার ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের সময়ে মঠবাসীরা সোৎসাহে উচ্চৈঃস্বরে "হর হর ব্যোম" ইত্যাদি গাইতেন এবং নৃত্য করতেন।

একদিন আলমবাজার মঠে তিনি আমাকে "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের" একটি জীবনচরিত লিখতে বলেন। "ম্যাক্সমুলার তাঁর নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী লিখেছেন। তোর বইতে থাকবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।" তিনি প্রাণায়াম অভ্যাসের এবং জ্যোতি দর্শনের নিমিত্ত সাধনার সমালোচনা করতেন এবং বলতেন, "শেষে একেবারে চোখে সর্ষেফুল দেখবি।" উদ্বোধন মঠে তাঁর শেষ অবস্থানের সময় তিনি আমাকে ব্রহ্মসূত্রের বঙ্গানুবাদ করার নির্দেশ দেন।

তাঁর কোন এক কলকাতা-সন্দর্শনের সময়ে গাড়িতে আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। 'উদ্বোধন' থেকে যাত্রা করে আমরা হাওড়া হয়ে সালকিয়া পৌঁছলাম। তিনি সুরেন ভট্টাচার্যের বাড়িতে পৌঁছে খোল আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। খোল নেই শুনে তিনি বললেন "যে বাড়িতে খোল থাকেনা তা হলো শ্মশানের মতো।" এক ব্যক্তি শীঘ্র খোল আনতে ছুটলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আশুবাবু খোলের সঙ্গতে গাইতে শুরু করলেন, "ভজ গৌরাঙ্গ, জপ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।"

শশী মহারাজ কীর্তনে যোগদান করলেন এবং অন্যান্যদের সাথে উচ্চৈঃস্বরে গাইতে এবং নৃত্য করতে লাগলেন। সংকোচবশত আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম। কীর্তন সাঙ্গ হলে শশী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা করলেন। তাঁকে একটি নতুন বস্ত্র দেওয়া হলো এবং তিনি তা পরিধান করলেন। তারপর আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসাদ দুপুরে আহার্যরূপে গ্রহণ করলাম।

অন্য একবার তিনি স্বামী পরমানন্দের সাথে কলকাতায় এসেছিলেন। আমরা পরমানন্দকে উদ্বোধন মঠের কর্মী হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। যখন আমি

পরমানন্দকে উদ্বোধন মঠে আসার জন্য রাজি করিয়েছিলাম তখন বৃহস্পতিবারের বারবেলা বলে শশী মহারাজ আমাকে বারণ করলেন। সে সময় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি ২নং বাগবাজার স্ট্রিটে অবস্থিত ছিল।

সম্ভবত অন্য কোন সাক্ষাতের সময় বলরাম বসুর বাড়িতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের পদসেবা করতে শশী মহারাজ আমায় বললেন। ব্রহ্মানন্দজীর সেবা ঠিক মতো হচ্ছে না এবং ভৃত্যেরা তাঁর ঘর ও বিছানা ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে না, লক্ষ্য করে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। গৃহভৃত্যদের বুঝিয়ে সেবা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যখন ব্যর্থ হলেন তখন তিনি নিজেই মহারাজের সেবা করতে লাগলেন।

সংস্কৃতে সুপণ্ডিত শশী মহারাজ একবার মাদ্রাজ থেকে হাওড়া ভ্রমণ করার পথে হনুমৎ বিরচিত সংস্কৃত নাটক "মহানাটক" পাঠে এমন মগ্ন হলেন যেন কোন উপন্যাস পাঠ করছেন।

বরানগর মঠের প্রথম দিকের দিনগুলিতে ব্যয় নির্বাহের জন্য সুরেশ চন্দ্র মিত্র কিছু অর্থ দিতেন। কিন্তু মিত্রবাবু অর্থদানের ব্যাপারে অনিয়মিত ছিলেন। মঠবাসীরাও মিত্রবাবুর কাছে অর্থভিক্ষা করতে সংকোচ বোধ করতেন। এতে মঠবাসীদের খুবই অসুবিধে হতো। সে সময়ে স্বামীজী বললেন, "আমরা আমাদের সংসার জীবন ত্যাগ করেছি। কিন্তু যেহেতু আমরা 'মঠ' তৈরি করেছি সেজন্য কি আমরা গৃহস্থদের কাছ থেকে ভিক্ষা চাইব? মঠবাসীদের তাঁদের যৎসামান্য জিনিসপত্র যেমন কিছু ধর্মীয় পুস্তকাদি বলরাম বসুর কাছে গচ্ছিত রেখে বিভিন্ন তীর্থস্থানে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে উৎসাহ দিলেন। এই সময়ে শশী মহারাজ বাধা দিয়ে বললেন—"আমি মহিমা চক্রবর্তী পরিচালিত 'রামকৃষ্ণ ফ্রী স্কুলে' শিক্ষকতা করে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার ব্যয় নির্বাহ করব।" শশী মহারাজকে সকলে মঠের 'মা' বলতেন। এটা কথিত আছে যে স্বামীজী তাঁকে মাদ্রাজে যেতে রাজি করানোর আগে তিনি একবারমাত্র গাজিপুর ছাড়া কখনো মঠের বাইরে যান নি। জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি রাত্রিতে গাজিপুর থেকে সোজা মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। বারাণসী, বৃন্দাবনের মতো পবিত্র তীর্থস্থানেও তিনি যান নি। কিন্তু তিনি প্রচারকার্য ও নতুন মঠ স্থাপনের জন্য ব্যাপকভাবে দক্ষিণভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সাথে রামেশ্বরমের মতো দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করেন।

তিনি শাস্ত্রের অভ্রান্ততা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। কেউ শাস্ত্রের কোন

অসংগতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হতেন। আমি একবার তাঁকে কিছু শাস্ত্রের অসংগতি দর্শালে তিনি নিরুত্তর ছিলেন।

আমি যখন উদ্বোধন মঠে স্বামীজীর উপর কবিতা প্রকাশ করলাম, তখন তিনি আমায় সাবধান করে বললেন—"যদি আমরা স্বামীজীর দু-বার প্রশংসা করি তবে রামদত্তের চেলারা তাঁর চারবার প্রশংসা করবে এবং তা এক সাম্প্রদায়িক রেষারেষি হবে।"

স্বামীজী বিরচিত সংস্কৃত স্তোত্রগুলি আমরা পেয়েছিলাম। এগুলি সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে 'বীরবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ঘটনা শশী মহারাজকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তাঁর অভিমত—যদি ব্যাকরণগত কোন ভুল থাকে, তবে তা স্বামীজীর ক্ষেত্রে আর্ষপ্রয়োগ বলে বিবেচিত হবে, যেহেতু তিনি কোন ঋষি অপেক্ষা কম ছিলেন না।

একবার আমি তন্ত্রধারক এবং অন্য আরেকবার পূজারি ছিলাম। উভয় অনুষ্ঠানেই শশী মহারাজ উপস্থিত থেকে আশীর্বাদ করেছিলেন। ১৯০৬ সালে দুর্গাপূজার সময় শ্যামবাজারে ট্রাম থেকে নামবার সময় আমি পড়ে গিয়ে শয্যাশায়ী হই। বেলুড় মঠে প্রতীকী ঘটে দুর্গাপূজা হয়েছিল—শিবানন্দজী ছিলেন পূজারি এবং রামকৃষ্ণানন্দজী তন্ত্রধারক। সন্ধিপূজার সময় একটি কুমড়োকে প্রতীকী বলি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সামনে একটি ঘড়ি রেখে তিনি বললেন—"যখন আমি বলব—'মহামাঈ কী জয়', তখন বলির মুহূর্ত জেনে তুই বলি দিবি।" নির্দিষ্ট সময়ে তিনি সজোরে চিৎকার করলেন—"মহামাঈ কি জয়।"

আমাদের অনুরোধে তিনি বেলুড় মঠে শাস্ত্র পড়াতে আরম্ভ করলেন। তা 'ভিজিটার্স রুমে' যা নিচের তলায় দক্ষিণের ঘরগুলির একটিতে অবস্থিত ছিল। সেখানে আমাদের শাস্ত্রপাঠ হতো। শশী মহারাজ বিস্তৃত ভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন।

একবার তিনি ও আমি দুজনাই জ্বরে আক্রান্ত হই। সদ্য ব্রহ্মচারী পূর্ণানন্দ আমাদের সেবায় ছিলেন। বার্লির জল পান করার সময় আমি সোচ্চারে বললাম, "শ্রীগুরু মহারাজজী কি জয়"। এতে তিনি মন্তব্য করলেন, "এই চিৎকার করে স্লোগান কোন উদ্দেশ্য সাধন করবে কি?"

তিনি বেলুড় মঠে আগমন করেছিলেন মাদ্রাজ মঠের জন্য কয়েক জন সাধুকর্মী নিতে, কিন্তু কাউকেই পেলেন না। সে সময় কলকাতার রিপন

কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র সুরেন্দ্র বিজয় গরমের ছুটিতে মঠে ছিলেন। তিনি তাঁর সাথে পড়বার বইও এনেছিলেন। সাধুজীবনের প্রতি সুরেন্দ্র বিজয়ের গভীর আগ্রহ আছে জেনে বাবুরাম মহারাজ তাকে সঙ্ঘে যোগদানের জন্য খুব পীড়াপীড়ি করলেন। এতে ছেলেটি খুবই বিচলিত হয়ে না খেয়ে বেলতলায় কান্নাকাটি করতে লাগল। দুপুরে কয়েকজন মঠবাসী তাকে দেখতে পেলেন এবং তার চোখদুটি ফোলা দেখে এবং সে দুপুরে আহার করেনি জেনে তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করলেন এবং প্রসাদ খেতে দিলেন। শশী মহারাজ কলকাতায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্র বিজয়কে তাঁর সাথে যাবার জন্য বললেন। সুরেন্দ্র বিজয় শশী মহারাজকে নিজের অন্তরের কথা খুলে বললেন এবং শশী মহারাজের সহানুভূতি পেলেন। শশী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের নিকট সুরেন্দ্র বিজয়ের সন্ন্যাসের প্রার্থনা জানালেন। শ্রীশ্রীমা সন্ন্যাসের অনুমতি দিলেন এবং ছেলেটিকে তাঁর কাছে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মাদ্রাজ রওনা হবার আগে ছেলেটিকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পাঠালেন। আনন্দে উল্লসিত রামকৃষ্ণানন্দজী গর্বের সাথে বলেছিলেন— "সৌভাগ্যক্রমে শ্রীশ্রীমা এখানে আছেন আমাদের সাহায্য করার জন্য। কেবলমাত্র তাঁর কৃপায় আমি দুই একজন সাধুকে পাচ্ছি।"

কঠোর বৈরাগ্যবান রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁর পরিবারের লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন। কয়েকবার তাঁকে তাঁর পূর্বাশ্রমে যাবার অনুরোধ করা হয়। তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁর কাকার ছেলে ছিলেন এবং তাঁকে তাঁর পরিবারের লোকেরা মাঝে মাঝে ডাকতেন। এতে শশী মহারাজ ভীষণ অসন্তুষ্ট হতেন।

একইভাবে তিনি দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের বিরুদ্ধে ছিলেন। একবার তিনি লক্ষ্য করলেন—দেবব্রত (পরবর্তী কালে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) এবং শচীন (পরবর্তী কালে স্বামী চিন্ময়ানন্দ) সংবাদপত্র পাঠে অনেকটা সময় ব্যয় করছেন। তিনি তাদের ভীষণ তিরস্কার করলেন। তিনি মন্দিরে সন্ধ্যারাত্রিকের সময় পবিত্র নামোচ্চারণ করতেন। তাঁর অপর বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি স্বামীজী বিরচিত সন্ধ্যা-বন্দনার সময় 'তেজস্তরন্তি ত্বরিতং'-এর স্থলে 'তরসা' শব্দ উচ্চারণ করতেন।

তিনি থিয়োসফিস্টদের মতবাদ পছন্দ করতেন না, ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি আয়োজিত ধর্ম সম্মেলনে থিওসফিক্যাল সোসাইটির জগেন মিত্র একটি রচনা পাঠ করেন। বেলুড় মঠে ফিরে শশী মহারাজ

মঠ কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করেন—"আপনারা থিওসফিকে স্বতন্ত্র ধর্মের স্বীকৃতি দিয়েছেন কেন? থিওসফিস্টরা নিজেরাই ঘোষণা করেছেন যে থিওসফি কোন ধর্ম নয়।" আমি রুদ্রের (পরবর্তী কালে স্বামী ধ্যানানন্দ) নিকট শুনেছিলাম যে শশী মহারাজ কয়েকজন সাধুকে পাকড়াও করলেন যাঁরা আডিয়ার মাদ্রাজের থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "বল, তোমরা কি শুনেছ। যদি থিওসফি ব্রহ্মজ্ঞানকেই লক্ষ্য স্থির করে, তাহলে তাঁদের বক্তৃতা থেকে তোমরা নতুন কি ভাব পেয়েছ? এবং যদি তা ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুকে লক্ষ্য স্থির করে তবে কি তা অনুসরণের যোগ্য?"

স্বামীজী শশী মহারাজকে দক্ষিণ ভারত পাঠাবার আগে তাঁর দক্ষিণ ভারতীয় শিষ্যদের বলেছিলেন, "আমি আমার এমন একজন গুরুভাইকে তোমাদের কাছে পাঠাব যিনি হবেন তোমাদের খুব পছন্দের। তিনি তোমাদের সকলের থেকে গোঁড়া (নিষ্ঠাবান)।" শশী মহারাজের এক ধরনের চামড়ার রোগ থাকার দরুন চিকিৎসকগণ তাঁকে কলাই এর ডাল খেতে নিষেধ করেন। এজন্য তিনি শাসপুরের ওষধি তেল ব্যবহার করতেন। স্বামীজী তাঁকে পাশ্চাত্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এই চর্মরোগের জন্য তিনি যেতে পারেন নি।

কলকাতায় তাঁর কয়েকবার থাকার সময় তিনি আমাকে মাদ্রাজ যেতে পীড়াপীড়ি করলেন। এমনকি, তিনি আমার যাতায়াতের খরচাও দেবেন। কিন্তু সে সময় আমি মাদ্রাজ যাবার সুযোগ করে উঠতে পারিনি।

'উদ্বোধনে'র প্রাথমিক বছরে শশী মহারাজ বাঙলায় রামানুজের জীবনী রচনা করেন এবং আমার সম্পাদকতা থাকাকালীন তিনি তা শেষ করেন। তিনি অন্য বিষয়ের ওপর কাজ আরম্ভ করেন। সম্ভবত 'স্তোত্র উপদেশ-রত্নমালা', যেহেতু তিনি কিছু সংস্কৃত স্তোত্রের অনুবাদ বাদ দিয়েছিলেন, সেহেতু তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। আমার অনুরোধের উত্তরে তিনি আমায় আশ্বাস দিয়েছিলেন করবেন বলে, কিন্তু তা দুর্ভাগ্যবশত তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হয় নি। অনেক পরে তাঁর সম্পূর্ণ রচনা 'উদ্বোধন' কার্যালয় থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। যখন আমি জানতে চাইলাম তিনি বইটির স্বত্বাধিকার সংরক্ষণ করতে চান কি না। অথবা 'উদ্বোধন' কে বিক্রয়লব্ধ অর্থ মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠকে দিতে হবে কিনা, তখন তিনি লিখে পাঠালেন, "আমি তোমায় পরে জানাব।" কিন্তু কোনদিনই এ বিষয়ে তিনি কিছু লেখেন নি।

বইটির প্রথমাংশে তিনি আলওয়াদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।

আলওয়াদের একজনকে তিনি বিষ্ণুর অবতার বলে বর্ণনা করেন। আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এতে উপহাস করবে। বইটিতে আমি ভাষার সামান্য পরিবর্তন করেছিলাম। উদ্বোধন পত্রিকায় স্বামীজীর 'শিবস্তোত্রম্' প্রকাশ করার পূর্বে আমি প্রয়োজনীয় সম্পাদনার জন্য পাণ্ডুলিপিটি মাদ্রাজে শশী মহারাজের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম। তিনি সম্পূর্ণ সম্পাদনা করে সংশোধিত প্রতিলিপিটি আমাকে পাঠান। মূল প্রতিলিপিটি মনে হয় নিজের কাছে তিনি রাখেন। তাঁর সংশোধনগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো যে তিনি 'প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতং' এর পরিবর্তে 'প্রাণবিচ্ছেদসূৎকং' ব্যবহার করেন। তিনি সংস্কৃত স্তোত্রগুলির বাঙলায় অনুবাদ করেন। স্বামীজীর 'চিকাগো বক্তৃতা'রও তিনি আবার বঙ্গানুবাদ করেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বাভাস' শীর্ষক একটি মূল বাংলা রচনা তিনি করেন। তৎকালে রামদয়াল চক্রবর্তী এবং কয়েকজন মাঘীপূর্ণিমায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে একটি মেলার আয়োজন করতেন। কয়েক বছর ধরে মেলাটি হয়ে আসছিল। এরই কোন এক মেলাতে শশী মহারাজের রচনাটি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বাভাস' পঞ্চবটীতলে ভক্তসকাশে পঠিত হয় এবং পরবর্তী কালে উদ্বোধন পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। এই রচনাগুলি ছাড়া তিনি 'দক্ষিণ ভারতের মন্দির' সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং তা 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বর্তমানের 'ব্রহ্মচর্য'-ব্রত দীক্ষানুষ্ঠানের মন্ত্র শশী মহারাজের রচনা। তিনি কয়েকজন গৃহিভক্তদেরও এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দিয়েছেন বলে আমরা শুনেছি। তাদের জন্য তিনি বিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বাদশতম মন্ত্রের কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। পরিমার্জিত অংশটিতে আছে যে গৃহীরা বিবাহ করতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য সকল স্ত্রীলোকদিগকে তাঁদের মাতৃজ্ঞান অবশ্যই করতে হবে। এরপরও আমি মন্ত্রগুলির স্থানে স্থানে সামান্য কিছু সংযোজন এবং পরিবর্তন করেছিলাম। আমি জেনেছি যে তেজনারায়ণ (পরবর্তী কালে স্বামী শর্বানন্দ) এই মন্ত্রগুলির দ্বারা 'ব্রহ্মচর্যব্রতে' দীক্ষিত হয়েছিলেন। ঐগুলির (মন্ত্রগুলির) একটি অনুলিপি বেলুড় মঠে পাঠানো হয়েছিল। বিশ্বরঞ্জন এবং রুদ্রকে 'ব্রহ্মচর্য ব্রতে' দীক্ষিত করার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঐ মন্ত্রগুলি প্রথম ব্যবহার করেন। এবং ১৯১২ সালে কনখলে জীবন, লক্ষ্মণ এবং রমেশকে 'ব্রহ্মচর্যব্রতে' দীক্ষা দেবার সময়ও তিনি ঐগুলির ব্যবহার করেন। এই উপলক্ষে আমি এই মন্ত্রগুলি পাঠ করি। যেহেতু জীবন বিবাহিত ছিল সেহেতু শশী মহারাজ প্রণীত মন্ত্রগুলির দুটি বৈচিত্রের কোনটিই প্রযোজ্য ছিল না। আমি প্রাসঙ্গিক অংশগুলি "পুত্রদারাদি পরিত্যজ্য"—এই বাক্যাংশ দ্বারা পরিবর্তন করেছিলাম। এছাড়াও এটি মনে

হয়েছিল যে ব্রহ্মচারীর মৌলিক কর্তব্যগুলির মধ্যে একটি হলো নারায়ণজ্ঞানে রোগীদের শুশ্রূষা করা। এই ভাবটিকে আরও সুস্পষ্ট করার জন্য আমি প্রচলিত মন্ত্রগুলির সঙ্গে "রোগাক্রান্তান্ ঔষধপথ্যাদিদানেন শুশ্রূষয়া চ" সংযোজন করেছিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে মা দুর্গার পূজা সমাপ্ত করতে হবে বলে পঞ্জিকার বিধান। এক বছর আমরা পঞ্জিকা বিধি নির্দেশিকা আক্ষরিক অর্থেই পালন করেছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে আমরা ভোর ৩টার সময় উঠে পূজায় বসলাম এবং সাড়ে আটটার মধ্যে পূজা শেষ করলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে খিচুড়ি করে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়েছিল। এত ভোরে পূজা সমাপনে মঠবাসীদের অনেকেই খুশি হননি এবং এতে আমাদের নিজেদের মধ্যে উত্তপ্ত আলোচনা হয়েছিল। শশী মহারাজ পরে এলে এই বিষয়টি তাঁকে জানানো হলো এবং মতামত দিতে অনুরোধ করা হলো। তিনি বললেন, "পঞ্জিকা নির্দিষ্ট সমাপ্তিকালের পূর্বে পূজা আরম্ভ করলেই চলবে।"

রুদ্রকে মাদ্রাজে পাঠাবার আগে যোগীন (পরবর্তী কালে স্বামী উমানন্দ) মঠে এসেছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কাছ থেকে সন্ন্যাস নেবার জন্য। প্রকৃত পক্ষে যদিও তিনি জাতিতে তেলি ছিলেন, তবুও তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে মিষ্টি করা শিখেছিলেন। এঁদের ছিল এটি পেশা। শশী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভোগের জন্য যোগেনকে দিয়ে বিভিন্নপ্রকার মিষ্টান্নাদি তৈরি করাতেন। সন্ন্যাসের পর উমানন্দ সন্ন্যাসীদের চিরাচরিত প্রথায় তপস্যা করতে চেয়েছিল। তাঁর অভাব সকলেই অনুভব করেছিলেন। যা হোক তিন মাস পরে ব্রহ্মচারী রুদ্রকে (সদ্ বন্ধু) শশী মহারাজের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

একবার মাদ্রাজে, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) শশী মহারাজের সমালোচনা করেছিলেন। কোন কারণে কৃষ্ণলাল মহারাজ শশী মহারাজকে কটুবাক্য বলেছিলেন। তা জেনে মহারাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি কৃষ্ণলাল মহারাজকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "আমি শশীকে অন্য কোন ব্যাপারে বকছি। কিন্তু তার ব্যাপারে তোমার এই সব কথা বলার সাহস হয় কি করে? তুমি কি তাঁর মতো সাধু খুঁজে পাবে।"

আগে আমি এক মজার ঘটনা শুনেছিলাম। যখন বরানগরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ' প্রতিষ্ঠিত হয়, স্বামীজী শশী মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজার দায়িত্ব নিতে বলেন। শশী মহারাজ কঠোরভাবে কিছু নিয়ম ও আচারাদি পালন

করতেন। সেই অনুযায়ী মোট ১৪টি পান প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করা হতো। একবার, এই কাজের জন্য অর্থ ও লোকবলের অভাব দেখে, শশী মহারাজ এবং কয়েকজন গুরুভাইদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। স্বামীজী শশী মহারাজের বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিলেন। স্বামীজী ১৪টি পানের পরিবর্তে ১০টি পানের পক্ষে তর্ক করতে লাগলেন। শশী মহারাজ চোদ্দ চোদ্দ বলে উত্তেজিত হয়ে বার বার চিৎকার করতে লাগলেন এবং মঠ ত্যাগ করে চলে গেলেন। যদিও কিছুক্ষণ পরে তিনি মঠে ফিরে এসেছিলেন।

উদ্বোধন কার্যালয়ের বাড়িতে শশী মহারাজ যক্ষ্মায় অত্যন্ত ভুগছিলেন। একদিন তিনি কোন কারণে বাবুরাম মহারাজকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু তিনি যখন শান্ত হলেন, তখন তিনি নিজের ভুল বুঝে অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। তিনি বাবুরাম মহারাজকে ডেকে পাঠান। বাবুরাম মহারাজ এলে শশী মহারাজ তাঁকে বারংবার অনুরোধ করেন তাঁকে (শশী মহারাজকে) পদাঘাত করার জন্য। তাঁকে কিছুতেই শান্ত করা গেল না, যতক্ষণ না বাবুরাম মহারাজ পদাঘাতের প্রতীকী স্বরূপ স্বীয় চরণ দ্বারা তাঁর শরীর স্পর্শ করেন। তাঁর এইকালে অসুস্থতার সময় বিশ্বরঞ্জন তাঁর সেবক ছিল। তৎকালে টি.বি. রোগীর শুশ্রূষা একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল।

কোন এক সময়ে নৌকাযোগে মঠে যাবার সময় আমি একবার শশী মহারাজের সঙ্গী ছিলাম। ডাঃ কাঞ্জিলাল আমাদের দলে ছিলেন। তিনি তাঁর অতীত জীবনের অপকর্ম এবং দুর্বলতার কথা স্বীকার করেন। আমি লক্ষ্য করলাম শশী মহারাজ তাঁকে খুবই উৎসাহ এবং কিছু মূল্যবান উপদেশ দিলেন।

বেলুড় মঠে স্বামীজী যে দিন দেহত্যাগ করেন, শশী মহারাজ তখন মাদ্রাজে এবং স্বামীজীকে স্বপ্নে দর্শন করেন। স্বামীজী তাঁকে বলেন, "শশী, দেখ লোকে যেমন থুতু ফেলে, তেমনি আমি আমার শরীরটাকে এই মাত্র ছেড়ে দিলুম।"

মহারাজ বলতেন, "আমি লক্ষ্য করেছি শশী একটুও নড়েচড়ে না, এমনকি চেয়ারে বসে থাকলেও। এভাবে সে তার শরীর নষ্ট করেছে। সেজন্য তার ডায়াবেটিস এবং পরে যক্ষ্মা হয়েছিল।

বাড়িঘর ত্যাগ করার আগেই আমি শশী মহারাজের পিতা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে প্রথম দেখেছিলাম। সুপ্রসিদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্র তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত হন। তিনি জমিদার ইন্দ্রনারায়ণের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। বেশ কয়েকবার আমি আমাদের পাড়ার এক অন্ধ ব্যক্তিকে

অর্থ সাহায্যের জন্য পার্ক স্ট্রিটের বসতবাড়িতে ইন্দ্রনারায়ণের কাছে নিয়ে যাই। এই যাতায়াতের কোন এক সময়ে আমি ঈশ্বরচন্দ্রকে সেখানে দেখি। যদিও আমি শশী মহারাজের সাথে আগেই পরিচিত হয়েছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র যে তাঁর পিতা তা আমার জানা ছিল না। আমি ইন্দ্রনারায়ণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, যে গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত তিনি এবং ইন্দ্রনারায়ণ তান্ত্রিক সাধনা করেছেন এবং ইন্দ্রনারায়ণ এখনও শুয়ে আছেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর শূন্য হাতে আমাদের ফিরতে হয়েছিল বলে আমরা হতাশ হয়েছিলাম। তখন বেলা প্রায় ১২টা এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছিলাম ঈশ্বরচন্দ্র মন্দিরে পূজায় ব্যস্ত।

পরবর্তী কালে ঈশ্বরচন্দ্রকে বেলুড় মঠে অনেকবার দেখি, বিশেষত স্বামীজীর বেলুড় মঠে অবস্থানকালীন। তিনি মধ্যে মধ্যে বেলুড় মঠে আসতেন এবং একনাগাড়ে দিন কয়েক কাটাতেন। তিনি সম্পূর্ণ চণ্ডীর শ্লোকসহ অনুবাদ পাঠ করতেন। তিনি তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানে এত দক্ষ ছিলেন যে ঘুমন্ত অবস্থাতেও প্রায়ই তিনি অং কং খং ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। তার কাছাকাছি ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতো। একবার তিনি সাকল্য নিবেদন সহযোগে সমগ্র চণ্ডীর হোমানুষ্ঠান করেন। আমরাও 'স্বাহা' উচ্চারণ সহযোগে অগ্নিতে সাকল্য আহুতি দিয়েছিলাম। আমরাও পূজার মুদ্রাদি তাঁর কাছ থেকে শিখেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে তত্ত্বমুদ্রাকে অন্যান্য সকল মুদ্রার পরিবর্ত হিসেবে গণ্য করা যায়।

১৯০১ সালে স্বামীজী আয়োজিত্র দুর্গাপূজায় ঈশ্বরচন্দ্র তন্ত্রধারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের দিন (৪ জুলাই, ১৯০২) ঈশ্বরচন্দ্র মঠে এসেছিলেন। তাঁকে দেখলেই আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ে স্বামীজী এই বলে আপ্যায়ন করতেন, "এখন ভট্টাচার্য মহাশয় এসেছেন। আগামী কাল পঞ্চোপচারে কালীপূজা করার ইচ্ছে আছে।"

যখন শশী মহারাজ নিয়মিত শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে যেতেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র একদিন তাঁর গুরু জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে যান। তাঁর যাবার উদ্দেশ্য ছিল শশী মহারাজকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। কথাবার্তার সময় ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিন্দা করেন। এতে শশী মহারাজ এত ক্রুদ্ধ হলেন যে কাটারি দিয়ে তিনি তাঁর পিতাকে হত্যার জন্য ছুটে গেলেন। তাতে খুশি হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, "সত্যই গুরুর প্রতি তোমার ভক্তি খাঁটি।"

একবার শশী মহারাজ টেলিগ্রাফ মনি-অর্ডারে কিছু অর্থ পাঠিয়েছিলেন একজন রাঁধুনি ও দুজন সাধুকর্মীর যাতায়াত খরচার জন্য। বেশ কিছুকাল পরে প্রকাশ মাদ্রাজে যায় এবং এক বছর সেখানে থাকে। সম্ভবত এই সময়েই বেলুড় মঠের রাঁধুনি প্রভাকরের ভাইপো অভিরামকে মাদ্রাজে পাঠান হয়। অভিরাম সেখানে প্রায় এক বছর ছিল।

একদিন আলমবাজার মঠে স্বামী নিত্যানন্দ (যোগেন চ্যাটার্জি) রামচন্দ্র দত্তের প্রভূত সমালোচনা করেন। শশী মহারাজ এই বলে তাকে ভর্ৎসনা করেন, "তুমি কি জান রামবাবু কত বড় ভক্ত? ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন নিজেদের ভেতর ঝগড়া করে সেরকম আমরাও কখনও কখনও ঝগড়া করি। এটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ব্যাপার। কিন্তু তুমি তাঁকে সমালোচনা করতে সাহস পাও কিভাবে? তোমার কি মনে নেই যে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় পাণ্ডবরা বলেছিলেন, 'আমরা কৌরবদের সাথে ঝগড়া করি সত্য। কিন্তু আমরা এখন একশত পাঁচভাই একত্র মিলিত হয়েছি।' তুমি একদিন কাঁকুড়গাছিতে যোগোদ্যান দর্শন করে আসলে ভালো হয়।"

একদিন ভবনাথ চ্যাটার্জি বরানগর মঠে আসেন। তিনি সাধুদের কাছে অনুতাপ করেছিলেন—"আহা, তোমরা সব কিছু ত্যাগ করে কেমন ভগবানকে ডাকছ, আর আমরা সংসার সাগরে যুদ্ধ করছি।" এই উপলক্ষ্যে তিনি একটি গান শোনান ঃ

"কেন অমিয় ভ্রমে গরল কর পান
কেন আপাত সুখেতে মজি ভুল পরিণাম।
ভেবেছ কি সার তবে, চিরদিন এইভাবে যাবে?" ইত্যাদি।

শশী মহারাজ এক উদাহরণ যোগে তাঁকে উৎসাহিত করলেন। তিনি বললেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তেরা মাছের মতো। তিনি তাদের কিছুজনকে জিঁইয়ে রাখেন এবং অন্যদের তপ্তকড়ায় ভাজেন। আমরা সর্বত্যাগী ভক্তেরা তপ্ত কড়ায় ভাজা হচ্ছি। কিন্তু তোমরা গৃহী ভক্তেরা জিয়ানো আছো, কিন্তু সময় হলে তিনি তোমাদেরকেও তপ্ত কড়ায় ভাজবেন।" এতে ভবনাথ খুশি হয়েছিলেন।

অনুবাদক ঃ স্বামী সংশুদ্ধানন্দ
বেদান্ত কেশরী, আগস্ট, ১৯৮৩ (পৃঃ ২৭১-২৭৭)

[এই স্মৃতিকথা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের (গোলপার্ক, কলকাতা) তদানীন্তন সম্পাদক এবং বর্তমানে মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক

স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ সংকলিত করেছেন, স্বামী শুদ্ধানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা থেকে। স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ (১৮৭২-১৯৩৮) ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট মহারাজ (১৮ মে ১৯৩৮—২৩ অক্টোবর, ১৯৩৮)। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলীর বাংলা অনুবাদক ছিলেন।]

রামকৃষ্ণানন্দ-প্রসঙ্গ

স্বামী শুদ্ধানন্দ

(আলমবাজার মঠে থাকাকালীন)

(ভিন্ন পরিবেশে অথবা ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা লিখিত)

আমি বরাহনগর মঠে, বোধ হয় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে আসতে আরম্ভ করি। তখন স্বামী বিবেকানন্দ মঠ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বেরিয়েছেন। তার কিছু পূর্বেই মাস্টার মশাই-এর একটি বয়স্থা বিবাহিতা কন্যার (১৬/১৭ বয়স) দেহত্যাগ হয়েছে। এই বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে শশী মহারাজকে কয়েকবার দর্শন করি। ১৮৯৭ সালে মে মাসে আমি মঠে যোগ দিয়েছিলাম। তখন স্বামীজী তাঁকে মাদ্রাজে পাঠিয়েছেন।

এই সময়ের পর তিনি মাদ্রাজ থেকে কয়েকবার মঠে আসেন। সেই সব সময়ে মঠে বা কলকাতায় দর্শন করার সৌভাগ্য হয়।

তিনি প্রথম আসেন, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, স্বামীজী তখন জীবিত। দ্বিতীয়বার আসেন, স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছু পরে। তখন ত্রিগুণাতীত-স্বামী আমেরিকায় যাননি। আমার মঠে খুব পেটের অসুখ ও মন্দাগ্নি হওয়ায় কলকাতার বাড়িতে এক সপ্তাহ থাকি। মঠের সকলকে নিমন্ত্রণ করে পাড়ার ভক্তেরা আমাদের বাড়িতে খাওয়ায়। হরি মহারাজ, সারদা মহারাজ, লাটু মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি ছিলেন। মহারাজ আসতে পারেননি। কয়েক দিন বাদে মহারাজকে আর একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় শশী মহারাজ মঠে এসে পড়েন। তাঁকে যেতে বলা হলেও যাননি। সম্ভবত এটা ১৯০২ এর কোন এক সময়ে হবে।

তৃতীয়বার ১৯০৪ সালের বোধ হয় আধাআধি, তখন পরমানন্দও সঙ্গে এসেছিলেন। পরমানন্দকে উদ্বোধনের worker (কর্মী) করবার চেষ্টা করা হয়।

চতুর্থবার ১৯০৬-এ মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে অভেদানন্দ স্বামী ও পরমানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে পুরী থেকে আসেন।

পঞ্চমবার তখন পূর্ণানন্দ সবে মঠে যোগ দেবার উপক্রম করছে। আমার জ্বর। হারাণ রক্ষিতের 'কামিনী ও কাঞ্চন'-এর review (সমালোচনা) লেখা 'উদ্বোধনে'-এ বেরিয়েছে।

আমি তখন কোঠারে। শ্রীশ্রীমাও কোঠারে। মাঘ মাস—তখন সবে হরি মহারাজ প্রথমবার দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করে মঠে এসেছেন।

শুকুল, কৃষ্ণলাল, সত্যকাম মাকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে গেছেন—বোধ হয় ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারি। শশী মহারাজ মাকে সমস্ত দক্ষিণ দেশ বেড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

তারপর আমি এপ্রিলে মঠে যাই এবং তারপর জুলাই-এ কাশী যাই। এই সময়ে জুলাই-এর মধ্যে শশী মহারাজ থাইসিস্ হয়ে কলকাতা উদ্বোধনে নূতন বাড়িতে আসেন। এই সময়েও আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি কাশী গিয়ে রয়েছি সেই সময়ে আগস্ট মাসে তাঁর দেহত্যাগ হয়।

শশী মহারাজ মাদ্রাজে ১৮৯৭ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ ১৪ বৎসর ছিলেন। তাঁর নিকট পরমানন্দ এবং ধ্যানানন্দ (রুদ্র মহারাজ) দীর্ঘকাল যাবৎ ছিলেন। উমানন্দ ও যোগেন ছ-বৎসর ছিলেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে নির্ভয়ানন্দ (১ বৎসর বোধ হয় গোড়াতে), সচ্চিদানন্দ (বুড়োবাবা) ছ-মাস, অচলানন্দ (১ বৎসর), গুপ্ত মহারাজ, নির্মলানন্দ, শঙ্করানন্দ, আত্মানন্দ, বোধানন্দ, বিমলানন্দ, সচ্চিদানন্দ (মতি মহারাজ), শর্বানন্দ, যোগেশ্বরানন্দ, (রামবাবুর শিষ্য সুরেশ), কৃষ্ণলাল, প্রকাশ (শরৎ মহারাজের ভাই), সুরেন্দ্র বিজয়, ব্রজেন প্রভৃতি ছিলেন।

বরাহনগর মঠে শশী মহারাজ আমাকে 'পঞ্চদশী' ও শ্রীমতী স্টো-র লেখা 'আঙ্কল টম্স কেবিন' পড়তে বলেন।

বোধ হয় বরাহনগর মঠে তিথি পুজোর দিন রাত্রে ছিলাম। শশী মহারাজ পূজক আর ফকিরবাবু তন্ত্রধারক। অনেকক্ষণ বসে পূজা দেখেছিলাম। ত্রিগুণাতীত স্বামী ডেকে নিয়ে গিয়ে শোয়ালেন।

তখন দশমহাবিদ্যার পূজা হচ্ছিল। ক্রমাগত নৈবেদ্য বদলান হচ্ছিল আর 'হস ক ল হ্রীং' প্রভৃতি দেবীর মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। মহাপুরুষ 'শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী' গানটি গাইলেন।

পরদিন প্রাতে হোম হলো, দেখলাম। সেই সময় 'বল ভাই হরি ওঁ' রামনাম কীর্তন হলো।

তাঁর ঠাকুর সেবার খুব নিষ্ঠা দেখেছি। মনে আছে, কথাবার্তা কইছেন, ঘড়ি কাছে আছে, ঘড়ি ধরে সময় দেখে ঠাকুর সেবায় যাবেন।

আরতির সময় 'হর হর ব্যোম ব্যোম' বলে খুব উৎসাহের সঙ্গে চিৎকার ও নৃত্য করতেন।

একদিন আলমবাজারে আমায় ঠাকুরের জীবনী লিখতে বলেছিলেন, 'যেমন ম্যাক্সমুলার লিখেছে তার version (বিবরণ), এ তোমার version (বিবরণ) ঠাকুরের life (জীবনী) হবে।

প্রাণায়াম করার ও জ্যোতিদর্শনের কথায় attack (আক্রমণ) করে বলেছিলেন, "চোখে সরষের ফুল দেখবে"। থাইসিস এর সময় উদ্বোধনে আমায় বলেছিলেন 'ব্রহ্মসূত্র' এর একটা literal (আক্ষরিক) তর্জমা করতে।

একবার মাদ্রাজ থেকে এসেছেন। তার সঙ্গে গাড়ি করে সুরেন ভট্টাচার্যের বাড়ি খালি গায়ে যাই। গাড়ি উদ্বোধন থেকে হাওড়া ঘুরে গিয়েছিল। পৌঁছিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন খোল আছে কি না। খোল নেই শুনে বললেন, "যেখানে খোল নেই সে তো শ্মশানপুরী।" অমনি খোল আনতে লোক ছুটল। আশুবাবু (আশুতোষ ভট্টাচার্য) খোল নিয়ে "ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে" ইত্যাদি কীর্তন করেন। উনি কীর্তনে যোগ দিয়ে ভয়ঙ্কর নৃত্য ও চিৎকার করেছিলেন। আমি ভয়ে সরে ছিলাম। তারপর ঠাকুরের পূজা করলেন। ওঁকে নতুন কাপড় দিলে, পড়েছিলেন। শেষে প্রসাদ পাওয়া হলো।

একবার পরমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় আছেন। পরমানন্দকে তখন 'উদ্বোধন'-এ interested (আকৃষ্ট) করার চেষ্টা করছি। তাকে 'উদ্বোধন'-এ নেবার চেষ্টা করাতে তিনি যেতে দিলেন না। কারণ যেদিন যাবার কথা সেদিন বৃহস্পতিবার বারবেলা ছিল। তখন মার বাড়ি ২নং বাগবাজার স্ট্রিটে।

আর একবার, বোধ হয় এইবারই বলরামবাবুর বাড়িতে মহারাজের পা টেনে নিয়ে সেবা করতে বসলেন। মহারাজের সেবার ত্রুটি হচ্ছে, চাকর

বাকরেরা বিছানা সাফ করছে না। কয়েকবার চাকরদের দ্বারা করাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে নিজেই করার উদ্যোগ করলেন।

সংস্কৃত খুব ভালো জানা ছিল। একবার যখন মাদ্রাজ থেকে আসেন, আমরা যেমন নভেল পড়ি, সেইভাবে সংস্কৃতে 'হনুমৎ' প্রণীত মহানাটক একখানা সঙ্গে করে ট্রেনে পড়তে পড়তে এসেছিলেন।

শাস্ত্রের কথা সব সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। প্রক্ষিপ্ত বললে চটে যেতেন। একবার আমি দু-একটা প্রক্ষিপ্ত undoubtedly point out (নিঃসন্দেহভাবে নির্দেশ) করেছি। তখন চুপ করে রইলেন।

মঠে পান খেতে দেওয়া হয়েছিল, চুনে গাল পুড়ে গেল। 'উদ্বোধন'-এ স্বামীজী সম্বন্ধে কবিতা বার করেছিলাম। আমাদের warn (সতর্ক) করেছিলেন, "তোমরা যেমন স্বামীজীকে বাড়াচ্ছ দু-হাত তেমনি রামদাদার চেলারা তাঁকে বাড়াবে চার হাত। গোঁড়ামির competition চলবে।"

'বীরবাণী'র সংস্কৃতগুলো প্রমথনাথ তর্কভূষণকে দিয়ে edit (সম্পাদনা) করানোতে চটে গিয়েছিলেন। বলতেন, "ওগুলো 'আর্ষপ্রয়োগ'।"

একবার আমি তন্ত্রধারক, আর একজন পূজক। তিনি উপস্থিত ছিলেন, খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্র পড়ে যেতে বললেন, তাই করা হলো।

অভেদানন্দ স্বামী যেবার আসেন, আমি বিনোদের বাড়ি ছুতোর পাড়ার নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে শ্যামপুকুরে ট্রাম থেকে পড়ে গেছি। মঠে ঘটে দুর্গাপূজা হবে। মহাপুরুষ পূজক, শশী মহারাজ তন্ত্রধারক। কুমড়ো বলি হবে সন্ধিপূজার সময়। কাছে ঘড়ি আছে, বললেন, যখন আমি 'জয় মা' বলব তখন ঠিক সময় হয়েছে জানবে এবং বলি দেবে। তিনি ভয়ংকর চিৎকার করে জয় মা বলে ছিলেন।

একদিন মঠে ক্লাস করছিলেন। আমরা সকলে বসেছিলাম। দক্ষিণ দিকের ঘরে তখন ভিজিটার্স রুম ছিল, এখন যেখানে শোবার ঘর (কানাই মহারাজের ঘর)। আলোচ্য বিষয় বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়েছিলেন।

তাঁরও জ্বর, আমারও জ্বর (তখন পূর্ণানন্দ মঠে সবে ঢুকেছে। আমাদের সেবা করছে)। খাওয়ার সময় চিৎকার করে—"জয় গুরুমহারাজজীকি জয়" হচ্ছে। Remark (মন্তব্য) করলেন, "শুধু ওরকম 'জয়' দিলে কি হবে?"

একবার ডাক্তার কাঞ্জিলাল এসেছেন। তিনি ও আমি নৌকা করে মঠে যাচ্ছি। কাঞ্জিলাল নিজের পূর্ব কাহিনি, দুর্বলতা ইত্যাদি তাঁকে বলছিলেন। তিনি খুব উৎসাহ দিয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন।

লোকের দরকার মাদ্রাজ মঠে, লোক মিলছে না। তিনি মঠে এসেছেন। সুরেন্দ্র বিজয় রিপন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। গ্রীষ্মের ছুটি মঠে কাটাতে, গৌরপদ সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বাবুরাম মহারাজ সাধু হতে চায় মনে করে খুব তাড়া দিয়েছেন। ছেলেটা না খেয়ে বেলতলায় বসে খুব কেঁদেছে। বৈকাল বেলা মঠের দিকে আসতে চোখ ফোলা দেখে সকলে sympathy (সহানুভূতি) করে প্রসাদ খাওয়ালে। শশী মহারাজ নৌকা করে মার দর্শনে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে নৌকায় করে কলকাতায় গেল। তার কথা শুনে মহারাজের sympathy (সহানুভূতি) হলো। মার কাছে গিয়ে বললেন, "মা, একে সন্ন্যাস দিন।"। মা আমাদের পাঠিয়ে দিতে বলাতে পাঠিয়ে দিলেন। মাদ্রাজ ফিরে যাবার আগে এই সব করে গেলেন। আমাদের attack (আক্রমণ) করে বলেছিলেন, "ভাগ্যিস মা আছেন। তাঁর কৃপায় তবু দু-একটা ছেলে পাওয়া যায়।"

সোমানন্দ পাগল হওয়ার কথায় বলেছিলেন, "তোমরাই তো পাগল করে দিয়েছ।"

তিনি বাড়ির কারোর সঙ্গে দেখা করার বিরোধী ছিলেন। অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল ইদানীং। কিন্তু বাড়ি যান নি। শরৎ মহারাজ বাড়ি যেতেন বলে তাঁর উপর খুব চটতেন।

খবরের কাগজ পড়ার উপর খুব চটা ছিলেন। তখন প্রজ্ঞানন্দ ও শচীন সবে মঠে ঢুকেছে। তারা খুব খবরের কাগজ পড়ে, একথা তাঁকে কে বলাতে খুব চটে গিয়ে গাল দিয়েছিলেন।

মঠে আরতির সময় যোগ দিয়ে মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন। 'তেজস্তরন্তি ত্বরিতং'-এর জায়গায় 'তরসা' বলতেন।

থিওসফিস্টদের উপর খুব চটা ছিলেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতায় যে convention of religions (ধর্ম সম্মেলন) হয়েছিল তাতে যোগেন মিত্র মশাই থিওসফির representative (প্রতিনিধি) হয়ে ঐ সম্বন্ধে একটা paper (ভাষণ) পড়েছিলেন। তিনি তারপর একবার এসে মঠে remark (মন্তব্য) করেছিলেন; "তোমরা

থিওসফিকে আবার religion-এর (ধর্মের) ভিতর দিলে কেন? ওরাই তো বলে থিওসফি কোন religion (ধর্ম) নয়।' রুদ্রের মুখে শুনেছি, মাদ্রাজে লোকেরা সব আডিয়ার থেকে থিয়সফির বক্তৃতা শুনে ফিরছে, উনি দরজার কাছে বসে ডেকে ডেকে তাঁদের জিজ্ঞাসা করতেন, "কি শুনে এলে? যদি থিওসফি নামে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে আর ওদের ওখানে নূতন কি শুনতে যাচ্ছ? আর যদি তা না হয়, নতুন কিছু হয়, তবে তাতে আর আছে কি?"

যখন Sri Krishna the Pastoral (রাখাল শ্রীকৃষ্ণ) ও Sri Krishna the King Maker (নৃপতি স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ) তাঁর দুটো লেকচার আলাদা pamphlet form a (পুস্তিকাকারে) ছাপা হয়, তখন 'প্রবুদ্ধ ভারত' এর প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বামী স্বরূপানন্দ ওর সম্পাদক। লেখাগুলিতে অনেক আজগুবি ঘটনা বলা হয়েছে বলে তিনি slight criticism (সামান্য বিরূপ সমালোচনা) করে লিখেছিলেন। শুনেছি নাকি সেই criticism (সমালোচনা) দেখে চটে বলেছিলেন, "স্বরূপ শালা।"

স্বামীজী যখন ওঁকে মাদ্রাজে পাঠান তখন মাদ্রাজীদের নাকি বলেছিলেন, "আমার এমন এক গুরুভাইকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি, যাকে তোমাদের খুব পছন্দ হবে। তোমাদের চেয়েও orthodox (নৈষ্ঠিক)।" তিনি নাকি মাদ্রাজীদের দৃষ্টিদোষ প্রভৃতি সব মেনে চলতেন। তবে রুদ্রের কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে মাছ খাবার ভারি ঝোঁক হতো। তখন মা-ঠাকরুনকে লিখে অনুমতি আনিয়ে (তাঁর গায়ের ক্ষতের জন্য কলাই ডাল ও মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ওটা এক প্রকার কুষ্ঠ, ওর জন্য শাসপুরের তেল ব্যবহার করতেন। ওর জন্যই তাঁর আমেরিকায় যাবার কথা উঠলেও যাওয়া হয় নি।) কয়েকদিন রেঁধে খুব করে কতকগুলো মাছ খেয়ে তাতে বিরক্তি আনতেন। বামুনকে হয়তো কোন কাজে পাঠান হতো, নিজে রাঁধতে যেতেন। সেই সময় রামু হয়তো এসে উপস্থিত এবং স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে রান্নাঘরে ছুটেছে। তখন পাছে রামু টের পায় তাকে ভাগাবার জন্য রাগের ভান করে চিৎকার আরম্ভ করতেন। অন্যে রামুকে বলত, "আজ স্বামীজী চটেছেন। আজ এস, কাল দেখা হবে।"

স্বামীজী মাছ, মাংস খেতেন কি না জিজ্ঞাসা করলে equivocally (দ্ব্যর্থক) উত্তর দিতেন, "Swamiji never enjoyed flesh" (স্বামীজী কখন মাংসাহার পছন্দ করেন নি)।

উৎসবের সময় যে সব জিনিস সংগ্রহ হতো তার অনেক হয়তো উদ্বৃত্ত

আসা, তিনি তা নিত্য ঠাকুর সেবায় লাগাতেন। তাতে কিছু moral scruple (নীতিগত দ্বিধা) বোধ করতেন না।

আমাকে প্রথম প্রথম মাদ্রাজ দেখে আসবার কথা বলতেন। বলতেন "ভাড়া দেব।" আমার যাবার তখন সুবিধে হয়নি। শেষেও একবার যেতে বলেন। কিন্তু বললেন, (ইঙ্গিত করলেন মঠের দিকে) "এরাই ভাড়া দেবে।"

গোড়া থেকে 'রামানুজ চরিত' লিখে আমার আমলে regularly (নিয়মিত) 'উদ্বোধন'-এ চালাতে থাকেন এবং আমার আমলেই শেষ হয়। আর একটা chapter (অধ্যায়) আরম্ভ করেন 'উপদেশ স্তোত্ররত্নমালা' কি ঐরকম একটা কিছু। কয়েকটি শ্লোক অনুবাদ করে chapter-টা (অধ্যায়) complete (শেষ) করেননি বলে ওটা আর ছাপাইনি। তাগাদা দেওয়াতে লিখবেন বলেছিলেন কিন্তু আর ঘটে ওঠে নি। 'রামানুজ চরিত' যখন পুস্তকাকারে উদ্বোধন থেকে ছাপা হয় তখন আমি লিখেছিলাম, "এ বই-এ আপনি copy right (স্বত্ব) রাখবেন কিনা বা মাদ্রাজ মঠকে কিছু দিতে হবে কি-না?" উনি জবাবে লিখেছিলেন, পরে ভেবে লিখবেন। কিন্তু আর কিছু লেখেন নি। গোড়ার দিকে যেখানে আলোয়ারদের বর্ণনা আছে সেখানে কোন আলোয়ারকে বিষ্ণুর শঙ্খের অবতার বলেছে। তিনি সেটা যথাযথ লিখে পরে remark (মন্তব্য) স্বরূপ লিখেছিলেন, "আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকগণ শঙ্খের অবতার শুনিয়া আজিংশৎপাটি বদন আবিষ্কার করিয়া হাস্য করিবেন।"

আমি এখানকার ভাষা একটু বদলিয়ে দিয়েছিলাম। স্বামীজীর লেখা 'শিবস্তোত্রম্' এখন যেটা 'বীরবাণী'তে বেরিয়েছে সেটা 'উদ্বোধন'-এ ছাপার আগে শশী মহারাজকে edit (সম্পাদনা) করতে মাদ্রাজে পাঠিয়েছিলাম। তিনি edit (সম্পাদনা) করে পাঠান। বোধহয় মূলটি ঐখানে রেখেছিলেন। শেষের দিকটা স্বামীজীর ছিল 'প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতং', উনি করেছিলেন 'প্রাণবিচ্ছেদসূৎকং'। অনুবাদ উনিই করে দিয়েছিলেন। 'চিকাগো বক্তৃতা'র বঙ্গানুবাদ ওঁরই করা।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বাভাস' নামক একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। তখন দক্ষিণেশ্বরে মাঘী পূর্ণিমায় কয়েকবছর ধরে রামদয়াল চক্রবর্তী প্রভৃতির উদ্যোগে ঠাকুরের একটি উৎসব হচ্ছিল। সেই উৎসবে পঞ্চবটীমূলে সেটি পঠিত হয়। পরে সেটি 'উদ্বোধন'-এ ছাপাই।

তা ছাড়া 'উদ্বোধন'-এ 'দাক্ষিণাত্যে দেবমন্দির' নামক একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এখন যে মন্ত্র পড়ে মঠে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দেওয়া হয় তা শশী মহারাজ-এর রচনা। শুনেছি তিনি অনেক গৃহস্থকেও এই মন্ত্র পড়িয়ে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করতেন। সেইজন্য দ্বাদশ মন্ত্র যাতে বিবাহ না করার কথা আছে তাতে 'গৃহস্থানাং পক্ষে' এই বিধি বলে অন্য মন্ত্র আছে। অর্থাৎ পরস্ত্রীতে মাতৃবুদ্ধি করতে হবে। আমি পরে ওর ভিতর একটু আধটু addition alteration (অদল বদল) করেছি। শুনেছি শর্বানন্দ শশী মহারাজের নিকট মাদ্রাজে ঐ মন্ত্রেই ব্রহ্মচর্য নিয়েছিল। তাঁকে তেজনারায়ণ নাম মহারাজই দিয়েছিলেন। পরে ওর কপি মঠে আনিয়ে মহারাজ প্রথম বিশ্বরঞ্জন ও রুদ্রকে বিধিপূর্বক ব্রহ্মচর্য দেন। দ্বিতীয়বার ১৯১২ সালে কনখলে মহারাজ জীবন, লক্ষ্মণ ও রমেশকে ঐ পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মচর্য দেন। আমি মন্ত্র পড়ি। জীবন বিবাহিত ছিল। শশী মহারাজের দুই ধরনের মন্ত্রই তার case-এ (ক্ষেত্রে) applied (প্রযোজ্য) হয় না বলে আমি 'পুত্রদারাদীন্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি মন্ত্র রচনা করি এবং নারায়ণ জ্ঞানে রোগী শুশ্রূষা যে ব্রহ্মচারীর অন্যতম কর্তব্য সে কথা এই পদ্ধতিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ না থাকায় আমি 'রোগাক্রান্তান্ ঔষধপথ্যাদিদানেন শুশ্রূষয়া চ' ইত্যাদি অংশও যোগ করি।

পাঁজিতে দুর্গাপূজার সময় লেখা থাকে—অমুক সময়ে 'পূজা সমাপ্যা'। আমরা ঠিক পাঁজির মতে পূজা করবার জন্য একবার রাত্রি তিনটা থেকে উঠে পূজার জোগাড় করে ঠিক পাঁজির মতে ৮½ / ৯টার ভিতর পূজা শেষ করি। বোধ হয় ওর মধ্যে একটা খিচুড়ি ভোগও দেওয়া হয়েছিল। অত সকাল সকাল পূজা শেষ করা কিন্তু মঠের সকলের মনঃপূত হয়নি। এই নিয়ে তর্ক চলতে থাকে। পরে একবার শশী মহারাজ মঠে আসলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, পাঁজিতে যে সময় 'পূজা সমাপ্যা' লেখা আছে, সেই সময়ে আরম্ভ করলেই হলো।

শুনেছি মাদ্রাজে যে সব ব্রহ্মচারী যেত তিনি তাদের উলঙ্গ করে তাদের শরীর পরীক্ষা করে দেখতেন। শরীরে কোন ত্রুটি তাঁর চোখে পড়লে তাকে দিয়ে ঠাকুরের সেবার কার্য করাতেন না।

একবার শশী মহারাজ মাদ্রাজ থেকে টেলিগ্রাম মনি অর্ডার পাঠান—একটি রসুই বামুন ও দু-জন কর্মী পাঠাবার জন্য। টাকা অনেক দিন পড়ে থাকে। সেই সময় বিশ্বরঞ্জন ও প্রকাশকে পাঠাবার কথা হয়। শেষে অনেক পরে প্রকাশ

যায়। সে এক বছর ছিল। বোধহয় এই সময়ে প্রভাকর ব্রাহ্মণের ভাগনে অভিরামকে পাচক ব্রাহ্মণ করে পাঠান হয়। সেও বছর খানেক ছিল।

রুদ্রকে মাদ্রাজ পাঠাবার পূর্বে যোগীন (উমানন্দ) মহারাজের নিকট সন্ন্যাস নিতে মঠে এসেছিল। সে প্রায় ছ-বছর শশী মহারাজের কাছে ছিল। তারা জাতিতে তেলী। কিন্তু বাড়িতে তাদের ময়রার কাজ ছিল বলে সকলে তাকে জাতিতে ময়রা বলে জানত। সে নানারকম খাবার তৈরি করতে জানত। শশী মহারাজ তাকে দিয়ে নানান খাবার তৈরি করিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিতেন। তিনি তাকে মহারাজের নিকট সন্ন্যাস নিতে পাঠিয়েছিলেন। মহারাজকে আগে না জিজ্ঞাসা করেই পাঠিয়েছিলেন। তার সন্ন্যাস নিয়ে পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন বেড়াবার ও তপস্যা করবারও ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য তাকে পাঠাবার পর শশী মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে তাঁর সাহায্যের জন্য মঠ থেকে পাঠাবার জন্য বার বার লিখতে থাকেন। এতে মহারাজ বিরক্ত হয়ে আমাকে দিয়ে লেখান—"আমাকে আগে না জানিয়ে যোগীনকে পাঠালে কেন?" তাতে শশী মহারাজ অভিমান করে কিছুদিন মহারাজকে কোন পত্রাদি লেখেন নি। রামু শেষে লিখল, "একলা স্বামী খুব খাটছেন। তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে" ইত্যাদি। এদিকে রুদ্র অল্পদিন হলো মঠে যোগ দিয়েছে। তখন মঠে আমরা নিজেরা উপনিষদাদি শাস্ত্র পড়ি। সকলে মিলে মঠে শশী মহারাজের খুব সমালোচনা চলছে—তাঁর ওখানে নূতন ব্রহ্মচারীর কোন training (শিক্ষা) হয় না। তিনি অনর্থক ব্রহ্মচারীদের অতি কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি দেন। ঠাকুরের ভোগ দেওয়া জিনিস রুটি প্রভৃতি বাসি রেখে সেগুলো প্রসাদ বলে তাদের খাওয়ান। তাতে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয় ইত্যাদি। যোগীন কাউকে পাঠাবার গা না দেখে মাঝে মাঝে নার্ভাস হয়ে বলে, "কাউকে না পাঠান তো বলুন, আমি আবার ফিরে যাই।" শেষে প্রায় তিনমাস মঠে থাকার পর রুদ্রকে পাঠান হয়।

একবার শুনেছি মাদ্রাজে মঠে মহারাজ শশী মহারাজকে criticise (সমালোচনা) করেছিলেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ তাতে যোগ দিয়ে শশী মহারাজের নিন্দা করতে থাকেন। তাতে মহারাজ কৃষ্ণলাল মহারাজকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন "আমি শশীকে ধমকাচ্ছি বলে কেষ্টলালও ঐরকম বলবে কেন? ওর মতো সাধু কটা হয়।"

শুনেছি যখন বরাহনগর মঠ প্রথম হয়, তখন স্বামীজীর কথায় শশী মহারাজ ঠাকুরপূজার ভার নেন। তিনি কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে পূজা-সেবার ব্যবস্থা

করেন। তাঁর নিয়মে বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরকে সর্বশুদ্ধ চোদ্দটি পান ভোগ দিতে হতো। বোধ হয় মঠের অন্য সকলের চোদ্দটি পান সাজতে অসুবিধে হতো বলেই হোক বা যে কারণেই হোক তাঁর সঙ্গে অপরের তর্কবিতর্ক হয়। স্বামীজীও শশীমহারাজের বিরুদ্ধে তর্কে যোগ দিয়েছিলেন এবং চোদ্দটি পানের পরিবর্তে দশটি বারটিতে কেন হবে না এরকম তর্ক করেছিলেন।

এই অবস্থায় শশী মহারাজ উত্তেজিত হয়ে fourteen, fourteen (চোদ্দটা চোদ্দটা) বলে চিৎকার করতে করতে রাগ করে মঠ থেকে বেরিয়ে যান। অবশ্য তার কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসেন।

শুনেছি বরাহনগরে প্রথম অবস্থায় সুরেশবাবু যখন খরচ দিতেন তিনি তা regularly না দেওয়ায় এবং এঁরা না নিতে যাওয়ায় খুব অনটন হয়। তখন স্বামীজী বলেন, আমরা সংসার ত্যাগ করেছি, আবার মঠ করে কোন্ শালার খোশামোদ করব? বলরামবাবুর বাড়িতে বইপত্র সব পাঠিয়ে দিয়ে সকলকেই এদিক ওদিক যেতে বলেন। এই সময়ে শশী মহারাজ কেবল বলেছিলেন, আমি মহিম চক্রবর্তীর রামকৃষ্ণ ফ্রি-স্কুলে পড়িয়ে সেই টাকায় ঠাকুর সেবা চালাব। শুনেছি স্বামীজী তাঁকে মাদ্রাজে পাঠাবার পূর্বে তিনি মঠ ছেড়ে কোথাও যান নি। কেবল একবার মাত্র নাকি কয়েকদিনের জন্য গাজিপুরে গিয়েছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই জ্বর নিয়ে ফিরে আসেন। এমনকি কাশী বৃন্দাবন কোথাও যান নি। মাদ্রাজ অঞ্চলে অনেক বেড়িয়েছিলেন লেকচার দেবার জন্য নূতন centre (কেন্দ্র) খোলবার চেষ্টায় এবং শ্রীশ্রীমা ও মহারাজকে রামেশ্বরাদি দেখাবার উদ্দেশ্যে।

মহারাজ মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান দর্শন করে এসে বললেন, "দেখলুম শশী একটুও বেড়ায় না। দিনরাত একটা চেয়ারে বসে শরীরকে মোটা ও খারাপ করে ফেলেছে।" প্রথমে তাঁর বহুমূত্র তারপর যক্ষ্মা হয়।

যখন থাইসিসে ভুগছেন উদ্বোধনে তখন একদিন কি কারণে বাবুরাম মহারাজকে খুব গালাগালি দেন। তারপর যখন হুঁশ হলো কি করে ফেলেছেন, তখন বাবুরাম মহারাজকে ডেকে বললেন, "আমাকে ক্যাঁত ক্যাঁত করে লাথি মার।" শেষে যতক্ষণ না বাবুরাম মহারাজ গায়ে পা ঠেকালেন কিছুতেই শান্ত হলেন না। করুণানন্দকে তাঁর সেবা করতে বলা হলো, সে করল না, অন্যস্থানে গেল। বিশ্বরঞ্জন প্রভৃতি যোগেন ঠাকুরের ছেলেরা সেবা করলে।

শশী মহারাজের বাবা ঈশ্বর ভট্টাচার্যকে বাড়িতে থাকতে প্রথম দেখি। তিনি জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের শিষ্য এবং পূর্ণাভিষিক্ত ছিলেন। তিনি ইন্দ্রনারায়ণের পুরোহিত ছিলেন। আমাদের পাড়ায় একটি অন্ধকে সঙ্গে করে সাহায্যের জন্য ইন্দ্রনারায়ণের পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে কয়েকবার নিয়ে যাই। তার মধ্যে একবার ঈশ্বর ভট্টাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন শশী মহারাজকে জানি, কিন্তু ইনি যে শশীমহারাজের বাবা তা জানতুম না। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে ইন্দ্রনারায়ণের কথা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত সাধনা হয়েছিল, তাঁর এখনও ঘুম ভাঙে নি।" তারপর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে প্রায় বেলা ১২টার সময় নিরাশ হয়ে ফিরে যাবার সময় ঈশ্বর ভট্টাচার্যকে খোঁজাতে দেখলাম তিনি ঠাকুরঘরে পূজায় বসেছেন। সেখানে কতকগুলি গেরুয়া পরা সাধু দেখেছিলাম। তাঁরা বেলা দেখে আমায় খেতে বলেছিলেন, চলে এলাম।

তারপর মঠে স্বামীজী থাকতে এঁকে অনেকবার দেখি। মাঝে মাঝে এসে কিছুদিন ধরে থাকতেন । প্রত্যহ ২রূপ চণ্ডী পড়তেন। তান্ত্রিক ক্রিয়ান্যাসাদি এত অভ্যাস ছিল যে রাত্রিতে ঘুমাতে ঘুমাতে 'অং কং খং' ইত্যাদি আওড়াতেন। পাশের লোকের ঘুমের ব্যাঘাত হতো। একবার সমগ্র চণ্ডীর হোম সাকল্য দিয়ে করেছিলেন। আমরাও "স্বাহা" "স্বাহা" করে (সন্ধ্যার পর উঠানে) অগ্নিতে সাকল্য দিয়েছিলাম। আমরা পূজার জন্য মুদ্রাদি শিখছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'এক তত্ত্বমুদ্রা দেখালেই সব মুদ্রা সিদ্ধ হয়।' একদিন দুর্গাপূজার সময়ে (ঘটে) আমাদের একখানি মাত্র বস্ত্র ছিল। তা সপ্তমীর দিন নিবেদন করে দেওয়াতে মহাষ্টমীর দিন 'বস্ত্রার্থে গঙ্গোদকম্' মন্ত্র পড়াচ্ছিলাম। তাঁকে আমাদের পূজার সময় থেকে ঠিক ঠিক হয় কি না দেখতে বলা হয়েছিল। ভট্টাচার্য মশায় ঐ কথা শুনে চটে গিয়ে বলে ছিলেন, "দেবী কি এক কোমর জলে গিয়ে দাঁড়াবেন নাকি? ঐ নিবেদিত বস্ত্রখানিই চেয়ে নিয়ে নিবেদন করে দাও।" স্বামীজী যে প্রতিমা করে ১৯০১ সালের অক্টোবরে মঠে দুর্গোৎসব করেন, তাতে ইনিই তন্ত্রধারক ছিলেন এবং তার পরের ৺কালীপূজায় কারণ খেয়ে পড়ে গেছিলেন শুনেছি। স্বামীজীর দেহত্যাগের দিন মঠে আসেন। স্বামীজী তাঁকে দেখে খুশি হয়ে বলেন, "এই যে ভট্‌চায্যি মশায় এসেছেন। ভালোই হলো। কাল পঞ্চোপচারে ৺কালীপূজা করবার ইচ্ছা আছে।"

শুনেছি ঠাকুরের নিকট যখন শশী মহারাজ যাচ্ছেন, তখন একবার তাঁর বাবা জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনতে

গিয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি ঠাকুরের নাকি নিন্দা করেন। শশী মহারাজ অমনি 'কঃ পিতা' বলে তাঁকে কাটতে গিয়েছিলেন। তাতে ভট্টাচার্যমশাই খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, তোরই ঠিক ঠিক গুরুভক্তি।"

একবার বোধ হয় আলমবাজার মঠে, বাড়ি থেকে এসে রাত্রে আছি। রামবাবু (দত্ত) সম্বন্ধে কথা উঠেছে। যতটা মনে হয় নিত্যানন্দ স্বামী এবং যোগীন চাটুয্যে রামবাবুর খুব নিন্দা করছিল, শশী মহারাজ ধমক দিয়ে বললেন, "রামবাবু কত বড় বিশ্বাসী ভক্ত জান? আমরা পরস্পর ঝগড়া করি সে আলাদা কথা। ভায়ে ভায়ে ওরকম ঝগড়া হয়। তা বলে নিন্দা করবে কেন? জান না, পাণ্ডবেরা বলেছিল, 'আমরা কৌরবের সঙ্গে বিবাদ করি বটে, কিন্তু এখন আমরা একশ পাঁচ ভাই।' তুমি (আমাকে লক্ষ্য করে) বরং একদিন কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান দেখে এসো।"

বরাহনগর মঠে ভবনাথবাবু এসেছেন। তিনি দুঃখ করছেন ঃ "তোমরা কেমন সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাকছ আর আমরা সংসারে হাবুডুবু খাচ্ছি।" ভবনাথ এই সময়ে একটি গান গেয়েছিলেন মনে আছে ঃ

"কেন অমিয় ভ্রমে গরল কর পান
কেন আপাত সুখেতে মজি ভুল পরিণাম।
ভেবেছ কি সার তবে, চিরদিন এইভাবে যাবে?" ইত্যাদি।

শশী মহারাজ তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিলেন ঃ "গৃহস্থ কতকগুলি মাছ এনে কতক জিইয়ে রেখে দিয়েছে এবং কতক খোলায় চাপিয়ে ভাজছে। আমাদের এখন তিনি ভাজছেন। তোমাদের জিইয়ে রেখে দিয়েছেন। আবার সময় হলে তোমাদেরও খোলায় চাপাবেন।"

[শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর প্রসঙ্গ, স্বামী কমলেশ্বরানন্দ,
প্রথম প্রকাশ ঃ ফাল্গুন ১৩৮৪, পৃঃ ৫১-৬৫]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিকথা

স্বামী বোধানন্দ

১৮৯০ সালে গ্রীষ্মের শেষভাগে কোন একদিনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সাথে প্রথমবার সাক্ষাৎলাভ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি তখন অন্যান্য সাধুদের সাথে বরানগর মঠে বাস করছিলেন। দিনটি ছিল অত্যন্ত গরম। সময় অপরাহ্ন তিনটে। আসরে আমরা পাঁচজন ছিলাম; খগেন পরবর্তী কালে স্বামী বিমলানন্দ, কালীকৃষ্ণ পরে স্বামী বিরজানন্দ, সুধীর পরবর্তী কালে স্বামী শুদ্ধানন্দ, সহপাঠী কুঞ্জলাল শীল ও আমি।

কিভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা জানলে খুব মনোরঞ্জক হবে বলে আমার মনে হয়। ওই একই বছরের বসন্তকালে আমার সমবয়সী চৌদ্দ-পনেরোটি বালক (বয়স চৌদ্দ থেকে কুড়ির মধ্যে) 'ভগবৎ সন্ধিৎসু' নামে একটি দল গঠন করেছিল যারা সাধুসঙ্গ অভিলাষী এবং তাঁদের নির্দেশানুযায়ী সাধনা করতে উৎসুক ছিল। আমরা কতিপয় ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়ে তাঁদের নির্দেশানুযায়ী সাধনা করেছিলাম। আমরা কালীঘাটের মন্দির দর্শনে যেতাম, গীতা, ভাগবত, উপনিষদ পাঠ করতাম, একাদশী, অষ্টমী এবং শিবরাত্রির দিন উপবাস করতাম, প্রায় প্রত্যেকদিন গঙ্গাস্নান করতাম ইত্যাদি।

১৮৯০ সালের জুলাই বা আগস্ট মাসে, আমরা কাঁকুড়গাছিতে মন্দির প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসবে যোগদান করলাম। প্রায় সেই সময় থেকে আমরা রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কালীপদ ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট গৃহী শিষ্যদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত রিপন কলেজে আমাদের অধ্যাপক ছিলেন। আমরা কলেজের অবসর সময়ে কলেজের বারান্দায় এবং অন্যান্য সময় তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা, রামচন্দ্র দত্তের বর্ণনা অপেক্ষা ভিন্ন ছিল এবং তা আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করত। প্রকৃতই তিনি একদিন অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে আমাদের কাছে বলেছিলেন যে যদি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে জানতে চাই তবে আমাদের তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত। তাঁরা

তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) বাণীর জীবন্ত ভাষ্য। তিনি আমাদের তাঁদের ঠিকানা দিলেন। তিনি তাঁর নিজস্ব কৌতুকমাখা ভঙ্গিমায় বললেন—যে সমস্ত শিষ্যরা শ্রীরামকৃষ্ণকে আদর্শ জ্ঞানে জীবনযাপন করার জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছেন তারা হচ্ছেন ফজলি ও ল্যাঙড়া শ্রেণির আম এবং গৃহিভক্তেরা সাধারণ শ্রেণির আম যা সাধারণত পরিপক্ক অবস্থায়ও টক থাকে। সন্ন্যাসী শিষ্যরা এখনও সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা লাভ না করলেও যখন তা করবেন তখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সুমিষ্ট হবেন। তিনি আমাদের তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সেবা করার জন্য উৎসাহিত করলেন। তাঁর নিকট তাঁদের (সন্ন্যাসী শিষ্যদের) সেবা করাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা। তাঁর কাছ থেকে এই নির্দেশ পাবার পর আমরা বরানগর মঠে সন্ন্যাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম।

মঠটি এক পুরাতন জীর্ণ, ইঁট দিয়ে তৈরি বাড়ির দোতলায় অবস্থিত ছিল। বরানগর কলকাতা থেকে চারমাইল উত্তরে। আমরা অর্ধেক রাস্তা মোটর গাড়িতে এবং বাকি রাস্তা পায়ে হেঁটে গেলাম।

আমরা যখন বিরাট কক্ষটিতে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম চার-পাঁচটি কম্বলাসনসহ ব্যাঘ্রচর্ম ও হরিণচর্ম বিছানো। আমরা প্রথমে সাক্ষাৎ পেলাম স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) যিনি বলিষ্ঠ এবং পরিচ্ছন্ন মুখশ্রীযুক্ত, আঠাশ/উনত্রিশ বছর বয়সের সন্ন্যাসী। আমরা তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলাম। তিনি আমাদের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে আমরা বললাম যে আমরা ছাত্র এবং মাস্টারমশায় (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) আমাদের অধ্যাপক। তিনি আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁদের নিকট থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে জানতে বলেছেন। যখন তিনি শুনলেন যে আমরা ছাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি আমাদের কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। খুব সম্ভবত আমরা সেগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। তিনি ভাবলেন হয়তো আমরা কর্তব্যবিমুখ এবং পড়াশোনায় অমনোযোগী। তিনি আমাদের সামান্য বকুনি দিয়ে পড়াশোনা অবহেলা না করার উপদেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যালয় শিক্ষাকে বুদ্ধি-শুদ্ধির একটি অনন্য সাধারণ উপায় বলে মনে করতেন (শিক্ষার ফল স্বরূপ বুদ্ধি শুদ্ধি)।

এক্ষণে আমরা অন্যান্য সন্ন্যাসীদের দেখলাম। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ছয়/ সাত জন। বেলা চারটের সময় নিত্য বৈকালিক ঠাকুর সেবা ছিল। আমাদেরকে

মন্দিরে নিয়ে গেলেন এবং আমরা শয্যার উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিত্র, তাঁর পূত ভস্মাবশেষ (শয্যার নিম্নে একটি বেলনাকৃতি কৌটাতে), তাঁর পবিত্র পাদুকাদ্বয় এবং অন্যান্য কয়েকটি মূল্যবান স্মৃতি বিজড়িত জিনিসপত্র দেখলাম। সামান্য জলযোগ আমাদের দিলেন এবং আমরা খেলাম। বিদায়ের পূর্বে আমরা সন্ন্যাসীদের প্রণাম করলাম এবং তাঁদের আশীর্বাদ নিলাম। ওই দিনটি থেকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতি অনুরাগ জন্মাল এবং তা ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকলো। পরিণতি হলো রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সদস্য হওয়া।

আমরা কখনও একাকী কখনও অন্যদের সাথে রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে মঠে যেতাম। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অনুমতি নিয়ে আমরা এক দুইদিন মঠে থাকতাম। ওই দিনগুলিতে আমরা সন্ন্যাসীদের নিকট সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেতাম এবং আমরা তাঁদের পূত সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছিলাম। ওই মঠবাসের কোনো এক সকালে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী নিভৃতে আমায় জিজ্ঞেস করলেন যে আমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যাহ্ন ভোগের জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ভিক্ষা সংগ্রহের নিমিত্ত তাঁর সঙ্গে যাব কিনা। আমি অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাঁর সাথে যেতে রাজি হলাম। আমরা যখন নিচের তলায় এলাম, তখন স্বামী ত্রিগুণাতীত একটি গেরুয়া কাপড় দিয়ে তা পরিধান করতে বললেন। আর আমার নিজের সাদা কাপড় পুরানো ইঁটের (যা সেখানে প্রচুর ছিল) তলায় রাখতে বললেন। তারপর আমরা রাস্তায় বের হলাম। আমরা বাজারের ভিতর দিয়ে কাছাকাছি গ্রামগুলিতে গেছলাম। আমরা "রাধাকৃষ্ণ" নাম করে লোকের বাড়িতে ভিক্ষা চাইতাম। তাঁরা আমাদের ভিক্ষার ঝুলিতে চাল, আলু, কিছু শাকসবজি দিতেন। এভাবে ভিক্ষা সংগ্রহ করে মঠে ফিরবার পথে আমরা ৺সর্বমঙ্গলার মন্দির দর্শন করলাম।

আমরা যখন মঠে এলাম তখন প্রায় বেলা এগারটা। নিচের তলায় আমি গেরুয়া পোশাকটি ছেড়ে সাদা পোশাক পরে উপরের তলায় এলাম। স্বামী ত্রিগুণাতীতজী ছাড়া আর কোন সন্ন্যাসী এ ঘটনা জানতেন না। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাদের ভিক্ষা দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। চার পাউন্ডের মতো চাল আমরা পেয়েছিলাম এবং তা দুপুরের ভোগের জন্য রান্না হলো। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বললেন "শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভিক্ষান্নকে খুব পবিত্র বলে মনে করতেন।"

রবিবার, ছুটির দিন, গরমের ছুটি ছাড়াও অন্যান্য দিনেও আমি মঠে

থাকতাম। একবার আমি মঠে দীর্ঘকাল ছিলাম। এতে আমার বাবা চিন্তিত হয়ে আমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে মঠে এলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁকে অত্যন্ত সাদর এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। বাস্তবিক আমার বাবা এত খুশি হয়েছিলেন যে তিনি রামকৃষ্ণানন্দের অনুরাগী হয়ে পড়েন। তিনি যখন মঠে পৌঁছেছিলেন তখন বেলা প্রায় ১১টা। সেদিন ছিল একাদশী এবং ওই দিনে তিনি উপবাস পালন করতেন। দুপুর প্রায় ১২টার সময়, মঠ থেকে মাত্র কয়েকশো ফুট দূরে গঙ্গায় তিনি স্নান করতে গেলেন। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেদিন মঠে ছিলেন। তিনি তাঁকেও সঙ্গে নিলেন। তাঁদের মধ্যে অল্প কথাবার্তা হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত আমার বাবাকে বললেন যে নবীন সন্ন্যাসীরা গেরোবাজ পায়রার ঝাঁকের মতো, যারা তাঁদের বাসা ছেড়ে উপরে উড়ে যায়। অন্যান্য পায়রাদের ডাকে। সে ডাকে বাসা থেকে পায়রারা বেরিয়ে আসে। আমার বাবা পরবর্তী কালে আমাকে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। খুব সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল যে মঠের সন্ন্যাসীরা গেরোবাজ পায়রার মতো অন্যান্য যুবকদের ঘর থেকে বের করে এনে তাঁদের দলে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। তিনি তাঁর সঙ্গে আমাকে ঘরে ফিরে যাবার জন্য বললেন না। "আমি পরে ঘরে ফিরে যাব" এই প্রতিশ্রুতি আমার কাছ থেকে নিয়ে তিনি একাকী ঘরে ফিরে গেলেন। অপরাহ্ণ তিনটের সময় আমি মঠ থেকে বিদায় নিলাম। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমায় বললেন যে তিনি আবার আসবেন। মনে হয় তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরবর্তী তিথি পুজোতে যোগদান করেছিলেন এবং মাস কয়েক পর দেহত্যাগ করেন।

ছুটিতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াতের সময় কোন একবার অনেকদিন মঠে ছিলাম, যা সাধারণত আমি কোন দিন করিনি। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছুটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আর যদি জানতে পারতেন যে আমি তার চেয়ে বেশিদিন মঠে আছি তা হলে তিনি বকাবকি করতেন। এক-দুইবার বকুনি এত তীব্র হলো যে ঘরে ফেরার সময় আমি ভীষণ কান্নাকাটি করলাম। এসব দেখে তিনি ভেবেছিলেন যে আমি খুবই আবেগপ্রবণ যুবক।

আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে কঠোর মনে হলেও তাঁর হৃদয় ছিল ভালোবাসা ও করুণায় পূর্ণ। যদিও তিনি সাধারণভাবে শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু অনেক ব্যাপারেই তিনি সরল ও স্পষ্টবাদী, সাধাসিধে এবং শিশুর মতো হাসি-খুশি ও প্রাণবন্ত ছিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন মঠের স্থায়ী বাসিন্দা। কত প্রীতির সাথে তিনি অন্যান্য সন্ন্যাসী, গৃহিভক্ত ও অভ্যাগতদের যত্ন করতেন। তিনি রান্না, সেবা, ধোয়া মোছা, শিক্ষাদান, বক্তৃতা দান এবং মন্দিরের কার্যাদি করতেন।

তিনি ছিলেন একজন আদর্শ কর্মযোগী। গুরুভাইদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অনন্য সাধারণ। সত্যি সত্যিই তিনি তাঁদের সকলের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতি অনুভব করতেন। অনেকবারই আমি তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতে দেখেছি। যদিও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর গুরু ছিলেন তথাপি তাঁর ভক্তি বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। তবুও তিনি গোঁড়া বা একদেশদর্শী ছিলেন না। সমস্ত অবতারদের, সব মতবাদের প্রতিষ্ঠাতাগণের, সব প্রচারকগণের এবং সর্বদেবদেবীর প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল অতুলনীয়।

যথার্থই তিনি ছিলেন শক্তির স্তম্ভস্বরূপ এবং আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার এক মহান উৎসস্বরূপ। তিনি আমাদের কয়েকজনের মধ্যে মেকি বিনয়ের ভাব লক্ষ্য করেছিলেন যা ছিল সহজাত কিংবা অপরের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। তিনি একদিন আমাদের আত্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বললেন ঃ

"কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে গীতার উপর বক্তৃতা তুমি করতে পারবে কিনা। কখনও বলবে না যে 'আমি গীতার বিষয়বস্তু এত ভালো জানিনা যে তার উপর বক্তৃতা করতে পারবো' এই মিথ্যা ভীরুতা ত্যাগ করে বল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই পারব।' এই স্বীকারোক্তি হবে সৎ এবং সত্য। অন্য দিকে তুমি যদি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বল—'আমি সামান্য জানি' অনেকে সেটাই বিশ্বাস করবে এবং যা হবে মিথ্যা। তোমার নিজের শক্তির উপর সাহস ও বিশ্বাস স্থাপন কর। সঙ্কল্প কর, 'আমি একাজ করতে পারি এবং আমি তা করবই।' এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তুমি অবশ্যই সফলতা লাভ করবে।"

এরপর তিনি ফ্যারাডে এবং তাঁর ছাত্রদের কাহিনি আমাদের শোনালেন। একদিন ফ্যারাডে এক নবীন ছাত্রকে শ্রোতৃবৃন্দের সামনে বক্তৃতা করতে বললেন। ছাত্রটি জিজ্ঞাসা করলেন যে শ্রোতৃবৃন্দ বিষয়বস্তুর কতটা জানে বলে তিনি আশা করবেন? উত্তরে ফ্যারাডে বললেন, "জানবে তোমার শ্রোতারা কিছুই জানেন না। তুমি তাঁদের নতুন কিছু দিতে যাচ্ছ।"

রামচন্দ্র দত্ত সন্ন্যাসীদের কোন কোন সময় সমালোচনা করতেন। তিনি কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ভক্তির প্রশংসা করতেন। সত্য সত্যই তাঁর সেবাভাব ছিল অনন্য যা তাঁর নিজস্ব। মন্দিরে তাঁর দৈনন্দিন পূজা ও সেবা দর্শন করার যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছিল, এই কথার সত্যতা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। তাঁর শয্যাপ্রস্তুতি, সন্ধ্যারতির পর খাটের চারদিকে মশারি টাঙানো, পবিত্র ভস্মাবশেষ এবং পাদুকায় পুষ্পার্পণ, আরাত্রিক, শিব ও গুরুনাম সঙ্কীর্তনের সাথে সাথে তাঁর ভাবোন্মত্ত নৃত্য, গ্রীষ্মের রাত্রিতে বিছানায় বৃহৎ পাখা দিয়ে ব্যজন, ভোগের জন্য রন্ধন, দক্ষতা, পরিচ্ছন্নতা, তৎপরতা এবং প্রতিটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ যত্নশীলতা দর্শকদের মনে এক অনপনেয় ছাপ রেখে যেত। সম্পূর্ণ দৃশ্যটি ছিলো ভাবোদ্দীপক, আনন্দদায়ক ও মর্মস্পর্শী। তাঁর এবম্বিধ অতি মানবিক ভক্তিরাচরণ দেখে কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হতো।

পাশ্চাত্য দেশ থেকে ভারতে ফিরে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে মাদ্রাজে প্রেরণ করেন। সেটা ছিল ১৮৯৭ সাল। তিনি সেখানে প্রায় চৌদ্দ বছর কর্মোপলক্ষে অবস্থান করেন। আজকের মাদ্রাজ মঠ, স্কুল, স্টুডেন্টস্ হোম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট প্রভৃতি তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও গভীর পরিশ্রমের ফল।

১৯০৪ সালে ব্রহ্মচারী অমূল্য (পরবর্তীতে স্বামী শঙ্করানন্দ) এবং আমি দক্ষিণ পশ্চিম ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলাম। যাবার পথে আমরা বম্বে পৌঁছালাম। স্বামী বিবেকানন্দের গৃহী ভক্ত শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র সোলাপুরে গভর্নমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর ক্যাম্পে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা প্রায় একসপ্তাহকাল তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের জন্য পাণ্ডারপুর তীর্থ-দর্শনের ব্যবস্থা করে দিলেন। সোলাপুর থেকে পাণ্ডারপুর ফিরবার পথে আমি মাদ্রাজে যাব ঠিক করলাম। আর ব্রহ্মচারী অমূল্য অজন্তা ইলোরার গুহামন্দির দর্শন করার মনস্থ করল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাকে মাদ্রাজে দেখে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং অতি স্নেহের সাথে আমার স্বাস্থ্য ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামী বিমলানন্দ এবং স্বামী অচলানন্দ তখন তাঁর সঙ্গে মাদ্রাজ মঠে ছিলেন। সে সময়ে এক বছর আগে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্গালোরের মঠে স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না এবং কাজের ভীষণ চাপে তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সেখানে স্বামী বিমলানন্দকে তাঁর কাজে সাহায্য করতে পাঠান। কয়েক সপ্তাহ পরে আমাকেও সেখানে পাঠান। ওই সময় নারায়ণ

আয়েঙ্গার (পরবর্তী কালে স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ) ব্যাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজে এসেছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় মঠে থাকতেন। ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যাবার দিনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁকে বললেন আমাকেও তাঁর সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যেতে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ধারণা ছিল যে আমরা তিনজন (স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী বিমলানন্দ ও আমি) একত্রে দক্ষতার সাথে কাজ করতে সমর্থ হব।

দক্ষিণ ভারতের লোকেরা দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে খুব পছন্দ করতেন। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মধ্যে কেউই সুবক্তা ছিলেন না। আমরা গীতা, উপনিষদ এবং পঞ্চদশীর বিষয়ে ক্লাস নিতাম। কিন্তু মাত্র কয়েকজন তাতে আগ্রহী ছিলেন। যদিও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের বন্ধু ছিলেন (যেমন ডঃ শ্রীনিবাস রাও, বিচারপতি সিংগ্লাচার, রায় বাহাদুর নরসিংহচার, ডাঃ পাল্পু, রাও সাহেব চেনাপ্পা, অপন্না আয়েঙ্গার, ভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার এবং অন্যান্য অনেকে) কিন্তু ডঃ ভেঙ্কটরঙ্গম এবং নারায়ণ আয়েঙ্গারের মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কেউই আমাদের কাজে প্রকৃত অনুরাগী ছিলেন না। কিন্তু আমরা হতোদ্যম হইনি। আমরা আমাদের লক্ষ্যে স্থির ছিলাম এবং সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে লিখে পাঠালেন যে নিউইয়র্কে (আমেরিকা) স্বামী অভেদানন্দের একজন সহকারী প্রয়োজন এবং তাঁর (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ইচ্ছা যে আমি সেস্থানে গমন করি। উত্তরে আমি বিষয়টি তাঁর বিবেচনার উপর ছেড়ে দিলাম। আমি এ প্রকার উত্তর লিখলাম, "যদি তিনি (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমাকে পাঠাতে চান, আমি যাব। ওই বিষয়ে আমার কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নেই। তাঁর সম্মতি লাভ করে মার্চ মাসের মাঝামাঝি আমি ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে কলকাতা রওনা দিলাম। যাত্রাপথে আমি মাদ্রাজ মঠে দিনকয়েক ছিলাম। সেটাই ছিল আমার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও থাকার শেষ সুযোগ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে নিউইয়র্ক পাঠাতে চাইছেন শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আমাকে বিশেষ আশীর্বাদ করলেন যা আমি আজও গভীরভাবে অনুভব করি।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ভক্তির প্রতিমূর্তি। তিনি ছিলেন সক্রিয়, স্বাবলম্বী এবং পরম ভক্ত। বীর হনুমানজীর কাছে রামচন্দ্র যা ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর কাছে অবিকল তাই ছিলেন। তাঁর জীবন এবং বাণী আমাদের কাছে প্রেরণা স্বরূপ। বাস্তবিকই আমরা খুবই ভাগ্যবান যে আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম এবং

তাঁকে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর বাবা ছিলেন উচ্চকোটির তান্ত্রিক সাধক এবং তিনি তাঁর পুত্রের গুরুভক্তির খুবই প্রশংসা করতেন।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সচ্চিৎ সুখ সাগরেস্মিন্
লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥

"যাঁর হৃদয় সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্মের অনন্ত সাগরে নিমগ্ন, তিনি অবশ্যই তাঁর মাতা, তাঁর পরিবার, তাঁর দেশ এবং পৃথিবীর নিকট আশীর্বাদ স্বরূপ।"

এই উক্তি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্পর্কে সঠিকভাবে প্রযোজ্য।

[স্বামী বোধানন্দজী মহারাজ (১৮৭০-১৯৫০) ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য। বরানগর মঠে যে সকল কলেজ-পড়ুয়া যুবক যাতায়াত করতেন স্বামী বোধানন্দ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯০৬ সালে তাঁকে আমেরিকার নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে পাঠানো হয়। তিনি পাশ্চাত্যে সফল বেদান্ত প্রচারক। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির স্থায়ী বাড়ি তৈরি করেন স্বামী বোধানন্দ ১৯১৫ সালে। ওখানেই তাঁর মহাসমাধি হয় ১৮/০৫/১৯৫০]

অনুবাদক ব্রঃ যতিরাজচৈতন্য

[বেদান্ত কেশরী, আগস্ট, ১৯৫০ পৃঃ ১২৭-১৩১]

শ্রীরামকৃষ্ণানন্দজীর স্মৃতিকথা

স্বামী অচলানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন গলরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৮৬ সালে কাশীপুরের বাগানে চিকিৎসার্থে বাস করিতেছিলেন, সেইসময় শশী মহারাজ প্রমুখ যুবকভক্তগণ অক্লান্তভাবে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত দিবারাত্র তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সেবকদিগের মধ্যে সেবাকার্যে তিনি অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকার্য তাঁহার এমন একটা প্রাণের জিনিস ছিল যে, তিনি নিজের শারীরিক ব্যাধি বা কোনপ্রকার দুঃখকষ্ট গ্রাহ্য করিতেন না। এই সময়ে একবার তিনি কঠিন উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন—এমনকি আস্ত আস্ত ভাত মলের সহিত বাহির হইতে থাকে; তথাপি তিনি একদিনও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু অপর গুরুভ্রাতাগণ উহা জানিতে পারিয়া কয়েকদিন বাধাপূর্বক তাঁহাকে অবসর দিয়াছিলেন। সেবকদিগের প্রাণপাত সেবা এবং বহুবিধ চিকিৎসা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর রোগমুক্ত হইল না। অবশেষে ঐ সালের আগস্ট মাসে তিনি মহাসমাধিতে লীন হইলেন। তাঁহার পূত শরীর কাশীপুর মহাশ্মশানে অগ্নিসৎকার করা হইলে পর তাঁহার দেহাবশেষ ভস্মাস্থি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রবীণ গৃহস্থ ভক্তগণ একটি তাম্রকলসে পূর্ণ করিয়া কাশীপুর বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুর যে-ঘরে বাস করিতেন, সেই ঘরে অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করিলেন এবং দ্বাররুদ্ধ করিয়া শোকাকুল চিত্তে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহারা যুবকভক্তগণকেও নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। শ্রীযুক্ত রামবাবু এই ভস্মাস্থিপূর্ণ কলসিটি নিজের কাঁকুড়গাছির বাগানে সমাহিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু শশী মহারাজ ও নিরঞ্জন মহারাজ দুইজনে পরামর্শ করিয়া গোপনে উক্ত গৃহের sky light দিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক কলসি হইতে ভালো ভালো অস্থি গ্রহণ করিয়া একটি কৌটায় পূর্ণ করিলেন এবং ঐ কৌটাটি সেই রাত্রেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাগবাজারস্থ ভবনে রাখিয়া আসিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম গৃহিভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে এবং পূজ্যপাদ স্বামীজীর আন্তরিক চেষ্টায় ও আগ্রহে বরাহনগরে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম মঠ স্থাপিত হইল, তখন শশী মহারাজই সর্বপ্রথমে

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং বলরাম মন্দির হইতে সেই পূতভস্মাস্থিপূর্ণ কৌটাটি সযত্নে আনয়নপূর্বক নিত্য নিয়মিতভাবে সেবাদি করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সেবাদি কার্য অতি অদ্ভুত রকমের ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবিতাবস্থায় তিনি যেভাবে সেবাদি করিতেন, ঠিক সেইভাবেই সেবা করিতে লাগিলেন। নিত্য দাঁতনকাঠিটি পর্যন্ত থেঁতো করিয়া দিতেন, এমনকি দাঁত খুঁটিবার জন্য খড়কে কাঠিও দিতেন। জলপান দিবার সময় ভিজানো ছোলাগুলির প্রত্যেকটির মুখ কাটিয়া দিতেন। তাঁহার এই সেবাপূজায় বাহ্য আড়ম্বর বা মন্ত্রাদির জটিলতা ছিল না—ছিল প্রাণের টান, অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা। শ্রীশ্রীঠাকুরের এইভাবে সেবাপূজাদি করা প্রথমত পূজ্যপাদ স্বামীজীর মত ছিল না। (পরে অবশ্য তিনি এইভাবে সেবাপূজাদির প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন।) তথাপি শশী মহারাজ কাহারো বাধা-নিষেধ না মানিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেবাপূজাদি করিতে থাকেন। তবে পূজনীয় নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে এবিষয়ে সাহায্য করিতেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ অনেকে তখন তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে অথবা হিমালয়ের নির্জনস্থানে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। কিন্তু শশী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা ত্যাগ করিয়া এক পদও নড়িলেন না—কোন তীর্থে, এমনকি কাশী পর্যন্ত যান নাই। এই সেবাকার্য ফেলিয়া বা অন্য কাহারও উপর ভার দিয়া তিনি কোন স্থানে নিমন্ত্রণেও যাইতেন না।

তিনি যে কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাই করিতেন তাহা নহে—গুরুভ্রাতাদিগকেও জননীর ন্যায় আদরযত্ন করিতেন। সেসময় যেসকল গুরুভ্রাতা বরাহনগর মঠে বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই আহার-নিদ্রা প্রভৃতি শরীর-চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক সর্বদা ভগবচ্চিন্তায় সম্পূর্ণ মগ্ন থাকিতেন। একমাত্র শশী মহারাজই তাঁহাদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া খাওয়াইতেন, তাঁহারই আপ্রাণ চেষ্টায় এই বিশ্ব-বিস্তৃত রামকৃষ্ণ সংঘ শৈশবে পুষ্ট হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘ দশবৎসর প্রথমত বরাহনগরে ও পরে আলমবাজারে ঐপ্রকার তীব্র অনুরাগের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও গুরুভ্রাতাগণের সেবা করিয়াছিলেন। তখন মঠের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। সুরেশবাবু অর্থসাহায্য করিলেও সবসময় তাহাতে সঙ্কুলান হইত না। শ্রীশ্রীঠাকুরসেবায় নিতান্ত অভাব হইলে তিনি ভিক্ষা করিতেন—কখনো বা সন্ন্যাসী হইয়াও ছাত্র পড়াইয়া অর্থসংগ্রহ করিতেন, তথাপি

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় কোনপ্রকার ত্রুটি হইতে দিতেন না। এত পরিপাটিভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় ব্যবস্থাদির জন্য সময়ে সময়ে পূজ্যপাদ স্বামীজীর সহিত তাঁহার বাগ্‌বিতণ্ডাও হইত। কিন্তু তাঁহার এই অটুট নিষ্ঠা ও গুরুগতপ্রাণতা দেখিয়া পূজ্যপাদ স্বামীজী আর বেশি কিছু বলিতে পারিতেন না। প্রত্যহ সন্ধ্যারতির সময় তিনি একেবারে ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন এবং 'জয় শিব ওঁকার, ভজ শিব ওঁকার' বলিতে বলিতে আরতির তালে তালে নৃত্য করিতেন। গ্রীষ্মকালে মধ্যরাত্রে হয়তো নিজের গরম বোধ হওয়ায় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, তখনি শ্রীশ্রীঠাকুরেরও গরম বোধ হইতেছে মনে করিয়া ঠাকুরঘরের জানালা দরজা খুলিয়া দিলেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীশ্রীঠাকুরকে হাওয়া করিতে লাগিলেন। ভক্তিশাস্ত্রের নির্দেশানুসারে তিনি সত্যসত্যই আত্মবৎ ইষ্টসেবা করিতেন। কীভাবে ইষ্টসেবা করিতে হয় তাহার পরাকাষ্ঠা তিনি নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধারণা ছিল, যদি কেহ এইপ্রকার মনপ্রাণ ঢালিয়া একনিষ্ঠভাবে শ্রীগুরু বা ইষ্টের সেবা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার দ্বারাই সেবকের ভক্তি মুক্তি লাভ হয়। এই কারণে তিনি জপ ধ্যান অপেক্ষাও এই সেবার দিকে অধিকতর জোর দিতেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীশ্রীতুরীয়ানন্দজীর একটি কথা মনে হইতেছে। তিনিও তাঁহার শেষ বয়সে এই সেবাকার্যের উপর অত্যন্ত জোর দিতেন। তাঁহার শরীরত্যাগের সাতদিন পূর্বে পূজ্যপাদ স্বামীজী প্রবর্তিত সেবাধর্মের কথা বলিতে বলিতে একেবারে উত্তেজিত হইয়া পড়েন—মুখমণ্ডল আরক্তিম, দৃঢ়স্বরে জনৈক সন্ন্যাসীকে বলিলেন ঃ "সংশয় রেখো না, তাঁর কাজ জেনে সবটা শরীর, মন, প্রাণ তাঁতে ঢেলে দাও। এ থেকেই সব হয়ে যাবে—সমাধি-টমাধি যা কিছু ভাবছ, সব এ থেকেই হয়ে যাবে। সংশয় রেখো না—লেগে যাও। স্বামীজী আমাকে দার্জিলিঙে বলেছিলেন—'হরি ভাই, এবারে নূতন একটা পথ করে দিয়ে গেলুম, এতদিন লোকে জানত ধ্যান, জপ, বিচার প্রভৃতির দ্বারাই মুক্তি হয়—এবারে এখানকার ছেলেরা তাঁর কাজ করে জীবন্মুক্ত, মুক্ত হয়ে যাবে। তাঁর আদেশ, সংশয় রেখো না।' "

বরাহনগর মঠে অবস্থানকালীন শশী মহারাজের পিতা একবার তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি কিন্তু অচল, অটল। যখন সমস্ত অনুরোধ ব্যর্থ হইল, তখন পিতা অতিশয় রুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অযথা নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে শশী মহারাজ আর স্থির থাকিতে

পারিলেন না, অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ "তবে রে শালা!" এই বলিয়া পিতাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। গুরুভক্তিতে তিনি এমনই বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, যদি কেহ তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীগুরুর প্রতি এতটুকু অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহা আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। তখন তাঁহার লঘু-গুরুজ্ঞান থাকিত না। পিতা স্বয়ং একজন বিশিষ্ট সাধক ছিলেন; সুতরাং পুত্রের এতাদৃশ অকপট গুরুভক্তি দর্শনে সাতিশয় মুগ্ধ হইলেন। তদবধি আর কখনো তিনি পুত্রকে গৃহে যাইতে বলিতেন না—বরং মধ্যে মধ্যে বরাহনগর মঠে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ক্রমশ এতটা ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইল যে, বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ স্বামীজী অনুষ্ঠিত প্রথম দুর্গাপূজাকালে তিনিই তন্ত্রধারকের পদে ব্রতী হন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা লইয়া পূজ্যপাদ স্বামীজীর সহিত শশী মহারাজের কখনো কখনো মতভেদ হইলেও স্বামীজীর প্রতি তাঁহার যেমন অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, স্বামীজীও তেমনি তাঁহাকে প্রাণের তুল্য ভালোবাসিতেন এবং তাঁহার উপর অত্যন্ত বিশ্বাসও ছিল। সেইজন্য পূজ্যপাদ স্বামীজী প্রথমবারে আমেরিকা গিয়া সেখানে বেদান্ত প্রচারের জন্য সর্বপ্রথমে শশী মহারাজকেই আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনিও স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য করিয়া আমেরিকা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার শরীরে চর্মরোগ থাকায় ডাক্তারগণ তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন, কারণ শীতপ্রধান দেশে যাইলে উহা আরো বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইল। ডাক্তারের অনভিমত জানিয়া পূজ্যপাদ স্বামীজীও তখন অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পূজ্যপাদ স্বামীজী প্রথমবার আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শশী মহারাজকে মাদ্রাজে গিয়া কেন্দ্র স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'—এই শাস্ত্রবাক্য শশী মহারাজ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। স্বামীজী আদেশ করিবামাত্র কোনপ্রকার দ্বিধা না করিয়া মাদ্রাজ যাইতে সম্মত হইলেন। অথচ ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা ছাড়িয়া কোথাও একপদও যান নাই। তাঁহার ভাব ছিল ভক্তপ্রবর শ্রীশ্রীমহাবীরের ভাবের অনুরূপ। মহাবীর যেমন নিজ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পালনে সদাপ্রস্তুত, শশী মহারাজও সেইরূপ স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দজীর আদেশ নির্বিচারে পালন করিতেন। তাঁহার চরিত্রে একদিকে যেমন দাস্যভাব ছিল, আবার অন্যদিকেও তেমনি বীরভাব,

প্রেমবীর্যভাব লক্ষিত হইত। এইজন্যই তাঁহাকে দাস ও বীর ভক্ত নামে অভিহিত করা যায়। শশী মহারাজ আলমবাজার মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি প্রতিকৃতি পূজা করিয়া নির্দিষ্ট দিনে মাদ্রাজ যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ প্রতিকৃতিখানি নিজ গলদেশে ঝুলাইয়া লইলেন এবং জাহাজপথেও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজাদি সংক্ষেপে সারিয়া লন। মাদ্রাজ মঠ হইতে একা বিশেষ কোন প্রয়োজনে অন্যত্র যাইতে হইলে নিত্য উপাসিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিখানি এইভাবে নিজ গলদেশে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেন এবং পথেও ভোগরাগ ও পূজাদি সংক্ষেপে সারিয়া লইতেন। মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়া তিনি পরম ভক্ত বিলগিরি আয়েঙ্গারের Ice House নামক ভবনে সযত্নে আনিত শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই প্রতিকৃতিখানি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বপ্রথম মঠ স্থাপন করিলেন এবং নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত মঠ এই বাড়িতেই ছিল। প্রথমবার আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে পূজ্যপাদ স্বামীজীকে এই বাড়িতেই অভিনন্দিত করা হয়।

প্রথম অবস্থায় মাদ্রাজ মঠে অত্যন্ত আর্থিক কষ্ট ছিল। কিছুদিন তিনি একাই ছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা ব্যতীত মঠের যাবতীয় কার্য তাঁহাকে অনেকসময়ে নিজহস্তেই করিতে হইত—যদিও স্বামী নির্ভয়ানন্দ, স্বামী সদানন্দ ও ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্র কিছুদিন করিয়া থাকিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বামীজীর আদেশ—সে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই আদেশ মনে করিয়া তিনি সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিয়া যাইতেন।

তুরীয়ানন্দজী ও ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রাকালে পূজ্যপাদ স্বামীজী মাদ্রাজ মঠের জন্য একটি চিনামাটির পাত্রে পতিতপাবনী গঙ্গার পূতবারি লইয়া যান এবং ঐ পাত্রটি মাদ্রাজে নামাইয়া দিয়া যান। সেবারে স্বামীজীর মাদ্রাজে নামা হইল না, কারণ জাহাজ হইতে কোন ভারতবাসীরই নামিবার সরকারি হুকুম ছিল না—পাছে কলকাতা হইতে প্লেগের জীবাণু মাদ্রাজে বিস্তারলাভ করে। শশী মহারাজ প্রাণাধিক প্রিয়তম স্বামীজীকে নামাইতে পারিলেন না বলিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। অগত্যা একখানি নৌকায় চড়িয়া জাহাজ পর্যন্ত কয়েকবার যাতায়াত করেন এবং স্বামীজীর ভুবনমোহন রূপলাবণ্য অতৃপ্ত নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত ঐভাবে অপেক্ষা করিবেন; কিন্তু অবশেষে পূজ্যপাদ স্বামীজীর ধমক খাইয়া নিরস্ত হন ও ফিরিয়া আসেন।

স্বামীজীর সেবার জন্য তিনি প্রচুর খাদ্যাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া জাহাজে উঠাইয়া দেন। শশী মহারাজ সেই গঙ্গাজলের পাত্রটি আনিয়া অতি যত্নসহকারে বন্ধ করিয়া রাখিলেন এবং নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। তদবধি এখনো উহা মাদ্রাজ মঠে সেইভাবে রক্ষিত আছে এবং নিত্য পূজিত হইয়া আসিতেছে।

১৯০০ সালে পূজ্যপাদ স্বামীজী আমেরিকা হইতে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন। ইতঃপূর্বেই ১৮৯৮ সালে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শশী মহারাজ ১৯০১ সালে কালীপূজার পর পূজ্যপাদ স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য বেলুড় মঠে আসিলেন। আমি তখন তথায় থাকিয়া স্বামীজীর সেবা করিতেছি। শশী মহারাজকে আমি এই প্রথম দর্শন করিলাম। তিনিও মাদ্রাজ যাইবার পর এই প্রথম বেলুড় মঠ দর্শন করিলেন; কারণ তিনি যখন মাদ্রাজে যান তখন মঠ আলমবাজারে ছিল। পূজ্যপাদ স্বামীজীকে আমেরিকা যাইবার সময় মাদ্রাজে নামাইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত আক্ষেপ ছিল, সেইজন্য তাঁহাদের প্রিয়তম নেতার দর্শন-লালসায় মাদ্রাজ হইতে তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, প্রেমানন্দ মহারাজ, সারদানন্দ মহারাজ প্রমুখ অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ তখন মঠে ছিলেন। স্বামীজী ও এই সমস্ত গুরুভ্রাতা—সকলেই শশী মহারাজকে বহুদিন পরে নিকটে পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। বাস্তবিকই গুরুভ্রাতাগণের পরস্পরের মধ্যে যে কী একটা অপূর্ব ভালোবাসা, আন্তরিক আকর্ষণ এবং গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। যাঁহাদের চাক্ষুষ দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারাই ইহা প্রাণে অনুভব করিবেন। মহানন্দে গুরুভ্রাতাগণের পবিত্র সঙ্গে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া শশী মহারাজ পুনরায় মাদ্রাজে গমন করিলেন। তখন তাঁহার শরীর বেশ স্থূলকায় এবং গৌরবর্ণ দেখিয়াছিলাম; কিন্তু শুনিলাম, মাদ্রাজ যাইবার পূর্বে তিনি অপেক্ষাকৃত কৃশ ছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে শশী মহারাজ বসন্তকে (পরে স্বামী পরমানন্দ) স্বামীজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসপ্রদানের জন্য সঙ্গে লইয়া পুনরায় বেলুড় মঠে আসিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বসন্তকে training-এর জন্য তাঁহার নিকট মাদ্রাজে ইতঃপূর্বে প্রেরণ করেন এবং বলিয়া দেন ঃ "শশী, এই ছেলেটিকে দেখো।" শশী মহারাজের নিকট ব্রহ্মানন্দ মহারাজের এই কয়টি কথাই যথেষ্ট। সেইজন্যই তিনি বসন্তকে সন্তানসদৃশ স্নেহ-যত্ন করিতেন এবং

তাহার সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া আধ্যাত্মিক শিক্ষাদি পর্যন্ত সর্ববিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি রাখিতেন। এককথায়, তিনিই তাহাকে মানুষ করিয়া তোলেন। তিনি আরো লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, এই বালকের মধ্যে অসাধারণ শক্তি রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক কাজ হইবে; এই কারণেও বসন্তকে তিনি অত্যধিক স্নেহ করিতেন। যাহা হউক, তাঁহার অনুরোধে স্বামীজী বসন্তকে পবিত্র সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিলেন। নাম হইল স্বামী পরমানন্দ। সেইসঙ্গে আরো দুইজনের সন্ন্যাস হইল। তাহাদের নাম স্বামী সত্যানন্দ এবং স্বামী নিশ্চয়ানন্দ। শশী মহারাজ স্বয়ং তাঁহাদের বিরজাহোমের অগ্নি স্থাপনাদি কার্য করেন। কয়েকদিন পরে পূজ্যপাদ স্বামীজীর অনুমতিক্রমে পরমানন্দ, সত্যানন্দ এবং যোগেশ্বরানন্দকে (কাঁকুড়গাছির সুরেশ) সঙ্গে লইয়া শশী মহারাজ মাদ্রাজে গমন করিলেন।

তৎপরে তিনি অনেকদিন আর বেলুড় মঠে আসেন নাই। ইতোমধ্যে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীস্বামীজীর দেহত্যাগ হইল। যে-রাত্রে তাঁহার দেহত্যাগ হয়, সেইরাত্রেই শশী মহারাজ নিদ্রিত অবস্থায় শুনিতে পাইলেন যেন পূজ্যপাদ স্বামীজী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন ঃ "শশী, শশী—শরীরটা থুথুর মতো ত্যাগ করে এলুম।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। নিকটে সচ্চিদানন্দ (বুড়ো বাবা) নিদ্রা যাইতেছিলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেন; কিন্তু কোনই মীমাংসা হইল না। যাহা হউক, শশী মহারাজ অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত এবং চিন্তাকুল চিত্তে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন বেলুড় হইতে তারযোগে সংবাদ আসিল ঃ "গতরাত্রে পূজ্যপাদ স্বামীজী মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন।" এই মর্মান্তিক সংবাদে তিনি বজ্রাহতের ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে কোনপ্রকারে শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন এবং সরল শিশুর ন্যায় অত্যন্ত অভিমান ভরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিখানি স্বহস্তে উত্তোলনপূর্বক পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন ঃ "যদি আমার দেহান্তের পূর্বে শ্রীশ্রীমার ও মহারাজের (ব্রহ্মানন্দজী) শরীর যায়, তাহলে তোমাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব।" শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার এই অকপট বালকের সরল প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা ও ব্রহ্মানন্দজীর দেহত্যাগের পূর্বেই শশী মহারাজ মহাপ্রয়াণ করেন।

১৯০৪ সালে মাদ্রাজে পরমানন্দ স্বামীর শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁহাকে লইয়া শশী মহারাজ বেলুড় মঠে আসেন। সেইসময় তিনি কিছুদিন মঠে বাস

করিয়াছিলেন এবং 'কলকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি'-তে এবং 'কলকাতা বিবেকানন্দ বোর্ডিং'-এ কয়েকটি ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তৎকালে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠে কঠোর তপশ্চরণ করিতেছিলেন। একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন ও ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন এবং সদা সর্বক্ষণ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। আমি তখন তাঁহার সামান্য সেবাদি করিতাম। শশী মহারাজ পরমানন্দ স্বামীর পরিবর্তে আরেক জন কর্মীর প্রয়োজন জ্ঞাপন করায় ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আমাকে তাঁহার সহিত যাইতে আদেশ দিলেন। অনন্তর যথাসময়ে শশী মহারাজের সহিত যাত্রা করিলাম। বিমলানন্দ স্বামীর (খগেন মহারাজ) শরীর অসুস্থ থাকায় শশী মহারাজ তাঁহাকেও সঙ্গে লইলেন; উদ্দেশ্য—ওয়ালটেয়ারে তাঁহার কিছুদিন বায়ুপরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাইবেন। তাঁহার অনুরাগী ভক্ত কুরুপমের রাজা তখন ওয়ালটেয়ারে ছিলেন। শশী মহারাজ আমাদের দুইজনকে সঙ্গে লইয়া উক্ত রাজার অতিথি হইলেন এবং সেখানে কয়েকদিন অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর বিমলানন্দজীর ওয়ালটেয়ারে কিছুদিন থাকিবার ব্যবস্থাদি করিয়া আমাকে লইয়া সোলাপুরে যাত্রা করিলেন। ইতঃপূর্বেই পূজ্যপাদ স্বামীজীর শিষ্য হরিপদ মিত্র মহাশয় তাঁহাকে সোলাপুর যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তথায় প্রায় তিন সপ্তাহ অবস্থান করিয়া কয়েকটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত নানাবিধ সৎপ্রসঙ্গও করিয়াছিলেন। এখানে বহু মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত তাঁহার পরিচয়াদিও হইয়াছিল। তথা হইতে আর কোন স্থানে না নামিয়া একেবারে মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন। তখনো Ice House নামক ভবনে মঠ ছিল। সে সময় মঠে আত্মানন্দজী ও ব্রহ্মচারী যোগীন (পরে স্বামী উমানন্দ) ছিলেন। তাঁহাদের উপর মঠের ও শ্রীশ্রীঠাকুরসেবার ভার দিয়া শশী মহারাজ বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন।

আমি গিয়া দেখিলাম, মঠে পাচক নাই—ব্রহ্মচারী যোগীন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের অন্ন শশী মহারাজ স্বয়ং অথবা আত্মানন্দজী রন্ধন করিয়া লন। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রাহ্মণেতর জাতির স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন না, সেই কারণে শশী মহারাজ ভোগের অন্ন পাক সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকিতেন। তিনি ব্রাহ্মণশরীর ভিন্ন অন্য কোন জাতিকে ভোগের অন্ন রন্ধন বা স্পর্শ করিতে দিতেন না। মঠের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় ঠাকুরসেবার নৈবেদ্য বা ভোগাদি অতি সাধারণভাবেই হইত। ভোরে বাল্যভোগে কয়েকটি নারিকেল নাড়ু, পূর্বাহ্ণে পূজার সময় সামান্য আদা ও ভিজা ছোলা, নারিকেল

নাড়ু বা মিছরি দেওয়া হইত। বরাহনগর মঠের মতো এখানেও ছোলাগুলির প্রত্যেকটির মুখ কাটিয়া দিতে হইত। মধ্যাহ্নে অন্নব্যঞ্জনাদি যাহা কিছু পাক হইত, তাহাই ভোগ দেওয়া হইত। বিকালে ঐ নারিকেল নাড়ু বা স্বহস্তে প্রস্তুত গজা, কচুরি বা নিমকি এবং রাত্রে ডাল, ময়দার রুটি, তরকারি এবং একটু দুধ ও সামান্য মিষ্টি নিবেদন করা হইত। দুধটি গরম গরম দেওয়া চাই। এতদ্ব্যতীত কোন ভক্ত ফলমূল বা মিষ্টান্নাদি আনয়ন করিলে তাহাও যথাসময়ে ভোগ দেওয়া হইত। মধ্যাহ্নে আধঘণ্টা এবং রাত্রে ১৫ মিনিট ধরিয়া ভোগ দেওয়া হইত; তৎপরে ঐ নিবেদিত প্রসাদ দুই বেলাই যথাক্রমে ১০ মিনিট ও ৫ মিনিট ধরিয়া হলঘরে পূজ্যপাদ স্বামীজীকে উৎসর্গ করিতে হইত। এই নির্দিষ্ট সময়ের একচুল এদিক-ওদিক হইত না। তিনি নিত্য নিয়মিত সময়ে ঘড়ি ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর মুছিতেন। হঠাৎ কোন লোক আসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে দু-এক মিনিট দেরি হইয়া যাইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। কখনো কখনো তিনি আমাদিগের নিকট বলিয়াই ফেলিতেন ঃ "বেটা নাস্তিক—কথা কইতে কইতে আমার ঠাকুরঘর খুলতে দেরি করে দিলে!"

পূর্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার এই সেবাপূজায় বাহ্য আড়ম্বর বা মন্ত্রাদির বাড়াবাড়ি ছিল না। ছিল প্রবল আন্তরিকতা ও সহজ সরল প্রাণের টান। যেন জ্বলন্ত, জীবন্ত, চৈতন্যময় ঠাকুর সাক্ষাৎ বসিয়া আছেন। তিনি সাক্ষাৎভাবেই তাঁহার সেবাদি করিতেন—ঠিক যেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূলশরীর থাকাকালীন করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার সেবাপূজার বিশেষত্ব। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছেন—বেলা প্রায় দুইটা হইবে, এমন সময় হয়তো হঠাৎ তাঁহার মনে হইল—গরম গরম নিমকি কচুরি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে ভাণ্ডার হইতে ময়দা, ঘৃত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাহির করিতে বলিলেন। ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি আনা হইলে স্টোভ জ্বালিয়া তিনি স্বহস্তে নিমকি, কচুরি প্রস্তুত করিলেন ও গরম গরম ভোগ দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নোনতা খাবার পছন্দ করিতেন, সেইজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে ঐরূপ করিতেন। নিত্য পূজার সময় ফুল পাওয়া যাইত না—কেবল তুলসীপাতা দিয়াই পূজা করিতেন। পূজান্তে কখনো কখনো তন্ময় হইয়া স্তবাদি পাঠ অথবা কাতরভাবে প্রার্থনাদিও করিতেন। ঠাকুরঘরে বসিয়া যখন "জয় গুরু মহারাজ", "প্রাণবল্লভ" বলিয়া প্রার্থনা করিতেন, তখন অপূর্ব দিব্যভাবে ঘর জম্ জম্ করিত। দর্শক মাত্রেরই মনে হইত, যেন শ্রীশ্রীঠাকুর জীবন্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। যিনি দেখিতেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া অতৃপ্ত

নয়নে চাহিয়া থাকিতেন। এ অদ্ভুত স্বর্গীয় দৃশ্য বর্ণনাতীত। প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন এ অপূর্ব ভাব যথার্থ উপলব্ধি করা দুরূহ। এইভাবে পূজা ও প্রার্থনাদি শেষ করিয়া বাহিরে আসিবার পরও বহুক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিমাভ ও দিব্যভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ থাকিত।

যখন তিনি ক্লাস করিতে বা অন্য কোন প্রয়োজনে বাহিরে যাইতেন, তখন তাঁহার নির্দেশমতো শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাদি আত্মানন্দজী বা আমি করিতাম। তিনি আশ্রমে থাকিলে পূর্বাহ্নের পূজাদি প্রায়ই নিজে করিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার অবশিষ্ট কাজ আমরা করিতাম। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের সময় সম্বন্ধেও অত্যন্ত অবহিত ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্থূলশরীরে থাকাকালীন মধ্যাহ্নে ১২টার মধ্যেই অন্নগ্রহণ করিতেন—মধ্যাহ্ন অতীত হইলে রাক্ষসী বেলায় কখনো অন্নাদি গ্রহণ করিতেন না। সেই কারণে বেলা ১২টার মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যাহ্নভোগ দিবার নিয়ম ছিল। এমনকি বিশেষ বিশেষ উৎসবাদিতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না। যাহাতে ভোগের বিলম্ব না হয়, সেইজন্য তিনি উৎসব-পর্বাদিতে পূর্বরাত্রে প্রায় তিনটা হইতেই রন্ধনাদি আরম্ভ করাইতেন। শশী মহারাজের এইপ্রকার নিয়মনিষ্ঠা ও কালনিষ্ঠা দর্শনে দাক্ষিণাত্যের কী ব্রাহ্মণ, কী অব্রাহ্মণ—সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি করিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় সামান্য একটু ত্রুটি হইলে তিনি আমাদিগকে অতি ভীষণভাবে তিরস্কার করিতেন। নিজেরও কখনো কিছু ত্রুটি হইলে নিজেকেও ভর্ৎসনা করিতে ছাড়িতেন না, এমনকি কখনো কখনো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ নিজের গণ্ডদেশে সজোরে চপেটাঘাত পর্যন্ত করিতেন। আবার কখনো সরল বালকের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতি অত্যন্ত অভিমানভরে কটূক্তিও প্রয়োগ করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করা অথবা ক্লাস করা কিংবা যাহা কিছু তিনি করিতেন—সমস্ত সেবার ভাবেই করিতেন এবং সর্বদাই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন; অথচ মঠের প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাঁহার তীব্র দৃষ্টি থাকিত।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে এবং মঠের অন্যান্য ঘরে আলো ও ধূপধুনা দেওয়া হইত। তাঁহার এ নিয়ম বরাহনগর মঠ হইতেই ছিল এবং এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি মঠের প্রত্যেকটি জিনিস অতি সন্তর্পণে ব্যবহার করিতেন—কারণ সমস্তই যে শ্রীশ্রীঠাকুরের। একবার একটু অসাবধানতাবশত জনৈক সেবকের হাত হইতে একটি চাবিতালা পড়িয়া যায়।

তাহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে তীব্র তিরস্কার করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা হইতে আরম্ভ করিয়া মঠের দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কার্য তিনি যেপ্রকার শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত করিতেন, আমাদিগকেও ঠিক সেইভাবে করিতে বলিতেন—না পারিলে রীতিমতো শাসন করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার শিক্ষাপ্রদানের (training) ধারা। একদিকে তাঁহার শাসন যেমন বজ্রাদপি কঠোর ছিল, আবার অন্যদিকে তাঁহার ভালোবাসাও তেমনি অপার্থিব ছিল। এই শাসনের পশ্চাতে সেবকদিগের জীবন গঠন করা এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধন করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; নচেৎ নিজের কোন স্বার্থবুদ্ধি ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী তাঁহার নিকট বেদবাক্য অপেক্ষাও অধিকতর শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি সম্বন্ধে কেহ কোনপ্রকার প্রশ্নাদি করিলে শশী মহারাজ কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না—অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিতেন ঃ "ঠাকুর যা বলে গেছেন—সব সত্য, তা তোমরা বেদাদি শাস্ত্রে পাও আর নাই পাও; কারণ ঠাকুর নিজমুখে বলে গেছেন। এখানকার (ঠাকুরের) অনুভূতি সব বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।" এইপ্রকার গভীর শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যেকটি উপদেশ তিনি হুবহু পালন করিতেন এবং সকলকে পালন করিতে বলিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বৃহস্পতিবারের বারবেলা বা অশ্লেষা, মঘা—এসমস্ত খুব মানিতেন। সেইজন্য তিনিও এসমস্ত বিষয় বিশেষভাবে মানিয়া চলিতেন। তিনি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বা অশ্লেষা ও মঘা নক্ষত্রে পত্রাদি লেখা, হাটবাজার করা অথবা কোন নতুন কাজ কিছুতেই করিতেন না বা করিতে দিতেন না। এমনকি পত্রাদিও খুব হিসাব করিয়া লিখিতেন, যাহাতে উক্ত নক্ষত্রে না পৌঁছায়। অবশ্য নিত্য কাজ সম্বন্ধে বৃহস্পতিবারের বারবেলা অতটা মানিতেন না। জিভ পরিষ্কার না করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর কাহারো হাতে জলগ্রহণ করিতে পারিতেন না; সেইজন্য শশী মহারাজ নিজে শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন কাজ করিবার পূর্বে ভালোভাবে জিভ পরিষ্কার করিতেন এবং আমাদিগকেও পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিতেন যেন এ বিষয়ে ভুল না হয়।

সাধুদের একত্রে সংঘবদ্ধ হইয়া থাকিবার উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—যেমন একটি চালাঘরের চালাটি পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া থাকে বলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সেইরূপ সাধুগণ যদি একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে পরস্পরের যথেষ্ট সাহায্য হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করে।

ধর্ম সম্বন্ধে বলিতেন ঃ "Religion is not a joke, অনেক খাটতে হয়।" এসম্বন্ধে আরো বলিতেন যে, ধর্মের রাস্তা পার্বত্য পথের চড়াই উতরাই-এর ন্যায়। এপথে উত্থান-পতন হইলেও সাধক সেই পথেই অগ্রসর হইতেছে। তিনি স্বয়ং পূর্বাশ্রমের আত্মীয়স্বজনগণের সহিত পত্রব্যবহার বা অন্য কোনপ্রকার সম্বন্ধ রাখিতেন না এবং নবীন সাধু ব্রহ্মচারিগণকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিতেন—বলিতেন—শ্রীভগবানলাভের উদ্দেশ্যে মহাবন্ধন জানিয়া যাঁহাদিগের সম্পর্ক একবার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, পুনরায় তাঁহাদিগের সহিত সম্পর্ক রাখা কোনমতেই উচিত নহে। ইহাতে সাধুজীবনের বিক্ষেপ ঘটায় এবং মনকেও অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া দেয়।

আহারবিহারে তিনি সংযত ভাব পছন্দ করিতেন। তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ সাধুজনোচিত, খুব সাধাসিধে ধরনের ছিল এবং তিনি নিয়মিত মুণ্ডনাদি করিতেন। যতদিন সক্ষম ছিলেন, ততদিন তিনি নিজের শরীরের জন্য কাহারো এতটুকু সেবা বা সাহায্য কিছুতেই গ্রহণ করিতেন না। কেহ কিছু করিতে যাইলে তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিতেন ঃ "আমরা প্রভুর সেবক, সেবা করতে এসেছি; সেবা করতে এসে সেবা নেওয়া বড় খারাপ।" শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদবিতরণ সম্বন্ধে তাঁহার এক বৈশিষ্ট্য ছিল—বিশেষ ভক্ত ভিন্ন তিনি যাহাকে-তাহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ দিতেন না; বলিতেন, যজ্ঞের হবি কুক্কুরের প্রাপ্য হইতে পারে না।

শশী মহারাজ মাদ্রাজ শহরের কোন কোন স্থানে নিয়মিতভাবে ক্লাস করিতে যাইতেন। এই কার্যে তাঁহার অতি অদ্ভুত নিয়মনিষ্ঠা ও সময়নিষ্ঠা ছিল। ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি আকাশের দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে তাঁর ক্লাস বন্ধ যাইত না। শ্রোতা কেহ উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যথাসময়ে তিনি ক্লাস আরম্ভ করিতেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবিরাম ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশলও অতি চমৎকার ছিল। তিনি শাস্ত্রের অতি জটিল তত্ত্বগুলি শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজীর ভাব দিয়া সহজ ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার শ্রোতাদিগের মধ্যে অধিকাংশই চাকুরিজীবী ছিলেন। একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ক্লাসে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর যথাসময়ে ক্লাস আরম্ভ হইল। চাকুরিজীবী শ্রোতাগণ সমস্ত দিন অফিসে পরিশ্রম করিয়া তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আসিয়াছেন। সেদিন 'পঞ্চদশী'র অংশবিশেষ ব্যাখ্যা হইতেছিল। তিনি গ্রন্থোক্ত ভাবে সম্পূর্ণ তন্ময়

হইয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। কোনপ্রকার অঙ্গচাঞ্চল্য নাই অথবা বাইরের দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই। আমিও একাগ্র মনে তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছি। এমন সময় হঠাৎ দেখিলাম যে, সম্মুখের শ্রোতাগণ ব্যাখ্যা-শ্রবণে বেশ নিবিষ্টচিত্ত; কিন্তু পশ্চাতের শ্রোতাদিগের অধিকাংশই ঝিমাইতেছেন। যাহা হউক, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যাখ্যাদি করিয়া যখন তিনি মঠে ফিরিতেছেন, তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি যখন ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন সম্মুখের শ্রোতাগুলিই বেশ নিবিষ্টভাবে শ্রবণ করিতেছিলেন; কিন্তু পশ্চাতের শ্রোতাগণ অধিকাংশই ঝিমাইতেছিলেন—আপনি কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন? তিনি তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেনঃ "আমি তো মানুষকে শোনাতে আসিনি—আমি ঠাকুরকে শোনাতে আসি; কাজেই কেউ শুনছে কিনা সেদিকে আমার আদৌ হুঁশ থাকে না।" এই কথাকয়টির দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, এই ক্লাস করাটাও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা হিসাবেই করিতেন। মঠে কেহ আসিলে তাঁহাকে বেশ আদর-যত্ন করিতেন এবং সহৃদয়ভাবে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন। তাঁহার অকৃত্রিম ভালোবাসায় আকৃষ্ট হইয়া এবং তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনায় উৎসাহিত হইয়া বহু যুবক শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাবে ভাবান্বিত হইয়াছিল। তাঁহারই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া রামু ও রামানুজ ভ্রাতৃদ্বয় ১৯০৫ সালে দরিদ্র ছাত্রদিগের জন্য একটি ছাত্রাবাস আরম্ভ করেন। তখন উহা বীজাকারে ছিল—ক্রমশ শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায়, শশী মহারাজের অমোঘ আশীর্বাদ, সহানুভূতি ও পরামর্শে এবং উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ঐ ছাত্রাবাস অঙ্কুরিত, পল্লবিত হইয়া বর্তমানে মহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

এইসময়ে তিনি 'শ্রীরামানুজচরিত' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তেলেগু ভাষাভিজ্ঞ জনৈক উকিল তেলেগু অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'শ্রীরামানুজচরিত' পাঠ করিতেন এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইতেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এমনই দখল ছিল। উহা প্রথমে পাক্ষিক 'উদ্বোধন'-এ ধারাবাহিকভাবে বাহির হইত—পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে ইহা তাঁহার অপূর্ব দান।

একবার তিনি ব্যাঙ্গালোর হইতে কতিপয় ভক্তের সাগ্রহ আমন্ত্রণে তথায় যাইয়া কয়েকটি বক্তৃতাদি প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় ভক্তগণ একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করায় তিনিও তাহাতে সম্মত হন। এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এখানে একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপিত

হইল। অতঃপর তিনি যথোচিত উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানপূর্বক যোগেশ্বরানন্দকে (কাঁকুড়গাছির সুরেশ) ঐ কেন্দ্রের ভার দিয়া মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে যোগেশ্বরানন্দ সংঘের আদেশমতো চলিতে না পারায় তাঁহাকে সংঘ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল। তৎপরে তিনি (যোগেশ্বরানন্দ) আলসুরে পৃথক আশ্রম স্থাপন করিলেন এবং মাদ্রাজ হইতে আত্মানন্দজীকে ব্যাঙ্গালোরে পাঠানো হইল। ইতোমধ্যে বিমলানন্দজী ওয়ালটেয়ার হইতে সুস্থ হইয়া মাদ্রাজে আসিলেন। তৎপরে তিনি ও বোধানন্দজী ব্যাঙ্গালোরে প্রেরিত হইলেন এবং আত্মানন্দজী মাদ্রাজে পুনরাগমন করিলেন।

অন্য একসময়ে শশী মহারাজ বোম্বে হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আহ্বানে তথায় বক্তৃতা করিবার জন্য যাইতে সম্মত হইয়াছেন, এমন সময়ে রেঙ্গুন অধিবাসিগণের বিশেষ অনুরোধে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহাকে রেঙ্গুনে গিয়া বক্তৃতা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি জানিতেন না যে, শশী মহারাজ ইতঃপূর্বেই বোম্বে যাইবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। এই আদেশ পাইয়া শশী মহারাজ প্রথমে মহা সমস্যায় পড়িলেন। কিন্তু সঙ্ঘপতি ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আদেশ পালনে তিনি এমনই তৎপর ছিলেন যে, অবশেষে রেঙ্গুন যাওয়াই সাব্যস্ত করিলেন এবং বোম্বের ভক্তগণকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া পত্র দিলেন যে, রেঙ্গুনের কার্য শেষ করিয়া পরে সেখানে যাইবেন। অতঃপর যথাসময়ে জাহাজে রেঙ্গুনযাত্রা করিলেন এবং পথের আহার্য হিসাবে কিছু চিঁড়া ও ফলমূলাদি সঙ্গে লইলেন। কারণ, তিনি যে খাঁটি আচারবান আদর্শ হিন্দু সন্ন্যাসী—আহারে বিহারে যথাসম্ভব নিয়ম নিষ্ঠা পালন করিয়া চলিতেন। রেঙ্গুনে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি সুন্দর বক্তৃতা করিলেন এবং পরে মাদ্রাজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তৎপরে বোম্বে যাইয়া বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। উভয় স্থানেই তাঁহার প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় বহুলোক আকৃষ্ট হইয়াছিল। একবার মালাবার অঞ্চলে ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি স্থানে গিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর নবীন উদার ভাব প্রচার করিয়াছিলেন।

১৯০৫ সালে শ্রীরঙ্গম, ত্রিচিনাপল্লি, পুদুকোটা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বক্তৃতা করিবার জন্য পুনরায় তাঁহার নিকট নিমন্ত্রণ আসিল। তিনিও যাইতে স্বীকৃত হইলেন। সেযাত্রায় আমাকে সঙ্গে লইয়া যান। আমরা উভয়ে নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করিলাম। প্রথমে তিনি ত্রিচিনাপল্লি স্টেশনে নামিলেন। ট্রেন হইতে অবতরণ করিবামাত্র স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিবিধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া

যথোচিত সম্মানে অভিনন্দিত করিলেন। নির্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য তিনি অশ্বযানে আরোহণ করিলে পর যান হইতে অশ্বযুগল খুলিয়া দিয়া ভক্তগণ ভক্তিভরে নিজেরাই গাড়ি টানিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে যথাস্থানে গাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহার নির্দেশমতো উক্ত গাড়িতে তাঁহার পার্শ্বে আমাকেও বসিতে হইয়াছিল। সেখানে একদিন থাকিয়া তিনি গণেশ টেম্পলে বক্তৃতা করিলেন, তৎপরে অশ্বযানে কয়েক মাইল দূরবর্তী শ্রীরঙ্গমে গমন করিলেন। সেখানে ২/৪ দিন থাকিয়া তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দেন। সেখান হইতে পুনরায় অশ্বযানে পুদুকোটা নামক নেটিভ স্টেটে গমন করিলেন। এখানেও তাঁহার কয়েকটি বক্তৃতা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তাঁহার বক্তৃতাগুলি অতি চমৎকার হইয়াছিল। বক্তৃতা ভিন্ন প্রায় সকল স্থানেই প্রশ্নোত্তর সভাও হইয়াছিল। তিনি এই সমস্ত সভায় নানাবিধ জটিল প্রশ্নের অতি সরল সমাধান করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এইসকল সারগর্ভ বক্তৃতা এবং সৎপ্রসঙ্গাদি দ্বারা ঐ অঞ্চলের সর্বসাধারণের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর মহাসমন্বয়ের ভাব প্রচারিত হইয়াছিল। প্রত্যেক স্থানেই জনসাধারণের পক্ষ হইতে অতি সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। এখানকার বক্তৃতাদি সমাপন করিয়া তিনি পুনরায় ত্রিচিনাপল্লি স্টেশনে আসিলেন এবং ট্রেনযোগে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ত্রিচিনাপল্লি স্টেশনে আসিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, এত নিকটে আসিয়াছ, রামেশ্বর তীর্থ দর্শন করিয়া আইস। যাহাতে পথে আমার কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়, সেজন্য তিনি আমাকে কয়েকটি স্থানে তাঁহার পরিচিত ভক্তদিগের নিকট পত্র লিখিয়া দিলেন এবং ট্রেনভাড়া ও অন্যান্য খরচ বাবদ আমাকে কিছু অর্থও দিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমি তাঁহার আদেশমতো রামেশ্বর যাত্রা করিলাম। রামেশ্বর দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে রামনাদ, পরমাকুটি, মাদুরা, কুম্ভকোনম প্রভৃতি যেস্থানগুলি পূজ্যপাদ স্বামীজীর চরণরেণুর স্পর্শে পবিত্র তীর্থস্বরূপ হইয়া গিয়াছে, সেইসমস্ত স্থান এবং ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি আরো কয়েকটি স্থান দর্শন করিয়া মাদ্রাজ মঠে উপস্থিত হইলাম। সকল স্থানেই ভক্তদিগের মধ্যে পূজ্যপাদ স্বামীজী ও শশী মহারাজের দেবচরিত্রের আশ্চর্য প্রভাব দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। একমাত্র তাঁহাদেরই প্রভাবে আমার এই তীর্থযাত্রায় কোনপ্রকার কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই।

আমি মাদ্রাজ মঠে আসিয়া দেখিলাম যে, স্বামী পরমানন্দ সুস্থ হইয়া বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। আমি বেলুড় মঠে যাইবার জন্য ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে পূর্ব হইতেই পত্র দিয়াছিলাম। পরমানন্দ স্বামী সুস্থ হইয়া এখন মাদ্রাজ মঠে

আসিয়াছেন; সুতরাং আমি চলিয়া যাইলেও এখানকার কাজকর্মের অসুবিধা হইবে না বুঝিয়াই ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আমাকে বেলুড় মঠে যাইবার জন্য অনুমতিপত্র দিলেন। তদ্দর্শনে শশী মহারাজও সম্মত হইলেন। বেলুড় যাইবার পথে আমার পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করিবার বাসনা জানিতে পারিয়া তথায় আমার খাওয়া-থাকার সুবিধার জন্য তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র রামকৃষ্ণবাবুর নিকট আমার সহিত এক পত্র দিলেন। আমিও যথাসময়ে যাত্রা করিয়া পুরীতে রথ দর্শন করিলাম এবং কয়েকদিন থাকিয়া বেলুড়ে আসিলাম।

বিশ্বস্ত সূত্রে শ্রুত—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দজীকে শশী মহারাজ আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা তো করিতেনই, এমনকি ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এবং প্রেমানন্দ মহারাজকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন; কারণ শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার এই দুই সন্তানকেও অতি উচ্চে স্থান দিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, এইজন্যই পুরাতন মাদ্রাজ মঠের গৃহনির্মাণের সময় চারিখানি পৃথক ঘর এবং একটি হলঘর প্রস্তুত করিয়াছিলেন—একখানি ঘর শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্য; এবং অবশিষ্ট তিনখানি যথাক্রমে স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী ও স্বামী প্রেমানন্দজীর জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্য কেহ, এমনকি তিনি নিজেও সে-ঘর ব্যবহার করিতেন না, অপর সকলের সহিত সেই হলঘরে বাস করিতেন। শেষে যখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল, তখন সকলের বিশেষ অনুরোধে সম্মত হইয়া প্রেমানন্দজীর জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানি কিছুদিন ব্যবহার করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে ব্রহ্মচর্য সংস্কারের যে মন্ত্রগুলি প্রচলিত আছে, সর্বপ্রথমে শশী মহারাজই শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া তাহা প্রণয়ন করেন এবং নিজে মাদ্রাজ মঠে ১৯০৫ সালে কালীপূজার রাত্রে শর্বানন্দ ও উমানন্দকে (যোগীন) ঐ মন্ত্রগুলির দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আহুতি প্রদান করাইয়া ব্রহ্মচর্য সংস্কার দেন। উক্ত মন্ত্রগুলির ভাব অতি চমৎকার। উহা দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হন। পরে শশী মহারাজ ও ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুমতি লইয়া স্বামী শুদ্ধানন্দজী ঐ মন্ত্রগুলির সহিত অনুরূপ কয়েকটি শব্দ সংযোজিত করেন এবং ১৯০৬ সাল হইতে উক্ত মন্ত্রগুলির দ্বারা বেলুড় মঠে ব্রহ্মচর্য সংস্কার প্রচলিত হইল।

স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ দীর্ঘকাল আমেরিকায় বাস করিয়া বেদান্ত প্রচারের পর ১৯০৬ সালে যখন ভারতে আগমন করেন, তখন শশী মহারাজ

মাদ্রাজ হইতে কলম্বো পর্যন্ত যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কলম্বো হইতে মাদ্রাজ আসিবার পথে অভেদানন্দজী কয়েকটি স্থানে অবতরণ করেন। শশী মহারাজও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যাহাতে প্রত্যেক স্থানেই তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত সাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হয়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থাদি করিয়াছিলেন। এইরূপে মহাসম্মানে সংবর্ধিত হইয়া তিনি মাদ্রাজ মঠে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানেও শশী মহারাজের চেষ্টায় বিপুলভাবে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল। কয়েকদিন মাদ্রাজ মঠে পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়া শশী মহারাজ তাঁহাকে লইয়া পুরীতে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট উপনীত হইলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এখান হইতে তিন গুরুভ্রাতা একত্রে কলকাতা যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে ট্রেন হাওড়া পৌঁছিলে কলকাতায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে সসম্মানে পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বরণ করিয়া জুড়িগাড়িতে আরোহণ করাইলেন। তৎপরে গাড়ি হইতে ঘোড়া খুলিয়া দিয়া যুবকগণ ভক্তিভরে নিজেরাই টানিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশ গাড়ি কলকাতার বাগবাজার পল্লিস্থ শ্রীপশুপতি বসু মহাশয়ের বাটিতে উপস্থিত হইল। এই বাটিখানি পূর্ব হইতেই অভেদানন্দ মহারাজের বাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কলকাতায় যে মহা সমারোহে অভেদানন্দজীকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়, তাহার মূলে শশী মহারাজের বিশেষ চেষ্টা বিদ্যমান ছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার কয়েকদিন পরে শশী মহারাজ পুনরায় মাদ্রাজ মঠে গমন করিলেন। ইহার পরে তিনি কয়েকবার বেলুড় মঠে যাতায়াত করেন। শেষবারে বেলুড় মঠে আসিয়া কিছুদিন থাকিবার পর মাদ্রাজ যাইবার পথে তিনি পুরীতে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলেন ঃ “এখানে দিনকতক থেকে যাও।” শশী মহারাজ বরাবরই পূজ্যপাদ স্বামীজীর কথা তাঁহার পরে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কথা বর্ণে বর্ণে পালন করিতেন; এবার কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কথা না শুনিয়া তিনি মাদ্রাজে চলিয়া গেলেন। তাহাতে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "শশীর শরীর আর বেশিদিন থাকবে না—সে তো কখনো আমার কথা না শুনে এরকম নিজের মতে কাজ করেনি!”

অত্যধিক পরিশ্রমে ও অনিয়মে ক্রমশ শশী মহারাজের বজ্রদৃঢ় শরীর কঠিন বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইল। এই অসুস্থ শরীরেও তিনি একটি মহৎ কার্যসম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তজননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানিকে তীর্থদর্শন করাইবার জন্য দক্ষিণ ভারতে লইয়া যান। ১৯১১ সালের প্রথমভাগে শ্রীশ্রীমা

পরমভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের উড়িষ্যার অন্তর্গত জমিদারি কোঠারে আছেন—আমিও তখন তাঁহার কাছে থাকি। সেইসময় শশী মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণ ভারতে তীর্থদর্শনে যাইবার জন্য অনুনয়বিনয় করিয়া পত্র দেন। শ্রীশ্রীমা অনুগত সন্তানের আকুল আহ্বানে তথায় যাইতে সম্মত হইলেন। অনন্তর নির্দিষ্ট দিনে শ্রীশ্রীমা মাদ্রাজ যাত্রা করিলেন। আত্মানন্দজী, ধীরানন্দজী, সত্যকাম এবং কতিপয় মহিলা ভক্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। (আশুতোষ মিত্র প্রণীত 'শ্রীমা' নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক The Shyamboy Electric Emporium, 134 Cornwallis Street, Kolkata—এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।) শ্রীশ্রীমা ও তাঁহার সঙ্গিগণকে যথোচিত আদর-যত্ন এবং রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থদর্শনের সমস্ত ব্যবস্থাদি করিতে শশী মহারাজকে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কিন্তু সেদিকে একটুও খেয়াল ছিল না। শ্রীশ্রীমা তীর্থাদি দর্শন করিয়া আনন্দ পাইতেছেন—ইহাতেই তাঁহার হৃদয় মহানন্দে পূর্ণ! এদিকে কিন্তু তাঁহার বহুমূত্র রোগাক্রান্ত শরীরে অসাধ্য যক্ষ্মা ব্যাধি প্রবেশ করিল। তখন পূজনীয় তুলসী মহারাজ তাঁহাকে চিকিৎসার্থে কলকাতায় লইয়া আসিলেন। পথে খুরদা রোড রেলস্টেশনে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, তুরীয়ানন্দ মহারাজ ও শঙ্করানন্দ মহারাজ পুরী হইতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত ইহাই তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ! কলকাতায় ইহার কিছুদিন পরে তিনি নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়পদে মিলিত হন। শুনিয়াছি, শরীরত্যাগের ২/৩ দিন পূর্ব হইতেই নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন।

"কীটেষু, পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃ পিশাচ মনুজেম্বপি যত্র যত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব ত্বৎপ্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাঽব্যভিচারিণী চ ॥"

অর্থাৎ হে কেশব! কীট, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, রাক্ষস, পিশাচ, মানুষ—যে-শরীরেই আমার জন্ম হউক, তোমার কৃপায় তোমার প্রতি যেন আমার অচলা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে।

শরীর যাইবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে সেবককে বলিলেন ঃ "ওরে আসন দে, আসন দে, দেখছিস না ঠাকুর এসেছেন!" বলিতে বলিতে তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! কিছুক্ষণ পরে তিনি

মহাসমাধিতে লীন হইয়া গেলেন!! ব্রহ্মানন্দ মহারাজ পুরীতে এই দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন; কিন্তু বেশি আশ্চর্যান্বিত হইলেন না; কারণ তিনি পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, শশী মহারাজের শরীর আর থাকিবে না। তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া বলিলেন ঃ "দক্ষিণদেশের দিকপাল চলে গেল।" হরিঃ ওঁ তৎ সৎ।

উদ্বোধন ঃ ১০৮ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

[স্বামী অচলানন্দজী মহারাজ (১৮৭৬-১৯৪৭) ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সেবা করার অধিকারী হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনি 'কেদারবাবা' নামে সুপরিচিত। কঠোর তপস্বী। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যখন দীক্ষার জন্য যান, শ্রীশ্রীমা তাঁকে দেখে বলেছিলেন "এ ছেলেটি সাধু হবে।" স্বামী অচলানন্দজীকে স্বামীজী বলেছিলেন, "যা, তোর কিছুই করতে হবে না। তোর সব আপনি আপনি হয়ে যাবে।" কেদারবাবা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ ছিলেন (১৯৩৮-১৯৪৭)]

রামকৃষ্ণানন্দ প্রসঙ্গ

স্বামী অচলানন্দ

(ভিন্ন পরিবেশে কথিত)

১৯০৪ সালের জুলাই মাসে শ্রীশ্রীমহারাজের আদেশানুসারে পূজনীয় শশী মহারাজের সহিত মাদ্রাজে যাই। সেই সঙ্গে বিমলানন্দ স্বামী বায়ু-পরিবর্তনের জন্য ওয়ালটেয়ারে যান। আমরা তিনজনেই ওয়ালটেয়ারে নামিলাম। সেখানে আমরা কুরুপম-এর রাজার অতিথি হই। রাজা শশী মহারাজকে গুরুতুল্য মান্য করিতেন। স্বামী বিমলানন্দকে সেখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সেখান হইতে সাতদিন পরে স্বামীজীর শিষ্য হরিপদ মিত্রের নিমন্ত্রণে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সোলাপুরে যাওয়া হয়। সেখানকার গণ্যমান্য লোকেরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন। কয়েকটি বক্তৃতা হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা ছিল খুব অদ্ভুত। ঠাকুর-স্বামীজীর কথা ও শাস্ত্রাদির শ্লোক আবৃত্তি করিয়া এক-দেড় ঘণ্টা কাল অনর্গল ইংরেজিতে

বক্তৃতা করিয়া যাইতেন। লোকেরা খুব প্রশংসা করিয়াছিল। হরিপদ মিত্রও আমাদের আদর আপ্যায়ন ও বিশেষ যত্ন সহকারে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেখান হইতে আমরা সোজা মাদ্রাজ চলিয়া আসি। তখন মঠ ছিল সমুদ্র পারে 'আইস হাউস'-এ বিলিগিরি আয়েঙ্গার এর বাড়ি। সেখানে স্বামী আত্মানন্দ ও ব্রহ্মচারী যোগীন (পরে উমানন্দ স্বামী নামে পরিচিত) ছিলেন। শশী মহারাজ ১৯০৪ সালের শেষাশেষিতে রেঙ্গুন যান। একাই গিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে তিনিই প্রথম রেঙ্গুনে যান ও সেখানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ওখান হইতে এক মাসের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বোম্বাই রওনা হন। ধর্মপ্রচারক রূপে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনিই প্রথমে বোম্বাই যান এবং সেখানেও খুব বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বোম্বাই যাওয়া ১৯০৫ সালের প্রথমেই হইয়া থাকিবে। ঐ সালের প্রথমেই মাদ্রাজে 'স্টুডেন্টস্ হোম' ছোটখাট বাড়ি ভাড়া করিয়া রামুর সহিত খোলেন এবং ঐ সময় রাজমহেন্দ্রীতে নিমন্ত্রিত হইয়া যান এবং সেখানে বক্তৃতাদি দান করেন। ঐ সালের এপ্রিল-মে তে ত্রিচিনাপল্লী, শ্রীরঙ্গম, পাদুকোট্টা প্রভৃতি রাজ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া যান। ত্রিচিনাপল্লীতে তাঁহার অভ্যর্থনা এক বিরাট ব্যাপার, বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। ঘোড়া খুলিয়া তাঁহার গাড়ি লোকেরা টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। ঐখান হইতে তিন-চার মাইল দূরে শ্রীরঙ্গমের প্রকাণ্ড মন্দিরের ভিতরে কোন ধনী লোকের বাড়িতে আমাদের বাসস্থান ঠিক করা হয়। মন্দিরটি কি বিরাট! উহার ভিতরেই বাজার, পুলিশ-স্টেশন, পোস্ট অফিস এবং বাড়িঘর রহিয়াছে। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া ত্রিচিনাপল্লীতে উচ্চ টিলাস্থিত এক দেবালয়ের (Rock Fort Temple) প্রাঙ্গণে বহুলোকের সম্মুখে তাঁহার এক বক্তৃতা হয়। পরে পাদুকোট্টা দেশীয় রাজ্যে যাওয়া হয়। সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা ও আলোচনার ক্লাস করেন। কয়েকদিন থাকিয়া তিনি মাদ্রাজে ফিরিয়া আসেন এবং আমিও রামেশ্বর তীর্থদর্শনে যাত্রা করি। যখন মাদ্রাজে থাকিতেন, কোন না কোন পাড়ায় প্রায় নিত্যই দুই একটি ক্লাস করিতেন। আমি যতদিন তাঁহাকে দেখিয়াছি কখনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখি নাই। ঠাকুরের কোন না কোন কাজেতে সর্বদাই নিজেকে নিযুক্ত রাখিতেন। ঐ সময়েতে "রামানুজ চরিত" লেখেন। তামিল অক্ষরে লিখিত কোন সংস্কৃত "রামানুজ চরিত" জনৈক ভদ্রলোক তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন। তিনি উহা বাংলায় লিখিয়া যাইতেন। মঠটিকে তিনি ঠাকুরের মনে করিতেন। মঠের যাহাকিছু জিনিসপত্র এমনকি তালাচাবি প্রভৃতি সবই ঠাকুরের। নিজেকে তাঁহার সেবক ও দাস এই জ্ঞানে অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবায় সর্বদা নিযুক্ত

থাকিতেন। যখন যেমন আবশ্যক পড়িত সব রকম কাজ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল। সামান্য তরকারি কোটা, রান্নাবান্না প্রভৃতি হইতে বড় বড় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনা প্রভৃতি কার্য বা বক্তৃতা প্রদান সবই প্রভুর সেবা হইতেছে এইভাবে চালিত হইয়া সম্পাদন করিতেন। ধ্যান ধারণার প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে বা তাঁহাকে উহাতে বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হইতে দেখি নাই। সেবাই তাঁহার প্রধান ভাব ছিল এবং উহাই বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিতেন। সর্ব অবস্থা ও সমস্ত কার্যে প্রভুর সেবা হইতেছে এই ভাবই তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে শিক্ষা পাইয়াছি। ঠাকুরের বাক্যকে তিনি 'বেদ' অপেক্ষাও বড় মনে করিতেন। ঠাকুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ বা নিষেধগুলি যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ও পালন করিতেন, ঠাকুরের বড় বড় উপদেশগুলিকেও সেইরূপ ভাবে করিয়া থাকিতেন। ঠাকুর ঘরেতে যে ঠাকুর সত্য সত্যই আছেন, তিনিই মঠ পরিচালনা করিতেছেন, আমরা তাঁহার সেবক মাত্র, এইভাবেই ভরপুর থাকিতেন এবং আমাকে তাহাই শিক্ষা দিতেন। ঠাকুরের কোন সামান্য জিনিস নষ্ট হইলে আমাদের বিশেষভাবে ভর্ৎসনা করিতেন এবং দৈবাৎ কখনও নিজের দ্বারা সামান্য ত্রুটি হইয়া পড়িলে নিজের উপরও বিরক্ত হইতেন এবং গালাগালি করিতেন। যখন মাদ্রাজ মঠে অবস্থান করিতেন তখন তিনি স্বয়ং পূজা করিতেন। তাঁহার পূজাতে একটি বিশেষত্ব ছিল—তিনি যে ঠাকুর ঘরে গিয়া খুব ধ্যানধারণা বা মন্ত্রপাঠ করিতেন তাহা নয়। ঠাকুর যেন সত্য সত্যই বসিয়া আছেন, যেন তাঁহার স্নানাদি করিবার সময় হইয়াছে, সেই সময় তাঁহাকে যাইতে হইবে এইরূপ ভাবে গরগর হইয়া ঠাকুরঘরে ঢুকিতেন। ঠাকুরকে স্নান করান, চন্দন ও তুলসী দিয়া সাজান, নিবেদনাদি করা প্রভৃতি চট্‌পট্‌ করিয়া পূজা সাঙ্গ করিতেন। ভাবে গরগর হওয়ায় মুখ বুক সমস্ত লাল হইয়া উঠিত এবং "জয়গুরু, জয়গুরু" উচ্চারণ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিতেন। সেইসময়কার ভাব ও চেহারা বর্ণনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। ঠাকুরের প্রসাদ কখনও ফেলিতেন না বা যাহাকে তাহাকে দিতেন না বরং বাসি করিয়া রাখিয়া দিতেন। অন্য ভক্ত না খাইলে নিজে খাইতেন ও বলিতেন "যজ্ঞের হবি কুকুরকে দেওয়া যেতে পারে না।" পান্তাভাত বাসিরুটি খাইয়া খাইয়া শরীর খারাপ হইত, তাহা সত্ত্বেও কখনও ফেলিতেন না। আমার মনে হয় তাঁহার শরীর পরে যে একেবারে ভাঙিয়া যায় ইহাই তাহার অন্যতম কারণ। এমনকি তিনি তাঁহার লেকচার দেওয়া, ক্লাস করা প্রভৃতি সমস্তই ঠাকুরের কাজ করিতেছেন বা সেবা করিতেছেন এইভাবে ভাবিত হইয়া করিয়া যাইতেন। আমার মনে আছে একদিন

রাত্রে ক্লাস হইতেছে, যতদূর মনে পড়িতেছে 'পঞ্চদশী' ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তিনি সব রকমের ব্যাখ্যা দিয়া তাহাতে ঠাকুর-স্বামীজীর কথা বলিয়া যাইতে ছিলেন। একঘর লোক কিন্তু বেশির ভাগ ঝিমাইতেছিল। সামনের গুটিকতক লোক মাত্র বসিয়া মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। ক্লাস হইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "মহারাজ, বেশিরভাগ শ্রোতা ঝিমুচ্ছিল। আপনি এত করে ঘণ্টাখানেক বলে গেলেন, সামান্য লোকই শুনল"। তিনি এমনভাবের সহিত ইহার উত্তর দিলেন, "কে কি শুনলে, কি বুঝলে আমি জানতে চাই না। আমি যে তাঁর কথা বলে কৃতার্থ এই যথেষ্ট।" লেকচারাদি ঐভাবেই নিজের উপকার বা কৃতার্থবোধ জ্ঞানে করিয়া যাইতেন। আশ্রমে কোন জিনিস বা আহার্য সামগ্রীর দরকার হইলে তিনি অসঙ্কোচে ক্লাসের ভক্তদের বা ছাত্রদের নিকট হইতে তাহা চাহিয়া লইতেন। চাহিতে কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না বা কোন রূপ obligation (বাধিত) বোধও করিতেন না। এমনকি দেখা গিয়াছে যদি কেহ তাঁহার নির্দেশ সত্ত্বেও আনিতে ভুলিয়া যাইত তাহাকে বারবার স্মরণ করাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, "যে যা কিছু দিচ্ছে, প্রভুর সেবার জন্যই দিচ্ছে। তাতে তারই কল্যাণ হবে। এতে আমার কোন স্বার্থ নেই।"

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি তাঁহার ভিতরে যে পূর্ণভাব তাহাই যেন তাঁহার বাহিরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। তাঁহার ভিতর বাহির এক ছিল। সেবা ভাবে সর্বদা এত গরগর মাতোয়ারা থাকিতেন যে আমি তাহা মুখে বর্ণনা করিতে পারিব না। একদিন শুইয়া আছেন হঠাৎ তাঁহার মনে এই ভাব উদিত হইল, ঠাকুরকে গরম গরম ভালো জিনিস (লুচি) দিতে হইবে। অমনি উঠিয়া নিজে স্টোভ জ্বালিয়া ময়দা মাখিয়া লুচি তৈয়ার করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। তাঁহার নিকট যে কেহ থাকিত সকলেই কিছু না কিছু অনুভব করিত যে সত্য সত্যই ঠাকুর তথায় বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার ভালোবাসাও খুব অদ্ভুত ছিল। যে কেহ তাঁহার নিকট থাকিত বা তাঁহার সহিত মেলামেশা করিত তাহাদের যেমন আন্তরিক ভালোবাসিতেন তেমনি আবার তাহাদের কল্যাণের জন্য কঠোর ভাব ধারণ করিতেন। কাহারও সামান্য অসুখ-বিসুখ করিলে এত বিচলিত হইতেন যে তাহা আর কি বলিব। ব্রহ্মচারী অথবা সাধু যে কেহ তাঁহার নিকট থাকিত তাহাদের কাহাকেও বাড়িতে বা বন্ধুবান্ধবের নিকট পত্রাদি ব্যবহার করিতে দিতেন না। ঠাকুর যে তাহাদের একান্ত আপনার জন একথা বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিতেন। যাহাতে তাহারা ইহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে সেই

বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেন। ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি বেলুড় মঠে আসেন। ইহাই তাঁহার প্রথম বেলুড় মঠ দর্শন। ইহার পূর্বে মঠ হওয়া অবধি দর্শন করেন নাই! স্বামীজীর সহিত উহাই তাঁহার শেষ দেখা। এইবারে মাদ্রাজে ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী না থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া মঠে আসেন। যোগীন বলিয়া একটি নূতন ছেলে ছিল বটে কিন্তু নূতন বলিয়া হয়ত তাহাকে পূজার ভার দেন নাই।

(শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর-প্রসঙ্গ—স্বামী কমলেশ্বরানন্দ,
১ম প্রকাশ, ১৩৮৪ ফাল্গুন, পৃঃ ৬৬-৭০)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিকণা

স্বামী শঙ্করানন্দ

বরাহনগর মঠের দিনগুলি ঃ বরাহনগর মঠের প্রারম্ভ থেকেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। তিনি নিত্য শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, রন্ধনের পর ভোগ নিবেদন, পূজার বাসনপত্র ও ঠাকুর ঘর ইত্যাদি পরিষ্কার করতেন ও গঙ্গাস্নান সেরে মঠে জল নিয়ে আসতেন। সাধারণত গুরুভাইদের মধ্যে চারজন রোজ ভিক্ষায় বেরুতেন। কিন্তু ভিক্ষালব্ধ অন্নের পরিমাণ তাঁদের প্রয়োজনের তুলনায় কম হতো। ভিক্ষার সময় এই যুবক সন্ন্যাসীরা পাড়া-প্রতিবেশীদের বিদ্রুপের সম্মুখীন হতেন। ঐ সময়ে একদিন স্বামীজী দৃঢ়ভাবে বললেন ঃ "শশী, তোকে নিত্য পূজার সরঞ্জাম বা ভোগের জন্য সামগ্রী কে যোগান দেবে?" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সেই কঠোর মন্তব্য সহ্য না করতে পেরে প্রতিবাদ করে বললেন—"তোমার কাছে কে সাহায্য নিতে যাচ্ছে? শ্রীপ্রভুই তাঁর সব প্রয়োজন মেটাবেন।"

এই সময় তিনি প্রতিদিন দুপুরে দুই ঘণ্টা করে তাঁর অবসর সময় বরাহনগর হাইস্কুলে পড়াতেন। মঠের অভাব মেটানোর জন্য এইভাবে তিনি প্রায় তিনমাস স্কুলে পড়িয়েছিলেন।

মঠের পাশে একটা ব্যায়ামাগার ছিল। যেসব ছেলেরা ওখানে আসত তারা তাঁকে "মাস্টারমশাই" বলে জানত। কারণ, তিনি তাদের স্কুলে পড়িয়েছিলেন। যখন ভক্তরা শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণ) জন্য মিষ্টান্নাদি আনতেন, তিনি স্কুলের ছেলেদের প্রসাদ খাবার জন্য মঠে নিমন্ত্রণ করতেন। ওই ছেলেরা তাঁর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিল ও তাঁকে ওরা মাঝে-মাঝে নানা কাজে সাহায্য করত।

ঠাকুরঘরের কাজ তিনি কখনও কোন গুরুভাইকে করতে দিতেন না। তাঁরা বিনাবাধায় যখন খুশি কলকাতায়, এমনকি তীর্থযাত্রা করতেও যেতেন। স্বামীজী আমেরিকা থেকে ফিরে, এপ্রিল ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মাদ্রাজে পাঠানোর আগে পর্যন্ত তিনি মঠে শ্রীপ্রভুর একনিষ্ঠ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস অনুষ্ঠানের সময় স্বামীজী তাঁকে রামকৃষ্ণানন্দ নামে

অভিষিক্ত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অনন্য ও একনিষ্ঠ ভক্তির জন্য অন্যান্য গুরুভাইরাও স্বামীজীর এই নামকরণকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমর্থন করেন।

একদিন বাবু বলরাম বসু মঠে এসে দেখেন যে সাধুরা তাঁদের দ্বিপ্রাহরিক আহার শুধু ভাত ও সামান্য শাক দিয়ে সারছেন। তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে সেদিন তাঁদের ভিক্ষায় কিছুই পাওয়া যায় নি। অতএব তাঁরা সেইদিন কেবল হিঞ্চে শাক রান্না করেছেন। মঠস্থ সাধুদের না জানিয়ে বলরাম বাবু একজন পরিচিত রাঁধুনিকে তাঁর বাড়ি থেকে রান্নার সামগ্রী মঠে আনতে বললেন এবং সে রাঁধুনিটি পুরস্কার পাওয়ার আশায় রাজি হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে বলরামবাবু তাঁর স্ত্রীকে বললেন যে তিনি ভাত ও সামান্য শাক দিয়েই আহার করবেন। তাঁর স্ত্রী ভাবলেন যে বলরামবাবুর শরীর হয়ত খারাপ হয়েছে। কারণ তিনি প্রায় অম্বল ইত্যাদি রোগে ভুগতেন। আহারের সময় তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আজ তুমি কেন সামান্য শাক দিয়েই আহার করবে? তোমার শরীর কি ভালো নয়?" উত্তরে বলরামবাবু বললেন, যে তিনি মঠে গিয়েছিলেন ও স্বচক্ষে দেখেছেন যে শ্রীপ্রভুর সাক্ষাৎ সন্তানেরাই শুধু ভাত ও সামান্য শাক দিয়ে আহার করছেন। তাহলে তিনি কি করে নানা ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেতে পারবেন? উত্তরে তাঁর স্ত্রী বললেন—"তুমি কী তাঁদের জন্য রান্নার সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করোনি?" বলরামবাবু বললেন যে তিনি তাঁদের পরিচিত রাঁধুনিকে তাঁদের বাড়ি থেকে জিনিসপত্র নিয়ে মঠে পৌঁছে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সন্ন্যাসী ভাইদের প্রতি একজন গৃহীর ঐরকম প্রাণঢালা ভালোবাসা ও সহৃদয়তা সত্যই বিরল। ঐরকম সম্পর্ক রাখা তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ছিলেন 'রসদ্দার'।

বরাহনগর মঠের সেই দুর্দিনেও যে কেউ মঠে আসত, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ তাদের প্রত্যেককে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ দিতেন। ঠাকুরকে নিবেদিত মিছরি বা সামান্য কোন মিষ্টান্ন হলেও তিনি দর্শনার্থীদের জন্য গুছিয়ে রাখতেন। মহারাজ বলতেন যে এক কণা প্রসাদ খেলেই নিঃসন্দেহে তাদের ঠাকুরের উপর ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে ও প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। মাদ্রাজেও তিনি প্রত্যেক দর্শনার্থীকে নারিকেলের তৈরি মিষ্টি বা মিছরি দিতেন ও মঠস্থ সকলের উপর নির্দেশ ছিল যে, প্রত্যেক ভক্তকে যেন কিছু প্রসাদ দেওয়া হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহারাজ বসন্তকে ওঁর সন্ন্যাসের জন্য মঠে নিয়ে আসেন। ঐ সময় স্বামীজী বসন্ত (পরমানন্দ), সূরজ রাও (নিশ্চয়ানন্দ) ও

শ্রীলঙ্কা থেকে আগত এক যুবককে (সত্যানন্দ) সন্ন্যাস দান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীকে সাহায্য করেন।

মাদ্রাজে ফেরবার সময় স্বামীজী যোগেশ্বরানন্দ (স্বামীজী যাকে বেলুড় মঠে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস দান করেছিলেন), পরমানন্দ ও সত্যানন্দকে মহারাজের সাথে পাঠান। কিন্তু সত্যানন্দ তাঁর পূর্বাশ্রমে চলে যান এবং পরবর্তী কালে তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। স্বামীজীর শরীর যাবার কয়েক মাস পর যোগেশ্বরানন্দ মঠে ফিরে আসেন। পরে আবার তাঁকে মাদ্রাজে ফেরত পাঠান হয়।

আইস হাউস (কারনান ক্যাসল)—১৯০২ এর শেষভাগ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত ঃ রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ মঠবাসীদের সর্বদা বলতেন যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের তরকারি কাটা বা অন্যান্য কাজ দ্রুত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাবধানতার সাথে করা হয়। তিনি বলতেন—"সাধু-ব্রহ্মচারীরা সব কাজ নিখুঁত ভাবে করবে। কাজ করতে গিয়ে যেন সময়, শক্তি বা জিনিসের অপচয় না হয়। তাদের সাবধানতা বজায় রেখে কাজ করা উচিত যাতে কোন দুর্ঘটনা না হয় বা কারোর কোন আঘাত যেন না লাগে। তারা যেই কাজে হাত দেবে, সেইটাই আদর্শ রূপে পরিগণিত হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনও তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেন অথবা কখনও তিনি হৃদয়ে হস্তদ্বয় স্থাপন করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এই সময় তিনি যেন দাঁত কড়মড় করতেন আর তাঁর সমস্ত শরীর স্থির হয়ে যেত। প্রণামের পর তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত আর তাঁর মুখমণ্ডলে এক দিব্য আভা প্রকাশিত হতো ও মুখখানি যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

স্নানের পর তিনি কোন দিকে না তাকিয়েই ঠাকুরঘরের দিকে দৌড়ে যেতেন। যেতে যেতেই কাপড় ছেড়ে নিতেন। সেইজন্য প্রত্যেক দিন তাঁর ভেজা কাপড় যত্রতত্র পাওয়া যেত।

একদিন মহারাজ বলছেন—স্বামীজী আমাকে স্বপনে দর্শন দিয়ে বললেন—"দেখ শশী, এই শরীরটাকে থুতুর মতো ফেলে দিলাম।" আর এই বলে তিনি দুই-তিনবার থুতু ফেলতে লাগলেন। এই দুঃস্বপ্ন দেখে মহারাজের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। পরদিন বেলুড় মঠ থেকে স্বামীজীর মহাসমাধির সংবাদ নিয়ে একটি তার এল।

মহারাজ আজীবন কঠোর নিরামিশাষী ছিলেন। তার কারণ, অল্প বয়স থেকেই তাঁর দুই পায়ে একপ্রকার চর্মরোগ (eczematous eruptions) ছিল। ওই রোগের জন্য তাঁকে কখনও পায়ে একপ্রকার আয়ুর্বেদিক তেল লাগাতে হতো। আর সমুদ্রের হাওয়ায় চর্মরোগ বৃদ্ধি পেত। সেই কারণে তিনি নগ্ন পায়ে সমুদ্রের হাওয়া বেশিক্ষণ লাগাতে পারতেন না।

সর্বদা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে গোঁড়া ব্রাহ্মণোচিত আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। কিন্তু সাথে-সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—"ভক্তের কোন জাত নেই", এইটিকে তিনি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করতেন ও তদনুযায়ী তা পালন করতেন।

একদিন একটি বাঙালি যুবক তাঁর কাছে আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করে। কারণ দুইজন বৈরাগী সাধু, যাদের কাছে সে আশ্রয় নিয়েছিল, তাকে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে ও তাকে ওরা পরিমাণ মতো খেতেই দিত না। মহারাজের তার প্রতি দয়া হলো ও তিনি ছেলেটিকে মঠে স্থান দিলেন। প্রায় এক মাস পর সেই ছেলেটি স্বেচ্ছায় মঠ থেকে চলে যায়। কিন্তু কিছুদিন পর যখন তার অনুশোচনা হয় ও সে মঠে ফিরে আসে, তখন মহারাজ তাকে ক্ষমা করে দেন। সেই ছেলেটি তাঁকে খুঁটিনাটি কাজ ও মঠের বাইরের কাজে সাহায্য করত। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের পূর্বে রান্না করা দ্রব্য বা ভোগ রান্নার সময়ও তাকে কিছু স্পর্শ করতে দেওয়া হতো না। পরবর্তী কালে যখন ছেলেটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তখন আর পূর্বোক্ত ব্যাপারের নিয়ম তাকে পালন করতে হতো না।

যে কেউ মঠে যোগদান করতে এলে, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদর্শিত পথে মহারাজ প্রত্যেকের শারীরিক গঠনাদি পরীক্ষা করে দেখতেন। তিনি বলতেন—"বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ যেই একবার পেয়েছে সেই পবিত্র হয়ে গেছে।" যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তিনি তাঁদের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিগুলি দেখতে এবং অনুভব করতে পারতেন ও তদনুযায়ী তাদের সাহায্য করতেন।

একদিন একটি ভদ্রলোক মহারাজের কাছে এসে তাঁর বড় গোড়ালি দুটি স্পর্শ করে খুব ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে। মহারাজ তাঁর এই আচরণ পছন্দ করেননি। তাকে বিদায় দিয়ে মহারাজ বললেন যে, সে যেন শহরে অনুষ্ঠিত তাঁর কোন class-এ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। সে চলে যাবার পর মহারাজ গঙ্গার জল আনতে বললেন। মাথায় গঙ্গার জল ছিটিয়ে তিনি তা সামান্য একটু পান করলেন। তারপর তিনি গোড়ালি দুটি ধৌত করতে করতে

বললেন—"ওই লোকটির জন্য আমি দুঃখিত। ওঁকে কেউ বাঁচাতে পারবে না যদি না সে প্রভুর কাছে অনুতপ্ত হয়ে ঐকান্তিক ভাবে প্রার্থনা করে।"

একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসের একজন বাঙালি বড় officer একদিন বিকালে মহারাজের সাথে দেখা করতে আসেন। সে এক বিদেশী গুরুর চেলা বলে খুব বড়াই করতে লাগল। আর সে তার গুরু-উপদিষ্ট সাধন-প্রণালী ইত্যাদির প্রশংসা করতে লাগল। উত্তরে মহারাজ বললেন—"এখন কি আমাদের বিদেশীদের কাছ থেকে সব কিছু শিখতে হবে! তবে, যে সকল বিষয় আমরা অনভিজ্ঞ, সে সকল বিষয় আমরা নিজেদের সুবিধার্থে তাদের কাছ থেকে শিখতে পারি। এ এক অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমরা নিজেদের রত্ন সম্ভারের সম্বন্ধেই অজ্ঞ। বিশেষ করে যদি আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে আমাদের বিদেশীদের কাছে শিখতে হয়!"

আর একদিন বানিয়ামবাদি থেকে এক ভদ্রলোক মহারাজের সাথে দেখা করতে আসেন। সে মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। সে লোকটি ইংরেজি বলতে পারেন না ও মহারাজও তামিল ভাষা ভালো জানতেন না। অতএব একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে দোভাষীর কাজ করার জন্য ডাকা হলো। ভদ্রলোক বললেন যে তিনি স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন ও তাঁর কৃপা লাভ করেছেন। কিন্তু তিন মাস পর, মাদ্রাজ মঠে আসার পূর্বে তিনি জানতেন না যে কে তাকে অত কৃপা করে আশীর্বাদ করলেন। ট্রিপলিকেনে একটি বইয়ের দোকানে উনি শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ছবি দেখতে পেলেন। যখন উনি দেখলেন যে স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিটির শ্রীমুখ ওই ছবিটির সঙ্গে মিলছে, তখন তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে উনি জানতে পারলেন যে ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণের ও তাঁর এক শিষ্য ক্যাসেল কারনানে থাকেন। সেই কারণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যকে দর্শন করতে ও শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে আরও কিছু জানবার জন্য মঠে এসেছেন। এর কিছুদিন পর সেই ভদ্রলোক তার গ্রামে একটি আশ্রম স্থাপন করেন এবং সেখানে নির্জন বাস ও প্রভুর নামগুণগান করে তার জীবন কাটাতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের ব্যাপারে মহারাজ খুব সচেতন থাকতেন যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কখনও বেশি গরম বা বেশি ঠাণ্ডা খাবার নিবেদন না করা হয়। তিনি দুধের ব্যাপারে বিশেষ করে এটি নজর রাখতেন। একদিন যখন ভোগ নিবেদনের জন্য সব সামগ্রী ঠাকুরঘরে নেওয়া হয়ে গেছে, মহারাজ নিজে এসে

দুধের বাটিটা নিতে এলেন। অতি সন্তর্পণে তিনি দুধের বাটিটা হাতে নিয়ে গম্ভীর ভাবে ধীর পদক্ষেপে ঠাকুরঘরের দিকে গেলেন। বাটিটা দুধে কানায় কানায় ভর্তি ছিল। তিনি কিছুটা দূরে যাওয়ার পর খানিকটা দুধ চলকে মাটিতে পড়ল। তখন তিনি দাঁত কড়মড় করে ধীর স্বরে বলতে লাগলেন—"তিনি গরম দুধ খাবেন।" "তিনি গরম দুধ খাবেন।" এর অর্থ বোঝা সত্যই কঠিন। তবে দুধ মেঝেতে পড়ে যাওয়ার অর্থ যে অমঙ্গল সূচক, যা আপসোস করেও কিছু করার উপায় নেই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া মহারাজের হয়ত নিজের উপর রাগ হয়েছিল যার বহিঃপ্রকাশ ঐ সকল শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রতিদিন সকালে, বিকালে একটি ও রবিবার দুপুরে ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে একটা অতিরিক্ত ক্লাস নিতেন। মহারাজের রবিবারের ক্লাসে প্রায় ট্রিপ্লিকেন ও মায়লাপুরের প্রবীণ অনুরাগী ও ভক্তরা মিলিত হতেন। মহারাজ তাঁর এই কাজ বহু বছর ধরে ভক্তি সহকারে করে গেছেন। তবে পরবর্তী কালে ক্লাসের সংখ্যা কমিয়ে দিতে হয়েছিল।

এক গ্রীষ্মকালে সকালবেলায় মহারাজ তাঁর ক্লাস সেরে বেলা ১০.৩০ নাগাদ এক ঘোড়ার গাড়িতে মঠে ফিরলেন। তাঁর ঘরে ঢুকেই তিনি কাপড় ছেড়ে দিয়ে খাটের এক ধারে বসে পাখা দিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে লাগলেন। গ্রীষ্মকালে গরমের জন্য তাঁর এই অবস্থা দেখে এক ব্রহ্মচারী পিছন থেকে তাঁকে হাওয়া করতে লাগলেন। প্রায় এক মিনিট পর, মহারাজ তাঁর হাত থেকে পাখাটি ছুড়ে ফেলে হাত দুটি মুঠো করে যেন কারোর সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন—"তোমার জন্যই আমাকে এত কষ্ট পেতে হয়। দেখ, আমার কী কষ্ট।" পর মুহূর্তে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে মাটিতে মুখ ঘষতে-ঘষতে বলতে লাগলেন—"না ভাই, না ভাই, আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। তুমি যা করেছ তাই যথার্থ। সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।" যখন তিনি উঠে বসলেন, তাঁর দুই চোখ বেয়ে ধারা পড়তে লাগল, মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর তিনি চারদিকে এক দিব্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এই সব কিছু তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে উদ্দেশ্য করে করছিলেন, যিনি তাঁকে মাদ্রাজে পাঠিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত ভাবধারায় জীবনযাপন করতে।

একদিন বিকালে সামান্য বৃষ্টি হচ্ছিল ও আকাশ সম্পূর্ণ মেঘে ঢাকা ছিল।

একটি ঘোড়ার গাড়ি ঠিক সময়ে মহারাজকে তাঁর ক্লাসের জন্য নিয়ে যেতে এসেছিল। মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারীকে সেদিন তাঁর সাথে যেতে বললেন। ঘোড়ার গাড়িটা জর্জ টাউনে এক গলিতে এসে থামল যেখানে মহারাজ ক্লাস নিতেন। সেখানে একটি ১২´ × ১৫´-র ঘর, যার এক ধারে ঘরের ভিতর ঢোকার জন্য সামান্য জায়গা ছিল। ঘরে একটা টেবিল, একটা চেয়ার আর সামনে দুটো ও ডান দিকে দেওয়ালের ধারে একটা বেঞ্চ রাখা ছিল। চেয়ারের পিছনে দেওয়ালে একটা ঘড়ি টাঙানো থাকত। এক কর্মচারী একটি বড় টেবিল ল্যাম্প এনে দিল। ঘরে অন্য কোন লোক ছিল না। মহারাজ ১৫ মিনিট অপেক্ষা করলেন কিন্তু কেউ এলেন না। তখন তিনি অতি আগ্রহ ও সাবলীল ভাবে তাঁর উপনিষদ বইটি খুলে পড়তে ও ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। এক ঘণ্টা পর তিনি পাঠ শেষ করে বইটা বন্ধ করলেন ও ব্রহ্মচারীটিকে বললেন—"চল, আমরা যাই।" ব্রহ্মচারীটি তাঁকে অনুসরণ করে ঘোড়ার গাড়ির কাছে এল, যেটা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। রাস্তায় যেতে যেতে সে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করল—"মহারাজ, এটা কি হলো, কেউ এলো না অথচ আপনি পুরো এক ঘণ্টা ক্লাস নিলেন?" উত্তরে মহারাজ বললেন—"আমি কারোকে শিক্ষা দিতে আসিনি। আমি কেবলমাত্র আমার দ্বারা নেওয়া সংকল্প পূরণ করি।" স্বামীজীর কাছে নেওয়া তাঁর সংকল্প পূরণ করার ব্যাপারে এই ধরনের অসাধারণ মনোভাব ও বৈশিষ্টতা তিনি সর্বদা নিঃস্বার্থ ভাবে, নিজেকে শ্রীপ্রভুর দাস জ্ঞানে, বজায় রাখতেন।

সেই সময় (১৯০২ এর শেষভাগ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত) কারনান ক্যাসেলে (আইস হাউস) কোন পাচক বা কর্মচারী ছিল না। একজন একচোখ কানা বৃদ্ধা সকালে ও অপরাহ্নে রান্নার বাসনপত্র মাজতে আসত। মাসিক চাঁদা থেকে আয় মাত্র ২৪ টাকা ছিল। এর দ্বারা ও ক্লাসের পর মহারাজের ছাত্রদের কাছ থেকে ভিক্ষায় লব্ধ তরকারি বা আটার দ্বারা মঠের জীবনযাত্রা নির্বাহ হতো।

একবার বেলুড় মঠ থেকে কয়েকজন সাধু রামেশ্বরের পথে মাদ্রাজ মঠে এসে উপস্থিত। সেই সময় মাদ্রাজ মঠে তিনজন স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া স্বামী পরমানন্দ, উক্ত ব্রহ্মচারী (পরে শঙ্করানন্দ) ও যোগীন (উমানন্দ) ছিল। আর ছিল বেলুড় মঠ থেকে আগত সাধুরা। মহারাজ তখন এক ব্যাগ চালের জন্য ব্রহ্মচারীটিকে অধ্যাপক রঙ্গাচারীর কাছে পাঠালেন। পথে ব্রহ্মচারীটির সাথে শ্রীবেঙ্কটরঙ্গমের দেখা হলো ও তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কোথায়

যাচ্ছেন? যখন তিনি জানতে পারলেন যে বেলুড় মঠ থেকে সাধুরা এসেছেন বলে মহারাজের এক ব্যাগ চালের প্রয়োজন, তখন তিনি বললেন—"আমি এক ব্যাগ চাল পাঠিয়ে দেব।" ব্রহ্মচারী অধ্যাপক রঙ্গাচারীর বাড়িতে গেলে, অধ্যাপক তাকে খুব সাদর অভ্যর্থনা করলেন ও তার বাড়িতে আসার কারণ জানতে পারলেন। ততক্ষণাৎ তিনি মঠে এক ব্যাগ ভালো চাল পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য তার এক আত্মীয়কে নির্দেশ দিলেন। ব্রহ্মচারীটি উক্ত লোকটির সাথে গেল ও এক ব্যাগ চাল একটি ঠেলা গাড়িতে বোঝাই করল। মঠে আসার পর, ব্রহ্মচারীকে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—কেন তার মঠে ফিরতে দেরি হলো। কারণ মঠে চাল এসেই গেছিল। ব্রহ্মচারীটি বললেন যে, অধ্যাপকের দেওয়া চাল তিনি তার সাথে এনেছেন। আর হয়ত শ্রীবেঙ্কটরঙ্গমের দ্বারা প্রেরিত চাল মঠে আগে এসে পৌঁছেছে। ট্রিপ্লিকেনের পথে যার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। দুই ব্যাগ চাল পেয়ে মহারাজ খুব খুশি হলেন ও উচ্চারণ করলেন—"জয় শ্রীপ্রভু!" আর তিনি বললেন—"এই চালে বেশ কিছু দিন চলবে।"

১৯০৩ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে ক্যাসেল কারনানে অবস্থিত মঠে প্রথমবার স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসব পালিত হলো। উৎসবের অন্যান্য অঙ্গের সাথে নারিকেল বাগানে বহু গরিব মানুষকে পেট ভরে খাওয়ানো হয়েছিল। ওই সময় আমেরিকার ওহিও থেকে আগত মিঃ ও হায়াত নামে এক আমেরিকাবাসী মঠের সংলগ্ন বহির্বাটিতে একটি ঘরে ছিলেন। সেই লোকটিকে তার মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্য থিওসফিক্যাল সোসাইটি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মহারাজ তাকে মঠে স্থান দিয়েছিলেন ও তার আমেরিকা ফিরে যাবার ব্যাপারে কলম্বোতে চিঠি লিখেছিলেন। লোকটি প্রায় কথা বলতেন না বা খাবার খেতেন না। তিনি গোড়ালির উপর ভর দিয়ে সুতো কাটা অভ্যাস করতেন। আর তিনি বলতেন যে এভাবে মনঃসংযোগ করা যায়। দেখা যেত, তিনি দুধ পছন্দ করতেন। সেই কারণে হাফডজন দুধের টিন কিনে তাকে দেওয়া হয়েছিল। পরদিন সকালে ব্রহ্মচারীটি দেখল যে, সব টিন উধাও হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলে মিঃ হায়াত কোন উত্তর দেননি। খালি টিনগুলি জানালা দিয়ে নারিকেল বাগানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সকলে ভয় পেলেন যে, লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। কিন্তু তার কিছুই হলো না। কারণ তিনি পরদিন অন্য কোন খাবার খাননি।

এরপর উৎসবের দিন দুপুরে সে সমুদ্রের ধার থেকে ছুটে এসে খবর দিল

যে, একটি লোক জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে ও সে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মহারাজ ব্রহ্মচারীকে ব্যাপারটা দেখার জন্য পাঠালেন। প্রচণ্ড গরম বালিতে ব্রহ্মচারী খালি পায়ে অতি কষ্টে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখল যে, কেবল একজন কুষ্ঠ রোগী সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে তার ঘা ধুচ্ছে। মিঃ হায়াতকে অতি কষ্টে বাধা দেওয়া হচ্ছিল যাতে উনি কুষ্ঠ রোগীটিকে টেনে না তোলেন। রোগীটির স্নান হয়ে যাবার পর তাকে মঠে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হলো। ঠিক সময়ে সে উপস্থিত হলো ও মিঃ হায়াত তা দেখে খুব খুশি হলেন। পরে মিঃ হায়াতকে কলম্বোতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো যখন জানা গেল যে তার আমেরিকা ফিরে যাবার জন্য টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

এই সময় মহারাজ বাংলায় শ্রীরামানুজের জীবনচরিত লিখছিলেন। তিনি তেলেগু হরফে ছাপা একটি সংস্কৃত বইয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। সামান্য সাহায্যের জন্য তিনি ব্রহ্মচারীকে তেলেগু শিখতে নির্দেশ দিলেন যাতে সে মহারাজকে সংস্কৃত পড়ে শোনাতে পারে। তার অল্প অবসর সময়ের মধ্যে এই উন্নতি দেখে তিনি খুব তৃপ্ত হলেন।

একদিন ট্রিপ্লিকেনের এক ভক্ত মহারাজকে তার বাড়িতে ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি ব্রহ্মচারীকেও মহারাজের সাথে তার বাড়িতে আসতে বললেন। নির্দিষ্ট দিনে মহারাজ ও ব্রহ্মচারীটি ভক্তের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। দরজায় ধাক্কা দেওয়ার পর এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে বলল যে, গৃহস্বামী বাড়িতে নেই। মহারাজ বৃদ্ধাটিকে অনুরোধ করলেন যে, যদি গৃহস্বামী কাছাকাছি কোথাও থাকেন, তাহলে যেন তাকে তাদের আগমনের খবর দেওয়া হয়। একটি ছেলেকে পাঠান হলো। কিছুক্ষণ পর ভক্তটি এসে খুব দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল ও অতি বিনয়ের সাথে বলল—"ও স্বামীজী! আমি তো পুরোপুরি ভুলেই গিয়েছিলাম।" মহারাজ অতি বিনম্রভাবে তাকে বললেন যে, আপনি কাছের কোন দোকান থেকে কিছু খাবার আনিয়ে দিন। খাবার আনা হলো ও মহারাজ অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে আহার সেরে ফিরে এলেন। পরে একসময় মহারাজকে আবার নিমন্ত্রণ করে ভালোভাবে আপ্যায়ন করা হয়েছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে স্বামী যোগেশ্বরানন্দ মাদ্রাজে এসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সাথে থাকেন। কিছুকাল থাকার পর তাকে বানিয়ামবাদিতে পাঠান হয়। সেখানে তিনি এক ভক্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে থাকতেন।

সেখানকার আশ্রম পরিচালনার ব্যাপারে তার কোন ভূমিকা ছিল না। তিনি সেখানে এক মাস থাকার পর হঠাৎ স্বেচ্ছায় মাদ্রাজে ফিরে আসেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি ব্যাপার, তুমি হঠাৎ চলে এলে? তোমার কি শরীর খারাপ?" উত্তরে স্বামী যোগেশ্বরানন্দ বললেন—"আমার পক্ষে সেখানে থাকা অসম্ভব, কারণ সেখানে কথা বলার মতো কোন লোক নেই।" মহারাজ তাকে মাদ্রাজে রাখার চেষ্টা করলেন যাতে তাকে দিয়ে ওনার কোন কাজের সাহায্য হয়। কিন্তু তিনি ব্যাঙ্গালোরে চলে গিয়ে সেখানে থাকতে লাগলেন।

এই সময়েই প্রথম বার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে ব্যাঙ্গালোরের ভক্তেরা আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে এক জনসভায় তিনি সবার সাথে স্বামী যোগেশ্বরানন্দের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পর স্বামী যোগেশ্বরানন্দ মঠ ও মিশনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একাকী থাকতে লাগলেন।

রোজ রাত্রে খাবার পর সব মঠবাসীরা মহারাজের সাথে মিলিত হতেন এবং তিনি শুতে যাবার আগে পর্যন্ত তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতেন। কখনও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের শারীরিক গঠন সম্পর্কে বলতেন যে, তাঁর গোড়ালি ও হাতের তালু কত নরম এবং হালকা রক্তিম বর্ণ ছিল। তিনি আরও বলতেন যে, দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর কীরকম সচেতন ছিলেন এবং তিনি তাঁদের (তাঁর শিষ্যদের) কোন জিনিস ব্যবহারের পরে যথাস্থানে রাখার ব্যাপারে কীভাবে শিক্ষা দিতেন। তিনি সর্বদা তাঁদের উপর নজর রাখতেন ও তিনি তাঁদের মনের যাবতীয় সংশয় ও অশান্তির কথা বুঝতে পারতেন। তিনি তাঁদের অজান্তেই প্রয়োজন মতো তাঁদের দোষ-ত্রুটি শুধরে দিতেন। কিন্তু তাঁরা অচিরেই স্বস্তি ও শান্তি ফিরে পেতেন এবং অনুভব করতেন যে, তাঁদের মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে গেছে। কখনও তিনি বলতেন—দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর কীভাবে সব ব্যঙ্গপূর্ণ মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি করতেন বা কীভাবে অন্যলোকদের অনুকরণ করে দেখাতেন। এইসব বর্ণনা করার সময় তিনি নির্দ্বিধায় গালাগালের ভাষাও ব্যবহার করতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের গণিতের উপর খুব প্রীতি ছিল ও তিনি ধাঁধার আর অঙ্কের সমাধান করতে ভালোবাসতেন। মঠবাসীদের কখনো তিনি একটা অঙ্ক দিয়ে তার সমাধান করতে বলতেন।

একদিন রাত্রে মহারাজ বললেন যে, স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে-ই ইংল্যান্ড থেকে

তামাক এনেছিলেন। তার (Sir Walter) অনেক বৈজ্ঞানিক বন্ধু ছিল যারা বড় সিগারে ধূমপান করতে পছন্দ করতেন। একদিন তিনি উক্ত বৈজ্ঞানিকদের জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, তোমরা তো অবশ্যই ধূমপান করতে পছন্দ কর, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কী বার করতে পার যে, ধোঁয়ার ওজন কত?" মহারাজ চারদিকে দেখতে লাগলেন যেন তিনি উত্তর জানতে চাইছেন। সেই সময় স্বামী যোগেশ্বরানন্দ, যিনি রসায়ন শাস্ত্রে এম.এ পাস করেছিলেন, উপস্থিত ছিলেন। তিনি জটিল তথ্য ইউ-টিউব ইত্যাদির সাহায্যে বোঝাতে লাগলেন যাতে লবণের দ্বারা গ্যাস ও জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করা হবে। সেই দ্রব্যগুলি আগে থেকেই ওজন করে রাখা হবে। শেষে উক্ত দুই দ্রব্যের ওজন নিলে ধোঁয়ার ওজন পাওয়া যাবে। ব্রহ্মচারীটি বলল যে, ধূম্রপায়ী তো ক্লান্ত হয়ে পড়বে যদি তাকে প্রতিবার একটি পাইপের ভিতর দিয়ে ফুঁ দিয়ে ধূম বার করতে হয়। তাহলে তো ধূমপানের সব আনন্দ নষ্ট হবে। কিন্তু কেবলমাত্র সিগারের ওজন থেকে ভস্মের ওজন বাদ দিলে ধূমের ওজন পাওয়া যাবে। মহারাজ এই সমাধান শুনে খুব খুশি হলেন ও বললেন যে, র‍্যালেও এই রকম সহজ, সরল উত্তরের প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে বৈজ্ঞানিকরা যথাযথ এবং নিখুঁত করতে গিয়ে এই ধরনের দুর্বহ ও জটিলতা সৃষ্টি করেন যার উপযোগিতাই হারিয়ে যায়।

স্বামী সারদানন্দ প্রত্যেক রবিবার কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটে ধর্মীয় ক্লাস নিতেন। যখনই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় (বেলুড় মঠ) আসতেন সানন্দে ছাত্রদের সাথে কথা বলতে যেতেন কারণ তিনি এক সময় তাদেরই মতো ছিলেন।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ একবার বেলুড় মঠে এসেছিলেন। তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতার শেষে তিনি এক ব্রহ্মচারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন যে ওনার সাথে মাদ্রাজে ছিল ও যাকে তিনি বেলুড় মঠে দেখতে পাননি। ব্রহ্মচারীটির অসুস্থতার কথা জেনে মহারাজ দুই মাইল রাস্তা অতিক্রম করে ঘোড়ার গাড়িতে করে তাকে দেখতে গেলেন। ব্রহ্মচারীটি তীব্র জ্বরে ভুগছিল। মহারাজ ঘরে ঢুকে, তার বিছানায় বসে ব্রহ্মচারীটির মাথায় ও গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন ও বললেন—'তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠ আর মাদ্রাজে চলে এসো। তোমার সুস্থতার খবর পেলেই আমি তোমার যাতায়াতের ভাড়া পাঠিয়ে দেব।'

মহারাজের এইরূপ অভাবনীয় সহানুভূতি ও ভালোবাসায় ব্রহ্মচারীটি অভিভূত হয়ে গেল।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পুরীতে এলেন এবং কিছুদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের সাথে শশী নিকেতনে থাকলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আন্তরিক ভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মাদ্রাজে যাবার জন্য এবং সেখানকার ভক্তদের আশীর্বাদ করার ও দক্ষিণ ভারতের তীর্থাদি দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। ২৭ অক্টোবর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মাদ্রাজের উদ্দেশে পুরী থেকে রওনা দিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ যতদিন মাদ্রাজে ছিলেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করতে যেতেন। তিনি মহারাজকে খুব ভক্তি সহকারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেন যেন তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। প্রণাম করে উঠে তিনি মহারাজকে কুশল প্রশ্নাদি করতেন ও জিজ্ঞাসা করতেন যে, মহারাজ সেদিন কোথাও ভ্রমণ করতে আগ্রহী কী না বা তিনি সেদিন কোন বিশেষ কিছু খেতে চান কী না।

একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রশ্নগুলির কোন উত্তর না দিয়ে স্থির হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ হতভম্ব হয়ে চলে গেলেন। সন্ধ্যায় আরতির পর মহারাজ যখন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রণাম করতে গেলেন, তখনও তাঁর ঔদাসীন্য দেখে তিনি খুব ব্যথিত হলেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এসে তিনি মহারাজের সঙ্গে আগত যুবক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাজার কী হয়েছে যে তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় কোন কথা বললেন না। "ওঁর কী শরীর ভালো নেই? অথবা তিনি কী আমার উপর রেগে আছেন?" যুবক সন্ন্যাসী সঠিক ভাবে জানতো না যে মহারাজের কী হয়েছে। তবে সে মহারাজের কাছ থেকে সরিয়ে রাখা কোন জিনিসের ব্যাপারে রামুর কাছ থেকে কিছু শুনেছিল। কাজেই সে বলল যে, হয়ত রামুকে দিয়ে মহারাজের জন্য আনা জিনিসটা সরিয়ে রাখা হয়েছে তাই তিনি এইরূপ ব্যবহার করছেন। সেদিন সকালে রামু মহারাজের জন্য বাইজিদের এবং অন্যান্য কিছু ছবি এনেছিল যেগুলি মহারাজ কিছু দিন আগে রামুকে আনতে বলেছিলেন। মহারাজ সেই ছবিগুলি শ্রীঅপরেশ মুখার্জিকে, যিনি 'রামানুজ' শিরোনামে একটি নতুন নাটক লিখছিলেন, পাঠাতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি দক্ষিণ ভারতীয় বেশভূষা, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির দ্বারা অভিনয়ে দর্শকচিত্তে প্রভাব ফেলতে পারেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরামর্শেই শ্রীমুখার্জি রামানুজের জীবনচরিতের নাট্যরূপ দিতে শুরু করেছিলেন। যদিও অনেক দিন পরে সেই নাটকটি মঞ্চে অভিনীত হয়।

পরদিন সকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রণাম করার পর তাঁর হাতে সেই ছবিগুলি তুলে দিয়ে বললেন—"রাজা, এর জন্য তুমি আমার উপর রেগে আছ? আমি এক তুচ্ছ জীব; কাজেই তোমার আমার উপর এইরূপ রাগ করা ঠিক হয়নি। তোমার এক বিন্দু মুখামৃত থেকে হাজার-হাজার শশীর উদ্ভব হতে পারে।" এই শুনে ও ছবির প্যাকেটটি পেয়ে মহারাজ হেসে দিলেন এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আলিঙ্গন করলেন। মহারাজ বললেন যে তিনি ওই ছবিগুলি নিয়ে সরিয়ে রেখেছিলেন কারণ সেগুলি প্রায় সবই দুশ্চরিত্র মহিলাদের ছবি ছিল। আর তিনি রামুকে আদেশ দিয়েছিলেন যাতে সেগুলি রাজাকে না দেওয়া হয়। মহারাজ বললেন—"আর সেই কারণেই আমি রামুর কাছ থেকে ছবিগুলি নিয়ে রেখেছিলাম। রামু তো বলেনি যে তুমি সেগুলি আনতে দিয়েছিলে।" এরপর আবার তাঁরা স্বাভাবিক ব্যবহার করতে লাগলেন।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে যখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাচ্ছিলেন তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পুরী থেকে খুরদা স্টেশনে এসেছিলেন মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে। এইটাই তাঁদের পরস্পরের শেষ দেখা।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে উদ্দেশ করে এক নবীন ব্রহ্মচারীকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন—"এখানে তুমি এক সাধুর সঙ্গ করতে পারবে। তাঁর সেবা করলেই তোমার সব হয়ে যাবে।"

(বেদান্ত কেশরী, জুলাই ১৯৫১, পৃঃ ৮৮-৯৬)
অনুবাদক ঃ স্বামী দয়াশীলানন্দ

[স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ (১৮৮০-১৯৬২) ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শিষ্য। তিনি ছাত্রাবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। স্বীয় গুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের অন্যতম সেবকও ছিলেন। ভুবনেশ্বর মঠ ও বেলুড় মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি মন্দির তাঁর তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তম প্রেসিডেন্ট মহারাজ। (১৯৫১-১৯৬২)]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পূতসঙ্গে

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে শশী মহারাজ নামে সুপরিচিত, তখন মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তরুণ বয়সে তখন আমি সবেমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেছি এবং বেলুড় মঠ থেকে মাদ্রাজ মঠে তাঁর নিকট প্রেরিত হয়েছি। সে সময়ে তাঁর পূত সঙ্গে কয়েক বছর বাস করবার মহৎ সৌভাগ্য আমার হয়। তাঁর সঙ্গে থেকে দিনের পর দিন বিভিন্ন অবস্থায় তাঁকে দর্শন করবার সুযোগ আমি লাভ করেছিলাম। তাতে তাঁর যে মহান অদ্ভুত চরিত্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়েছি তা স্মরণ করলে এত দীর্ঘকাল পরেও স্তম্ভিত হয়ে যাই।

বিংশ শতাব্দী জড় বিজ্ঞানের যুগ। সে সময় চারিদিকে নাস্তিক্য ও সংশয়বাদের প্রাবল্য, সে সময়ে এরূপ একটি গভীর জ্ঞানভক্তি সমন্বিত উন্নত চরিত্রের বিকাশ হয়েছিল, এটি পরম আশ্চর্যের বিষয়। জীবের কল্যাণ সাধনার্থেই কি পরম কারুণিক পরমেশ্বর সে সময়ে এরূপ একটি মহদুচ্চ আদর্শ চরিত্র জগতে প্রকট করেন? অথবা যুগ প্রয়োজনে শ্রীভগবান স্বয়ংই যখন নাস্তিকতা ও সংশয় নিরসনার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ, তখন ঐরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পন্ন তদীয় লীলা সহচর যে আবির্ভূত হবেন, এতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ মুখে বলেছেন, শশী মহারাজ অবতার পুরুষের নিত্য-সহচর।

পূজ্যপাদ শশী মহারাজ সর্বক্ষণই যেন এক অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক রাজ্যে বাস করতেন। ঐটি তাঁর কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং জাগতিক কাজকর্মে নিযুক্ত থাকবার কালেও তিনি গভীর ধর্মপ্রাণতার পরিচয় দিতেন। তাঁর সামান্য কাজেও একটা আধ্যাত্মিকতার ছাপ থাকত। তাঁর কাজের ধরনের দর্শনে জন-সাধারণ বিস্মিত হতো। কিন্তু এটি তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজ ও স্বভাবগত ছিল। বরং এটি দর্শন করে লোকে যে আশ্চর্যান্বিত হয়, সেটিই তাঁর কাছে বিস্ময়ের বিষয় ছিল।

তাঁর মধ্যে দেখেছি অশেষ গুরুভক্তি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন লোকলোচনের অগোচর হলেও শশী মহারাজের হৃদয় থেকে কখনও তিনি অন্তর্হিত হন নি। সর্বদাই যেন গুরু মহারাজ তাঁর কাছে করামলকবৎ প্রত্যক্ষগোচর ছিলেন। স্থূল চোখে বাহ্যবস্তু দর্শনের মতোই তিনি তাঁকে সদা উপলব্ধি করতেন। মুখে সে কথা ব্যক্ত না করলেও যারাই তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ্য করত, তারাই এটি দৃঢ়ভাবে বোধ করত। এমনকি অনেকে, যারা প্রথম প্রথম তাঁর কাছে তেমন ভক্তিভাব নিয়ে আসেনি, তারাও তাঁর কার্যকলাপ দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়েছেন এবং আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্বন্ধে নিজেদের ধারণা নতুন করে গঠন করতে বাধ্য হয়েছেন।

যদিও তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, তবুও ধর্ম সাধনের অতি সাধারণ লৌকিক অনুষ্ঠানগুলিতেও তাঁর অপরিসীম নিষ্ঠা দেখা যেত। এই নিষ্ঠাব্রত তিনি আজীবন পালন করেছিলেন। প্রাতঃকালীন শ্রীগীতা পাঠ ও শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম আবৃত্তি না করে তিনি জলগ্রহণ করতেন না। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের পুজো সমাপন ও তাঁর ভোগ নিবেদন না করে এবং ঐ নিবেদিত মহাপ্রসাদ ছাড়া তিনি কখনও অন্নগ্রহণ করতেন না; সেটি আশ্রমে বাস করবার কালেই হোক, অথবা রেল, জাহাজে যাতায়াত করবার সময়েই হোক। মাদ্রাজ মঠে স্বচক্ষে দেখেছি, তিনি যখন পুজোয় বসতেন অথবা পুজোর আনুষঙ্গিক অন্য কোন কাজ করতেন তখন তাঁর আকৃতিই পরিবর্তিত হয়ে যেতো। তখন তাঁর শান্তোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন করে ঘোর অবিশ্বাসীও ভক্তিভাবে অবনত হতো। প্রকৃত পক্ষে দু-একটি ঘটনা এমন হয়েছে যে তাঁকে আবেগ ভরে পুজো ও আরতি করতে দেখে নিতান্ত নাস্তিক ভাবাপন্ন দর্শকের মনেও ধর্মসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

ভুলবশত 'ভক্ত' বলতে অনেকে যেরকম অনুমান করেন—একটু নির্বোধ গোছের, ভাবপ্রাণ, ভাব বিলাসী, চিন্তাশক্তিবিহীন ব্যক্তি—তিনি মোটেই সেরূপ ছিলেন না। তাঁর মধ্যে ভক্তির সাথে অসাধারণ ধীশক্তির সমাবেশ। তাঁর বুদ্ধি ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল, তাঁর বিদ্যা ছিল অগাধ, অতল স্পর্শী। এরূপ ধীমান, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান সন্ন্যাসী বিরল দেখা যায়। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করে অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি নির্বাক হয়েছেন, তাঁর অকাট্য যুক্তি ও প্রত্যক্ষানুভূতি প্রসূত বাক্যাবলীর প্রতিবাদ তাঁরা খুঁজে পান নি। খ্রিস্টীয় ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য দর্শন করে অনেক খ্রিস্টান ধর্মযাজককেও বিস্ময়ান্বিত

হতে হয়েছে। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে কোন কোন মুসলমান তাঁকে 'পয়গম্বর' অর্থাৎ আচার্য বা ঐশ্বরিক বার্তা প্রচারক বিবেচনায় হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করতেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় একটি ভাষ্য লিখবেন, যার মধ্যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মতগুলির সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হবে। কিন্তু অকালে শরীর ত্যাগ হওয়ায় তাঁর উক্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। নয়তো সংস্কৃত শাস্ত্রের পাঠক পাঠিকাগণ একটি মূল্যবান গ্রন্থপাঠের সুযোগ পেতেন, সন্দেহ নেই।

তাঁর যেরকম গুরুভক্তি, সেরূপই ছিল গুরুভাইদের প্রতি প্রীতি ও আজ্ঞাবহতা, স্বামী বিবেকানন্দের সামান্য আদেশও তাঁর নিকট বেদবাক্য সম ছিল। স্বামীজীর ইচ্ছায় তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদান্ত প্রচার করতে যান এবং সে কাজ করতে করতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তিনি শরীরপাত করেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ আসন প্রদান করেছিলেন, শশী মহারাজের সাতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁকে শশী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ বলেই গণ্য করতেন। তাঁকে যখন শশী মহারাজ ভক্তি বিহ্বল হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতেন, তখন মনে করা দুঃসাধ্য হতো যে, এঁরা দুজনেই গুরুভাই।

শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরানিকে দর্শন করলে শশী মহারাজ ভাবে আত্মহারা হয়ে যেতেন। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরানি যখন দক্ষিণ দেশে তীর্থ পর্যটনে যান, তখন তাঁকে পেয়ে শশী মহারাজের কি আনন্দ ও উৎফুল্ল ভাবই না দেখেছি। শ্রীশ্রীমার যাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট বা অসুবিধে না হয় সেজন্য শশী মহারাজ নিজের দেহমনের সমগ্র শক্তি একীভূত করে সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। যতদিন শ্রীশ্রীমা দক্ষিণ দেশে ছিলেন, ততদিন শশী মহারাজ আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে তাঁর অনুসরণ ও পরিচর্যা করেছিলেন। তাঁর সেবার যে এরূপ সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন, এজন্য শশী মহারাজ নিজেকে মহাসৌভাগ্যবান মনে করতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শ্রীশ্রীমার দক্ষিণদেশ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দেশবাসীর বহুলোকের কল্যাণ সাধন হবে। মাতা ঠাকুরানির এই তীর্থ ভ্রমণের সময় শশী মহারাজ এত পরিশ্রম করেছিলেন যে তাতে তাঁর স্বাস্থ্য চিরদিনের মতো ভেঙে যায়, তিনি আর সুস্থ হতে পারেন নি।

পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জীবনের ঘটনাবলী এবং তাঁর পূত আদর্শ চরিত্রের

কথা এখন আমাদের স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে বইতে থাকে বিমল বিশুদ্ধ আনন্দের ধারা। সেই স্মৃতি আমাদের মনে জাগরিত করে দেয় আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাঁর পূত চরিত্রের যত অধিক আলোচনা হয় ততই আমাদের মঙ্গল।

(স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত "স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ" পুস্তকের ভূমিকা সাধু হতে চলিতভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে)

দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে আমার দিনগুলি কখনও বিস্মৃত হবার নয়। কালের এই দীর্ঘ অবসানেও সেগুলি আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। আমার সন্ন্যাস জীবনের শুরুতে এমন একজন মহাপুরুষের সঙ্গ লাভে আমি ধন্য হয়েছি।

আমি যখন খুবই তরুণ তখন আমি বেলুড় মঠ থেকে মাদ্রাজ মঠে তাঁর অধীনে সেবা করবার জন্য প্রেরিত হই। মাদ্রাজে গিয়ে তাঁর পূজা-সমাপন প্রণালী দেখে আমি সর্বপ্রথমে মুগ্ধ হলাম। শ্রীভগবানের পাদপদ্মে একান্ত আত্মনিবেদন ও সম্পূর্ণ শরণাগতি ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর জীবন সর্বস্ব। এরূপ প্রণম্য ব্যক্তি কর্তৃক চালিত হওয়াই উচ্চতম আধ্যাত্মিক সাধনা। তাঁর সঙ্গে বাস করা এবং তাঁর বিশুদ্ধ উদাহরণ অনুসারে জীবন গঠন ও উন্নয়ন করা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ সুযোগ।

আমি তাঁর জীবনে সেবা ও সাধনার জগৎ দেখেছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, "হে অর্জুন, যা কিছু কর তা আমাতে অর্পণ কর।" এই উপদেশ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল। একবার বক্তৃতা প্রদান শেষে মাদ্রাজ মঠে ফিরে স্বামী বিবেকানন্দের তৈলচিত্রের সামনে তাঁকে প্রার্থনারত দেখেছিলাম। প্রতিমূর্তির সামনে প্রণত হয়ে তিনি এই আকুল প্রার্থনা করেছিলেন, "হে প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা, তুমিই প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্যতম প্রতিনিধি, আর তুমিই আমাকে এখানে তাঁর বাণী প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছ। আমি শুধু তোমার আদেশ পালন করছি। ভাই, তোমার কাছে এই নিবেদন, যেন কোন গর্ব বা আত্মাভিমান আমার অন্তরে প্রবেশ না করে, নাম যশের

বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষাও যেন আমার মনে না ওঠে। যে গুরুভার বা দায়িত্ব তুমি আমার উপর ন্যস্ত করেছ, তা তোমারই। আশীর্বাদ. কর, যাতে আমি ঠাকুরের হাতের যন্ত্র হয়ে তাঁর কাজ করে যেতে পারি। আর আমার সমস্ত কাজের ফল তাঁকে সমর্পণ করতে সমর্থ হই। আমাকে সর্বক্ষণ সৎপথে চালিত কর। ভগবানে শরণাগতি ও ঈশ্বরকর্মের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার কি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি রামকৃষ্ণানন্দজীর ভক্তিবিশ্বাস এত প্রগাঢ় ছিল যে, প্রভুর পুজো করবার সময় তাঁর অন্যদিকে আদৌ হুঁশ থাকতো না। যে ছবির সামনে তিনি নিত্য পুজো করতেন তাতে ঠাকুরের জীবন্ত উপস্থিতি কী গভীর ভাবেই না তিনি অনুভব করতেন। নিজ সত্তা তাঁর কাছে যেমন স্বতঃসিদ্ধ সত্য ছিল, ঠাকুরের ছবিও তাঁর কাছে তেমনি জাগ্রত ও জীবন্ত ছিল। মাদ্রাজের গ্রীষ্মকাল বাঙ্গালির পক্ষে অসহ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

জুন মাসের এক দুপুরে আহার শেষে বিশ্রামের সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী গ্রীষ্মের তীব্র তেজে অতিষ্ঠ হয়ে ছটফট করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হলো, এই অসহ্য গ্রীষ্মে ঠাকুরের নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। তিনি তখন নিজের কষ্ট ভুলে ঠাকুরঘরে নীরবে প্রবেশ করলেন এবং ঠাকুরের প্রতিকৃতির ওপর হাত পাখা দিয়ে ব্যজন করতে লাগলেন। তিনি সুমিষ্ট স্বরে 'হে প্রাণবল্লভ প্রভু আমার, হে প্রাণবল্লভ প্রভু আমার' ইত্যাদি বলতে বলতে প্রায় দু ঘণ্টা ঠাকুরকে ব্যজন করলেন। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে একথাগুলো উচ্চারণ করতে করতে তিনি যখন ব্যজন করছিলেন তখন পারিপার্শ্বিক কোন কিছুতেই তাঁর দৃষ্টি ছিল না, গ্রীষ্মের তীব্রতাও তিনি ভুলে গেছিলেন, একমাত্র ঠাকুরের জীবন্ত প্রকাশই তাঁর কাছে সত্য ও অনুভবযোগ্য ছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। গুরু ও ইষ্ট যে আলাদা নয় তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

মাদ্রাজ মঠের ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর প্রতিকৃতি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিদিনই তিনি একনিষ্ঠ অনুরাগের সাথে খুব নিয়মিতভাবে সেই ঠাকুরঘরে পূজা করতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মাদ্রাজ গমনের অনেক আগে থেকেই এরকম পুজো চলছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ১৯০৮ সালে যখন মাদ্রাজে পদার্পণ করলেন তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর একান্ত বাসনা হলো স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দিয়ে অন্তত একবার ঠাকুরপুজো করান। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তা হলে ঠাকুর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল হবে এবং 'বহুজন সুখায় বহুজন

হিতায়' ঠাকুর ঘরে প্রতিষ্ঠিত দেবতার আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে সে অনুরোধ করবার সুযোগ পাচ্ছিলেন না, একদিন যখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্নান সেরে ঠাকুর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি করজোড়ে তাঁর সামনে এসে তাঁকে ঠাকুরঘরে গিয়ে পুজো করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বললেন, "আনুষ্ঠানিক পুজোয় আমি অভ্যস্ত নই।" কিন্তু তাঁর সব আপত্তিই নিষ্ফল হলো, তাঁর প্রিয় গুরুভাইয়ের সপ্রেম অনুরোধ রক্ষা করতে হলো। তিনি ঠাকুরঘরে ঢোকবার পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঠাকুর ঘরের মধ্যে কি ঘটল তা বাইরের জগতের কাছে চিরকাল অজ্ঞাত থেকে গেল।

যিশুখ্রিস্ট যথার্থই বলেছেন—"যিনি পুত্রকে দেখেছেন তিনি পিতাকেই দেখেছেন"। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে ঠাকুরের মানসপুত্র জ্ঞানে ভক্তি করতেন। সে জন্য তিনি উভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ দেখতেন না। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ১৯০৮-০৯ সনে যখন মাদ্রাজ মঠে অবস্থান করছিলেন তখন রামকৃষ্ণানন্দজী প্রতিটি সন্ধ্যায় আরতির পর তাঁর প্রিয় গুরুভাইকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন। তিনি স্বয়ং স্বাগ্রহে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সেবার কাজ করতেন ও আমাদেরকে অবিচলিত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর সেবা করতে প্রায়ই উৎসাহ দিতেন। তিনি আমাদের বলতেন—একমাত্র তাঁর সেবা করলেই ঠাকুরের প্রকৃত সেবা হবে এবং তোমরা অন্য কোন তপস্যাদি ছাড়া পরম ও চরম পুরুষকার লাভ করতে পারবে। ঠাকুরের সব মহিমা তাঁর মধ্যে প্রকাশিত এবং ঠাকুর তাঁর মধ্য দিয়েই আমাদের সঙ্ঘের কল্যাণ বিধানে নিরত আছেন। একদিন কোন ভক্ত ঠাকুরকে ভোগ দেবার জন্য কতগুলো ভালো ভালো ফল মঠে আনলেন। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী সেগুলো স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কাছে নিবেদন করে ভক্তটিকে বললেন, ঠাকুর আপনার উপহার স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মধ্য দিয়েই গ্রহণ করেছেন। আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী যখন মাদ্রাজে ছিলেন তখন স্বামী বিবেকানন্দের 'দেববাণী'র ইংরেজি সংস্করণ স্থানীয় মঠ থেকে প্রকাশিত হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ঐ বইটির প্রচারে আগ্রহান্বিত হয়ে তার বিক্রি বাড়াবার জন্য কয়েকটি পরামর্শ দেন। সমালোচনার্থে বইটি বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাবার ভার আমার উপর পড়ল। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বললেন, "মাদ্রাজের (শ্রেষ্ঠ ইংরেজি দৈনিক) 'হিন্দু' পত্রিকায় একটি বই আগে পাঠাও। ওটাতে সমালোচনা প্রকাশিত হলে 'বোম্বে ক্রনিক্ল' নামে বিখ্যাত দৈনিকে 'হিন্দুর' সমালোচনা সহ আর একখানি বই পাঠাও।" এ বিষয়ে উভয় গুরুভাই-

এর মধ্যে মতভেদ হলো। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী বললেন "উভয় দৈনিকে বইটি একই সময়ে সমালোচনার্থে পাঠানই যুক্তিসঙ্গত।" যখন এ বিষয়ে আলোচনা চলছিল তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী হঠাৎ নিজেই নিজের প্রস্তাব তুলে নিলেন ও বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি তো এই মঠের মোহন্ত এবং পণ্ডিত লোক। এটা তোমারই কাজ। এতে আমার হস্তক্ষেপ করা উচিত হয়নি।" এই বলে তিনি এ বিষয়টি ও মঠের অন্যান্য বিষয়েও একেবারে উদাসীন থেকে গেলেন। সেদিনই তিনি একটি কার্ড নিয়ে মাদ্রাজ ছাড়বার দিন স্থির করে পুরীর একজন ভক্তকে চিঠি দিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী কোনরকমে দু একদিন নীরব থাকলেন। প্রিয় গুরুভাই-এর এই ঔদাসীন্য তাঁর বুকে শেল বিঁধলো। একদিন সকালে তিনি ব্রহ্মানন্দজীর কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে বললেন, "মহারাজ, তোমার কৃপা থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি। আমি কিছুই নই। তোমার পায়ের ধুলো থেকে আমার মতো শত শত শশী তৈরি হতে পারে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, ভাই।" তৎক্ষণাৎ দুজনের প্রগাঢ় ভালোবাসা আবার প্রকাশিত হলো। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর গুরুভ্রাতৃভক্তি অতুলনীয়।

এই মহামনা সন্ন্যাসী দুজনের পূত সঙ্গ লাভ করে আমি শিক্ষা পেয়েছিলাম যে, মঠে থাকবার সময় সন্ন্যাসীর কাছেও অর্থ বিষয়ে খাঁটি ব্যবসায় পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। আমি তখন মঠের কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। আর যে লোহার সিন্দুকে টাকা থাকত, তা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ঘরে ছিল। আমাকে প্রায়ই সিন্দুক থেকে টাকা নিতে হতো এবং তিনি আমাকে প্রায়ই এরকম করতে দেখে একদিন বলেছিলেন, "তোমাকে প্রায়ই টাকা নিতে দেখি। তুমি যথাযথ হিসেব রাখ তো? টাকা যখন আগাম নেবে তার রসিদ রাখবে।" আমি এসব বিষয়ে একরকম অনভিজ্ঞই ছিলাম। এবং বললাম, "না মহারাজ, আমি রামকৃষ্ণানন্দজীকে তাঁর নির্দেশে টাকা যখন তখন আগাম দিই, আর সে টাকার কোন রসিদ রাখি না।" স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বললেন, "তা হবে না, যে টাকা-অগ্রিম দাও তার রসিদ রেখো।" মহারাজ যা বললেন তা আমি রামকৃষ্ণানন্দজীকে গিয়ে বললাম। তিনি এতে সাথে সাথে সম্মত হলেন। তখন থেকে আমি তাঁকে যে টাকা দিতাম তার রসিদ রাখতাম। আমার যখন ব্যাঙ্গালোর যাবার সময় হলো আমি তাঁকে বললাম, "মহারাজ, সিন্দুকের চাবিগুলো আপনি রাখুন। আমি যতদিন কোষাধ্যক্ষ ছিলাম ততদিনের মধ্যে আপনি আমার কাছ থেকে মোট ছশো টাকা নিয়েছেন।" শশী মহারাজ বললেন, "এত টাকা কি আমি নিয়েছি? না, না, খুব বেশি হলে আমি দু-তিনশো টাকা নিয়েছি। সে যাই হোক, যা টাকা আছে তা ব্রহ্মচারী রুদ্রচৈতন্যকে

বুঝিয়ে দাও।" আমি বললাম, "আগাম প্রদত্ত সব টাকার রসিদ আমার কাছে আছে।" তিনি বললেন, "তা ভালো, সেগুলো আমাকে দেখাও।" আমি রক্ষিত রসিদগুলোর সাহায্যে হিসাব মিলিয়ে দিলাম। এতে আমরা উভয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

মাদ্রাজে অবস্থানকালে (১৮৯৭-১৯১১) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী শ্রীগুরুর বাণী প্রচারের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। ঠাকুরের নিত্যপুজো ছাড়া তিনি মঠে ও শহরের অনেক জায়গায় সাপ্তাহিক ধর্মব্যাখ্যায় যেতেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির নানা সংঘ ও সমিতির আহ্বানে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিতে যেতে হতো। এই সব বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য বিষয়গুলো অত্যন্ত সরলভাবে ও যত্নের সাথে তিনি বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু শ্রোতৃ সাধারণের ওপর তাঁর বক্তৃতার ফলাফলের কথা তিনি আদৌ ভাবতেন না। শ্রোতার সংখ্যা অল্প হলেও তিনি তা গ্রাহ্য করতেন না। ট্রিপ্লিকেনে তাঁর একটি ক্লাসে যাবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। সেই ক্লাসে খুব কম শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন কেরানি। সারাদিন অফিসে কাজ করে তাঁরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে তাঁর ক্লাসে এসেছিলেন। শশী মহারাজ যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করছিলেন তখন তাঁদের কয়েকজন ঝিমোতে লাগলেন। মঠে ফিরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর ক্লাসে যাঁরা ঘুমোচ্ছিলেন তাঁদের তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কি-না। তিনি তার উত্তরে বললেন, "শ্রোতারা মনোযোগের সাথে আমার ব্যাখ্যা শোনে কিনা তা আমি লক্ষ্য করি না। আমি নিজেই নিজের ছাত্র ও নিজের ব্যাখ্যা নিজেই শুনি। এতে আমি উদ্দীপনা পাই ও আমার চিত্ত উন্নত হয়। এটাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।"

তাঁর জীবনের শেষভাগে তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে তাঁর দুটি মহৎ বাসনা ছিল। তার ভেতরে একটি ছিল সঙ্ঘের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে মাদ্রাজে নিয়ে যাওয়া সেখান থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত তাঁর তীর্থভ্রমণের বন্দোবস্ত করা, যাতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির লোক তাঁর পুণ্য দর্শন ও সঙ্গলাভে ধন্য হয়। তাঁর দ্বিতীয় বাসনা ছিল সঙ্ঘ জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে মাদ্রাজ এবং রামেশ্বরাদি স্থানে নিয়ে যাওয়া। ঠাকুরের কৃপায় তাঁর দুটি বাসনাই পূর্ণ হয়েছিল।

শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে তিনি জগজ্জননীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি জ্ঞানে ভক্তি করতেন। শ্রীশ্রীমায়ের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় সব ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা যখন ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে অবস্থান করছিলেন তখন স্বামী

রামকৃষ্ণানন্দজী আশ্রম ঘরের বাইরে একটি তাঁবুতে থাকতেন এবং নিজে তাঁর সেবাকাজ করতেন। প্রতিদিন সকালে তিনি বাগান থেকে সুগন্ধি ফুল তুলে এনে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিতেন। মায়ের চরণে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম সহ কাতরভাবে কৃপাভিক্ষা করতে তাঁকে কতবারই না দেখা গেছে। এক সন্ধ্যেয় শ্রীশ্রীসারদাদেবী আশ্রমের পিছনে একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপরে কয়েকজন নতুন সন্ন্যাসীর সাথে গিয়ে সূর্যাস্ত দর্শন করেছিলেন। আকাশে নানা রঙের বিচিত্র লীলা দেখতে দেখতে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। অবিলম্বে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের সামনে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন। মায়ের পায়ে ভক্তিভরে প্রণাম সহ সজল চোখে তিনি প্রার্থনা করলেন—"হে জননি, হে গিরিকুমারি, তুমি সত্যি সত্যিই হিমালয়সুতা। তুমি জগদম্বা উমা। তুমিই শক্তিরূপে সর্বভূতে বিরাজিতা এবং তুমি প্রসন্না হলে মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত হয়। মা, আমাকে আশীর্বাদ কর, যারা তোমার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদের সকলকে কৃপা কর যাতে তারা সকলে সংসার থেকে মুক্ত হয়।" শ্রীশ্রীমা চোখ খুলে স্নেহভরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর মাথায় নিজের হাত রেখে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। এতে শশী মহারাজ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

১৯১১ সনের প্রথম দিকে শ্রীশ্রীমা মাদ্রাজ ছেড়ে কলকাতা অভিমুখে রওনা হন। তখন রামকৃষ্ণানন্দজী ভাঙা স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কল্পে ব্যাঙ্গালোরে যান। তিনি তখনও বুঝে উঠতে পারেন নি যে, তিনি ইতোমধ্যেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছেন। শ্রীশ্রীমায়ের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে শশী মহারাজ ছিলেন তাঁর পদসেবক। প্রতিদিন তাঁর জ্বর ও কাশি হওয়া সত্ত্বেও তিনি মায়ের পূত সান্নিধ্যে রামেশ্বর ও অন্যান্য জায়গায় গিয়েছিলেন। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণে তিনি নিজের ভগ্ন দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। পাছে শ্রীশ্রীমার কোন অসুবিধে হয় বা তাঁর নিরন্তর সেবায় বাধাপ্রাপ্ত হন সেজন্য কোন চিকিৎসককে দিয়ে নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান নি। শ্রীশ্রীমায়ের কলকাতা ফিরে যাবার পর শশী মহারাজ ব্যাঙ্গালোর গেলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করান হয়, তখন জানা যায় যে তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি অনেক দূর এগিয়েছে। ডাক্তার খোলাখুলিভাবে আমাদের বললেন যে, এ রোগ আর সারবে না। তিনি শশী মহারাজকে শীঘ্রই কলকাতায় পাঠাতে পরামর্শ দিলেন, যাতে তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো গুরুভাইদের সাথে আনন্দে ও শান্তিতে কাটাতে পারেন। এবার ব্যাঙ্গালোরে থাকার সময় তিনি প্রায়ই আমাদেরকে ঠাকুর ও তাঁর অসীম করুণার কথা

ভাবাবিষ্ট হয়ে বলতেন। একদিন তিনি ভাবাবেগে ঠাকুরের অপার করুণার মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যাবার সুদীর্ঘ কালের বাসনা দেহ রাখার আগে ঠাকুরের কৃপায় পূর্ণ হওয়াতে তিনি পরম প্রীত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, এখন তাঁর আর কোন বাসনা নেই। এখন তিনি শান্তিতে দেহত্যাগে প্রস্তুত আছেন।

উপসংহারে আমি বলতে পারি যে, মহাবীর হনুমান যেমন ভগবান রামচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্ত ও সেবক ছিলেন, তেমনি রামকৃষ্ণানন্দজী ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত শিষ্য ও সন্তান। তাঁর দেব চরিত্রে দাস্য ভক্তি মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর পদানুসরণ করবার জন্য তিনি আমাদের প্রেরণা দিন।

[(মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকাতে প্রকাশিত ইংরেজি স্মৃতিকথার অনুবাদ। 'উদ্বোধন' আষাঢ় ১৩৫৫, পৃঃ ২৮৯-২৯২)। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ছিলেন (১৮৮২-১৯৬২) শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। স্বয়ং শ্রীশ্রীমা তাঁকে গেরুয়া বস্ত্র দিয়েছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট তাঁর আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস হয়। রাঁচির মোরাবাদী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা (১৯২৭)। সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর এই আশ্রমে তিনি সাধন-ভজন ও লোককল্যাণ কার্যে ব্রতী ছিলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অষ্টম প্রেসিডেন্ট মহারাজ। তিনি মাত্র কয়েকমাস ছিলেন ঐ পদে (৬/৩/১৯৬২—১৬/৬/১৯৬২)। তিনি ভগবৎপ্রসঙ্গ করতেন ভক্তদের কাছে। এগুলি 'সৎপ্রসঙ্গ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।]

শশী মহারাজের পরাভক্তি

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

স্বামীজী ভেবেছিলেন তিনি—"রামকৃষ্ণানন্দ" নামটি গ্রহণ করবেন। কিন্তু শশী মহারাজের জ্বলন্ত দাস্যভক্তি দেখে নিজের কাঙ্ক্ষিত ঐ প্রিয় নামটি তাঁকে দিয়ে দিলেন।

তাঁরই সনির্বন্ধ অনুরোধে শশী মহারাজ নিজের চিরপ্রিয় ঠাকুরসেবাটি ছেড়ে আলমবাজার মঠ থেকে মাদ্রাজ চলে যান, সেটি ১৮৯৭ সালের কথা।

শশী মহারাজের জীবন—আদর্শ। মাদ্রাজে তিনি নিজে ঠাকুর তুলতেন। সকালে তরকারি কাটতে বসতেন, তখন ব্যাখ্যা করতেন—মনুসংহিতা, এই

পন। তারপর স্নান সেরেই পূজায় বসতেন। বিকালের ক্লাস বা লেকচার থেকে ফিরে এসে যথাসময়ে সন্ধ্যারতি করতেন।

বাইরের ক্লাসে সাত-আটজন লোক, অফিসের কাজের পর এসে কেউ ঝিমোয়, কেউ ঘুমোয়। তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই, তিনি সেবাবোধে ক্লাস করে যাচ্ছেন। কেউ বললে তাকে বলতেন, "কে ঘুমোয় বা কি করে তাতে দরকার কি? আমি ঠাকুরকে শোনাই।"

স্বামীজীর একটি অনুরোধে মাদ্রাজে চলে যান। পূর্বে আসানসোলের এদিকে আসা হয় নি। এগারো বছর ঠাকুরের ভস্মাস্থির একনিষ্ঠ সেবায় লেগে ছিলেন। ইংরেজি অনেক ভুলে গিয়েছিলেন, মাদ্রাজে গিয়ে আবার শেখেন—কিডির (সিঙ্গারাভেলু মুদলিয়র) কাছে। ক্লাসে ভাষার ত্রুটি হলে কিডি বলতো, "স্বামীজী, আজ ঐটা ভুল হয়েছিল।"

তামিল 'কিডি' মানে পাখি। পাখির মতো স্বল্পাহারী, তাই স্বামীজী তার নাম দিয়েছিলেন 'কিডি'।

শশী মহারাজ স্বামীজীর ছবির সামনে হাতজোড় করে বলতেন, "দেখো, আমার যেন নামযশের আকাঙ্ক্ষা না হয়।"

মাদ্রাজ মঠে একদিন তেল মাখার সময় তাঁকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজকে) বললুম, "শশী মহারাজের কাছে আর থাকা যায় না; এত গালমন্দ করেন যে একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে। আমি আপনার সঙ্গে চলে যাবো, এখন থেকে আপনার কাছেই থাকবো।" মহারাজ ওই কথা শুনে খুব দুঃখিত হয়ে বললেন, "দেখ, ঠাকুরের ওপর ভালোবাসা নেই বলেই এ-ধরনের কথা তোমাদের মুখ থেকে বেরোয়। এমন মহাপুরুষের সঙ্গ ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছা কি করে তোমার মনে এলো? শশী মহারাজের গালমন্দটাই শুধু মনে রেখেছো, তাঁর এমন জীবন অন্তরের স্নেহপ্রীতি কিছুই দেখলে না।"

শশী মহারাজ আমাদের গালমন্দ করতেন বটে, আবার স্নেহও করতেন খুব। তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের সাধুজীবন যাতে নিখুঁতভাবে গড়ে ওঠে তিনি তাই চাইতেন; সেইজন্যই গালমন্দ করতেন। আবার খেতে বসে ভালো জিনিসটি যেই মুখে ঠেকেছে অমনি আমাদের পাতে তুলে দিয়ে বলছেন, "দেখ, কেমন উপাদেয়!" ভালো জিনিস পেলে আমাদের না খাইয়ে তাঁর তৃপ্তি হতো না।

শশী মহারাজ তাঁকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজকে) দেখতেন, 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' এইভাবে। ঠাকুরপূজার জন্য আনা ফলমিষ্টি নির্বিকারে মহারাজের সেবায় দিয়ে দিতেন। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেন, মহারাজও কোনরকম আপত্তি না করে তাঁর প্রণতি গ্রহণ করতেন। তাঁর প্রতি শশী মহারাজের কি সুগভীর শ্রদ্ধা! একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত থেকে কতকটা অনুমান করতে পারবে ঃ

মাদ্রাজ মঠের রান্নাঘরে বসে তামাক খাচ্ছি। ওদেশে সাধুদের তামাক-খাওয়া নিন্দনীয়। সে যাই হোক, সেদিন কোনও বিশেষ প্রয়োজনে শশী মহারাজ হঠাৎ রান্নাঘরে এসে পড়েন। আমার হাতে হুঁকো দেখে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে বললেন, "তুমি যে আবার তামাক খাও তা তো জানা ছিল না।" তিনি নিজে তামাক খেতেন না, কর্মীদের তামাক-খাওয়া পছন্দ করতেন না। তৎক্ষণাৎ আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মহারাজের কাছে নালিশ করলেন। মহারাজ শুনে বললেন, "শশীভাই, তাতে আর এমন কি হয়েছে! আমি তো অনেক কমবয়সেই আরম্ভ করেছিলাম। তামাক একটু খেলেই বা।" বিচার শুনে শশী মহারাজ আর একটা কথাও বললেন না। কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হলেন তাও নয়। মহারাজ অনুমতি করছেন ব্যস্, আর কিছু বলার নেই। এমনই তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি।

মাদ্রাজ মঠে মহারাজ রোজ ভোর চারটায় আমায় জাগিয়ে দিতেন—সময়মতো জপধ্যান করবার জন্য সাধনভজনে খুব উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন। এমনি করে অযাচিত স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে বেঁধেছিলেন।

তাঁর মুখখানি খুব উজ্জ্বল দেখাতো, আর সর্বদা অন্তর্মুখ।

শশী মহারাজ তাঁকে ঠাকুরের মতোই দেখতেন; দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে যেমন দুখানি খাট পাশাপাশি ছিল মায়লাপুরে মহারাজের জন্য ঠিক সেইরকম ব্যবস্থা রেখেছিলেন।

আর দু-একটা কথা বলে আজকের মতন থামি।

শশী মহারাজ শহরের এখানে-সেখানে ক্লাস নিতেন, বক্তৃতা করতেন। মঠে ফিরে স্বামীজীর ছবির নিচে দাঁড়িয়ে বলতেন, "তুমিই আমাকে এখানে এনেছো—দেখো ভাই, নামযশের মোহে যেন না ডুবি; যদি ডুবি তুমিই দায়ী হবে মনে থাকে যেন! প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা যেন এতটুকু না আসে।"

মহারাজের তাসখেলা ঃ মাদ্রাজ মঠে মহারাজ আমাদের নিয়ে একদিন তাস

খেলাতে বসলেন। একপক্ষ তিনি ও নীরদ মহারাজ, প্রতিপক্ষ শশী মহারাজ আর আমি। আমি প্রথম থেকেই খুব সিরিয়াস—মহারাজকে হারানো চাই। খেলা বেশ চলছে। দেখছি শশী মহারাজের ভুলের জন্য মহারাজ বারবার জিতে যাচ্ছেন। আমাকে বিপন্ন দেখে তিনি উৎফুল্ল হচ্ছেন দেখে আমার আরো রোখ চাপলো—শশী মহারাজকে ক-বারই বললুম, "মহারাজ, আপনি একটু সাবধানে খেলুন, যাতে অন্তত একদানও আমরা জিততে পারি।" বৃথাই মিনতি—সব ভালো ভালো তাসগুলো শশী মহারাজের জন্য নষ্ট হলো, আমাদের ভয়ানক হার হয়ে গেল। মহারাজের খুব স্ফূর্তি—বিশেষত আমার ব্যর্থ প্রয়াস দেখে। আমিও ভয়ানক রেগেমেগে বললুম, "একলা আমি কি করবো, মহারাজ! শশী মহারাজের কোন সাহায্যই পেলুম না।"

খেলা সাঙ্গ হলে শশী মহারাজ আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে খুব তিরস্কার করলেন, "আহাম্মক, তুমি যে রীতিমতো পেশাদার খেলোয়াড় হয়ে উঠছো দেখছি! ভেবেছ বুঝি আমি মহারাজের সঙ্গে নিছক তাস খেলতে বসেছিলাম? একবারও চেয়ে দেখ নি আমাদের হারিয়ে তাঁর কত আনন্দ! দেবশিশুর মতো সুন্দর ও পবিত্র সে-হাসি বারবার দেখেও আমার সাধ মিটছিল না। আহাম্মক, ভালো ভালো তাস আমি তো জেনেশুনে ছেড়ে দিচ্ছিলাম। তাঁকে আনন্দে রাখাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। ইনি কী সাধারণ! আমাদের কল্যাণের জন্যই এঁর শরীরধারণ। তুমি কি করে বুঝবে এঁর কত কৃপাকণা!" আমি তো হতভম্ব। মহাপুরুষদের তাসখেলার মধ্যে এত গভীর তাৎপর্য থাকতে পারে কখনও তা কল্পনা করিনি। বাবা, শশী মহারাজের কী গভীর প্রেমভক্তি! তাঁদের অন্তরে রাগদ্বেষের স্থান ছিল না, এ-স্বীকৃতি স্বয়ং মহারাজের।

মাদ্রাজ মঠে শশী মহারাজের বকুনি রোজ অন্তত একবার হবেই। তাঁর কাছে থাকতে গেলে কাজকর্ম একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই। খুব সাবধানে সব করতে হবে। ঠাকুরসেবায় এতটুকু অনিয়ম বা ত্রুটি সহ্য করতেন না। কিন্তু যতই সাবধান হই না কেন ত্রুটি একটু-আধটু হতোই, তাই বকুনির হাত থেকে রেহাই ছিল না।

ব্যাঙ্গালোরে আছি। প্রয়াণের দু-মাস আগে শশী মহারাজ ব্যাঙ্গালোর এলেন হাওয়া বদলের জন্য। তখন দুরন্ত ক্ষয়রোগে শরীর একবারে ভেঙ্গে গেছে। বেশ কিছুদিন থেকে স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল, শ্রীশ্রীমার দক্ষিণদেশ—আগমনের পূর্বেই তাঁর শরীরে ব্যাধি প্রবেশ করে, তখন চিকিৎসা নিতে রাজি হন নি।

ব্যাঙ্গালোরে তাঁর মাছ খাবার ইচ্ছা হয়, লুকিয়ে রান্না করে পথ্য দেওয়া হতো। একদিন রান্নাঘরে মাছ কুটছি, একটি দক্ষিণী ভক্ত দেখতে পায়; শশী মহারাজের পথ্য তৈরি হবে শুনে অনুমোদন করে। যেন প্রকাশ না হয় সেজন্য তাকে বলি। আমার অনুরোধ সে রেখেছিল।

উঠোনে তক্তপোশে বসে শশী মহারাজ একদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "দুটি সাধ ছিল মনে ঃ একবার মাকে আবাহন করে এনে এদেশের ভক্তদের তাঁর শ্রীচরণে সঁপে দেওয়া; আর মহারাজকে একবার নিয়ে আসা, দক্ষিণী ভক্তদের কল্যাণের জন্য। তাঁরা কৃপা করে আমার দুটি সাধই পূর্ণ করেছেন। এখন এ-শরীর থাকলো আর গেল!"

মাদুরাতীর্থে শ্রীশ্রীমহারাজ ঃ রামেশ্বরধাম থেকে মাদ্রাজ ফেরার পথে মহারাজ মাদুরায় নেমে নির্ধারিত স্থানে উঠলেন। শশী মহারাজ পূর্ব হতেই সব ব্যবস্থা করিয়ে রেখেছিলেন। এখানে মীনাক্ষীদেবীর মন্দির। মহারাজ কিন্তু ধুলোপায়ে দেবীদর্শনে গেলেন না।

স্নান করবেন, তেল মাখছেন, কাছে আর কেউ নেই; মুখভাব গম্ভীর, হঠাৎ বলছেন, "দ্যাখ্, পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম এখানে প্রতি অণু-পরমাণুতে দেবীর শক্তি বিরাজ করছে।" তখনও শ্রীমন্দিরে যাওয়া হয়নি।

পরদিন আমরা তাঁর সাথে দেবীদর্শনে গেলুম, ক-জন মাদ্রাজি ভক্তও সঙ্গে আছেন। তিনি যখনই দেবদর্শনে যান দক্ষিণ পাণি বুকের উপর রেখে করজপ করতে থাকেন। কাপড়-ঢেকে করজপের রীতিই সাধারণত দেখা যায়। মহারাজ তেমন করেন না, কোনরকম আচ্ছাদন ব্যবহার করেন না। তিনি কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা তিন আঙুলে করজপ করেন।—আজ দেবীদর্শনে যাবার সময় তার ব্যতিক্রম হলো না। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর ভাবাবেশ হলো ঃ 'মা' 'মা' বলতে বলতে ধীরে ধীরে দেবীর পানে এগিয়ে চলেছেন, বারো-চৌদ্দহাত তফাৎ থাকতে হঠাৎ থেমে গেলেন; মুহুর্মুহু অশ্রুকম্পপুলক দেখা দিল, সে-দৃশ্য আজও চোখের সামনে ভাসছে। তাঁর ভাবগতিক দেখে আগেই মনে হয়েছিল—মাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছেন, মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য কাতর হয়ে পড়েছেন, আর দেরি সয় না। এখন দাঁড়িয়ে পড়বার পর মনে হলো সেই তীব্র ব্যাকুলতা যেন বাঁধ মানছে না, দেহখানি মার দিকে ঝুঁকে রইলো। শশী মহারাজ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলেন, আমরাও তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালুম। মার্বেল-পাথরের মেজে, পড়ে গেলে রক্ষা নেই। কতক্ষণ পরে

অশ্রুকম্পাদি ও ঝুঁকে-থাকার উপশম হলো—এখন সম্পূর্ণ স্থির, বাহ্যশূন্য, সমাধিস্থ। আহা কি মুখশ্রী! আনন্দ আর ধরে না, উপছে পড়ছে। ঐ দিব্যভাব প্রায় আধঘণ্টা থাকলো, আমরা দর্শন করে জীবন সার্থক করলুম। ক্রমে অনেকটা সহজ অবস্থায় নেমে এসে খুব মৃদুস্বরে বললেন, "শশীভাই, একখানি গাড়ি ডাকবে না?"

বাসস্থানে ফিরেও ভাবের ঘোর কাটে না; বেলা একটায় খোঁজ নিচ্ছেন আমরা খেয়েছি কিনা; নিজের স্নানাহার হয়নি হুঁশ নেই। শশী মহারাজ বললেন, "রাজা, তোমারও তো খাওয়া হয়নি।" তখন আমায় বলছেন, "তেল মাখিয়ে দে।" স্নানাহারের পরেও ভাবের উপশম হয়নি, সন্ধ্যার দিকে সহজ হন। তখন শশী মহারাজ বললেন, "আজ তোমার খুব একটা দিন, কি বলো রাজা? খুব দর্শন করলে।" তিনি মৃদুস্বরে বললেন, "মা-র কৃপা! আহা, মার কোলে কী আনন্দে ছিলাম কি বলবো ভাই!" শশী মহারাজ আর স্থির থাকতে পারলেন না, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, "রাজা, তোমার পায়ের ধুলো দাও, দেহমন পবিত্র করি।" মহারাজ বলছেন, "কি করো, কি করো ভাই।" ততক্ষণে শশী মহারাজ বলছেন, "পড় না বেটারা মহারাজের পায়ে লুটিয়ে।" আমরা তাঁর পায়ে লুটিয়ে ধন্য হলুম।

শশী মহারাজ অসুখ নিয়ে ব্যাঙ্গালোর এলেন হাওয়া-বদলের জন্য। তখন বাড়াবাড়ি হয়েছে। আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। ডাক্তার থুতু পরীক্ষা করে আমাকে দেখালেন—রোগের জীবাণু রয়েছে; বললেন, "এ কী করেছেন! ছ-টা মাস আগে এলেও হতো। এখন সাধ্যের বাইরে চলে গেছে।"

শশী মহারাজ আমাদের বললেন, "এখন শরীর থাকলো আর গেল!" চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় আনা হয়। রাজা মহারাজ তখন পুরীতে রয়েছেন। তিনি খুরদা রোড জংসনে এসে গাড়িতে দেখা করে বললেন, "শশীভাই, তুমি এমন করে শরীরপাত করলে? আমাদের একবার জানালে না।" শশী মহারাজ বলেছিলেন, "রাজা, মার যেন কোন কষ্ট না হয় সেদিকেই আমার লক্ষ্য ছিল।" কলকাতায় এসে উদ্বোধন-বাড়ির একখানি ঘরে মাসখানেক ছিলেন। সেখানে শরীর যায়।

('যোগক্ষেম' পুস্তক হতে সংকলিত,
পৃঃ ৫০, ৮৫-৮৬, ৩৭-৩৮, ৫২-৫৩, ৫৫-৫৭, ৬৭-৬৯, ৭২-৭৩, ৭৫-৭৬)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের পুণ্য সান্নিধ্যে

স্বামী মাধবানন্দ

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পুণ্য সান্নিধ্যে আটদিন বাস করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি ছিলেন মাদ্রাজ মঠের প্রথম অধ্যক্ষ এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক স্তম্ভস্বরূপ। রামচন্দ্রের লেখা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীতে তাঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পড়ি। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, যুবক শশী (যে নামে তখন তিনি পরিচিত ছিলেন) শ্রীরামকৃষ্ণের যে অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ সেবা কাশীপুরে তাঁর শেষ অসুখের সময় করেছিলেন তা এককথায় নজিরবিহীন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি সম্বন্ধে আমি তখনও পর্যন্ত এবং পরবর্তী কালে বরাহনগর, আলমবাজার এবং বেলুড়মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের নিকট (যাঁরা অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন) বিশদভাবে জানতে পেরেছিলাম। এর ভিত্তিতে আমি দ্রুত স্থির করে ফেলি যে সঙ্ঘের শিক্ষানবিশ ব্রহ্মচারিরূপে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অধীনে থেকেই জীবন আরম্ভ করব। যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ ঠাট্টা করে, সামান্য ত্রুটিতে শশী মহারাজের কঠোর মনোভাবের—যা তীব্র ভর্ৎসনায় আত্মপ্রকাশ করত—কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন। তদনুযায়ী শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের (বেলুড় মঠের তদানীন্তন সম্পাদক) ব্যবস্থাপনায় আমি পরীক্ষার হল ত্যাগ করার ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে নিঃশব্দে মাদ্রাজ মেলে চড়ে বসি।

২২ এপ্রিল দুপুর নাগাদ মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশনে উপস্থিত হলাম। এক ভদ্রলোক মায়লাপুর ব্রডিস রোডের কাছাকাছি এক জায়গায় ট্রাম থেকে নামিয়ে দিয়ে বললেন আমি যেন বড় রাস্তা ধরে না চলি। তার নির্দেশ মারাত্মকভাবে ভুল বোঝার ফলে আমি গরুর গাড়ির রাস্তা ধরে কয়েক গজ হাঁটার পরে একটি নারকেল বাগানে এসে পৌঁছাই। সেই বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে এক ঘণ্টা পরে মঠে উপস্থিত হই—যেটা ছিল মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। সেখানে পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি তাঁর একমাত্র সহকারী ব্রহ্মচারী রুদ্র চৈতন্যকে আমার খাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। তার একটু পরেই তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সাধু হতে চাই কি না। উত্তরে

আমি বললাম যে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁদের সান্নিধ্যে থেকে পবিত্র জীবনযাপন করা। তিনি বললেন, "সে একই কথা। তাহলে তুমি ঠিক জায়গায় এসে পড়েছ। বর্তমান যুগে যে-কেউ শ্রীরামকৃষ্ণাবতারের আশ্রয়ে আসবে তার জীবনের উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হবে। কিন্তু যদি অর্থ ও যশ চাও তবে ফিরে গিয়ে তোমার এম.এ. পড়া উচিত।" আমি বললুম, "ওসব আমি গ্রাহ্য করি না।"

সে সময় সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ (যিনি 'মহারাজ' নামে অধিক পরিচিত) ব্যাঙ্গালোরে আশ্রম-বাড়ির প্রতিষ্ঠা কার্য শেষ করে কয়েকদিন আগে সদলবলে মাদ্রাজে ফিরে আসায় মঠ তখন লোকে পরিপূর্ণ। তখন মাদ্রাজ মঠের চতুষ্কোণ একতলা বাড়ির চারকোণে ছোট ছোট চারটি ঘর ও মাঝখানে একটি বড় হলঘর ছিল। পূর্ব দিকের ঘর দুটির একটি ঠাকুর ঘর এবং অন্যটিতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি রাখা ছিল। প্রথমটির কোণাকুণি বিপরীত দিকের ঘরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ থাকতেন এবং অপরটি স্বামী ব্রহ্মানন্দের বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট হয়েছিল। হলঘরটি মঠের কার্যালয় ও অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যবহৃত হতো। আবার, এটি ছিল মঠস্থ অন্যান্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের শোবার ঘর। যদিও মাত্র দু-বছর পূর্বে তৈরি, কিন্তু ইতোমধ্যেই বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছিল। তাই ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এটি পরিত্যক্ত হয় এবং বর্তমান দোতলাবাড়িটি সেখানে নির্মিত হয়েছে। কন্ট্রাক্টরের ব্যবসায়িক অসততার এক করুণ নিদর্শন এই ঘটনা। মঠে তখন প্রচুর মশা। তাই হলঘরের মাঝখানে মশারি খাটাবার সমস্যা সুকৌশলে সমাধান করতে হয়েছিল। হলঘরের ভেতরের দিকের ছাদের মাঝখানে যে লোহার আঙটা ছিল সেখান থেকে একটি দড়ি লম্বালম্বি ঝুলিয়ে তার সঙ্গে বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি একটি ফ্রেম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। মশারি সেই ফ্রেমের সঙ্গেই টাঙ্গানো হতো। মঠে তখনো বিদ্যুৎ আসেনি। আরো বলা হয়, মাদ্রাজ হলো এমন এক শহর যেখানে আবহাওয়া পাঁচ মাস উষ্ণ, আর বাকি সাতমাস উষ্ণতর। ফলত ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে মাদ্রাজে আসা অবধি বছরের পর বছর বিপুলকায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আত্মবলিদানের যে কী নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, বিশেষত তাঁর আবার বহু পুরানো চর্মরোগ ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর সেবাপরায়ণতা এত প্রবল ছিল যে বারাণসী বা উত্তর ভারতের কোন তীর্থস্থান দর্শন করতে পর্যন্ত তিনি কোনদিন যাননি।

সেদিন বিকাল বেলা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। অন্যান্য বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া তিনি আমার হাতের রেখা পরীক্ষা করলেন, কিন্তু কোন অভিমত প্রকাশ করলেন না। পরে জেনেছিলাম, তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে আমায় তখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে; যোগদান করব পরবর্তী কালে, আমি লক্ষ্য করি যে মাদ্রাজে মহারাজের উপস্থিতি সকলের প্রাণে অফুরন্ত আনন্দের সঞ্চার করেছিল। বস্তুত তিনি যেন আক্ষরিক অর্থেই আনন্দ বিকিরণ করতেন, আর অতি সাধারণ মানুষও সেই আনন্দের ভাগী হতো। তিনি শিশুদের মতো কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি ওড়িয়া পাচক ছিল। সামান্যতম উস্কানিতেই সে হাসতে আরম্ভ করত। তাই মহারাজ ওকে নিয়ে খুব মজা করতেন। একদিন আমিও মহারাজের একটু ঠাট্টা তামাসার পাত্র হয়েছিলাম। আমার মাদ্রাজে আসার পরদিন মহারাজ সবার সামনে দেওয়ালে টাঙানো তাঁর অতি সম্প্রতি তোলা একটি ফটো দেখিয়ে বললেন, "তুমি মঠের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দকে চেন? দেখ তো, ছবিটি তার সঙ্গে মেলে কি না?" আমি শুধু একটু হাসলুম। তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, "ও তাকে চেনো না।" যখন জানতে পারলেন যে মাদ্রাজে আসার খবর বাড়ির লোকদের জানিয়ে এসেছি, তখন বলে উঠলেন, "আঃ কী দুঃখের কথা! ওরা এখন তোমার পিছু ধাওয়া করবে।" যখন তাঁকে বুঝিয়ে বললুম যে স্বামী সারদানন্দের নির্দেশেই এটা করেছি। তখন বললেন, "কিন্তু তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল।" সেই আনন্দের দিনগুলি শীঘ্রই শেষ হয়ে এলো। কারণ, শুনলুম যে, দিন তিনেকের মধ্যেই মহারাজ পুরী রওনা হবেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে শুধু গভীর ভালোবাসতেন তা-ই নয়, অন্যান্য গুরুভাইদের অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্ররূপে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও পোষণ করতেন এবং এই বিষয়ে বোধ হয় তিনি অন্যদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমার কাছে সেই ঘটনা বর্ণনা করেন যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের ডেকে বলেছিলেন, "রাখাল আমাদের রাজা। তোমরা তাঁর অধীনস্থ প্রজা।" প্রত্যেক ব্যাপারে মহারাজকে খুশি করার জন্য তিনি কি আন্তরিক চেষ্টাই না করতেন! প্রত্যক্ষদর্শীরা সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর সামান্যতম অসন্তোষেও শশী মহারাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হতেন। এবং যতক্ষণ না অতি দীনভাবে তাঁর ক্ষমাভিক্ষা করতেন ততক্ষণ স্থির হতে পারতেন না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে পড়েছিলাম যে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, রাখাল নিত্যসিদ্ধ। তাতে আমার এই বিশ্বাসই হয়েছিল যে তিনি সর্বদা ভগবদ্‌ভাবে বিভোর এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু তার বদলে একবার তাঁকে দেখলাম তাস খেলতে। আমি অবশ্য চুপ করেছিলাম। একদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিষয়টি উত্থাপন করে আমায় বললেন, " মহারাজ যে তাস খেলেন তা আমাদের পক্ষে ভালো। তিনি এত উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে বাস করেন যে তাঁর শরীর বেশিদিন টিকবে না যদি তিনি সর্বদা ঐ ভূমিতে অবস্থান করেন। আমরা সেজন্য তাঁর খেলার আগ্রহ সঞ্চার করি যাতে তাঁর মন কিছুটা অন্তত হালকা হয়।" আমি বুঝতে পারলাম তাঁর মতো বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিধর পুরুষকে সাধারণ মাপকাঠিতে বিচার করা কতখানি অবিবেচনা প্রসূত হয়েছে।

নির্দিষ্ট দিনে মহারাজ পুরী রওনা হয়ে গেলেন। তাঁকে স্টেশনে বিদায় জানিয়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমায় বলেছিলেন, "তাঁর মতো সন্ন্যাসীর জন্য সব ব্যবস্থা আপনা আপনিই হয়ে যায়। মহারাজ ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভ্রমণ করতে অস্বস্তি বোধ করতেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণির একশয্যা সম্বলিত একটি একান্তকক্ষ পেয়ে গেলেন। তাতে পাখা এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে এত আদর-যত্ন করতেন এবং সুযোগ-সুবিধা দিতেন যা আমরা অন্যরা ততটা পাইনি। কখনো তিনি মহারাজকে তাঁর কাঁধে চড়াতেন। একদিন মহারাজের একটি শিশু সুলভ আচরণে অভিভূত হয়ে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'তুই এত সরল'! হায়; 'আমি চলে গেলে তোকে কে দেখবে?' কিন্তু দেখলে তো জগন্মাতা তাঁর সব বন্দোবস্ত করেছেন।"

যাবার সময় মহারাজ আমায় বললেন, "এখানে তুমি একজন মহাত্মার সঙ্গে রইলে। তাঁর সেবা কর।" আমি সেজন্য তাঁর কিছু কিছু ব্যক্তিগত সেবা—যেমন, সময়ে সময়ে গা-হাত টিপে দেওয়া, হাওয়া করা ইত্যাদি করতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু সাধ্যমতো চেষ্টা করলেও আমার সেবায় তাঁর বিশেষ আরাম হতো বলে মনে হয় না। সেজন্য তিনি প্রায়ই বলিষ্ঠ রুদ্র মহারাজকে ডেকে দিতে বলতেন। আশ্রমে ছোট ছোট কাজও আমায় দেওয়া হতো। সেগুলির মধ্যে একটি ছিল মেঝে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার রাখা। একদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দেখতে পেলেন, আমি একটি মাকড়সাকে সাবধানে পাশে সরিয়ে রাখছি। তিনি এসে আমার হাত থেকে ঝাঁটা নিয়ে মাকড়সাটিকে মেরে ফেলে বললেন, "তুমি

যদি এগুলিকে না মার ওরাই তোমাকে মেরে ফেলবে।" তিনি আমার অস্বাভাবিক কোমলতা দূর করতে চাইতেন। অপ্রতিকার অপেক্ষা প্রতিস্পর্ধিতাই সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে একটি বাস্তবানুগ নীতি। কেবলমাত্র উচ্চ হৃদয় ব্যক্তিরাই অন্যায়ের প্রতিবিধান থেকে বিরত থাকার যোগ্য।

আরেকদিন শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের সহজ কয়েকটি শ্লোক ব্যাখ্যা করতে বলে আমার সংস্কৃত জ্ঞান পরীক্ষা করলেন। পরিশেষে বললেন, "তুমি ঠিক ধরেছ।" এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণের পার্থক্য বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, বাঙালিরা সাধারণত বোঝে না যে এ দুটি ভাষা পৃথক। পূর্বোক্ত পার্থক্য বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতে তিনি দুর্গাসপ্তশতী থেকে নিম্নোক্ত শ্লোক (পঞ্চম অধ্যায়; ৩২-৩৪) বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ আবৃত্তি করলেন—

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

—যে দেবী শক্তিরূপে সর্বজীবে বাস করেন তাঁকে বারংবার প্রণাম। শব্দগুলি ইংরেজি উচ্চারণের মতো মধুর শোনালো এবং বাংলা উচ্চারণ বোঝাবার জন্য একটি বাক্যাংশ উদ্ধৃত করলেন, 'ওগো শক্তিস্বরূপিণী'—হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী। কিন্তু শোনালো 'ওগো শোক্তি-শ্শরূপিণি।' তিনি আরো মন্তব্য করলেন যে চণ্ডী যথার্থ ভাবে উচ্চারিত না হলে জগন্মাতা অসন্তুষ্ট হন। তিনি সংস্কৃতে মহাভারতের শান্তিপর্ব পাঠ করতে এবং অপ্রচলিত শব্দগুলি অর্থসহ লিখে রাখতে আমাকে উপদেশ দিলেন। একবার তিনি গীতার সপ্তম অধ্যায়ের বিখ্যাত ১৪শ শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করে আমায় শোনালেন, যে শ্লোকে বলা হয়েছে কেবল মাত্র ভগবানের শরণাগত হলেই মায়া অতিক্রম করা সম্ভব। আরেকবার শশী মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দের সদ্য প্রকাশিত 'দেববাণী' থেকে নিম্নোক্ত অংশ আমাকে পাঠ করতে বললেন, যা তিনি নিজেই সংক্ষেপে আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। "যেসব লোক এমন সব সম্প্রদায়ের মতামত বা কার্যকলাপ বর্ণনা করে যেগুলির সঙ্গে তাদের সহানুভূতি নেই, তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যাবাদী। যারা সম্প্রদায় বিশেষে দৃঢ়বিশ্বাসী, তারা অপর সম্প্রদায়ে যে সত্য আছে, তা বড় একটা দেখতে পায় না।" (১ জুলাই)। "যতক্ষণ তুমি সত্যের অনুরোধে যে কোন মুহূর্তে বদলাতে প্রস্তুত না হচ্ছ, ততক্ষণ তুমি কখনোই সত্য লাভ করতে পারবে না; অবশ্য তোমাকে দৃঢ়ভাবে সত্যের অনুসন্ধানে লেগে থাকতে হবে।" (৫ জুলাই)

যে স্বল্প সময় আমি তাঁর নিকট ছিলাম তিনি বরাবর আমার প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। এমনকি গোপনে তিনি এমন সব কথা বলতেন যা একজন নবাগতের পক্ষে শোনা ঠিক নয়। কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর বহুকালের পরিচিত বলে গণ্য করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণে বলেছিলেন, "তিনি আমায় শুধালেন, 'তোমার সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস অথবা নিরাকারে?' উত্তরে আমি বললুম, 'ভগবান আছেন কি-না তাই জানি না। তাই সাকার নিরাকারের প্রশ্নই আসে না।' উত্তর শুনে তিনি খুব খুশি হলেন।" একবার তিনি ধুতির খুঁটে একখণ্ড বরফ বেঁধে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন। এতখানি রাস্তা আসতেও বরফখণ্ড গলেনি। একদিন এই প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে উত্তর কলকাতার একটি জায়গা থেকে বরফ এনেছিলেন এবং আরো বলেন যে, বরফ গ্রহণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন, "এটি ভক্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন।" তিনি বলতে লাগলেন, "এবারে সমাধি-টমাধি সব তাকে তুলে রেখেছি। এখন তাঁর কাজ করতে হবে।" একবার ফারসী শিখছেন জানতে পেরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কঠোর ভাষায় নিরুৎসাহিত করে বলেছিলেন, "অপরা বিদ্যায় ডুবে থাকলে তোর হৃদয় ভক্তিহীন হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে 'কালী'র কাজ। সেই ছেলেদের মধ্যে পড়ার আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে, নয়তো ও এসব ছেড়ে দিয়েছিল।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বললেন, "শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে হবে বলে আমায় আবার নতুন করে সব শিখতে হলো।"

হরিপ্রসন্ন নামে জনৈক ভদ্রলোক সম্বন্ধে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা বর্ণনা করেন। হরিপ্রসন্ন অঙ্কে তাঁর সহপাঠী ছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণকেও সে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করতে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কালী মন্দিরে ধ্যান করতে বলতেন। একদিন ধ্যানস্থ অবস্থায় তার অনুভূতি হলো যে চোখ দুটি যেন এক হয়ে গিয়ে কপালে আরেকটি চোখ ফুটে উঠেছে। ভয় পেয়ে সে ছুটে এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে সব কিছু জানালে তিনি বললেন, "এইটুকুতেই স্থির থাকতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে এলি।" ঠিক কাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা আমি আর তার খোঁজ নিইনি।

ত্যাগের প্রতিমূর্তি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সংসারী লোকের সংযমে শিথিলতা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল এমন একটি ঘটনার কথা তিনি আমাদের বলতেন। অবশ্য যাকে জড়িয়ে এই ঘটনা তার নামোল্লেখ করতেন না। এক শ্রেণির লোক সম্বন্ধে তিনি মজা করে বলতেন, "এরা নিজেরা

যেমন স্ত্রৈণ তেমনি ভাবে যে তাদের দেবতাদেরও প্রত্যেকের বুঝি তিনটি করে স্ত্রী!" অবশ্য সাধারণ আচার-ব্যবহারে তাঁর সহৃদয়, বিবেচক ও স্নেহশীল রূপটিই প্রকাশ পেত। শুধু একদিনই সকালের ক্লাস থেকে ফিরে বেশি ভাড়া দাবি করার জন্য গাড়োয়ানকে বকতে শুনেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনই ভাড়া মিটিয়ে দেবার আদেশ দিলেন এবং মৃদু হেসে বললেন যে এদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। স্থানীয় 'স্টুডেন্টস্ হোম' এর ছাত্ররাই পালা করে মঠের জন্য কেনাকাটা করত। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিজেই এই ছাত্রাবাস গড়ে তুলেছিলেন দুঃস্থ ছাত্রদের প্রতি সমবেদনায়। মঠে কে কি দায়িত্ব পালন করবে সে বিষয়ে তিনি নিজেই নির্দেশ দিতেন। অথচ অতি সাধারণ কাজ, যেমন রান্নার জন্য কুটনো কোটা ইত্যাদিতেও সকলকে সাহায্য করতেন। অবশ্য তাঁর দৃষ্টিতে, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সাক্ষাৎ বিরাজিত। তাঁর দৈনন্দিন সেবা-পূজা ছিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্বেচ্ছা-স্বীকৃত একটি প্রিয় কাজ। এই কাজে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন এবং পূজা বিস্তারিত ভাবে করতে গিয়ে দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন, যদিও কাজটি ছিল শ্রমসাধ্য। স্বভাবতই তাঁর পূজা ছিল একটি উপভোগ্য দৃশ্য। অবসর সময়ে তিনি 'শ্রীগুরু মহারাজ' বা ঐ ধরনের কোন পবিত্র নাম গভীর আবেগে উচ্চারণ করতে করতে হলঘরে পায়চারি করতেন। গম্ভীর প্রকৃতির হলেও তিনি সহজেই বালকের মতো উচ্চহাস্য করতেন। তাঁর বেশভূষা ছিল সাদাসিধে এবং সমস্ত আচার আচরণ অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করত যে তিনি একজন উচ্চকোটির মহাত্মা।

এখানে আমি কয়েকটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করছি যা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মানসিক অবস্থার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী। এক গুমোট রাতে তাঁর ঘুম আসছিল না। পরদিন সকালে সেটি উল্লেখ করে তিনি বললেন, "হয়তো নতুন যে ছেলেটি এসেছে তাঁর মা কাঁদছিল। তাই আমি ঘুমোতে পারিনি।" একদিন দুজন যুবক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো, হাতে তাদের সদ্য বাজার থেকে কেনা কয়েকটি বই। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাদের সস্নেহ সম্ভাষণ জানালেন এবং বইগুলির শিরোনামের দিকে তাকিয়ে জানতে পারলেন যে একটি বই Theosophy in Everyday Life (প্রাত্যহিক জীবনে থিওসফি)। তাঁর চকিত মন্তব্য— "প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বর—এই ধরনের বই নেই। কেন?" একদিন মনে হয় প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠেছিল, মৃত্যুর পর পরলোকে জীবের বসবাস সম্ভব কি না। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জানতে চাইলেন, এসব আমি বিশ্বাস করি কিনা। উত্তরে আমি বললাম "আংশিক।" "না, পরে যখন এসব মানবে তখন সবটুকু মানতে

[illegible]" মন্তব্য করলেন রামকৃষ্ণানন্দ। চটের বস্তার উপর বসতে নিষেধ করে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে বসতে বারণ করতেন, কারণ এর ফলে মুদির প্রবৃত্তি জাগতে পারে। (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও আমাদের সবার উপস্থিতিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার একটি সাবধানবাণী আমাদের শুনিয়েছিলেন। সেটি হলো—মাদুর বিছানোর হাওয়া যেন কোনভাবেই গায়ে না লাগে)। দুটি বিষয়ে মহারাজ দরদের সঙ্গে আমার ভুল সংশোধন করে দিয়েছিলেন। প্রথম, যখন আচালা লাল আটার বদলে পরিষ্কার সাদা রুটিই আমার পছন্দ—এই মত প্রকাশ করেছিলাম। দ্বিতীয়, যখন Inspired Talks (দেববাণী) বইটিতে এত দামী ও হালকা কাগজ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলাম। আমার ত্রুটি সংশোধন করতে গিয়ে মহারাজ কী সুন্দরভাবেই না ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মনের উৎকর্ষের বিষয়টি আমার মনে দৃঢ় মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ইন্দ্রিয় কেবল বস্তুর বহিরাবরণ স্পর্শ করতে পারে। যেমন ধর, এই দেওয়ালটি। এর দিকে তাকালে তুমি রঙিন একটি জায়গামাত্র দেখতে পাবে। দেওয়ালের ভেতরে কি আছে চোখ তোমাকে জানিয়ে দিতে পারবে না। কেবলমাত্র মনই তোমাকে দেওয়ালটি সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য যেমন, এর ঘনত্ব, এটি যে ইটের তৈরি ইত্যাদি পরিবেশন করতে পারে।" সেদিন তিনি অনুরূপ হৃদয়াবেগে আরো অনেক কথা বলেছিলেন।

একদিন তিনি বলেন, "যখন দেখবে একটি ছাগশিশুকে তার মা দুধ খাওয়াচ্ছে, জানবে ভগবান সেখানে সাক্ষাৎ বিরাজিত।" অপর একদিন ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বললেন, "একজন মানুষ নিজের প্রতি কৃত অপরাধের প্রায় সবটুকুই হয়তো ভুলে যেতে পারে, কিন্তু তার স্ত্রীর প্রতি কোন অন্যায় আচরণ তা কথাচ্ছলে হলেও সে কখনোই ভুলতে পারে না। সুতরাং ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি অহংবোধ সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে চায় তার অবিবাহিত থাকাই উচিত।" আমার স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল তাঁর সেই চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমার বর্ণনা; যখন তিনি ভগবান লাভের জন্য একনিষ্ঠ ব্যাকুলতার প্রয়োজনের উপর জোর দিতে গিয়ে একটি কাহিনির উল্লেখ করেছিলেন। কাহিনিটি হলো গুরুর নিকট ঈশ্বর দর্শনের জন্য শিষ্যের সনির্বন্ধ প্রার্থনার কাহিনি। শিষ্যের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে গুরু তাকে একটি পুকুরে নিয়ে গেলেন এবং অতর্কিতে তাকে জলের নিচে চুবিয়ে ধরলেন। খানিকক্ষণ পরে গুরু শিষ্যকে ছেড়ে দিলে সে জলের বাইরে মাথা তুলে দাঁড়াল। নিমজ্জিত অবস্থায় কোন্ জিনিসটির প্রয়োজন সে সব থেকে বেশি অনুভব করেছিল জানতে চাইলে শিষ্য গুরুকে বলল—

"নিঃশ্বাসের জন্য একটু বাতাস।" গুরু—"আর কিছু নয়?" শিষ্য—"না"। "যখন অন্য কিছু নয়, শুধুমাত্র ঈশ্বর দর্শনের জন্যই এরকম আকুল আকাঙ্ক্ষা তোমার মনে জাগবে, তখনই তাঁর দেখা পাবে"—বললেন গুরুদেব।

একদিন আমি তাঁর কাছে একটি চিরকেলে বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম যে, শত্রুভাবের সাধনায় ঈশ্বর দর্শন হয় দ্রুত; কারণ ঐ ভাবের সাধককে দিনরাত ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকতে হয়। একথা শুনে মহারাজ মন্তব্য করলেন, "ঈশ্বর চাবুক মেরে তাদের মনে সদ্ ভাব জাগিয়ে রাখেন।" বাঙলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যের একটি ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ জীবনী-গ্রন্থ ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয় (গোঁড়ামির মলিন অংশগুলি ছাড়া)। বইটি সম্বন্ধে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য—"যেন একটা উপন্যাস লেখা হয়েছে।"

তাঁর সান্নিধ্যে আমার আনন্দের দিনগুলি ফুরিয়ে আসছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করতেই যেন একদিন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ব্রাহ্মণবংশ জাত আমার এক প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক, আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে। তার সঙ্গে সব ধরনের তর্ক-বিতর্ক হলো নিষ্ফল। মনে হলো, আমার এখন ফিরে যাওয়াই উচিত। কারণ, আমি থেকে গেলে পিতা-মাতা এখানে এসে মহারাজকে অযথা হয়রান করতে পারেন। তাঁকে যাতে এই কষ্টভোগ না করতে হয় শুধুমাত্র সেই কারণে আমি তখনকার মতো বাড়ি যেতে মনস্থ করলাম, এই আশায় যে তাঁদের বুঝিয়ে সুজিয়ে দিনকয়েকের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও মহারাজের দূরদর্শিতার স্পষ্ট পরিচয় আমি পেতাম। সেদিন খেতে বসে তিনি আমাকে নিভৃতে বললেন শিক্ষক মহাশয়ের থালা থেকে উচ্ছিষ্ট তুলে না খেতে, যদিও সেটা ভারতবর্ষের একটি অতি প্রচলিত প্রথা। অধ্যাত্মপথের পথিক আমার প্রতি মহারাজের এই বিধিনিষেধ আরোপ যে যুক্তিযুক্তই হয়েছিল একথা আমি পরবর্তী কালে অনুধাবন করতে পারি। বাড়ি রওনা হবার আগে মাদ্রাজের পার্শ্ববর্তী তীর্থ-নগরী কাঞ্জীভরম দর্শন করে আসার প্রস্তাব মহারাজ আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু খুব শিগ্‌গিরই ফিরে আসবো তাই সেই প্রস্তাবে আমি তখনই রাজি হইনি। (অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে তেইশ বছর পরে সেই তীর্থ দর্শন বাস্তবে ঘটেছিল)। কলকাতার পথে পুরীতে যাত্রা বিরতির পরামর্শও মহারাজ আমাদের দেন। (অবশ্য পুরীতে নেমে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন এবং জগন্নাথ দর্শনের সঙ্কল্প আমাদের এমনিতেই ছিল)। পরামর্শদানকালে ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে লক্ষ্য করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমার শিক্ষক মশাইয়ের প্রতি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন—

"সেখানে একজন সচল জগন্নাথকে দেখতে পাবে।" স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন, রামকৃষ্ণানন্দের এই মন্তব্য।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরকোটি সন্তানদের অন্যতম এবং তাঁরই অপর গুরুভাই স্বামী প্রেমানন্দের কথা। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সান্নিধ্যে যখন ছিলাম তখন কোন একদিন শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "ঐ যে বাবুরাম, তিনি হলেন অনন্ত আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস। কিন্তু তিনি কিছুতেই তা প্রকাশ করবেন না।" হিন্দু-অহিন্দু নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটাতে সেই শক্তি যে কত বলিষ্ঠ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েক বছর পরে যখন স্বামী প্রেমানন্দ পূর্ববঙ্গে ও অন্যত্র ধর্মপ্রচার শুরু করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত, যারা তাঁর আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করত তাদের কাছে তিনি ছিলেন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি তুল্য।

পুরীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের দর্শন লাভে আমরা ধন্য হলাম। আমাদের দেখে সেদিন তার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানতে পারি প্রায় চারমাস পরে যখন তাঁকে সেখানেই দ্বিতীয়বার দর্শন করি। জনৈক বন্ধুকে তিনি বলেছিলেন, "যেন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী করে ছেলেটিকে নির্দয়ভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। আমি মনে বড় আঘাত পেয়েছিলাম।" সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যে ঐ ধরনের গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপক বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

কলকাতায় এসে শিক্ষকমশাই আমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখার তাগিদ বোধ করতে লাগলেন। সেই উৎকণ্ঠায় চলন্ত ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে হাঁটুতে চোট পেলেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে তিনি যেমন তার মতো ভাবতে লাগলেন যে একজন মুমুক্ষু সাধককে ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত করার নিমিত্ত হওয়ার জন্যই তার এই চোট আঘাত, অন্যদিকে আমাকে কিছুদিন প্রাক্তন স্কুলে অঙ্কের শিক্ষকরূপে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে হয়েছিল। এর অল্প কয়েকদিন পরেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছ থেকে আমি একখানি সুন্দর চিঠি পেলাম। চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি আমার এক বন্ধুর সংবাদ দিয়েছিলেন যে সেও সঙ্ঘে যোগদান করার ইচ্ছায় মাদ্রাজ মঠে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু তাকেও বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি লিখেছিলেন, "আজকালকার বাপ-মা ছেলেরা বিপথগামী হয়েছে দেখেও বিচলিত হন না। কিন্তু তাদের সাধু হবার অনুমতি দিতে তারা একেবারেই নারাজ।"

এরপর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় বলরামবাবুর বাড়িতে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের সম্ভবত নভেম্বরে। আমাকে দেখে তিনি খুব আনন্দিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নাও। তাহলে সব কিছুর সুরাহা হয়ে যাবে।" আমি বললাম যে, এই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। তখন তিনি বললেন, "এখন এম.এ. পাশ করার জন্য এমন একটি বিষয় বেছে নাও যার জন্য তোমাকে খুব বেশি খাটতে হবে না।" "আমি ইতোমধ্যেই তা করেছি"—জবাবে বললাম। কথাপ্রসঙ্গে আমি যখন জানালাম যে মাদ্রাজ থেকে আমাকে ফিরিয়ে আনতে অভিভাবক হয়তো পুলিশের সাহায্য নিতেন, তখন মহারাজ বললেন, "আরে না, আমি তোমাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে পারতাম যেখানে পুলিশ যেতে সাহস করত না। আমি কিন্তু চেয়েছিলাম তুমি বাড়ি ফিরে যাও।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ বেলুড় মঠে; এর অল্প কয়েক সপ্তাহ পরে। তিনি তখন জ্বরে ভুগছেন। কিন্তু তা হলেও মুখে আমন্ত্রণ-মধুর হাসিটুকু লেগেই ছিল। সেদিন তাঁর জন্য কিছু ফল কিনে আনতে আমাকে কলকাতা পাঠানো হয়। পরবর্তী কালে আমি জানতে পারি যে মহারাজ সেই সময়ে আমার সঙ্ঘে যোগদানের আশায় দিন গুনছিলেন। আমি এটা তাঁর আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করে খুবই উৎসাহিত বোধ করি।

বেলুড় মঠে অল্প কয়েকমাস থাকার পর আমি পরের বছর হিমালয়ের কোলে অবস্থিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রেরিত হই। সেখানে যাবার এক বছরের মধ্যেই এই নিদারুণ সংবাদ আমার কাছে পৌঁছাল যে মহারাজ দ্রুত-সঞ্চারী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় উদ্বোধন কার্যালয়ে এসেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ দেহে এই ধরনের রোগ সঞ্চার আমাদের কাছে রহস্যজনক মনে হলো, কিন্তু কারণ ছিল স্পষ্ট। কার্যোপলক্ষে উপযুক্ত বিশ্রাম ও পুষ্টিকর আহার ছাড়াই প্রাণপাত পরিশ্রম তিনি করেছিলেন। এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনিই অজ্ঞাতসারে প্রথমে বহুমূত্র রোগ সৃষ্টি করে। অবিলম্বে এই মর্মন্তুদ সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছাল যে আরোগ্য লাভের আর কোন আশা নেই এবং দর্শনাকাঙ্ক্ষীরা যেন অতি শীঘ্র তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। আমার পক্ষে হঠাৎ করে আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অবশেষে এলো দেহাবসানের সংবাদ, সমস্ত আশ্রমকে শোকস্তব্ধ করে দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করল পরের মাসে।

জীবনের শেষ দিনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, কেউ যেন একটি সঙ্গীত রচনা করে তাঁকে গেয়ে শোনায়। অভিনেতা নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় সঙ্গীত রচিত হলো। সঙ্গীতের শুরুতে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তার বাক্যরূপ—'পোহাল দুঃখরজনী।' বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে তার মরদেহ সৎকার হয়। সেই স্থানে* কোন স্মৃতি চিহ্ন স্থাপিত হয়নি যা দর্শনার্থীদের কাছে স্থানটির পবিত্রতার সাক্ষ্য দিতে পারে। তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল তাদের সকলের হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি চিরজাগ্রত। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রসারে এবং বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্তিত নববেদান্ত আন্দোলনে তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর রেখে যাওয়া কিছু অমূল্য গ্রন্থ, বাণী, পবিত্রতা মণ্ডিত উজ্বল জীবন, নিরভিমানিতা এবং প্রাণপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ ও নিপীড়িত মানবের সেবায় উৎসর্গিত জীবনের যতটুকু লিপিবদ্ধ আছে তা সবই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিস্তম্ভরূপে চিরকাল দণ্ডায়মান থাকবে।

বেদান্ত কেশরী, আগস্ট, ১৯৭২, পৃঃ ২১৭-২২২
অনুবাদক ঃ স্বামী জয়দেবানন্দ

[স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ (১৮৮৮-১৯৬৫) ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসব্রতগ্রহণ করেন। দুবছর আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ ছিলেন (১৯২৭-১৯২৯)। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন (১৯১৮-১৯২৭)। নিবেদিতা রচিত 'The Master as I saw Him' পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করেন। 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী', 'ভাষা পরিচ্ছেদ', 'বৃহদারণ্যক উপনিষদের' শাঙ্করভাষ্য, 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীমা তাঁকে দেখে বলেছিলেন ঃ "হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।"

স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ সুদীর্ঘকাল সাধারণ সম্পাদক (১৯৩৮-৬২ মাঝে দু-বৎসর বাদে) এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নবম প্রেসিডেন্ট মহারাজ ছিলেন (১৯৬২-১৯৬৫)।]

---

* স্থানটি বর্তমানে পরিবেষ্টিত। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সহ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের যে আটজনের মরদেহ এখানে সমাহিত হয়েছে, একটি স্মৃতিফলকে তাঁদের নাম উৎকীর্ণ আছে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের পুণ্যসঙ্গে

স্বামী শর্বানন্দ

বেলুড় মঠ থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা আমার পরিচয়পত্র (শিবানন্দ লিখিত) নিয়ে যেদিন আমি প্রথম মাদ্রাজে আসি তখন ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষার্ধের কোন এক দিন। স্বামী ব্রহ্মানন্দও আমার সম্বন্ধে তাঁকে লিখেছিলেন। তাই বীচ্ রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাদ্রাজ মঠে পৌঁছেই দেখতে পেলাম শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এই নামেই সঙ্ঘে পরিচিত। কারণ, তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শশিভূষণ) বড় দালানের বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন যেন আমারই প্রতীক্ষায়। মঠ ছিল তখন ট্রিপ্লিকেন-স্থিত 'আইস্ হাউস'-এর মূল বাড়ির নিচের তলায়। তাঁর মেদবহুল বিশাল শরীর এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখমণ্ডল শশী মহারাজের প্রতি আমার মনে প্রথম যে ধারণা সৃষ্টি করেছিল তা ভয় ও গভীর শ্রদ্ধার। তাঁর ব্যক্তিত্বের ছিল এমন এক বৈশিষ্ট্য যা মনকে আকর্ষণ করত অনিবার্যভাবে।

আমি যখন মঠে পৌঁছাই তখন গাঢ় সন্ধ্যা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পরে তিনি জানতে চাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য আমি কি এনেছি। যখন আমি জানালাম যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কিছু নিয়ে যেতে হবে একথা আমার মনেই জাগেনি এবং বেলুড় মঠেও কেউ আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলে দেননি তখন তিনি কোমল অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক কণ্ঠে বললেন, "যখনই বাইরে থেকে মঠে আসবে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য অবশ্যই কিছু নিয়ে আসবে।" তাঁর কাছে আমার এই প্রথম শিক্ষা। আমি লজ্জিত বোধ করলাম। তিনি তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ঐ ঝুড়িতে কি আছে?" আমি বললাম, "যাত্রা-পথে খাওয়ার জন্য যে কিছু আম ও মিষ্টি সঙ্গে এনেছিলাম তারই কয়েকটি অবশিষ্ট আছে।" একথা শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, "বিচলিত হয়ো না, ঐ আমগুলিই নিয়ে এস এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন কর।" আমি যখন তাঁর অনুরোধে মৃদু আপত্তি জানালাম এই জন্য যে ঐগুলি থেকে আমি কয়েকটি ইতোমধ্যে খেয়ে ফেলেছি কিন্তু তিনি তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "এতে কোন দোষ হবে না। ফলের অগ্রভাগ গ্রহণ করলেও বাকি ফল ধুয়ে নিবেদন করা

চলতে পারে।" সুতরাং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী রাত্রিতে ভোগের সঙ্গে ঐ আমগুলিও সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করা হলো।

সে-সময়ে মঠবাসী বলতে মাত্র তিনজন—শশী মহারাজ, বসন্ত (স্বামী পরমানন্দ) ও যোগীন (স্বামী উমানন্দ), আমি হলাম চতুর্থ আশ্রমিক। মঠে আসার ঠিক পরদিন থেকেই নির্দিষ্ট কিছু কাজের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হলো যার মধ্যে প্রধান ছিল ঠাকুরঘর পরিষ্কার রাখা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের নৈবেদ্য প্রস্তুত করা।

তখন মঠের দৈনন্দিন কার্যক্রম ছিল এইরকম—আশ্রমবাসী সকলে ভোর পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করতেন এবং প্রাতঃকৃত্যের পর নিজ নিজ ঘরে উপাসনায় বসতেন। কিন্তু শশী মহারাজ সর্বপ্রথম ঠাকুরঘরে যেতেন এবং প্রাতঃকালীন ভোগ নিবেদনের পর ঠাকুরঘর বন্ধ করে দিতেন। এরপর ঘরে ফিরে এসে তিনি প্রতিদিন গীতা ও চণ্ডীপাঠ করতেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতাম এবং ঠাকুরঘর থেকে প্রসাদ সরিয়ে এনে অপর একটি কক্ষে রক্ষিত স্বামীজীর প্রতিকৃতির সম্মুখে স্থাপন করতাম। এরপর দুটো ঘরই ঝেড়ে-মুছে ঝকঝকে পরিষ্কার করতে হতো। ইতোমধ্যে যোগীনের চা প্রস্তুত হয়ে যেত এবং আমরা সকলে প্রাতরাশের জন্য কার্পেটের উপরে বসতাম, একের পর এক, বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী। প্রথমে পরিবেশন করা হতো শশী মহারাজকে, তারপর অন্যদের। প্রাতরাশের পর শশী মহারাজ কুটনো কুটতে বসতেন এবং আমাকে কোন একটি বই থেকে পাঠ করতে বলতেন। আমি প্রথমে যে বই থেকে পাঠ আরম্ভ করি সেটি পতঞ্জলি যোগসূত্র। আমি প্রথমে গ্রন্থের মূল অংশ পাঠ করতাম এবং তিনি প্রতিটি সূত্র ব্যাখ্যা করতেন। অন্যান্যরা থাকতেন আলোচনার নীরব শ্রোতা। একঘণ্টা বা তারো কিছু বেশি সময় এইভাবেই অতিবাহিত হতো এবং তারপর আমরা নিজ নিজ নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে অথবা অন্য কোন কাজে চলে যেতাম। ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় এগারটা তখন শশী মহারাজ পূজা করতে ঠাকুরঘরে যেতেন এবং সাড়ে এগারটা নাগাদ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দুপুরের ভোগ নিবেদন করতেন। ঠাকুরঘর থেকে যখন ভোগ নামিয়ে আনা হতো তখন দুপুর সাড়ে বারটা। ঐ সময়ে ঠাকুরঘর বন্ধ হয়ে যেত এবং আমরা সবাই মধ্যাহ্নকালীন আহারে বসতাম। আহারের পর শশী মহারাজ ও আশ্রমিক সকলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন। অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে তিনটায় তিনি আমাদের সকলকে তাঁর কাছে ডাকতেন। আমরা সবাই মেঝেতে বসলে বসন্ত 'চৈতন্যচরিতামৃত'

থেকে পাঠ করত। পাঠ চলাকালীন শশী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তুলনামূলক আলোচনা করতেন। এই ধরনের অবকাশে স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-শিষ্যরা তাঁদের সন্ন্যাসজীবনের প্রথম পর্বে যে সব ধর্মীয় সাধনা অনুশীলন করেছিলেন শশী মহারাজ সেইসব প্রসঙ্গেরও অবতারণা করতেন। গভীর আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তিনি এইসব আলোচনা করতেন, যা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। অপরাহ্ণ ঠিক চারটায় ঠাকুরঘর দুটির দ্বার উন্মুক্ত হতো এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বৈকালিক নিবেদন করা হতো। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ নিবেদনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সময়-সচেতন। এক মিনিটের জন্য হলেও এই নিয়মের কোন শিথিলতা তিনি বরদাস্ত করতেন না।

কোন কোন দিন বিকালে তিনি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যেতেন ধর্মালোচনা করতে। আমরাও আমাদের নির্ধারিত কাজ সেরে নিতাম অথবা সাময়িক বিনোদনের জন্য সমুদ্রতীরে বেড়িয়ে আসতাম।

সন্ধ্যায় আমরা ঠাকুরঘরে সমবেত হতাম সান্ধ্য প্রার্থনা ও উপাসনার জন্য। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সময়ে নিয়মিত সন্ধ্যারতি হতো না। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের রাত্রিকালীন ভোগ নিবেদন করা হতো এবং আধঘণ্টা পরে ঠাকুরঘর রাত্রের মতো বন্ধ হয়ে যেত। এরপর আমরা রাতের আহারে বসতাম। আহারান্তে শশী মহারাজকে ঘিরে বসে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত পরিচর্যা করতাম। সে-সময় তিনি আমাদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনের কিছু কিছু ঘটনা বর্ণনা করতেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি শুতে যেতেন এবং আমরাও রাতের মতো বিশ্রাম করতে যেতাম।

অল্প কয়েকদিন মঠবাসের পরেই আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের কাছে শশী মহারাজের কি প্রত্যাশা। তিনি চাইতেন, আমরা হব ত্রুটিহীন, সময়নিষ্ঠ, নিয়মানুবর্তী, কর্মতৎপর এবং সকল প্রকার কাজে, বিশেষত ঠাকুরঘর ও ঠাকুরসেবার কাজে একনিষ্ঠ। আমার মাদ্রাজে আসার ঠিক দ্বিতীয় দিনে আমি যখন ঠাকুরঘরে কর্মরত তখন শশী মহারাজ ছায়া ও কায়ার অভিন্নতা সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তাঁর স্বভাবসুলভ দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, "দেখ বাছা, এটিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিমাত্র বলে ভেব না। ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত অস্তিত্ব অনুভব করতে চেষ্টা কর এবং সেই অনুযায়ী তোমার সেবা-যত্ন চালিয়ে যাও।" সন্ন্যাসী-প্রবরের নিকট এই আমার দ্বিতীয় শিক্ষা।

পরের দিন ঠাকুরঘরের কাজে কিছুটা অসতর্কতার জন্য আমার ভাগ্যে জুটল মহারাজের তীব্র ভর্ৎসনা। এই ধরনের প্রচণ্ড তিরস্কারে আমি ছিলাম অনভ্যস্ত। তা ও আবার এই সামান্য ত্রুটির জন্য! আমি ভেঙে পড়লাম। আমাকে কাঁদতে দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ সান্ত্বনা দিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন, "জান তো শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলতেন? কামার লোহার ঢেলাটি প্রথমে আগুনে ছুঁড়ে দেয়। পিণ্ডটি যখন আগুনের মতো লাল হয়ে ওঠে তখন সেটিকে নেহাইয়ের উপর বসিয়ে ইচ্ছামতো পিটিয়ে নির্দিষ্ট আকার দেয়। এভাবেই আকৃতিহীন একটি ধাতুপিণ্ড ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। তোমরা সবাই হলে ঐ আকৃতিহীন ধাতুপিণ্ডের মতো এবং তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদের এ-ধরনের কঠোর তিরস্কার যেন ধাতুপিণ্ডকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা এবং নেহাইয়ের ওপর চড়িয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তাকে ব্যবহারযোগ্য বস্তুর আকারে গড়ে তোলার সামিল।" শশী মহারাজের প্রবোধবাক্যে আমি অনেকটা উৎসাহিত বোধ করলাম। এই ঘটনার ঠিক পরদিন আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছি; পাতে পরিবেশন করা হয়েছে সুন্দর মালগোবা আম। শশী মহারাজের পাতেই আম দেওয়া হলো প্রথমে। একটি বড় আমের অল্প একটু চেখেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "আঃ কি মিষ্টি! এই আমটা খুব ভালো। তুমি এটা খাও।" এই কথা বলে যেন মাতৃস্নেহে বিগলিত হয়ে সব থেকে বড় আমটিই আমার পাতে তুলে দিলেন। স্নেহপূর্ণ এই একটি আচরণই আমার কাছে তাঁর হৃদয়ের আন্তর প্রদেশটি উন্মোচিত করে দিল এবং সেই মুহূর্ত থেকে তার কোন তিরস্কার বা গালমন্দ আমাকে পীড়া দিত না অথবা আমার অভিমানে আঘাত করত না। কারণ, আমি সর্বদাই অনুভব করতাম যে ঐ পরুষবাক্য ও ভয়াল মুখমণ্ডলের পিছনে লুকিয়ে আছে এমন একটি করুণাপূর্ণ হৃদয়ের কোমলতা যা স্নেহশীল জননী-হৃদয়েও দুর্লভ।

একথা মানতেই হবে যে, তাঁর প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি ছিল কঠোর এবং আচরণ ছিল সময়ে সময়ে রূঢ়। কিন্তু অনুগামী বা শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিক বিকাশ কিভাবে ঘটানো যায় সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাঁর চিন্তায় অগ্রাধিকার পেত সবসময়। তিনি আমাদের কোন প্রকার প্রতিবাদ বা সংশয় সহ্য করতে পারতেন না, প্রত্যাখ্যান তো দূরের কথা। তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল কামারের ভারী হাতুড়ির তীব্র আঘাতের মতো। এটা যে হজম করতে পারত তার চরিত্র গড়ে উঠত এমন এক ছাঁচে যা জীবনের উত্থান-পতনের সকল দুঃখ-জ্বালা অতিক্রমে সক্ষম হতো এবং সেই ব্যক্তি জীবনে উচ্চাদর্শ উপলব্ধির যোগ্যতা লাভ করত।

অনেকেই আসত তাঁর কাছে; কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারত। তাঁর সান্নিধ্যে থাকাকালীন আমি লক্ষ্য করেছি যে জপ-ধ্যান বা ঐ জাতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। শশী মহারাজের সতর্ক দৃষ্টি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবায় ও তাঁর উপদেশ-পালনে আমরা কতটুকু নিয়মনিষ্ঠ, ত্রুটিমুক্ত দক্ষ ও নিষ্ঠাসম্পন্ন। বস্তুত এগুলির মধ্যেই লুকিয়ে আছে যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের অপরিহার্য শর্ত—আত্মসংযম, একাগ্রতা ও ঈশ্বরানুরাগ। কেবলমাত্র এইসব সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিই ইচ্ছা করলে ভক্তিমার্গে সহজে এগিয়ে যেতে পারে। যে একটি বিষয়ে তিনি প্রতিনিয়ত অক্লান্তভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন তা হলো, মঠের পূজাগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত উপস্থিতি। শুধু তা-ই নয়, তিনি আছেন সমগ্র মঠ জুড়েই; মঠের প্রতিটি বস্তুই তাঁর এবং জীবনের সকল প্রচেষ্টা তাঁকে অথবা তাঁর সেবাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই একক সাধনাই আমাদের অবলম্বনীয়। যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে "জয় গুরু, জয় গুরু" বলে আকুল প্রার্থনা জানাতেন তখনই তাঁর জীবন্ত অস্তিত্বের বোধ এত গভীরভাবে হৃদয়কে নাড়া দিত যে তা ভাষায় প্রকাশ করা অপেক্ষা অনুভূতিতে ধরে রাখাই শ্রেয়। যদি ধর্মজীবনের মর্মকথা হয় অধ্যাত্মচেতনার জাগৃতি, যে-চেতনা ঈশ্বর বা ব্রহ্মরূপে শুধু যে আমাদের সত্তার গভীরে বিরাজিত তা নয়, বরং বহির্বিশ্বেও ওতপ্রোত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মূল ভিত্তি, তাহলে আধ্যাত্মিকতার বিচারে শশী মহারাজের শিক্ষাধারার গুণমান অত্যুৎকৃষ্ট।

শশী মহারাজ ছিলেন অতিমাত্রায় রক্ষণশীল যে-রক্ষণশীলতা সময়ে সময়ে যেন হয়ে পড়ত কুসংস্কারের সমগোত্রীয়। কিন্তু তাঁর এই আপোসহীন মনোভাবের পশ্চাতে ছিল শাস্ত্রনির্দেশ ও গুরু-আজ্ঞার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। তাই বলে তিনি অবশ্য কোন অনুশাসনের মোহমুগ্ধ অনুগামিমাত্র ছিলেন না। তাঁর ছিল শাণিত বুদ্ধি এবং মহান শাস্ত্রবাণীর মর্ম অনুধাবন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণের মতো প্রভূত বিদ্যাবত্তা। বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে অথবা মঘা-অশ্লেষা নক্ষত্রে তিনি মঠের চৌহদ্দির বাইরে পা ফেলতেন না এবং ঐ দিনগুলিতে কোন চিঠিপত্রও লিখতেন না। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এসব বিধি-নিষেধ মেনে চলতেন। ঐ সময়ে তিনি সরস কৌতুকে বলতেন, "ঐ বুড়ো লোকটাই আমার মধ্যে এসব কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

শাস্ত্রব্যাখ্যা ও দার্শনিক আলাপ-আলোচনায় তিনি ভাবলেশহীন কট্টর

অধ্যাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন—সেখানে ভক্তসুলভ কোন রকম হৃদয়াবেগ বা ভাবোন্মত্ততা প্রকাশ পেত না। তাঁর দার্শনিক আলোচনার ভিত্তিভূমি ছিল অদ্বৈত বেদান্ত। অবশ্য ব্যবহারিক জীবনে তিনি দ্বৈত বেদান্তের ভক্তিভাবের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি আমাদের তর্ক, যুক্তি ও দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণে খুব একটা উৎসাহ দিতেন না। শুধুমাত্র তর্কের খাতিরেই সমস্ত যুক্তি-তর্ক খণ্ডনে তিনি প্রয়াসী হতেন। জোরের সঙ্গে তিনি বলতেন, একজন ছাত্র হবে একান্তভাবেই জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিসম্পন্ন; তার থাকবে আকুল আগ্রহ গুরুজনের পাদমূলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করার। এই শিক্ষালাভ হবে তর্ক-যুক্তি বা বাগ্-বিতণ্ডার চিহ্নিত পথে চলে নয়। কিন্তু শিক্ষাগুরুর বিচ্ছুরিত সত্যালোকের উজ্জ্বল জ্যোতির সম্মুখে শিক্ষার্থী যদি নিজের অন্তর্লোকের দ্বার সত্যি সত্যিই উন্মুক্ত করে দেয় কেবল তাহলেই শিক্ষালাভ সম্ভব। এ যেন ঠিক রবিকরস্পর্শে পুষ্পকোরকের আপনা থেকেই কুসুমিত হওয়া।

অতীতের সেই দিনগুলিতে মাদ্রাজ মঠে আমাদের সাধুজীবন ছিল কঠোর, একপেশে ও বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে নিরুদ্বেগ প্রশান্তি ও মানসিক আনন্দ বিরাজ করত যা কেবল সত্যিকার আধ্যাত্মিক সম্পদে গরীয়ান মহামানবের উপস্থিতিই পরিবেশকে দান করতে পারে। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর আজ অতিক্রান্ত, কিন্তু কোলাহলহীন সেই স্নিগ্ধ জীবনের স্মৃতিটুকু আজও হৃদয়াবেগকে এমন ভাবে নাড়া দেয় যার তুলনা মেলা ভার।

এভাবেই আমাদের দিন কেটে যাচ্ছিল মাদ্রাজ মঠে। কিন্তু কিছুদিন পরেই ঘটল এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা যা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল গভীরভাবে এবং শশী মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হলো আমার মন। একদিন অপরাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বৈকালিক নিবেদন করতে গিয়ে দেখা গেল ভাঁড়ার শূন্য। মঠের আর্থিক অবস্থা সেযুগে নুন আনতে পান্তা ফুরনোর মতো। কোষাগার সেদিন রিক্ত। সাধারণত প্রতিদিন বেলা ঠিক চারটায় বৈকালিক নিবেদন করা হতো। এই তথ্য যখন গোচরে এলো তখন ঘড়িতে বিকাল তিনটা। বিষয়টা শশী মহারাজকে জানানো হলে বিস্মিত উদ্বেগে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি কিন্তু বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিতে গ্রহণ করলেন। তাঁর ধারণা হলো এ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে পরখ করে নিতে চান। একজন যথার্থ সন্ন্যাসীর মতো এই

বিশ্বাসে তিনি চিরস্থির ছিলেন যে, এ-জগতে কিছুই ঘটতে পারে না ঈশ্বরেচ্ছা ছাড়া—"তৃণখণ্ড পর্যন্ত স্বাধীনভাবে নড়তে পারে না যদি তা ঈশ্বর নামঞ্জুর করেন।" সুতরাং এ ধরনের একটি উদ্বেগজনক ঘটনা আকস্মিকভাবে যদি ঘটেও যায় সেটি কোনভাবেই তাঁর অগোচরে থাকতে পারে না। শশী মহারাজ প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাণী উদ্ধৃত করে বলতেন, মানুষ আর কী—তাঁর দাবার ছকের ঘুঁটি বই তো নয়। তাই সেদিন যে ভাঁড়ার ছিল রিক্ত তা আগেভাগে নজর না দেবার জন্য তিনি আমাদের বা অন্য কারোর উপর রুষ্ট হলেন না। তাঁর ক্রোধ ও ক্ষোভের স্রোতধারা সেদিন একান্তভাবেই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণমুখী। তীব্র গর্জনে তিনি বলে উঠেছিলেন, "পরীক্ষা হচ্ছে? আমি এখানে বালি খেয়ে স্বামীজীর কাজ করে যাব! আরে, আমি জানি, তুমি আমায় বাজিয়ে নিচ্ছ। তবে তোমারও জেনে রাখা উচিত আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ। আমি মৃত্যুবরণ করতে বা তিলে তিলে আত্মোৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। কিন্তু এখান থেকে একচুলও নড়ছি না। তুমি যদি চাও চরম দুঃখ-বিপদ নেমে আসুক আমার জীবনে।" গভীর দুঃখে ও আবেগে তাঁর আরক্তিম মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। দুঃখ, নির্দিষ্ট সময়ে প্রাণেশ্বরকে কিছু নিবেদন করতে পারার ব্যর্থতায়; আর সর্বদেবতাময় শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তায় অবিচলিত আস্থা আবেগের মূলে। এই বেদনাবোধ ও হৃদয়োচ্ছ্বাস কিছুক্ষণ লাগল স্তিমিত হতে এবং তিনি তখন হলঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পাদচারণা করছিলেন। ঐ আধঘণ্টা সময় ছিল চরম উৎকণ্ঠার। আমরা ছোটরা তখন বিস্ময়ে হতবাক; সেই মন্দ্রগম্ভীর পরিবেশকে হালকা করার জন্য কী করতে হবে ভেবে পাচ্ছিলাম না। ঠিক সেই সময়েই বাইরের দরজায় শোনা গেল মৃদু করাঘাত। আমাদের কেউ বাইরে গিয়ে সম্মুখের দরজা খুলে দিল। সমাগত ব্যক্তি শ্রীকোণ্ডিয়া চেট্টি, শশী মহারাজের প্রাক্তন ছাত্র। তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে আসা হলো। দেখা গেল, তিনি হাতে করে এনেছেন কিছু ময়দা, ঘি, মিছরি ও শুকনো ফল। তিনি শশী মহারাজের সামনে সেগুলি রাখলেন এবং সঙ্গে পাঁচ টাকার ধাতুমুদ্রাও। সেই চরম মানসিক উদ্বেগ-আকুলতার মুহূর্তে এই উপহার এমন অপ্রত্যাশিত ছিল যে সমগ্র ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণেরই পরিকল্পিত বলে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হলো। তখন বেলা সাড়ে তিনটা। বৈকালিক নিবেদনের পূর্বে আধঘণ্টা সময় এখনো হাতে। শিশুসুলভ আনন্দ ও উল্লাসে ফেটে পড়লেন শশী মহারাজ। আমাদের দুটো স্টোভ নিয়ে আসতে বললেন এবং নিজেই কিছু মিষ্টি ও সুস্বাদু খাবার তৈরি করলেন ভোগের জন্য। আমাদের মধ্যে তখন

দারুণ উত্তেজনা; খুব দ্রুত কাজ সেরে ফেলতে সবাই তখন তৎপর। ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় চারটা তখন বেশ কয়েক রকম খাবার প্রস্তুত হয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করে সেদিন আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল শশী মহারাজের প্রাণ।

এরই সমসাময়িক ঘটেছিল অপর একটি ঘটনা যার স্মৃতি আমার মনে আজও অম্লান। ঘটনাটি পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চাই এই কারণে যে, শশী মহারাজের মানসিক গতিপ্রকৃতির অভ্রান্ত দিশারী এই ঘটনা। ঘটনার কাল খুব সম্ভবত ঐ বছরেরই এপ্রিলের শেষ ভাগ। কোন এক তীব্র গুমোট রাত্রে আহারের পর বিছানায় শুয়ে আছেন শশী মহারাজ; আমি যথারীতি তাঁর গা-হাত টিপে দিচ্ছিলাম। যতদূর আন্দাজ, রাত তখন এগারটা, দুর্বিষহ গরম। হঠাৎ তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। কোমরের কাপড় শক্ত করে গুঁজে নিয়ে সটান চলে এলেন ঠাকুরঘরে। আমাকে আদেশ করলেন তাঁকে অনুসরণ করতে। যে-তক্তপোশের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি রাত্রিতে শয়ন দেওয়া হয়েছিল তার সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন এবং পাখা দিয়ে তাঁকে হাওয়া করতে লাগলেন। একটি বেদির উপর স্থাপিত স্বামীজীর ছবিতে হাওয়া করতে তিনি আমাকে আদেশ করলেন। একটানা প্রায় একঘণ্টা ধরে চলল বায়ুসেবা। এরপর অতি সন্তর্পণে নামিয়ে রাখলেন পাখাটি এবং নীরবে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকেও তাঁর অনুগমন করতে বললেন। শশী মহারাজের সামগ্রিক আচরণ আমার মধ্যে এই বোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হলো যে শ্রীরামকৃষ্ণ পটে সাক্ষাৎ বিরাজিত, তক্তপোশে তিনি নিদ্রিত এবং আমরা তাঁর সেবায় নিরত। নিশীথের এই গুরুসেবার 'পর তিনি এসে দাঁড়ালেন বাড়ির বাইরের বারান্দায়। চারদিক উন্মুক্ত; আমরা দুজন সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমি একটি চেয়ার নিয়ে এলে তিনি তাতে বসলেন। আমি তাঁকে হাওয়া করতে লাগলাম। রাত তখন গভীর এবং গরম অসহনীয় হলেও নিশীথের স্তব্ধতা, তটভূমিতে আছড়ে পড়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ছন্দোময় কলতান এবং চোখের সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত উজ্জ্বল জলরাশি—সব মিলিয়ে অতি মনোহর এক সম্মোহন রচনা করল। শশী মহারাজের কোন বাঙ্-নিষ্পত্তি হলো না। মন তখন তাঁর সুউচ্চ অতীন্দ্রিয় ভূমিতে। তাঁর ভাবভঙ্গিতে এই ইঙ্গিতই পাওয়া গেল। আমি নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলাম এবং তাঁকে অবিরাম হাওয়া করতে লাগলাম। এইভাবে কিছু সময় অতিক্রান্ত হলে তিনি সহসা আমার দিকে ঘুরে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "দেখ, আমার মন ঊর্ধ্বলোকে ধাবমান।

এভাবে বসে থাকলে আমি খুব শিগ্‌গির সমাধিস্থ হয়ে পড়ব।” আমি নীরব রইলাম এবং অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম তাঁর ভাবসমাহিত অবস্থার কথা। সম্ভবত এক ঘণ্টার বেশি সময় অতিবাহিত হলো এরূপ ভাবতন্ময়তায়। এরপর তিনি সাধারণ ভূমিতে নেমে এলেন। সম্ভবত তখন রাত দুটো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শশী মহারাজ বললেন, “চল, এখন আমরা গিয়ে বিশ্রাম করি।” আমার এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখার সুযোগ হয়েছিল।

“প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগুলিই চরিত্রের দর্পণ, যেখানে আমাদের ফাঁক-ফোকরগুলি ভেসে ওঠে”—বলেছেন স্মাইল; এবং তার এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। মহানুভব ব্যক্তিদের মহত্ত্বের আন্দাজ পেতে গেলে তাঁদের গৌরবদীপ্ত সাফল্যের খতিয়ানে যাবার প্রয়োজন নেই, বরং তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ আচার-ব্যবহার নিরীক্ষণ করেই সেই ধারণা লাভ সম্ভব। তুচ্ছ আচার-ব্যবহারই তাঁদের যথার্থ মহত্ত্বকে উন্মোচিত করে দেয় সর্বসমক্ষে। মহাজন-সান্নিধ্য যতই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে ততই তাঁর অকৃত্রিম স্বার্থহীনতা, অনাসক্তি, পবিত্রতা, শরণাগতি ও নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরসান্নিধ্যবোধ সম্বন্ধে নিবিড় পরিচয় ঘটবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। তিনি স্পষ্ট অনুভব করবেন যে, সেই মহাপ্রাণ ব্যক্তির পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে আছে বস্তুত এক অপার্থিব আনন্দ-সৌরভ এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরিত দ্যুতি প্রকৃতপক্ষে চেতনার আরোহিণী। উল্লিখিত ঐ দুটি ঘটনা এবং মঠের প্রাত্যহিক জীবনধারা আমাকে শশী মহারাজের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করল; পূর্ণ করে দিল আমার মানসকুম্ভ এক অননুভূতপূর্ব সম্ভ্রম ও প্রশংসায়। মাদ্রাজে আসার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য অলোকসামান্য সন্ন্যাসি-সন্তানদের কয়েকজনকে দর্শন করার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পরিধির বাইরের অনেক আধ্যাত্মিক শক্তিধর পুরুষ সম্বন্ধেও আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম। কিন্তু মাদ্রাজেই উপস্থিত হয়েছিল আমার জীবনের এক মহালগ্ন যখন শশী মহারাজের মতো মহাপুরুষের নিকট-সান্নিধ্যে থেকে তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যার সমস্ত খুঁটিনাটি চাক্ষুষ করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম।

সেই বছর জুলাই মাসের শুরুতে আমি দাক্ষিণাত্য ও মালাবার অঞ্চলে তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ ত্যাগ করি এবং সেপ্টেম্বরেই ভ্রমণ শেষ করে ব্যাঙ্গালোর হয়ে মাদ্রাজে ফিরে আসি। শশী মহারাজকে ঐ সময় খুবই ব্যস্ত দেখতে পাই। তিনি তখন মায়লাপুরে রামকৃষ্ণ মঠের নূতন পাকা বাড়ি নির্মাণের

জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কিভাবে সংগ্রহ করা যায় তাঁরই পরিকল্পনা করছিলেন। ফিরে এসেও দেখলাম মঠের গতানুগতিক জীবনযাত্রা, তবে স্বামী পরমানন্দ তখনো মাদ্রাজে ফেরেননি। শুনলাম, স্বামী অভেদানন্দজী নিউইয়র্কের কাজে সাহায্য করার জন্য পরমানন্দকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাইছেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঘটল একটি ছোট্ট ঘটনা যা আমার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিল গভীরভাবে। তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলছে এবং আমরা সব বাঙালি যুবক ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর (ঐ দিনটিতেই বঙ্গদেশ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়) অনশন সত্যাগ্রহ করার শপথ গ্রহণ করেছিলাম। ঐ একই দিনে বঙ্গভূমির প্রতি অবিচারমূলক এই কালাকানুন প্রত্যাহার করার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শনেরও সঙ্কল্প আমাদের ছিল। সঙ্ঘে যোগদানের পূর্বেই এই ব্যাপারে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম। সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে উপবাসী থেকে আমি প্রতিজ্ঞা পালন করতে চাইলাম। বিষয়টি শশী মহারাজের গোচরে আসতেই তিনি রুখে উঠলেন এবং আমাকে প্রচণ্ড তিরস্কার করলেন ধর্মসঙ্ঘে যোগদানের পরেও রাজনৈতিক প্রবণতার জন্য। শশী মহারাজ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, শুধুমাত্র রাজনীতির পথে চলে ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতা কখনোই করায়ত্ত হতে পারে না। তিনি আরো বললেন যে, স্বদেশ ও সামগ্রিকভাবে মানবজাতির সেবা আমি আরো সফল ও সার্থকভাবে করতে পারব, যদি আমার আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর নির্দেশিত পথে। রাজনৈতিক বিক্ষোভ-সমাবেশ পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট এবং ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সঙ্গে তা সঙ্গতিহীন, ইত্যাদি আরো অনেক কথা তিনি সেদিন বলেছিলেন। ভারতবাসীর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি তাঁর তীব্র অনীহা ছিল লক্ষ্য করার মতো। অবশ্য, তাঁর সেদিনকার যুক্তিজাল আমার মনে তখন রেখাপাত করতে পারেনি এবং আমি উপবাসী থেকে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য জেদ করতে লাগলাম। তবে আজ আমি বুঝতে পারছি, তাঁর ঐ ধরনের মনোভাব ছিল কত যুক্তিপূর্ণ। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, যখন একজন তরুণ ব্রহ্মচারী গুরুজনদের কাছে উপস্থিত হয়, প্রশিক্ষণ ও উপদেশলাভের আশায় তখন গুরুজনদের নির্দেশপালনে তার তরফে থাকা চাই নিঃশর্ত তৎপরতা। ঐকান্তিক শরণাগতি ভিন্ন শিষ্যত্ব পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না এবং গুরু শিষ্যের মধ্যে মহৎ ও কল্যাণকর কিছু প্রকৃতপক্ষে সঞ্চারিত করতে পারেন না। হিন্দু আদর্শ অনুযায়ী এই হলো শিষ্যত্বের মর্মবাণী এবং শশী মহারাজ এই বিষয়ে কোনরূপ শিথিলতায় ছিলেন একেবারে নারাজ।

আমার দুর্ভাগ্য, তাঁর ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করতে তখন আমি ছিলাম নিতান্ত অক্ষম। আধুনিকতাসুলভ বিপ্লবী-মনোভাব আমার হৃদয়কে তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই যখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, "তুমি যদি আমার নির্দেশ মেনে না চল তবে তোমাকে এস্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হবে; কোন অবাধ্যতার প্রশ্রয় আমি দিতে পারি না"—আমি তৎক্ষণাৎ আমার অল্প জিনিসপত্র যা কিছু ছিল সব গুছিয়ে নিয়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। ঠিক তখনই এলো স্বামী বিমলানন্দজীর আহ্বান। তিনি আমাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে গিয়ে প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে এই বিষয়ে আমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করলেন। বিমলানন্দ ছিলেন প্রেমিক সন্ন্যাসী। তাঁর ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি ও দরদী হৃদয়। তিনি আমার হৃদয়াবেগ ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়-উজাড়-করা সহানুভূতি ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি প্রয়াসী হলেন উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতি আমার দৃষ্টি খুলে দিতে, যে-সত্যের কাছে জাগতিক রাজনীতি তুচ্ছ হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে রয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। ঈশ্বরোপলব্ধিকেই আমি যদি জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে থাকি, তিনি বলেন—তবে আমার উচিত হবে সেই লক্ষ্যপথ আঁকড়ে থাকার জন্য সর্বান্তঃকরণে সচেষ্ট হওয়া এবং তুচ্ছ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জড়িয়ে পড়ে শক্তিক্ষয় না করা। তাঁর জোরালো যুক্তি মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলল এবং তৎক্ষণাৎ মনের ভার লাঘব করে মনে শান্তিবারি সিঞ্চন করল। আমি তাই বিমলানন্দজীর সঙ্গে মঠে ফিরে এলাম এবং শশী মহারাজের পায়ে লুটিয়ে পড়ে মার্জনা ভিক্ষা করলাম আমার সাময়িক বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য। শশী মহারাজ আমার এই মানসিক পরিবর্তনের কথা শুনে গভীর তৃপ্তিবোধ করলেন এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ-বিষয়ক প্রচলিত ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করে বিষয়টির উপর আলোকপাত করলেন। জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাক—তিনি এই আশীর্বাদ করলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, শশী মহারাজ আমাদের কখনোই মঠের ভেতরে রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা করতে দিতেন না। এমনকি মঠে খবরের কাগজের অনুপ্রবেশও বরদাস্ত করতেন না। একদিন কেউ একটি খবরের কাগজ নিয়ে এসে মঠের বারান্দায় বেঞ্চের ওপর ফেলে রেখে চলে যায়। শশী মহারাজ তা দেখতে পেয়ে আমাকে তৎক্ষণাৎ কাগজটি আবর্জনা-পাত্রে ছুঁড়ে ফেলতে বলেন। শুধু তা-ই নয়, খবরের কাগজের স্পর্শে অশুচি সেই স্থানে 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' উচ্চারণ করে কিছু গঙ্গাজলও ছিটিয়ে দিতে তিনি আমাকে আদেশ করলেন।

একথা তিনি প্রায়ই বলতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ খবরের কাগজে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করতে পারতেন না।

দেখতে দেখতে উপস্থিত হলো পবিত্র নবরাত্রি উৎসব। শশী মহারাজ নিজেই দুর্গাপূজার পদ্ধতি অনুযায়ী পূজা সমাপন করলেন। উৎসবের সমাপ্তি হলো নবমী তিথিতে হোমের পর। সমস্ত পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন হলো শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির সম্মুখে।

নবরাত্রির পর দীপাবলী। দীপাবলীর রাত্রিতে বাংলার সর্বত্র এবং রামকৃষ্ণসঙ্ঘের বিভিন্ন শাখা-কেন্দ্রে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শশী মহারাজ সেদিন উপবাসী থাকলেন এবং আমাকে ও যোগীনকে উপবাস করতে বললেন। পূজা আরম্ভ হলো রাত্রি দশটায়। এইসব বিশেষ তিথিতে বিস্তারিত কালীপূজার প্রচলিত প্রথা তিনি সে-রাত্রে অনুসরণ করলেন না। বলতে গেলে, সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অনুযায়ীই মাতৃ-আরাধনা সম্পন্ন করলেন। প্রায় মধ্যরাত্রিতে প্রজ্বলিত হলো পবিত্র হোমাগ্নি এবং শশী মহারাজ হোমাগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে আমাদের বসতে বললেন। হোমের প্রাথমিক ক্রিয়া সমাপনের পর তিনি ব্রতধারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলেন। এই ব্রতধারণ ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হবার জন্য একজন ব্রহ্মচারীর অবশ্যকর্তব্য। তিনি আমাদের আদেশ করলেন মন্ত্র পুনরাবৃত্তি করতে। সঙ্কল্পমন্ত্র পাঠের পর আমাদের গৃহীত প্রতিজ্ঞা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সাহায্য ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করে আবার যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হলো। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী নিজেই ব্রহ্মচর্য-দীক্ষার বিস্তারিত পদ্ধতিটি প্রণয়ন করেছিলেন প্রাচীন শাস্ত্রবিধান অনুসরণ করে। তিনি চাইতেন, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে প্রবর্তিত বৈদিক সন্ন্যাস অনুষ্ঠানের মতো ব্রহ্মচর্য-দীক্ষাও সঙ্ঘ প্রবর্তন করুক ব্রহ্মচারীদের জন্য। এই দীক্ষা উপনয়ন সংস্কার থেকে আকৃতি ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং যোগীন ও আমিই ঐ পদ্ধতি অনুসারে প্রথম ব্রতধারী ব্রহ্মচারী। এর পূর্বে আমাদের সঙ্ঘে ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল না।

সেই বছর নভেম্বরের প্রায় গোড়ার দিকে আমার কাছে নির্দেশ এলো পুরী চলে যাবার। সেখানে তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অবস্থান করছিলেন। আমাকে তাই অগত্যা মাদ্রাজ ত্যাগ করতে হলো এবং বিদায় জানাতে হলো পূজনীয় শশী মহারাজের পূত সঙ্গকে। বিদায়কালে এ তথ্য আমার অজানা ছিল যে, ঠিক পাঁচ বছরের ব্যবধানে আমাকে এখানে ফিরে আসতে হবে আমার

দুর্বল ও অপরিণত স্কন্ধে কর্মের গুরুভার বহন করতে, যে মহান কর্মযজ্ঞ শশী মহারাজেরই আরব্ধ ও দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত। যদিও শশী মহারাজের নিকট-সান্নিধ্যে ছিলাম বড়জোর ছ-মাস, কিন্তু আমার যুবক-মনে এই অল্প সময়ে যে গভীর ও অনপনেয় ছাপ তিনি ফেলেছিলেন তা আজ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হবার পরেও খুবই সজীব ও অম্লান। আমার ধর্মজীবনকে তিনি একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন এবং আমার চেতনার গভীরে সঞ্চারিত করেছিলেন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। সুতরাং এই বিষয়ে তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়ই বলতেন—'আমি পাঁচফুলের সাজি'। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চাইতেন যে তাঁর মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও আদর্শ বিরাজ করছে বিশুদ্ধ সমন্বয়ে, যেগুলি হিন্দুশাস্ত্রে 'ভাব'-শব্দে আখ্যাত। এ যেন এক সুদৃশ্য পুষ্পস্তবক, যেখানে শোভা পাচ্ছে বিচিত্র বর্ণের অগণিত পুষ্প; যেখানে বর্ণের বিচিত্রতা অপরূপ সুষমায় দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে। এবং আমরা দেখতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই বর্ণবৈচিত্র বিগ্রহায়িত ও পরিপূর্ণ অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর অন্তরঙ্গ-শিষ্যদের জীবনে। তাঁর কোন দুজন শিষ্যই অবিকল একই ছাঁচে ঢালা ছিলেন না। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক জীবনধারা ছিল স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনপথের প্রেরণা ও পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের নির্বিশেষ জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। এটাই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য-শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য। শিষ্যদের প্রত্যেকেই সহজাত ব্যক্তিগত মানসিক গঠন অনুযায়ী নিজ নিজ জীবনে পূর্ণ রূপায়িত করতেন আধ্যাত্মিক ভাবরাশির কোন একটিকে, যে-ভাবরাশি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তিমার্গের সাধনার ফলস্বরূপ আহরণ করেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ছিলেন ভক্তি প্রেমের সেই ধারার মূর্ত বিগ্রহ যা মহাকবি বাল্মীকি তাঁর রচিত রামায়ণ মহাকাব্যে হনুমান-চরিত্রে এঁকেছেন। রামকৃষ্ণানন্দজীরও ছিল অনুরূপ স্বার্থগন্ধশূন্য অকুণ্ঠিত ভক্তি। তার সঙ্গে ঘটেছিল বলিষ্ঠ তেজস্বিতার মণিকাঞ্চন সংযোগ যা তাঁর বিরুদ্ধাচারীর হৃদয়ে আসতো ভয়াবহতার অগ্রদূত হয়ে। তিনি ছিলেন বিশালকায়; তাঁর ছিল ওজস্বী ব্যক্তিত্ব, কুশাগ্র বুদ্ধি এবং হৃদয়টি ছিল স্নেহময়ী জননীর চেয়েও আরো বেশি কোমল। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলোকে চির-উজ্জ্বল এবং প্রদীপ্ত আননের বিচ্ছুরিত জ্যোতি প্রচণ্ড শক্তি ও নিঃশর্ত শরণাগতির এক আবহ সৃষ্টি করত। শশী মহারাজ ছিলেন মুখ্যত ভক্ত। কিন্তু তাই বলে নারীসুলভ ভাববিহ্বলতার অশ্রুপাত তাঁর মধ্যে ছিল না, ভক্তিমার্গে যা সহজেই

চোখে পড়ে। তেজস্বিতাই ছিল তাঁর চরিত্রের উপাদান। হিন্দুশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের বিচারে সঙ্ঘে তাঁর স্থান ছিল স্বামীজীর পরেই। অথচ তিনি ছিলেন শিশুর মতো সহজ সরল ও বিনয়ে মধুর। একথা বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর ভক্তি-উজ্জ্বল জীবন এক অনন্য বিশিষ্টতায় মণ্ডিত, আধুনিক ভারতের কাছে তা শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যুৎকৃষ্ট উপহার।*

অনুবাদক ঃ স্বামী জয়দেবানন্দ
সেবাদর্শে রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী প্রমেয়ানন্দ,
উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৭৫-১৮৬

[শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য স্বামী শর্বানন্দ (১৮৮৫-১৯৭০) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক বিশিষ্ট সন্ন্যাসী। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সঙ্ঘজীবন বরণ করার পর সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন ১৯১০ সালে স্বগুরুর কাছেই। সঙ্ঘ জীবনের আদিপর্বেই রামকৃষ্ণানন্দের নিকট-সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয় ১৯০৬ সালে, মাদ্রাজে। সেখানে প্রায় ছ মাস তাঁর সহকারিরূপে কাজ করার সুবাদে সাধু-জীবনের বনিয়াদ গড়ে ওঠে শর্বানন্দের। তিনি মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষপদে বৃত হন ১৯১১ সালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহাপ্রয়াণের পর এবং এক নাগাড়ে পনের বছর দক্ষতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেন। দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজ মঠরূপ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দীপশিখা—যার প্রজ্বালক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, ক্রমশ সমিদ্ধ হয়ে ওঠে তাঁরই অধ্যক্ষতায়। মাদ্রাজে বর্তমান মঠবাড়ি, পূজাগৃহ ও প্রকাশন-বিভাগ তাঁরই উদ্যমশীলতার নীরব সাক্ষী। সঙ্ঘের অন্যতম ইংরেজি মুখপত্র 'বেদান্ত কেশরী' ও তামিল মাসিক 'রামকৃষ্ণ বিজয়ম্'-এর প্রতিষ্ঠাতারূপে তাঁর বিজয়গৌরব ধ্বনিত। প্রাচ্যবাণী তথা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই সুদূর অতীতে। বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যের মণিকাঞ্চন সংযোগ হওয়ায় শর্বানন্দের প্রচার-পরিধি হয়েছিল বহু-বিস্তৃত। তামিলনাড়ু ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য ছাড়াও বহির্ভারতে শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশেও তিনি পদার্পণ করেছেন বক্তৃতা-সফরে। দিল্লি, মুম্বাই, করাচি, নাগপুর ও শ্রীলঙ্কায় মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্র স্থাপনে বিশেষভাবে উল্লেখ্য তাঁর ভূমিকা। তাঁর ইংরেজি ভাষায় অনূদিত ও টীকা-সম্বলিত উপনিষদ-গ্রন্থমালা সংস্কৃত-অজানা পাঠকবর্গের কাছে উপনিষদ-গাম্ভীর্যে প্রবেশের রাজপথ।]

---

* Golden Jubilee Souvenir, 1948, The Ramakrishna Math, Madras. pp. 16-24.

শশী মহারাজের স্মৃতি

স্বামী অম্বিকানন্দ

মঠে স্বামীজীর ঘরে যেখানে আয়নাটা সেখানে মহারাজ ধ্যান করছেন। আমিও বিপরীত দিকে বসে ধ্যান করছি। শশী মহারাজ মাদ্রাজ থেকে এসেছেন। তিনি ধুলোপায়ে ঠাকুর ও মহারাজকে প্রণাম না করে জামা খুলবেন না, মুখ, হাত, পা ধোবেন না। বসে আছেন মহারাজ বেরুলে প্রণাম করবেন। মহারাজ ১০.৩০টায় বেরুলেন। শশী মহারাজ এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, "রাজা, তোমার আবার এত ধ্যানট্যান কেন?" মহারাজ হেসে বললেন, "আরে ভাই, এই একটু কিছু করতে হবে তো?"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৯০

শশী মহারাজ সম্বন্ধে যা শুনেছি

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ

মঠে যোগদান করার সময় ঠাকুরের সন্তানদের সকলকে আমি পাইনি। কয়েকজন আগেই দেহত্যাগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শশী মহারাজ। শুনেছি, শশী মহারাজ ছিলেন সাক্ষাৎ ঠাকুর। আরও শুনেছি মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজকে) তিনি অদ্ভুত ভালোবাসতেন। ঠাকুরের সন্তানদের ভেতর মহারাজকে যাঁরা বুঝতে পারতেন শশী মহারাজ তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু আমি জানি না, তবে একটি ঘটনা তাঁর সম্বন্ধে শুনেছিলুম মঠে থাকাকালীন, সেইটিই বলছি। উমানন্দ নামে মহারাজের এক শিষ্য ছিলেন বেলুড় মঠে, তিনি মহারাজের সেবক ছিলেন। প্রথমবার মহারাজ যখন দাক্ষিণাত্যে যান উমানন্দ তখন মাদ্রাজ মঠের কর্মী। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি হাসপাতালে আছেন। অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে ওঠে। শশী মহারাজ রোজ সকালে হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে দেখে আসেন। মৃত্যুর দুই তিন দিন আগে মহারাজকে দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন, "জানি মহারাজ হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে আসতে নার্ভাস হতে পারেন। আমি তাঁকে ভেতরে আসতে বলব না। গাড়িতেই থাকবেন তিনি,

আমি একটিবার জানলা দিয়ে তাঁকে দেখব।" শশী মহারাজের মুখে সেকথা শুনেই মহারাজ বলে উঠলেন, "বল কি শশী? কত রকম রোগী সেখানে—আমার অসুখ হবে না!" পরপর দু-তিন দিন অনুরোধ করেও একই উত্তর পেলেন শশী মহারাজ। তাঁর খুব কষ্ট হলো। উমানন্দের শরীর চলে গেল। সকালবেলা ঘর থেকেই মহারাজ তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। শারীরিক কুশল জানিয়ে শশী মহারাজ আবেগভরে বলতে লাগলেন, "তুমি কি নিষ্ঠুর মহারাজ! উমানন্দও এখানকারই ছেলে। অন্তিমকালে একটিবার দেখতে চাইল, আর তুমি দেখা দিলে না?" বলতে বলতে তাঁর চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। মহারাজ গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং খানিক পরে আস্তে আস্তে বললেন—"শশী, চোখের দেখাটাই কি সব? আমি কি তার কাছে যাইনি?" সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করে বললেন, "মহারাজ, তোমাকে আমরা বুঝতে পারিনি।"

(স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকথা, সংকলক ও সম্পাদক—স্বামী চেতনানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২য় পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃঃ ৬৯-৭০)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিসুধা

স্বামী অম্বানন্দ

আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে আমি একজন ভালো লেখক নই, তবুও শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের মতো মহান ও পূত চরিত্রের মানুষের একান্ত অনুরাগিরূপে তাঁর স্মৃতিচারণ অতি আনন্দের সাথে করছি। এটি তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

যতদূর আমার মনে পড়ে ১৮৯৯ সালের নভেম্বর মাসে আমি শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও পরিচিত হবার পরম সৌভাগ্য লাভ করি মাদ্রাজের ক্যাসেল কার্নানে (বর্তমানে বিবেকানন্দ হাউসে)। তিনি আমাকে নারকেল নাড়ু প্রসাদ দিয়েছিলেন এবং কথাবার্তার মাঝে বললেন, "তোমার পড়ার ঘরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি রাখবে। তা হবে তোমার কাছে প্রেরণার উৎস ও আশীর্বাদ স্বরূপ। তাঁর কথানুযায়ী আমার বাড়িতে প্রায় প্রত্যেক ঘরেই শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি আছে এবং ভক্তিসহকারে তাঁকে পুজো করি। শ্রীরামকৃষ্ণ আমার জীবন সর্বস্ব।

অন্য আরেকদিন সাক্ষাতের সময় তিনি শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ দেন এবং বলেন, "বহু প্রাচীনকাল থেকে পুরী তীর্থক্ষেত্র রূপে পরিচিত। পুরী জ্ঞানভূমি। ঐ পবিত্র মন্দিরে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। সকল শ্রেণির মানুষ উচ্চ অথবা নীচ সবাই একত্রে বসে প্রসাদ গ্রহণ করে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই মহাপ্রসাদের সঙ্গে মিষ্টান্ন দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে বলতেন— 'এই প্রসাদ তোমাকে ভক্তি দিক।' শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসাদকে 'পরব্রহ্মণ' রূপে বলতেন।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে আরও কিছু প্রসাদ দিলেন। চৌদ্দ বছর ধরে আমি এই মহাপ্রসাদকে অমূল্য সম্পদ হিসেবে রেখেছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের এই মহাপ্রসাদ দিতাম এবং এর মহত্ত্ব সম্বন্ধে বলতাম।

১৯১৪ সালে পুরী যাবার পরম সৌভাগ্য লাভ করি। আমি মন্দিরে পূজা দিই এবং 'মহাপ্রসাদ' নিয়ে আসি যা আজও আমার কাছে আছে। এর মধ্যে দিয়ে রামকৃষ্ণানন্দজীর কথার প্রতি আমার আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি। এক সন্ধ্যায় যখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন দেখি তাঁর সঙ্গে আর একজন ভক্ত রয়েছেন। তিনি বলেন যে ঐ ভক্তটি শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক। সেবক ছিলেন স্বাধীনচেতা ও সৎ ব্যক্তি। তিনি কারোর সঙ্গে কখনো থাকেন না। কিন্তু তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে এখানে আছেন। কারণ তাঁর প্রতি ঐ ব্যক্তির ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

আমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা আমি আনন্দের সঙ্গে এখন বলব। সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন ত্রিবান্দ্রমের ডাঃ কে রমন থাম্পি ও শ্রী কে জনার্দন পিল্লাইও।

রামকৃষ্ণানন্দজী ঃ 'Immitation of Christ' বইটি আমার খুব ভালো লাগে। তোমাদের মধ্যে কারোর কাছে যদি বইটি থাকে, আমাকে কি দেবে?

আমরা সবাই শুনে অবাক হলাম। কারণ তার আগের দিনই আমরা ছ-আনা দিয়ে প্রত্যেকে একটা করে ঐ বই কিনেছিলাম।

আমি ভেবেছিলাম বইটির কিছু অংশ পড়ে তাঁকে দেবো। কিন্তু ডাঃ থাম্পি আমার কিছু করার আগেই পরের দিনই তাঁর বইটা তাঁকে দেবেন বললেন। রামকৃষ্ণানন্দজী খুশি হলেন। কিন্তু আমার মনে খুব দুঃখ হলো যে তাঁকে আমার

পাইটা তৎক্ষণাৎ দিতে পারলুম না। আমি ভাবলাম ডাঃ থাম্পি উঁচু মনের একজন মানুষ। আমার দুঃখ দূর করার জন্য মনে মনে ঠিক করলাম যে আমি রামকৃষ্ণানন্দজীকে ভগবানের পূজার জন্য কোন প্রয়োজনীয় জিনিস দেবো।

আমাদের পরীক্ষা শেষ হলো। বাড়ি যাবার আগে আমরা তিনজন রামকৃষ্ণানন্দজীকে প্রণাম করতে গেলাম। রামকৃষ্ণানন্দজী আমাদের ঠাকুর ঘরে নিয়ে গেলেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি দেখালেন। তিনি আমাদের পূজা কিভাবে করতে হয় তা বললেন। তিনি আমাকে বললেন, "মধুরাম, তুমি কি চন্দন কাঠ ও চন্দন তৈরির পাথরটি (পিঁড়ি) দেখতে পাচ্ছ? আমরা শুনেছি ত্রিবাঙ্কুরে উন্নত মানের চন্দন কাঠ পাওয়া যায়। তুমি কি খুব ভালো চন্দন কাঠ পাঠাতে পারবে?" আমি কিছু দেবার আশায় ছিলাম এবং তা করতে পারব ভেবে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আমি ঠাকুরের নাম স্মরণ করে প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জিনিসটি পাঠিয়ে দেব। রামকৃষ্ণানন্দজী আমাকেও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস দেবার সুযোগ করে দেওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করলাম। আমার গ্রাম কেরালার মাভেলিকারাতে পৌঁছে একটি ভালো জাতের চন্দন কাঠ কিনে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে ডাকযোগে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। পর পর তিনবছর এরকম চন্দন কাঠ তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমার বন্ধু স্বর্গীয় এম. কে. নারায়ণ পিল্লাই এটি নিয়ে যেতেন গরমের ছুটির সময়ে।

১৯০০ সালে আমার বিবাহের পরে আমরা তিনজন রামকৃষ্ণানন্দজীকে প্রণাম জানাতে মাদ্রাজে গিয়েছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল।

রামকৃষ্ণানন্দজী ঃ "তুমি কি বিবাহিত?"

আমি হ্যাঁ বললাম। আর বন্ধুরা না বললেন। তারপর তিনি 'ব্রহ্মচর্য'র সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করলেন এবং এতে আমি লজ্জিত ও হতাশ হলাম— মনে হলো যেন আমার গলায় কেউ পাথর চেপেছে। করুণাময় রামকৃষ্ণানন্দজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমিও ভাগ্যবান"। পুনরায় তিনি ব্রহ্মচর্যের কথা বললেন।

তখন আমি মনে মনে ভাবলাম পৃথিবীতে দু-শ্রেণির মানুষ আছেন, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ। প্রথমেই রামকৃষ্ণানন্দজী বললেন যে, ব্রহ্মচারীরা ভাগ্যবান। আর তার ঠিক পরেই বললেন যে গৃহীরাও ভাগ্যবান। তাই আমি সিদ্ধান্ত করলাম—

সকলেই ভাগ্যবান। সেই মুহূর্তে রামকৃষ্ণানন্দজী বলতে শুরু করলেন; "এটি ভগবানের ইচ্ছায় যে তুমি বিবাহ্ করেছো। সেজন্য আমি বলেছি তুমিও ভাগ্যবান।" আর সেইক্ষণেই আমার মনে পড়ল "প্রবুদ্ধ ভারত"-এ প্রকাশিত শ্রী বি. রাজম আয়ারের নিবন্ধে লিখিত কথা, "হে প্রভু, তোমার ইচ্ছা ভিন্ন একটি পরমাণুও চলতে পারে না।" একথা ভেবে আমি আশ্বস্ত হলাম যে ভগবৎ ইচ্ছা ভিন্ন কোন কাজই হয় না। ভগবান চালক, আর আমরা সবাই তাঁর যন্ত্রস্বরূপ। রামকৃষ্ণানন্দজীর মুখমণ্ডল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বন্ধুদের চেয়ে এতে আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান বলে মনে করেছিলাম। একথা শুনে আমি ভাবলাম রামকৃষ্ণানন্দজী একজন মহাত্মা এবং আমি জানি তাঁর কথা ফলবেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি কেন তিনি এরূপ বলেছিলেন।

রামকৃষ্ণানন্দজী আবার বলতে আরম্ভ করলেন—"ওদের নিজেদের বোঝা বহন করতে হয়। তুমি ভাগ্যবান যে তোমার জীবনের দায়িত্ব ও সহস্রাধিক বোঝা ভাগ করে নেবার জন্য আরেকজনকে পেয়েছ। সেজন্য আমি তোমাকে বললাম—তুমি বেশি ভাগ্যবান।" তিনি একটি উদাহরণ দিলেন। ষাঁড় ও মোষ উভয়েই গাড়ি টানছিল—ষাঁড় ডানদিকে আছে, মোষ বাঁ দিকে। ফলে গাড়িটি পড়ে গেল গভীর গর্তে। সেজন্য তিনি চাইছিলেন যাতে আমি আমার স্ত্রীকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহান জীবন ও শিক্ষার কথা বলি। তিনি আমাকে আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন—আমরা যেন দুজনেই সেই আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে সরল সাধারণ জীবন যাপন করি যা কিনা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এরপর থেকে এ সকল কথা গৃহস্থদের বলতাম যাঁদের ছিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি।

কিছুকালের মধ্যেই একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল আমি আমার স্ত্রীকে আর একবারই দেখেছিলাম এবং যা ঘটবার তা পাঁচমাস পরে ঘটল। ভগবৎ ইচ্ছায় আমি ও আমার স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের দ্বারা পৃথক হয়ে পড়লাম। দক্ষিণেশ্বরের সেই শক্তিময় মহাপুরুষ পাঁচমাস পর আমাকে আশীর্বাদ করলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৯০০)।

রামকৃষ্ণানন্দজীর অসীম কৃপায় ১৯১৪ সালে কলকাতায় যাবার এবং শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। শ্রীশ্রীমা তাঁর অসীম করুণা ও স্নেহ দ্বারা আমায় আশীর্বাদ করলেন। আমাকে তাঁর পূত চরণামৃত দিলেন। আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগোষ্ঠীতে নিয়ে নিলেন।

চিন্তাদ্রিপেট-এর রবিবারের ক্লাসে (৬টা থেকে ৮টা) শশী মহারাজের ভাগবত ব্যাখ্যা আমি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনতাম, তা আমাকে কাঞ্চন ত্যাগে উদ্দীপ্ত করেছিল। সাধারণত রামকৃষ্ণানন্দজী ৬ টা বাজার ১০ মিনিট আগে আসতেন এবং ব্যাখ্যা ২ ঘন্টা হতো। সেজন্য আমরা আমাদের স্নান সেরে প্রায় পৌনে একঘন্টা আগে সভাস্থলে যেতাম।

আমি খড়ম পড়তাম। এমনকি রামকৃষ্ণানন্দজীর সামনেও তা ব্যবহার করতাম। আমি যখন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতাম তখন প্রণাম করতাম না, তবে হাতজোড় করে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাতাম। কিন্তু তিনি তাঁর স্বাভাবিক ভদ্রতা ও নম্রতার সঙ্গে আমাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।

রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁর অসুস্থতার কারণে কিছুদিনের জন্য নিয়মিত পাঠ নিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি সবসময়েই ভক্তদের কাছ থেকে প্রশ্ন আশা করতেন এবং তার উত্তর দিতেন। এতে আমাদের অনেক সন্দেহ দূর হতো। তাই আমি বন্ধু ডাঃ রমন থাম্পিকে বলতাম যাতে তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীকে অনুরোধ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য পার্ষদদের সম্পর্কে অতীতের কথা বলতে। পর পর দুটি রবিবার রামকৃষ্ণানন্দজী এ সম্পর্কে অনেক মজার ঘটনা ও কথা বলেছিলেন। এটা মনে রাখা উচিত যে এ বিষয়গুলি নিয়ে কোন বই ছাপা হয় নি। একদিন তিনি বলার পর করজোড়ে বললেন যে আমরা যেন এসব কথা অবিশ্বাসী লোকদের কাছে না বলি। তখন থেকে আমরা জানতে পারলাম যে রামকৃষ্ণানন্দজীর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্যদের প্রতি কত গভীর বিনয় ও বিশ্বাস ছিল।

যদিও আগে আমার সেই সৌভাগ্য হয়নি তাঁর মতন মহান মহাপুরুষকে প্রণাম করবার, তবে আমি এখন অন্তরের গভীর আকুতির সঙ্গে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলাম পূর্বে তা না করার জন্য। এইভাবে আমার ত্রুটি শোধরাবার চেষ্টা করেছি।

স্বামী প... (তখন শ্রীকে পদ্মনাভন থাম্পি) এর বিশেষ আমন্ত্রণে রামকৃষ্ণানন্দজী একবার ত্রিবান্দ্রমে এলেন। আমার ছোট ভাই তখন ত্রিবান্দ্রমে ছিল। সে রামকৃষ্ণানন্দজীকে প্রণাম করতে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণানন্দজী তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে বলে যে মধুরামের ভাই সদাশিবন। আমার নাম শুনে খুশি হলেন এবং আমার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি আমার ভাইকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর সঙ্গে আমায় দেখা করতে বললেন।

সদাশিবন আমাকে তা লিখে জানায় এবং আমি রামকৃষ্ণানন্দজীর সাথে দেখা করার জন্য খুব শিগ্‌গিরই ত্রিবান্দ্রমে যাই। আমি ইঞ্জিনিয়ার শ্রী থানু পিল্লাইকে নিয়ে রামকৃষ্ণানন্দজীর বাসস্থান 'ঘোষভবন'-এ দেখা করতে গেলাম। আমরা তাঁকে দেবার জন্য ফল ও মিছরি নিয়ে ছিলাম। আমরা যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম ও কথা বললাম সে সময়ে তিনি আমাদের বললেন যে তিনি ভগবানের ভোগ রাঁধার জন্য যাচ্ছেন।

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভোগ না দিয়ে কিছুই খেতেন না। তিনি ট্রেনে বা গাড়িতে গেলেও এই নিয়মই কঠোরভাবে পালন করতেন।

ত্রিবান্দ্রমে দুই সন্ধ্যায় তাঁর গীতা ব্যাখ্যা আমরা শুনেছিলাম। আমরা ভাষায় বোঝাতে পারব না যে তিনি আমাদের কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর ওই আলোচনায় আমরা প্রভূত মানসিক শান্তি ও আনন্দ পেয়েছিলাম।

অনুবাদক ঃ স্বামী দিব্যসুধানন্দ

বেদান্ত কেশরী, আগস্ট, ১৯৭৮ (পৃঃ ২৯৪-২৯৬)

[স্বামী অম্বানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম মধুরম্ (১৮৭৪-১৯৫১)। তিনি ছিলেন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের অন্যতম ভক্ত। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। নাগেরকয়েলে প্রতিষ্ঠিত নিজের আশ্রমে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। এই স্মৃতিকথাটি কন্যাকুমারী জেলার ভেল্লিবালাই (বেলুড় মঠের অধীন নয়) আশ্রমের স্বামী মধুরানন্দের নিকট প্রাপ্ত]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কথা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

(১)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্মোৎসবের দিন সন্ধ্যারতির পর বেলুড় মঠের ভিজিটার্স রুমে স্মৃতিসভা হইয়াছে। পুরাতন 'উদ্বোধন' হইতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী পঠিত হইল। তৎপরে পূজনীয় সুধীর মহারাজ তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলিলেন ঃ "পূজাতে তাঁর অদ্ভুত নিষ্ঠা আলমবাজার মঠে আমরা দেখেছি। তখন আমি সাধু হইনি। একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার রাত্রে আলমবাজার মঠে সকাল থেকে আরম্ভ করে পরের দিন সকাল পর্যন্ত অবিরাম পূজা চলেছিল। শশী মহারাজ পূজা করেছিলেন। তখন সন্ধ্যারতির সময় 'ভজ শিব ওঁঙ্কার' এই গান হতো। শশী মহারাজ উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতেন। পাড়ার লোকেরা অস্থির হয়ে উঠত। পাড়ার মধ্যেই মঠ ছিল কিনা। তিনি সংস্কৃতে খুব পণ্ডিত ছিলেন। একবার ট্রেনে আসতে একখানি সংস্কৃত নাটক (হনুমৎ নাটক) পড়তে পড়তে এসেছিলেন। স্বামীজীর লেখা তাঁর কাছেই আমরা দেখে দিতে পাঠাতাম। 'ওঁ হ্রীং' স্তবটি প্রমথনাথ তর্কভূষণের নিকট সংশোধনের জন্য দেওয়া হয়েছে শুনে তিনি চটে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, স্বামীজীর কি ভুল ধরতে হয়? ওসব আর্যপ্রয়োগ। তবে একদিন আরতির সময় শুনেছিলাম তিনি উক্ত স্তবের অশুদ্ধ অংশগুলি নিজে শুধরে শুধরে আস্তে আস্তে পাঠ করেছিলেন, যাতে অপরে শুনতে না পায়। নানা তীর্থাদি ভ্রমণ না করে এক জায়গায় বসে ঠাকুরের কাজ নিয়ে থাকলেও যে ধর্ম লাভ হয়, শশী মহারাজের জীবন থেকে আজ এটি আমাদের বিশেষ করে শেখবার। তিনি কাশী পর্যন্ত যাননি গুরুপূজা ছেড়ে। রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে যে কয়েকবার গিয়েছিলেন তা তাঁর নিজের ঐসব তীর্থ দেখার ইচ্ছার জন্য নয়। তবে শ্রীশ্রীমা এবং মহারাজ যখন মাদ্রাজ গিয়েছিলেন তখন তাঁহাদিগকে দেখাবার জন্য ঐ সকল তীর্থে তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন।"*

(২)

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ছোট একখানা চৌকিতে বসিয়া আছেন। শশী মহারাজ ব্যস্ত হইয়া কি কাজে দরজার বাহিরে যাইতে ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে

* স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক ২০/৭/৩৩ তারিখে বেলুড় মঠে কথিত।

যাইতে বাধা দিলেন এবং তিনবার এই কথাটি বলিলেন, "দেখ, তুমি যাঁকে খুঁজছ সে এই, (নিজের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া) সে এই, সে এই।"

কাশীপুর বাগানে একদিন শীতকালে গভীর রাত্রে ঠাকুরের কমোড পরিষ্কার করিতে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া শশী মহারাজ বাইরে গেলেন। আসিয়া দেখেন, ঠাকুর কোন মতে হামাগুড়ি দিয়া একপাশ হইতে একখানা লাঠি লইয়া আলনা হইতে একখানা গায়ের কাপড় টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। শশী মহারাজ বড় দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন, "হায়! হায়! আমি অসাবধানতাবশত ভালো করিয়া এঁকে ঢাকিয়া দিই নাই। শীত লাগিয়াছে, তাই বুঝি ঠাকুর অমন করিতেছেন।" ঠাকুরকে বলিলেন, "আপনি কেন আমাকে বললেন না?" ঠাকুর বলিলেন, "তোমার গায়ে দেব বলে ওটি আনছিলাম, আমার শীত করছে না।" মাদ্রাজে শশী মহারাজ অধিকাংশ সময় নিজেই ঠাকুরের পূজা ও সেবাদি করিতেন। তাঁহার চাল চলন, ব্যবহার দেখিয়া মনে হইত বাস্তবিকই তিনি প্রত্যক্ষ ঠাকুরের সহিত ব্যবহার করিতেছেন! একবার রাত্রে ঠাকুরের শীতল দেবার কিছুই ছিল না। তিনি ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন। রুদ্র মহারাজ বলিতেছেন, "কি হবে?" তিনি বলিতেছেন, "আচ্ছা, দেখাই যাক না।" অবশেষে রাত্রি প্রায় নয়টার সময় একজন ছাত্র ময়দা, ঘি, নারিকেল, চিনি প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত। মাঝে মাঝে ঠাকুরের উপর রাগ-অভিমানও করিতেন। কখনও রাগ করিয়া ঠাকুরের ছবির দিকে অগ্রসর হইতেন। কখনও বা রাগ করিয়া বলিতেন, "তুমি কেন কষ্ট দিচ্ছ আমাকে? অমুক অমুক খারাপ ব্যবহার করিল বা অমুক কড়া কথা বলিল, তার জন্য সে তো দায়ী নয়—তোমারই তো এসব কাজ।"

ঠাকুরের ভোগ পূজাদি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সম্পন্ন হইত। দিনের ভোগ দিয়া আধঘণ্টা, জলখাবার দিয়া দশমিনিট, রাত্রের ভোগের সময় কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করিবার নিয়ম ছিল।*

(৩)

শশী মহারাজ বলিতেন, "ঠাকুর ও মা অভেদ, যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি।" শ্রীশ্রীমা মাদ্রাজে গেলে ঠাকুরের থালা বাসন তাঁহার জন্য বাহির করিয়া

---

* বেলুড় মঠে ১৪/১/৩৩ তারিখে স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখ সাধুবৃন্দের সমক্ষে স্বামী ধ্যানানন্দ কর্তৃক কথিত।

দিয়াছিলেন। গেলাসে জল খাইয়া মা অবশ্য বলিয়াছিলেন, "এ গেলাসে আর ঠাকুরকে দিও না।" শশী মহারাজ মায়ের আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।

শশী মহারাজ বলিতেন, "স্বামীজী হচ্ছেন জগদ্‌গুরু। তাঁদের বক্তৃতা প্রভৃতি দেওয়া সাজে। আমাদের ওসব করা মানে বানর যেমন মানুষকে দাঁতন করিতে দেখিলে তার পরিত্যক্ত দাঁতন কাঠিটি লইয়া নিজের দাঁতে ঘষিতে থাকে সেইরূপ বাঁদরামো।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিজে বসিয়া বসিয়া প্রসঙ্গাদি করিতেন। ঠাকুরের ভোগ হইবার পর স্বামীজীর নিকট পাঁচ মিনিট রাখা হইত, তাহার পর সে ভোগ বাহির হইত।

রামকৃষ্ণানন্দজী বলিতেন, "স্বামীজীর সমস্ত গ্রন্থাবলী অনন্ত !" বেলুড় মঠে আসিলে তিনি ধুলো পায়ে ঠাকুর প্রণাম করিতেন। যদিও সকল গুরুভ্রাতাকে তিনি গভীর ভাবে ভালোবাসিতেন, তথাপি ব্রহ্মানন্দজী এবং প্রেমানন্দজীকে তিনি ভক্তি করিতেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কারণ এই দুই গুরুভ্রাতাকে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন। তাহার কারণ বোধ হয় এই ব্রহ্মানন্দজী ছিলেন ঠাকুরের মানস পুত্র, তাঁহার অশেষ স্নেহের পাত্র এবং একমাত্র প্রেমানন্দজীকেই ঠাকুর ভাবাবস্থায় তাঁহার দেব-দেহ স্পর্শ করিতে দিতেন। শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) দীর্ঘকাল মাদ্রাজে শশী মহারাজের সেবা ও সঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তিনি অখণ্ড ব্রহ্মচারী ও পূর্ণ কামজয়ী ছিলেন।"

শশী মহারাজ বলিতেন, "স্বামীজীর বক্তৃতার পর আর কাউকে নূতন কিছু বলতে হবে না। তাঁর বক্তৃতাবলী আমাদের সম্বল।" শশী মহারাজ মাদ্রাজ মঠে ঠাকুরের পূজায় প্রায় সমস্ত সকালটা কাটাইতেন। তিনি যখন পূজা করিতেন তখন একজন ব্রহ্মচারী তটস্থ থাকিতেন। তিনি পূজাকালে যখন যাহা চাহিতেন তৎক্ষণেই তাহা দিতে হইত, দেরি সইত না। পূজার আসনে যতক্ষণ বসিতেন ভাবস্রোত নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য সর্বদা মুখে 'জয়গুরু' উচ্চারণ করিতেন। ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষ (God is a person) এইভাবে আরূঢ় হইয়া তিনি পূজা করিতেন। রাজা মহারাজকে এত ভক্তি করিতেন ও ভালোবাসিতেন যে, একবার রাজা মহারাজের অসুখ শুনিয়া তিনি মাদ্রাজ মঠের ঠাকুর ঘরের ছবি ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "এবার যদি রাজার অসুখ না সারে তোমাকে সমুদ্রে বিসর্জন দেব। শীঘ্র রাজার অসুখ সারিয়ে দাও।" গরম দুধ ঠাকুরকে ভোগ দিতে লইয়া যাইতেন, দুধে আঙ্গুল দিয়া দেখিতেন দুধ কত গরম। দুধ খুব গরম থাকায় তাঁর আঙ্গুলে ফোস্কা পড়ে যায়। ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুরকে অভিমান ভরে

বলছেন, "আবার গরম দুধ খাওয়া চাই!" রাত্রিতে একদিন নিজের মশারিতে মশা ঢুকে গিয়েছিল। তিনি গভীর রাত্রে উঠে মশারি তুলে ঝাড়ছেন। হঠাৎ মনে হলো, আজ এত মশা, নিশ্চয়ই ঠাকুরের মশারিতেও মশা ঢুকেছে। অমনি ঠাকুর ঘরের তালা খুলে ঠাকুরের মশারি ঝেড়ে দিতে এলেন। ঠাকুর তাঁর কাছে এত জাগ্রত ও জীবন্ত ছিলেন!

শশী মহারাজের শাসন কত কঠোর ছিল তাহা নিম্নোক্ত দুইটি ঘটনা হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইবে ঃ মাদ্রাজ মঠের অদূরেই ডাকঘর অবস্থিত। রুদ্র মহারাজ কোন কাজের জন্য ডাকঘরে গিয়াছিলেন, কিন্তু পোস্টমাস্টারের সহিত কথাবার্তায় তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হয়। শশী মহারাজ বিলম্ব দেখিয়া ডাকঘরে যাইয়া পোস্ট মাস্টারের সম্মুখেই উক্ত ব্রহ্মচারীকে ভর্ৎসনা করেন। আর একবার রুদ্র মহারাজ একটি চিঠি লিখিতেছেন এবং শশী মহারাজ ঠিকানাদি বলিয়া দিতেছেন। চিঠিখানি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর পোর্টব্লেয়ারে যাইবে। রুদ্র মহারাজ ঠিকানাটি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ভুলক্রমে একটি শব্দ বাদ পড়িয়া যায়। ঠিকানাটি পড়িয়া শুনাইলে শশী মহারাজ যখন দেখিলেন যে, তদুক্ত একটি শব্দ বাদ পড়িয়াছে, তখন তিনি পত্রলেখককে ভর্ৎসনা করেন। শশী মহারাজ চেয়ারে এবং রুদ্র মহারাজ তাঁহার সম্মুখে একটি টুলে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার হাতের কলমটি পড়িয়া শশী মহারাজের পায়ে বিঁধিয়া রক্তপাত হয়। রুদ্র মহারাজ উঠিয়া শশী মহারাজের পায়ের রক্ত মুছিয়া ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া দেন। তখন শশী মহারাজ বলিলেন, "তুমি যা ঠিকানা লিখেছিলে তাতে চিঠি যেতো, আমি জানতাম। কিন্তু আমরা যেমনটি বলি তেমনটি করো, তাতে তোমাদের অশেষ কল্যাণ হবে।"*

শশী মহারাজের শাসন যেমন কঠোর ছিল তাঁহার স্নেহ-ভালোবাসাও তেমনি গভীর ছিল। আহার করিবার সময় একটি আম মুখে দিয়া যখন দেখিতেন উহা সুমিষ্ট তখনি তাহা পাশে উপবিষ্ট ব্রহ্মচারীর পাতে তুলিয়া দিতেন। তিনি মঠবাসিগণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যুবক ব্রহ্মচারিগণকে গৃহের সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে উপদেশ দিতেন। পূর্বস্মৃতি সাধুজীবনের বিশেষ অন্তরায়। একবার বসন্ত মহারাজ (স্বামী পরমানন্দ) বাড়ি গিয়াছিলেন। বরিশাল জেলার বানরিপাড়া গ্রামে তাঁহার পিতা আনন্দমোহন গুহঠাকুরতা বাস করিতেন। বসন্ত মহারাজ তখন বালক

---

* স্বামী যোগেশ্বরানন্দ কথিত।

মাত্র। শশী মহারাজ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন। গৃহে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে কয়েকখানি নূতন পরিধেয় বস্ত্র এবং সিল্কের উত্তরীয় দিয়াছিলেন। বসন্ত মহারাজ সেইগুলি লইয়া মাদ্রাজ মঠে গিয়াছেন। শশী মহারাজ নূতন কাপড়গুলি দেখিয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন এবং ঐগুলি আনিতে বলিলেন। কাপড়গুলি আনিতেই শশী মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিল্কের চাদরটি কাকে দিয়েছেন?" বসন্ত মহারাজ ভয়ে বলিলেন, "ওটি আপনাকে।" তখন শশী মহারাজ উক্ত চাদরটি চাহিয়া লইলেন এবং যে কাপড়গুলি পিতামাতা পুত্রের জন্য দিয়াছিলেন সেগুলি ফেলিয়া দিতে বলিলেন। কাপড়গুলি ফেলিয়া দেবার পর শশী মহারাজ বলিলেন, "সন্ন্যাসজীবন রক্ষার জন্য গৃহের সকল স্মৃতি মুছে ফেলতে হবে।"

আলমোড়া রামকৃষ্ণ কুটিরের রাম মহারাজ একবার বেলুড় মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সাধুদিগের পতন সম্বন্ধে। শশী মহারাজ তদুত্তরে উত্তেজিত হইয়া এই আখ্যায়িকাটি বলিয়াছিলেন, "সমুদ্র পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া একজন দেখিতেছে যে, জনৈক তীর্থযাত্রী হিমালয়ের পথে চড়াই ও উতরাই অতিক্রম করিয়া কেদার-বদ্রীর অভিমুখে যাইতেছে। আপাতদৃষ্টিতে যাহা অবতরণ, প্রকৃত দৃষ্টিতে তাহাই উচ্চতর আরোহণের আয়োজন মাত্র। এই সকল অবতরণ তাহাকে ক্রমশ ঊর্ধ্বতর শৃঙ্গে আরোহণ করাইয়া অবশেষে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু, সমুদ্রপৃষ্ঠে বা পর্বতমূলে দণ্ডায়মান ব্যক্তি যেখানে ছিল সেইখানেই আছে; সে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে নাই। কেদার-বদ্রীযাত্রী আপাত অবতরণ সত্ত্বেও উচ্চতর পর্বতে আরোহণ করিয়া গন্তব্য পথে উপস্থিত হইল। সাধুর পতন প্রকৃত পক্ষে প্রারব্ধ ক্ষয় বা সংস্কার নাশ মাত্র। তাঁহার পতন বা অবনতি স্থূলদৃষ্টিতে বিচার্য নহে।" শ্রীশ্রীমাও বলিতেন, "নাটাইতে সুতা জড়ান বা খোলা দূর হইতে একই প্রকার দৃষ্ট হয়।" যে কর্ম অপরের কর্মবন্ধন সৃষ্টি করে, সাধকের জীবনে সেই সকল কর্মসংস্কার ক্ষয় করে মাত্র। এই জন্য শ্রীভগবান গীতাতে বলেছেন যে, যোগভ্রষ্ট সাধক শুদ্ধাচারী শ্রীমানের গৃহে বা যোগীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্বজন্মে যেখানে সাধনা বন্ধ হইয়াছিল সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া দ্রুতবেগে উন্নত এবং সাধনান্তে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হন।"

(উদ্বোধন : ৪৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা)

ব্রহ্মদেশে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার উৎসাহে এবং স্থানীয় বাঙালি ভক্তগণের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সমিতি স্থাপিত হয়। উক্ত সমিতি কর্তৃক প্রত্যেক বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সমিতি রামকৃষ্ণোৎসবে বক্তৃতাদি প্রদানের জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আহ্বান করেন। স্বামীজী তদনুযায়ী মাদ্রাজ হইতে ১৬ মার্চ জাহাজে চড়িয়া ২০ মার্চ রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। রেঙ্গুনের গভর্নমেন্ট হাউসের ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিথিরূপে তিনি তথায় পাঁচ দিন ছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দই ব্রহ্মদেশে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম প্রচারক। রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র[১] দিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাদ্রাজস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ
শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ

মহাত্মন্,

আমরা রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ সেবক সমিতির সভ্যগণ এই শহরে আপনার শুভাগমন উপলক্ষে আপনাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাইতেছি।

বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই সীমান্ত দেশ বর্মা ও ভারতের মধ্যে পুরাকাল হইতেই ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ বিদ্যমান। আমাদের পূর্বপুরুষগণই বৌদ্ধধর্মের পবিত্র আলোক সমুদ্রপারে এই সুদূর দেশে বহন করিয়াছিলেন। ইহা পরম গৌরব ও পরিতোষের বিষয় যে, বহু শতাব্দী পরে আমাদের এই জাতীয় অবনতির দিনেও আপনার মতো

---

১ মূল ইংরেজি অভিনন্দনটি 'ব্রহ্মবাদিন্' নামক মাদ্রাজের অধুনালুপ্ত ইংরেজি মাসিকে ১৯০৫, মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমাদেরই এক সুযোগ্য স্বদেশবাসী ধর্মপ্রচারের জন্য পুনরায় এই সুন্দর প্যাগোডার দেশে পদার্পণ করিয়াছেন।

আপনাকে আমাদের পরমাত্মীয় মনে হইতেছে। আপনার জীবনে প্রাচীন হিন্দুর ত্যাগাদর্শ যেমন মূর্ত হইয়াছে তেমনি লোককল্যাণার্থ সেবাধর্মও জীবন্ত হইয়াছে। আপনার বিশ্ববিশ্রুত গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ যে মহৎ কর্ম আরম্ভ করিয়াছেন সুদূর ভবিষ্যতে তাহার যে পূর্ণ পরিণতি হইবে তাহার কিঞ্চিদাভাস আমরা আপনার কর্মে দেখিয়া পরমানন্দিত হইয়াছি।

দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে মহাত্মা শঙ্করাচার্য যে বিরাট ধর্মরাজ্যের পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা এবং প্রায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেইরূপ আপনি এবং বিবেকানন্দ প্রমুখ আপনার শক্তিশালী গুরুভ্রাতাগণ যে বিপুল ধর্মসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাপূর্বক জগতে হিন্দুধর্মের প্রকৃত মহিমা প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র হিন্দুজাতি গৌরবান্বিত ও জাগ্রত হইতেছে।

মহাত্মন্, আপনার নাম, আপনার কার্য এবং আপনার জীবন আমাদিগকে আপনার গুরু মহাপুরুষ ও ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের অভূতপূর্ব জীবনী ও অমৃতময় বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবী ও স্বাস্থ্যবান হইয়া হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানরূপ মহৎ কর্ম সুসম্পন্ন করিয়া হিন্দুজাতিকে সঞ্জীবিত করুন।

আপনার গুণমুগ্ধ ও একান্ত অনুরক্ত
রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ সেবক সমিতির সভ্যগণ
রেঙ্গুন, ২০ মার্চ, ১৯০৫

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ এপ্রিল সংখ্যায় এবং ‘ব্রহ্মবাদিন্’ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায়, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ রেঙ্গুনে অবস্থানকালে সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত প্রত্যহ ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন এবং উৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতা ব্যতীত আরও চারিটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ভি. এন. শিবায়, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে ‘বেদ ও বেদান্ত’ শীর্ষক বক্তৃতাটি সুলে প্যাগোডা রোডস্থিত ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত হয়। হিন্দু সোসিয়াল ক্লাবে ‘ভক্তি’ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা স্বামীজী দিয়াছিলেন তাহাতে সভাপতি ছিলেন এস.সি.দত্ত, এম-এ, বি-এল। থিয়োজফিক্যাল সোসাইটিতে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহার বিষয় ছিল ধর্মসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন; উহাতে পৌরোহিত্য

করেন রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যারিস্টার বি কাওয়াসজি। দুঃখের বিষয় উক্ত বক্তৃতাবলীর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

বর্তমানে রেঙ্গুনে যেখানে হাইকোর্ট অবস্থিত তাহারই সন্নিকটে একটি প্রশস্ত গৃহে স্বামীজী ছিলেন। গৃহের সম্মুখেই খোলা মাঠের উপর বৃহৎ চাঁদোয়া দিয়া উৎসব মণ্ডপ নির্মিত হইল। ঠাকুর সাজাইবার জন্য গভর্নমেন্ট হাউসের বাগান হইতে আনীত সুন্দর লতাপাতা ও ফুল দিয়া একটি নিকুঞ্জবন প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে কারুকার্যখচিত সিংহাসনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার দুইপার্শ্বে স্বামী বিবেকানন্দ ও সারদাদেবীর প্রতিকৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। দরিদ্র-নারায়ণ সেবা উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত চাল, ডাল প্রভৃতি দেখিয়া দরিদ্রদের সম্বন্ধে জনৈক যুবক একটি খারাপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। দরিদ্রগণের মধ্যে অধিকাংশই দানের অযোগ্য এবং ভিক্ষাকে অর্থোপার্জনের অন্যতম উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে—এই মন্তব্য শুনিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সহাস্যে বলিলেন, "ভিখারি ও দুঃখী দরিদ্রদের দরিদ্র-নারায়ণ বলে ডাকবে। এই নাম স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তন করেছেন। দরিদ্র-নারায়ণদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভেদ এনো না। তারা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান ভেবে তাদের সমান ভালোবাসা দিয়ে সেবা করো। এদের সেবা করার সুযোগ পেলেই নিজেদের ধন্য মনে করবে। ভিখারিদের ঘৃণা করো না; কারণ আমরা ওদের চেয়ে কম ভিখারি নই। ওরা কত অল্পে সন্তুষ্ট।" ঐদিন প্রায় তিনশত দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষপূর্বক খাওয়ান হইয়াছিল।

উৎসবের দিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আদেশে সমিতির কর্মিগণ প্রত্যুষে উঠিয়া স্নানান্তে ঠাকুরঘরের কাজে নিযুক্ত হইলেন। স্বামীজী স্বয়ং নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গিরীন্দ্রনাথ সরকারকে লইয়া বাহাদুর রামদাস ভট্টাচার্যের বাগান হইতে নাগেশ্বর চাঁপা ফুল আনিবার জন্য চলিলেন। এই ফুল ভগবান রামকৃষ্ণদেব খুব ভালোবাসিতেন। সেইজন্য ঐ ফুল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বামীজী তাঁহার বিপুল বপু লইয়া ৩/৪ মাইল পথ হাঁটিতে স্বীকার করিলেন। পথে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (তখন অখ্যাতনামা যুবকমাত্র) তাঁহাদের সহিত জুটিলেন। স্বামীজী একটি বিশেষ ফুলের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন দেখিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহাকে রাস্তায় কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত পূজা করেন কেন?"

স্বামীজী—পূজা করে বড় আনন্দ পাই।

শরৎচন্দ্র—পূজা করাই কি শ্রেষ্ঠ উপাসনা?

স্বামীজী—সর্বত্র ভগবদ্দর্শনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ধ্যান মধ্যম, স্তব ও জপ অধম।

শরৎচন্দ্র—তবে লোকে এত আড়ম্বর করে পূজা করে কেন?

স্বামীজী—পূজা জিনিসটা বাইরের মোটেই নয়, অন্তরের। সাধারণ লোকে ভগবানের তুষ্টির জন্য ভয়ে বা কামনা পূরণের জন্য মানসিক করে পূজা অর্চনা করে; এসকল বড়ই তুচ্ছ। ভগবানের উপর ভালোবাসা না এলে, তাঁর দর্শনের জন্য অশ্রুপাত না হলে তাঁর পূজা হয় না। বিষয়ী লোকেদের পূজা, জপ, তপ ক্ষণিক; তারপর আর তাদের কিছু মনে থাকে না। কিন্তু প্রকৃত ভক্তরা শ্বাস-প্রশ্বাসে ভগবানের নাম জপ বা চিন্তা করেন এবং ফুল, পাতা, জল, ফল এইসব দিয়ে নিষ্কামভাবে তাঁর পূজা করে ভক্তিভরে বলেন—

"পূজা উপাসনা সকলি গো ফাঁকি।
শুধু এই সুযোগে তোমারেই গো ডাকি॥"

সকলে রামবাবুর বাগানে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি নাগেশ্বর চাঁপা ফুলের গাছে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়াছিল। তাহাদের সৌরভে ও সুষমায় বাগানটি যেন নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছিল। ফুলগুলি দেখিতে প্রায় সাদা গোলাপের মতো। বাগানের বর্মী মালি গাছে উঠিয়া ফুলভরা কয়েকটি ডাল ভাঙ্গিয়া দিল। স্বামীজী তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া একটি লম্বা বাঁশের সাহায্যে সহস্তে কয়েকটি ফুল তুলিলেন। সুদূর ব্রহ্মদেশে তাঁহার আরাধ্য দেবতার প্রিয় পুষ্পগুলি স্বহস্তে চয়ন করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি খুশি হইয়া বর্মী মালিটিকে কিছু বকশিশ দিলেন এবং জানিয়া লইলেন যে ঐ ফুলের বর্মা নাম গাড়্। প্রবাদ আছে, এই ফুল ভগবান বুদ্ধদেবের অতিশয় প্রিয় ছিল।

উৎসবমণ্ডপে ফিরিয়া স্বামীজী দেখিলেন লাটপ্রাসাদের মালি এক ঝুড়ি সুন্দর গোলাপফুল আনিয়াছে। এতগুলি ফুল পাইয়া তিনি আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া উঠিলেন এবং স্বয়ং বিবিধ পুষ্পে ও পুষ্পমাল্যে ঠাকুরকে সাজাইলেন। একটি কীর্তনের দল আসিয়া সংকীর্তন আরম্ভ করিল। কীর্তনান্তে ঠাকুরের ভোগ ও আরতি হইল। আরতির সময় খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা ও বর্মী বাদ্য তালে তালে বাজিতে লাগিল। সকলের সমবেত 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে উৎসবমণ্ডপে আনন্দের স্রোত বহিল। থারাবড়ি, পেগু ও ব্রহ্মদেশের

অন্যান্য স্থান হইতে অনেক ভক্ত উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। দূরাগত ও স্থানীয় প্রায় একশত ভক্তের সহিত স্বামীজী মধ্যাহ্নে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। উৎসবান্তে সকলে 'জয় ভগবান রামকৃষ্ণদেব কী জয়' 'স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ কী জয়' ধ্বনি করিয়া চলিয়া গেলেন।

স্বামীজী অবসরমত রেঙ্গুনের প্রধান দর্শনীয় বস্তুগুলি দর্শন করিয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত সোয়েডাগন প্যাগোডা দেখিতে যান। উক্ত প্যাগোডা বৌদ্ধজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির। এইরূপ সুবৃহৎ, সুদৃশ্য ও সুবর্ণমণ্ডিত প্যাগোডা কোন বৌদ্ধদেশে নাই। ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র অস্থি ও কেশ উহাতে সংরক্ষিত হওয়ায় উহা বৌদ্ধদের পরম তীর্থ। উহা একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত বলিয়া শতাধিক পাথরের সিঁড়ি চড়াই করিয়া উহাতে উঠিতে হয়। উহার প্রধান চূড়া ৩৭০ ফুট উচ্চ। ইহাকে প্রত্যেক বার মেরামত করিতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সোয়ে = স্বর্ণ, ডাগন = মস্তক; উক্ত মন্দিরের চূড়াটি সোনার পাত দিয়া মোড়া বলিয়া উহার নাম সোয়েডাগন। উহার বিরাট চাতালের উপর প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক বসিতে পারে। স্বামীজী প্যাগোডাটি প্রদক্ষিণ করিলেন এবং উহার চারিপার্শ্বের অপূর্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি একটি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্বক পদ্মাসনে ধ্যান-মগ্ন হইলেন। তাঁহার গম্ভীর ও সৌম্য মুখমণ্ডল অনেক তীর্থযাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্বর্গীয় ভাবে উজ্জ্বল তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শনে ব্রহ্মদেশীয় রমণীগণ বুদ্ধদেবের চরণে অর্পণ করিবার জন্য যে ফুল আনিয়াছিল তাহার কিয়দংশ ধ্যান-মগ্ন স্বামীজীর পায়ে দিলেন। ধ্যানান্তে স্বামীজী যখন এই ফুলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন প্যাগোডার বৃদ্ধ ম্যানেজার স্বামীজীকে ইংরেজিতে ফুলের ইতিবৃত্ত বলিলেন। তিনি স্বামীজীর সহিত আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া প্যাগোডার পূর্বদিকে অবস্থিত পৃথিবীর দ্বিতীয়[১] বৃহত্তম ঘণ্টাটি দেখাইলেন। ঘণ্টাটি প্রায় ১৪ ফুট উচ্চ, এবং ইহার ওজন ৯৪,৬৮২ পাউন্ড। ইহার মধ্যে ছয়টি লোক পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারে। প্যাগোডার সর্বোচ্চ চূড়ায় তিন লক্ষ টাকা মূল্যের একটি রুবি আছে। অন্ধকার রাত্রে এই রুবিটি দূরস্থিত তারকার ন্যায় উজ্জ্বল দেখায়। ব্রহ্মদেশের স্বাধীন রাজা মিন্‌ডন্ মিন্ জগদ্বিখ্যাত মোগক্ রুবি খনি হইতে উক্ত রুবি সংগ্রহ করিয়া মন্দিরের চূড়ায় রক্ষা করেন।

---

১ পৃথিবীর প্রথম বৃহত্তম ঘণ্টা মস্কোতে আছে।

প্যাগোডা-প্রাঙ্গণে জনৈক আইরিশ ফুঙ্গীর সহিত স্বামীজীর পরিচয় হইল। তিনি আয়ারল্যান্ডের এক শিক্ষিত খ্রিস্টান। বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হইয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মদেশে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই মুণ্ডিত-মস্তক, শ্বেতাঙ্গ, নগ্নপদ, গৈরিকধারী আইরিশ ফুঙ্গী সমগ্র বর্মাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ইনি এই সোয়েডাগন প্যাগোডার পার্শ্বে একটি ফুঙ্গীচক্রে (বৌদ্ধমঠে) থাকেন। ইনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তাঁহার মঠে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজী সাদরে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পরদিন ভিক্টোরিয়া হলে তাঁহার যে বক্তৃতা হইবে তাহাতে যাইবার জন্য ফুঙ্গীকে বলিলেন। তদনুযায়ী ফুঙ্গী স্বামীজীর বক্তৃতায় উপস্থিত হন এবং তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হন। সভা ভঙ্গ হইলে ফুঙ্গী স্বামীজীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।" শিশু-স্বভাব স্বামীজী নিজের গলার মালাটি ফুঙ্গীকে পরাইয়া দিলেন এবং পরদিন সকালে তাঁহার সঙ্গে যাইবেন বলিলেন। তৎপরে ভক্তগণ স্বামীজীকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত রয়েল লেকে (হ্রদে) বেড়াইতে লইয়া যান। স্বামীজীর গাড়িতে আইরিশ ফুঙ্গী ও শরৎচন্দ্র ছিলেন। হ্রদে পৌঁছিয়া স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও রমণীয় সৌন্দর্য দর্শন করিলেন। সন্ধ্যায় হ্রদটি দীপান্বিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। স্বামীজী উহার প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে আনন্দিত হইয়া বাসায় ফিরিলেন। পরদিন তিনি আইরিশ ফুঙ্গীর মঠে গিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু ও হিন্দু সন্ন্যাসীর মধ্যে যে ধর্ম-প্রসঙ্গ[১] ইংরেজিতে হইয়াছিল তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আইরিশ ফুঙ্গী—আমি জগতের সকল ধর্মের অসারতা ও বৌদ্ধধর্মের সার্বভৌমিকতা উপলব্ধি করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছি। এই ধর্ম জগতের প্রায় অর্ধেক অধিবাসীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে।

স্বামীজী—আমরা জগতে প্রচলিত সকল ধর্মকেই ভক্তি করি। সকল ধর্মই সমান ও সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক।

আইরিশ ফুঙ্গী—এই মতের প্রবর্তক কে?

স্বামীজী—যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

আইরিশ ফুঙ্গী—তাঁর প্রচারিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য কি?

১ এই কথোপকথনটি শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে (৩০-৩২ পৃষ্ঠায়) আছে।

স্বামীজী—সর্বধর্মসমন্বয়। শ্রীবুদ্ধ, যিশু খ্রিস্ট, মহম্মদ প্রভৃতি অবতার সকলেই স্ব স্ব প্রবর্তিত পন্থাকেই একমাত্র মুক্তিমার্গ বলে ঘোষণা করেছেন। ইঁহাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্থক্য এই যে, তিনি নিজে কোন ধর্মমত প্রচার করেন নি। জগতের প্রচলিত সকল ধর্মের সার সত্যটুকু নিজ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করে তিনি যত মত তত পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরের অনন্ত রূপ ও অনন্ত ভাবের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো কেহই বোঝাতে পারেন নি। সর্বস্ব ত্যাগ করতে না পারলে অমৃতের অধিকারী হওয়া যায় না। এই বিশ্বাসে উক্ত ত্যাগী শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ কোনদিন টাকা পয়সা স্পর্শ করেন নি। তিনি সহধর্মিণীকে আনন্দময়ী রূপ জ্ঞানে পূজা করেছিলেন। বিবাহিত জীবনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের এইরূপ জ্বলন্ত উদাহরণ জগতের আর কোথাও নাই।

আইরিশ ফুঙ্গী—বুদ্ধদেব কেবল মাত্র নির্বাণের কথা বলেছেন। বাসনার ক্ষয় হলেই নির্বাণ প্রাপ্তি হয়। ঈশ্বরবাদ তিনি স্বীকার করেন নি।

স্বামীজী—ধর্মক্ষেত্র ভারতে নাস্তিক্য বাদ থাকতে পারে না। যারা বুদ্ধদেবকে ব্রহ্মবাদী বা আত্মবাদী না বলে নিরীশ্বরবাদী বলেন, তাঁরা একান্ত ভ্রান্ত। বুদ্ধদেব দার্শনিক মতাবলম্বী ঈশ্বরবাদী ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম পবিত্র আর্যধর্ম। তাঁর সাধনা ভগবান লাভেরই জন্য। আমরা তাঁকে অবতার জ্ঞানে পূজা করি।

তারপর স্বামীজী ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—"জীব স্বরূপত ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। এই জগৎরহস্যের সন্তোষজনক মীমাংসা হিন্দুর বেদে আছে। বৌদ্ধগণ বেদ মানতেন; এই সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। বৈদিক মতের পর বৌদ্ধমত, বৌদ্ধমতের পর বেদমত নয়।"

আইরিশ ফুঙ্গী হতাশভাবে বলিলেন, "পরমার্থ বস্তু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।" স্বামীজী বলিলেন, "ঈশ্বর একমাত্র শুদ্ধ মনের গোচর। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তিনি ধ্যানে এক, বিচারে বহু।" কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী আইরিশ ফুঙ্গীকে বলিলেন, "সব পথেই ঈশ্বর লাভ করা যায়। আপনার নিজ ধর্মেই মুক্তিলাভ হতো। স্বধর্ম ত্যাগ করে এবং ধর্মান্তর গ্রহণ করে ভুল করেছেন। হিন্দুশাস্ত্র বলে 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। পরধর্মো ভয়াবহঃ।"

কবি নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র রেঙ্গুনে তখন ব্যারিস্টার ছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন রেঙ্গুনে পদার্পণ করেন তখন নবীনচন্দ্র তথায় পুত্রের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। কবি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং

কথাপ্রসঙ্গে স্বীকার করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সর্বধর্মসমন্বয়কারী একজন অবতারের অতীব প্রয়োজন বর্তমান যুগে ছিল। স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় বাণী জগৎ গ্রহণ করে শান্তিলাভ করবে।" কবি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাঁহার সৎপ্রসঙ্গ শুনিয়া পরম প্রীত হন এবং তাঁহার পুত্রের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডারউইন, টিন্ডল, মিল প্রভৃতির গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া নিজেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নিকট নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বামীজী বলিলেন—"যারা নাস্তিক তারা বেশি আস্তিক, নাস্তিকেরাই সর্বক্ষণ ঈশ্বরকে খুঁজছে। যাদের মন ঈশ্বরান্বেষণে ব্যস্ত তারা কি নাস্তিক হতে পারে? ঈশ্বর নির্ণয় করতে হলে নিবিষ্ট মনে বিশ্বস্রষ্টার অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশল দর্শন করতে হয়। কার্যকারণপরম্পরার দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অতি সহজেই অনুমিত হয়। কর্তা ব্যতীত কর্ম হতে পারে না। যখন জগৎ রয়েছে তখন এর সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছে, এতে ভুল নেই।"[১]

শরৎচন্দ্র—যদি স্বভাবকে জগতের কারণ বলি?

স্বামীজী—স্বভাবের উৎপত্তির কারণকে তবে ঈশ্বর বলতে পার।

শরৎচন্দ্র—স্বভাবের কারণ যদি ঈশ্বর হন তাহলে তাঁর কারণ কে?

স্বামীজী—ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি স্বভাবের কারণ এবং ইচ্ছাশক্তির কারণ স্বয়ং ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া ভগবানের আদি কারণ নির্ণয় করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি স্বয়ম্ভু, অনাদি, অদ্বিতীয়। তাঁকে ডাকতে হলে শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে শুদ্ধ মনে সাধন-সাগরে ডুব দিতে হয়, উপর উপর ভাসলে হবে না।"

শরৎচন্দ্র—যুক্তি ও পাণ্ডিত্য খানিক দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে বটে; কিন্তু তার পরে সব অন্ধকার।

স্বামীজী—কে বললে অন্ধকার? তাঁকে ব্যাকুল হয়ে খোঁজ, নিশ্চয়ই দেখা পাবে, সংশয়-গ্রন্থির পরপারেই অপরূপ জ্যোতিঃ ও অপার আনন্দ-সাগর। ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে অনেকে তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন, জগতের সমস্ত ধর্ম ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। বিষয়ী লোকেরা সব কথা শুনে যায়; কিন্তু বিশ্বাস করে না।

---

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই কথোপকথন গিরীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে (৩৫-৪৬ পৃষ্ঠায়) আছে।

শরৎচন্দ্র—এত অবিশ্বাস আসে কেন বলুন তো?

স্বামীজী—এই অবিশ্বাসই হলো বাধা। শুধু বাধা নয় বিষম ব্যাধি। পূর্বজন্মের সংস্কারগুলো ক্ষয় করে ফেলতে হবে। যার বিশ্বাস এসে গেল সে ভাগ্যবান। তার আর কোন অভাব রইল না। বিশ্বাস দুর্লভ ধন। আমাদের রোগ হচ্ছে বাসনা—প্রতিকার হচ্ছে বিবেক। এই বিবেকরূপী ভগবান আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন; তাঁকে ভুললেই সব পণ্ড।"

শরৎচন্দ্র—আপনি বহুদিন তো আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা করেছেন, কিছু পেলেন কি?

স্বামীজী—শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু আমাদের নন। তিনি জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। ভগবান তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই বাণীটির সার্থকতার জন্য অধর্মের অভ্যুত্থান, ধর্মের সংস্থাপন, সাধুদের পরিত্রাণ ও পাপী তাপীদের উদ্ধারের পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে, খ্রিস্টরূপে, মহম্মদরূপে, বুদ্ধরূপে, শঙ্কররূপে ও গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়ে অনেক লীলা করে গিয়েছেন। বর্তমান যুগে তিনিই সর্বধর্ম সমন্বয়কারী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। গীতার বাণী তিনি জীবনে প্রতিফলিত করেছেন; তাঁর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের অশ্রুতপূর্ব দৃষ্টান্ত, লোক-শিক্ষার্থ দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনা এবং "যত মত তত পথ" ঘোষণা, ধর্মজগতে যুগান্তর এনেছে। তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত "কথামৃত বাণী" সারা বিশ্ববাসীর তৃষিত প্রাণে শান্তি বারি সেচন করছে। তিনি বলেছেন—জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—এসব তিনি আছেন বলে সব আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। একের পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়; কিন্তু এককে মুছে ফেললে শূন্যের কোন মূল্য থাকে না, জন্ম, মৃত্যু, এসব ভেল্কির মতো; এই আছে এই নেই। শুধু আহার, নিদ্রা, বাসনা ও ভোগের সেবাতেই জীবন ক্ষয় করলে কি ধর্ম হয়? ঈশ্বর-লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

শরৎচন্দ্র—তাঁকে আমরা দেখতে পাই না কেন?

স্বামীজী—ঠাকুর বলতেন, "সমুদ্রে রত্ন আছে, যত্ন চাই, সংসারে ঈশ্বর আছেন, সাধনা চাই।" তিনি আরও বলেছেন—পানায় ঢাকা পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছ পুকুরে জল নেই, যদি জল দেখতে চাও তবে পানা সরিয়ে ফেল। মায়ায় ঢাকা চোখ নিয়ে ঈশ্বর দেখা যায় না; যদি ঈশ্বরকে দেখতে চাও মায়াকে সরিয়ে ফেল।

শরৎচন্দ্র—এই মায়া বস্তুটি কি?

স্বামীজী—ব্রহ্মের যে শক্তিদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে সেটির নাম মায়া! মায়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব জীবকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমাদের মায়াবৃত বিষয়মুখী মন স্ত্রী, পুত্র, মান-যশ এই সবেতেই মুগ্ধ থাকে; আর এই সব অসার অনিত্য ধনকে সার নিত্য বলে মনে হয়। ভগবানের দয়া না হলে এই মায়ার হাত থেকে কারুর নিস্তার নেই। কিন্তু তাঁর কৃপা হয় কার উপর? তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই ভাবছেন, কিন্তু জীবের প্রাণ কি তাঁর কৃপা পাবার জন্য লালায়িত হয়েছে? তাঁর কৃপা পাবার উপায় হচ্ছে চোখের জল—তাঁর একান্ত শরণাগত হয়ে কেঁদে কেঁদে কৃপা ভিক্ষা চাইতে হয়, তাঁর দয়া তখন হয়, যখন তিনি বোঝেন হাঁ, এ ঠিক ঠিক আমায় ভালোবাসে, আমাকেই চায়—কামিনী-কাঞ্চনে এর মন নাই। এদিকে বিষয়ে যোল আনা টান রয়েছে, ওদিকে মুখে শুধু কৃপা কর, দেখা দাও বললে কি তাঁর আসন টলে? এই কপট ভণ্ডামি যেদিন চলে যাবে, প্রাণ সরল হবে—মন শুদ্ধ হবে সেই দিনই তাঁর দয়া হবে।

শরৎচন্দ্র—ঈশ্বর যদি জীবের মঙ্গলের জন্য সর্বদা ভাবেন, তবে তাদের এত দুঃখ কেন?

স্বামীজী—তিনি শুধু মঙ্গলময় নন, তিনি সর্বমঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান, ভগবান যখন যা কিছু করেন সবই জীবের মঙ্গলের জন্য। আমাদের বাপ মাও ছেলের জন্য মঙ্গল কামনা করেন বটে, কিন্তু তাঁরা সর্বশক্তিমান নন। ঈশ্বরে একত্রে এ দুটি গুণ থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি দুঃখ কষ্ট দেন, তবে নিশ্চয়ই জানবে এ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁর দয়া নিহিত আছে। যাকে আমরা দুঃখ বলি, বাস্তবিক তা দুঃখ নয়—দীক্ষা। ক্ষণিক সুখের লোভে আমরা ভগবানকে ভুলে যাই, তাই তিনি কৃপা করে দুঃখ রূপ দীক্ষা দিয়ে তাঁকে মনে করিয়ে দেন। তাঁর দয়া দুইভাবে অনুভব করতে হয়। অনুকূল দয়া ও প্রতিকূল দয়া। কখনও তিনি জীবের প্রার্থিত ধন, জন, পুত্র, পরিবার, মান, ঐশ্বর্য প্রভৃতি দিয়ে খেলাঘর সাজিয়ে দেন তখন সেটি তাঁর অনুকূল দয়া। আর যখন সেগুলি একে একে কেড়ে নিয়ে চোখের জলে ভাসিয়ে তাঁর দিকে টেনে নেন, তখন হচ্ছে তাঁর প্রতিকূল দয়া।

শরৎচন্দ্র—অদৃষ্ট, দৈব, পুরুষকার জিনিসগুলি কি ভালো বুঝতে পারি না।

স্বামীজী—এ সংসারে কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত, কেহ রাজা, কেহ প্রজা,

কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ চণ্ডাল, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ পাপী, কেহ পুণ্যবান, কেহ হিংস্র, কেহ দয়ালু, কেহ দেব-সেবা করে সুখ্যাতি অর্জন করছে, কেহ বিষ্ঠা পরিষ্কার করে ঘৃণিত হচ্ছে। এই বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান করলেই পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল বা অদৃষ্ট স্বীকার করতে হয়। দৈব ও পুরুষকার, এই উভয়ই আমাদের জীবনকে পরিচালনা করে। দৈবের ফল পূর্ব-জন্মের ফলে মানুষ বর্তমান জীবনে পেয়ে থাকে। বর্তমান জীবনের কৃতকর্মফলের কতক অংশ হয়তো বর্তমানেই পায়, কিন্তু পুরো পায় না। সেইটে দৈবরূপে পর জীবনে তার সুখ দুঃখের কারণ হয়। পুরুষকারটিও দৈবশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাঁর কৃপা ছাড়া 'পুরুষকার' কথাটা অর্থহীন। দৈবের সাধনায় পুরুষকার আবশ্যক, আবার পুরুষকার দ্বারা কর্মসাধনায় দৈব বা ভগবৎকৃপা আবশ্যক।

শরৎচন্দ্র—ভাগ্য বা অদৃষ্টের খণ্ডন হয় কি?

স্বামীজী—সংসারী লোক অহংকারেই মত্ত। কিন্তু যখন দুঃখে, শোকে, পীড়ায়, দারিদ্র্যে ও হতাশায় জর জর হয়ে পড়ে, যখন নিজের চেষ্টা, নিজের উদ্যম, নিজের যত্ন ও পরিশ্রম কোনরূপেই ফলদায়ক হয় না তখনই সে ভাবে অদৃষ্টের কথা। আর বলে 'অদৃষ্ট অখণ্ডনীয়।'

শরৎচন্দ্র—যদি আমার কর্মফলজনিত-অদৃষ্টে যা আছে, তাহাই অনিবার্যে হয় তবে ঈশ্বর আরাধনা বা ধর্মকর্মে প্রয়োজন কি?

স্বামীজী—অদৃষ্টবাদে আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস; কিন্তু অদৃষ্ট অখণ্ডনীয় এ কথায় আমার আস্থা নাই। কর্মফলরূপ অদৃষ্ট প্রকোষ্ঠে ভালো, মন্দ, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ যা কিছু সঞ্চিত হয়েছে, তা একেবারে অচল অটল অখণ্ড বা অপরিবর্তনীয়—একথা আমি বিশ্বাস করি না। এক পরমাত্মা ভিন্ন এই বিশ্বসংসারে অদাহ্য, অখণ্ড, অশোষ্য, অচ্ছেদ্য বা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় আর কিছু থাকতে পারে না। যেখানে রোগ, সেইখানেই ঔষধ; যেখানে অন্ধকার সেইখানেই আলো; যেখানে অত্যাচার, সেইখানেই পরিত্রাণ; যেখানে ধর্মগ্লানি সেইখানেই ধর্মস্থাপন—ইহাই সংসারের চিরন্তন নিয়ম। সকল বিষয়েই যদি এক নিয়ম, তবে অদৃষ্ট সম্বন্ধে বিপরীত হবে কেন? যদি দুঃখের ভার লাঘব হবার উপায় না থাকে তা হলে লোকে এত পুণ্য সঞ্চয় করে কেন? এত পরোপকার, এত দান, এত কঠোর তপস্যা, এত তীর্থ দর্শন, এত শাস্ত্র চর্চা ও উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? যদি দূরদৃষ্ট খণ্ডনীয় বা পাপমোচনের কোন উপায় না থাকে তবে যুগে যুগে অবতারের প্রয়োজন কি? যিশু খ্রিস্টের পরিত্রাতা

saviour কিংবা মহম্মদের রশুল prophet অথবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কপাল-মোচন নামের সার্থকতা কোথায়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—"তুমি একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব"; যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—চোখের জলে পূর্বপূর্ব জন্মের পাপ ধৌত হয়ে যায়; যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—ভগবানের আর একটি নাম 'কপাল মোচন'। তাঁর কৃপা হলে এক মুহূর্তে মানুষের কপাল (অদৃষ্ট লিখন) মুছে যেতে পারে। ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে এই বলে প্রার্থনা কর, হে দয়াময়! আমি অসহায় দুর্বল; ইহ জন্মে বা জন্ম জন্মান্তরে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে সকল পাপ সঞ্চয় করেছি তুমি দয়া করে সেইগুলি ক্ষমা কর। আমার সমস্ত কর্ম ফল ক্ষয় করে দাও প্রভু! অনুতপ্ত হৃদয়ে এইভাবে প্রার্থনা করলে ব্যাকুল প্রাণে কাঁদতে পারলে নিশ্চয় তাঁর দয়া হবে। ছেলে কাঁদলেই মায়ের আসন টলে।

শরৎচন্দ্র—সকলেই কি কাঁদতে পারে?

স্বামীজী—বেশি বুদ্ধিমান হয়েই তো তোমরা মুস্কিলে পড়েছ! পাটোয়ারি বুদ্ধিটুকু সরিয়ে ফেল, পথ সহজ হবে। হেসে কেউ ভগবান লাভ করে নি। যারা তাঁকে পেয়েছে, কাঁদতে কাঁদতেই পেয়েছে।

শরৎচন্দ্র স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা গেরুয়া না পরেও সন্ন্যাসী হওয়া যায় কি?

স্বামীজী—ধর্ম হচ্ছে মনের। গেরুয়া না পরেও মুক্ত হওয়া যায়, মানুষ মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত। আগে চাই মন, পরে বাহিরের সাহায্য, মন ভালো হলে গেরুয়ায় যেমন বাহিরের কিছু সাহায্য করে, মন খারাপ হলে তেমনি গেরুয়ার দ্বারা ভণ্ডামির সহায়তা হয়। গেরুয়া পরা, তিলক ফোঁটা কাটা, তীর্থযাত্রা, হজ, কীর্তন, জপ, তপ কিছুই ধর্ম নয়; ধর্মের বহিরাবরণ মাত্র। এগুলি মানুষের মনকে ভগবৎকৃপার অধিকারী হতে সাহায্য করে।

শরৎচন্দ্র—তবে কিসে মুক্তি হয়?

স্বামীজী—জীবাত্মা পরমাত্মার জন্য আত্মহারা না হলে মুক্তিপথের সন্ধান পাওয়া যায় না।

শরৎচন্দ্র—আপনাদের মঠের সন্ন্যাসী হবার নিয়ম কি?

স্বামীজী—মঠের সন্ন্যাসী হতে গেলে প্রথম তিন বৎসর শিক্ষানবিশ থাকতে

হয়, তারপর তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী থাকতে হয়। এই ছয় বৎসর* পরে মঠাধ্যক্ষ তোমার সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ততা বিবেচনা করে তবে যে সন্ন্যাস দেবেন। মঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ ত্যাগী, আদর্শ সেবক, আদর্শ সংযমী ও আদর্শ ভক্ত হতে হবে।

শরৎচন্দ্র—ঐ ছয় বৎসর কি শিক্ষা করতে হবে?

স্বামীজী—মিশনের মূলমন্ত্র—Renunciation and Service (ত্যাগ ও সেবা), সংসারাসক্তি ত্যাগ, সর্বভূতে ভগবান দর্শন ও জীবকে শিব জ্ঞানে সেবা করা।

শরৎচন্দ্র—সেবা কাজটি বাড়ির মেয়েদের কাছেই ভালো শিক্ষা হয়, হিন্দুর মেয়ে আপন স্বামী পুত্রের যে ভাবে সেবা করে তার চেয়ে বড় আদর্শ কিছু হতে পারে কি?

স্বামীজী—সতীর পতিসেবার মধ্যেও একটু স্বার্থ গন্ধ থাকে; কিন্তু মঠের সাধু ব্রহ্মচারিগণ অসহায় রোগীকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে পীড়িত নারায়ণ জ্ঞানে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করে।

শরৎচন্দ্র—মঠের বড় কঠিন নিয়ম; ছয়* বৎসর শিক্ষানবিশী। ছয় বৎসর মেডিকেল কলেজে পড়লে ডাক্তার হওয়া যায়।

স্বামীজী—ডাক্তার হলে দৈহিক রোগের চিকিৎসা হবে বটে; কিন্তু সন্ন্যাসী হতে পারলে ভবরোগ থেকে অব্যাহতি পাবে।

শরৎচন্দ্র—প্রতিবারে কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ সাধুর সমাগম হয়, ওঁরা সকলেই কি ভবরোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন?

স্বামীজী—ওঁদের মধ্যে পেটের জন্য, নাম-যশের জন্য, ঔষধাদি দিয়ে অর্থোপার্জনের জন্য, রাজদণ্ড এড়াবার জন্য অনেকে সাধু সেজে থাকেন, কিন্তু ভগবান লাভের জন্য সর্বত্যাগী বিবেক-বৈরাগ্যবান সাধু খুবই কম। বহু জন্মার্জিত তপস্যার ফলে কাম-কাঞ্চনে অনাসক্ত হলে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া যায়। মুমুক্ষু না হলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

ভগবান রামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর ও কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্তি, গুরুভক্তির জীবন্ত-বিগ্রহ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পূতসঙ্গে নাস্তিক শরৎচন্দ্রের

* বর্তমানে ৯ বৎসর

আন্তিক্যবুদ্ধি অস্থায়ী ভাবে আসিয়াছিল। স্বামীজীর বিদায়ের সময় উপস্থিত হইলে বহু বাঙালি ও মাদ্রাজি ভক্ত স্বামীজীকে প্রণাম-পূর্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে ভক্তগণের চক্ষু জলভারাবনত দেখিয়া তিনিও অভিভূত হইলেন। এক প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক ভাবে সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তাঁহার পুতস্পর্শে অনেকের মনে ধর্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল। তিনি ২৫ মার্চ শনিবার রেঙ্গুন হইতে জাহাজে উঠিলেন এবং ২৯ তারিখ প্রাতে মাদ্রাজে অবতরণ করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় তিনি মাদ্রাজ হইতে বোম্বাইতে ঠাকুরের উৎসবে বক্তৃতা দিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি রেঙ্গুনে যে বীজ ১৯০৫ খ্রিঃ বপন করিয়াছিলেন তাহা কালে মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় বিশ বৎসর পরে রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মিশনের বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল এবং লাইব্রেরি ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

(উদ্বোধন ঃ ৪৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা)

শশী মহারাজ

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

পরবর্তিকালে শশী মহারাজ নামে পরিচিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী জন্মেছিলেন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে এবং মহাসমাধিলাভ করেছিলেন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে। তিনি এই পৃথিবীতে আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন মাত্র ৪৮ কি ৪৯ বছর। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি এমন সুগভীর ছাপ রেখে গেছেন, এমন কিছু করে গেছেন যা চিরস্থায়ী এবং চিরন্তন হয়ে থাকবে। জনসেবায় সমর্পিত তাঁর মহৎ জীবন দক্ষিণ ভারতে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি আজও সমানভাবে অনুভূত।

তাঁর ঐকান্তিক গুরুভক্তি, আদর্শের প্রতি আনুগত্য, ঈশ্বরে অনুরাগ এবং সর্বজনের প্রতি সেবার ভাব তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল। যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তাঁদের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিদ্বান, একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং সুসংস্কৃতজ্ঞ। শাস্ত্রের উপর ছিল তাঁহার অসাধারণ অধিকার। আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল এবং হৃদয়বান প্রেমনিষ্ঠ পুরুষ। এইসব কারণেই অনেক মুমুক্ষু ব্যক্তি সান্ত্বনা ও মহৎশান্তির প্রত্যাশায় তাঁর কাছে চলে আসতেন।

শশী মহারাজ কলেজে পাঠ্যাবস্থায় প্রতিদিন প্রার্থনার পর বাইবেল বা চৈতন্যচরিতামৃত নিয়মিত পাঠ করতেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও প্রার্থনাসভায় যোগদান করতেন। এ থেকেই তাঁর অধ্যাত্ম-বিকাশ এবং এই জীবনেই ভগবানলাভ করার জন্য আকুলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং এর ফলেই তিনি শেষ পর্যন্ত ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের শেষ তিন বছর, বিশেষ করে তাঁর কাশীপুরে বাসকালে গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় আত্মনিবেদন করেছিলেন। তিনি কলেজের লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কাশীপুরে চলে আসেন এবং দিবারাত্র গুরুদেবের সেবাশুশ্রূষায় যুক্ত হন। যখন প্রয়োজন তখনই শ্রীরামকৃষ্ণকে সেবা করার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পরও তিনি পুনরায় এমন

নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুসেবা শুরু করে দিলেন যে মনে হতো শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝি তখনও জীবন্ত। বস্তুত তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্হিত হননি। তিনি তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত উপস্থিতি মঠবাসীদের সামনে তুলে ধরতেন। তাঁর পূজাদি নিখুঁতভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। বেলুড় মঠ ও মাদ্রাজ মঠে এখনও যে শ্রীরামকৃষ্ণপূজা হচ্ছে তার সব কিছুর প্রবর্তন তিনিই করেছিলেন। এই সেবাপূজা দেখলে বোঝা যেত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালে তিনি কি ধরনের সেবাযত্ন করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালেও তিনি যেভাবে গুরুসেবা করতেন, তাঁর তিরোধানের পরেও সেই একই ধারায় সেবাদি সম্পন্ন করে যেতেন। একবার ভেবে দেখ। বেলুড় মঠে প্রতি প্রত্যুষে (এখন অবশ্য আর করা হয় না) তিনি নিম বা বাবলার ডাল থেকে একটি দাঁতন তৈরি করে দিতেন যেমনটি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবিতকালে ব্যবহার করতেন, দাঁতনটি থেঁতলে ঠিক তেমনি নরম করে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবিতকালে যা যা পছন্দ করতেন, তিনি সে সকল দ্রব্যই গুরুসেবায় নিবেদন করতেন। অনেক রকমের ফুল দেওয়া হতো। শ্রীরামকৃষ্ণ চাঁপা, কেতকী প্রভৃতি কড়া গন্ধের ফুল পছন্দ করতেন না। তিনি পছন্দ করতেন কোমল গন্ধের ফুল। সুতরাং চাঁপা, কেতকী প্রভৃতি কড়া গন্ধের ফুল নিবেদন করলেও তিনি সেগুলিকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি থেকে দূরে রাখতেন, যাতে কড়া গন্ধের ঝাঁঝ অনেকটা কমে যায়। সকালবেলা স্নানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ গতরাতে ভেজানো ছোলা খোসা ছাড়িয়ে আদা নুন দিয়ে খেতেন। আজ পর্যন্ত এই ভোগ বেলুড় ও মাদ্রাজে নিবেদন করা হয়, কিন্তু বৃহস্পতিবার তিনি আদা খেতেন না, কারণ বাংলাদেশে ঐরূপ রীতির প্রচলন ছিল। সেকারণে সেদিন আদার বদলে গোলমরিচ দেওয়া হতো। এখনও ঐ নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের প্রায় অন্তে গলায় ক্যানসার রোগের জন্য কোন শক্ত খাবার খেতে পারতেন না। তিনি সুজির পায়েস জাতীয় তরল পথ্য খেতেন। তাই বেলুড়ে মাদ্রাজে ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আরও কয়েকটি কেন্দ্রে আজও সুজির পায়েস ভোগ দেওয়া হয়। এই সমস্ত পূজাপদ্ধতির সব কিছুরই প্রবর্তক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তিনি নিজে কাশীপুর বাগানে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে যেভাবে সেবা করতেন সেই সেবা-ধারারই অনুসরণ করতেন পরবর্তিকালেও। তিনি সদা সজাগ থাকতেন এবং সারাদিনে শ্রীরামকৃষ্ণের যখনই প্রয়োজন হতো তখনই তিনি গুরুর কাছে গিয়ে হাজির হতেন।

তিনি ঠাকুরের ভোগ রান্না করতেন। প্রথমে তৈরি করতেন চাটনি, পায়েস প্রভৃতি যেগুলি খুব ঠাণ্ডা অবস্থায় নিবেদন করতে হয়। আর ভাত, ডাল, তরকারি যেগুলি গরম গরম পরিবেশন করতে হয়, সেগুলি শেষকালে রান্না করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোগ নিবেদন করতেন। তিনি একসঙ্গে সব লুচি তৈরি করতেন না। এখন দেখি ভোগ নিবেদন করে পূজারি মন্দিরের বাইরে চলে আসেন। কিন্তু শশী মহারাজ মন্দিরের ভিতরেই থাকতেন এবং একটি একটি করে লুচি ভেজে ঠাকুরকে গরম গরম লুচি খাওয়াতেন। এভাবে একটির পর একটি লুচি তিনি ঠাকুরকে নিবেদন করতেন। তিনি এমনি আন্তরিকভাবেই ঠাকুরের সেবা করেছিলেন।

গভীর রাতে যখন তিনি গরম অনুভব করতেন, তৃষ্ণার্ত বোধ করতেন, তিনি ঠাকুরের ঘরে চলে যেতেন, শয়ন ঘরের জানালা খুলে দিতেন, এক গ্লাস জল খেতে দিতেন এবং সারা রাত ধরে ঠাকুরকে পাখার বাতাস করতেন। তিনি এভাবেই ঠাকুরের পূজা করতেন। তাঁর পূজানুষ্ঠানে বিধি কিছু ছিল না, কিন্তু তা ছিল অনন্যস্বতন্ত্র। এখন তোমরা যখন পূজা করতে বস, তোমরা কিছুক্ষণ আসনে বসে ধ্যান কর তারপর পূজাদি শুরু কর। কিন্তু রামকৃষ্ণানন্দজীর এ সকলের প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি সর্বক্ষণই অনুভব করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের অপার্থিব উপস্থিতি এবং সেকারণে পূজার পূর্বে ধ্যান জপ ইত্যাদির প্রয়োজন বোধ করতেন না। কি সকালে কি সন্ধ্যায় তিনি সরাসরি পূজা আরম্ভ করতেন। তিনি এভাবেই পূজানুষ্ঠান করতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী আদর্শের ব্যাপারে কঠোর নিয়মানুবর্তী ছিলেন। জীবনে তিনি কখনও শ্রদ্ধার অভাব এবং আদর্শের উদ্‌যাপনে ও অনুবর্তনে কোন প্রকার শিথিলতা পছন্দ করতেন না। সুতরাং তাঁর কাছে ব্রহ্মচারীদের শিক্ষা হতো সুচারু ও সর্বাঙ্গসুন্দর।

একদিন জনৈক ব্রহ্মচারী ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করেই জরুরি একটি কাজে পোস্ট অফিসে ছুটে যায়। তখনকার দিনে মঠে রামকৃষ্ণানন্দজী ও সেই ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। সেজন্য বাধ্য হয়েই তাকে জরুরি একটা কাজ সারতে পোস্ট অফিসে যেতে হয়েছিল। কিন্তু যাহোক, রামকৃষ্ণানন্দজী জানতে পারলেন যে ব্রহ্মচারী ভোগ নিবেদন করে বেরিয়ে গেছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ব্রহ্মচারী পোস্ট অফিসে গেছে। তিনি পোস্ট অফিসে গিয়ে ব্রহ্মচারীকে ধরলেন। তিনি ব্রহ্মচারীর কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে রাস্তা দিয়ে নিয়ে

এসে মঠে পৌঁছালেন এবং ব্রহ্মচারীকে বুঝিয়ে দিলেন যে, গুরু মহারাজের যে কোন জিনিসের প্রয়োজন হতে পারে, সুতরাং ব্রহ্মচারীর সেজন্য প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজশক্তি অথবা ইংরেজরা বাঙালি মাত্রকেই সন্দেহ করত এবং তাদের অনেককেই পুলিশ-নজরে থাকতে হচ্ছিল। মাদ্রাজ মঠের সাধুরাও যেহেতু বাংলা দেশ থেকে আগত, সেজন্য তাদেরকেও সন্দেহের চোখে দেখা হতো। একবার একজন সি.আই.ডি. (গোয়েন্দা) অফিসার কলকাতা থেকে এসে লক্ষ্য করতে থাকলেন শশী মহারাজ ও অন্যান্যরা কি করেন। শশী মহারাজ বুঝতে পারলেন লোকটি গোয়েন্দা অফিসার। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভোগ হয়ে গেলে ডাল ও ভাতের সঙ্গে অন্য কিছু মিশিয়ে দিলেন। গোয়েন্দা অফিসার খেতে বসে প্রতি গ্রাসে ডালভাতের মধ্যে অন্য কিছু পাচ্ছেন। তাঁর কাছে এটা অসহ্য মনে হলো।

তিনি বললেন ঃ "ব্যাপার কি স্বামীজী, ডাল ভাতের মধ্যে অন্য কিছু দেখছি!" শশী মহারাজ উত্তর দেন ঃ "হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন তা সত্য। আমাদের অন্য কোন উপায় নেই, কোন মতে আমরা খাওয়া দাওয়া করি।" এরপরেই গোয়েন্দা অফিসার দু-একদিনের মধ্যে সরে পড়েন। তিনি এই কৌশলে গোয়েন্দার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।

তাঁর গুরুভ্রাতাদের প্রতি, বিশেষত যাঁরা ছিলেন ঈশ্বরকোটি—তাঁদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভক্তি। তিনি তাঁদেরকে প্রায় শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। বর্তমান মাদ্রাজ মঠের প্রবেশপথের বাগানে ছিল মঠের প্রথম বাড়ি। সেখানে চারটি বাস করবার ঘর ও একটি হলঘর ছিল। তিনি বলতেন, "একখানা ঘর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য, আরেকটি স্বামীজীর জন্য, তৃতীয়টি রাজা মহারাজের জন্য, চতুর্থটি প্রেমানন্দজীর জন্য এবং হলঘরটি হলো ভক্তদের জন্য।" একজন এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "স্বামীজী, তাহলে আপনি থাকবেন কোথায়?" তিনি উত্তর করেন ঃ "বারান্দায়।" এইটি ছিল তাঁর মুক্ত মনের চেহারা।

রাজা মহারাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। রাজা মহারাজ যখন ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ মঠে বাস করছিলেন, সে সময়ে তিনি একবার পেটের অসুখে ভুগছিলেন। তাঁর পথ্য ছিল সাগুজল। হঠাৎ এক ভক্ত একটি থালা

ভর্তি নানারকমের মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত হন। শশী মহারাজ মিষ্টির থালা নিয়ে রাজা মহারাজের সামনে ধরেন এবং বলেন ঃ "রাজা, তুমি খাও।"

রাজা মহারাজ ঃ "বল কি শশী? আমার পেটের অবস্থা ভালো নয়। আমি সাগু খাচ্ছি"

শশী মহারাজ ঃ "তাতে কি হয়েছে? তুমি তো আর খেতে যাচ্ছ না, তোমার মধ্য দিয়ে গুরু মহারাজই গ্রহণ করবেন।"

একথার পর মহারাজ বেশ কিছু পরিমাণ মিষ্টি খেয়ে নিলেন এবং তাতে কোন অসুবিধাও দেখা দিল না।

আরেকদিন স্বামীজীর "Inspired Talks" (দেববাণী) প্রকাশনার পরেই বইটির সমালোচনার ব্যবস্থা নিয়ে শশী মহারাজের সঙ্গে রাজা মহারাজের মত পার্থক্য হয়। মহারাজ শশী মহারাজকে বলেছিলেন Bombay Chronicle-এ একখানা বই সমালোচনার উদ্দেশ্যে পাঠাবার জন্য। শশী মহারাজ বলেন ঃ "কে Bombay Chronicle পড়তে যাচ্ছে? 'হিন্দু' পত্রিকাতে এর সমালোচনা বের হলেই যথেষ্ট!" একথা বলে তিনি আর বোম্বেতে কোন বই পাঠাননি। মহারাজ কিছু বললেন না। কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এমনকি শশী মহারাজ যখন তাঁকে নিত্যকার প্রণাম করতে গেলেন, তখনও মহারাজ নীরব ও নির্বিকার। শশী মহারাজ বুঝতে পারলেন যে তাঁর মন্তব্যে মহারাজ খুবই বিচলিত। কিন্তু এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর ছিল একটা বিচিত্র পদ্ধতি। তিনি রাজা মহারাজের কাছে গিয়ে বলেন ঃ "রাজা, তোমার এরকম ছোট মন? শশী কি তোমার সমান যে, তার সঙ্গে তুমি মান অভিমান করছ? তুমি ইচ্ছা করলে আমার মতো শত শত শশী তৈরি করতে পার। তোমার লজ্জা করছে না যে, তুমি আমাকে তোমার সমজাতীয় মনে করেছ?" মহারাজ শুনে লজ্জা পেয়ে যান এবং বলেন ঃ "না, না, শশী, কিছুই হয় নি।" শশী মহারাজের ভক্তি ছিল এমন গভীর।

একবার শশী মহারাজ মাদ্রাজ থেকে বেলুড় মঠে সকাল দশটার সময় উপস্থিত হন। তিনি রাজা মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখেন যে, মহারাজ ধ্যান করছেন। সে সময়ে তাঁকে ডাকা বা তাঁর ধ্যানে বাধা দেবার স্পর্ধা কারুরই ছিল না। কিন্তু শশী মহারাজ সোজা মহারাজের কাছে হাজির হলেন, মহারাজকে সামান্য ধাক্কা দিয়ে বললেন ঃ "রাজা, এ তুমি কি করছ? তুমি আবার কি

ধ্যান করছ? আচ্ছা, তোমার এতক্ষণ ধরে ধ্যান করবার কি প্রয়োজন? উঠে পড়।" তাঁর মহারাজের প্রতি ছিল এই ধরনের গভীর শ্রদ্ধা। প্রেমানন্দজীর প্রতিও ছিল তাঁর আর এক ধরনের ভক্তি। আর স্বামীজীর প্রতি তো ছিল অপারসীম ভক্তি। স্বামীজীর প্রতি তাঁর যে গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তা বিস্ফুরিত হয়েছে তাঁর রচিত "অনিত্যদৃশ্যেষু বিবিচ্য নিত্যং" স্তোত্রে, সেই স্তোত্র আর তোমাদেরকে শোনাবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নাই।

রাজা মহারাজ যখন মাদ্রাজ মঠে গিয়েছিলেন সে সময়ে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী খাজাঞ্চির কাজ করতেন। মহারাজ ও তাঁর সঙ্গীদের খরচপত্র মেটাবার জন্য শশী মহারাজ প্রায়ই তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা নিতেন। রাজা মহারাজ এটা লক্ষ্য করে বিশুদ্ধানন্দজীকে আদেশ করলেন, "শোন, শশী যখনই টাকা নেবে তার কাছ থেকে একটা রসিদ লিখিয়ে নেবে।" এরপরের বার শশী মহারাজ বিশুদ্ধানন্দজীর কাছে টাকা নিতে আসতেই তিনি টাকার একটি রসিদ লিখে শশী মহারাজকে সই করতে দেন। শশী মহারাজ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, "ব্যাপার কি? তুমি কোনদিন তো রসিদ চাও নি? আজ চাইছ কেন?" তখন বিশুদ্ধানন্দজী বলেন ঃ "মহারাজ আদেশ করেছেন টাকা দেবার সময় আপনার কাছ থেকে রসিদ নেবার জন্য।"

শশী মহারাজ হেসে বললেন ঃ "বেশ, বেশ।" তিনি রসিদ সই করে দিলেন। এরপর থেকে যখনই বিশুদ্ধানন্দজী টাকা দিতেন রসিদ নিয়ে নিতেন। রাজা মহারাজ মাদ্রাজ থেকে চলে যাবার পর শশী মহারাজ বিশুদ্ধানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "তোমার থেকে এ পর্যন্ত কত টাকা নিয়েছি?"

বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ ঃ "একহাজার পঞ্চাশ টাকা।"

শশী মহারাজ ঃ "কি? একহাজার পঞ্চাশ! হতেই পারে না।"

তখন বিশুদ্ধানন্দজী সব রসিদ বের করে তাঁর হাতে দিলেন। শশী মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন ঃ "দেখেছ, কিভাবে রাজা তোমাকে রক্ষা করলেন। তাঁর বুদ্ধি পরামর্শ না পেলে আজ তুমি সমস্যায় পড়ে যেতে।" এই সকল ঘটনা থেকেই বোঝা যায় রাজা মহারাজের প্রতি তাঁর কি গভীর শ্রদ্ধাই না ছিল!

একদিন তিনি মহারাজকে নিয়ে যান মাদুরাইতে মীনাক্ষী মন্দিরে। ওখানে কাউকেই গর্ভমন্দিরের ভিতরে যেতে দেওয়া হতো না। কিন্তু শশী মহারাজের

বাসনা হলো মহারাজকে নিয়ে সেখানে যাবেন। তিনি অদ্ভুত এক কৌশল অবলম্বন করলেন। মহারাজ ও শশী মহারাজ দুজনেই চেহারায় ভারিক্কি ও বলিষ্ঠ ছিলেন। শশী মহারাজ তারস্বরে বললেন, "আলওয়ার! আলওয়ার!" এবং মহারাজকে ধরে নিয়ে গিয়ে দেবীমূর্তির সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। তিনি নিস্পন্দ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। শশী মহারাজ লক্ষ্য রাখছিলেন যাতে মহারাজ পড়ে না যান। উপস্থিত পুরোহিতদের কারুর কিছু বলার বা তাঁদের জাত নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সাহসও ছিল না। ঐ অবস্থায় রাজা মহারাজ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

এরপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীমা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন। শশী মহারাজ মাকে দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বর তীর্থে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমাও আমন্ত্রণ গ্রহণ করে রামেশ্বর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। রামেশ্বরে শশী মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে দিয়ে ১০৮টি স্বর্ণ বিল্বপত্র নিবেদন করে রামেশ্বর শিবের পূজা করিয়েছিলেন। রামেশ্বরের শিবলিঙ্গ শক্ত গ্রানাইট পাথরের নয়। সম্ভবত নরম বালু পাথরের গড়া। সে কারণে পূজার সময় অভিষেকের জল শিবলিঙ্গের উপর ঢালা হয় না। শিবলিঙ্গটি একটি ধাতুর আচ্ছাদনে ঢেকে জল ঢালা হয়। মনে হয় সর্বদাই শিবলিঙ্গকে ঐভাবে ঢেকে রাখা হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীমা যখন পূজা করছিলেন সে সময়ে ঢাকনা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং শ্রীশ্রীমা শিবলিঙ্গটি দেখতে পেয়েছিলেন। দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ "যেমনটি রেখে গেছিলাম তেমনটিই আছে।" দলের একজন ভক্তমহিলা জিজ্ঞাসা করেন ঃ "মা, আপনি কি বললেন?" শ্রীশ্রীমা কোন উত্তর দেন না।

দাক্ষিণাত্য থেকে শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যাবর্তনের পর শশী মহারাজ বলেন ঃ "দক্ষিণ ভারতে আমার কাজ শেষ হলো। মহারাজকে নিয়ে এসে তাঁকে দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থানগুলি দেখিয়েছি। এবার মাকেও আনা গেল, মাও সেসকল তীর্থ ঘুরে দেখলেন। এখন দক্ষিণে আমার কাজ শেষ হলো।" বাস্তবিকই এরপরই তাঁর কাজের সমাপ্তি ঘটেছিল।

এর কয়েকমাস পরেই তিনি রোগাক্রান্ত হন। বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্যাঙ্গালোরে। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো না। তাঁর গুরুভাইয়েরা তাঁকে অনুরোধ করেন কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসার জন্য। তিনি কলকাতা যাওয়ার পথে রাজা মহারাজ—তিনি সে সময়ে পুরীতে বাস করছিলেন—তাঁকে দেখবার জন্য খুরদা স্টেশনে উপস্থিত হন। শশী মহারাজের

জীর্ণ স্বাস্থ্য দেখে তিনি আতঙ্কিত হন। শশী মহারাজ কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসকদের কাছে জানতে পারেন যে, তিনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত। রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তখনকার দিনের যাবতীয় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেও নিরাময়ের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

একদিন শশী মহারাজ বলেন ঃ "আমার কেন এই মারাত্মক ব্যাধি? আমি জীবনে সজ্ঞানে কোন পাপকর্ম করিনি।" তিনি কিছুক্ষণ নীরবে থেকে নিজেই বলেন ঃ "একদিন স্বামীজীর পিঠে একটা কিল মেরেছিলাম। স্বামীজী স্বয়ং মহাদেব। ঐ পাপেই আমার এই ভোগান্তি।"

ঘটনাটি হচ্ছে এরকম। বরাহনগর মঠে একদিন স্বামীজীর খুব খিদে পেয়েছিল। তখন মঠের খুব সঙ্গিন অবস্থা। মঠবাসীরা প্রতিদিন খেতে পেতেন না। ক্ষুধায় খুব কাতর হয়ে স্বামীজী ভাঁড়ারে গেলেন, কিন্তু কিছুই পেলেন না। তিনি ঠাকুরঘরে এসে দেখলেন সেখানে একটি পাকা কলা রয়েছে। ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে স্বামীজী বললেন, "কলা খাও, কলা খাও!" ঠিক সেই সময়ে শশী মহারাজ সেই ঘরে ঢুকে দেখেন স্বামীজী ঐভাবে ঠাকুরের সঙ্গে মস্করা করছেন। তিনি খুবই চটে যান এবং স্বামীজীর পিঠে একটা ঘুসি মারেন, স্বামীজীকে হাত ধরে টেনে ঠাকুরঘরের বাইরে নিয়ে যান। স্বামীজী শশী মহারাজের মনের ভাব বুঝে চুপচাপ ঠাকুরঘর থেকে চলে যান। শশী মহারাজ তখনও ঠাকুর ও স্বামীজীর মধ্যে যে গভীর অভেদ সম্পর্ক তা সঠিকভাবে অবধারণ করতে পারেননি। পরবর্তী কালে এই ধারণা তাঁর স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। তিনি বলতেন, "ঐ অপরাধেই আমি আজ ভুগছি।"

এভাবে শশী মহারাজ কিছুকাল ভুগে শেষে মহাসমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁর শেষ মুহূর্তের বিভিন্ন আচরণ দেখে তাঁর গুরুভাইরা এর মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর মৃতদেহ বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্বামীজীর মন্দিরের দক্ষিণদিকের চত্বরের শেষপ্রান্তে দাহ করা হয়। সেই চত্বরটি এখন লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। তিনি ও তাঁর অন্যান্য গুরুভাইরা যাঁদের মৃতদেহ সেখানে দাহ করা হয়েছিল তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া আছে। এই হলো সংক্ষেপে শশী মহারাজের জীবন কথা।

আমরা প্রশ্ন করতে পারি, তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর উনপঞ্চাশ বছরের জীবনে কি লাভ করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেব স্বামী সারদানন্দের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে। স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন ঃ "দক্ষিণ ভারতে গিয়ে ভক্তদের

কাছে গিয়ে খোঁজ কর, জানতে পারবে স্বামীজীর তিরোধানে তাঁরা কিরূপ মর্মাহত হয়েছিলেন এবং শশী মহারাজের স্নেহ স্মরণ করে তাঁরা কিভাবে অশ্রুবিসর্জন করেন। আজ খুব সহজেই বলতে পারি—চারিদিকে তাকিয়ে দেখ তাহলেই বুঝতে পারবে শশী মহারাজ দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র কি করে গেছেন।" দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আওতায় যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলি সবই এই মহাত্যাগীর জীবনের স্মৃতিস্তম্ভ বৈ তো নয়।*

(উদ্বোধনঃ ৮৮ বর্ষ, ৮ সংখ্যা)

* ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে প্রদত্ত ইংরেজি ভাষণের অনুবাদ। অনুবাদক ঃ স্বামী প্রভানন্দ। মূল ভাষণটি Vedanta Kesari পত্রিকার সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।—সঃ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী হৃষীকেশানন্দ

১৮৬৩ সালের জুলাই মাসে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মঙ্গলবার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবারে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি শশিভূষণ চক্রবর্তী নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীশ্রীজগদম্বার আরাধনা করিতেন। শিশুকাল হইতেই ধর্মভাব শশীর মনে দৃঢ়ভাবে গাঁথিয়া গিয়াছিল।

পড়াশুনায় তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ছিলেন। অল্প বয়সেই সত্যের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা ছিল। স্কুলের পড়া শেষ করিয়া তিনি কলকাতায় কলেজে বিদ্যার্জনের জন্য আগমন করেন। এই সময় ধর্মপিপাসা মিটাইবার জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই কেশবচন্দ্র সেনের সহিত পরিচিত হইয়া অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে থাকেন। ফলে কলেজের পড়া ক্রমশ শিথিল হইয়া আসিল। তিনি ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের একজন ভক্ত হইলেন। কেশব তাঁহাকে নিজের পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

কেশবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিয়া শশীর ধর্মপিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন সময় সহসা ব্রাহ্মসমাজের কোন সদস্যের নিকট তিনি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিষয় অবগত হন। সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব দক্ষিণেশ্বরেই হইবে। এই উপলক্ষে ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসে শশী শরতের (স্বামী সারদানন্দ) সহিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার ঘরে একটি খাটের উপর উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। শশী ও শরৎকে দেখিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব হাস্যবদনে মেজের উপরে মাদুরে বসিতে বলিলেন ও নাম ধাম আদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কেশব বাবুর ব্রাহ্মসমাজের সদস্য জানিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—"যেমন পোড়াবার আগে ইটে কোম্পানীর মুদ্রার ছাপ দেওয়া হয় এবং পোড়ানোর পর আর ঐ ছাপ কখনও নষ্ট হয় না, সেই রকম তোমরাও সংসারে ঢোকার আগে যদি ছেলে বয়সে ধর্মে মনকে ছোপাইয়া

লও তাহলে তোমরা কখনও সংসারে আসক্ত হবে না। দেখনা আজকাল বাপমায়ে ছেলেদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়। পাশ করে বেরুতে না বেরুতেই তারা দুই চারটি ছেলের বাপ। এই ভাবে কত ছেলেই না জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলেছে। সংসারের চাপে ধর্মকর্ম আর তাদের হয়ে উঠে না।"

এই কথাগুলি শুনিয়াই বালকদ্বয় প্রশ্ন করিলেন, "তবে বিবাহ করা কি এতই খারাপ কাজ?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাহাদিগকে নিকটস্থ তাক্ থেকে একটি পুস্তক লইয়া উহার কোন একটি বিশেষ অংশ দেখাইয়া পাঠ করিতে বলিলেন। উদ্ধৃত অংশটি বিবাহ সম্বন্ধে যিশু খ্রিস্টের অভিমত।

"কতকগুলি লোক নপুংসক হইয়া জন্মিয়াছেন, কতকগুলি লোক নপুংসক বলিয়াই পরিচিত, আবার কতকগুলি লোক স্বর্গরাজ্যের জন্য নপুংসকত্ব বরণ করিয়াছেন।" সেন্ট পল বলিয়াছেন, "সেইজন্য আমি অবিবাহিত ও বিধবাদিগকে বলিতেছি যে তাহারা যদি আমার মতো থাকিতে পারেন তবে তাহাদের অশেষ কল্যাণ হইবে। কিন্তু যদি তাহা না পারেন, তবে তাঁহারা বিবাহ করুন; কারণ কামাগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরার চেয়ে বিবাহ করাই শ্রেয়ঃ।" এই অংশটি পড়া হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "বিবাহই বন্ধনের মূল।"

পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শশীকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি ভগবানকে সাকারভাবে বিশ্বাস কর, না নিরাকারভাবে বিশ্বাস কর?" উত্তরে তিনি 'হাঁ' কিংবা 'না' কিছুই বলিতে পারিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

শশী এই প্রথম দর্শন হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সেই অবধি তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। দিন দিন শশীর ধর্মের পিপাসা বাড়িয়া চলিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিয়া তাঁহার ত্যাগ ও ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কলেজের পড়াশুনায় একপ্রকার ভাঁটা পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ মতো তিনি সাধন-ভজনে অধিক সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে পরমহংসদেবের শরীর অসুস্থ হইলে একদল যুবক শিষ্য কিছুকালের জন্য পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শশী তাঁহাদের মধ্যে একজন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় শশী কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইলেন। কখনও ক্ষুধা, তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া, আবার কখনও রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি দিন রাত গুরুদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যুবকবৃন্দও

কখনও সেবায় এবং কখনও সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিলেন। কিন্তু গুরুদেবের সেবাই শশীর সাধন, ভজন, জপ, তপ যা কিছু সর্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। সেবায় তিনি সকলের চেয়ে প্রধান হইয়া উঠিলেন এবং এই সেবাই তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রথম ও প্রধান সাধনা হইল।

১৮৮৬ সালে আগস্ট মাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাসমাধি লাভ করিলে এই যুবকগণ স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে একে একে গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। বরাহনগরের একটি ভূতুড়ে ভাঙ্গা বাড়িতে তাঁহাদের প্রথম মঠ হইল। শশীও এই মঠে যোগদান করিলেন। এই সময় হইতে শশী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে পরিচিত। এখানে শশী শ্রীগুরুদেবের অস্থি বেদির উপরে স্থাপন করিয়া উহার সেবায় রত হইলেন। এই সেবা ছাড়িয়া তাঁহাকে কোথাও কখনও যাইতে দেখা যায় নাই। গুরু ভ্রাতৃগণ সকলেই ধ্যান জপ ও অধ্যয়নে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি সময়ে সময়ে গুরুভাইদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। শশী মঠের মায়ের মতো ছিলেন।

এইভাবে কিছুদিন বাস করিবার পর ক্রমশ স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি একে একে তীর্থ পর্যটনে বাহির হইলেন। এমন সময়ও গিয়াছে যখন মঠে শশী ছাড়া আর কেহ ছিলেন না। সেই এক যুগ গিয়াছে যখন অশন-বসন ও বাসস্থানের অভাব ছিল। সর্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়াও শশী ধীর স্থির ও অচল ভাবে প্রায় দ্বাদশ বৎসর শ্রীগুরুদেবের সেবাতেই কাটাইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "শশী মঠ-মিশনের স্তম্ভ স্বরূপ।" তিনি যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর রত না থাকিতেন তবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ গঠিত হইত কিনা তাহা কে বলিতে পারে?

মাদ্রাজ ও মাদ্রাজবাসীদের কাছে ১৮৯৭ সালটি একটি শুভ বৎসর বলিতে হইবে। কারণ, স্বামী বিবেকানন্দ এই বৎসরেই তাঁহার বিখ্যাত চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে বক্তৃতা দানের পর প্রথমবার ভারতে ফিরিয়া আসেন। মাদ্রাজে তাঁহাকে বিরাটভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। এখানেই স্বামীজী তাঁহার বিখ্যাত আটটি বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। মাদ্রাজবাসীরা তাঁহার বক্তৃতায় মোহিত হইয়া নূতন শক্তি পাইয়াছিল। স্যর সুব্রহ্মণ্যম্, ডাক্তার রাও প্রভৃতি শহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্বামীজীকে গাড়িতে বসাইয়া নিজেরাই গাড়ি টানিয়া শহর প্রদক্ষিণ করিলেন। স্বামীজী মাদ্রাজ হইতে কলকাতায় আসিবেন। মাদ্রাজীরা আর তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না। স্বামীজী বলিলেন, "তোমাদের জন্য আমি একজন

নিষ্ঠাবান শুদ্ধাচারী, ধর্মপরায়ণ, সংস্কৃতজ্ঞ ও অতি সরল সন্ন্যাসী পাঠাইব।" মাদ্রাজীরা এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িলেন। এই সন্ন্যাসী অন্য কেহ নন। ইনিই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। যিনি কখনও বরাহনগর মঠ হইতে বাহিরে যান নাই, আজ তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আজ্ঞায় সুদূর মাদ্রাজে আসিয়া পৌঁছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের প্রধান কেন্দ্রস্থল মাদ্রাজে তাঁহার শুভাগমন হয় ১৮৯৭ সালে।

কলেজ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইংরেজির পাঠও ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর আদেশে মাদ্রাজ আসিতে হইবে বলিয়া তিনি একখানি ওয়েবস্টারের অভিধান ও স্কট বিরচিত 'আইভ্যান হো' নভেল কিনিলেন। আসিবার পথে ট্রেনে বসিয়াই এই নভেলটি শেষ করেন। মাদ্রাজ মঠের লাইব্রেরিতে আজও এই পুস্তক দুইখানি আছে। মাদ্রাজে আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে ছিল গঙ্গাজল ও তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুদেবের একটি আসল ফটো।[১]

মাদ্রাজ আসিয়া প্রথমে শশী মহারাজ সমুদ্র তীরস্থিত আইস হাউসের পাশে একটি ছোট ভাড়া বাড়িতে থাকেন। ইহা পার্থসারথি মন্দিরের নিকটে ও ট্রিপ্লিকেনের ভিতরেই। এখানে আসিয়া তিনি যথারীতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্বের মতো পূজা করিতে থাকেন। ইহা ছাড়া তিনি অনেক লোকের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে শহরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও ক্লাস এবং যাবতীয় গৃহ কর্মাদি করিতেন। কিছুকাল এই বাড়িতে থাকিয়া আইস হাউসের একটি ঘর ঠিক করিলেন। স্বামীজীও আমেরিকা হইতে ফিরিবার পথে এই বাড়িতে ছিলেন। এখন এই বাড়িটি গভর্নমেন্টের পরিচালিত বিধবাশ্রমে পরিণত হইয়াছে।[২] এখানে থাকাকালীন বেলুড় মঠ হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ শশী মহারাজের কাজে সহায়তা করিবার জন্য একজন ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। এই ব্রহ্মচারী পরে স্বামী পরমানন্দ বলিয়া পরিচিত হন। এই যুবক-সন্ন্যাসীর জীবনের পরিবর্তন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছেই হইয়াছিল। এখানে বেশি দিন তিনি থাকিতে পারিলেন না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই বাড়ি বিক্রী হইয়া যাওয়ায় ১৯০৭ সালে কপালীশ্বর মন্দিরের কাছে মায়লাপুরে ব্রডিস রোডের উপরে জনৈক ভক্ত-প্রদত্ত ভূমিতে ৫৫০০ টাকা ব্যয়ে স্থায়ী ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয়।

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্থূল শরীর থাকাকালীন সমাধি অবস্থায় বসা পাঁচখানি ফটো তোলা হয়। এই পাঁচখানির একখানি ফটো শশী মহারাজের কাছে থাকিত। সে খানি তিনি পূজা করিতেন। উহা এখনও মাদ্রাজ মঠের ঠাকুরঘরে রক্ষিত আছে।

২ আইস হাউসটি এখন মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের অধীনে। বর্তমান নাম বিবেকানন্দ ইলম। এখানে স্বামীজীর উপর একটি প্রদর্শনী আছে।

মঠ-বাড়িটি লাল বর্ণের একতলা বাড়ি। ইহার ভিত্তি বেশ উঁচু। চারিদিকে চারিটি ঘর ও মধ্যে একটি প্রশস্ত হল ঘর। পশ্চিম দিকে একটি ছোট উঠানের পাশে আর একটি বাড়ি। এই বাড়িতে রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর ও স্নানের ঘর। এই নূতন বাড়িতে আসিয়া শশী মহারাজ ছেলেমানুষের মতো এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "আহা এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাস করিবার যোগ্য চমৎকার বাড়ি। এখানে যখন শ্রীশ্রীঠাকুর থাকিবেন, তখন ইহাকে অতি যত্নে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে ও দেওয়ালে পেরেক বসাইয়া বা অন্য কোন প্রকারে যেন বাড়িটি বিকৃত না করা হয় তাহাও দেখিতে হইবে।" পরে একদিন শুভদিনে এখানে একটি ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। অপরটি স্বামী বিবেকানন্দের জন্য এবং তৃতীয় ঘরটি ঠাকুরের মানসপুত্র ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্য রাখিলেন।

মাদ্রাজে তাঁহাকে অতি কষ্টেই থাকিতে হইত। তিনি একাধারে পূজারি, রাঁধুনি, ভৃত্য, বক্তা ও লেখক। সব কাজ তাঁহাকে একাই করিতে হইত। এই সময় মঠের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। কখনও মঠের চাঁদা আদায় করা, আবার কখনও বা দিনে তিন চারিটি ক্লাস করিয়া ক্লান্ত হইয়া মঠে ফিরিতেন। রান্না করিয়া খাওয়ার আর শক্তি থাকিত না। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চাহিয়া তিনি সকলই সহ্য করিতেন। কখনও নিতান্ত দুঃখ যাতনায় ধৈর্যচ্যুতি হইলে তিনি অতি ভক্তিভরে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের কাছে মর্মবেদনা জানাইয়া তাঁহারই উপরে সমস্ত ভার ন্যস্ত করিতেন। যাঁহারা শশী মহারাজের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারাই কেবল তাঁহার এই সময়কার অবস্থা জানেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অগাধ ভক্তির দুই চারিটি দৃষ্টান্ত ভক্তমুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি ঃ

গ্রীষ্মকালে মাদ্রাজ বাঙলা দেশ হইতেও গরম হয়। উত্তাপ ১০৫ হইতে কখনও কখনও ১১০ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে। এই কালে একদিন রাত্রে ভয়ানক গরম পড়ে। শশী মহারাজ স্থূলকায় ছিলেন। গরমে তিনি ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন। হঠাৎ উঠিয়া ঠাকুর ঘর খুলিলেন ও একটি পাখা লইয়া শ্রীগুরুর সেবায় লাগিয়া গেলেন। সমস্ত রাত ঐভাবে কাটিয়া গেল। অবশেষে ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা পড়িলে তিনি ঠাকুরঘর ছাড়িয়া স্নানাদি করিতে যান।

আর একদিন ঠাকুরকে অন্ননিবেদন করিয়া দুধ গরম করিতে গিয়াছেন। একটু দেরি হইয়াছে দেখিয়া শীঘ্র গরম দুধ লইয়া ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার হাতে

গরম দুধ পড়িয়া যায়। ঠাকুরের কাছে আসিয়া দুধ তাঁহাকে নিবেদন করিতে করিতে সাক্ষাৎ চেতন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়া উঠিলেন, "এতই ব্যস্ত, একটু দেরি করিতে পারিলে না, আমার যে হাত পুড়ে গেল?"

আর এক সময়ে একদিন মঠে খাদ্যদ্রব্য কিছুই নাই। সকালে কিছুই নিবেদন করিতে পারেন নাই। দুপুর আসিল। তখনও কোথা হতে কিছুই আসে নাই। শশী মহারাজ ঠাকুরঘরে গিয়া বলিয়া আসিলেন যে—ঘরে কিছু নাই, তাই তোমাকে কিছু দিতে পারিলাম না। ঠাকুরকে না দিয়ে তিনি কখনও কিছু খাইতেন না। অতএব তাঁহারও ভাগ্যে সেদিন কিছুই জোটে নাই। অপরাহ্ণেও খাদ্য-দ্রব্য সংগৃহীত হইল না। সমস্ত দিন ঠাকুরকে কিছুই দিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখে-কষ্টে ঠাকুরের কাছে যাইয়া বলিলেন, "ঘরে কিছুই নাই, তা তোমায় কি দিব? যাই সমুদ্রের তীর থেকে বালি এনে তোমায় নিবেদন করিব ও পরে তাহাই প্রসাদ গ্রহণ করিব!" এই প্রকারে ঠাকুরের সহিত একপ্রকার ঝগড়া করিয়া তিনি সত্য সত্যই মঠ হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের দিকে চলিলেন। পথে একটি পরিচিত ভক্তের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি শশী মহারাজের হাতে একটি দশ টাকার নোট দিয়া বলিলেন, "এইটি ঠাকুরের সেবায় ব্যবহার করিবেন।" এই প্রকার অপ্রত্যাশিত ভাবে টাকা পাইয়া শশী মহারাজ ভক্তটিকে আদ্যোপান্ত ঘটনাটির বর্ণনা করিয়া তাঁহার সঙ্গে বাজারে গিয়া খাদ্য দ্রব্যাদি কিনিয়া মঠে ফিরিলেন এবং নিজহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া রাত্রে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ কত ঘটনাই যে ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ কে জানে?

আর একটি ঘটনা বলিয়াই শশী মহারাজের সেবার পরাকাষ্ঠার উদাহরণ শেষ করিব। মাদ্রাজে কোন একদিন ভয়ানক বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি ক্রমশই মুষলধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিতে থাকে। এই বৃষ্টির ধারায় ছাদ থেকে চুয়ে ঠাকুর ঘরে জল পড়িতে লাগিল। ঘরের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া শশী মহারাজ ঠাকুরের শরীরে যাহাতে জল না পড়ে সেজন্য একটি ছাতা খুলিয়া ঠাকুরের পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইভাবে সমস্ত রাত যতক্ষণ না বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছিল ততক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন।

ইহা হইতে মনে হয়, মহাবীর যেমন শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া জগতে দ্বিতীয় কিছুই জানিতেন না, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু জানিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন প্রস্তর-মূর্তির মধ্যে সাক্ষাৎ চৈতন্যময়ী ভবতারিণীকে

দেখিয়াছিলেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও সেইরূপ ফটোর ভিতরে সাক্ষাৎ জ্বলন্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতেন। ধন্য গুরুর ধন্য শিষ্য। "গুরু মেহেরবান্ তো চেলা পালোয়ান!"

দেখিতে দেখিতে এইপ্রকার সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া শশী মহারাজ সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল মাদ্রাজে কাটাইয়া ছিলেন। শেষে দুই একজন সাধু আসিয়া তাঁহার কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন। বহু বৎসরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িল ও তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। ১৯১১ সালে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলকাতায় আনা হইল। সেখানে দুই মাসের মধ্যে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

আজ দক্ষিণ-ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে বিরাট কার্য দেখিতে পাওয়া যায় উহার ভিত্তি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দই স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব তিনি নূতনভাবে প্রচলন করেন। এই উৎসব সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্র পর্যন্ত হইয়া থাকে। কেবল যে বিশেষভাবে পূজা হয় তাহা নহে, ইহাতে মানুষকে ভগবান জ্ঞানে যতভাবে সেবা করা যায় তাহা সবই আছে। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, কীর্তন, নৃত্য, হরিকথা, নানাভাষায় ভগবৎ-প্রসঙ্গ এবং বক্তৃতার তিনি আয়োজন করিতেন। ভজন ও নৃত্যে তাঁহাকে সকলের সঙ্গে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে দেখা যাইত।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" ও "স্বামীজীর কথোপকথন" ইংরেজিতে প্রকাশ করিয়া তিনি প্রচার-বিভাগ স্থাপন করেন। নিজেও "Message of the Eternal Wisdom" প্রভৃতি পুস্তক ইংরেজিতে ও শ্রীরামানুজাচার্যের জীবনী বাঙালা ভাষায় লেখেন। আজ এই প্রচার বিভাগ হইতে ইংরেজি, তামিল, তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষায় বহু পুস্তক এবং তামিল ও ইংরেজি ভাষায় দুইটি মাসিক পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া শুধু ভারতবর্ষে নয় সমগ্র জগতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবরাশি প্রচারিত হইতেছে। প্রচার কার্যের জন্য তিনি শুধু বই লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, নিজেও বক্তৃতা ও প্রসঙ্গব্যপদেশে দক্ষিণ-ভারতের বহু শহর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে ব্যাঙ্গালোর ও ত্রিবান্দ্রমের নাম উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি শহর দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাঙ্গালোরে একটি আশ্রম স্থাপন করেন এবং পরে ত্রিবান্দ্রমেও আর একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। তাঁহার প্রচারকার্য ভারতের বাহিরে বর্মা, সিংহল, সিঙ্গাপুর ও মালয় পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

তিনি যুবকদিগকে ভালোবাসিতেন। তাহাদের জন্য বিশেষ করিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পের ক্লাস করিতেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল। একদিন কোয়েম্বাটুরবাসী জনৈক নিঃসহায় যুবক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাহাকে মঠে রাখিয়াই চিকিৎসা করেন। পরে তাহার পড়াশুনা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। ইহাই মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের আরম্ভ। এই বিদ্যার্থী ভবন দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দৈনিক জীবনযাত্রা অতি নিয়মিত ছিল। তিনি প্রাতঃকালে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও বিষ্ণুসহস্র নাম পাঠ করিতেন।[১] ইহা একদিনের জন্যও বন্ধ হয় নাই। তিনি নিরামিষাশী ও অতি নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং নিবেদিত খাদ্য ভিন্ন অন্য খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। শেষ জীবনে ডায়েবেটিস্ রোগে আক্রান্ত হইলে ডাক্তারেরা তাঁহাকে গমের রুটি খাইতে বলেন। কিন্তু উহা নিবেদিত হইবে না জানিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গোঁড়া হিন্দু হইলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের সহিত তিনি মিশিতেন। একদিন মাদ্রাজে সেন্ট টমাস মাউন্ট দর্শন করিতে গিয়া অতি ভক্তিভাবে সেখানে গির্জায় গিয়া প্রার্থনা করেন। একদিন কোন মুসলমান তাঁহার কাছে আসিলে তিনি তাঁহার সহিত কোরান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সকাল ছয়টা হইতে পরদিন ছয়টা পর্যন্ত অসীম ধৈর্য ও উৎসাহের সহিত একাসনে অচল ও অটলভাবে বসিয়া অনেকদিন পূজা করিতে দেখা যাইত। গুরুভাইরা শুধু যে শশী মহারাজের এই ধৈর্যের প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে, তাঁহারা কখনও কখনও ঐ প্রকার ঘণ্টা নাড়িয়া পূজা করার উপর কটাক্ষ করিতেন। এই নিন্দাস্তুতিতেও শশী মহারাজকে কখনও বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। উৎসবাদিকে ধর্ম-সাধনের দ্বার স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সর্বদাই উহাদিগকে উচ্চস্থান দিতেন।

বাহির হইতে দেখিলে তাঁহাকে একজন গোঁড়া ভক্ত বলিয়া মনে হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অদ্বৈত বেদান্তভাবে সম্পূর্ণ ভাবিত ছিলেন। তিনি অদ্বৈত বেদান্ত বুঝিবার উপযুক্ত আধার ব্যতীত সাধারণ লোকের সহিত কখনও উক্ত

---

১ বই দুইখানি মাদ্রাজ মঠের ঠাকুর ঘরে এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।

বিষয় আলোচনা করিতেন না। যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারাই মাত্র তাঁহার বৈদান্তিক অন্তঃপ্রবাহ, সাম্যভাব ও অনাসক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। একদিন কোন ভক্ত শশী মহারাজের এই প্রকার ভাবের কথা প্রকাশ করিলে তিনি বলেন, "আমি সর্বদাই একত্বে পূর্ণ! একত্বই (দুই বিহীন) অদ্বৈত—উহাই পবিত্রতা এবং ইহার অর্থ অভীঃ (ভয়শূন্যতা)। যেখানে দুইয়ের অস্তিত্ব আছে সেখানেই ভয়। যখন আমরা একাকী, তখন আমরা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী নাচিতে ও গাইতে পারি, কিন্তু যখনই কোন বন্ধু আসেন তখনই আমাদিগকে সতর্ক হইতে হয়। যেখানেই দুই সেখানেই ভয়, যেখানে এক সেখানে ভয় কোথায়? যতক্ষণ ভয় আছে ততক্ষণ শান্তি কোথায়? অতএব এস, আমরা বলি আমিই একমাত্র, আমার দ্বিতীয় কিছুই চাই না।"

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—সব ধর্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। শশী মহারাজের জীবন শ্রীগুরুর পাদপদ্মে চিরতরে সমর্পিত ছিল। তিনি ছিলেন শরণাগতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে বিভোর থাকিতেন। তাঁহার জীবন ভক্তি ও সেবার সমন্বয়-স্বরূপ ছিল।

(উদ্বোধন : ৪৪ বর্ষ, ৮ সংখ্যা)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

ব্রহ্মচারী সৎচৈতন্য

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পূর্ব নাম শশিভূষণ চক্রবর্তী। তিনি শশী মহারাজ নামে আমাদের নিকট পরিচিত। তাঁহার পূর্বাশ্রম ছিল কলকাতার পটলডাঙ্গায়। তিনি ছেলে বেলায় হিন্দু ধর্মে নিষ্ঠাবান হইলেও কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ধর্মানুরাগ ও মেধাশক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঐ ঘনিষ্ঠ ব্যবহারের ফলে কিছুদিন শশী মহারাজ তাঁহার ছেলেদের গৃহশিক্ষকের কার্য করিয়াছিলেন। তিনি যখন বি.এ. পড়িতেছিলেন তখন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের নিকট যান। তাঁহার আন্তরিকতা ও অনুরাগ শীঘ্র পরমহংসদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইভাবে তিনি জীবনের আদর্শ পাইয়া তাঁহাকেই সর্বস্ব জ্ঞান করিলেন। প্রতি আচার ব্যবহারে এবং দৈনন্দিন কর্মে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল কার্য করিতেন। তৎ চিন্তাই তাঁহার সার হইল।

ঠাকুর পরমহংসদেব যখন কাশীপুরের বাগানে কঠিন গলরোগে শয্যাগত, তখন শশী মহারাজ গুরুসেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন। তাঁহার এই গুরুসেবা ছিল অতুলনীয়। রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসিশিষ্যগণ সকলেই ভগবানকে সারাৎসার জানিয়া তল্লাভে কেহ কঠোর তপঃ অনুষ্ঠানে, কেহ অনন্যচিত্ত হইয়া ব্রহ্মানুধ্যানে, কেহ সারারাত্রি ধুনি জ্বালাইয়া পবিত্র অগ্নির সম্মুখে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সেই বস্তুলাভের চেষ্টায় দৃঢ়ব্রতী, কেহ বা ঈশ্বর লাভ হইতে বিলম্ব হইতেছে মনে করিয়া মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল হইয়া সুদূর তীর্থযাত্রার কঠোরতা সহ্য করিতেছেন, কিন্তু গুরুগত প্রাণ শশী মহারাজ সাধন ভজন সব ভুলিয়া গুরুসেবায় নিমগ্ন। কাশীপুর বাগানে সকলেই গুরুসেবাকে উদ্দেশ্য করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর লাভের আবেগে সকলে কিছু না কিছু তপশ্চর্যা করিতেছেন, শশী মহারাজ গুরুসেবায় অচল অটল, সুমেরুবৎ স্থির। অবশ্য পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরানি ঐ সেবার ভার লইয়াছেন, কিন্তু শশী মহারাজ ইহাতে এত তৎপর যে অপরকে প্রায় কিছু করিতে দিতেন না। কখন

কোন্ জিনিসটি হইলে যথাযথ হয় তদ্বিষয়ে তিনি সর্বদা সতর্কদৃষ্টি এবং গুরুর আদেশ পালনে সদা প্রস্তুত থাকিতেন। আর তাঁর সকল কাজে এত গভীর মনোনিবেশ ও অনুপ্রাণতা থাকিত যে তাহা যথাযথসম্পন্ন হইতে বাধা পাইত না।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে, উহার গভীরতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরমহংসদেব বরফ খাইতে ভালোবাসিতেন এবং শশী মহারাজ গুরুদর্শনে যাইতে হইলে যথাসাধ্য কিছু লইয়া যাইতে হয়, ইহা তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তাই তিনি মধ্যে মধ্যে বরফ লইয়া যাইতেন। একবার আলমবাজার হইতে তিনি এক পয়সার বরফ লইয়া হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরে যান এবং তিনি তথায় যাইলে পরমহংসদেবও বলিলেন, "এই সময় যদি বরফ পাওয়া যাইত তো খাইতাম।" শশী মহারাজ অমনি গামছা হইতে বরফটি খুলিলেন এবং তাঁহাকে খাইতে দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এক পয়সার বরফ এতটা রাস্তা আসিয়াও একটুও কমে নাই। শশী মহারাজ উহা এমন নিখুঁতভাবে গামছায় মুড়িয়া আনিয়াছিলেন যে উহার মধ্যে একটুও বাতাস প্রবেশ না করায় উহা নষ্ট হয় নাই! সর্ববিষয়েই শশী মহারাজ নিয়ম-নিষ্ঠা পূর্ণভাবে বজায় রাখতেন। তিনি ছিলেন—যেমন ভদ্র তেমনই আচারশীল। তাঁহার প্রতিকার্যে philosophy-র আড়ম্বর না থাকিলেও তাহাতে প্রাণশক্তি ছিল। একটি ছোট দৃষ্টান্ত—তিনি কোন দূরের ব্যক্তি বা বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া দেখাইতে কখনও তর্জনী অঙ্গুলি ব্যবহার করিতেন না; বলিতেন— তর্জনী নিক্ষেপ অহংকারসূচক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধি লাভের পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার সন্ন্যাসিশিষ্যগণ আর গৃহে ফিরিলেন না, বরাহনগরে এবং পরে আলমবাজারে ভাড়াটিয়া বাড়িতে সাধনভজন ও ঠাকুর সেবা লইয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় এবারও শশী মহারাজ অগ্রণী। তখন মঠে অত্যন্ত অর্থ কষ্ট। কোন কোন সময় মাসাবধিকাল অর্থাভাবে সেবকদের নিয়মিত আহারাদি হইত না, হয়তো নুনভাত ও তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ খাইয়া দিন যাপন করিতে হইয়াছে। অনেক সময় মঠবাড়ির ভাড়ার টাকার অভাবে সকলে মিলিয়া আশ্রম তুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু শশী মহারাজ নাছোড়বান্দা। তিনি ঐ মঠে গুরুপাদুকার সেবা লইয়া না খাইয়া মরিবেন তো অন্যত্র যাইবেন না। এ লইয়া লাঠালাঠি পর্যন্ত হইত কিন্তু তিনি এতটুকুও বিচলিত হইতেন না; পরন্তু গুরুসেবায় পূর্ববৎ নিষ্ঠাবান। ঠাকুরের নৈবেদ্যের ছোলাগুলির মুখটি কাটা হইতে, তাঁর দাঁতন

দেওয়া পর্যন্ত সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি অতীব নিষ্ঠাবান। তিনি যে কোন কাজ করিতেন, এত প্রাণ মন দিয়া করিতেন যে সামান্য কাজ হইলেও তাঁহাতে তিনি ডুবিয়া গিয়া সানন্দে থাকিতেন।

সেবাকালে তিনি এত নিঃশব্দে ও স্থিরভাবে কাজকর্ম করিতেন যে তিনি আছেন কিনা কেহ জানিতে পারিত না। একবার একজন সেবক ঠাকুর ঘরের কুলুঙ্গি হইতে কোন জিনিস আনিতে গিয়া সেটি ফেলিয়া দেন, শশী মহারাজ তাহার পিঠে একটি চড় বসাইয়া দিলেন। পরে তাহাকে আবার ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন, "যখন যে কাজ করিবে খুব মনোযোগ দিয়া করিবে; আর অতি ধীরভাবে হাঁটিবে, যেন শব্দ না হয়, দেখনা লক্ষ্মী পদ্মের উপর থাকেন তবু পদ্ম ডোবে না। তোর মনটা বড় টলমল করে, একটু স্থির হবার চেষ্টা করবি।" এই বলিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি শাসনে একটু রুক্ষ হইলেও সর্বদা কল্যাণকামী ও প্রেমবান ছিলেন। যাহাকে গালাগালি দিতেন তাহাকেই অধিক ভালোবাসিতেন। তিনি বলিতেন, "আমার বড় ইচ্ছা তোরা ঠাকুরের জীবনের অনুকরণে সব জীবন গঠন করে প্রকৃত মানুষ হোস, তোদের সব ভালো দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়।" আবার কাহাকেও ক্ষুণ্ণ বা বিমর্ষ দেখিলে তিনি তাহার দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত অস্থির হইয়া পড়িতেন এবং কাহারও ভিতর সামান্যমাত্র গুণ দেখিলে তাহাকে ঐ বিষয়ে সমধিক উৎসাহিত করিতেন। তিনি নিজে যেমন সর্ব বিষয়ে ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া চলিতেন, অপরে সেইরূপ চেষ্টা করিলে খুব আনন্দ অনুভব করিতেন।

তাঁহার কড়া শাসনে যে কেহ থাকিত মানুষ হইয়া যাইত। তাই বলিয়া তিনি কম ভালোবাসিতেন না। একবার এক যুবক এম-এ পড়িতে পড়িতে বৈরাগ্যবান হইয়া মাদ্রাজস্থ আশ্রমে তাঁহার নিকট গিয়া পড়িল; তিনি অসময়ে যাওয়ায় তাহার খাওয়া দাওয়ার ও স্বাচ্ছন্দের জন্য তিনি সমধিক ব্যস্ত হইলেন এবং বিশ্রামের পর মিষ্ট আলাপনে তাহার সম্বন্ধে সকল বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে সাধু জীবন যাপনে উৎসাহিত করিলেন। তিনি ছিলেন practical লোক। তিনি তাহাকে একখানা চণ্ডী আনিয়া পড়িতে দিলেন ও কয়েকটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। তাহার শাস্ত্রাধ্যয়ন না থাকায় ব্যাখ্যায় অল্প একটু ভুল হইল; তাহাতে শশী মহারাজ বলিলেন—"তা তোমার হয়ে যাবে"। যুবককে আশ্রম ঝাঁট দিতে দেওয়া হইল; যুবক কোমল স্বভাব তার উপর সাধু হইতে আসিয়াছে—একটি মাকড়সা দেখিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে সরাইয়া দিতেছিল।

শশী মহারাজ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ওটাকে মেরে ফেল" ইংরেজিতে বলিলেন, "তুমি যদি ওকে না মার ও তোমাকে মারবে।" শশী মহারাজ মাদ্রাজে থাকিয়া অধিক সময়ে ইংরেজিতে কথা কহিতেন।

তিনি সংস্কৃতে খুব পণ্ডিত ছিলেন। একবার দক্ষিণ দেশে পণ্ডিত সমাজে সংস্কৃতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সাধারণে যেমন রেলগাড়িতে যাতায়াত কালে নভেল পড়িয়া সময় কাটায়, তিনি তেমনি সংস্কৃত নাটক পড়িয়া কাটাইতেন। একবার মাদ্রাজ হইতে কলকাতা আসিবারকালীন গাড়িতে 'হনুমৎবিজয়ম্' নামক নাটক পড়িয়া শেষ করিলেন। আবার এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁর নিষ্ঠা একটুও কমিত না। একবার মঠ হইতে স্বামীজী লিখিত 'ওঁ হ্রীং' নামক সংস্কৃত স্তোত্রের একস্থলের ভ্রম সংশোধন করাইয়া তাঁহার নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়, তিনি অনুমোদন তো করিলেনই না, বরং বলিয়া পাঠাইলেন—এই স্তোত্র যেমন আছে, তেমনই যেন আবৃত্তি করা হয়; উহা ভুল নয়, আর্ষ প্রয়োগ।" এই ব্যাপারে স্বামীজীর প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধার নিদর্শন পাওয়া যায়।

তিনি গুরুভাইদের গুরুসদৃশ দেখিতেন; বিশেষত রাখাল মহারাজকে। একবার রাখাল মহারাজ যখন মাদ্রাজ আশ্রমে ছিলেন, তখন একটি দরখাস্ত লইয়া তাঁহার সহিত তাঁহার মতান্তর হয়, তাহাতে রাখাল মহারাজ মাদ্রাজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে উদ্যত হন, এমন সময় তিনি সাষ্টাঙ্গ হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন এবং বলিলেন "মহারাজ ... আপনি ইচ্ছা করিলে আমার মতো কত শশীর সৃষ্টি করিতে পারেন।" প্রসঙ্গক্রমে পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ স্বামীর প্রতি তাঁর গুরুসদৃশ ভক্তির উল্লেখ করিয়া আমাদের রাখাল মহারাজের বিষয় কয়েকটি কথা মনে পড়িতেছে; উহা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

পূজনীয় রাখাল মহারাজ একবার সেতুবন্ধ তীর্থে যাত্রা করিবার কালে প্রথম শ্রেণির একটি berth reserved করিবার কথা হয়; কিন্তু তিনি প্রথম শ্রেণিতে সাহেব সুবো যায় জানিতেন এবং তাহাদের সহিত একত্র যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন; এ বিষয়ে তিনি বরাবর একটু nervous বলিয়া বোধ হইত। এখন কি হইবে? দৈবক্রমে, একটি মাত্র berth আছে এমন একটি অতি ছোট compartment পাওয়া গেল। মহারাজ নিঃসঙ্কোচে সেবার তীর্থযাত্রা করিলেন। তিনি এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন—"এঁরা এমন পুরুষ যে ইঁহাদের সুবিধার জন্য ভগবান স্বয়ং পূর্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।"

ইনি বলিতেন, "মহারাজ এত উচ্চ অবস্থায় সর্বদা থাকিতেন যে কেবল আমাদের কল্যাণের জন্য জোর করিয়া সামান্য বিষয়ে মন দিয়া রাখিতেন।" এইরূপ একবার একজন নূতন ব্রহ্মচারী মহারাজকে খেলিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হন; তাহাতে শশী মহারাজ পাছে ছেলেটি নূতন বলিয়া ঠিক বুঝিতে না পারে তজ্জন্য মহারাজের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা, সরলতা ও উদারতা সম্বন্ধে নানা উদাহরণ দিয়া তাহাকে বোঝান। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মহারাজ এত সরল ও নির্ভীক ব্যবহার করিতেন যে ঠাকুর বালকের মতো একবার বলিয়াছিলেন, "আমি গেলে তোকে কে দেখবে! তুই এত সরল!"

শশী মহারাজ অতি সামান্য বিষয়েও অশিষ্ট বা চঞ্চল ব্যবহার সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার এক ভদ্রলোক আলমবাজার মঠে যান। শশী মহারাজের সম্মুখে বসিয়া তিনি কথা বলিবার সময় পূর্ব স্বভাববশত পা নাড়িতে থাকেন, তাহাতে তিনি বলেন "বাবু, ঠাকুর বলিতেন, এরূপ পা নাড়ান ভালো নয়।" আবার তিনি যখন গাত্রোত্থান করিলেন তখন বলিলেন, "মহাশয় এখন আমি যাচ্ছি", তাহাতে শশী মহারাজ বলেন—"বাবু, যাচ্ছি বলবেন না, বলুন এখন আসি।" তিনি সর্ব বিষয়ে এরূপ নিখুঁত ছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে যখন তিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া কলকাতায় উদ্বোধন অফিসে (মায়ের বাড়িতে) রোগ শয্যায় শায়িত তখন একটি যুবক ভক্ত তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে আসিতেন। তিনি এত সরলভাবে ও হাস্য কৌতুকের সহিত তাহাদের সহিত মিশিতেন যে সকলেই নিঃসঙ্কোচে মাঝে মাঝে রসিকতাপূর্ণ গল্প গান করিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে তাঁহাকে সুখে সেবা করিতে পারিতেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে ঐ যুবকও একটি হাসির গল্প বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি একবার পুরীধামে তীর্থ দর্শনে যাই; তথায় একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে বালুর চরে এক স্থানে দেখি যে একটি অতি ক্ষুদ্র গম্বুজাকৃতি মন্দিরের মধ্য হইতে 'ওম্ ওম্' ধ্বনি গম্ভীরভাবে বাহির হইতেছে; উহা ছোট গম্বুজে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় বেশ সুন্দর শোনাইতেছে এবং পথিক তীর্থযাত্রিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। আমরা গিয়া দেখি একটি বৃদ্ধ, রুক্ষ-দর্শন, দাড়ি খোঁচা খোঁচা, পায়ে গোদ মন্দির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছে যে ইহার ভিতর একজন সাধু আছেন—ধ্যানস্থ। অনেকে মনস্কামনা পূর্ণ হইবার জন্য টাকা পয়সা দিয়া ঔষধাদি লইতেছেন; এক বৃদ্ধা নিজ কন্যার পুত্র কামনায় কয়েকটি টাকা দিয়া গেল। আমাদের কৌতুক হইল। দেখি এর ভিতর কি আছে

গলিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কারণ তাহার দ্বার এত ক্ষুদ্র যে ভিতরে প্রবেশ করা দুরূহ, অবশেষে পশ্চাতের ফোকর দিয়া দেখিলাম যে ঐ বৃদ্ধের অনুরূপ আকৃতি তাহার পুত্র, যে একটু আগে বাহিরে ছিল, সেই ভিতরে গিয়া বসিয়া ঐরূপ শব্দ করিতেছে এবং এইরূপে যাত্রীকে ঠকাইয়া দুপয়সা রোজগার করিতেছে। তখন আমরা বুড়োকে বলিলাম—ভিতরে কে আছে আমরা অবশ্য দেখিব। আমরা জানিতে পারিয়াছি, বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ বলিল—"বাবা, পেটের দায়ে এইরূপ দুপয়সা রোজগার করি, আপনারা বাধা দেবেন না।"

এইরূপ গল্প বলিয়া তীর্থের পাণ্ডারা কিরূপে লোক ঠকায় জানাইয়া আমরা সমবয়স্ক অনেকে উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলাম। শশী মহারাজও ইহার পূর্বে খুব হাসিতে ছিলেন, তিনি গল্প শুনিয়া হঠাৎ এত গম্ভীর হইয়া গেলেন যে আমরা আশ্চর্য হইয়া গেলাম। সকলে হাসিতেছে, তিনি কিন্তু হঠাৎ ধীর স্থির, চিন্তাশীল। তিনি এইরূপে মনোভাব সংযত করিতে পারিতেন। তারপর অতি গম্ভীরভাবে আমাদের বলিলেন—"দেখ, ঐরূপ সন্দেহের মন নিয়ে তীর্থে যেও না, তীর্থে যেরূপ মন নিয়ে যাবে সেরূপ দর্শন হবে। তীর্থ মহা পবিত্র ভূমি, ঐরূপ বুদ্ধি লইয়া গেলে অকল্যাণ হয়; উহা অত্যন্ত খারাপ; দুষ্ট লোকেরা ঐরূপ করিয়া থাকে; তাহাদের তীর্থে যাওয়া বিড়ম্বনা, যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।"

যুবক এই সৎশিক্ষা জীবনে কখনও ভুলে নাই এবং উহাতে আমার মহা কল্যাণ হইয়াছে। শশী মহারাজ ছিলেন স্বচ্ছ জলের মতো নির্মল। লজ্জা, মান ও ভয় তাঁকে স্পর্শ করে নাই। তিনি বেশির ভাগ সময় গম্ভীর থাকিলেও তাঁহার সহিত মিশিলে তাঁহার উদার হৃদয়ের মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। তিনি এরূপ ভাবে নূতন ব্রহ্মচারীদের শাসন দ্বারা গঠন করিতেন যে—যে কেহ তাঁহার গাল খাইয়াছে, সে বুঝিত যে উহার মধ্যে কত ভালোবাসা, কত টান বিদ্যমান। তিনি গাল না দিলে তাহাদের মনে হইত তিনি বোধ হয় তাহার উপর বিরূপ বা উদাসীন—এতটা স্নেহ তাঁহার রূঢ় বাক্যের মধ্যেও ছিল।

মাদ্রাজে স্থিতি কালে তিনি যে কেহ আশ্রমে যাইত সকলকেই ঠাকুরের প্রসাদী নারকেলের নাড়ু না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। তাঁহার একাগ্রতা, তন্ময়তা এবং কার্যের দৃঢ়তা ও গুরুত্ব তাঁহার রচিত রামানুজ চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়াছে। কাজের মধ্যে ডুবিয়া কিরূপে নিজেকে হারাইতে হয় তাহার আদর্শ

শশী মহারাজের জীবন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যেক সন্ন্যাসী শিষ্যের এক একটি বিশেষত্ব আছে। শশী মহারাজের বিশেষত্ব এইখানে। উপসংহারে তাঁহার উদারতা, তেজস্বিতা ও আচার্য ভক্তির একটি কথা বলিয়া প্রসঙ্গ সমাপন করিব।

তিনি দক্ষিণদেশে একবার এক সভায় নিমন্ত্রিত হন। তথায় তিনি একজন পণ্ডিতের জগৎবরেণ্য আচার্য শঙ্করের সম্বন্ধে ভক্তিহীনতা ও অনুদারতার দোষারোপে বিচলিত হইয়া সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন এবং বলেন যে, যেখানে আচার্য নিন্দিত সেখানে আমি থাকিতে পারি না। আচার্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এইরূপ গভীর ও তীব্র ছিল। আবার তাঁহার লিখিত রামানুজ-চরিত পাঠ করিলে দেখা যায় কি শ্রদ্ধা ও প্রীতির তুলিকায় তাহা অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাই ছিল তাঁহার জীবনের ভূষণ।

একদিন তিনি জনৈকের নিকট যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা কতদূর ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আমরা গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়ি এবং কেহ আসিয়া বলে, 'তোমায় বাহিরে যাইবার রাস্তা দেখাইয়া দিতে পারি'; তাহা হইলে আমরা কি করি; নিশ্চিতই আমরা তাহার অনুসরণ করি। এই কার্যে আমরা তাঁহার প্রতি যে কৃতজ্ঞতা অনুভব করি, তাহাকেই ভক্তি এবং আরাধনা বলে। গুরু এইরূপ একজন ব্যক্তি। আমাদের তাঁহাকে নিঃসংশয়ে অনুসরণ করা উচিত। তাহা হইলে আমরা এই জগৎ গোলক ধাঁধা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। কিন্তু আমরা কখনও কখনও মনে করি—কেন তাহাকে অনুসরণ করিব? আমার নিজের পথ আমি নিজেই বাহির করিব? তাই আমরা স্বাধীন ভাবে চলি। কিন্তু এই পথ-প্রদর্শক এত ধীর এবং আমাদের প্রতি এত প্রেমময় যে তিনি, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না একাকী পথ বাহির করিতে গিয়া তাঁহার নিকট পুনরায় সাহায্যের জন্য ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ অপেক্ষা করেন।

গুরুর কাজ কয়েক মুহূর্তে সম্পন্ন হইয়া যায়—ইহা বুঝাইবার জন্য একদিন সন্ধ্যাকালে মায়লাপুরে তিনি নিম্নলিখিত উদাহরণটি দিয়াছিলেন। যথা—যখন একটি লোককে সাইকেল চড়িয়া যাইতে দেখা যায় এবং যদি কেহ দেখে সম্মুখে তাহার রাস্তা বিপজ্জনক, তাহা হইলে তিনি তাহাকে সতর্ক করিয়া, আর এক দিক দিয়া যাইতে বলিয়া দেন। লোকটি পূর্বের মতোই—প্যাডেল করিতে থাকে; এবং সাইকেলও চলে। কিন্তু লোকটি বিপদ এড়াইয়া অন্য রাস্তা দিয়া চলিয়া গন্তব্য পথে পৌঁছায়। সেইরূপ গুরু শিষ্যকে কুপথ হইতে ঘুরাইয়া সুপথে চালিত

করেন। শিষ্যের কাজ পূর্বের মতোই চলিতে থাকে কিন্তু ঘোর নিরাপদে। যথার্থ পথ দেখানই গুরুর কাজ।

তিনি দম্ভ অহঙ্কার দেখিলে সহিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন যে, যে ব্যক্তি ধর্ম পথে থাকবে, তাহার মিথ্যার সহিত রফা করা চলিবে না। যখন এক ব্যক্তি অপরের উপর প্রভুত্ব করিবে তখন সে সব কিছুই অন্যায় কার্য করে। কিন্তু ভগবান মানুষের মন অধিকার করিলে অসাধু পবিত্র এবং ধার্মিক হয়। সত্য বটে যতক্ষণ আত্মা দেহে থাকে—ততক্ষণ তাহার একটু না একটু অহংকার থাকে। অহংকার মোটেই না থাকিলে জীবাত্মাই থাকিত না। কারণ যদি অহংকারকে পৃথক কর, কি বাকি থাকবে? কেবল মাত্র ঈশ্বর। সন্ন্যাসীর পক্ষে অহংকার থাকা মোটেই শোভা পায় না। তাহাকে তাহার অতিশয় মিত্রের প্রতি যেমন পরম শত্রুর প্রতিও তেমন ব্যবহার করা উচিত। এই জন্যই আমরা সন্ন্যাসী হইয়াছি—লোকে ভালো বা মন্দ ব্যবহার করুক—তবুও আমরা প্রত্যেককে সাহায্য করব।

একদিন সন্ধ্যাকালে মায়লাপুর মঠে একজন একটি সন্ন্যাসীর আশ্চর্য রকমের শক্তির কথা বলিল। কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর এত ক্ষমতা সত্ত্বেও কারও উপকার করে না। ইহা শুনিয়া তিনি একটু ঘৃণার সহিত বলিলেন, "স্বার্থপর লোকের পক্ষে স্বাস্থ্যবান ও বলবান হওয়া সহজ। এইরূপ লোক বৃষ্টির সময়—যদি কোনও বন্ধুর অসুখের কথা শুনে তাহা হইলে বলে যে এই বৃষ্টির সময় তাহার নিকট যাওয়া আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমি নিজে পীড়িত হইয়া পড়িতে পারি এবং বন্ধুকে বলিয়া পাঠায় যে আমি যাইতে পারিলাম না কিন্তু বড়ই দুঃখিত। যখন বৃষ্টি থামিবে আমি যাইলেও যাইতে পারি। কিন্তু নিঃস্বার্থ লোক বন্ধুর অসুখ শুনিলেই মাথায় চাদর বাঁধিয়া সেই বৃষ্টিতেই রওনা দেয়। রাস্তায় কি বিপদ হইবে না হইবে তাহা অত ভাবিয়া দেখে না। স্বামী বিবেকানন্দ যদি শুনিতেন যে কোনও বন্ধুর জ্বর হইয়াছে তাহা হইলে তিনি ঝড় ঝাপটা না মানিয়া তাহার বাড়িতে যাইতেন। তিনি একজনের জীবন বাঁচাইতে নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত থাকিতেন।"

(উদ্বোধন ঃ ৩৪ বর্ষ ৭ ও ৮ সংখ্যা)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী ধর্মেশানন্দ

পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রাণতার বিকাশ দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন রামকৃষ্ণানন্দ। প্রকৃতপক্ষেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ধ্যান, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জ্ঞান, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রাণ, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সর্বস্ব ছিলেন। বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ শশী মহারাজ একমনে একপ্রাণে একাই রন্ধন করা, বাসন মাজা, জল তোলা, ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরপূজা ও আশ্রমের অধ্যক্ষতা পর্যন্ত সকল কার্য সম্পাদন করিতেন। মঠে একজন চাকরের সহিত তিনি জলতোলা প্রভৃতি তুচ্ছ কর্ম এরূপ নিরভিমান ও গোপনভাবে করিতেন যে, চাকরটি বহুকাল তাঁহাকে একজন সহকর্মী বলিয়া মনে করিত।

শশী মহারাজ স্বহস্তে রন্ধন ও নিরামিষ আহার করিয়া নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। যৌবনের প্রাক্কালে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়াও তাঁহার নিষ্ঠার শৈথিল্য দেখা যায় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে আমিষ আহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে স্বামীজীর আদেশে তিনি যে দাক্ষিণাত্যে প্রচারোদ্দেশ্যে যাইবেন এবং নিষ্ঠাবান দক্ষিণদেশীয়গণের সহিত সুদীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষকাল যাপন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব প্রচার করিবেন, ইহা যেন পূর্বেই নির্দিষ্ট ছিল। বরাহনগরে তাঁহার তীব্র তপস্যার জীবন স্মরণ করিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তখন বরাহনগর মঠের সকলেই অপ্রতিগ্রাহী ছিলেন। কাহারও নিকট মঠের জন্য কিছু চাহিতেন না। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আকাশবৃত্তি অবলম্বনে দিনযাপন করিতেন। একবার অভিমান করিয়া সকলে উপবাসী রহিলেন। সারাদিন কাটিয়া গেলে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে একজন ধনী লোক ভৃত্য দ্বারা ভোগ্য-দ্রব্য প্রেরণ করেন। ভৃত্য দরজায় ধাক্কা দিতেছে শুনিয়াও কেহ অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া শেষে তাহার চিৎকারে শশী মহারাজ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী মাথায় একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়াছে। ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার মহিমা জানিয়া তাঁহারা সেই রাত্রি ঐ সমস্ত দ্রব্য ঠাকুরকে ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইরূপ আর একটি ঘটনা তাঁহার মাদ্রাজ মঠে অবস্থানকালে

ঘটিয়াছিল। আশ্রমে কিছু না থাকায় তিনি অভিমান করিয়া সমুদ্রের বালির পিণ্ড ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই খাও, আমিও আজ ইহাই প্রসাদ পাইব!" তখন আশ্রমে তিনি একা থাকিতেন এবং সকল কাজ তিনি একাই করিতেন, এমন সময় নানাপ্রকার খাদ্যাদি লইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া নিবেদন করিল, "ঠাকুরের জন্য পূজোপঢৌকন আনিয়াছি, গ্রহণ করুন।" শশী মহারাজ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে উহা ঠাকুরকে যথাবিধি নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপরে নির্ভর তাঁহার জীবনের একটি বিশেষত্ব ছিল। পূজার সময় ধ্যানকালে তাঁহার তেজোময় মূর্তি জ্যোতির্ময় হিমাচলসদৃশ বলিয়া অনুমিত হইত।

আমেরিকাবাসিনী ভক্তিমতী দেবমাতা কিছুকাল তাঁহার সহিত মাদ্রাজ আশ্রমে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "শশী মহারাজের ধৈর্য মানবে অসম্ভব।" একবার দেবীপূজা উপলক্ষে দেবমাতা তাঁহাকে সকাল হইতে পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত প্রায় ২৪ ঘণ্টা একসঙ্গে একাসনে বসিয়া পূজা ও জপধ্যানাদি করিতে দর্শন করিয়া বিস্মিতা ও মুগ্ধা হইয়াছিলেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ভক্তিতে সবই সম্ভব।

তিনি ভক্তের উদাহরণস্বরূপ কাকরূপী রামভক্তের কথা বলিতেন। তপস্যাকালে অত্যন্ত পিপাসায় কাতর হইয়াও মুহূর্তের জন্য রামনাম জপের বিরাম হইবে এই আশঙ্কায় জল পান করিতে গিয়াও সেই কাক জলপান করিতে পারে নাই। ভক্তিই ভক্তের প্রাণ। ভক্তির শক্তিতে আমিত্বের বিনাশ হয়। তিনি কোন কর্মকে ছোট মনে করিতেন না, পরন্তু সর্বকর্ম শ্রীশ্রীঠাকুরের বলিয়া মনে করিতেন। মাদ্রাজে প্রথম অবস্থায় যখন তাঁহাকে আশ্রমের প্রায় সকল কর্ম করিতে হইত, তখন তাঁহাকে নিবিষ্টমনে ঠাকুরের জন্য তরকারি কুটিতে দেখা যাইত। সন্ধ্যারতির পর তিনি ভক্তদের লইয়া যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে দুই ঘণ্টাকাল যাপন করিতেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে যেন এক জ্যোতি বাহির হইয়া ভক্তদের মনোরাজ্যে ভাবান্তর আনয়ন করিত। সকলে তখন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইতেন।

শশী মহারাজ ঠাকুর পূজাকালে এত বিভোর থাকিতেন যে, তাঁহার তখন বাহ্য জ্ঞান থাকিত না। অন্তরে দেবতাকে তিনি মনোরাজ্য হইতে আকর্ষণ করিয়া সম্মুখে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। তখন তাঁহার নিকট ইষ্ট ভিন্ন সকল বস্তু ও ব্যক্তি যেন অদৃশ্য হইত। তাঁহার সঙ্কোচ,

লজ্জা ও ভয় থাকিত না। একবার এক যুবক মাদ্রাজ-মঠে তাঁহার পূজাকালে নিম্নলিখিত ঘটনা দেখিয়া চমৎকৃত হন ঃ তিনি বলেন, শশী মহারাজ সকালে শহরে ক্লাস করিয়া আসিয়া সেদিন একটু বিলম্বে ঠাকুরের পূজা করেন। রান্নাঘর হইতে একটি বড় বাটিতে করিয়া একবাটি গরম দুধ দুই হাতে ত্রস্তপদে লইয়া যাইতেছিলেন, দেখিলাম তাঁহার হাত দুইটি লাল হইয়া গিয়াছে। একে গ্রীষ্মকালে সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত, তার একফোঁটা দুধ যেন মাটিতে না পড়ে, এইভাবে খুব সতর্কতার সহিত দ্রুত ঠাকুরঘরে যাইয়া ঠাকুরের সম্মুখে গরম দুধের বাটি রাখিয়া যেন একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "নাও, খাও!" যেন নিজের পিতামাতার প্রতি ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, আমি এত তাড়াতাড়ি কি পারি? আবার দেরি হইলে পিত্ত পড়িবে তো! অতএব আমার কি দোষ? তার যদি একফোঁটা দুধ মাটিতে পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে তো আজ আর খাওয়া হইত না! আর একবার মাদ্রাজে বর্ষাকালে ঠাকুরঘরটি ভাঙ্গা থাকায় রাত্রিতে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। তিনি সারারাত্রি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির উপর একটি ছাতা ধরিয়া কাটাইয়াছিলেন। গরমের সময় সারা দুপুর এমনভাবে তন্ময় হইয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেন যে, মনে হইত সত্যই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিকৃতিতে আবির্ভূত হইয়া গ্রীষ্মে ক্লান্ত হইয়া তাঁহার সেবা লইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেন বলিয়া তামাকের কলকেটি লইয়া হাত বাড়াইয়া নিষ্পন্দভাবে অপেক্ষা করিতেন, দাঁতনটি ছেঁচিয়া দিতেন, আর ঠাকুরের মুখশুদ্ধির জন্য একটি পান কম সাজিলে বা চুন বেশি হইলে কঠোর শাসনে সেবককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। ঠাকুরের সেবায় তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল যথার্থই অপূর্ব।

দেবমাতা একবার তাঁহার আলুথালু বেশে ফটো তোলা হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী, সেজে ফটো তুলিলেন না কেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি যে এইরূপই। কৃত্রিম সৌন্দর্যের কি প্রয়োজন?" দেহের দিকে তাঁর মোটেই দৃষ্টি ছিল না। খুব প্রাতঃকালে তাঁহার উচ্চারিত ভগবদ্‌গীতি শ্রবণ অতি মনোমুগ্ধকর ছিল।

একবার দেবমাতা Christmas Eve-এ খ্রিস্টসম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন অনেকেরই খ্রিস্টের উপলব্ধি হইয়াছিল এবং আপনাকেও একজন অহিন্দু খ্রিস্টান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, ইহার কারণ কি?" তিনি মৃদু হাসিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর বলিতেন, আমি ও স্বামী সারদানন্দ

যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে ছিলাম। খুব ছোটবেলায়ও আমি যিশু খ্রিস্টের চিন্তা করিতাম এবং ভাবিতাম যে, আমি যেন তাঁহার সহিত একসঙ্গে অবস্থান করিতেছি।" পরেও তাঁহার ঐ ভাবের গভীরতা কম দেখা যায় নাই। পিটারের ত্যাগ ও গুরুভক্তি তাঁহার আদর্শ ছিল। তিনি বলিতেন, পিটার ক্রুশবিদ্ধ হবার সময় কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হইলে বলিয়াছিলেন, "আমার মাথা নিচের দিকে করিয়া আমাকে ক্রুশবিদ্ধ কর। তাহা হইলে যিশুর পাদস্পর্শে, তাঁহার পবিত্র পদধুলির সংস্পর্শে আমার মস্তক পবিত্র হইবে।"

তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠা ও উদারতা সমান ছিল। বৈষ্ণব শাক্ত বা কোন ধর্মাবলম্বীর সহিত মিশিবার কালে তাঁহাকে যেন তাঁহাদেরই একজন বলিয়া বোধ হইত। এক সময়ে মাদ্রাজে তাঁহাকে স্কুলে বালক-বালিকাদিগকে বাইবেল পড়াইতে হইত। তাহারা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে শুনিতে ভাবিত, তিনি খ্রিস্টান নাকি! মুসলমান ছাত্রগণ যখন বৈকালে তাঁহার নিকট আসিত, তখন তিনি কোরান এরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বোঝাইতেন যে তাহারা লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া প্রতিদিন উহা শুনিতে আসিত। তিনি ছাত্রগণকে অঙ্কশাস্ত্রের দুরূহ প্রশ্নসমূহ ক্রীড়াচ্ছলে মীমাংসা করিয়া দিতেন। অঙ্কের কঠিন বিষয়, Trigonometry-র problem, Logarithms প্রভৃতি তাঁহার আমোদের অঙ্গস্বরূপ ছিল। কঠিন সংস্কৃত নাটক তাঁহার নিকট সাধারণ উপন্যাসের মতো সহজপাঠ্য ছিল।

একান্ত সন্দিগ্ধজনের অন্তরেও ঈশ্বর বিশ্বাস আনয়নের জন্য তিনি দুরূহ জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রতিপাদন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ধর্মে ও ভগবানে—এমনকি অবতারে পর্যন্ত বিশ্বাসী হইতেন। কি শাস্ত্রাধ্যয়নে, কি পূজায়, কি গৃহকর্মে, কি শিক্ষকতায়, কি ধ্যান-ধারণায় তিনি আদর্শ মানব, আদর্শ সন্ন্যাসী ছিলেন।

দেবমাতা বলেন, "শশী মহারাজের ধর্মোপদেশ শ্রোতার প্রাণস্পর্শ করিত। তিনি উপদেশে যেমন ভাব দান করিতেন তেমনই যুক্তি দান করিতেন। মাদ্রাজে একদিন সন্ধ্যারতির পর জগতের ক্ষণিকত্ব এইরূপে দুই এক মিনিটের মধ্যে বুঝাইয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছিলেন, মন স্মৃতির সমষ্টি। বর্তমান আবার কোথায়? বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যতটা সংস্পর্শ হয় কেবল ততটাই বর্তমানের উপলব্ধি। বিষয়ানুভূতিই স্মৃতিরূপে মনোমধ্যে স্থান পায়। বর্তমান-রূপী মুহূর্ত

ইউক্লিডের জ্যামিতির বিন্দুর (point) মতো স্থিতিহীন (without dimension)। আমাদের বর্তমানও এইরূপ স্থিতিহীন—ক্ষণস্থায়ী মাত্র। মানব ইন্দ্রিয়সম্ভোগ করিবার জন্য বাঁচিতে চায় এবং এই ক্ষণমাত্রকে বর্তমান বা আজকাল বলিয়া কেবল বৃথা বাড়াইয়া দেয়। ইহাকে মানুষ সপ্তাহ, মাস, বর্ষ বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু বাস্তবিক বর্তমান বলিয়া কিছু নাই; সবই তখন অতীত বা ভবিষ্যৎ হইয়া গিয়াছে এবং মনেতেই ইহাদের অস্তিত্ব। এইরূপে মনেতেই জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। মানুষ যখন মনের পারে যায় তখন বর্তমান-রূপী জগৎ তাহার নিকট অদৃশ্য হয়। সুষুপ্তিতেই এই মিথ্যাত্ব সুন্দর প্রমাণিত হয়। তখন মানব স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়ের দুর্ভাবনা ও কর্তব্য হইতে নিবৃত্ত হয়। জাগরণে যখন মনের উদ্ভব হয়, তখন আবার সব স্মৃতির উদয় হয়। মনেতেই জগতের উদয়, মনেতেই জগতের লয়, মনই এই মরীচিকা। বাসনাশূন্য মন এই রহস্য বুঝিতে পারে। তখন এই বাহিরের জগৎ তাঁহার নিকট অসার ও শূন্য বলিয়া প্রতীত হয়। আর একদিন বলিয়াছিলেন, বাহ্য জগৎ মানবের স্নায়ুর দুই প্রান্ত মধ্যে অবস্থিত। স্নায়ুর এক প্রান্ত দেহের চর্মের সন্নিকটে ও আর এক প্রান্ত মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকে, মানব-শরীরে এই স্নায়ুরাশি যেন জাল বুনিয়াছে। এই স্নায়ুজালের এক এক প্রান্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পর্যন্ত গিয়া দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ানুভব করে। আমরা যেন এই জালে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; আর যেন জালে থাকিতে ভালো লাগে না। এই জাল-রূপ গোলকধাঁধার বাহিরে আসিলে আমাদের মুক্তি, এই তুচ্ছ স্নায়ুর বন্ধন কাটিলেই মুক্তি। আবার বলিতেন, মন দ্বারা অনন্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না। তবে কি ঈশ্বর লাভ অসম্ভব? না, তাহা নহে। কারণ, ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই, তাতেই আমাদের মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতির অস্তিত্ব। তিনিই আমাদের জীবনের জীবন, মনের মন, অস্তিত্বের অস্তিত্ব। অতএব তাঁহাকে আমরা পাইয়াই আছি, কেবল অন্তর্মুখীন হইলেই উহা বোঝা যায়।

একদিন খ্রিস্ট-ধর্মের Devil বা Satan-এর কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, হিন্দুরা যাহাকে অহং বলে, উহাকে খ্রিস্টানরা Satan বলে। খ্রিস্টানরা Satanকে বাহিরে দেখে, আর হিন্দুরা ইহাকে অন্তরে দেখে, এই মাত্র পার্থক্য। এই অহং নষ্ট হইলে আমাদের দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি হয়। এই অহং দূর হইলে কেবল ঈশ্বর বা আত্মাই থাকেন। তখন সকল দুঃখের অবসান হয়। এই first person বা উত্তম পুরুষরূপ আমি বা Satan কে দূর করিতে পারিলেই

আত্মোপলব্ধি। বস্তুত 'আমি' বলিয়া কিছুই নাই। উহা বিরাট ঈশ্বরেচ্ছায় এক কণামাত্র—প্রতিবিম্ববৎ মিথ্যা।

শশী মহারাজের শ্রীরামকৃষ্ণপ্রাণতার পর তাঁহার গুরু ভাইদের প্রতি প্রীতি উল্লেখযোগ্য; বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি অতুলনীয়। নিষ্ঠাবান শশী মহারাজ স্বামীজীর আদেশে তাঁহার জন্য মুসলমানের দোকান হইতে বিলাতি পাউরুটি কিনিয়া আনিয়াছিলেন। স্বামীজীর আদেশে তিনি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বৎসর কাল মাদ্রাজে ধর্মপ্রচার করেন। ঐ সময় তিনি মাদ্রাজ হইতে বোম্বে, ব্যাঙ্গালোর মহীশূর ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে ধর্ম বিষয়ে বহু বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতসভায় সংস্কৃত ভাষায়ও তিনি সুন্দর বক্তৃতা করিতেন।

তিনি মঠে প্রথমে ঢুকিয়া ধুলি পায়েই ঠাকুর ঘরে ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন, তারপর সাষ্টাঙ্গ হইয়া স্বামীজী, মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিতেন।

মহারাজের অসুখ, মাদ্রাজে চিঠি আসিয়াছে। তখন শশী মহারাজ পূজা করিতে বসিয়া ঠাকুরের ছবিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজকে যদি ভালো করে না দাও, তোমাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব!"

দেবমাতা বলেন, "মাদ্রাজে থাকাকালীন প্রতিদিন শেষরাত্রে দুই ঘণ্টাকাল তিনি মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা সেই স্থানকে মন্ত্রময় করিয়া দিতেন।"

যদিও প্রবর্তককে বাহ্যপূজাদির খুঁটিনাটি ব্যাপার পালন করিতে উৎসাহিত করিতেন, তথাপি আত্মানাত্ম-বিবেককেই উচ্চতর স্থান দিতেন। ভক্তিসম্বন্ধে বলিতেন, 'ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই ভক্তি। যথার্থ অনন্যচিত্ত হইলে ঈশ্বর ভক্তের দাসের দাস হন। এই আত্মসমর্পণের জন্যই কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া অসম্ভব জানিলে তবে আত্মনিবেদন হয়।"

নিষ্ঠা সাধুকে বাঁচায় এই সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত গল্প বলিতেন ঃ কোন শহরে এক ভজনপরায়ণ ফকির থাকিতেন। তিনি নিষ্ঠাসহকারে রোজ রোজ মসজিদের দরগায় সন্ধ্যাকালে বাতি দিতেন। একদিন সেই ফকিরের মনে বিকার উপস্থিত হওয়ায় তিনি এক বারাঙ্গনার নিকট গমন করেন। বারাঙ্গনা সব বুঝিতে পারিয়াও তাঁহাকে সমাদরে বসায় এবং বাক্যালাপ করিতে থাকে। এইরূপে কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া আসিলে বারাঙ্গনা তাহার পরিচারিকাকে বলিল, 'এই চেরী, চেরাগ লাগাও।" এই কথা শুনিয়া ফকিরের প্রতিদিন সন্ধ্যায় মসজিদের

দরগায় চেরাগ দিবার কথা মনে পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পলাইয়া গেলেন। এইরূপে সাধুর সাধুত্ব রক্ষা পাইল।

শশী মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, তোরা ঠাকুরকে 'অবতার' 'অবতার' বলিস! 'অবতার' কি বলতো? এই বলিয়া Mathematics এর অঙ্কের ধারায় বলিলেন, স্বামীজী তাঁহার সমুদয় বাক্যে, বক্তৃতায় যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন + (plus) ঠাকুরের সব পার্ষদ + (plus) অনন্ত = (equal to) ঠাকুর।

তাঁহার লিখিত "The Soul of Man", "Shree Krishna the Pastoral and King-maker" প্রভৃতি পড়িলে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও আত্মোপলব্ধির গভীরতা হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার সহিত আলাপ করিলে কি আনন্দই না পাওয়া যাইত! তিনি অন্তর স্পর্শ করিয়া সকল সংশয়ের সমাধান করিয়া দিতেন।

(উদ্বোধন ঃ ৪৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিসংগ্রহ

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ

পূজ্যপাদ শশী মহারাজ বলিতেন ঃ "একমাত্র গুরুসেবা দ্বারাই সব হয়।" তিনি নিজ জীবনে এই মহাবাক্যের সত্যতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অক্লান্তভাবে এবং একনিষ্ঠ হইয়া তিনি স্বীয় প্রাণের আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করিতেন। এই সেবা পরমহংসদেবের জীবিতকালে প্রত্যক্ষভাবে এবং তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার ভাবময় বিগ্রহ অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটি আলস্য বা ঔদাসীন্য কখনও তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল এবং উহা বুঝিতে পারিলেই আমরা তাঁহার জীবনবেদের মর্মোদ্‌ঘাটনে সমর্থ হইব।

তাঁহার ঐহিক দেহত্যাগের কিছু পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির বাগবাজারস্থ ভবনে অসুস্থ অবস্থায় তাঁহাকে দুই-একবার দূর হইতে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তদীয় গুরুভ্রাতা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রেমানন্দ-স্বামীর মুখে বহুবার তাঁহার পূতচরিত্রের কাহিনি শ্রবণ করিয়াছি। তিনি প্রায়ই আমাদের প্রাণে অগ্নিময় উৎসাহ সঞ্চার করিয়া বলিতেন—"ওরে তোরা শশী মহারাজের একখানি জীবনী লেখ। ওদেশে (অর্থাৎ মাদ্রাজ অঞ্চলে) গিয়ে তাঁর অদ্ভুত প্রভাব যা দেখে এসেছি সে কথা মুখে আর কি বলব! তিনি ওদিককার দিক্‌পাল ছিলেন। তোরা তাঁর জীবনী আলোচনা কর!" এই উৎসাহবাক্যে প্রণোদিত হইয়াই সেই সমুদ্রবৎ অগাধ গম্ভীর ও আকাশের ন্যায় অসীম ও বিরাট মহাপুরুষের জীবন কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা তাহার শুভাশিস। আমি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া যে ভাব লাভ করিয়াছি তাহা যথাসাধ্য এই গ্রন্থে (শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর প্রসঙ্গ) বিবৃত করিবার চেষ্টা করিলাম এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ ও মঠের অন্যান্য সাধুগণের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাও এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল। যদি এতদ্দ্বারা পাঠকগণ সেই মহাপুরুষের মহান্ চরিত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও ধারণা করিতে সমর্থ হন তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

*　　　*　　　*

ভরত মহারাজের (স্বামী অভয়ানন্দ) নিকট প্রাপ্ত

ভরত মহারাজ শশী মহারাজের অসুখের সময় মহারাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। একদিন শশী মহারাজ হঠাৎ ভরত মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্ দ্যাখ্, কি দেখছিস, দেখতে পাচ্ছিস না? শীঘ্র মাদুর পাত, তাকিয়া সাজিয়ে দে, দু-প্রস্থ। ঠাকুর, স্বামীজী এসেছেন।" ভরত মহারাজ বলিলেন, তিনি নিজে কিছু দেখিতে পান নাই। প্রকাশ মহারাজকে শেষ কয়দিন কাছে আসিতে দেন নাই। তিনি দূরে থাকিয়া সব সেবার বন্দোবস্ত করিতেন। তাহার পর কয়েকদিন গেলে হঠাৎ একদিন চিৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকেন এবং পরে তাঁহার সেবা লন। বাবুরাম মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিলেন, "বাবুরামদা, মা কি তোমাদেরই" ইত্যাদি। বলিতে বলিতে কাঁদিতে থাকেন। ইচ্ছা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানিকে একবার দেখিবেন। বাবুরাম মহারাজ নিচে আসিয়া শরৎ মহারাজকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন যাহাতে মাকে দেশ হইতে আনানো যায়। তজ্জন্য কৃষ্ণলাল মহারাজ ও গনেন মহারাজ মাকে আনিতে যান। কিন্তু মা আসিলেন না। অগত্যা তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই শশী মহারাজের দেহত্যাগ হয়।

শশী মহারাজ রামকৃষ্ণবাবুকে (বলরামবাবুর পুত্র) বিশেষ ভালোবাসিতেন। অসুখের সময় প্রত্যহ তিনি আসিয়া দুই তিন ঘণ্টা গল্প করিতেন। তাঁহার সঙ্গ বিশেষ পছন্দ করিতেন। তিনি না আসিলে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আর শশী মহারাজের এক সহোদর ছোট ভাই তিনি অফিস ফেরত ফলাদি লইয়া আসিতেন। তাঁহাকেও ভালোবাসিতেন। কিন্তু তাঁহার গর্ভধারিণী মা আসিয়া কত অপেক্ষা করিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে পরে সে কথা জানান হইলে বলিতেন, "দু-মিনিটের জন্য দেখা করতে দাও। তারপর তোমরাই সরিয়ে দিও।"

তিনি দেওয়ালে ঠাকুর ও মায়ের মূর্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের বিশেষ গালাগালি দিতেন। আর বলিতেন যে, "তোমাদের দেব না তো কাকে দেব?" তিনি সর্বদা একটা ভাবে থাকিতেন।

প্রভু মহারাজের (স্বামী বীরেশ্বরানন্দ) নিকট প্রাপ্ত

মাদ্রাজে থাকাকালীন শশী মহারাজ ঠাকুরকে ভোগ দিবার সময় একটি ঘরে স্টোভে গরম গরম লুচি ভাজিতেন আর ঠাঁই করিয়া দিয়া থালায় বেগুনভাজা

লবণ দিয়া পরে একএকখানি লুচি দিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতেন। তাহাতে আধঘণ্টা হইতে পৌনে এক ঘণ্টা ব্যয় হইত। তাঁহার আমলে ভোগের কাল দীর্ঘ ছিল। পরে শর্বানন্দ-স্বামী মহারাজের দ্বারা ঐ নিয়ম উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করায় মহারাজ বলিয়াছিলেন, "শশী যা করে গেছে সময় বদলান হবে না।" তাঁহার সঙ্গে কাজ করা বড় মুস্কিল ছিল। রান্নার জোগাড় দিত রুদ্র মহারাজ। যেই বলিবেন "তারপর দে" অর্থাৎ অভিপ্রায় বুঝিয়া যেমন যেমন দেওয়া উচিত তাহাই দিতে হইবে। তাহার ব্যতিক্রম হইলে ভীষণ গালাগালি দিতেন। কিন্তু রুদ্র মহারাজ তাঁর ধাত জানিতেন। তাই তিনি জোগাড় দিতে পারিতেন।

সময়ে সময়ে তাঁহার মাছ খাইবার ইচ্ছা হইত। হয়তো নিজেই রাঁধিতেছেন, এমন সময় রামু আসিয়া উপস্থিত। তিনি তখন রুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া ভীষণ গালাগালি দিতেন। রুদ্র মহারাজ সরিয়া গেলে রামু চিৎকার শুনিয়া রুদ্র মহারাজকে বলিল—Swami seems to be very angry. I shall come in the evening.

তাঁহার জামার উপর দুই একটা পকেটওয়ালা ব্যাগে ঠাকুর ও মায়ের মূর্তি লইয়া বাইরে যাইতেন।

তিনি গরমের দিনে রাত্রে তৃষ্ণা পাইলে ঠাকুর ঘর খুলিয়া ঠাকুরকে জল দিতেন এবং সারারাত্র বাতাস করিতেন।

মাদ্রাজের মঠে চারটা ঘর ও একটা বারান্দা ছিল। মহারাজকে লিখিলেন ঃ "একটা ঘর তোমার, একটা স্বামীজীর, একটা বাবুরাম মহারাজের, একটা ভক্তদের আর বারান্দাটা আমার জন্য।" বাস্তবিক ঐ বারান্দায় তিনি অধিক সময় বসিয়া থাকিতেন। একবার মহারাজের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "যদি রাজাকে না সারাও তবে তোমায় সমুদ্রে ফেলে দেবো।"

সত্যেন মহারাজের (স্বামী আত্মবোধানন্দ) নিকট প্রাপ্ত

সত্যেন মহারাজ শশী মহারাজের নিকট মাস খানেক ছিলেন। শশী মহারাজের মুখে শুনিয়াছিলেন ঠাকুর একদিন শশী মহারাজের ঠোঁট দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে, তুই যার তার হাতে খাস্ নাকি?" তখন শশী মহারাজ সকলের হাতে খাইতেন, বিশেষ নিষ্ঠাটি ছিল না। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে ঐরূপ খাইতে নিষেধ করায় তিনি যাবজ্জীবন শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্র ব্যক্তির হাতে অন্নাদি

গ্রহণ করিতেন। তিনি নিজে কুটনো কুটিতেন। তাহাদের লইয়া ক্লাস করিতেন। সে সময়ে আর বাহিরের কাজ বিশেষ করিতেন না। সত্যেন মহারাজ-এর বয়স তখন সতের বছর। ছেলেমানুষ। ওখানকার Zoological Garden (পশুশালা) ইত্যাদি দেখিবার প্রস্তাব কেহ করিলে বলিতেন, "না, ব্রহ্মচারীর হেথা হোথা যাওয়া ঠিক নয়।" তিনি পছন্দ করিতেন না যে সাধুরা বাইরে বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি করে। বলিতেন, "ওতে চিত্ত চঞ্চল হয়।" পছন্দ করিতেন না যে সাধুরা কেহ মঠ ছাড়া বিশেষ কার্য ব্যতীত বাহিরে যায়। তবে নিজে বলিতেন, "বিকাল বেলা একটু সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে এস।" নিজে খুব ধ্যান করিতেন। "রাম, রাম" বা "শিব, শিব" হয়ত এক ঘণ্টা আওড়াইতেছেন।

তিনি ভোর তিনটা চারিটার সময়ে আমাদের তুলিয়া দিতেন, বলিতেন "ধ্যান কর গে।" নিজেও দীর্ঘ সময় ধরিয়া ধ্যান করিতেন। পরমানন্দ স্বামীকে তিনি বিশেষ ভালোবাসিতেন।

বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত

সকলের ভাব-ভক্তি হইতেছে দেখিয়া শশী মহারাজ একবার ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন যাহাতে তাঁহারও ঐরূপ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তাহলে কিন্তু আমার সেবা চলবে না।" শশী মহারাজ তাহার উত্তরে বলেন, "তবে আমার ওতে কাজ নেই। যা হলে আপনার সেবা করতে পারবো না তেমন ভাব আমার চাই না।"

একবার ঠাকুর ঘরে গিয়া স্বামীজী পূজায় বসিয়া একটি আস্ত কলা অর্ধেক ছাড়াইয়া ঠাকুরকে দিয়া বলেন, "এই নাও ঠাকুর, খাও। যেমন দিয়েছ তেমনি তো দেব।" শশী মহারাজ ইহা দেখিয়া চটিয়া আগুন হইয়া যান। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বামীজীর পৃষ্ঠে সজোরে চপেটাঘাত করেন। স্বামীজী ইহাতে কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তাহার অন্য গুরুভ্রাতারা চটিয়া অস্থির হইলেন। তখন স্বামীজী বলিলেন, "ওর কোন দোষ নেই। ওর ভাব থেকে ও ঠিকই করেছে, আর আমার ভাব থেকে আমি ঠিক করেছি। ঠাকুর তো কারোর ভাব ভাঙতেন না—একথা তো জানিস।"

স্বামীজী যখন মঠটি করেন তখন বলিয়াছিলেন, "এ মঠটা শশীর নামেই হোক।"

শশী মহারাজ বাবুরাম মহারাজের চরণে সাষ্টাঙ্গে ভূপতিত হইতেন এবং তাঁহার সেবার জন্য মধ্যে মধ্যে টাকা পাঠাইতেন।

তিনি মাদ্রাজে ঠাকুর সেবাকালে ছেলেকে যেমন করিয়া বকে তেমনি করিয়া ঠাকুরের প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া স্নানাদি করাইতেন। গরম দুধের বাটি লইয়া "দুধ খাবে, দুধ খাবে, খাও খাও" ইত্যাদি বলিয়া বকিতে বকিতে ঠাকুরকে খাওয়াইতেন।

কাহারো নিকট কিছু লইবার সময়ে তাহাদের বকিয়া কিছু গ্রহণ করিতেন, নতুবা চাওয়া চাওয়ি গ্রাহ্য করিতেন না। যতবড় লোক হউক না কেন, কোন তোয়াক্কা করিতেন না। ক্লাসের ছেলেদের নিকট আটা ইত্যাদি গ্রহণ করিতেন। যিনি দিতেছেন তিনি দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেছেন এ ভাব আনিতে দিতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর প্রসঙ্গ—স্বামী কমলেশ্বরানন্দ, পৃঃ ৭৩

তৃতীয় পর্ব

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কথা

মহেন্দ্রনাথ দত্ত

বরাহনগরের মঠে যেরূপ, আলমবাজার মঠেও সেইরূপ শশী পূজাদি করিতেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী ও তেজস্বী হওয়ায় সকল কাজে প্রধান হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একপ্রকার কর্তা ছিলেন এবং তাঁর আদেশমতো সকলেই চলিতেন। মঠ সংক্রান্ত যা কিছু কাজ সমস্তই শশী মহারাজ করিতেন ও তাঁর আদেশমতো সম্পাদিত হইত। তিনি যেমন অকাতর পরিশ্রমে সমস্ত কাজ করিতেন, তেমনি জপ ধ্যান ও অধ্যয়ন করিতেন। বি.এ. পরীক্ষা দিবার কয়েকদিন আগে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে আসিয়াছিলেন। সংস্কার এমন জিনিস যে, আলমবাজারের মঠে তিনি একদিন হাস্য করিয়া বলিতেছেন, "আরে দেখ কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি যে, পরীক্ষার চারদিন মাত্র আর বাকি আছে, আমি খুব মন দিয়ে পড়ছি আর ভাবছি কি করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব। আর দেখ, কতবৎসর হলো বাড়ি ঘর ত্যাগ করেছি, তবু এখনও পরীক্ষার ভয় ভেতরে রয়েছে; স্বপ্নেও তাই দেখেছি, একেই বলে সংস্কার।"

গণিতবিদ্যা তাঁর বিশেষ ভালো লাগিত। আলমবাজারের মঠে অনেক সময় ১১টার পর অবসর পাইলে তিনি গণিতের একটি বই খুলিয়া শ্লেট বা কাগজে অঙ্ক কষিতেন। অনেক সময় অপরাহ্ণ ৪টার পর অর্থাৎ ঠাকুরদের বৈকালিক সমাপনের পর তিনি ভাগবৎখানি খুলিয়া ঋষভদেবের উপাখ্যানটি পড়িতেন এবং পড়িতে পড়িতে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বর্তমান লেখককে বলিতেন, "দেখ, একেই বলে উচ্চ অবস্থা।" তিনি ঋষভদেবের উপাখ্যানটি অনেকবার পড়েছিলেন ও বর্তমান লেখককে শুনাইয়াছিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও বর্তমান লেখক ঃ একবার নিরঞ্জন মহারাজ বর্তমান লেখকের সঙ্গে নানা গ্রন্থাদি সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা উঠল। বর্তমান লেখক তখন বৈষ্ণবগ্রন্থের কিছুই জানিতেন না—চৈতন্যদেবের শুধু নামমাত্র শুনেছিলেন, কাজেই বেফাঁস কথা

কহিতে লাগিলেন। শশী মহারাজ অপর স্থানে ছিলেন, তিনি সেখান হইতে আসিয়া বলিলেন; "তুই ছোঁড়া বৈষ্ণব বই পড়েছিস?" বর্তমান লেখক বলিলেন, "না"। আগে বৈষ্ণব বই পড় তবে তর্ক করবি—এই বলে শশী মহারাজ চৈতন্যচরিতামৃত ও অপর অপর বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ করিতে উপদেশ দিলেন। বর্তমান লেখক পুস্তকগুলি লইয়া আসিয়া চৈতন্য চরিতামৃতের ধারে ধারে দাগ দিয়া সমস্ত বইগুলি পড়িলেন ও যতদিন না অধ্যয়ন সমাপ্ত হইল ততদিন শশী মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ করেননি। তারপর গ্রন্থাদি লইয়া শশী মহারাজের সামনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এইতো সব বইগুলো পড়া হয়ে গেছে, এখন কি তর্ক করবে বল।" শশী মহারাজ বইগুলো খুলে দেখেন যে যথার্থই ধারে ধারে দাগ দেওয়া হইয়াছে। তিনি তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যা ছোঁড়া, সন্তুষ্ট হয়েছি"—এই বলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। গল্পটি সামান্য হইলেও শশী মহারাজের বিদ্যাচর্চার দিকে কেমন অনুরাগ ছিল এবং অপরকেও তিনি কি করিয়া বিদ্যাচর্চায় প্রণোদিত করিতে পারিতেন, এটি তার একটি উদাহরণ। মিষ্টি মধুরভাবে হাসি তামাশার ছলে তিনি অপরকে বিদ্যাচর্চায় উত্তেজিত করিতে পারিতেন।

বর্তমান লেখককে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ভর্ৎসনা ঃ একদিন গরমকালে অপরাহ্নে বর্তমান লেখক একটি খ্রিস্টগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন এবং শিবানন্দ মহারাজের সহিত সে বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। উভয়েই বাহিরবাড়ির বড় ঘরটির মাঝের দরজার সামনের বারান্দায় বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, তাতে যিশু, বুদ্ধ ও মহম্মদের জীবনী লেখা ছিল এবং কে কাহার অপেক্ষা কতখানি বড়, তাহারি যেন সব জরিপ করা হইয়াছিল। বর্তমান লেখকের অল্প বয়েস, সে জন্য দোষগুণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। শিবানন্দ মহারাজের সাথে কথাবার্তা হইতেছিল। শশী মহারাজ ঠাকুর ঘরের বৈকালীন কাজ করিতেছিলেন এবং জানলা দিয়া সব শুনিতে পাইতেছিলেন। হঠাৎ তিনি রুদ্রমূর্তি ধরিয়া সম্মুখে আসিলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধপূর্ণ-স্বরে বর্তমান লেখককে বলিলেন, "কি বই পড়ছিস রে হতভাগা ছোঁড়া?" বর্তমান লেখক যা পাঠ করিতেছিলেন তা লইয়া শশী মহারাজের কাছে তর্ক করিবার প্রয়াস পাইলেন। শশী মহারাজ তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ডান পা তুলিয়া লাথি মারিবার মতো করিয়া দাঁড়াইলেন। সে ভীষণ রুদ্রমূর্তি দেখিয়া বর্তমান লেখকের হৃৎকম্প হইতে লাগিল—তর্ক ও বাক্‌বিন্যাস তিরোহিত হইয়া যাইল। তখন শশী মহারাজ শান্ত হইয়া বলিলেন, "দ্যাখ, ওসব বই কখনও পড়বিনি। যাঁরা

মহাপুরুষ, জগদ্‌গুরু, যাঁদের পায়ের ধুলো নিলে লোক পবিত্র হয়ে যায়, তাঁদের আবার বিচার করা? আর কে কত বড় সেই নিয়ে আবার তর্ক করা? লিখবে কে? না একটা সামান্য লোক যে মহাপুরুষদের কণামাত্র সাধনা করে নাই।" তাহার কথা শুনিয়া ধারণা হইল উচ্চ অবস্থার সাধক জগদ্‌গুরুদের নিন্দা করা—এতে মহাপাপ হয়। কথাটি অতি সত্য। বর্তমান লেখক একেবারে লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে মহাপুরুষদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি মহাপুরুষদের লইয়া আর তর্ক করেন নাই এবং অপর কেউ করিতে আসিলে শশী মহারাজের উপাখ্যানটি তাহাকে বলেন। শশী মহারাজের মতো মহাপুরুষের সামান্য কাজের ভিতর হইতেও এক প্রগাঢ় উপদেশ পাওয়া যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও সুরেশচন্দ্র মিত্র ঃ বরানগর মঠের অবস্থানের শেষ ভাগে সম্ভবত ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বর্ষাকালে সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উদরী রোগ হলো এবং তাহাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। সকলেই আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, শুধু শশী মহারাজ বরানগর মঠ ছাড়িয়া আসেন নাই। সুরেশবাবুর শশী মহারাজকে দেখিবার বড় আকাঙ্ক্ষা হইল। এইজন্য শশী মহারাজ একেবারে যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া করিয়া সুরেশবাবুকে দেখিতে আসেন। ঘণ্টা খানেক থাকিয়া আবার মঠে ফিরিয়া যান। তাহারপর তিনি বড় একটা কলকাতায় আসেন নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ হইয়াছে একথা তাঁহার ভালো লাগিত না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত আছেন। এইজন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহী অবস্থায় যেসকল সেবা করেছিলেন, শশী মহারাজ সাধ্য অনুযায়ী ঠিক সে সমস্ত কাজ করিতেন। এরূপ প্রত্যক্ষ গুরুভক্তি সহসা দেখা যায় না। একদিন আলমবাজারের মঠে বড় গরম পড়িয়াছিল, শশী মহারাজ পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের ঘরে শুইয়া আছেন এবং নিজেকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও তো এই প্রকার গরম বোধ হইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ঘরে গিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শয্যার পাশে দণ্ডায়মান হইয়া অবশিষ্ট রাত্র পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। এরকম আশ্চর্য গুরুসেবা জগতে অতি বিরল।

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গুরুভক্তি ঃ শশী মহারাজের তীর্থ পর্যটনের কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করাই তীর্থবাস ও তপস্যা

মনে করিতেন। "জয় গুরুদেব শ্রীগুরুদেব" এ কথাটি উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি বিভোর হইয়া প্রদীপ্ত সিংহের মতো গর্জন করিতে থাকিতেন। সব তীর্থই তাহার ঠাকুর ঘর ছিল। জপ বিষয়ে তিনি একান্তমনা ছিলেন। বরানগরের মঠের প্রথম অবস্থায়, তখন শশী মহারাজ অল্পবয়স্ক, তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "এই ঠাকুরের সেবা নিয়েই আমি জীবন কাটাব, আর আমার অন্য কিছুই আবশ্যক নাই।" যথার্থই তা তিনি নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অনবরত জপ করিতেন এবং সকলকেই জপ করিতে উপদেশ দিতেন। জপ ও গুরুসেবা এ দুটি তাঁর প্রাণ ছিল।

বরানগরের মঠে যেরূপ অনটন হইয়াছিল, আলমবাজারের মঠে উৎসব উপলক্ষে সেরূপ প্রচুর সামগ্রী আবার আসিতে লাগিল। এক একদিন মা অন্নপূর্ণা যেন দশহাতে জিনিস দিতে লাগিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ভক্তদের প্রতি ভালোবাসা ঃ কলকাতার বাজারের উৎকৃষ্ট সামগ্রী আনিয়া ভক্তেরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভোগাদি দিতে লাগিলেন। শশী মহারাজ সমাগত ভক্তবৃন্দকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইতেন কিন্তু পরে অনেক জিনিস উদ্বৃত্ত থাকিত। তিনি উপস্থিত ভক্তদেরকে সে সকল উদ্বৃত্ত সামগ্রী প্রসাদ বলিয়া বাড়িতে লইয়া যাইতে বলিতেন এবং যাঁরা সম্মত হইতেন, তাঁদের সহিত জিনিস পাঠাইয়া দিতেন—ঘরে কিছুই রাখিতেন না।

বালকের মতো সব সময়ে হাস্য মুখে কথা কইতেন এবং বালকের ন্যায় নানা প্রকার রহস্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার কথাবার্তা ও হাস্যকৌতুকের ভিতর একটা মাধুর্যপূর্ণ গম্ভীর ভাব পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার হাস্য-কৌতুকে অপরে কেউ হাস্য কৌতুক করিতে সাহস করিত না। বালকত্ব করিলেও তিনি খুব রাশভারী লোক ছিলেন। তাঁহার একটি প্রিয় জিনিস ছিল—কাঁচা লঙ্কা দিয়া মুড়ি খাইতে বড় ভালোবাসিতেন। একবার করিয়া মুড়ি মুখে দিতেছেন, আর একবার করিয়া কাঁচালঙ্কায় কামড় দিতেছেন। যখন দুই চক্ষে জল আসিত তখন তাঁর কাঁচালঙ্কা খাওয়া নিবৃত্ত হইত। তিনি রুটি, লুচি খাইতে পছন্দ করিতেন না। ভাতই তাঁহার প্রিয় আহার ছিল এবং অধিক পরিমাণে খাইতে পারিতেন। 'উদ্বোধন' অফিসে যখন তাঁহার শেষ অসুস্থ অবস্থা, ডাক্তারেরা তাঁকে দেড়সের মাত্র দুধ খাওয়াইয়া রাখিয়াছিল। একদিন বর্তমান লেখক তাঁহাকে প্রাতে দর্শন করিতে যাইলে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখছ ভাই, শালারা আমায় শুকিয়ে রাখছে, আমায় মাত্র দেড় সের করে দুধ দেয়। জানতো আমার

সেই 'Royal Morsel' (অর্থাৎ বড় থাবা করিয়া অন্নের গ্রাস) এই অঙ্গুলি বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার অন্নের গ্রাসের নির্দেশ করিয়া দিলেন। আগুন ও জল একসাথে মিশাইলে যাহা হয়, শশী মহারাজ তাহাই ছিলেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে গুরুসেবা করা কাহাকে বলে তাই তিনি নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন। যৌবনের প্রথম অবস্থায় তিনি কৃশ ছিলেন এবং গায়ের রঙ ফ্যাকাসে সাদা ও মুখে কোঁকড়ানো দাড়ি ছিল কিন্তু শেষ অবস্থায় তিনি স্থূলকায় হইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত,
দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৌষ ১৪০৭, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।
প্রকাশক শ্রীসীতানাথ দত্ত, দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি,
৩৬/৭ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট, কলকাতা-৬, পৃঃ ১৫-১৯

[মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৯-১৯৫৬) স্বামী বিবেকানন্দের মেজভাই, চিরকুমার, জ্ঞানতপস্বী, ভ্রমণপিপাসু ও সুলেখক। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে ধন্য। ভক্তমণ্ডলীতে তিনি 'মহিমবাবু' নামে সমধিক পরিচিত। ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ায় বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর লিখিত পুস্তকের সংখ্যা ৯০—৩৫টি ইংরেজি এবং ৩৬টি বাংলা বই এযাবৎ মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছে।]

পূর্বস্মৃতি

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

আজ ত্রিশ বছরের কথা। এই সবে মাত্র বরাহনগরের ভাঙ্গা বাড়ি থেকে মঠ আলমবাজার "ভূতের বাড়িতে" উঠে এসেছে। স্বর্গীয় নাগ মহাশয় লেখককে শশী মহারাজ ও যোগীন মহারাজের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে দেশে চলে গেছেন। তখনকার মঠের একটু হালচাল বললে, অত্যুক্তি হবে না। অন্তত আমি প্রথমটা যেমন দেখেছিলুম তাই কিঞ্চিৎ এখানে লিপিবদ্ধ করছি। মঠে তখন চাকর বা বামুন কেউ ছিল না। শশী মহারাজ ঠাকুরের ভোগ রান্না করতেন; কানাই মহারাজ হাটবাজার ও বাসনমাজা, যোগীন মহারাজ, হরি মহারাজ, সুশীল মহারাজ (স্বামী প্রকাশানন্দ), আরো দুই একজন সাধু ব্রহ্মচারী ঘর ঝাঁট দেওয়া, কুটনা কুটা, মসলা বাটা প্রভৃতি কাজ করতেন। লেখক যখন যখন মঠে যেতো ও থাকতো, তখন শশী মহারাজের আদেশে সে হেঁসেলে গিয়ে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতো; শশী মহারাজ প্রাত্যহিক রান্নার কাজ থেকে একটু অব্যাহতি পেতেন।

লেখক মধ্যে মধ্যে কানাই মহারাজের সঙ্গে হাট বাজার করতো এবং কখনো বা তাঁর সঙ্গে সাধুদের উচ্ছিষ্ট বাসন মেজে নিজেকে ধন্য মনে করতো। তখনো লেখক স্বামীজীকে দেখে নাই বা তিনি কোথায় কিভাবে আছেন তাও জানতো না। তখন স্বামীজী ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করছিলেন এবং তার কিছুদিন পরে আমেরিকা যান, একথা লেখক পরে মঠধারী সাধুদের প্রমুখাৎ শুনেছিল।

একদিন মঠে কানাই মহারাজ শিব মহিম্ন-স্তব পাঠ করছিলেন, লেখক একমনে শুনে বুঝতে পারলো, পাঠকের সংস্কৃত জ্ঞান তত নেই। কিন্তু তাঁর পঠনের একাগ্রতা দর্শনে লেখক বিস্মিত হয়ে গেল। শশী মহারাজ বলেছিলেন, "ভাষাজ্ঞান না থাকলেও ভক্তের একাগ্র হৃদয়ই ভগবান গ্রহণ করেন।" এই বলে "অসিত গিরিসমং স্যাৎ" শ্লোকটি পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কিরূপে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন সেই গল্পটি বললেন। শশী মহারাজই তখন মঠকে জাগিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠা একাগ্রতা ও সেবা দর্শনে লেখক কখনো বিস্মিত হতো, কখনো বা মনে করতো, তাঁর মাথায় একটু ছিট আছে। কারণ এক ছিলিম

তামাক সেজে ভোগান্তে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত ঠাকুরের ছবির কাছে ধরে থাকা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে লেখকের মনে হতো। ক্রমে আসা যাওয়া করতে করতে লেখকের সেই ভাব পরিবর্তিত হয় এবং সে বুঝতে পারে, সেবা ও নিষ্ঠা এরূপ ঐকান্তিকতাতেই পূর্ণতা লাভ করে। তখনকার ঠাকুর-ঘরে আরাত্রিক দর্শনও উপভোগের জিনিস ছিল। কয়েকজন বালসন্ন্যাসী, যাঁদের সম্বল বলতে কিছুই ছিল না, যাঁরা অন্নবস্ত্রাভাবে অর্ধাশন ও প্রায় কৌপীন মাত্র সম্বল করেছিলেন, তাঁরা যখন "জয় জয় জয় গুরুদেব" রবে মঠ ও পল্লি মুখরিত করতেন তখন লেখকের মনে হতো, এঁরা দেবতা—মানবাকারে, এঁদের সঙ্গ দর্শন ও স্পর্শনে সত্য সত্যই মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়, সত্য সত্যই ঈশ্বরানুরাগে হৃদয় উদ্বেলিত হয়। এমন সুখের দিন মঠে কত যে অতিবাহিত করা গেছে, তার স্মরণেও হৃদয় পবিত্র হয়। মনে হয়, পূর্বে এই সব সাধুদের সঙ্গ ও কৃপালাভ করাতেই পরে সাক্ষাৎ শঙ্কর স্বামীজীকে মন্ত্রগুরুরূপে পাওয়া গিয়েছিল। ঠাকুরের গৃহিভক্ত স্বর্গীয় সুরেশ দত্ত ও হরমোহন মিত্রের সঙ্গে লেখক অনেক সময় আলমবাজার মঠে যেতো। আবার যখন নাগ মহাশয় কলকাতায় থাকতেন তখন লেখক তাঁর সঙ্গেই প্রায় দক্ষিণেশ্বর ও আলমবাজার মঠে যেতো। নাগ মহাশয়ের সঙ্গে মঠে যাওয়া এক আনন্দের ব্যাপার ছিল। ভাবাবেশে তিনি এখানে সেখানে পড়ে যেতেন, মঠের সাধুরা তাঁকে অতি সন্তর্পণে ধরে বসাতেন। নাগ মহাশয়কে দেখে কি আনন্দের উৎসই যে শশী মহারাজের হৃদয়ে বয়ে যেতে দেখেছি, তা বলতে পারি না। উভয়ে মুখোমুখি বসে "জয় গুরু জয় গুরু" বলতে বলতে সাশ্রুনয়নে ও রুদ্ধকণ্ঠে অবস্থান করতেন। ভাব ও ভাষা উভয়ের রুদ্ধ হয়ে যেত। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় উভয়ে যেন উন্মাদ হয়ে উঠতেন। আমি তখন সব ভালো বুঝতে পারতুম না। ক্রমে কিছু কিছু বুঝতে পেরেছিলুম।

মঠে তখন বিবেকচূড়ামণি পাঠ হতো। কালী মহারাজকে (স্বামী অভেদানন্দ) পাঠ করতে শুনেছি। তাঁর বেশ পাণ্ডিত্য ছিল। বিকালে শাস্ত্র পাঠ আলোচনা হতো। দুপুরে আহারের পর সকলে একটু বিশ্রাম করতেন। সকাল সন্ধ্যায় খুব জপ ধ্যানাদি চলতো। উপস্থিত সকলকেই তাতে যোগ দিতে হতো। গৃহিভক্তদের মধ্যে গিরিশবাবু, অতুলবাবু, নবগোপাল বাবু, হুট্‌কো গোপাল, নিতাই ডাক্তার, হরমোহন ও সুরেশবাবুকে মঠে মধ্যে মধ্যে দেখতে পেতুম, এঁরা মঠে কেউ রিক্তহস্তে যেতেন না। মঠে তখন সামান্য ডাল, ভাত, রুটির ব্যবস্থা ছিল। জুটলে

মৎস্যও ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হতো—নতুবা যখন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থা। তখন এটি বেশ লক্ষ্য করতুম যে, ঠাকুরের ভোগরাগ যাইহোক না কেন, সাধুদের ভক্তিরসে ম্রক্ষিত হয়ে তা অমৃতরসে পরিণত হতো। একদিন আমি না জেনে একটা পচা রুই মাছ শেয়ালদা থেকে কিনে মঠে নিয়ে যাই। শশী মহারাজ ও আমি একত্রে তার ঝুরি ভাজা করে ঠাকুরকে ভোগ চড়াই। সাধুরা তা খেয়ে মহাতৃপ্তি লাভ করেন। ভক্তি ও ভালোবাসার এমন মহিমা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

মঠের সাধুরা তখন সকলেই গঙ্গাতে স্নান করতেন, কারণ তখন স্নানের অন্য কোন বন্দোবস্ত ছিল না। বিশেষত যুবক সন্ন্যাসিগণ তখন ভক্তিবশতই হোক বা শারীরিক সুস্থতা সাধনেই হোক গঙ্গাস্নান সকলেই ভালোবাসতেন। স্নানের ঘাটে বসে কত শাস্ত্র চর্চা ও ঠাকুরের কত প্রসঙ্গই যে হতো তা বলবার নয়, কখনও স্নান করতে গিয়ে দুঘণ্টাই হয়তো কেটে যেত। সকলেই যেন তন্ময়, আহার নিদ্রা ভুল হয়ে যেত। আলমবাজারের বাড়িতে হরি মহারাজ একদিন একটি ভূত দেখতে পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে ফেরবার কালে তিনি দেখেছিলেন, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার পাশের নিচের ঘরে সে ঢুকে পড়লো। তাঁর নিজমুখে লেখকের ইহা শোনা। আর একদিন নাগ মহাশয়ও মঠে ভূত দেখেন, দেখবার পরে আমাকে ঐ বিষয়ে বলেন। কিন্তু মঠের সাধুদের ঐ বিষয়ে দৃক্‌পাত ছিল না। তাঁরা বলতেন, "আমরা শিবের দানা—ভূত-প্রেত আমাদের আর কি করতে পারে?"

(উদ্বোধন, ২৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৩৪, পৃঃ ৩৯১-৩৯৪)

[শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৬২-১৯৪২) ছিলেন স্বামীজীর গৃহি-শিষ্য ও শাস্ত্রজ্ঞ। স্বামীজীর প্রিয় 'বাঙাল'। তিনি স্বামীজীর সেবা করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-বই এর জন্য তিনি আমাদের কাছে সুপরিচিত। এছাড়া 'সাধু নাগমহাশয়', 'শ্রীরামকৃষ্ণাদ্য', 'শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী', 'শ্রীশ্রীঠাকুরের নামামৃত' এবং বহু স্তোত্র, সংগীত, কবিতা ও প্রবন্ধের রচয়িতা।]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

কুমুদবন্ধু সেন

একটা বড় দোতলা বাড়ি। দোতলার বাইরের দিকে একটা বড় হল ঘর। সেখানে বিশ্রাম করতেন, দর্শকদের অভ্যর্থনা জানাতেন, আবার ভক্তদের সঙ্গে নানা ধর্মকথা আলোচনাও করতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ সেখানে দিনে ও রাতে শয়নাদিও করতেন। এটাই ছিল আলমবাজার মঠ। এই বড় বাড়িটির মাসিক ভাড়া ছিল মাত্র দশ টাকা। "ভূতের বাড়ি" বলে এর দুর্নাম ছিল। তাই লোকজন এই বাড়ি ভাড়া নিতে ভয় পেত। এর আগে এই বাড়িতে দুজন ভাড়াটে আত্মহত্যা করায় এই গুজব আরও ছড়িয়েছিল।

একদিন স্বামী সারদানন্দজীর নির্দেশে আমি মঠের ঠাকুরঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। সেখানে একটা কাঠের সিংহাসনের ওপরে রাখা শ্রীরামকৃষ্ণের পটকে পূজা করা হতো। সেই পবিত্রস্থানের নিয়মশৃঙ্খলা সম্বন্ধে আমি বিশেষ জানতাম না। আমি জুতোর আওয়াজ করতে করতে বারান্দা পেরোচ্ছিলাম। এমন সময় গম্ভীর গলায় একজন বললেন, "ওখানে কে হে?" সেই রাশভারী কণ্ঠস্বর শুনে আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম—আমার বুক ধুক্‌পুক্ করতে লাগল। আমি তখন বালক মাত্র, চোদ্দ বছর বয়স। দেখলাম, একজন স্বামীজী আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমাকে দেখে মৃদু হেসে তিনি বললেন, "ওহে ছোকরা! তোমার জুতো জোড়া খুলে ওখানে রেখে এস"—এই বলে বারান্দায় একটা জায়গাও দেখিয়ে দিলেন। এবার তিনি আমাকে বললেন, "আমার সঙ্গে এস।" যেখানে হাত-মুখ ধুতে পারি সেখানে নিয়ে গেলেন। তারপর ঠাকুরঘরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমি কিছুক্ষণের জন্য একা ঠাকুরের পটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম—এক নতুন অনুভূতিতে মন ভরে গেল, পারিপার্শ্বিকের কথা ভুলে গেলুম, সেই পবিত্র প্রতিকৃতির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। বেরিয়ে এসে দেখি, স্বামীজী আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। স্নেহভরে আমাকে কাছে ডাকলেন। আমাকে প্রসাদ দিলেন—কয়েক টুকরো ফল ও মিষ্টি। তিনি আমার নাম, ঠিকানা জানতে চাইলেন। আমি কোন্ শ্রেণিতে পড়ি সে বিষয়েও খোঁজ

নিলেন। অত্যন্ত স্নেহ-ভরা কণ্ঠে আমাকে প্রতি রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে মঠে আসতে বললেন। ইনিই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—সময়টা ছিল ১৮৯৪ সাল।

ছুটির দিনে আমি প্রায়ই মঠে যাতায়াত করতে লাগলাম—মাঝে মাঝে একা, আবার কখনো বা অন্য ভক্তদের সঙ্গে—যাদের সঙ্গে আমি ক্রমে পরিচিত হয়ে উঠছিলুম। একদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাকে শুকদেবের গল্প বললেন। জন্মের পরেই পুত্রকে অরণ্য ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ছুটে যেতে দেখে পিতা ব্যাসদেব তার পিছন পিছন ছুটতে থাকেন আর ডাকতে থাকেন, "পুত্র আমার, ফিরে এসো! ফিরে এসো!" যে সমস্ত বৃক্ষরাজির পাশ দিয়ে শুকদেব ছুটে গিয়েছিলেন সেগুলি তাঁর পবিত্র স্পর্শে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। তারা শুকদেবের মতো করেই ব্যাসদেবের আহ্বানের উত্তর দিচ্ছিল। কিন্তু ঐ ব্রহ্মচারীকে মায়া স্পর্শ করতে পারে নি। সাধারণ মানুষ আমাদের ঠাকুর পরমহংসদেবকে সশরীরে না দেখলে শুকদেব সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারত না। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আরও বললেন, "ঠাকুরের কৃপায়, তাঁর আশীর্বাদে আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাস করতে পেরেছি যে মায়াকে এই জীবনেই জয় করা যায়।" এখনও যখন আমার বয়স আটষট্টি*, পরিষ্কার স্মরণ করতে পারি, ঐসব কথা বলবার সময়ে আন্তরিকতায় ও বিশ্বাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের গোটা মুখ কি রকম জ্বলজ্বল করছিল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পূজাপদ্ধতি ছিল অপূর্ব এবং চিত্তাকর্ষক। যিনি সেই পূজার সময়ে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছেন তিনি উপলব্ধি করেছেন সে পূজা জীবন্ত, জ্বলন্ত পুরুষের। ওঁর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। সন্ধ্যারতির সময় যখন তিনি পঞ্চপ্রদীপ ওপরে তুলে দোলাতেন এবং গম্ভীর কণ্ঠে "জয়গুরু জয়গুরু" বলে হুঙ্কার দিতেন তখন উপস্থিত সকলের মন শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে ভরে যেতো। বিখ্যাত বাঙালি নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিন তার গুরুভাইদের বললেন, "শশী হলো আসন-সিদ্ধ, নইলে ওর মতো সারারাত একাসনে বসে পুজো করা আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।"

পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে একজনকে চান এবং তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নাম করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যাত্রার জন্য আয়োজন শুরু করে দিলেন। স্যুট তৈরির অর্ডারও দেওয়া হলো। কিন্তু প্রায়ই তিনি চর্মরোগে

---

* ১৯৪৯ সালের স্মৃতিকথা।

ভুগতেন। এক্ষেত্রে শীতের দেশ তাঁর সইবে না—এই মনে করে ডাক্তাররা অনুমতি দিতে রাজি হলেন না। প্রস্তাবিত যাত্রা আর হলো না।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণাও ছিল। একদিন স্বামীজী বলেছিলেন, "শশীই মঠের চালক শক্তি। প্রভুর প্রতি তার অটল ভক্তি, সেবার আদর্শ, কর্তব্যবোধ, দরদি মন এবং দৃঢ় সঙ্কল্প এই সঙ্ঘকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যখন আমরা শরীর, মন আর পৃথিবী ভুলে থাকতুম, তখন সে এক স্নেহময়ী মায়ের মতোই আমাদের শরীরের দিকে নজর দিত, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করত। মঠের সকলেই পরিব্রাজক হয়ে নানা জায়গায় সাধনার জন্য গিয়েছে। কেবল শশী এক পা-ও নড়েনি। মঠ রক্ষা করে গেছে। ঠাকুর ঘরটি ছিল তার কাছে শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ঈশ্বরভক্তি ও দেবসেবার সে হলো মূর্ত বিগ্রহ।"

স্বামী বিবেকানন্দ গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে এইভাবে তাঁর প্রসঙ্গে বলতেন।

কিন্তু পাশ্চাত্য থেকে কলকাতায় ফিরেই স্বামীজী মাদ্রাজে একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে অনুরোধ করলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখনই রাজি। কারণ স্বামীজীর মুখ দিয়ে ঠাকুরই আদেশ করছেন। জীবনযাত্রায় তিনি কিন্তু কঠোর ভাবে রক্ষণশীল রীতি-নীতি মেনে চলতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মাদ্রাজি ভক্ত ও শিষ্যদের বলেছিলেন, যে তাদের কাছে এমন একজন গুরুভাইকে পাঠাবেন যিনি তাদের সবচেয়ে গোঁড়া লোকের থেকেও গোঁড়া। আবার একই সঙ্গে খাঁটি সাধু যাঁর ভগবৎ-বিশ্বাস অতুলনীয়। স্বামীজী আরও বলেছিলেন, "তিনি তাঁর ঋষিতুল্য চরিত্র, শিশু-সুলভ সারল্য, গভীর পাণ্ডিত্য, বৌদ্ধিক ঔজ্জ্বল্য এবং ভালোবাসায় ভরা হৃদয় দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গন করে আছেন।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সর্বোপরি ছিল উচ্চ আধ্যাত্মিকতা যা অনুভব ও উপলব্ধির মহিমায় সুমণ্ডিত। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই উদ্দীপিত হয়েছিলেন। ফলে মাদ্রাজে স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনা করতে সুবিধা হয়েছিল এবং সকল বাধা-বিঘ্ন অপসারিত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য পরলোকগত কালীপদ ঘোষ বোম্বাইতে কাগজের ব্যবসায়ী সংস্থা মেসার্স জন ডিকিন্‌সন এ্যান্ড কোং এর শাখা

খুলেছিলেন। গ্র্যান্ট রোডে টোপীওয়ালা চউলে একটি ফ্ল্যাট অফিস-কর্মচারীদের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। অন্যান্য বাঙালিরাও সেখানে পরলোকগত কালীপদ ঘোষের অথবা তাঁর পুত্র পরলোকগত বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের অনুমতি নিয়ে থাকতে পারতেন। বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ঐ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বোম্বাই শাখার প্রধান ছিলেন। অর্চনার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের পট সেখানে স্থাপন করা হয়েছিল। প্রতি বুধবারে সেই পটের সামনে ফুল এবং মিষ্টান্ন নিবেদন করা হতো। আমি সেখানে ১৯০৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯০৫ সালের মে মাস পর্যন্ত ছিলাম। কখনো রামকৃষ্ণ মঠের কেউ কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণের কোন ভক্ত বোম্বাইয়ে গেলে তাঁদের সেখানে আপ্যায়ন করা হতো। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বামী বোধানন্দ এবং স্বামী শঙ্করানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী) বোম্বাইয়ে আসেন এবং ঐ বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

কথাবার্তার মধ্যে স্বামী বোধানন্দ বললেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্তী জন্মোৎসবে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে নিমন্ত্রণ করলে ভালো হয়। বোম্বাইয়ের বাঙালি বাসিন্দারা প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করতেন। আমি কয়েকজন বয়স্ক এবং বিশিষ্ট বাঙালির সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করলাম। প্রস্তাবটি সকলের সম্মতি লাভ করে এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। এর মধ্যে কয়েকজনের স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁরা সেই দিনগুলির স্মৃতি মনের মধ্যে সযত্নে লালন করতেন। বোম্বাই হাইকোর্টের সুপরিচিত আইনজীবী মি. সেটলুর স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর কাছে একজন আমাকে নিয়ে গেলেন। মি. সেটলুর এই প্রস্তাবটিকে শুধুমাত্র অনুমোদন করলেন না, বরং এ ব্যাপারে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য আমাদের উৎসাহিত করলেন। আমি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে বিস্তারিতভাবে সব কিছু লিখে বোম্বাই আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। মি. সেটলুরের সাহায্যে আমরা আগে থেকেই ঐ বিশেষ দিনটির জন্য স্যার কাওয়াসজি হলটি ভাড়া করেছিলাম। এসবের জন্য কিছু চাঁদাও সংগৃহীত হয়েছিল।

কিন্তু নিমন্ত্রণ গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাদের একটি তারবার্তায় জানালেন যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে ঐ একই দিনে ভাষণ দেবার জন্য তিনি রেঙ্গুন যাত্রা করছেন। তিনি

আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন আমরা যেন তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে বোম্বাইয়ে পাঠাবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দকে পত্র লিখি। মি. সেটলুর এবং উৎসব কমিটির অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে যেন আমি অবশ্যই লিখে জানাই যে বোম্বাইয়ের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে সাগ্রহে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আসার অপেক্ষায় আছে। আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে সব কিছু বিস্তারিত জানিয়ে লিখলাম যে মি. সেটলুর, ড. (পরে স্যার) বালচন্দ্র কৃষ্ণ ও বোম্বাইয়ের অন্যান্য সুপরিচিত নাগরিকরা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সাক্ষাৎ দর্শন এবং ভাষণাদি শোনবার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন। ইতোমধ্যেই মাদ্রাজ থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নাম ও খ্যাতি বোম্বাইয়ে পৌঁছে গিয়েছিল। উত্তরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে লিখলেন যে তাঁকে না জানিয়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে নির্দিষ্ট তারিখে সভার ব্যবস্থাদি করা আমাদের তরফে একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। অবশ্য, তিনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করবেন, যদি তারিখ বদল করা হয়। সে ক্ষেত্রে তিনি রেঙ্গুন সফর শেষ করে বোম্বাই যাওয়ার জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে বলবেন। আমরা সম্মত হলাম। অধ্যক্ষ মহারাজ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অনুমোদনে সভার দিন পরিবর্তিত হলো।

ইতোমধ্যে এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য আমি শ্রীবালগঙ্গাধর তিলকের কাছে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলাম। ঔরঙ্গাবাদ থেকে তিনি উত্তরে জানালেন যে কতকগুলি জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। পত্রশেষে তিনি লিখেছিলেন, "গুরু এবং শিষ্য উভয়কেই আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। আপনাদের এই প্রয়াস সম্বন্ধে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তা সর্বতোভাবে সাফল্য লাভ করুক।"

১৯০৫ সালের মার্চ মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বোম্বাইয়ে আসেন। পূর্বেই তিনি তাঁর আসার তারিখ ও সময় তারবার্তায় আমাদের জানিয়েছিলেন। মি. সেটলুর, মি. বৈদ্যসহ বোম্বাই শহরের বিশিষ্ট নাগরিকরা এবং ওখানকার বাঙালি অধিবাসীদের প্রায় সকলেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। প্ল্যাটফর্মে তাঁকে মাল্যভূষিত করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে টোপীওয়ালা চউলে শ্রীবরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হয়। বরেন্দ্রকৃষ্ণের ঘরেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। শ্রীঘোষ অন্য একটি ঘরে চলে যান।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জানতে চাইলেন যে ওখানে শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য পূজা হয় কিনা। তাঁকে জানানো হলো কেবল বুধবার সন্ধ্যাতেই ফুল-ফল মিষ্টি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করা হয়। তা শুনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাদের বললেন, যতদিন তিনি সেখানে থাকবেন, ততদিন তিনি নিজেই প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা ও ভোগ নিবেদন করবেন। আমরা যেন সেইমতো ব্যবস্থা করি। আমরা তাই করলুম। তিনি যখন গভীর ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করতেন তখন সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য। যৎসামান্য ভক্তি আছে এমন মানুষের কাছেও তা ছিল অভিনব। পূজার সময় পারিপার্শ্বিক তিনি ভুলে যেতেন। তাঁর মন ও অন্তরের ভাবতরঙ্গানুযায়ী তাঁর শরীর হতে বিচ্ছুরিত হতো জ্যোতি।

তাঁর আগমনের একেবারে প্রথম দিনে অনেকেই পুষ্প ও অর্ঘ্য নিয়ে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিঃ (পরে স্যার) নরোত্তম দাস মোরারজীও। নরোত্তম দাসজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে পরদিন তাঁর কাপড়ের মিল দেখাতে নিয়ে যান এবং তাঁকে ঐ কলে তৈরি এক গাঁটরি বস্ত্র উপহার দেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যে চারটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার একটি সভায় বালগঙ্গাধর তিলক সভাপতিত্ব করেন। তিলক রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের পরিচালনায় বোম্বাইয়ে যাতে একটি রামকৃষ্ণ মঠ নির্মিত হয়, সেজন্য রামকৃষ্ণানন্দকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি এমনকি তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় একটি প্রধান সম্পাদকীয়তে লেখেন, কলকাতা ও মাদ্রাজের মতো বোম্বাইতেও যেন একটি মিশন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উপস্থিতিতে একটি কমিটি গঠিত হয়। তাতে সভাপতি হন স্যার বালচন্দ্র কৃষ্ণ, সম্পাদক হন ডাঃ বৈদ্য এবং সদস্য হন বোম্বাইয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ও কয়েকজন বাঙালি অধিবাসী। তিলককে সভাপতি হতে অনুরোধ করা হয়। তিনি রাজি হননি। কারণ, তিনি রাজনীতির লোক। তাঁর নাম থাকলে এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হতে পারে। কমিটির বাইরে থাকলেই তিনি আরও ভালোভাবে সাহায্য করতে পারবেন।

সে যাই হোক, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর অবস্থানকালে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত তাঁর চারটি বক্তৃতার বিবরণ বোম্বাইয়ের সকল ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষার পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তারবার্তার মাধ্যমে জানান, শ্রীরামকৃষ্ণের

কৃপায় তাঁর বোম্বাই সফর সফল হয়েছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে লেখা একটি চিঠির মধ্যে যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাব ও বাণী প্রচারে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানান। এই মূল চিঠিটি স্বামী বিশ্বানন্দ বোম্বাই মঠে সংরক্ষণ করার জন্য আমার কাছ থেকে নিয়ে নেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে দর্শনের জন্য রাত্রি নটা পর্যন্ত (বোম্বাই সময়) সর্বদা ভিড় লেগে থাকত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের নানা ঘটনা এবং নানা অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ হতো যা শ্রোতাদের সংশয় দূর করে তাদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করত।

পরবর্তী কালে বেলুড় মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন মাঝে মাঝে আসতেন তখন তাঁকে দর্শনের সৌভাগ্য হতো। তাঁর জীবনটি ছিল আধ্যাত্মিক ভাবের এক অফুরন্ত উৎস। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছেন তিনি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন নি।

বোম্বাইয়ে থাকাকালে কথাবার্তার মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ রেঙ্গুনে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের বিবরণ দিয়েছিলেন। সেখানে বহুসংখ্যক শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তখন সেখানে ঘটনাচক্রে কবি নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও হয়েছিল। জীবন সম্বন্ধে কবির উদার ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ করেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কবি নবীনচন্দ্র স্বীকার করেন যে এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো একজন অবতারপুরুষ বিশেষ প্রয়োজন। একালে জগতের বিভিন্ন মনুষ্যসমাজের নানা মতবাদ, সংস্কৃতি ও ধর্মাদর্শ, মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এখন পৃথিবীর তাই এমন একজন আচার্য পুরুষ বা অবতারের প্রয়োজন যাঁর মধ্যে ঐ নানা বিষয় ও বস্তু সম্মিলিত আকারে অভিব্যক্ত হবে যাঁর ভাবাদর্শ অনুযায়ী বিশ্ববাসী তাদের নিজ নিজ চিন্তা ও আদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে মিলিত হতে পারবে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নবীনবাবুকে বলেছিলেন এ যুগের সেই বাঞ্ছিত অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস রূপে মানবদেহ ধারণ করেছেন—বিশ্ববাসী তাঁর শ্রীচরণতলে শান্তি ও সমন্বয়ের ভাব গ্রহণ করে অবস্থান করবে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আরও বললেন, এসব শুনে কবিবর অভিভূত হন এবং তাঁর পুত্র নির্মলচন্দ্রের জন্য মহারাজের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। নির্মলচন্দ্র তখন ওখানে ব্যারিস্টারি করছিলেন।

বোম্বাইয়ে থাকাকালে একদিন তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ওখানে হিন্দু শাস্ত্রাদি পাওয়া যাবে, এমন কোন গ্রন্থাগার কাছাকাছি আছে কিনা। আমি বললাম, "হ্যাঁ, আছে।" ভাবলাম যে তিনি বক্তৃতার প্রয়োজনে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ দেখে নিতে চান। তাঁর ভোগ নিবেদন পর্ব শেষ হলে আমি প্রয়োজনীয় বইগুলির নাম জানতে চাইলাম। তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি কি আমাকে পেশাদার বক্তা মনে কর, যে আমাকে বইয়ের সাহায্য নিয়ে গভীর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে হবে। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদেরকে দিয়ে বলান। আমরা তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ। তাঁর দাস ছাড়া আমরা কিছু নয়।" শুনে আমি একেবারে নিশ্চুপ।

আর একদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাদের বললেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্বের কিনারা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আরও বললেন, "তোমরা কি মনে কর, আমরা তাঁর অপূর্ব জীবন এবং বাণী প্রচার করছি? একেবারে নয়। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই অপূর্ব রহস্যময় ভাবে তাঁর অসাধারণ জীবন ও বাণী প্রচার করে যাচ্ছেন। যখন যেখানে তাঁর কথা বলতে গেছি, সেখানে দেখেছি যে, আগে থেকেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। কেউ স্বপ্নে তাঁর দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, কেউ সরাসরি তাঁর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা পেয়েছেন, কেউ তাঁর সহজসরল ভাষা এবং গল্পকথায় ভরা সর্বোচ্চ অনুভূতি ও উপদেশাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে আছেন, আবার কেউ বা স্বামী বিবেকানন্দকে দেখে এবং তাঁর উদ্দীপক ভাষণ শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণই স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটিয়েছেন, যাতে পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে গেছে।"

আমেদাবাদে এক বাঙালি সাধু ছিলেন। যিনি রোগীদের ঔষধপত্র দিয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং তার কিছু পয়সা কড়িও হয়েছিল। কাজের দরকারে বোম্বাইয়ে এলেই আমাদের ফ্ল্যাটে উঠতেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাকে দীক্ষা দিয়েছেন। খুব অল্প বয়সে বোম্বাইয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তার দেখা হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একদিন তার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি জানালাম, লোকে বলে, যে উনি খুবই লোভী। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বললেন, "তা হতে পারে। কিন্তু একথা নিশ্চিত জেনো যে, যাঁরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি কিংবা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছেন তাদের মুক্তি হবেই—এবং এই তাঁদের শেষ জন্ম।"

আশ্চর্য, ঠিক পরদিন সেই বাঙালি সাধুটি আমেদাবাদ থেকে তাঁর কাছে দেখা করতে এলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে আলিঙ্গন করলেন। বেশ কয়েকঘণ্টা তাঁরা কথাবার্তা বললেন। পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাকে বলেছিলেন, "ওকে সাধারণ মানুষ মনে করো না, ও মহারাজের আশীর্বাদ পেয়েছে। বাইরের আচার-আচরণ দেখে ওর বিচার করো না। ওর ভিতরটা হলো ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসায় ভরা।"

১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতার টাউন হলে এক ধর্মসম্মেলন হয়। ঐ প্রকার অনুষ্ঠান ভারতে সেই প্রথম। যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়, তাতে সভাপতি হয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র। তিনদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দারভাঙ্গার মহারাজা স্যার রামেশ্বর সিংহ। আমার অনুরোধে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অনুষ্ঠানটির সাফল্য সম্বন্ধে খুবই আগ্রহ বোধ করেছিলেন। মাদ্রাজের বিশিষ্ট পণ্ডিতজনের কাছ থেকে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন দর্শন শাখা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সক্রিয় সাহায্য এবং সহানুভূতি ছাড়া এই সম্মেলনে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন দর্শন ধারার উপযুক্ত উপস্থাপনা সম্ভব হতো না। একথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

গুরুভাইদের সনির্বন্ধ অনুরোধে, সর্বোপরি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাবার জন্য কলকাতায় চলে আসতে হয়। তিনি তখন দুরন্ত ক্ষয় রোগে আক্রান্ত। তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে বাগবাজার 'উদ্বোধন বাড়ী'তে, 'মায়ের বাড়ী' বলেই যার পরিচয়, রাখা হয়। কলকাতায় এলে ওখানেই শ্রীশ্রীমা থাকতেন। কলকাতার সেরা চিকিৎসকদের চিকিৎসাধীনে তিনি ছিলেন। মঠের লোকজনই অত্যন্ত সাবধানে এবং গভীর ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর সেবা করতেন।

যখন তাঁর শরীরের অবস্থা খুব খারাপ, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে একদিন 'উদ্বোধন বাড়ী'তে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি হাসলেন। আমাকে তিনি তাঁর শেষ কথা শোনালেন ঃ "যারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির আশ্রয় নিয়েছে নিশ্চয় জেনো এটিই তাদের শেষ জন্ম। তাঁদের বিষয় ছাড়া যাঁদের অন্য কোন বাসনা নেই, অন্য কোন কাজ নেই, কামকাঞ্চনের প্রতি লোভ নেই, সে-ই হলো খাঁটি ভক্ত। এমন মানুষেরাই কেবল তাঁদের আশ্রয় করে।"

বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার এবং শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহিভক্ত স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাছে আমি যাতায়াত করতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, "শশী মহারাজের অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি গানের একটি ছত্র লিখে পাঠিয়েছেন, ঐ ভাবানুযায়ী আমি যেন পুরো গানটি লিখে দিই। গানটি ঃ 'পোহালো দুখ রজনী'। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় আমি অবিলম্বে গানটি লিখে ফেলেছি। সেটি পুলিন মিত্র (বিখ্যাত গায়ক) তাঁর কাছে গেয়ে শুনিয়েছেন। শুনে তিনি একেবারে অভিভূত। রচনাটি তাঁর খুবই পছন্দ হয়েছে।" গানটি এই ঃ

"পোহাল দুখ রজনী।
গেছে 'আমি আমি' ঘোর কুস্বপন,
নাহি আর ভ্রম জীবন-মরণ,
হের জ্ঞান অরুণ-বদন বিকাশে, হাসে জননী ॥
বরাভয়করা দিতেছে অভয়,
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়,
বাজাও দুন্দুভি, শমন-বিজয়, মার নামে পূর্ণ অবনী ॥
কহিছে জননী 'কেঁদো না, রামকৃষ্ণ পদ দেখো না।
নাহিক ভাবনা রবে না যাতনা।'
হের মম পাশে, করুণায় দুটি আঁখি ভাসে,
ভুবন-তারণ গুণমণি ॥"

১৯১১ সালের ২১ আগস্ট রামকৃষ্ণানন্দ মহাসমাধিতে প্রবেশ করলেন। শেষ দিনগুলিতে তিনি কেবল ঈশ্বর এবং তাঁর প্রেমঘন অনন্ত করুণার কথা বলতেন। অসহ্য যন্ত্রণা তখন তাঁর শরীরে—তারই মধ্যে তিনি প্রভুর নাম করে যাচ্ছেন। দর্শকদের বলতেন, যখন তিনি ঈশ্বরকে এবং তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি কথা স্মরণ করেন, তখন শরীরের জ্বালা যন্ত্রণার কথা একেবারে ভুলে যান। মধুর হেসে বলতেন—"এসবই তাঁর কৃপা।"

১৯১৬ সালে যখন আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মাদ্রাজে যাই, তখন এক সন্ধ্যাকালে তিনি আমাকে বলেছিলেন—"শশী মহারাজ স্বয়ং বেদান্তমূর্তি। তাঁর শরীর গেছে, কিন্তু তাঁর ভাব সমগ্র মাদ্রাজে জাগ্রত হয়ে আছে।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ত্যাগ, সংযম ও ভালোবাসার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। আচার-আচরণে দৃঢ়-নিষ্ঠ এই সন্ন্যাসী মঠের প্রতি অনুগত থেকে, মঠের সমস্ত

কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে আদর্শের প্রতিভূ, সেই আদর্শের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গভীর আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করে তিনি তাঁর সেবাময় মহান জীবন যাপন করে গেছেন।

অনুবাদকঃ সুজাতা রাহা
[বেদান্ত কেশরী, আগস্ট ১৯৪৯
পৃঃ ২১৪-২২০]

[কুমুদবন্ধু সেন সুলেখক। তিনি শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক পার্ষদদের পূতসঙ্গে এসেছিলেন। আলমবাজার মঠ হতেই তিনি সাধুদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার। ১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশমালা বক্তৃতা দেন এবং পরে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য'।]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-স্মৃতি

ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়

১৯১০ হইতে ১৯১১ খ্রিঃ মধ্যে শ্রীযুত শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) মাদ্রাজ হইতে বিশেষ অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসিলেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে দ্বিতলে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ডানদিকের ঘরটিতে তাঁহাকে রাখা হইল। বিশ্বরঞ্জন মহারাজ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। Anatomy-র dissection প্রথম বৎসর আমার তখন হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য পিঠের উপরকার মাংসপেশিগুলির কথা আমার জানা ছিল। সেইগুলি মনে করিয়া সেই মাংসপেশিগুলির উপরে Vibratory massage করিয়া (টিপিয়া) দিতাম। উহাতে তিনি বিশেষ আরাম পাইতেন এবং বিশ্বরঞ্জন মহারাজকে বলিতেন যে, শ্যামাপদ ডিসেকশন করছে, সেইজন্য ও মাংসপেশিগুলি টিপে দিলে বড় আরাম পাই। অতএব ওকেই করতে দাও। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এই মহাপুরুষের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া ও সেবার সুখ্যাতি শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতাম।

তিনি অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু যখন হাসিতেন তখন মনে হইত ঠিক যেন সাত-আট বৎসরের বালক। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের কৃপা ব্যতীত ঐ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ আমার ঘটিত না। ব্যাঙ্গালোর হইতে একটি ভক্ত তাঁহার জন্য একটি পেঁপে পাঠাইয়াছিলেন, সেই পেঁপে কাটিয়া লম্বালম্বি চার ভাগের একভাগ আমাকে খাইতে দিয়াছিলেন। আমি উহার পূর্বে ওরকম সুস্বাদু পেঁপে কখনও খাই নাই, সেই কথা বলিলে তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

(স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথা ঃ সংকলক ও সম্পাদক—স্বামী চেতনানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০ পৌষ ১৪১২, পৃঃ ২৫১-২৫২)

আমার আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দেন্দ্র সরস্বতী

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন দীর্ঘকায় ও সুঠাম দেহের অধিকারী। তার দেহের রঙ সোনালি। প্রশস্ত প্রশান্ত আনন। তাঁর নয়নদ্বয় আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল।

যখন পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজে এলেন তখন সেখানকার নাগরিকরা তাঁকে এখানে একজন সন্ন্যাসী পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁদের অনুরোধে স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে মাদ্রাজে পাঠান। তার আগে পর্যন্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী আলমবাজার মঠে ছিলেন। স্বামীজী চেয়েছিলেন যে রামকৃষ্ণানন্দজী যেন গীতা, ভাগবত ও অন্যান্য দর্শন গ্রন্থের ক্লাস নেন।

১৮৯৭ সালে মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কাজ আরম্ভ করেন। ১৮৯৮ সালের মধ্যিখান থেকে ১৯১০ সালের শেষ পর্যন্ত আমি বারো বছর তাঁর ক্লাসে নিয়মিত ভাবে যোগদান করেছি। ভক্তদের অনুরোধে তিনি প্রত্যেকদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যেতেন এবং প্রায় দেড় থেকে দুঘণ্টার মতো সকালে ও বিকালে আলোচনা করতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বাঙালি বলে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় কথা বলতেন না। তিনি একমাত্র ইংরেজিতে বলতেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও নানান শ্রেণির লোকেরা তাঁর ক্লাস শুনতে আসত এবং উপকৃত হতো। তিনি সহজ সুন্দর ইংরেজিতে বলতেন এবং অল্প ইংরেজি জানা শ্রোতারাও সহজেই তাঁর কথা বুঝতে পারতেন। আমি তাঁদের মধ্যে একজন যে তাঁর ক্লাস নিয়মিত শুনতো। আমি অতি গৌরবের সঙ্গে জোর দিয়ে বলতে পারি যে তাঁর বক্তৃতাগুলি আমার মনের উপর গভীর ছাপ ফেলেছিল। এতে আমার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছিল যা কখনও পরিবর্তিত বা নষ্ট হয় নি। তিনি কখনও একটিও অপ্রয়োজনীয় বাক্য বলেন নি। তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ শ্রোতাদের মধ্যে কারুর না কারুর আচার-আচরণে প্রত্যক্ষ পরিবর্তন এনেছিল।

তিনি আমাদের উৎসাহ দিতেন। মনে হতো যেন আমরা ভক্তি সমুদ্রে

হাবুডুবু খাচ্ছি। প্রত্যেক শ্রোতা অনুভব করতেন যে শুধুমাত্র তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে নয়, সাংসারিক প্রাত্যহিক জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিয়মিত তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসব পালন করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি সুন্দরভাবে সাজানো হতো এবং তিনি অতি ভক্তির সঙ্গে পূজা করতেন। সকাল হতে রাত্রি পর্যন্ত দর্শনার্থীরা দলে দলে উৎসবে আসতেন। ভজন ও হরিকথা এবং সকলকে প্রসাদ দেওয়া হতো। আমার প্রধান কাজ ছিল প্রসাদ বিতরণের। একবার একজনের খুব ব্যস্ততা ছিল এবং আমাকে প্রসাদ দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। তখনও ভোগ দেওয়া হয়নি। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ভদ্রলোককে অনুরোধ করতে বললেন কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার জন্য। পরে তিনি আমার কাছে খেদ প্রকাশ করেছিলেন ঃ এ ধরনের লোক এখানে আসে কেন? তাঁরা সত্যিকারের প্রসাদ চান, না শুধু ফল চান? প্রত্যেক দিন নিজে যা রান্না করতেন তাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভোগ দিতেন— ভাত, চাপাটি, ডাল, তরকারি, দুধ ও পান। সেভাবে তিনি একাকী (গীতাতে যেমন বলা হয়েছে) বসে আহার করতেন।

ভক্তেরা কখনও কখনও সংকীর্তনে তাঁকে ডাকতেন। সঙ্গে যাবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এরূপ কয়েকটি অনুষ্ঠানে। কীর্তন যেই না আরম্ভ হয়েছে, অমনি তিনি দাঁড়িয়ে ভাবে নৃত্য করতেন। মনে হতো স্থানটি আনন্দ সমুদ্রের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। এ বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তাঁর বক্তৃতাতে সাধু সন্তদের মহান আদর্শের কথা থাকত, তিনি অন্তর থেকে বলতেন। তাঁর ছিল উদার হৃদয় ও মন। তাঁর বক্তৃতা ছিল প্রেমময়। তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার প্রচার করতেন। শ্রোতাদের মন উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে চলে যেত। ভক্তদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা বর্ণনাতীত। সে ভালোবাসা ছিল দেহাতীত। গরিব-দুঃখীদের প্রতি তাঁর ছিল করুণা ও ভালোবাসা। অনেক সময় দেখেছি—নিজের রুটি ভিখারি ও দুঃস্থদের দিয়ে দিতেন। আর নিজে আহার না করে আনন্দে থাকতেন। যদি কোন দর্শনার্থী বা তাঁর কোন ছাত্র দুপুরের আহারের সময় আসতেন, তাহলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী তাকে নিজের পাশে বসাতেন এবং নিজের থালা থেকে তুলে দিতেন। এটি তাঁর অভ্যাস ছিল— নিজে প্রসাদ গ্রহণের আগে অন্যদের খাওয়ানো।

একবার তাম্রপানি নদীর তীরের এক শহরে সাধুসঙ্গ সভা আয়োজন করা

হয়েছিল। তাঁকে উদ্যোক্তারা নিমন্ত্রণ করেছিলেন বক্তৃতার জন্য। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। আমার কাজ ছিল তাঁর বক্তৃতা ইংরেজি হতে তামিলে অনুবাদ করা। আমরা সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সেখানে উপস্থিত হলাম, তাঁর স্নানের জন্য গরমজল রাখা হয়েছিল। তিনি কিন্তু পবিত্র নদীতে স্নান করতে চাইলেন। আমাদের ফিরে আসার পর রাত্রের আহার করলাম। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে খেতে আদেশ করলেন। তাঁর চিন্তা ছিল যে উদ্যোক্তারা হয়তো আমাকে যত্ন করবে না। আমার বয়স তখন কুড়ি বছর। যেহেতু আমি দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ, সেজন্য খাবার সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করতাম। তিনি তা বুঝতেন এবং উপস্থিত অব্রাহ্মণদের বাইরে যেতে বললেন। তিনি বলতেন ঃ "প্রত্যেকের উচিত বর্ণাশ্রম ধর্ম, সামাজিক রীতিকে শ্রদ্ধা করা। যদি না করি, তাহলে আমরা কষ্ট ভোগ করব।" একজন অব্রাহ্মণ তাঁর জন্য পানীয় জল প্রতিদিন নিয়ে আসত। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী আমাকে পান করতে কখনও বলেন নি। আমাদের গোঁড়া রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা।

তিরুনেলভেলিতে তিনি আমাকে স্টেজে ডাকলেন এবং বলবার জন্য উৎসাহ দিলেন—যাতে আমার ভয় কেটে যায়। এভাবে তিনি জনসভায় বক্তৃতা দিতে শিখিয়ে ছিলেন। সেই রাত্রে উন্মুক্ত আকাশ তলে নদীতীরে ঘুমোতে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে আমার এই ইচ্ছার কথা বলিনি। খুঁজতে খুঁজতে আমার কাছে এলেন এবং বললেন ঃ "চল আমার ঘরে ঘুমুবে।" আমি নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলাম এবং বললাম, "মহারাজ, আমাকে বিরক্ত করবেন না, আমি এখানে আরামে আছি।" তিনি হেসে বললেন ঃ "ওঃ, তুমি আমার চেয়ে বড় সন্ন্যাসী" এবং চলে গেলেন।

একবার কাঞ্চীপুরমে গরুড়োৎসবে তিনি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিছু বলার জন্য। আবার তিনি আমাকে সঙ্গে নিলেন। এক উকিলের বাড়িতে আমরা ছিলাম। সেই ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়ে বললেন—"এ কি আপনার শিষ্য?" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী বললেন—"না, না, এসব ছেলেরা আমার শিক্ষক। যদি এ ধরনের ছেলেরা আমার কাছে বেদান্ত পড়তে না আসত, তাহলে আমি অকর্মণ্য হয়ে যেতাম। হয়তো আমি অন্য ধরনের মানুষ হয়ে যেতাম। তারা সব সময় আমাকে ভগবানের মহিমা স্মরণ করায়। সেজন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।" কি পার্থক্য তাঁর ও অন্যান্য সাধুদের মধ্যে—অন্য সাধুরা নিজেকে ভগবান বলে মনে করে এবং শিষ্যদের বলে তাঁর পাদপূজা করতে!

মঠে একজন বাঙালি ব্রহ্মচারী ছিল—যিনি তাঁকে যত্নের সঙ্গে সেবা করতেন। রামকৃষ্ণানন্দজীর ছাত্র এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী একদিন জিজ্ঞাসা করলেন যে ব্রহ্মচারী রাঁধুনি কিনা। রামকৃষ্ণানন্দজী বললেন—"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তিনি আমার ভগবান—তিনি আমার অন্নদাতা।"

রামকৃষ্ণানন্দজী উচ্চ-নীচ ভেদ করতেন না, অথবা ধর্ম, জাতি, স্ত্রী ও পুরুষ ভেদাভেদও মানতেন না। সকলের প্রতি তাঁর ছিল সমদৃষ্টি। যে যতই নীচ হোক বা তার যে কোন পেশাই হোক—কাউকে তিনি নিন্দা করতেন না। এইটি ব্যবহারিক বেদান্ত।

গীতার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা এবং নিজে তা পালন করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির প্রাক্কালে আমি সন্ধ্যা পাঁচটায় মঠে গিয়েছিলাম। আমি বললাম ঃ "আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে আগামী কাল ঘটা করে দরিদ্র নারায়ণ সেবা হবে। কিন্তু আপনার তো এক বস্তা চালও নেই। কেমন ভাবে করবেন?" তিনি আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। দয়া পরবশ হয়ে বললেন ঃ "কি বোকা তুমি! মা অন্নপূর্ণার প্রতি তোমার বিশ্বাস নেই? মা তাঁর ছেলেদের দেখবেন। আমাদের উচিত তাঁর পাদপদ্মে স্মরণ নেওয়া এবং আমরা নিশ্চিন্ত থাকব। তিনি অঘটন পটিয়সী।" আমরা এরূপ কথা বলছিলাম। আশ্চর্য, মেনগেটের কাছে দুটি গরুর গাড়ি এলো—চালের বস্তা, ঘিয়ের টিন, সবজির ঝুড়ি এবং আরও খাবার জিনিসে ভর্তি। আমরা দুজনেই বিস্ময়ে অভিভূত।

তাঁর কথোপকথনে তিনি জোর দিতেন পবিত্র চিন্তা, মনের সঠিক আচরণ ও ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তির উপর, তিনি বলতেন বাহ্যিক পূজার রীতির চেয়ে এগুলির প্রয়োজন আরও বেশি। তিনি আরও বলতেন ঃ "আমাদের অনেকেই মনে করেন আমরা শৈব, আমরা বৈষ্ণব, আরও কত কি। এইটি ভুল। আমাদের অনেকেই মেয়েমানুষ বা অর্থের প্রতি গভীর আসক্ত।" রামকৃষ্ণানন্দজীর গভীর চেষ্টা ছিল ভক্তদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করা। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ রাত্রে ঘুমুতে যাবার আগে প্রত্যেকের উচিত অন্তত কয়েক মিনিট চিন্তা করা ঃ আজ কি আমি আমার মন থেকে অহংকার ও কামকে দূর করার চেষ্টা করেছি অথবা একটু কমাবার চেষ্টা করেছি; আমি কি ভালো অভ্যাস বা গুণ আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছি? অনেকে বলে থাকেন যে "চরিত্রই হলো পঁচাত্তর পারসেন্ট আধ্যাত্মিকতা।" এভাবে তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক জীবন গঠন করার চেষ্টা করতেন।

সন্ন্যাসী ও মঠের প্রধানদের ব্যক্তিগত অর্থ বা জিনিসপত্র নেওয়াকে নিন্দা করতেন। একবার মধ্ব মঠের প্রধান মাদ্রাজে দু-মাস ক্যাম্প করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে প্রত্যেক মধ্বগৃহস্থ তাঁর একমাসের বেতন যেন তাঁকে দেয়। যদি কোন গৃহস্থ তা না দিতে পারে, তাহলে তাকে শাস্তিস্বরূপ সামাজিক বয়কট করা হবে। রামকৃষ্ণানন্দজীর ছাত্র ছিল একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি তাঁকে বললেন ঃ "তোমার তো বেশি আয় নেই। কিন্তু তোমার পরিবার বিশাল। আমি মনে করি না যে ঐ মঠের প্রধানকে না দিলে কিছু হবে।" তাঁকে ভক্তেরা যে প্রণামী দিতেন, তিনি কখনও নিজের কাছে রাখতেন না। কিছু কেনবার প্রয়োজন হলে তিনি নিতেন, বাকিটা ফেরত দিতেন। আমি অনেকবার দেখেছি। অর্থ স্পর্শ করাকে তিনি দূষণীয় মনে করতেন। যখন তিনি বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হতেন, উদ্যোক্তারা কোচম্যানকে সরাসরি টাকা দিতেন। তিনি বারবার শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ স্মরণ করিয়ে দিতেন যে কামকাঞ্চন ত্যাগ করা প্রয়োজন। তিনি ছিলেন ত্যাগ ও প্রশান্তির প্রতীক। তাঁর পবিত্র সংস্পর্শে এসে একজন গৃহস্থ আদর্শ গৃহস্থ, একজন ব্রহ্মচারী আদর্শ ব্রহ্মচারী এবং একজন সন্ন্যাসী আদর্শ সন্ন্যাসিরূপে বাস করতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। বেশি হাঁটাহাটি করলে বা কথা বললে তাঁর ক্লান্তি লাগত। এতে শরীর খারাপ হয়ে যেত। কখনও কখনও শ্বাসকষ্টে ভুগতেন। তাঁর ডানপায়ে একজিমা ছিল—নিয়মিত মলম লাগাতেন। তিনি প্রায়ই চুলকানিতে খুবই কষ্ট পেতেন এবং এজন্য তাঁর শরীরে ম্যাসাজ করার আমি সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি সর্বদা কায়মনোবাক্যে সত্যতা, সততা ও সমন্বয়ের উপর জোর দিতেন। তিনি বলতেন—যুবকেরা সাধারণ পোশাক পরবে, দিনে একবার খাবে এবং ভালো ভালো গুণ অভ্যাস করবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি কপটতা একদম পছন্দ করতেন না, যারা নিজেকে নীতিবাগীশ ও আধ্যাত্মিক মনে করতেন, অথচ কাজে কর্মে বর্বরোচিত আচরণ করতেন, তাদেরকে তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না।

শ্রীবিলিগিরি আয়েঙ্গারের 'আইস হাউস' বাড়িতে রামকৃষ্ণানন্দজী বেশ কয়েক বছর ছিলেন। শ্রীবিলিগিরি আয়েঙ্গার মারা যাবার পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা রামকৃষ্ণানন্দজীকে ওখানে থাকতে দিতে চাইলেন না। তিনি বুঝলেন এবং আইস হাউস ছেড়ে দেবেন বলে মনস্থ করলেন। তিনি বললেন ঃ "আমি সন্ন্যাসী, আমি মনে করি সমুদ্রের তীরে থাকা এবং ভগবানের ধ্যানে সময় কাটানো অনেক ভালো।"

[১৯৪৮ মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে লেখক এই স্মৃতি কথাটি তেলেগু পত্রিকায় লেখেন। তেলেগু থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন কমলা এস. জয়া রাও। স্মৃতিকথার লেখক তেলেগু পণ্ডিত। তিনি তামিল, ইংরেজি ও সংস্কৃত খুব ভালো জানেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের পুণ্য সঙ্গ তিনি বার বছর করেছেন। পরে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত। তিনি তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেছেন।]

বেদান্ত কেশরী জুলাই, ১৯৯৮, পৃঃ ২৪৮-২৫০
অনুবাদক ঃ স্বামী বিমলাত্মানন্দ

স্মৃতিচারণা

সি. রামস্বামী আয়েঙ্গার

প্রথম পর্ব

মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে বহুবছর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার জীবনে তাঁর প্রভাব অসীম। তাঁর স্মৃতি লিখতে আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি। তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্বময় সন্ন্যাসী। তাঁর সম্পর্কে কিছু বলার যোগ্যতা আমার নেই।

আমার মনে হয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ছিলেন পৃথিবীর মহিমময় মহাপুরুষদের অন্যতম, যাঁদের নিয়ে জগৎ গৌরবান্বিত হয়। এরূপ মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে আসা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে পরম সৌভাগ্য। এই সান্নিধ্য যতই কম সময়ের জন্য হোক না কেন, তা সর্বদা আনন্দময়। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি, তাঁর অন্তরের আন্তরিকতা, তাঁর কাজে প্রবল উৎসাহ, সর্বনিম্নস্তরের এবং নিচু মানুষদের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা—এসব ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এগুলি কখনো ভোলা যাবে না। ইন্দ্রিয় সমূহের উপর প্রখর নিয়ন্ত্রণ যে কি অপূর্ব ছিল এবং পৃথিবীর সুপ্রাচীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তিনি যে কি সুযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর মাদ্রাজ আগমনের কারণ ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় তাঁর সাফল্যমণ্ডিত প্রচারকার্য শেষ করে প্রত্যাবর্তনের পর, তিনি কলম্বো থেকে আলমোড়া পরিভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে হিন্দুধর্মের মহান সত্যগুলি সাধারণ মানুষের নিকট প্রচার করেন। আজও আমাদের অনেকের স্মরণ থাকতে পারে, যেরকম তিনি প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে মাদ্রাজে অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং সে সুযোগ তিনি অতি সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত, তাঁর মহত্ত্ব এবং সার্বভৌমত্বের কথা বলতে কখনও ক্লান্তিবোধ করতেন না। তাঁর বক্তৃতা এবং অভিভাষণ এতই প্রভাবশালী ছিল যে তা এখানকার জনসাধারণের মধ্যে পরমহংসদেবের বাণী আরও জানার জন্য প্রকৃত ইচ্ছা জাগ্রত করেছিল। সেজন্য

কয়েকজন নাগরিক তাঁর কাছে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি তাঁর গুরুভাইদের কোনও একজনকে মাদ্রাজে পাঠান—যিনি এখানে একটি মঠ স্থাপন করবেন। এই মঠ থেকে ধর্মীয় প্রচার ও জনহিতকর কাজগুলি পরিচালিত হবে। এস্থানে এধরনের কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে উৎসাহ সহকারে যাঁরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন—মাদ্রাজ কার্যনির্বাহী সভার কিছুকালের সদস্য স্বর্গীয় শ্রী ভি. কৃষ্ণস্বামী আয়ার এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গীয় পি. আর সুন্দর আয়ার।

জনসাধারণের ইচ্ছা পূরণের জন্য স্বামীজী প্রত্যুত্তরে যা বলেছিলেন—সে ছবি এখনও আমার স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এখানে থাকাকালীন তাঁর নিবাসস্থল "আইস হাউসের" সিঁড়ি থেকে নামার সময় তিনি বললেন—"আমি তোমাদের কাছে এমন একজনকে পাঠাব যিনি তোমাদের দক্ষিণ ভারতের সমস্ত লোক থেকে গোঁড়া (নিষ্ঠাবান) এবং একই সঙ্গে ভগবৎ পূজা এবং ধ্যানে অতুলনীয় এবং অনতিক্রমণীয়।"

সেকালে কলকাতা এবং মাদ্রাজের মধ্যে সরাসরি কোনো রেল যোগাযোগ ছিল না। তাই স্বামীজীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরের স্টিমারে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী এবং তাঁর সহকারিরূপে স্বামী সদানন্দ মাদ্রাজে এলেন।

উভয়কেই অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে স্বর্গীয় আলাসিঙ্গা পেরুমল অভ্যর্থনা জানালেন। আইস হাউস রোডে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো। তাঁদের বসবাসের সুবিধের জন্যে যে সব ভক্তেরা ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রামনাদের রাজা স্বর্গীয় ভাস্কর সেতুপতি।

অবিচ্ছিন্নভাবে প্রায় ১৫ বছর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গ করার সুবাদে, তাঁর জীবনের নিত্য কর্মসূচী লক্ষ্য করার অনেক সুযোগ আমার ঘটেছিল এবং লক্ষ্য করেছিলাম কত বিরাট ছিল তাঁর আত্মোৎসর্গ, তাঁর অপার করুণা, তাঁর গভীর সমবেদনা এবং সর্বোপরি তাঁর শিশুসুলভ সরলতার অনেক দৃষ্টান্ত আমি স্মরণ করতে পারি।

কলেজ থেকে ফিরবার পথে এক সন্ধ্যায় সর্বপ্রথম আমি তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। সন্ন্যাসী যে ঘরে বাস করছিলেন, সেই ঘরে উঁকি দিতে এক চেহারা চোখে পড়ল যা শক্তপোক্ত, গৌরবর্ণ, কপোল বুদ্ধিদীপ্ত এবং মন সর্বোচ্চ একাগ্রতায় নিমগ্ন। তিনি তখন স্কট বিরচিত "আইভান হো" পড়ছিলেন। প্রণাম করতেই তিনি আমায় বসতে বললেন এবং আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা

করলেন। তিনি বললেন যে—তিনি তাঁর ইংরেজি ভালোভাবে ঝালিয়ে নিচ্ছেন। এই ভাষাতেই তাঁকে দক্ষিণ ভারতের জনগণকে শিক্ষা দিতে এবং প্রচার করতে হবে। এজন্য প্রথম কয়েকমাস তিনি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। আর সেইসঙ্গে তিনি অনুরাগী ও ভক্তদের একত্রিত করলেন। প্রকৃত ঘটনা হলো কলকাতার মঠে তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছিল—শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ধ্যানে। তারপরে স্বামী বিবেকানন্দই তাঁকে তাঁর শান্তির নিলয় থেকে টেনে এনে মাদ্রাজের কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত করলেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁর নাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল এবং বেশ কিছু শিক্ষামূলক ক্লাসের ব্যবস্থা হলো। এক সময়ে তিনি প্রায় বারোটি ক্লাস নিতেন। সৈয়দ গেট, জর্জ টাউন, ট্রিপলিকেন, মায়লাপুর—যেখানেই মানুষ ধর্ম এবং ধর্মীয় সত্য সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী ছিলেন সেখানেই তিনি ধর্মালোচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আগ্রহী শ্রোতাদের পঞ্চদশী, গীতা, ভাগবত এবং হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় রত্নভাণ্ডারের পবিত্র গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা করতেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকল এবং শহরের ঘরে ঘরে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর নিয়মিত এবং সময়মত এই ক্লাসগুলিতে আসাই তাঁকে সকলের প্রিয় করেছিল। তিনি সর্বদাই ক্লাস আরম্ভের পাঁচ মিনিট আগে আসতেন এবং শ্রোতার সংখ্যা অল্প হলেও তিনি ক্লাস নিতেন। অনেক সময়ে ক্লাসে তিনি ছাড়া আর কেউ থাকত না। সে সময়েও তিনি নিরাশ হতেন না। পুরো সময় তিনি ধ্যানে কাটাতেন এবং নিঃশব্দে মঠে ফিরে আসতেন। এই সব ঘটনায় তাঁর ঈশ্বরনির্ভরতা প্রকাশ পেত। ধৈর্য এবং সহনশীলতার একটি শিক্ষা যা অপরের মধ্যে সুব্যাখ্যার চেয়েও শিক্ষাপ্রদ।

তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অনন্য। তা ছিল কম বেশি প্রশ্নোত্তরমূলক—প্রথাগত বা কঠিন ছিল না। আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি যা বলতেন তা সোজাসুজি শ্রোতার হৃদয়ে গেঁথে যেত। সময় বয়ে যেত মিনিট থেকে ঘণ্টায়। কিন্তু আমরা যারা তাঁর সুললিত বক্তৃতা শুনতাম, আমরা সবাই দিব্য আনন্দ অনুভব করতাম। কেমন করে আমাদের সময় অতিবাহিত হতো তা বুঝতেই পারতাম না। উঁচু তত্ত্ব, জটিল প্রশ্ন, বিতর্কিত সমস্যা এবং নৈতিকতার বিভিন্ন দিকগুলি এত সরলভাবে আলোচিত হতো—যা একটি শিশুও বুঝতে সক্ষম হতো।

অপ্রয়োজনীয় কূট তর্কে আবৃত সত্য সর্বসমক্ষে শ্রোতাদের প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করার তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। শ্রোতারা বিস্ময়ে অভিভূত হতেন—

যখন তিনি আমাদের সনাতন সত্য নতুন আলোকে উপলব্ধি করার শিক্ষা দিতেন, তখন আমাদের মনে হতো আমরা কোন বাক্যবাগীশের কাছে আসিনি বরং একজন অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছি।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে একটি ঘটনা। একদা পাচাইপ্পা কলেজের অধ্যক্ষ এবং ফিলজফির প্রফেসার শ্রীযুক্ত এরিক ড্রিউ এর সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে তাঁর আলোচনা চলছিল। আলোচনার সময় রামকৃষ্ণানন্দজী পুরো বিষয়টির মূল বক্তব্য বলেন মাত্র দুটি বাক্যে। "রাজনীতি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা এবং ধর্ম হচ্ছে ইন্দ্রিয় হতে মুক্তি।" এরকম কোন বিষয়ের সার মর্ম দেওয়ার বিশেষ দক্ষতা তাঁর ছিল। অন্যান্য বক্তৃতাতেও তাঁর এ ভাব পরিলক্ষিত হতো।

আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি, একবার দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি সুন্দরভাবে বললেন—"দ্বৈতবাদে ভোগ আদর্শ; অদ্বৈতবাদে মুক্তি আদর্শ। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে প্রেমিক শেষে তাঁর প্রেমাস্পদকে লাভ করেন এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দাস হন প্রভু। উভয় পথই খুব ভালো। একজনের এক আদর্শ ত্যাগ করে অন্য আদর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।"

ক্লাস নেওয়া এবং বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া মঠে অন্যান্য সময় নিরন্তর পূজায় অতিবাহিত হতো। সে পূজা এত গভীর এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ যে তিনি নিজেকে এবং জগৎকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন। তিনি তাঁর গুরুকে এমনভাবে পূজা করতেন যেন মনে হতো তিনি তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি সর্বদা অনুভব করছেন। তাঁর অশ্রুপূর্ণ নয়নে এবং আবেগকম্পিত কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণের স্তোত্রপাঠ এক অনবদ্য দৃশ্য ছিল।

তাঁর আহার্য বিষয়ে বলতে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আগে কোন খাদ্য নিবেদন করার পর তিনি ঐ খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং তিনি সবিশেষ সচেতন ছিলেন যাতে নিবেদনের দ্রব্য ভালোভাবে তৈরি হয়। এ ব্যাপারে সামান্যতম অমনোযোগিতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ঠিক এভাবে তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করতেন।

যদি কোন অতিথি বা দর্শনার্থী মঠে উপস্থিত থাকতেন, তাঁরা প্রসাদ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি তাদের বিদায়ের অনুমতি দিতেন না। এরূপ আচরণ তিনি তাঁর শেষদিন পর্যন্ত করেছেন।

তিনি কি গভীর ভক্তির সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করতেন তা নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে। একদিন সকালে সরকারি উচ্চ পদাধিকারী এক ভদ্রলোক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে প্রণাম করতে তাঁর কাছে এলেন। তখন সকাল ১০-৩০ মিঃ সকালের পূজা শেষ করে তিনি তাঁর গুরুর প্রতিকৃতিকে* (যা এখনও মাদ্রাজ মঠে রক্ষিত ও পূজিত হয়) 'শিবগুরু, সদ্‌গুরু, সনাতন গুরু, পরমগুরু', ইত্যাদি শ্রীশ্রীঠাকুরের নামোচ্চারণ পূর্বক দু-ঘণ্টা বা তার বেশি সময় যাবৎ বাতাস করছিলেন। আমাদের বন্ধু বিস্ময় এবং শ্রদ্ধায় অভিভূত হলেন এবং অন্য কোনদিন তাঁর সাক্ষাৎ করবেন বলে তাঁকে শুধুমাত্র সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ফিরে আসেন।

মাদ্রাজে তিনি তাঁর গুরুর জন্মদিনের উৎসব প্রবর্তন করেন এবং যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণ দরিদ্র নারায়ণ এর সেবা খুব ভালোবাসতেন, সেহেতু তিনি দরিদ্র নারায়ণ সেবা প্রচলন করেন যা এখন প্রত্যেক বছর হাজার হাজার মানুষকে আকৃষ্ট করছে। কত আন্তরিকতার সাথে তিনি এই কাজ করেছিলেন তা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে। তিনি তাঁর প্রত্যেক গুণগ্রাহীর কাছে গিয়ে তাদের সাহায্যের অনুরোধ করেন যাতে এই মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ভজনের সময় তিনি সকল শ্রেণির ভক্তদের সাথে খোলা মেলা মেলামেশা করতেন। হঠাৎ আবেগে তিনি যেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্তোত্রপাঠ করলেন তাতে সকলে তাঁর সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন। সেই সময়ে সকলেই নিজেদেরকে ভুলে গিয়েছিল। এ ঘটনা একমাত্র তুলনীয় বাংলার বৈষ্ণব সংস্কারক শ্রীচৈতন্যের নামসংকীর্তনের সঙ্গে। এটি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অনেকে যাঁরা এই নৃত্য উপভোগ করেছিলেন, তাঁরা এখনও বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মনের এই উচ্চ ভাবাবেগের কথা স্মরণ করেন।

উৎসবের সময় সমবেত ভক্তদের জন্য সান্ধ্য বক্তৃতার আয়োজন হতো। এর উদ্দেশ্য ছিল ভক্তেরা তাঁদের জ্ঞান এবং বাগ্মিতা দেখাক। বরং এতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে তাঁদের অধ্যয়ন এবং শিক্ষার সুযোগ হতো।

তিনি এই প্রেসিডেন্সির অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন এবং মূলত তাঁরই প্রভাবে ভানিয়ামবাড়ি, ব্যাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রাম, পুডুকোটাহ, ধর্মপুরী এবং অন্যান্য স্থানে কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কর্ম এবং পূজা ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সবসময়েই তাঁর প্রারম্ভিকতাটা ছিল সাধারণ ও আন্তরিক।

---

* বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন মন্দির হয়েছে। পুরাতন মন্দিরে এখনও ফটো আছে।

বিভিন্ন সময়ে তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা সংগৃহীত হয়ে এখন বই-আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হলো "দ্য ইউনিভার্স অ্যান্ড ম্যান।" এতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং বেদান্তের গভীরতর সত্যের ব্যাখ্যা আছে। "শ্রীকৃষ্ণ দ্য প্যাস্ট্রল" এবং "শ্রীকৃষ্ণ দ্য কিং মেকার"—উভয় পুস্তকেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কিছু কিছু দিক আলোচিত হয়েছে। "দ্য সোল অফ্ ম্যান" পুস্তকের সারতত্ত্ব হলো উচ্চ দার্শনিকতা। তাঁর জীবনের মহৎ আদর্শ ছিল ভগবদ্ভক্তি এবং সেই আদর্শের মূর্ত রূপ তিনি দেখেছিলেন শ্রীরামানুজের মধ্যে। শ্রীরামানুজের জীবনী রচনা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। সেজন্য শ্রীরামানুজের স্মৃতিপূত বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। এভাবে প্রথমে মূল উপাদান সংগ্রহ করে উত্তর ভারতের ভক্তদের জন্য বাঙলায় "দ্য লাইফ অব শ্রীরামানুজ" (শ্রীরামানুজ-চরিত) তিনি রচনা করেন। বিশেষ করে যাঁরা এই বই পড়েছেন তাঁদের মনে হয়েছে যে রামানুজের জীবনের মূল ভাবটিকে তিনি ধরতে পেরেছেন এবং সেজন্য এই মহান ধর্মসংস্কারকের সহৃদয় বিবরণ দিতে পেরেছেন। এ বইটির ইংরেজি অনুবাদ মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় তিনজন আচার্য কর্তৃক ব্যাখ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের তিন সুপ্রচলিত তত্ত্বের একটি সংকলন বই করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়ায় তিনি এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। সামগ্রিকভাবে মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল প্রশংসনীয়। তিনি জানতে পারলেন যে কোয়েম্বাটোরের প্লেগে এক পুরো পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়েছে। মাত্র কয়েকটি অনাথ ছেলে টিকে রয়েছে। তারাও কোন মতে বেঁচে আছে। তাঁদের এই অসহনীয় ও বেদনাময় অবস্থা জেনে তিনি তাদেরকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। এইটি ছিল আজকের সুপরিচিত রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোমের সূত্রপাত। এই স্টুডেন্টস হোমে দরিদ্র বালকদের বিনা খরচে থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। সেই সঙ্গে তাদের জীবন গঠনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। তিনি মঠে ব্রহ্মচারীদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যে তাঁরা ধৈর্য এবং আত্মত্যাগের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তিনি তাঁদের সমস্ত অহংকার নাশ করিয়েছিলেন। ফলে তাঁদের জীবন ছিল সরল ও ভক্তিপূর্ণ। এক আমেরিকান ভদ্রমহিলা, বর্তমানে সিস্টার দেবমাতা নামে পরিচিত, তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত

বয়েছিলেন এবং সেকারণেই তিনি পাশ্চাত্যে প্রাচ্য দর্শনের তত্ত্ব এবং আদর্শ ভালোমতো প্রচার করেছিলেন। সিস্টার দেবমাতা রামকৃষ্ণানন্দজীর বক্তৃতা ও ক্লাসের বিষয়গুলি ডায়েরিতে নোট নিয়েছিলেন। ফলে রামকৃষ্ণানন্দজীর মূল্যবান শিক্ষা ও উপদেশ সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও জীবন্ত। এজন্য আমরা সিস্টারের কাছে ঋণী।

তাঁর জীবনের প্রাণের ইচ্ছা ছিল যে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় শিষ্যদের দক্ষিণ ভারতের তীর্থগুলি দর্শন করানো। তাঁরই প্রচেষ্টায় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীশ্রীমা এখানে এসেছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে রামেশ্বর তীর্থ দর্শনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে দক্ষিণ ভারতে তাঁর কর্ম শেষ।

ডায়াবেটিস রোগে তিনি বেশ ভুগছিলেন। তাঁর কাশি রূপান্তরিত হলো যক্ষ্মায়। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার জন্য তিনি কলকাতায় গেলেন। মাদ্রাজে খবর এলো যে তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। সেজন্য আমি তাঁকে সেখানে দেখতে গেলাম। এটাই ছিল আমার তাঁকে সশরীরে দর্শন করার শেষ সুযোগ। তিনি আমার প্রতি খুবই স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং মাদ্রাজে তাঁর অনুরাগীদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। বহুবার তিনি মাদ্রাজে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন এবং মহান আচার্যদের জন্মভূমিতে দেহত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তারপর তিনি আমায় আশীর্বাদ দেন এবং বিদায় জানান।

আমি তাঁর জীবনের আরো অনেক ঘটনা বলতে পারি; কিন্তু সময়াভাবে তা করতে পারছি না। এইটুকুই বলতে পারি যে পরবর্তী কালে স্বপ্নে আমি তাঁর পাদস্পর্শ করেছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমি তাঁর সাথে সমুদ্রসৈকতে ভ্রমণ করছি। আমার সঙ্গে ছিল তাঁর এক ভক্ত। তৎক্ষণাৎ আমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম এবং আমার চোখ দুটি খুলে গেল। তারপরেই আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

দক্ষিণ ভারত তাঁর সন্ন্যাসীদের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু এখানে এমন মহাত্মা ভক্ত খুব কমই আছেন যাঁরা স্বার্থত্যাগে, কর্মনিষ্ঠায় এবং ঈশ্বরভক্তিতে রামকৃষ্ণানন্দজীর মতো ভক্তকে অতিক্রম করতে পেরেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব

(১)

যখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মাদ্রাজে ১৮৯৭ সালে আসেন তখন তিনি আইস হাউস রোডের ছোট্ট বাড়িতে ছিলেন। এই বাড়িটি স্বামী বিবেকানন্দের গুণগ্রাহীরা ভাড়া নিয়েছিলেন। তাঁরাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর ব্যয়ভারও বহন করতেন। কিছুকাল পরে তিনি 'ক্যাসল কার্নানে'র এ্যাপার্টমেন্টে চলে আসেন। এটি আইস হাউস নামে সুপরিচিত। মাদ্রাজে অবস্থান কালে স্বামী বিবেকানন্দ এই বাড়িতে বাস করেছিলেন। এজন্য এটি পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত।

ক্যাসলটির আদি-মালিক ছিলেন শ্রীবিলিগিরি আয়েঙ্গার, যিনি স্বামীজীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। মঠের গোড়াকার দিনগুলিতে, তিনি পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁর উইলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে মাসিক ১২টাকা দেওয়ার শর্ত রাখেন।

তাঁর মৃত্যুর পর ক্যাসলটি নিলামে ওঠে। আমরা খুব চিন্তায় পড়লাম যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি বাড়িটি কিনে নেন, তাহলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে থাকার জন্য অন্য জায়গা খুঁজতে হবে। এতে আমরা সবাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং চেয়েছিলাম মঠের কোন ভক্ত যদি কিনে নেন। নিলামে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এরকম এক ভক্ত ছিলেন ডাঃ এম.সি. নাঞ্জুণ্ডারাও। তাঁর পরিকল্পনা ছিল সেখানে একটি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোম স্থাপন করার। তিনি বাড়িটির জন্য ১৬০০০ টাকা পর্যন্ত নিলামের ডাক ধরেন এবং তারপর হাল ছেড়ে দেন। বাড়িটি ১৭০০০ টাকায় কিনে নেন একজন জমিদার।

যখন নিলামের ডাক চলছিল, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী নির্লিপ্তভাবে, ভিড় থেকে দূরে উঠোনের এক কোণে একটি লম্বা বেঞ্চিতে বসেছিলেন। আমি নিলাম লক্ষ্য করছিলাম। এবং মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে নিলামের সংবাদ দিচ্ছিলাম। তিনি তাকালেন এবং বললেন, "তুমি এত চিন্তিত হচ্ছ কেন? কে কিনবে বা কে বিক্রি করবে আমরা কি তা গ্রাহ্য করি? আমার প্রয়োজন অতি সামান্য। শ্রীগুরু মহারাজের জন্য শুধুমাত্র একটি ছোট ঘর আমার প্রয়োজন। আমি যে কোন জায়গায় থাকতে পারি এবং তাঁর নাম গুণ কীর্তন করে সময় কাটাতে পারি।"

আমরা যা অনুমান করছিলাম, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মূল বাড়িটির যে অংশে বাস করছিলেন তা তাঁকে খালি করে দিতে হলো। তিনি উঠোনের মধ্যে বাইরের

একটি ছোট ঘরে এসে উঠলেন। তিনি মায়লাপুরে না যাওয়া পর্যন্ত বাস করেছিলেন সেখানে।

যখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মাদ্রাজে আসেন, তিনি আমাদের কাছ থেকে আইস হাউসের কাহিনি শোনেন। তারপর তিনি মন্তব্য করেন "এটি অন্যের হাতে দিয়ে তোমরা বুদ্ধিমানের কাজ করো নি। এই বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ বাস করেছিলেন এবং তাঁর কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাবার জন্য তোমরা যদি ওটা সংগ্রহ করতে পারতে, তাহলে এটি হতো তাঁর নামে একটি সুন্দর স্মৃতি সৌধ। তোমরা যদি শুধু আমায় বলতে, আমি যে কোন উপায়ে টাকা জোগাড় করে দিতাম এবং যে সুযোগ এসেছিল তা হাতছাড়া হতে দিতাম না। শশী এ সব ব্যাপারে স্বাভাবিক ভাবে উদাসীন। তোমাদের সকলের কিছু করা উচিত ছিল।"

যদিও ঘটনাটি প্রমাণ করে যে দু-জন মহান ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের আপাতভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও তা অভ্রান্তভাবে উভয়ের মহত্ত্বই প্রকাশ করে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী অধ্যাত্মজগতে এতই মগ্ন ছিলেন যে তিনি প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ সংক্রান্ত ব্যাপারে খুব বেশি মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু অপরপক্ষে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর বিষয় সংক্রান্ত বিচার ক্ষমতা প্রখর ছিল, যদিও তাঁর ছিল শিশুসুলভ সরলতা এবং তিনি আত্মানুভূতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন।

(২)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী জনসমক্ষে উপস্থিত হতে বা বক্তৃতা দিতে দ্বিধা বোধ করতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল আলাপ আলোচনামূলক। কিন্তু যখনই তিনি কোন বক্তৃতা দিয়েছেন, তা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। যদি আমি সঠিকভাবে মনে করতে পারি, এখানে আসার পরে তাঁর প্রথম বক্তৃতাটা ছিল "শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর ধর্মোদ্দেশ্য" এবং তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়াই. এম. আই. এ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিচারপতি স্যার এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ার এর সভাপতিত্বে। বক্তৃতার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী অতি যত্নের সাথে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং আমায় তা দেন। আমি প্রায় দশবছর যাবৎ তা সংরক্ষণ করি এবং তারপরে তা শ্রীপি.আর.রাম আইয়ার কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর নাম শহরে সুপরিচিত হয়ে উঠল এবং তাঁর কাজ চারদিক থেকে প্রশংসিত হতে থাকল। মাদ্রাজে মিশনের স্থায়ী ভিত্তির জন্য, পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, ১৯০২ সালে পাচিয়াপ্পা হলে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটিতে মূলত মাদ্রাজবাসীরা অংশগ্রহণ করেন। "হিন্দুধর্ম এবং দর্শনের চর্চা এবং প্রসারের জন্য শহরে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনার দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিরক্ষা এবং কর্মধারা বজায় রাখতে" তাঁরা সংকল্প করেন। তারপরে অর্থ সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো এবং তাতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী নিজেও এগিয়ে এলেন। তিনি বলতেন, "ভিক্ষাগ্রহণ হচ্ছে অহংকারত্বের পরীক্ষা এবং এর দ্বারা তুমি কতটা উৎপীড়িত হচ্ছ, কতটা তোমার অহংকার আছে তা পরিমাপ করা যায়।" তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং একজন বা দুজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে ট্রিপলিকেন, মায়লাপুর এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে লোকের দরজায় দরজায় ঘুরলেন। ১৭০০ টাকা সংগ্রহ করতে দু-বছর লেগেছিল।

তারপর শ্রীযুক্ত ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার নতুন আবেদনপত্র ছাপলেন। তিনি লিখলেন, "যে সন্ন্যাসী সঙ্ঘে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যরা অন্তর্ভুক্ত, সে সঙ্ঘ পৃথিবীর মহত্তম। তাঁরা নিঃস্বার্থপর জনহিতকর কাজ করেন। এই শহরে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখানে লোকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বেদান্ত প্রচারের জন্য, কোন বেতন বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয় বরং তা মানুষকে ভালোবেসে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর পণ্ডিত এবং বিদ্বানদের বেদান্তের সত্য আলোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য আমন্ত্রণ করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা স্থাপন করা হবে, যেখানে নিঃস্ব গরিবদের দুঃখমোচনের জন্য এবং লোকশিক্ষার জন্য ত্রাণ কার্য সংগঠিত করা হবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে। হাজার হাজার দাতাদের দেশে আমাদের কি তার অভাব হবে? কর্মে একনিষ্ঠতা, উদ্দেশ্যের তন্নিষ্ঠতা এবং স্বেচ্ছায় গৃহীত কর্তব্য অবশ্যই জনসাধারণের প্রত্যয় উৎপন্ন করাবে যে তাঁদের দান মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবে। সুযোগ অবহেলা করলে তা হবে অত্যন্ত নিন্দার্হ। ঈশ্বরের এবং এই প্রাচীন দেশের অমর সাধুদের আশীর্বাদে সাফল্য আমাদের আসবেই।"

(৩)

আবেদনটি বেশ সাড়া জাগাল, যদিও ধীরে। ব্রডিস রোডে একটি ছোট জায়গায় সংগৃহীত অর্থে একটি বাড়ি তৈরি শুরু হলো ১৯০৬ সালে। জমিটি

পাওয়া গিয়েছিল স্বামীজীর ভক্তপ্রবর স্বর্গীয় আকুলা কোন্ডিয়া চেট্টিয়ারের মাধ্যমে। শুভদিনে যথারীতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী পূজা করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করানোর। কিন্তু তা আর সম্ভবপর হয়নি। আমাদের কয়েকজন বন্ধু স্বামী অভেদানন্দকে অনুরোধ জানালেন আনুষ্ঠানিক ভাবে ভিত্তি স্থাপনের জন্য। তখন তিনি পাশ্চাত্য থেকে এসে আমাদের মধ্যে ছিলেন।

শ্রীযুক্ত এ.এস. বালসুব্রামনিয়াম আয়ার কাজের দায়িত্ব নিলেন। বাড়িটি ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে সম্পূর্ণ হলো। তিনি স্মৃতি তহবিলের সম্পাদকদের লিখলেন, "বাড়ি নির্মাণ এবং সুসম্পূর্ণ করার চূড়ান্ত বিল হচ্ছে ৫৫০০ টাকা; এ পর্যন্ত চাঁদা থেকে সংগৃহীত হয়েছে ৪১০০ টাকা। আবার সংগৃহীত টাকা থেকে ঘাটতি মেটাতে হবে। বাড়িটি বসবাসযোগ্য হয়েছে এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী গৃহ প্রবেশ করবেন রবিবার, ১৭ নভেম্বর, ১৯০৭। আমি আপনাদের নির্দেশের অপেক্ষায় আছি—ঐ উপলক্ষ্যে কি করা উচিত ইত্যাদি।"

নির্দিষ্ট দিনের ভোরে, শ্রীযুক্ত এ.এস. বালসুব্রামনিয়াম আয়ারের গাড়ি আইস হাউসের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে অপেক্ষা করছিল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছিল। রামকৃষ্ণানন্দজী শ্রীগুরু মহারাজের প্রতিকৃতিটি সঙ্গে নিলেন। তিনি আমাকে সাবধানে ছাতা ধরতে বললেন যতক্ষণ না তিনি গাড়িতে ওঠেন। আমরা নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে নতুন বাড়িতে এলাম।

এটি ছিল একটি সাধারণ লাল রঙের একতলা বাড়ি, উঁচু ভিত্তির উপর বাড়িটি ছিল। বিশাল ছাদ। ভিতরে একটি বড় হলঘর এবং চারটি ঘর ছিল। হলঘর থেকে একটি দরজা দিয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। সেখানে একটি বাড়িতে খাবার ঘর এবং স্নান ঘর ছিল।

নতুন বাড়ির ভিতরে এসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী শিশুর মতো আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন—"এটি শ্রীগুরুমহারাজের বাসোপযোগী একটি সুন্দর বাড়ি। এই বাড়িতে শ্রীগুরুমহারাজ থাকবেন বলে তিনি বললেন—আমাদের এটিকে সর্বদা পরিষ্কার এবং খুব শুদ্ধ রাখতে হবে। আমাদের যত্ন নিতে হবে যাতে পেরেক পুঁতে বা অন্য কোনভাবে দেয়ালগুলো নষ্ট না হয়, বুঝেছ?"

শ্রীগুরু মহারাজজীকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা এবং পূজা করা হলো।

শ্রীকপিলেশ্বরের অভিষেক এবং বিশেষ পূজা হলো। পরে কোন এক সময় কৌতুকছলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী বলেছিলেন, "এ পর্যন্ত আমি ট্রিপলিকেনে ছিলাম এবং পার্থসারথি আমাকে অনেক পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু এখন কপিলেশ্বর আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়েছেন। তুমি জান যে তাঁর নামের অর্থানুযায়ী তিনি হলেন ভিক্ষুদের প্রভু এবং এরপরে তিনি আমাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন।" দরিদ্রনারায়ণ ভোজন করানো হলো। শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনার জন্য পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করা হলো। সন্ধ্যায় একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হলো। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী শ্রী (বর্তমানে স্যার) পি.এস.শিব স্বামী আয়ারকে অনুরোধ করলেন সমাগত ভক্তদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার জন্য। আরাত্রিক এবং প্রসাদ বিতরণের পর সেই দিনের অনুষ্ঠান শেষ হলো।

(৪)

ক্যাসল কারনানের প্রথম দিককার দিনগুলিতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী নিজেই ছিলেন, 'তাঁর নিজের ভৃত্য এবং পাচক'। যখন তিনি মায়লাপুরে এলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন একজন ব্রহ্মচারী এবং একজন পাচক। সারাটি দিন ছিল তাঁর ঈশ্বরের প্রতি নিরন্তর সেবা।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী শহরের বিভিন্ন স্থানে ক্লাস নিতেন এবং মঠে অভ্যাগতদের সংখ্যাও ছিল অনেক। যখন কেউ বাইরে থেকে মঠের ভিতরে আসতেন, তাকে নিজের পা ধুতে এবং প্রাঙ্গণের মধ্যে অতি ভক্তিভরে প্রবেশ করতে হতো। যদি কোন আগন্তুক এই প্রথা ভঙ্গ করে প্রবেশ করতেন, তার ফিরে যাবার পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী সে স্থানে জল ছিটিয়ে পবিত্র করতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী যখন প্রথম এ স্থানে আসেন তখন তিনি এখানকার পবিত্রতা বিষয়ক যেসব কথা বলেছিলেন এই মুহূর্তে আমি স্মরণ করছি। তিনি সর্বদা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতেন যে, প্রত্যেকেই যাঁরা মঠে আসছেন, এমনকি কুলি পর্যন্ত যেন প্রসাদ পায়। এজন্য তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদিত মিষ্টি ও নারকেল নাড়ু রাখতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁর দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। অনেক উদাহরণের মধ্যে একটি হলো—তিনি প্রতিদিন ভোরে গীতা এবং বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করতেন। এর কোন অন্যথা হতো না। ১৯০৬ সালে রামেশ্বরম যাবার পথে, স্বামী প্রেমানন্দজী তাঁর মাকে নিয়ে মাদ্রাজে ছিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী এক রাত্রি তাঁদের দুজনের সঙ্গে কাটান, যেখানে প্রেমানন্দের মায়ের বাসস্থান ছিল। সেই রাত্রে তাঁর কাছে গীতা ও বিষ্ণুসহস্রনাম ছিল না। গভীর রাত্রিতে তিনি আমাকে বই দুটি কোন প্রতিবেশির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে বলেন। সেগুলি তিনি তাঁর পাশে রেখে তারপর শুতে গেলেন।

মঠে তাঁর প্রয়োজন কমিয়ে ন্যূনতম করেছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে সন্ন্যাসীদের পক্ষে 'ভিক্ষান্নম্' উৎকৃষ্ট। অনুরক্ত যুবক ভক্তদের কয়েকজনকে তাঁর জন্য নিকটবর্তী কয়েকটি বাড়ি থেকে ভিক্ষার অন্ন আনতে পাঠাতেন। এটি করার দুটি উদ্দেশ্য তাঁর মনে ছিল। এক দারিদ্রের আদর্শ তাঁর সামনে বজায় রাখা। আর বালকদের ভিক্ষার মাধুর্য অনুভব করাতে এবং ভিক্ষা করে পবিত্র হতে শিক্ষা দেওয়া। তিনি আমাকে এই সেবার সুযোগ বহুবার দিয়েছিলেন।

যখনই তাঁর কোন সাহায্যের দরকার হতো, তিনি তা অন্যের নিকট চাইতে দ্বিধান্বিত হতেন। তিনি বলতেন, "যদি আমরা সাহায্য ছাড়া একেবারে চলতে না পারি, তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট কেন প্রার্থনা করব না? অন্যের নিকট কেন যাব?" একবার শ্রীগুরু মহারাজের জন্মদিন আগত প্রায়। দরিদ্র নারায়ণ ভোজন উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। এর জন্য তখনও অর্থের কোন সংস্থান ছিল না, মধ্য রাতে আমি মঠে ঘুমোচ্ছিলাম। হলঘর থেকে অদ্ভুত শব্দে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো। শব্দের অনুসরণ করে গেলাম। দেখলাম খাঁচায় আবদ্ধ সিংহের মতো স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী পায়চারী করছেন। আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে কি যেন বিড় বিড় করছেন। আমি তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে ভয় পেলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম তা ছিল দরিদ্র নারায়ণ ভোজনের জন্য তাঁর সাহায্যের প্রার্থনার ধরন। পরের দিন সকালে অর্থের সুরাহা হলো। মহীশূরের যুবরাজের কাছ থেকে বড় দান পাওয়া গেল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর রচিত পুস্তক "মহাবিশ্ব ও মানব" (Universe & Man) বইটি পড়ে যুবরাজ তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছেন।

দক্ষিণ ভারতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর ইচ্ছা ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর আলোকে তিনজন আচার্যের দর্শন মতবাদের সমন্বয় সাধন করা। বাঙলাভাষায় তাঁর রচিত 'শ্রীরামানুজ চরিত' খুবই উঁচুমানের এবং এটি বৈষ্ণব আচার্যদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় বহন করে।

আচার্য শঙ্করের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ। যখন তিনি ক্যাসল

কারনানে ছিলেন তখন এক ধনী ব্যবসায়ী মঠে প্রায়ই আসতেন। তিনি একদিন শঙ্করের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য করেন। তাতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ক্রোধে জ্বলে ওঠেন এবং এতে ভদ্রলোক খুবই অবাক হন। তাঁর পাশে কয়েক শ ভক্ত ছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে ব্যবসায়ী মঠকে আর সাহায্য দেবেন না। একথা পরে তাঁরা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি আর সাহায্য দেবেন না। তুমি কি মনে করো শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ এই ধরনের লোকের দয়ার উপর নির্ভর করে?"

অন্য কোন এক সময়ে ঠিক একই ধরনের ঘটনা মায়লাপুরে ঘটেছিল। তিনি এক ধর্মীয় সভায় আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আলোচনা চলাকালীন সভার সংগঠকদের একজন শ্রীশঙ্করকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী আচার্যের অপমান সহ্য করতে পারলেন না। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "যেখানে শ্রীশঙ্কর সম্মানিত হন না, সেখানে আমার স্থান নেই।" এই বলে তিনি দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করলেন।

ঐ কালে অনেক যুবক সঙ্ঘে যোগদান করার জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে এসেছিলেন। তাদের কয়েক জনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল।

একজন বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ যুবক ছিলেন যিনি জাপান থেকে সদ্য ফিরে এসেছেন। তিনি মঠে কিছুকাল ছিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁকে দেখেছিলেন তাঁরা ভেবেছিলেন যে সে খুব ভক্তিমান এবং সঙ্ঘভুক্ত হবে। কিন্তু কাউকে স্থায়িভাবে সঙ্ঘে যোগ দেবার আগে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী সর্বদা তাঁদের বেশ কঠিন পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি প্রায়ই নবাগতদের মেঝে ঝাড়ু দিতে বা থালাবাসন ধুতে বা অন্যান্য দৈহিক কাজ করতে বলতেন। জাপান থেকে আগত নবাগত তা সহ্য করতে পারলেন না, একদিন তিনি বললেন, "এখানে আমি এসব বিষয় শিখতে আসিনি।" তৎক্ষণাৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁকে মঠ ত্যাগ করতে বললেন।

অপরজন ছিলেন একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ যুবক। যখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী জানতে পারলেন যে সে বিবাহিত এবং তাঁর বৃদ্ধ মাতা পিতার ভরণ পোষণের সাহায্য দরকার, তিনি তাঁর বারংবার অনুরোধেও কান দিলেন না। তিনি তাঁকে তাঁর নিজ সাংসারিক দায়িত্ব পালনের জন্য উপদেশ দিলেন।

তৃতীয়জন ছিলেন একজন ভালো বিখ্যাত খেলোয়াড়। তিনি অবিবাহিত এবং সন্ন্যাস জীবনের প্রতি তাঁর তীব্র ঝোঁক ছিল। তিনি এ ব্যাপারে স্বামী

রামকৃষ্ণানন্দজীকে কয়েকবার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি সর্বদা বলতেন, "আমি আর কে? যদি তুমি সঙ্ঘে যোগ দিতে চাও তবে তোমার আমাদের সঙ্ঘাধ্যক্ষের কাছে যাওয়া এবং জিজ্ঞাসা করা উচিত।" তাই তিনি বেলুড় গেলেন। সেখানে সঙ্ঘাধ্যক্ষ বললেন, "যদি তোমার সঙ্ঘে যোগ দেবার একান্ত ইচ্ছে হয় তাহলে তুমি অবশ্যই রামকৃষ্ণানন্দজীর কাছে যাও এবং তাঁর সেবা কর। তাঁর মাধ্যমে এসো।" যখন তিনি ফিরে এলেন তখন রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁকে মঠ বাসের অনুমতি দিলেন। সে সর্বদাই গভীর ধ্যানের ভান করত এবং মঠের কোন সাধারণ কাজ করত না। সত্যকার ধর্মজীবন অত সহজে লাভ করা যায় না। একদিন তিনি নিঃশব্দে মঠ ছেড়ে চলে গেলেন এবং রোয়াপেট্টায় রাস্তার ধারে কুটিরে বাস করতেন। পরে তিনি তিরুভেট্রিয়ুর চলে গিয়ে সেখানে বাস করতেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। সন্দেহাতীতভাবে তিনি ছিলেন মুমুক্ষু, কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁকে সন্ন্যাস জীবনের উপযুক্ত মনে করেন নি।

একই ধরনের অনেক ঘটনার মধ্যে এগুলি কয়েকটি ঘটনা মাত্র। আমরা দেখেছি যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী একজনকেও সন্ন্যাসের জন্য সঙ্ঘভুক্তি করেন নি। তাঁর কাছে আশ্রম জীবন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ শাস্ত্রে আছে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গম্ পথস্তৎ।" এজন্য তাঁর মাদ্রাজে অবস্থানে কেউ সন্ন্যাসী হননি। কিন্তু এও মনে রাখা দরকার যে তাঁর কোন অনুগামী সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য ছিল না।

মানুষ যে যেখানে আছে সেখান থেকে তাকে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত করতে চাইতেন। সর্বস্তরের শত শত মানুষের জীবনে তাঁর প্রেরণা নিঃশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে। এবং তারাও চলার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি সদ্য প্রাপ্ত দুটি পত্রের উল্লেখ করতে চাই যা তাঁর চিরস্থায়ী প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে।

একজন ভক্ত লিখছেন, "প্রত্যেক মহৎ চিন্তা, আমার মনে আমাদের ভালোবাসার পাত্র শশী মহারাজের মুখশ্রী এবং তাঁর স্মিত হাসির চিত্র বহন করে আনে। ঐ দিনগুলি ছিল আশীর্বাদপূত এবং আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। বহু ভক্তের মধ্যে আমরাই কয়েকজন ঐ আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলাম। শুধুমাত্র আমরা সেই সময়ে তা জানতে সক্ষম হইনি।"

অপর একজন লিখছেন, "যাঁরা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পায়ের ধূলা গ্রহণ করেছেন তাঁরা সোনার মানুষে পরিণত হয়েছেন। তাঁর স্পর্শমাত্রই পাপী সাধুতে রূপান্তরিত হয়। আমি নিজেকে ভালোভাবে জানতে পাচ্ছি; তাঁর স্পর্শ আমাকে

কিভাবে প্রভাবিত করেছে। আমার অনেক দুর্বলতা এবং ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ঝড় ঝাপটার মধ্যেও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তিনি ভিন্ন আমার জীবনে কোনো আধ্যাত্মিকতা থাকতোই না। তাঁর চরণতলে আমরা প্রথম মিলিত হয়েছিলাম এবং তাঁর চরণতলে আমরা আবার মিলিত হবো।”

(৫)

১৯০৮ সালের শেষভাগে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মাদ্রাজে শুভাগমন হয়। যখন তিনি এলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁকে তাঁর নিজের ঘরে থাকার বন্দোবস্ত করলেন। এজন্য ঘরটি ভালোভাবে করা হয়েছিল। বাইরে প্রবেশ পথে হলঘরে নিজে থাকতেন এবং বলতেন, “গুরু মহারাজ এবং তাঁর সন্তান ভিতরে থাকবে। আমি এখানে থাকব এবং তাঁদের সেবা করব। এর বেশি কি আমি চাই?” স্বামী ব্রহ্মানন্দজী যে ঘরে থাকতেন তার প্রবেশ দ্বারে আমি তাঁকে প্রায়ই অলক্ষ্যে প্রণাম করতে দেখতাম। এইরকম ছিল মহারাজজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। [স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে তাঁর গুরুভাইরা এই নামেই ডাকতেন]।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী পৌঁছনোর পরেই সর্বশ্রী ভি. কৃষ্ণস্বামী আয়ার, পি. আর. সুন্দর আয়ার তাঁর জন্য ফল ও ফুল নিয়ে দর্শন করতে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁদের মহারাজজীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বিদায় নেবার আগে শ্রীযুক্ত ভি. কৃষ্ণস্বামী আয়ার রামকৃষ্ণানন্দজীকে জিজ্ঞেস করলেন—“উনি কি বক্তৃতা দেবেন? আমি সব বন্দোবস্ত করব। কোন্ সময় তাঁর পক্ষে সুবিধে হবে?” রামকৃষ্ণানন্দজী হেসে উত্তর দিলেন, “বক্তৃতায় কি আছে? তিনি কখনও বক্তৃতা দেন না। তাঁর মতো মহাপুরুষ কেবলমাত্র দৃষ্টি বা স্পর্শ দিয়ে কারুর মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চারিত করতে পারেন।”

কিছুদিন পর স্বামী ব্রহ্মানন্দজী যখন রামেশ্বরমে তীর্থভ্রমণে গেলেন তখন শ্রীভি. কৃষ্ণস্বামী আয়ার সমস্ত সুযোগ-সুবিধের আয়োজন করলেন। শ্রী টি.ভি. শেষগিরি আয়ার, (স্যার) কে. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু তীর্থ যাত্রার জন্য অর্থ দিলেন। মহারাজজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্য রেলওয়ের প্রথম শ্রেণির কক্ষের ব্যবস্থা করা হলো। চারজন নবীন স্বামী ও আমি অন্য কক্ষে ছিলাম। শ্রীভি. কৃষ্ণস্বামী আয়ার আমাকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই দলের সঙ্গে যেতে, যাতে স্বামীজীদের ঠিকমতো যত্ন এবং তাঁদের সমস্ত সুযোগ সুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

পথে একটি স্টেশনে ট্রেন থামলে আমি রামকৃষ্ণানন্দজীকে দেখতে গেলাম। আমি দেখলাম একটি সিগারেট হাতে নিয়ে, তিনি জানলার বাইরে উঁকি দিচ্ছেন। তিনি তা থেকে একটা টান দিলেন, তারপর মাথায় স্পর্শ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিচে ফেলে দিলেন। আমি এতে খুব অবাক হলাম। কারণ আমি তাঁকে আগে কখনও ধূমপান করতে দেখিনি; যদিও বাংলায় ধূমপান খুবই স্বাভাবিক।

তিনি আমায় বললেন, "এটি পবিত্র প্রসাদ।" তিনি সিগারেটের অবশিষ্টাংশ মহারাজজীর ধূমপানের পর তাঁর হাত থেকে নিয়েছিলেন।

রামেশ্বরমে রামনাদের রাজার প্রাসাদে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে যাবার আগে মহারাজজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মন্দিরে গেলেন। জোড়া-বলদে টানা গাড়িতে তাঁরা গেলেন। যখন তাঁরা ফিরে এলেন তখনও তাঁরা আমাদের বাক্স ইত্যাদি জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখলেন। মহারাজজী ভর্ৎসনা করলেন, "এগুলি কি পরে হতে পারত না? তোমরা এখানে ভগবানকে পূজা করতে এসেছ এবং তোমাদের প্রথমে তাই করা উচিত।"

আমরা রামেশ্বরমে তিনদিন ছিলাম। দ্বিতীয় দিনে নবীন স্বামীজীরা এবং আমি সমুদ্রস্নানে গেলাম। মহারাজজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্য আমরা পাত্রে পবিত্র জল নিয়ে এলাম। মহারাজজীর নিয়ে আসা বেনারসের গঙ্গাজল দিয়ে দেবাদিদেব শিবের অভিষেক করা হলো।

পথে মাদুরাইতে আমরা তিনদিন ছিলাম। এখানে এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটলো। মীনাক্ষী মন্দিরে মায়ের জীবন্ত রূপ মহারাজজী দর্শন করলেন—দেখলেন তাঁর দিকে মা এগিয়ে আসছেন। এতে তাঁর সমাধি হয়। খুবই ভীড় ছিল এবং রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁকে প্রায় একঘণ্টা ধরে থাকেন। একই সঙ্গে তিনি নিজেও ভাবস্থ ছিলেন—চোখ দিয়ে জলের ধারা বইছিল এবং বারংবার মাতৃবন্দনা করছিলেন।

মন্দিরের বাইরে আসার পর একটি হলঘরে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী আদি শঙ্করাচার্যের মূর্তি দর্শন করলেন। মূর্তির চরণ স্পর্শ করে তাঁর প্রণাম করার ইচ্ছা জাগল। কিন্তু পুরোহিতেরা তাঁকে অনুমতি দিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের ধাক্কা দিয়ে বললেন, "এই মহান মহাপুরুষকে পূজা করতে কে আমায় বাধা দিতে পারে?" তিনি মূর্তির কাছে গেলেন এবং প্রণাম করলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো।

তৃতীয় পর্ব

(১)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী সম্পর্কে মাদ্রাজে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অনুরাগীদের কাছে যা বলেছিলেন তা আমরা স্মরণ করি ঃ

"আমি তোমাদের এমন একজনকে পাঠাব, যিনি দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে গোঁড়া ব্যক্তির চেয়েও গোঁড়া; কিন্তু একই সঙ্গে ভগবৎ জ্ঞানে এবং ভক্তিতে অপূর্ব ও অতুলনীয়।" এই কথার সত্যতা আমি উদাহরণ সহযোগে বলার চেষ্টা করব।

প্রথমত, গীতা এবং গঙ্গার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "গীতা এবং গঙ্গাজল হিন্দুদের হিন্দুত্ব।" এটা কি শুধুমাত্র দেশভক্তি বা বাল্য সংস্কার? কে জানে? "মা গঙ্গা এবং হিন্দুদের মধ্যে কি অপূর্ব মনোরম সম্পর্ক। এটা কি শুধুই কুসংস্কারের ফল? হতে পারে। তাঁরা গঙ্গানাম জপ করে জীবন ধারণ করেন, গঙ্গা জল কণ্ঠে ধারণ করে দেহত্যাগ করেন, দূর দূরান্তের মানুষ গঙ্গাজল তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যান, যত্ন করে তাম্রপাত্রে রাখেন এবং পবিত্র উৎসবাদিতে তাঁরা বিন্দু বিন্দু পান করেন।" গঙ্গাজলের পাবনী শক্তির প্রত্যেকটি কথা রামকৃষ্ণানন্দজীর জীবনে প্রতিফলিত।

যখন তিনি প্রথম মাদ্রাজে আসেন, তিনি পূজার জন্য তাঁর সঙ্গে গঙ্গাজল আনেননি এবং তিনি অচিরেই আনার ব্যবস্থা করলেন। ১৮৯৯ সালে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাবার পথে রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্য বেশ বড় একটি মাটির কলসি ভর্তি গঙ্গাজল নিয়ে আসেন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন সিস্টার নিবেদিতা ও স্বামী তুরীয়ানন্দজী। যে স্টিমারে তিনি ছিলেন তা মাদ্রাজ বন্দরে পৌঁছালো। সে সময়ে কলকাতায় প্লেগ হওয়ায় বন্দরে দর্শনার্থীদের এবং যাত্রীদের প্রবেশ বা প্রস্থানের নিষেধ ছিল। স্টিমারটি জাহাজ ঘাট থেকে দূরে নোঙ্গর করল। বন্ধু বান্ধব এবং ভক্তেরা যাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য বিপুল সংখ্যায় সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা ছোট ছোট নৌকায় করে স্টিমারের পাশে গেলেন। যে সমস্ত উপহারগুলি তাঁরা এনেছিলেন তা ঝুড়ি করে উপরে ওঠানো হলো এবং গঙ্গাজলের কলসিটিও একই উপায়ে নিচে নামানো হলো। রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে আমি ও কয়েকজন এক নৌকায় ছিলাম। তিনি বিবেকানন্দ এবং স্বামী তুরীয়ানন্দজীর পছন্দের কিছু মিষ্টি ও রান্নাকরা তরকারি এনেছিলেন—সেগুলিও উপরে পাঠানো হলো। আমাদের উপরে ডেকের

কিনারায় গৈরিক বসনে ভূষিত দুজন সন্ন্যাসী এবং ভগিনী নিবেদিতার আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি দর্শন করলাম। স্বামী তুরীয়ানন্দজী মাদ্রাজে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীকে বললেন, "আমি আমেরিকায় যাচ্ছি বলে আনন্দিত নই এবং আমি বাধ্য হয়ে যাচ্ছি। যদি আমার পরিবর্তে তুমি যাও, তবে আমি এখানে থাকব"। আমাদের যখন ফিরে যাবার সময় হলো, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী আমায় বললেন, মাঝিকে বলো স্টিমারের চারিদিকে আমাদের প্রদক্ষিণ করাতে। দুই মহাত্মার চরণ আজ আমরা স্পর্শ করতে পারলাম না। অন্তত তাঁদের প্রদক্ষিণ করি। মাঝি অসন্তুষ্ট হয়ে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল, কিন্তু রামকৃষ্ণানন্দজী প্রদক্ষিণের জন্য জেদ করতে লাগলেন এবং বললেন, "যদি প্রয়োজন হয় মাঝিকে কয়েক আনা পয়সা বেশি দেবে।"

এবার গীতা সম্বন্ধে বলি। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী প্রতিদিন সকালে প্রথমেই গীতা পাঠ করতেন। কখনওই বাদ যেত না। তাঁর রচিত "শ্রীরামানুজ চরিত"-এ তিনি আলেয়াবাদে গীতার প্রতি অনুরাগের কথা যা লিখেছেন তা তাঁর নিজের প্রতিও প্রযোজ্য। গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাক বা না থাক, "আমি জেনেছি যে গীতাপাঠ সকল কাজের মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয় এবং গৌরবজনক। গীতা পাঠ সর্বপ্রথম করা উচিত।" তিনি আরও বললেন, "যে শুধু মাত্র একবার গীতার প্রধান সত্য মনে প্রাণে বুঝেছেন সে কেমন করে জগতের তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে? প্রকৃতপক্ষে গীতার মধু আস্বাদন করার জন্য শুদ্ধ অন্তঃকরণে ভক্তি এবং শুদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন। এছাড়া শ্রীভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী কেবলমাত্র বার বার পাঠ করলে বিফল হবে না। এটা পাঠকের মনে অতি অবশ্যই পবিত্র এবং ভক্তির ভাব জাগ্রত করবে।"

"রামকৃষ্ণানন্দজী প্রায়ই একটি শ্লোক* উদ্ধৃত করতেন যার অর্থ—মৃত্যু তাকে কেমন করে ভয় দেখাবে যে ভগবদ্‌গীতা সামান্য পড়েছে, কয়েকবিন্দু গঙ্গাজল পান করেছে এবং ভগবানকে অন্তত একবার পূজা করেছে?"

শুধুমাত্র এসবগুলিতে নয়, প্রথাগত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ও বিশ্বাসের সকল ব্যাপারেও রামকৃষ্ণানন্দজী খুব নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। উদাহরণ দেওয়া যাক। তিনি পঞ্জিকা না দেখে কোন শুভকাজ আরম্ভ করতেন না। তিনি বিশেষ দিনে বা তিথিতে কখনো যাত্রা করতেন না। তিনি আপাতভাবে শুভ-অশুভ লক্ষণ, চিহ্ন এবং পূর্বাভ্যাসের উপর খুবই গুরুত্ব দিতেন।

* ভগবদ্‌গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।
সকৃদ্‌পি যস্য মুরারিসমর্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাম্‌॥

যখন তিনি 'শ্রীরামানুজ চরিত' রচনা করেছিলেন, সে সময়ে তিনি কাঞ্জিভরম্ এবং শ্রীপেরামবুদুরে যান। সেখানে বিভিন্ন উৎস থেকে বৈষ্ণব সাধুদের জীবনীসংক্রান্ত অনেক মজার গল্প এবং ঘটনা সংগ্রহ করেন। যখন তিনি একটি ভেষজ গুল্ম 'থুথুভালাই'-এর গুরুত্ব সম্বন্ধে জানলেন যে তা সাত্ত্বিক খাদ্য এবং এটি গ্রহণে যমুনাচার্য ত্যাগের পথে প্রেরণা পেয়েছিলেন তখন তিনি এটির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি মঠে তা লাগালেন এবং যত্নের সঙ্গে পরিচর্যা করতেন এবং তিনি প্রতিদিন খেতেন। মঠের একজন সন্ন্যাসী যিনি তাঁর সহকারী ছিলেন একদিন সাধারণ আগাছা মনে করে তা উপড়ে দেন। এতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন।

(২)

তিনি বাল্যকালে ও কৈশোরে খুবই গোঁড়া নিষ্ঠাবান ছিলেন। যখন তিনি সন্ন্যাসিরূপে সমস্ত সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হলেন তখনও তিনি একইরকম ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, এই ছোট ছোট বিষয়গুলির কোন মূল্য না থাকলেও তা পালন করা উচিত। কারণ বীজের খোসা যদি বের করা হয় তাহলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা নষ্ট হয়। সেজন্য ধর্মের প্রাণচঞ্চলতার জন্য এই বিষয়গুলি প্রয়োজনীয়। তার গুরুভাইদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব ছিল প্রায় পূজার মতন। একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবরূপে তিনি নিজেকে গণ্য করতেন ও বলতেন; "আমি তাঁর (প্রভুর) ভৃত্যের, তাঁর ভৃত্যের ভৃত্য।" একবার তিনি এর্ণাকুলামে ছিলেন এবং সেখানে বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীদুরাই স্বামী আয়ারের বাড়িতে প্রবেশ মাত্রই বললেন, "আমি শুনেছি যে স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকের সময় আপনার বাড়িতে ছিলেন। এটি একটি তীর্থস্থান। ঠিক যে জায়গাটিতে বা ঘরটিতে তিনি ছিলেন, প্রথমেই আমি তা দর্শন করতে চাই।" শ্রী দুরাইস্বামী আয়ার উত্তর দিলেন, "যখন তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন ঠিক যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তিনি সেখানেই বসেছিলেন।" তৎক্ষণাৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মেঝেতে গড়াগড়ি দিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। কেননা যে ধুলিতে তাঁর নেতার পাদস্পর্শ হয়েছে তা তাঁর নিকট ছিল পবিত্র। মাদ্রাজ এবং অন্যান্য স্থানেও যেখানে তিনি শুনতেন যে স্বামী বিবেকানন্দ সেস্থানে অবস্থান করেছিলেন তিনি সে সব স্থান দর্শনমাত্র প্রণাম করতেন, যেন সেটি একটি মন্দির।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার বিভিন্ন উদাহরণ আমি বর্ণনা করেছি। এখানে আর একটি মজার ঘটনা বলব। ১৯০৮ সালে যখন তিনি মাদ্রাজে ছিলেন, একদিন তিনি আমায় একজন দক্ষিণ ভারতীয় নর্তকীর ছবি সংগ্রহের জন্য আদেশ করেন। তিনি কি করবেন তা ভেবে আমি বিস্মিত হলাম। পরের দিন সন্ধ্যায় ছবিটি নিয়ে মঠে এলাম, আমি রামকৃষ্ণানন্দজীকে জিজ্ঞেস করলাম এ ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন কিনা। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর এরূপ ছবি চাওয়ার ব্যাপারে তিনিও অজ্ঞ। কিন্তু তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন এটি ভালো নয়। বিশেষ করে মঠের দর্শনার্থীরা যদি এটা দেখেন বা এই সম্বন্ধে শোনেন, তাহলে তাঁরা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে ভুল বুঝতে পারেন। সেজন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ছবিটি আমার কাছ থেকে নিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে এ ব্যাপারে কোন কিছু বলতে নিষেধ করলেন। যদি তিনি আবার এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে তখন বলতে পারো। শীঘ্রই যখন তিনি (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমাকে বলতে হলো যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে আমি এই ছবিটি দিয়েছি। তিনি এ ব্যাপারে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর অনধিকার হস্তক্ষেপ অনুমোদন করেন নি—তা আমার মনে হলো। এরপরে যখনই রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁর কাছে আসতেন, তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। এমনকি তাঁর সঙ্গে কথাও বলতেন না। কিছুদিন পর তিনি মাদ্রাজ ছেড়ে চলে যাবার দিনক্ষণ ঠিক করার জন্য পঞ্জিকা আনালেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী তা আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ব্রহ্মানন্দজীর ঘরে ছুটে গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, "দয়া করে আমার উপর রেগে যেও না। আমি হচ্ছি অনুপযুক্ত এবং তুচ্ছ ভৃত্য। কেবল তোমার ইচ্ছামাত্র একশো শশী আসতে পারে।" (অন্তরঙ্গগোষ্ঠীর মধ্যে রামকৃষ্ণানন্দজী শশী নামে পরিচিত।) তৎক্ষণাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মুখশ্রী হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মেঘ কেটে গেল। উভয়ের সারল্য এবং অকপটতা যে কেউ শ্রদ্ধা না করে পারে না, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ছিলেন মহাপ্রাণ। তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীকে ক্ষমা করলেন তাঁর বিনয় ও শিশুবৎ আচরণে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কেন এই ছবি চেয়েছিলেন তা আমি পরে বুঝেছি। বাঙলার এক ভক্তকে তিনি তা পাঠাতে চেয়েছিলেন—ভক্তটির চরিত্র স্খলন হয়েছিল। তার গুরুর কাছ থেকে এই ছবিটি পাওয়ায় তার কি প্রভাব হবে! যখনই সে ছবি দেখবে তখনই এর উপর তার ইন্দ্রিয় লালসাময় দৃষ্টি পড়বে। সেই সঙ্গে

তার মনের মধ্যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ছবি ভেসে উঠবে। এভাবে তার কাম অপসারিত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও একই ধরনের ঘটনা আমরা স্মরণ করতে পারি। আধ্যাত্মিক জীবনের নিম্নস্তরের গৃহিভক্তদের তিনি বলতেন, "একজন সবচেয়ে খারাপ জায়গায় যেতে পারে, কিন্তু সে যেন শুধু চৈতন্যময়ী মায়ের সঙ্গে যায়। একজন মদ্যপান করতে পারে তবে তা প্রথমে মা জগদম্বাকে নিবেদন করে পান করুক।" এরকম অনেক উপদেশ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এগুলির অনুমোদন আছে তা নয়। কিন্তু এ ছিল দুর্বলচিত্ত ভক্তদের ক্রমে বদ্ অভ্যাস ত্যাগ করানোর উপায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তাঁর নিজ গুরুর মতো, তাঁর শিষ্যদের নতুন এবং সাধারণভাবে উচ্চতর মার্গ দর্শন করাতেন। এমনকি যাঁরা তাঁর খুব নিকট সান্নিধ্যে থাকতেন তাঁরাও তাঁর বহু কাজের তাৎপর্য প্রথমে বুঝতে সক্ষম হতেন না।

(৩)

তৃতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর ভক্তি। তাঁর জীবন ছিল নিরন্তর কঠোর সংযম ও কৃচ্ছ্র সাধনায় পূর্ণ। তিনি কখনোই কাউকে নিজের কষ্টের কথা বলতেন না। তিনি পূজার সময়ে তাঁর মনের কথা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে নিবেদন করতেন।

এক সন্ধ্যায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে কয়েকজন ভক্ত দেখা করতে আসেন এবং তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তিনি মন্দিরে আছেন। তাঁরা মন্দিরে তাঁকে রাগতভাবে উচ্চকণ্ঠে বলতে শুনলেন, "বুড়ো আমায় এখানে এনেছ এবং আমাকে অসহায় ভাবে ফেলে রেখেছ। তুমি কি আমার ধৈর্যের এবং সহ্যশক্তির পরীক্ষা করছ? এরপর থেকে আমি নিজের জন্য, এমনকি তোমার জন্যও ভিক্ষা করতে বের হব না। যদি অযাচিত ভাবে কিছু আসে, তা আমি তোমায় নিবেদন করব এবং সেই প্রসাদ গ্রহণ করব। অন্যথা আমি সমুদ্রতটের বালি নিয়ে এসে তোমায় নিবেদন করব এবং তাই আহার করে আমি জীবনধারণ করব।" ভক্তেরা বাইরে থেকে তাঁর কথা বুঝতেই পারছিলেন না এবং তাঁরা অনুমান করলেন যে তিনি অন্য কারোর সঙ্গে ঝগড়া করছেন। কার সঙ্গে? শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে! এভাবে তিনি তাঁর গুরু এবং ভগবানের দিব্য উপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করতেন।

অন্য আরেক ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। মঠের প্রথম বাড়িটি তৈরির পর শিগ্‌গিরই নানা জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছিল। বৃষ্টির সময় ছাদের ফাটল

দিয়ে জল পড়ত। এই সময়ে তিনি মন্দিরে গিয়ে দেখতেন বৃষ্টির জল পড়ছে কিনা। এক রাত্রে তিনি মন্দিরে গিয়ে দেখেন ঠিক শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির উপরেই জল পড়ছে। রামকৃষ্ণানন্দজী তখনই সেখানে ছাতা ধরে সারা রাত দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ না বৃষ্টি বন্ধ হয়। অন্য কেউ হলে, ছবিটি অন্যত্র সরিয়ে নিত ও ঘুমুতে যেত। কিন্তু রামকৃষ্ণানন্দজী তা করলেন না। তাঁর মনে হলো যদি তিনি তা করেন তবে অসময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁর বিশ্রাম থেকে জাগিয়ে তোলা হবে এবং তা হবে অন্যায়।

তাঁর অনন্য ভক্তি ছিল। যাঁরা ক্ষণিকের জন্যেও তাঁর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাও তাঁর ভক্তিতে আপ্লুত হতেন। তিনি কিন্তু কাউকেই তাঁর শিষ্য করেননি। সম্প্রতি আমি এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছি যে মহীশূর রাজপ্রাসাদের বর্তমান মৃদঙ্গবাদক শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। যেদিন মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী 'ন্যাশনাল গার্লস স্কুল' (জাতীয় বালিকা বিদ্যালয়) উদ্বোধন করেন, সেদিন তিনি মৃদঙ্গ বাজিয়ে ছিলেন। সে সময়ে তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অচিরেই তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে। ঐ দিনটিকে তিনি তাঁর জীবনের এক মহান দিনরূপে স্মরণ করেন।

অন্য এক গোঁড়া বৈষ্ণব বন্ধু ছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দজীর সাথে সাক্ষাত হবার পর আমায় বলেন যে, যখনই তিনি দৈনিক পাঠের জন্য 'তিরুভৈমোঝি' খুলতেন এবং নাম্মালওয়ার এবং অন্যান্য সন্তদের কথা চিন্তা করতেন তখন ''স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী''র অবয়ব তাঁর সামনে ভেসে উঠত। তিনি আচার্যের মহত্ত্ব দেখেছেন, এই পরম মহাত্মার মাধ্যমে তিনি অজানা সন্তদের মহত্ত্ব জেনেছিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর সাথে আমরা সাক্ষাৎ করতে পেরে নিজেরা সৌভাগ্যবান মনে করি। আমরা মনে করি আজও তিনি একইভাবে আমাদের সঙ্গে আছেন।

অনুবাদ ঃ ব্রঃ যতিরাজচৈতন্য

বেদান্ত কেশরী, মে, ১৯২২, পৃঃ ৯১-৯৭,
আগস্ট ১৯২৮, পৃঃ ১৪৯-১৫৭,
সেপ্টেম্বর ১৯৩০, পৃঃ ১৭৮-১৮১

[শ্রী সি. রামস্বামী আয়েঙ্গার (১৮৭১-১৯৩২) ছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের 'রামু'। রামু স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসেছিলেন যখন স্বামীজী পরিব্রাজক ও আমেরিকা ফেরার পর মাদ্রাজে ছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের সঙ্গে প্রথম থেকেই তিনি মঠ স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমের প্রথম সম্পাদক। আমৃত্যু এই পদে ছিলেন। যদিও তিনি রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তবুও তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন।]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

শ্রীসি. রামানুজাচারীয়ার

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যগোষ্ঠীর অন্যতম। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ভার তাঁরই উপর অর্পিত হয়। আজ সর্বত্রই—সন্ন্যাস শিক্ষা ও লোকসেবাব্রতী অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে ও তাঁর পূতসঙ্গপ্রাপ্ত বহু ভাগ্যবানের জীবনে—আমরা রামকৃষ্ণানন্দজীর তপস্যার সুপক্ক পরিণতি লক্ষ্য করেছি।

তিনি কি সাধন করেছেন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে সাথে সাথেই উত্তর দিতেন, "আমার গুরু প্রয়োজনীয় সকল সাধনাই করেছিলেন।" সেরকম রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ কেন্দ্রের সাফল্যের কারণ কি, যদি কেউ জানতে চাইতেন, তবে আমরা কালবিলম্ব না করেই বলতে পারি, সে রহস্য লুকিয়ে আছে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উৎসর্গীকৃত জীবনে, অন্যের কোন প্রচেষ্টায় নয়।

যে কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন, তার গৌরবময় পরিণতি ও জগৎ কল্যাণার্থে তাঁর কাজের সাফল্য আজ সামনে দেখতে পাওয়া আমাদের মহা সৌভাগ্য বলতে হবে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবন ছিল ঘটনা-বিরল। কোন সাময়িক বিপ্লব দিয়ে তা বিকশিত হয় নি। যা হবার তা একেবারেই হয়েছিল। প্রয়োজনবোধেই কেবল তাঁর তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি হতো মাত্র। সাধনার প্রারম্ভে তিনি যা করতেন, শেষেও তাই করে গেছেন। এরকম জীবনের বর্ণনা দেওয়া সহজ, অনুভব করা কঠিন এবং অন্যের পক্ষে অনুশীলন করা একরকম অসম্ভব।

আধ্যাত্মিক শক্তি

সাংস্কৃতিক সংকটের আবর্তে দেশ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হলো তখন যেসব বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি তার মোহে আকৃষ্ট হলেন, তাঁদের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একজন, কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে ও গুরুকৃপায় তিনি সাফল্যের সাথে তা থেকে বাইরে এসে জগতে জ্ঞানালোক বিতরণ করলেন ও ঐ সংস্কৃতির পেছনে যে প্রচ্ছন্ন বিপদ রয়েছে সে বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিলেন।

১৮৬৩ খ্রিঃ-এ ভূমিষ্ঠ হয়ে ৪৮ বছর তিনি এই মরধামে ছিলেন এবং মাদ্রাজে চোদ্দ বছর নিজ কার্যশেষে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট মহাসমাধি লাভ করেন।

ধর্মপ্রাণ বাবা-মার সন্তানরূপে ইহজগতে এসে তিনি একান্ত ধার্মিক পরিবেশে লালিতপালিত হন। দেবতুল্য বাবার কাছে যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছিলেন পরবর্তী কালে তা আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। পিতা বীজ বপন করেছিলেন এবং শ্রীগুরুর সস্নেহ সান্নিধ্যে তা থেকে বিশাল বৃক্ষের উদ্ভব হলো।

শশী (শশিভূষণ চক্রবর্তী তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম) ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এবং আশা করা গিয়েছিল যে, তিনি যোগ্যতার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। জ্যোতির্বিদ্যাও তাঁর ভালো লাগত এবং জগৎ ও অনন্ত সম্বন্ধে নিজ মত নির্ধারণে এটি তাঁকে সাহায্য করেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরু ভাইদের মতো আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে তিনিও কলেজ জীবনে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছিলেন। এতে কিন্তু তাঁর ধর্ম-তৃষিত অন্তরের পিপাসা নিবৃত্ত হয় নি। বরং তা অধিকতর ক্ষুধার উদ্রেক করল। ব্রাহ্ম সমাজ এই ক্ষুধা প্রশমিত করতে পারে নি। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত ও বাইবেল-পাঠে তাঁর তৃষ্ণা আরও বর্ধিত হলো।

বক্তৃতাকালে ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্বের কথা বার বার উল্লেখ করায় এরূপ একজন আধ্যাত্মিক-গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যে এত কাছে আছেন তা তিনি অবগত হন।

প্রথম মিলন

আপন জ্যাঠতুতো ভাই শরৎচন্দ্রের (স্বামী সারদানন্দ) সাথে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখতে যান। ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসে সেই সাক্ষাৎকার হয়। সেই প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ চিনলেন শশী ও শরৎ তাঁর দুই অন্তরঙ্গ। প্রসঙ্গত তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনি শশীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার সাকারে না নিরাকারে বিশ্বাস?" শশী উত্তর দিলেন ঃ "ঈশ্বরের অস্তিত্বেই যখন আমার সন্দেহ বর্তমান, তখন ঠিক কোন্‌টিতে বিশ্বাস করি তা বলতে আমি অক্ষম।" এরূপ সরল উত্তরে পরমহংসদেব অত্যন্ত খুশি হলেন।

এই সাক্ষাৎকার শশীর মনে চিরস্থায়ী রেখাপাত করল ও তাঁর জীবনে আমূল

পরিবর্তন এনে দিল। সেদিন থেকে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীগুরুর পদতলে বসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও চিন্তাধারায় শশী চিরদিনের মতো বাঁধা পড়লেন।

তাঁর কলেজে পড়ার সমস্ত আকর্ষণ নষ্ট হলো এবং পরমহংসদেবের অপরূপ ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি ক্রমশ আকৃষ্ট হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশকে তিনি দেবোপদেশরূপে গণ্য ও তা বর্ণে বর্ণে পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টিত হলেন। তাঁকেই তিনি নিজের জীবনের ধ্রুবতারা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁর উচ্চধারণা ধীরে ধীরে গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধায় রূপায়িত হলো। সেজন্যই শশী গুরুসেবায় আরও বেশি সময় নিয়োগ ও তাঁর ভালোবাসার পরিচালনায় আধ্যাত্মিক সাধনা আরম্ভ করলেন।

সখ্য

শশী বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ পাবার পর আমার বক্তব্য আর কিছুই রইল না। ব্যক্ত করবার আগেই তিনি আমার সব সন্দেহ ভঞ্জন করতেন।" শরৎ ও নরেন্দ্রর সাথে শশীর অচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় এবং তাঁদের মধ্যে যে অন্তহীন আলোচনা চলত, তাতে সবারই বিশেষ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়।

শুভাকাঙ্ক্ষী একজন প্রতিবেশী যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সাধারণের যখন এই বিশ্বাস, চল্লিশের পর ধর্মাভ্যাস করা উচিত, তখন এত কমবয়স থেকে তুমি কেন ধর্মজীবন বরণ করছ?"—এর উত্তরে তিনি সেই মুহূর্তে বললেন—"আপনি কি নিশ্চয় করে বলতে পারেন আমি ততদিন জীবিত থাকব? মৃত্যু যে কোন সময় আসতে পারে আমার কি সেজন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়?"

এরপর প্রায় তিনবছর তিনি শ্রীগুরুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য-লাভের সুযোগ পান। এসময় বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণেশ্বর দর্শনে যেতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যাধি সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টি, সেবা ও শুশ্রূষার প্রয়োজন ব্যবস্থায় ঐ সান্নিধ্য গভীরতর হতে লাগল। যুবক শিষ্যদের মধ্যে বারোজন—তাঁদের মধ্যে শশী এবং নরেন্দ্রও ছিলেন—বাড়ি ও পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সেবার জন্য সমবেত হলেন। ভক্তদের মধ্যেও ঐ কালে শশীর প্রাধান্য পরিস্ফুট হয়।

গুরুসেবা

নিজের সুবিধা, সোয়াস্তি ও স্বাস্থ্যের প্রশ্ন চিন্তা না করেই তিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে দিনরাত শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করেছিলেন। শশীর জীবনীকার লিখছেন—"অন্যান্য শিষ্যরা যখন অধিকাংশ সময় আধ্যাত্মিক সাধনায় কাটাতেন, শশী তখন সর্বক্ষণ ছায়ার মতো গুরুর পাশে থেকে তাঁর প্রয়োজন মেটাতেন। গুরুসেবাই তাঁর প্রধান সাধনা ছিল এবং তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করল। এ সময়ে গুরুসেবায় তিনি যে উদ্যম দেখিয়েছিলেন, সেটাই শেষদিন পর্যন্ত তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হয়। শ্রীগুরুর চরণে তিনি নিঃসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং মনে প্রাণে গুরুপ্রীতি ও গুরুসেবাই তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা হয়েছিল। এই সেবায় তাঁর মন থেকে সংসার ও বন্ধুবান্ধব, লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে মুছে গেল।"

প্রত্যেক যুবক ভক্তের গুরুভক্তির প্রাবল্য ছিল, কিন্তু শশীর ক্ষেত্রে তা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ওইরকম ভক্তির তুলনা নেই, যা অতুলনীয় ও অননুকরণীয়। শশী ছিলেন সেবার মূর্ত প্রতীক। তিনি বেশ ভালো করেই বুঝেছিলেন যে, গুরুসেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। তিনি অন্য কোনরকম তপস্যা করেননি এবং অন্য কোন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন জানতেন না।

গুরুর রোগ যন্ত্রণা দূর করাই তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল। নিজের জীবনের বিনিময়ে গুরু আরোগ্য লাভ করলে তিনি তাতেও প্রস্তুত ছিলেন। নিঃস্বার্থ ভালোবাসার তিনি আদর্শস্থল। সেবার মাধ্যমেই তিনি পূর্ণতা লাভ করেন।

এটি দেখে সন্ত কান্নাপ নায়নারের ভক্তির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। তিনি আপন ইচ্ছেমতো শিবপুজো করতেন। একদিন দেখলেন যে মহাদেবের চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। এটি নিরাময় করতে তৎক্ষণাৎ নিজের চোখ উৎপাটন করে শিবকে দান করলেন।

হনুমানের উপমা

হনুমান যে ভাবে ব্যক্তিগত সুখ সুবিধের কথা বিবেচনা না করে প্রশ্নহীন, আপত্তিহীন ও দাস্যভাবে অতুলনীয় গুরুভক্তি প্রদর্শন করেছেন, শশী সেই আদর্শ সর্বদাই সামনে রাখতেন। সেবার মূল রহস্য কি তা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি বুঝেছিলেন এবং সেবা, কেবল সেবা করেই গেছেন, গুরুর বিশেষ করুণা লাভ করে তিনি তাঁর চিহ্নিত সেবক ও পুত্ররূপে গণ্য

হয়েছিলেন এবং তাঁর সেবায় দ্বিতীয়টি আর কেউ ছিলেন না। গুরুভক্তির এরূপ নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যায়।

সর্বশেষ ও আনন্দময় মুহূর্ত যখন এলো, গুরু যখন আনন্দোচ্ছ্বাসে জগন্মাতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তখন খুব শান্ত হতে চেষ্টা করেও এই দৈহিক বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে শশী সমস্ত দেহমনে অবশ হয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে কাঁদতে অচেতন অবস্থায় গুরুর চরণে পড়ে গেলেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর গুরুর ভস্মাস্থির অধিকাংশ নিত্যপূজার জন্য রাখা হলো এবং উত্তরাধিকারীদের জন্য শশী এই সম্পদকে একনিষ্ঠভাবে রক্ষা করে গেলেন। এটিকে তিনি গুরুমহারাজের রক্তমাংসের শরীররূপে গণ্য করতেন। গুরুর ভস্মাস্থির ওপর তিনি বারো বছর ধরে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছিলেন, এক মুহূর্তের জন্য এটিকে পরিত্যক্ত রাখেন নি।

গুরুগতপ্রাণতা দিয়ে শশী মঠের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। আলাদা ঘরে একটি বেদির উপর গুরুর ভস্মাস্থি রেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবিতকালে তিনি যেমনটি সেবা ও ভক্তি করতেন তখনও ঠিক তেমনটি করতে লাগলেন। সেজন্য দিব্যদেহে অবস্থান করলেও মঠের সকলেই ঠাকুরের জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলেন।

অনবরত নাম জপ ও অবিরাম স্মরণ তাঁর কাছে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল, তিনি প্রায়ই বলতেন—"আমি কেবল এই কাজেই সমগ্র জীবন দেব। আর কিছু আমি চাই না।"

শিষ্যদের রক্ষণাবেক্ষণ

গুরুর তিরোধান ও ১৮৯৭ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক মিশন ও বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা—এই দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তীকাল ত্যাগী শিষ্যদের কাছে ঘোর দুর্দিন রূপে উপস্থিত হয়েছিল। ঠাট্টা, বিদ্রুপ, নিত্যকার খাবার ও ভরণপোষণের সংস্থান নেই, এরকম বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের সাথে তখনকার দিনগুলি করুণ হয়ে উঠল। বিধাতার কোন এক অলক্ষ্য বিধানে শশীর উপর শিষ্যদের পরিচালনভার অর্পিত হলো, এ অবস্থায় পড়লে মানুষের পক্ষে যতখানি করা সম্ভব, ততখানি উদ্যমের সাথে নির্ভীক হৃদয়ে অপূর্ব বিশ্বাসভক্তি সহকারে সে কর্তব্য তিনি পালন করে চললেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছেন—"শশী ছিল মঠের মূল খুঁটি। সে না থাকলে মঠ চলা অসম্ভব হতো।"

তাঁর ব্যক্তিত্বের উন্মাদনায় ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে মঠের প্রতি বেশ কয়েকটি অমূল্য জীবন আকৃষ্ট হলো ও তা যথাযথ আধ্যাত্মিক শক্তিতে ধীরে ধীরে দীক্ষিত হতে লাগল। স্বামী বিবেকানন্দ ফিরে এলে শশীর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হলো।

প্রথম পর্যায়ের বারো বছর কাল শ্রীগুরুর সেবাই তাঁকে পূর্ণভাবে অধিকার করেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি যে কেবল সেই সেবারই অনুশীলন করেছিলেন তা নয়। পরন্তু এটির সাথে শ্রীগুরুর উপদেশ ও বাণী প্রচারের কাজটি যুক্ত করলেন। সব কাজকেই তিনি শ্রীগুরু মহারাজের কাজ বলে জানতেন।

১৮৯৭ সনের শুরুতে মাদ্রাজবাসিগণ স্বামী বিবেকানন্দকে পেয়েছিল। সেই প্রথম তিনি পাশ্চাত্য বিজয় যুগপ্রবর্তনকারী ভ্রমণ শেষে ভারতে ফিরলেন। মাদ্রাজের ভক্ত সকলের আকুল আকাঙ্ক্ষায় মাদ্রাজে প্রথম একটি মঠ স্থাপনের কথা তাঁকে পেয়ে বসে। স্বামীজী সম্মত হয়ে বললেন—"আমি তোমাদের কাছে এমন এক সন্ন্যাসীকে পাঠাব যিনি দক্ষিণের সমস্ত গোঁড়া ব্যক্তির থেকেও গোঁড়া; তিনি তামাক খান না, আর তোমরা যতখানি যত্নের সঙ্গে পূজা-জপাদি কর, তিনি তার চেয়েও বেশি যত্ন সহকারে তা করেন।" ইনিই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসে তিনি মাদ্রাজে এলেন।

মাদ্রাজে কাজের কথা

নিজস্ব উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সাথে তিনি কাজে ব্রতী হলেন। ধারাবাহিক ভাবে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিতে লাগলেন এবং শহরের বিভিন্ন অংশে বেদান্ত ক্লাস খুললেন। শহরের চারিদিকে কমপক্ষে সপ্তাহে দশটি ক্লাস বসত।

১৯০২ সালের জুলাই মাসে মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ ইহধাম ত্যাগ করলেন। মাদ্রাজবাসিগণ ঠিক করলেন যে, তাঁদেরই আপনজন পুণ্যশ্লোক স্বামীজীর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি 'আনন্দ মন্দির' স্থাপন করবেন। তখনও পর্যন্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ 'আইস হাউসে' বাস করছিলেন। যথেষ্ট তৎপরতা ও উদ্যমের সাথে স্মৃতিরক্ষার কাজটি গ্রহণ করা হয় নি।

১৯০৭ সালে একটা ছোট মঠবাড়ি (বর্তমানের মঠ বাড়ি নয়) তৈরি হলো

এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ওখানে চলে গেলেন। তখন মঠে যৎকিঞ্চিৎ ও ক্বচিৎ কখনও সাহায্য আসত।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব-প্রভা, বাগ্মিতা ও সাফল্য মাদ্রাজের জনসাধারণকে বিমোহিত করল মাত্র, কিন্তু প্রবল কর্মপ্রেরণার কোন স্থায়ী প্রভাব দেখা গেল না। তখনও শ্রীগুরু মহারাজের মাহাত্ম্য ও গৌরবের কথা লোকে খুব কমই জানত।

শশী মহারাজ যখন শান্ত ও নীরব পরিবেশে কাজ আরম্ভ করলেন, কেবল তখনই মাদ্রাজবাসী শ্রীগুরু মহারাজকে সম্পূর্ণ জানতে, বুঝতে ও পূজা করতে আরম্ভ করল। মিশনের কাজে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো।

ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা

জনসেবার দিক থেকে 'দি রামকৃষ্ণ স্টুডেন্টস্ হোম' নামে অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠাই তাঁর চিন্তা ও শ্রমের প্রথম আন্তরিক বহিঃপ্রকাশ। ১৯০৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোট আকারেই এর আরম্ভ হয়েছিল। এটির স্থায়ী ক্রমোন্নতি ও অসাধারণ সাফল্যই তাঁর আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব ও বিশ্বাসের অভ্রান্ত নিদর্শন।

তাঁর পরবর্তী কীর্তি হলো ব্যাঙ্গালোরে মঠ স্থাপন ও মহীশূর রাজ্যে মিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রসারের বীজ বপন করা। ব্রহ্মদেশ, ত্রিবাংকুর ও পদুকোটা রাজ্যে তাঁর ভ্রমণের ফলে ঐ সমস্ত জায়গায় ভবিষ্যৎ কাজের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল।

তিনি প্রথমে মানুষ তৈরি করতে চাইতেন এবং তাদের দ্বারাই মিশনের কাজ গড়ে উঠবে বলে তাদেরকে ভিত্তিভূমি হিসেবে গণ্য করতেন।

তার মধ্যে ছিল কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা। এছাড়া, যেসব ব্রহ্মচারী তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন বা যাঁরা তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উল্লেখযোগ্য সভ্যরূপে গণ্য হয়েছেন।

'জীবন্ত বিশ্বাস' যে কি তা তিনি দেখিয়েছেন। কৃত্যানুষ্ঠান বা পূজাপদ্ধতি শশী মহারাজের মতো সাধুরা যখন গ্রহণ করেন, তখন তা প্রাণস্পন্দনে ভরে ওঠে। তখন তা সার্থক হয় বা তার উপলব্ধি করা যায়। এগুলিকে তিনি নিছক অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য করতেন না, কারণ প্রভু তাঁর কাছে ছিলেন প্রাণবন্ত। তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করতেন।

কৃত্যের মূল্য

শশী মহারাজের পূজাকৃত্যের সার্থকতা ও তার মূল্য বিষয়ে সকল সন্দেহের নিরসন করেছিল। তাঁর পুজো দেখতে দেখতে মানুষের অন্তরে ও দেহে ভগবৎপ্রীতির অপূর্ব ভাবপ্রবাহ ঘটতো। আশ্রমের পবিত্রতার সাথে উপযুক্ত শান্ত পরিবেশ তৈরি করাই ছিল তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টা। পূজার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি অতি মাত্রায় যত্ন নিতেন। তিনি সব সময়ে বলতেন ঃ "এঁকে কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিরূপে মনে করো না। তিনি এখানে সদা বর্তমান আছেন। তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করার চেষ্টা কর আর সেই মতো সেবা কর।"

পূজার এবং ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের নিয়ম ও পদ্ধতি শশী মহারাজ নির্ধারিত করে গেছেন এবং এজন্য উপযোগী মন্ত্রও রচনা করেছিলেন।

গুরু মহারাজের জীবনযাপন-ধারাকে তিনি সর্বদা অনুসরণ করতেন। কোন ওজর আপত্তি না করে সম্পূর্ণরূপে তা গ্রহণ করতেন। গুরু মহারাজ যা করতেন না তিনিও তা করেন নি। গুরু মহারাজকে প্রদত্ত না হলে তিনি কোন কিছুই গ্রহণ করতেন না। এমনকি ডাক্তারের নির্দেশে বিশেষ খাদ্য খেতে হলেও ঐ নিয়ম পালন করতেন।

শশী মহারাজের মতো সন্ন্যাসীর পক্ষে যদিও অদ্বৈতানুভূতি লাভ করা সহজ ও সম্ভব, তবু তিনি "চিনি হবার চেয়ে চিনি খেতেই" পছন্দ করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, অদ্বৈতানুভূতির পর যে ভক্তি এসে থাকে তা সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরাভক্তি। আত্মসমর্পণ যখন সম্পূর্ণ হয় তখন ভক্ত ও ভগবান এক হয়ে যান। আর সেটাই অবশেষে অদ্বৈতানুভূতিরূপে ফল প্রসব করে। শশী মহারাজ আত্মসমর্পণকে সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি রূপে গণ্য করতেন।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি যতখানি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন, শ্রীশ্রীমাকেও (শ্রীসারদাদেবী—শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মপত্নী) সর্বদা সেরূপ করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা উভয়েই ছিলেন অগ্নি আর দাহিকা শক্তির মতো অভিন্ন।" গুরুভাইদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও ভক্তি ছিল অপূর্ব। এছাড়া তাঁদের মধ্যেই যে শ্রীগুরুদেব অধিষ্ঠান করেন, তা তিনি বিশ্বাস করতেন।

শশী মহারাজকে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ স্নেহ করতেন এবং শ্রীগুরুর প্রতি অভিনব সেবার জন্যই শশীকে রামকৃষ্ণানন্দ নামে তিনিই অভিহিত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে শশী মহারাজ বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। স্থানীয় ভক্তদেরকে আশীর্বাদ করার জন্য তিনি শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম শিষ্যগণের সবাইকেই মাদ্রাজে আনিয়ে ছিলেন।

১৯১০ সালের মাঝামাঝি শশী মহারাজ দারুণ অসুখে পড়লেন। তাঁর বিশাল দেহ ভেঙে পড়ল। বারো বছরের তপশ্চর্যা ও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্বল্পতা গ্রহণ করে কঠোর জীবনযাপন এবং চোদ্দ বছর ধরে কঠিন পরিবেশ ও পরিস্থিতির এবং অভাবের মধ্যেও মাদ্রাজবাসীদের মধ্যে ভাবপ্রচার ও অবিরাম অক্লান্ত শ্রমের ফলে বহুমূত্র ও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলেন। সবিশেষ চিকিৎসার জন্যে তাঁকে কলকাতায় আনা হয় কিন্তু ফল কিছুই হলো না।

বিদায় বাণী

তাঁর শেষ বাণী ছিল—"আমার কাজ শেষ হয়েছে। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। কিন্তু যা হয়েছে তা কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণায় ও স্বামীজীর আদেশে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে আমি আমার দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছি, প্রভুর ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। যখন আমি তাঁর কথা বলি, তখন সব ব্যথা চলে যায়, দেহের কথা ভুলে যাই।"

আধ্যাত্মিক জগতে শ্রীরামকৃষ্ণই শেষ সাধক। জগতের সমস্ত রকম আধ্যাত্মিক সাধনার তিনিই চরম পরিণতি। তাঁর শিষ্যেরা এটির এক একটি দিকের বিকাশ করেছেন। শশী মহারাজও একটি দিক গ্রহণ করে সেই আদর্শে জীবনযাপন করেন।

তিনি ছিলেন প্রকৃত ও খুব উচ্চ ধরনের সন্ন্যাসী। তাঁর অনুভূতি গভীর ও সম্পূর্ণ এবং ঈশ্বর বিষয়ে তাঁর ধারণা সর্বব্যাপী ও উদার ছিল। বিভিন্ন দার্শনিক পথের যে সংযোগ সাধন তিনি করেছিলেন, তা শ্রীগুরুর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পান। তিনি অবিভক্তভাবে ও সর্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

অনিচ্ছা বা সাংসারিক কোন কিছুর পাওয়ার আশায় যে কৃচ্ছ্রসাধন, তার লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন শান্ত ও গম্ভীর, এছাড়া দিনরাত

সবসময় কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তায় ডুবে থাকতেন। আধ্যাত্মিকতার চরম সোপানে উঠলেও তিনি ছিলেন বালকের মতো সরল ও বিনীত। তাঁর মধ্যে ভক্তি গভীরভাবে গ্রথিত হয়েছিল। আত্ম-সমর্পণ ও বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ হয়েছিল বলেই বলতে সমর্থ হতেন, "আমি ভগবানের ভাবে পূর্ণ এবং অন্য কারুরও সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করি না।" তিনি সমস্ত মূর্তিকেই পূজা করতেন এবং রাস্তার পাশে প্রতিটি ছোট মন্দিরে ভক্তিভাবে প্রণাম করতেন। তিনি ছিলেন মৌলিক চিন্তার অধিকারী।

প্রেম ও পবিত্রতা তাঁর মধ্যে ঠিক ঠিক সুস্পষ্ট বিকশিত হয়েছিল। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করা। এটা যে কত গভীর ছিল তার ইতি করা যায় না। একমাত্র হনুমানের সঙ্গেই যথাযোগ্যভাবে তুলনা করা যেতে পারে। উচ্চ-নীচ, ধনী ও নির্ধনের মধ্যেকার পার্থক্য তাঁর মধ্যে মোটেই ছিল না। পবিত্র কর্তব্যের বেদিতে তিনি আত্মবলি দিয়েছিলেন, সে কর্তব্য হলো—সকল জীবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করা ও অন্তরের দেবতাকে প্রত্যক্ষ করতে সহায়তা করা। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যই তিনি এ জগতে এসেছিলেন, অননুকরণীয় ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণেরই সেবা করেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণেই প্রত্যাবর্তন করলেন।

অনুবাদক—শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়
উদ্বোধন, মাঘ—১৩৫৮, পৃঃ ১৩—১৯

[শ্রীসি. রামানুজাচারীয়ার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের প্রিয় 'রামানুজ'। স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করেছিলেন ও তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ মাদ্রাজে আসার পর তাঁর খুড়তুতো ভাই রামুর সঙ্গে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের যোগ্য সহকারী ও একনিষ্ঠ ভক্ত হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ স্টুডেন্টস্ হোম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় রামানুজ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মাত্র সাতজন অনাথ নিয়ে এই হোম আরম্ভ হয়েছিল। রামু ও রামানুজের দক্ষ পরিচালনায় হোম একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় এবং ৩০০ জন অনাথ বালকের সেবা করা হয়। রামানুজ ছিলেন এই কাজের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি কৃতী সঙ্গীতজ্ঞ ও অভিনেতা। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।]

স্মৃতিসুধা

কে. পদ্মনাভন থাম্পি

প্রায় ২০ বছর আগেকার কথা। তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সুপরিচিত গৃহী ভক্ত প্রয়াত কালীপদ ঘোষের ত্রিবান্দ্রমের বাড়িতে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। কালীবাবু ছিলেন ত্রিবাঙ্কুরের এক অতি পরিচিত মানুষ। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের প্রায় শেষদিকে কালীবাবু প্রথমবার ভ্রমণপিপাসুরূপে ত্রিবাঙ্কুরে এসেছিলেন এবং এক অনুকূল পরিবেশের সূচনা করেছিলেন। এর বেশ কিছু বছর পরে তিনি (কালীবাবু) জন ডিকিন্‌সন এন্ড কোং এর স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে ত্রিবান্দ্রমে আসেন। তখন ঐ কোম্পানি ত্রিবাঙ্কুরের দরবারের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্টেশনারী ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করবে বলে ঐ সময়ে আমরা তাঁর সঙ্গে (কালীবাবু) বহুবার মিলিত হয়েছিলাম। আমার মনে আছে একবার ত্রিবান্দ্রম সমুদ্রতটেও কথাবার্তা হয়েছিল। কথাবার্তায় প্রসঙ্গক্রমে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর বক্তৃতার বিষয় আলোচনা হয়। কালীবাবু আমাদের বলেছিলেন যে—"কেশববাবু এক হিন্দু ঋষির (যাঁর তুলনা হয় না) চরণতলে শিক্ষালাভ করেছিলেন তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য।" সেই সময় এই প্রথমবার আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনেছিলাম। তখনকার দিনে এ নাম ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। শ্রীঘোষ অল্পক্ষণের আলাপ পরিচয়ের পরিসরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে একেবারেই অপারগ ছিলেন। কলেজ জীবন থেকেই যেহেতু আমি ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন সম্পর্কে ও ব্রাহ্ম সাহিত্য সম্পর্কে সমধিক পরিচিত ছিলাম সেজন্য ব্রাহ্মনেতার জীবনগঠনের পরম পুরুষ প্রবর সম্বন্ধে জানতে বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলাম। কিন্তু আমার জানবার তৃষ্ণা বহু বছর পূরণ হয়নি। আমার দুর্ভাগ্য যে ১৮৯২ সালের ডিসেম্বরে আমি ত্রিবান্দ্রম থেকে দূরে চলে গিয়েছিলাম আর ঐ সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ এক অজ্ঞাত পরিচয় সন্ন্যাসিরূপে ত্রিবান্দ্রমে এসেছিলেন। এবং তিনি অধ্যাপক সুন্দররাম আইয়ারের বাড়িতে কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। সেখানে যাঁরাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের মনে প্রভূত ছাপ পড়েছিল। যখন ধর্ম মহাসভায় স্বামীজীর অভ্যর্থনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল অধ্যাপক সুন্দররাম আইয়ার

একেবারেই নিশ্চিত ছিলেন যে ঐ স্বামী বিবেকানন্দই সেই অপরিচিত সন্ন্যাসী যিনি তাঁর বাড়িতে কয়দিন বাস করেছিলেন। এর কিছুকাল পরে আমি শুনেছিলাম স্বামী নিরঞ্জনানন্দ নামে এক শিক্ষিত সন্ন্যাসী কন্যাকুমারীতে যাবার পথে ত্রিবান্দ্রমে গিয়েছিলেন এবং দক্ষিণ ত্রিবান্দ্রমের সুপরিচিত শৈলনিবাসে কয়েক দিন অতিবাহিত করেছিলেন। স্বামীজীর আমেরিকা হতে ভারত প্রত্যাবর্তনে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল এবং তার মাদ্রাজ বক্তৃতা ও রাজযোগ পাঠে আমার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তাঁর 'কলম্বো থেকে আলমোড়া' বক্তৃতা পাঠে আমার আধ্যাত্মিক পিপাসা আরও বৃদ্ধি পায় যা পূরণের জন্য একজন ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের দর্শনের আমার গভীর অভিলাষ জন্মে। এই আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই আরও প্রবল হয়। যখন স্থানীয় সংবাদপত্রে জানতে পারলাম যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ত্রিবান্দ্রমে আসছেন এবং বাবু কালীপদ ঘোষের অতিথিরূপে থাকবেন, তখন আমি গভীর আনন্দে অভিভূত হয়েছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকারের জন্য চিঠি লিখলাম এবং খুব দ্রুত উত্তর পেয়ে ত্রিবান্দ্রমে গেলাম। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে দেখা করলাম এক মধ্যাহ্নে। এক পার্কের পশ্চিম কোণে একটি ছোট্ট বাংলো বাড়ির মিলিত বাগান সংযোজিত ছিল কালীবাবুর বাসগৃহ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল করুণা ও ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি স্বামী বিবেকানন্দের কোন বই পড়েছি কি না। কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি আমাকে কৃপা করে আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশেষ উপদেশ দান করেছিলেন। ধর্মীয় বিষয় এবং তাঁর অনুশীলন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ ছিল এবং অন্তরে প্রবল সমবেদনার ভাব জাগ্রত হয়েছিল। এর ফলে কোন দুর্দশা কবলিত দৃশ্যে আমার মনে বেদনার ভাব উদিত হতো। রামকৃষ্ণানন্দজী শহরের এক ক্ষুদ্র গৃহে নিয়মিত 'গীতা'র ক্লাস নিতেন। কিন্তু আমি থাকতাম ত্রিবান্দ্রম থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে এবং বিশেষ অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে আসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর ক্লাসে যোগদান করা যায় নি। এক সপ্তাহ পরে এক সকালে রামকৃষ্ণানন্দজীর দর্শন পেলাম। তিনি ভাগবতের একটা অংশ পাঠ করে আমার কাছে তার অর্থ ব্যাখ্যা করলেন। এক বা দুই সপ্তাহ পরে বিশেষ কাজের প্রয়োজনে আমাকে ত্রিবান্দ্রম যেতে হয় এবং সেই সুযোগে আমি দুপুরে

রামকৃষ্ণানন্দজীকে দর্শন করি। আমাদের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছিল এবং আমি তাঁকে টাউন হল পর্যন্ত গাড়িতে পৌঁছে দিই। সেখানে তিনি "ভক্তি" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমার কাজের ব্যস্ততার জন্য আমি ঐ বক্তৃতা শুনতে পারিনি। পরের সপ্তাহে তিনি কন্যাকুমারীতে পুজো দেবার জন্য চলে যান। ফিরবার পথে তিনি আমার আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন। আমি তাঁর যথাযোগ্য আহারের আয়োজন করেছিলাম। তিনি এই কথা বেশ বলেছিলেন— "তুমি গুরু মহারাজকে অতিথি রূপে পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে।" রামকৃষ্ণানন্দজী সেই রান্না করা খাবার শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করলেন। তারপরে নিজে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। স্বামীজী ঘি নিলেন না যেহেতু তা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভোগ দেওয়া হয়নি। পরে আমিও ঐ প্রসাদ পেয়েছিলাম। তারপরেই তিনি গরুর গাড়িতে অন্যত্র চলে গেলেন। আমি ঐ স্থানকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করেছিলাম এবং পরের দিন ঐ স্থানে ধ্যানে বসলাম এবং আমার মনে এক গভীর প্রশান্তি অনুভব করলাম। আমাদের বাড়িতে অবস্থান করার সময় ধর্মীয় বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল। আমার বন্ধুদের মধ্যে যারা ধর্মীয় বিষয়ে উৎসাহী তারাও সেখানে উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে একজন শঙ্করাচার্য রচিত 'সৌন্দর্য লহরী'র ব্যাখ্যার জন্য রামকৃষ্ণানন্দজীকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি শ্লোকগুলিকে দেখে কোন পণ্ডিতের কাছে যেতে বললেন। রামকৃষ্ণানন্দজী ত্রিবান্দ্রমে এক মাস ছিলেন এবং 'গীতা'-র উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এছাড়াও শেষের বক্তৃতাটি দেওয়ানজীর শহরের নিবাস দুর্গের পদ্মবিলাস প্রাসাদে প্রদত্ত হয়েছিল এবং ঐ বক্তৃতায় দেওয়ান শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী রাও সভাপতিত্ব করেন। রামকৃষ্ণানন্দজীর ঐ সময়ে অবস্থান কালে বহু গণ্যমান্য ধর্মপিপাসু মানুষ তাঁকে দর্শন করেন ও পরিচিত হন এবং ধর্ম বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তাঁদের মধ্যে প্রৌঢ় জজ সাহেব শ্রীযুক্ত তেদাদ্রী সদর মুদালিয়র প্রায়ই আসতেন। রামকৃষ্ণানন্দজীর ত্রিবান্দ্রম ছেড়ে যাবার কথা জানতে পেরে আমি তাঁর যাত্রার কয়েক ঘণ্টা আগে প্রণাম জানাতে এসেছিলাম। আমি শ্রীঘোষের বাংলোয় প্রায় রাত আটটায় উপস্থিত হই এবং আমার সঙ্গে বহু কথাবার্তা হয়। মহারাজজী একটি স্থায়ী কেন্দ্র আরম্ভ করার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন এবং একজন সন্ন্যাসীকে প্রেরণের জন্য অঙ্গীকার করেন। রামকৃষ্ণানন্দজী মাদ্রাজে ফিরে যাবার কয়েক মাস পরে তিনি ব্যাঙ্গালোরে যান, ত্রিবান্দ্রমে কোন কেন্দ্র তখনও খোলা হয়নি। হয়তো ভেবেছিলেন অল্প সংখ্যক উৎসাহী মানুষের জন্য একজন সন্ন্যাসীকে প্রেরণ যুক্তিযুক্ত হবে না। তাঁর গীতা ক্লাসের ফলস্বরূপ

একটি ছোট বেদান্ত সমিতি ত্রিবান্দ্রমে কয়েকজন উৎসাহী বেদান্ত অনুরাগীর দ্বারা গঠিত হয়। এভাবেই ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অতিবাহিত হয়। এর পরেই ব্যাঙ্গালোর মঠের স্বামী নির্মলানন্দজী ত্রিবাঙ্কুরের মধ্যবর্তী এক হরিপাদ গ্রামে আসেন স্থানীয় বেদান্ত সমিতির অনুরোধে। তখন আমি সেখানেই ছিলাম। সে সময়ে স্বামী নির্মলানন্দজী কেন্দ্রের সূচনা করেন। সেইকাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে এবং বিস্তৃতি লাভ করেছে কেরালার সমুদ্রতটে ও দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে।

অনুবাদক—স্বামী সংসিদ্ধানন্দ

[*স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছিল—১৯২২ এর মে মাসে। 'বেদান্তকেশরী' পত্রিকায়, পৃঃ ১০৫-১০৭*]

[শ্রীকে. পদ্মনাভন থাম্পি (১৮৬৭-১৯৪০) ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের শিষ্য। ত্রিবাঙ্কুর ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। সরকারি উকিল এবং ত্রিবাঙ্কুররাজের পুলিশ কমিশনার ছিলেন। কেরালায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব প্রচারে অগ্রণীভূমিকা নিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাই ডাঃ কে. রমন থাম্পি। চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার পর স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের কাছে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন—নাম হয় স্বামী পরানন্দ।]

স্মৃতিকথা

পি. মনিক্কাস্বামী মুদালিয়র

(প্রথম পর্ব)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্পর্কে স্মৃতিকথা লেখার জন্য আমাকে বলা হয়েছে এবং তা আমি আনন্দের সাথে করব। আমি প্রায় পঁচিশ বছর আগে তাঁর সংস্পর্শে আসি যখন তিনি মাদ্রাজের চিন্তাদ্রিপেটে ধর্মীয় ক্লাস নিচ্ছিলেন। প্রথম এক দুই বছর তার বেদান্ত ব্যাখ্যার আমি ঘোরতর বিরোধী ছিলাম যদিও সেই সম্পর্কে আমার অল্পই জ্ঞান ছিল। তাঁকে প্রশ্ন করার সময় আমি এক প্রকার উদ্ধত ছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে অনেকবার বাদানুবাদ হয়েছিল, যদিও শেষে আমি পরাজিত হয়েছিলাম। তাঁর প্রতি আমার এরূপ আচরণ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি এবং একদিন তাঁর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ আলোচনায় তাঁর মুখনিঃসৃত উচ্ছ্বসিত ও তত্ত্বালোকপূর্ণ ব্যাখ্যা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে আমাকে হতবাক করেছিল। পরের দিন সন্ধ্যায় আমি মঠে ছুটে গিয়েছিলাম। তখন মঠ ছিল ক্যাসেল কার্নানে, তবে "আইস হাউস" নামে সুপরিচিত ছিল। আমার অভব্য আচরণ সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সমাদরের সাথে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন এবং এর ফলে আমি আমার আগের ব্যবহারের জন্য হৃদয়ে গভীর অনুতাপ অনুভব করলাম। ব্যথিত হৃদয়ে আমি তাঁর কাছে ব্যাখ্যা শুনতে লাগলাম। আগে যে সকল ব্যাখ্যা আমার কাছে তাঁর ক্লাসে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছিল, তাঁর ব্যাখ্যায় আমার অন্তর ভরে উঠলো। এবং পরবর্তী কালে আমি তাঁর একান্ত গুণগ্রাহী হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ গভীর হয়েছিল এবং আমি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলাম। তখন আমি আমার জীবন ও চিন্তাধারাকে সঠিক বুঝতে পেরেছিলাম এবং বন্ধুদের মন্তব্যে উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছিলাম—"তিনি কিরূপ সন্ন্যাসী? তিনি তো রাজপ্রাসাদে বাস করেন, গদির উপরে শয়ন করেন এবং উত্তম খাদ্য গ্রহণ করেন।"

মাদ্রাজের প্রথম দিকের দিনগুলিতে তিনি নিজেই ছিলেন নিজের ভৃত্য ও রাঁধুনি। তাঁর ক্লাসগুলি ছিল শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তৃত এবং যা তিনি প্রায় হেঁটেই যাতায়াত করতেন। এতে তাঁর অনেক সময় লাগতো। সপ্তাহের কোন

কোন দিনে তাঁকে দু-তিনটিরও বেশি ক্লাস নিতে হতো এবং অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে মঠে ফিরতেন। তখন আর রান্না করারও তাঁর ক্ষমতা থাকতো না। আমি জানি—এমন বহুদিন বেকারীর পাঁউরুটি তাঁর রাত্রের সামান্য আহার, তার কারণ, তাঁর তখন রাঁধবার শক্তি অথবা মঠে কোনই খাদ্যবস্তু থাকত না। তিনি তাঁর এই অসুবিধের কথা কাউকে বলতেন না এবং দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তাঁর এই দুরবস্থার কথাও জানত না। তাঁর অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী যাঁরা মঠে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন তাঁরাই তাঁর অসুবিধের কথা জানতে পেরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তা পাঠাতেন। তিনি যে কোন দানই সহজে গ্রহণ করতে চাইতেন না। বরং তিনি তাঁর ছাত্রদের বলতেন—"সাহায্য না করে নিজেরা আরামে থাক।" তাঁর অধিকাংশ ছাত্রই অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং তিনি চাইতেন না যে তাঁকে তাঁরা সাহায্য করুক। তিনি ছিলেন এইরকমই দয়ালু ও উদারমনা। যখন আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম কোথা থেকে তিনি দৈনন্দিন খরচা পান তখন দৃঢ়ভাবে ও শান্তস্বরে বলতেন—"ভগবান পাঠিয়ে দেন।" একদিন মঠে লুচি তৈরির জন্য এক ফোঁটাও ঘি ছিল না। তিনি বারান্দায় পায়চারী করছিলেন এবং জানতেন না যে কোথা থেকে আসবে। ঠিক এমন সময় তাঁর এক ছাত্র অত্যন্ত বিনীত ভাবে ও অস্ফুট স্বরে তাঁর সামর্থ অনুযায়ী মঠকে কিছু অনুদান দেবে জানাল। কারণ সে তার চাকরিতে সামান্য উন্নতি করতে পেরেছিল। তাঁর কাছে ছাত্রটি প্রার্থনা জানাল—কিভাবে তিনি মঠকে সাহায্য করতে পারেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাহায্য নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে কিন্তু ছাত্রটি বার বার অনুরোধ করাতে তিনি বললেন, "তুমি একপাত্র ঘি দাও।" পরবর্তী কালে তা প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে তিনি তা গ্রহণ করতেন। মঠের অভাব দূর হয়েছিল যখন মাদ্রাজের মানুষেরা তাঁর পরিচয় জানতে পেরেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তাঁর পাঠের ছাত্রদের মধ্যে প্রচারিত করার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এজন্য মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় অকুতোভয়ে বক্তৃতা দিতেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন ঈশ্বর ও দানবের উপাসনা একত্রে করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ কাম কাঞ্চন ত্যাগ করার পরই আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয়। আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিক ভোগস্পৃহা পরস্পর বিরোধী। গীতা এই ত্যাগের উপদেশ দেয়। এক কথায় তাঁর উপদেশ ছিল ত্যাগ, পবিত্র ও সরল হওয়ার। এই উপদেশ শহরের অনেককে উদ্বিগ্ন করেছিল। তাঁরা শঙ্কিত

ছিলেন যে তাঁদের যুবক ছাত্রেরা ত্যাগের পথ অবলম্বন করবে। ফলে তাদের সংসারে বিপর্যয় আসবে। সেজন্য তারা স্বামীজীকে (শশী মহারাজকে) তাঁর উপদেশের ধারাকে পরিবর্তন করার জন্য চাপ দিলেন। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন আবার কঠোর। এ ঘটনাকে উল্লেখ করে নিভৃতে তিনি ব্যক্তিগত আলোচনায় বলতেন ঃ "আমি আমার গুরুর কাছে যা শিখেছি তা ব্যতীত অন্য কিছু কি শিক্ষা দেব? নিশ্চয়ই আমি তা করব না। আমি কাউকে আমল দিই না, তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যা খুশি করতে পারেন। আজ যদি আমি এই 'ক্যাসেল' থেকে বহিষ্কৃত হই তখন আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমার কোন এক ছাত্রের দরিদ্র কুটিরে থাকব। আমি সন্ন্যাসী এবং জানি না আমার পরবর্তী আহার কোথা থেকে আসবে।"

তাঁর গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অনন্য এবং অভাবনীয়। তাঁর একান্ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর গুরুর মৃত্যু হয়নি। তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ছবি সব সময় থাকত। অনেক দিন তাঁকে সাহায্য করার জন্য মঠে যখন কোন ব্রহ্মচারী ছিল না, তখন তিনি মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান পেতেন। তিনি তাঁর গুরুর ছবি সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং তিনি তাঁর উপস্থিতি এতই গভীর ভাবে অনুভব করতেন যে তাঁকে (গুরুকে) খাদ্য নিবেদন না করলে বা তাঁর অন্যান্য আনুষঙ্গিক সেবাদি না করলে অপরাধ বলে মনে করতেন। একদিন আমি মঠে সকাল ১০-১১টা নাগাদ উপস্থিত হয়েছিলাম এবং দুপুর দুটো পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিলাম। যখন আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম তখন তিনি বললেন, "অপেক্ষা কর। গুরু মহারাজ জলযোগ করছেন। আমি তোমাকে একটু প্রসাদ দেবো।" এরূপ বলে তিনি কিছুক্ষণ বসলেন। যেন গুরু মহারাজের জলযোগ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন। তারপর তিনি পুজোর ঘরে গিয়ে কিছু ফল ও মিষ্টি নিয়ে ফিরে এলেন এবং তা আমার হাতে অত্যন্ত স্নেহভরে প্রসাদ রূপে দিলেন।

এই অদ্ভুত আচরণ আমার বিসদৃশ মনে হয়েছিল। তখন আমার মন তাঁর বিষয়ে তাচ্ছিল্যভাবে পূর্ণ হলো। একজন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত রূপে ধারণা করে তাঁর ছবি সর্বত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ানোকে আমি মানসিক বিকার বলে মনে করেছিলাম। এরূপে আমাদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ তৈরি হয়। যদিও শেষে তা আমি বুঝতে পারি। আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম তাঁর গুরুর প্রতি গভীর ও সুদৃঢ় ভক্তি—বিশ্বাস দেখে। তিনি বলেছিলেন ঃ ভক্তের চোখ এবং মন

বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয় এবং তা যদি অন্যেরা বুঝতে না পারে তা ভক্তের দোষ নয়।

তিনি এমনকি এও বলেছিলেন যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি নিতান্তই মূক, প্রাণহীন মৃত বস্তু নয়। বরং তাঁরা জীবন্ত দেবতা যাঁদের সঙ্গে কথা বলা যায়। তাঁকে মনে হতো তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তর থেকে কথা বলছেন যা আমার বোধগম্যের অতীত। আমার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে তিনি যেরূপ বলেন তা সত্য। যখনই তিনি কোন মন্দিরের গোপুরম দেখতেন তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতেন। তাঁর ভক্তি ছিল অপরিমেয়।

যদিও তিনি গোঁড়া ছিলেন তবুও তাঁর ছিল দয়ালু অন্তর। একবার তিনি এক ছাত্রের আমন্ত্রণে রাত্রের আহারের জন্য সৈদাপেট গিয়েছিলেন। স্বামী পরমানন্দ ও আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সন্ধ্যাকালীন আহারের পর আমরা সৈদাপেটের অদূরে অবস্থিত সেন্ট থমাস মাউন্টে গিয়েছিলাম। ঐ চূড়ায় আমরা গিয়ে সেখানে একটি চার্চ দেখতে পেয়েছিলাম। রামকৃষ্ণানন্দজীর চার্চ দেখার ইচ্ছার কথা জানতে পেরে ঐ চার্চের প্রধান যাজক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আমরা সকলেই চার্চে প্রবেশ করলাম এবং আমরা সবাই অবাক হয়েছিলাম যখন দেখলাম রামকৃষ্ণানন্দজী সোজা বেদির কাছে গিয়ে খ্রিস্টীয় প্রথায় নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। এই ঘটনার পূর্বে রামকৃষ্ণানন্দজীর সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল যে তিনি অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচার সম্পর্কে তাঁর একেবারেই সহানুভূতি ছিল না। রামকৃষ্ণানন্দজী বলতেন—"ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য ও মনু যা করেছেন এবং লিখেছেন তা সব সঠিক ও সত্য। কারণ তাঁরা এমন মানুষ ছিলেন যাঁদের মধ্যে সামান্য স্বার্থপরতাও ছিল না।" তিনি ছিলেন সকল হিন্দুরীতির একনিষ্ঠ সমর্থক—এমনকি তথাকথিত কিছু কিছু গোঁড়ামিরও। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল শাস্ত্র এবং ঋষিদের প্রতি আমাদের দুর্বল বিশ্বাসকেও দৃঢ়তা দান ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার। এ হেন রামকৃষ্ণানন্দজীকে খ্রিস্টীয় রীতিতে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে দেখে আমি এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। হয়তো এর সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর একটি প্রিয় উক্তিতে—"মধুমক্ষীর মতো ব্যবহার কর। সাধারণ মাছির মতো নয়।"

মাদ্রাজে লোকেদের ভুল অথবা ঠিক একটি ধারণা ছিল যে প্রকৃত সন্ন্যাসীর কোন নিজস্ব সম্পত্তি থাকবে না, তাঁরা ধ্যানের জন্য সময় ব্যয় করবে। সামান্য

অথবা একেবারেই তিনি জাগতিক বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন না এবং নির্জনে থাকবেন। ক্ষুধা ও জলপিপাসার জন্য লোকালয়ে আসবেন। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জীবন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি মনে করতেন কর্মই উপাসনা এবং তাঁর গুরুর উপদেশ ধনী ও দরিদ্র সকল গৃহে সমভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গীকৃত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে তাঁর মুক্তি সকল মানবজাতির মুক্তির মধ্যে সন্নিহিত এবং এজন্য তিনি শাস্ত্রবিমুখ মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করতেন। এই বিষয়ে তিনি নিজে সকল শাস্ত্রীয় বিধি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। যেমন উপবাস করা, জপ ধ্যান করা, গ্রহণে সমুদ্রে স্নানাদি করা প্রভৃতি রীতি মানতেন। উচ্চ মূল্যবোধ বিমুখ মানুষদের এ রকম রীতির মূল্য বোঝাতে তিনি এসব করতেন। তাঁদেরকে জানাতে সচেষ্ট থাকা ছিল এগুলির প্রকৃত অর্থ।

হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর শাস্ত্র জ্ঞান ছিল গভীর। যখন তিনি শঙ্করাচার্যের দর্শন ব্যাখ্যা করতেন তখন তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের এমন এক উন্নত অবস্থায় নিয়ে যেতেন যাতে কিনা তারা পূর্ণতার মধ্যে একত্ব অনুভব করতেন। এভাবে রামকৃষ্ণানন্দজীর মধ্যে এই দুই বিপরীত ভাব লক্ষ্য করা যেত।

তিনি কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন এবং বাহ্যিক শ্রদ্ধা প্রকাশের প্রতি তাঁর কোন মনোযোগ ছিল না। তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সেই সব অভ্যাসের সংশোধন করতেন যেগুলি তাঁদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। একদিন তাঁর ক্লাসে এক শিক্ষার্থীকে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন—"এইরকম ভাবে বসে থেকো না, এটি একটি বিষণ্ণতার চিহ্ন।" অন্য একদিন তাঁর ক্লাসে এক শিক্ষার্থীকে তিনি বেঞ্চে বসে থাকা অবস্থায় পা নাড়াতে দেখলেন। রামকৃষ্ণানন্দ তাঁকে বললেন—"পা নাড়ানো থামাও। এটি কোন ভালো ও উপকারী অভ্যেস নয়।" যখন কোন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে জল পান করতেন, তিনি বলতেন—"বসে জল খাও"। তিনি শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁদের অভ্যাসকে সঠিক পথে চালিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

মাদ্রাজে প্রকৃত ভক্তি প্রায় ছিলই না। খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বৈভব মানুষকে করে তুলেছিল হিন্দুধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী,

সন্দেহপরায়ণ ও ঘৃণাযুক্ত এবং সেজন্য রামকৃষ্ণানন্দজীর কাজ ছিল বড়ই কষ্টকর ও খুবই অসুবিধাপূর্ণ। এই অঞ্চলের মানুষরা যদিও হৃদয়হীন, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধর। তিনি যখনই সুযোগ পেতেন তখনই বৈষ্ণব ও শৈব বা কেঙ্গালাই এবং বদগলাই এর মধ্যে বিরোধ প্রার্থনার দ্বারা দূর করার চেষ্টা করতেন এবং ধর্মের শাশ্বত পবিত্রতা ও মহিমার প্রচার করতেন। তিনি সর্বদাই অন্যকে বলতেন যে মানুষের তথা সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্মের সার বস্তুকে জানা এবং ধর্মের অসার ভাগ ত্যাগ করে সময়োপযোগী নিজেদের সবকিছুতে মানিয়ে নেওয়া।

একাজ ছিল সুকঠিন শিলাখণ্ডের মতো। তাঁর নিরন্তর পরিশ্রম একেবারে বিফলে যায় নি। তিনি যে মঙ্গলের বীজ রোপণ করেছিলেন তার সুফল ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল।

(বেদান্ত কেশরী, জুলাই ১৯২২, পৃঃ ৯৭-১০২)

দ্বিতীয় পর্ব

১৮৯৭ খ্রিঃ শুনলাম যে চিন্তাদ্রিপেটে একজন ইংরেজি জানা স্বামীজী ধর্মীয় ক্লাস নিচ্ছেন। আমি জেনেছিলাম যে স্বামীজী পাঠের শেষে শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এ থেকে তাঁর পাণ্ডিত্য ও ধর্মীয় জ্ঞানের প্রকাশ পায়। আমি স্বামীজীর ক্লাস সম্পর্কে উৎসাহিত হলাম এবং ক্রমেই তাঁর মাধুর্য, প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিকতার গুণগ্রাহী হলাম।

আমি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উচ্চ আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে বলবার আগে তাঁর সম্পর্কে ধারণা দেবার একটি চেষ্টা করব। শশী মহারাজ ছিলেন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে তাঁর বয়সের তুলনায় কমবয়সী বলে মনে হতো। তাঁকে মনে হতো যেন তিনি পঁচিশ বছরের যুবক। কিন্তু তাঁর প্রকৃত বয়স চৌত্রিশ। তাঁর হাস্যময় ও কোমল মুখমণ্ডল সকলের মন জয় করে নিত। তাঁর মুখখানি ছিল লম্বাটে ও গোলাকার, কিন্তু চোয়ালটি ছিল দৃঢ়তাপূর্ণ। তাঁর ঠোঁট দুটি ছিল পুরু। চোখ দুটির আকার বৃহৎ নয়, কিন্তু স্নিগ্ধ ও বুদ্ধিমত্তায় ভরপুর। তাঁর বক্ষ বৃহৎ ও উদর ছিল স্থূলকায়। তাঁর হাত-পা সুগঠিত এবং তাঁর চলন রাজকীয়। যখন তিনি ক্লাসে যেতেন একটি লম্বা কোট হাঁটু অব্দি পরিধানে থাকত। আর মাথায় থাকত একটি পাগড়ি, যার একটি খোলা প্রান্ত কাঁধের

উপরে এসে লুটিয়ে পড়ত। আমি কখনো তাঁকে জুতো পরতে বা ছড়ি হাতে দেখিনি। তার অবয়ব ছিল মনোমুগ্ধকর।

শশী মহারাজ ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত এবং তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী ছিল অনবদ্য। তিনি জানতেন তাঁর শ্রোতারা ধর্মীয় বিষয়ে নবীন। তাই তিনি সযত্নে শাস্ত্রীয় বিশেষ শব্দগুলি বলতেন না। তিনি খুব সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখতেন, যাতে আনকোরা শ্রোতারা সহজেই বুঝতে পারে। আমার মনে পড়ে রামকৃষ্ণানন্দ বহু ক্লাসে গীতার শ্লোক "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়" ব্যাখ্যা করেছিলেন। সামান্য মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে এই শ্লোকটির অর্থ পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। তাই তিনি ক্লাসে এটির ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর ব্যাখ্যায় সামগ্রিক রূপ প্রস্ফুটিত হতো। প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি লেখক বা ভাষ্যকারের মতের ভিন্ন মত উপস্থাপন করতে পিছপা হতেন না। আমার মনে পড়ে যখন তিনি ক্লাসে পঞ্চদশী ব্যাখ্যা করছিলেন তখন তিনি কয়েকটি কথার সমালোচনা করেন এবং ফলস্বরূপ দুজন শ্রোতা (শিক্ষার্থী) পাঠে আসাই বন্ধ করে দিলেন।

শশী মহারাজ শুধুমাত্র ধর্মের সারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন এবং ব্যাখ্যার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদার কথা বলতেন না। তিনি এরূপ করতেন পাছে আরেকটি নূতন মতবাদের সৃষ্টি না হয়। রামকৃষ্ণানন্দ সুযোগ পেলে হিন্দু ধর্মের সুউচ্চ গরিমার কথা তুলে ধরতেন। তিনি ক্লাসে প্রায়ই জ্ঞান ও ভক্তির উপর জোর দিতেন সেই সঙ্গে বৈরাগ্য বা ত্যাগের কথা বলতেন। ফলস্বরূপ তাঁর শ্রোতারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন যে পরিবার বা গৃহ ত্যাগ করে ধর্মীয় জীবন যাপন একান্ত প্রয়োজনীয় কি না। এ মনে হতে পারে যে যুবকদের কাছে তাঁর ত্যাগের শিক্ষা তাঁকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল কিনা। আমি একদিন মঠে রামকৃষ্ণানন্দজীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আমি তাঁকে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বলতে শুনলাম—"আমি কি হোমরা-চোমরাদের বিশেষ ধার ধারি? আমি একজন সন্ন্যাসী এবং আমার যে কোন একজন ছাত্রের প্রদত্ত ভিক্ষান্নে বেঁচে থাকতে পারি। আমি আমার গুরু মহারাজের কাছে যা শিখেছি তাই শিক্ষা দেব, নাকি, এই হোমড়া-চোমড়াদের পছন্দ মতো শিক্ষা দেব?" আমি তাঁকে তখন সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারিনি। পরে আমি জেনেছিলাম যে কয়েকজন হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তি রামকৃষ্ণানন্দকে হুমকি দিয়েছিলেন তাঁকে অর্থ সাহায্য বন্ধ করার যদি তিনি যুবকদের ত্যাগের শিক্ষা দেওয়া বন্ধ না করেন। কারণ যুবকরাই ছিল তাঁদের পরিবারের আশা ভরসার স্থল।

মাদ্রাজের সাধারণ জনগণ সম্ভবত চেয়েছিলেন যে তিনি যোগ বা অন্যান্য সাধারণ সাধনার শিক্ষা দিন যা অনুসরণ করলে সাংসারিক জীবন যাপনের কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু তিনি বলতেন—"ঈশ্বর ও দানবের সাধনা একত্রে সম্ভব নয়"। ফলে মাদ্রাজের সাধারণ মানুষ রামকৃষ্ণানন্দজীর ক্লাসে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তাঁর ক্লাসের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশ কমতির দিকে ছিল। যখনই কোন শিক্ষার্থী কিছু ব্যবহারিক প্রণালী জানতে চাইত, তিনি বলতেন, "পরের বারে"। কিন্তু সেই পরের বার কখনই আসত না। রামকৃষ্ণানন্দজী কি জানতেন না যে আধ্যাত্মিক বীজ অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য প্রয়োজনীয় মৃত্তিকা তখনও তৈরি হয় নি?

যখন কোমলেশ্বেরণপেটের ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল তখন আমরা তিনজন তাঁকে কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাদানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলাম। আমরা তাঁর নির্ধারিত নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হলাম যখন তিনি হোম করলেন এবং হোমাগ্নির সামনে আমাদের দিয়ে কয়েকটি শপথ করিয়ে নিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের কোন মন্ত্র দেন নি—এমনকি যাঁরা তাঁর খুব নির্ভরযোগ্য ও ভক্ত ছিল। যেমন প্রয়াত রাও সাহেব, রামস্বামী আয়েঙ্গার ও তাঁর খুড়তুতো ভাই রায় বাহাদুর রামানুজাচারিয়ার, যিনি কিনা মিশনের মাদ্রাজ শাখার একনিষ্ঠ সম্পাদক ছিলেন, তাঁদেরও তিনি মন্ত্রদীক্ষা দেননি। আপাতভাবে রামকৃষ্ণানন্দজী কখনও আধ্যাত্মিক গুরুর আসন গ্রহণ করেন নি অথবা তিনি হয়তো মনে করেছিলেন যে এজন্য ক্ষেত্র তখনও প্রস্তুত হয় নি।

ক্লাসে যাবার সময় রামকৃষ্ণানন্দকে যে সব বাধা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হতো সে সম্পর্কে কিছু কথা বলব। শশী মহারাজের সময় এই অঞ্চলে কোনও বাস বা ট্রাম ছিল না। তখন এক ধরনের অদ্ভুতাকারের ঝটকা ছিল যা আজকের মতো নয়। এটা একরকম ছোট বাক্সের মতো, যার মধ্যে তিনজনকে ঠাসাঠাসি করে বসতে হতো। একজন বসত সামনের দরজার দিকে আর দুজন ঠিক চালকের সিটের পেছনদিকে। ঝটকার সামনের দরজা ছিল অত্যন্ত ছোট্ট এবং বাক্সটি এমনভাবে একদিকে ঝুঁকে থাকতো যাতে যাত্রীদের সদা-সতর্ক থাকতে হতো যাতে অপরের সাথে ধাক্কাধাক্কি না লাগে। যখন শশী মহারাজ তাঁর স্থূলকায় দেহকে কাত করে ও মাথা নিচু করে কোনরকমে ঝটকার মধ্যে বসতেন—সে এক মজার দৃশ্য। আইস হাউসের সামনে ঝটকা পাওয়া যেত না এবং সর্বদা তাঁকে ঝটকা স্ট্যান্ড পর্যন্ত হেঁটে যেতে হতো, যা ছিল একমাইল

দূরে ট্রিপলিকান বাজারে। আবার কোন সময় এজন্য পয়সাও থাকতো না। সেজন্য তাঁকে মাউন্ট রোড ধরে পদব্রজেই চিন্তাদ্রিপেট যেতে হতো। সে সময়ে মাউন্ট রোড ছিল অত্যন্ত নিচু জমি। সে কারণে প্রায়ই তা জলে ডুবে থাকত। সেজন্য রামকৃষ্ণানন্দকে হাঁটু জল এবং সময়ে সময়ে কোমর জল পেরিয়ে ক্লাস নিতে যেতে হতো। কিন্তু তিনি জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সর্বদা রক্ষা করছেন। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত শরণাগত। তাই দেখা যেত একজন হরিজন ঝটকাওয়ালা রামকৃষ্ণানন্দকে দেখতে পেলেই বিনা পয়সায় ক্লাসে নিয়ে যেত এবং আবার মঠে পৌঁছে দিত।

রামকৃষ্ণানন্দ যখন ক্লাস থেকে ফিরতেন তখন তিনি ভীষণ ক্লান্ত থাকতেন। নিজের রান্না করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। গোড়ার দিকে মঠে কেউ ছিল না বা তাঁকে সাহায্য করেন এমন কেউ ছিল না। তিনি নিজেই ছিলেন রাঁধুনি ও ভৃত্য, আবার তিনি নিজেই পূজারি এবং প্রচারক। কখনও সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর মঠে ফিরে গিয়ে দেখেন যে রুটিতে মাখানোর জন্য এক ফোঁটা ঘিও নেই। এমনকি এমনদিনও গেছে ক্লাসের শেষে তাঁর কোন ছাত্রকে একটু পাঁউরুটি কিনে দিতে বলতেন রাত্রের আহারের জন্য। এককথায় তাঁকে বহু কষ্ট ও অসুবিধের মধ্যে চলতে হতো। কিন্তু এ সব অবস্থাই তিনি অকল্পনীয় ধৈর্য সহকারে সহ্য করতেন। তথায় তাঁর মনে ছিল অসীম প্রশান্তি। অবস্থা এমনই ছিল যে যদি তিনি মঠটিকে মাদ্রাজের অন্য কোন জায়গায় নিয়ে যেতেন, তাহলে কেউ তাঁকে দোষ দিতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন এক মহান কর্মযোগী এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর গুরু সকল বাধা দূর করে দেবেন এবং তাই তিনি তাঁর নেতা স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত কর্তব্য পালনে একনিষ্ঠ ছিলেন। হ্যাঁ, একদিন সব বাধা, সর্ব অসুবিধে দূরীভূত হয়েছিল। তাঁর কয়েকজন ছাত্র এগিয়ে এলেন আর্থিক সাহায্য নিয়ে। একজন শিক্ষার্থী তাঁকে চক্ষু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর জন্য চশমা করে দিলেন।

তাঁকে সাহায্য করার জন্য মঠ থেকে একজন ব্রহ্মচারী প্রেরিত হলো। তারপরে এলেন রামু এবং রামানুজ। তাঁরা সব দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন। সেই থেকে রামকৃষ্ণানন্দের উদ্বেগ দূর হলো। আমার এসব ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণানন্দের অনুপম সেবা ও কঠোর পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে তুলে ধরা। শশী মহারাজ ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি সকল কিছুই ত্যাগ করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর প্রিয়তম নেতা বিবেকানন্দের অর্পিত কাজগুলি নিরলস ভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

শশী মহারাজ প্রায় ছয় বছর আইস হাউসে রইলেন। কিন্তু কতদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব ঘর ছাড়া বাস করতে পারেন? কোন্ডিয়াচেট্টি তাঁর এক ছাত্র মায়লাপুরে মঠ তৈরির জন্য একখণ্ড জমি দান করতে স্বীকৃত হলেন। এখন যেখানে মঠের বিল্ববৃক্ষটি আছে এটিই ছিল সেই জমি। জনসাধারণের দানে এখানে ছোট ঘর তৈরি হলো। শশী মহারাজ 'আইস হাউস' থেকে ঐ নতুন ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিস্থাপন করলেন। নতুন মঠ জীবন আরম্ভ হলো। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য একটি নতুন বাড়ি করতে পেরে তিনি খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। এর প্রতিচ্ছবি তাঁর মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হলো এবং ক্রমেই তাঁর কাজের মধ্যে দিয়েও সেভাবটি প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

অত্যন্ত গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি আমার উপর রামকৃষ্ণানন্দের আশীর্বাদ। বিশেষত সাধুসেবা কিভাবে করতে হয় তা আমাকে শিখিয়েছিলেন এবং আমি কখনও তা ভুলতে পারব না। আমি যখন 'আইস হাউসে' তাঁকে দেখতে যেতাম, আমি খুব সাধারণভাবে হাত জোড় করে বলতাম 'নমস্কার'। তিনি প্রত্যুত্তরে বলতেন—'নারায়ণ'। হয়তো তিনি আমার সম্বোধন করার প্রক্রিয়াকে লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন তাঁর সঙ্গে যখন বসে কথা বলছিলাম, তিনি বললেন ঃ "তুমি কি আমার পা ধুয়ে দেবে?" আমি তা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে করলাম এবং খুবই আনন্দ পেলাম। আমি বুঝলাম সাধুসেবা কিভাবে করতে হয় তা তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন। অন্য একসময়ে রামকৃষ্ণানন্দকে বলতে শুনলাম, "শুশ্রূষা" শব্দটি তাঁর সেবককে বোঝাচ্ছেন। সেবকটি তখন তাঁকে পাখার হাওয়া করছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন অভ্যাস সম্পর্কিত শিক্ষা দিতেন। তাই তাঁর জীবনে এইটি দৃষ্টান্তরূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল যে নিয়মের অন্তরের ভাবটি শুধুমাত্র পালনীয়।

রামকৃষ্ণানন্দ কোন দর্শনার্থীকে মঠ থেকে প্রসাদ না পেয়ে যেতে দিতেন না। আমি প্রায়ই যে সময়ে মঠে যেতাম—দেখতাম রামকৃষ্ণানন্দ তখন কি করছেন। একদিন আমি তাঁকে দুপুর বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত কাজ করতে দেখলাম। আমি যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম—তখন তিনি বললেন ঃ "অপেক্ষা কর, শ্রীগুরুমহারাজ বৈকালিক আহার করছেন। আমি তোমাকে একটু প্রসাদ দেব।"

এই ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং আমি প্রসাদের মহিমা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। প্রসাদ সম্পর্কে আমি তাঁর

মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম, কিন্তু তিনি স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টান্তের কথা বললেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রথমে প্রসাদের মহিমাতে কোন বিশ্বাসই ছিল না। এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কিছু প্রসাদ রূপে দিলে তিনি গ্রহণ করতেন না। জগন্নাথের আটকে প্রসাদের এক কণা কলার মধ্যে মিশিয়ে বিবেকানন্দকে দিতেন। শশী মহারাজ বলতেন প্রসাদের মহিমা তিনি এভাবে বুঝেছিলেন। সেই থেকে প্রসাদের প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস।

আমি কখনও কখনও শুনেছি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি কোন সন্ন্যাসী শিষ্য করেন নি। কিন্তু কতিপয় ভাগ্যবান যাঁরা শশী মহারাজের পবিত্র পরশ লাভ করেছিলেন, তাঁরা আমার মতোই গৃহী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আমার মতোই নীরবে রামকৃষ্ণানন্দের ভাবাদর্শ অনুযায়ী সারা জীবন কাজ করে গেছেন।

আমার কোন কোন বন্ধু যাঁরা শশী মহারাজকে মঠে দর্শন করেছিলেন তারা মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি ত্যাগী নন বরং একজন ভোগী। কারণ তিনি তার ঘরে চেয়ার টেবিল ও খাট ব্যবহার করতেন। বন্ধুরা আমাকে অনুরোধ করেছিল তাঁকে জিজ্ঞাসা করার জন্য যে তিনি কিরূপ সাধনা করেন। যখন আমি এই প্রশ্নটি করেছিলাম তখন তিনি উত্তর দিলেন ঃ "বলে দাও আমার গুরু আমার জন্য সব সাধনাই করেছেন।" কি দ্রুত ও বলিষ্ঠ উত্তরই না ছিল!

শশী মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। কিন্তু ক্ষমা প্রদর্শন করতে অপারগ ছিলেন না। তিনি সর্বদাই ক্ষমা করতেন যদি কারুর কল্যাণ হয়। আমি একজন বাঙালি যুবকের ঘটনা জানি যে কিনা কোনক্রমে ভ্রাম্যমান বৈরাগীদের খপ্পরে পড়েছিল এবং কোন ভাবেই বেরিয়ে আসতে পারছিল না। যখন এই বৈরাগীর দল ট্রিপলিকানে এসেছিলেন সেই বাঙালি যুবকটি শশী মহারাজের কথা জানতে পেরে ঐ দল ত্যাগ করে এসে শশী মহারাজের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল যোগেন। শশী মহারাজের হৃদয় করুণায় বিগলিত হয় এবং তাকে মঠে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু হায়! অল্প কিছুদিন পরেই যোগেন শশী মহারাজের অনুমতি না নিয়েই মঠ ত্যাগ করল। সে কিছুকাল পরেই আবার মঠে ফিরে এল এবং কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হলো। শশী মহারাজ তাকে ক্ষমা করলেন এবং মঠে থাকার অনুমতি দিলেন। পরবর্তী কালে যোগেন সাধুরূপে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘভুক্ত হলেন।

শশী মহারাজের সুপরিচিত উক্তিগুলি (বাণী) নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(১) মানুষ সাড়ে তিন হাতের একটি দেহ নয়।

(২) মন হলো চৈতন্য মিশ্রিত জড় পদার্থ।

(৩) সুখ ও দুঃখ পরস্পর বিরোধী কথা।

(৪) কালের বিভাজনে বর্তমান, ভূত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে বর্তমান হলো পরব্রহ্ম।

(৫) দানব ও ভগবানের পূজা একত্রে সম্ভবপর নয়।

(৬) প্রকৃত ভক্ত ভগবান অপেক্ষা বড়। কারণ সে দাতা গ্রহীতা নয়।

(৭) জ্ঞানী জলপূর্ণ প্রস্রবণের মতো; কিন্তু ভক্ত হলো উপছে পড়া জল-প্রস্রবণ।

(৮) মায়া মঞ্চে উপস্থিত সজ্জিত সুন্দরীর মতো। যে মুহূর্তে তাকে মায়া বলে জানতে পারা যায়, সে মুহূর্তে সে তার মায়াবী শক্তি ত্যাগ করে।

(৯) জ্ঞানী চিনি হতে চায়, কিন্তু ভক্ত চিনির আস্বাদ করতে চায়।

(১০) জলে নিমজ্জিত ব্যক্তি তীরের কিনারা দেখতে পায় না, কিন্তু যার মাথা জলের উপরে থাকে সে দেখতে পায়। সেইরকম মায়ায় আবদ্ধ মানুষ বাইরের বস্তুকে জানতে পারে না।

(১১) মনের প্রকৃত সত্তা হলো মূঢ় এবং অচেতন অর্থাৎ জড় পদার্থ।

(১২) বর্তমান জন্ম পূর্ব জন্মের সংস্কার। তুমি যদি স্বীকার ও বিশ্বাস কর তোমার অস্তিত্বের কথা তবে সকল কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার তোমাকে করতেই হবে।

(১৩) বাসনাই হলো দেহ। বাসনাত্যাগের বাসনাই অহানিকর। সুখ ও দুঃখ একত্রে জন্মায়।

(১৪) তুমি নিজের উপর বেশি আস্থা রেখো না যে, তুমি স্ত্রী-সংসর্গে কাম জয় করতে পারবে।

(১৫) তুমি জগতে সকল কিছু ঠিক করার কে? ঈশ্বর কি জানেন না কখন এবং কিভাবে তা করতে হবে?

(১৬) মানুষ হলো সৎ ও চৈতন্যের পরম রূপ, তুমি হলে প্রথম এবং অন্যেরা তোমাকে অনুসরণ করবে।

(১৭) চোখের ক্রটি দূর করার পরিবর্তে নিজের চশমার রঙ রাঙিয়ে নাও। জগৎকে সবুজ রঙে রাঙাবার চেষ্টা করোনা। তাই নিজের মনকে ঠিক করো, জগৎকে ঠিক করার প্রচেষ্টা করো না। ধর্ম কোন গির্জা, মন্দির বা মসজিদে নেই, আছে তোমার মনে। ঈশ্বর সান্নিধ্যে মায়া সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস হয়, ঈশ্বরের দ্বারা নয়। যেমন দেহে চুল গজায় মানুষের ইচ্ছা অনুসারে নয় কিন্তু তার উপস্থিতিতে।

(১৮) স্মৃতি হলো আমাদের সদাই পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং যখন আমরা বলি ভালো ঘুমিয়েছি, এটি একটি ভূতপূর্ব ঘটনা। তাই এটি আমাদের অভিজ্ঞতার ফল। গভীর নিদ্রায় মন কার্যকরী থাকে। কিন্তু চিন্তার তুলনামূলক বিচারে যুক্ত থাকে না, যেমনটি জাগ্রত অবস্থায় থাকে। মধুমক্ষিকার মতো ব্যবহার কর, সাধারণ মাছির মতো নয়। ধনীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান কর, কিন্তু তাঁর অর্থ বাহুল্যের জন্য নয়। বরং তার পুণ্য বা শুভকর্মের জন্য—যার ফলে সে ধনবান। নগ্নরূপে আমরা এসেছি নগ্নরূপে আমাদের যেতে হবে।

শশী মহারাজ তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত করেছিলেন দক্ষিণ ভারতের মানুষদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যা ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান। তিনি কাজ করেছিলেন অতি নিঃস্বার্থভাবে ও কঠোর পরিশ্রম করে। তাঁর দেহের প্রয়োজনের জন্য যা কিছু আসত, তাতেই তিনি ছিলেন পরিতৃপ্ত। আগামী কালের চিন্তা করতেন না। কার্যে তিনি ছিলেন অবিচল, নির্ভয়ে তা তিনি করেছিলেন। প্রায় চোদ্দ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি ক্লাস নিয়েছিলেন, বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ব্যাঙ্গালোর ও অন্যান্য স্থানে তিনি মঠ স্থাপনা করেছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন চাষের অযোগ্য পাথুরে মাটি। সেই পাথুরে মাটিকে উর্বর জমিতে রূপান্তরিত করেছিলেন যাতে পরবর্তী প্রজন্ম বীজ বপন করতে পারে। নিজের দৈহিক প্রয়োজনকে অবহেলা করা এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য তাঁর দেহে কঠিন পীড়া দেখা দেয়। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে ঘোষণা করেন এ এক দুরারোগ্য ব্যাধি। তাঁর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি স্থান পরিবর্তন চান নি, যতদিন না বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার্থে অন্যত্র যাওয়ার জন্য তাঁকে বলেন। প্রকৃত কর্মযোগিরূপে তিনি তাই তাঁদের অনুরোধ মান্য করে কলকাতায় যান। সর্ববিধ চিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি ১৯১১ সালে এই মরদেহ ত্যাগ করে তাঁর প্রিয় গুরুর চরণে চরম শান্তি ও আনন্দের স্থান লাভ

করেন। তাঁর দেহত্যাগে মাদ্রাজের অনুরাগী ও ভক্তদের মধ্যে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। যে শূন্যতা জগৎ যতদিন থাকবে ততদিন স্থায়ী হবে।

তাঁর প্রস্তুত জমিতে পরবর্তী পরিচালকরা প্রয়োজনীয় বীজ বপন করেছেন। আমরা দেখেছি তাদের অর্জিত উত্তম ফসল। সবই শশী মহারাজের জন্যেই, তাঁর জয় হোক।

অনুবাদক ঃ স্বামী সংসিদ্ধানন্দ

বেদান্ত কেশরী, সেপ্টেম্বর ১৯৪৬, পৃঃ ১৬৯-১৭৩

[শ্রীপি. মনিক্কাস্বামী মুদালিয়র (১৮৬৯-১৯৬০) সামরিক হিসাবরক্ষক ছিলেন। তিনি কাজ করার সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল গভীর আন্তরিকতা। মনিক্কাস্বামী ছিলেন অদ্বৈতী ও যুক্তিবাদী। তাঁদের দুজনের মধ্যে এ নিয়ে খুব আলোচনা হতো। সামরিক চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি মাদ্রাজ মঠে সুদীর্ঘ সময় বসবাস করেছিলেন।]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঃ একজন নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী

কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রী

আমার যেমন স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করে ও তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে জীবন ধন্য হয়েছিল, তেমনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে দর্শন করার ও তাঁর পদপ্রান্তে বসে আশীর্বাদ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই দুই ঘটনা ঘটেছিল বিংশ শতাব্দী শুরু হবার আগে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৯৩ সালে। বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন। তাঁর গান্ধর্ব বিনিন্দিত কণ্ঠে ও আধ্যাত্মিকতার স্রোতে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ চমকিত ও আকৃষ্ট হয়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৮৯৭ সালে যখন স্বামীজী শিকাগো থেকে হিন্দুধর্মের বীররূপে প্রত্যাবর্তন করেন। মাদ্রাজে মঠ স্থাপনের জন্য রামকৃষ্ণানন্দজীকে দায়িত্ব অর্পণ করেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী আইস হাউসের একটি ঘরে থাকতেন। আমরা প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। যখনই দরিদ্র নারায়ণের সেবা বা অতিথি অভ্যাগতদের সমাগম হতো তখন আমরা আহার পরিবেশন বা ছোট ছোট কাজ করে আনন্দ লাভ করতাম। তিনি আমাদের অন্তরে দরিদ্র নারায়ণ সেবার আদর্শ যে উজ্জ্বল অক্ষরে এঁকে দিয়েছিলেন আজও তা আমাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। আমি রামু (শ্রীসি. রামস্বামী আয়েঙ্গার পরে যিনি সম্পূর্ণভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং যার অদম্য উৎসাহ ও সুদক্ষ পরিচালনায় মায়লাপুরের রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল।) রামানুজ (শ্রীসি. রামানুজাচারিয়ার যিনি তাঁর খুড়তুতো ভাই রামুর কার্যের সার্থক সহকারী ছিলেন), রাও সাহেব সি.ডি. কৃষ্ণস্বামী আইয়ার (যিনি একজন ডিস্ট্রিক্ট জজরূপে অবসর গ্রহণ করেন), এম. রঙ্গস্বামী আইয়েঙ্গার প্রভৃতি একদল ছাত্রগোষ্ঠী গড়ে ওঠে যারা রামকৃষ্ণানন্দজীর পাদমূলে উপবেশন করত। মাদ্রাজের উত্তরে মোডা স্ট্রিটের রামস্বামী আইয়েঙ্গার-এর বাড়িতে ক্লাস হতো। আমরা স্বামীজীর কাছে গীতা, উপনিষদাদি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করি। [এখানেও এরপর থেকে 'স্বামীজী' অর্থে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে বোঝানো হচ্ছে।]

কিছুদিন পরে আইস হাউস বিক্রি হয়ে গেলে, স্বামীজী কিছুদিনের জন্য

বাড়িটির বহির্ভাগে একটি বাড়িতে ছিলেন। ১৯০৭ সালে মায়লাপুরের ব্রডিজ রোডে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি বাড়ি তৈয়ার করা হলে, স্বামীজী উৎফুল্ল মনে সেই বাড়িতে উঠে আসেন। সেই বাড়িটি পরে ভেঙে ফেলা হয় এবং সেই স্থানে বর্তমানে বৃহৎ ও শোভনীয় মঠ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণানন্দজীর চোদ্দ বছরের মাদ্রাজ জীবন ছিল অপ্রতিহত ও বিরামহীন কর্মময়। তাঁর সঙ্গে কোন গুরুভাই ছিলেন না। একেবারে একাকী। আবার প্রথমদিকে কোন চাকরও ছিল না। একদিকে মন্দিরে প্রভুর পূজা ছাড়াও অগণিত ভক্তের ভিড়ও তাঁকেই সামলাতে হতো। আবার মিশনের কার্য পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহও করতেন। প্রথম থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী মাদ্রাজবাসীর হৃদয় স্পর্শ করে এবং স্বামীজীর সদা সরল ও আধ্যাত্মিকতাময় মিশনকে মাদ্রাজবাসীর কাছে জনপ্রিয় করে তোলে। স্বামীজী শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ক্লাস নিতেন। প্রায়ই তাঁকে দিনে তিনটে ক্লাসও নিতে হতো। আজকের মতো মাদ্রাজে তখন বাস ট্রামের ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। এমনকি কোন মোটর গাড়ি বা বেসরকারি বাসও ছিল না। তথাকথিত মায়লাপুর ট্রাম বারবার্থ ব্রিজের কাছে থামতো এবং তখন শহরের একমাত্র ট্রামলাইন (পূর্ব নাম ব্ল্যাক টাউন এবং পরে মহামহিম পঞ্চম জর্জ সম্রাট রূপে সিংহাসনাভিষিক্ত হলে নাম পরিবর্তিত হয়ে জর্জ টাউন হয়) চিন্তাদ্রিপেট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ট্রামযাত্রা ছিল একধরনের অত্যাচার, কিন্তু স্বামীজী যেখানে যেতেন তার সবগুলিতে ট্রামের সুবিধে না থাকায় তাঁকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঝটকায় যেতে হতো। তদানীন্তন ঝটকা গাড়ি বর্তমানে আর দেখা যায় না। ঝটকার সিটগুলিতে যদিও চারজনের বসার ব্যবস্থা থাকত, কিন্তু দুইজন যাত্রীই স্বচ্ছন্দে বসতে পারত। উপরের সিটগুলি ছিল এতই উপরে যে, ঘোড়া চলতে শুরু করলেই উপরের সিটের যাত্রী ঝাঁকানিতে নিচে চলে আসত এবং নিচে বসা ব্যক্তির সঙ্গে বাদানুবাদ হতো। স্বামীজী ছিলেন অতিশয় স্থূলকায় ও লম্বা। যখন তিনি ঝটকায় বসতেন তাঁর মাথাটি উপরের দেওয়ালে ধাক্কা খেত ও তিনি বড়ই অসুবিধা বোধ করতেন। কিন্তু তবুও দিনের বিভিন্ন সময়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁকে সেই অসুবিধার মধ্যেও ঝটকায় চড়ে বিভিন্ন ক্লাস নিতে হতো।

স্বামীজীর কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতো সিংহময় ব্যক্তিত্ব, উজ্জ্বল চক্ষু বা মনোহারী বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর কোনটাই ছিল না। তাঁর ছিল সাদা মাঠা

মুখমণ্ডল, কিন্তু যখন তিনি হাসতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডলে হৃদয়ের আন্তরিকতাই প্রকাশ পেত।

স্বামীজী বাগ্মীও ছিলেন না। আমরা যারা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনেছি, যাঁকে আমেরিকাতে তাঁর বক্তৃতার জন্য "একজন দৈবী বক্তা" খ্যাত বলে জানি, তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণানন্দজীর বক্তৃতা ভঙ্গির অনেক পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। স্বামীজী বাচন শৈলীতে সুদক্ষ না হলেও তাঁর বক্তৃতা ছিল আবেগপূর্ণ ও অল্পসময়ে শ্রোতার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাত। এসব প্রকাশ দেখা যেত তাঁর ক্লাসগুলিতে। তাঁর ছিল দৃঢ়তাপূর্ণ যুক্তিমূলক আলোচনা। ঠিক সক্রেটিস রীতি। এতে আমরা তাঁর প্রতি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হতাম। আমরা ছিলাম আপাদমস্তক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আমাদের মন ছিল আধুনিক ও সন্দেহযুক্ত। আমরা অবিরাম বিভিন্ন প্রশ্নবানে তাঁকে জর্জরিত করতাম। কিন্তু তিনি ছিলেন সর্বদা শান্ত, ধীর ও স্থির। যেন পর্বত শিখরে বসে আছেন—ধৈর্য ও হাসি হাসি মুখ। তাঁর চারিদিকে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা দেখেও দেখতেন না। ঈশ্বর ও গুরুদেবের প্রতি তাঁর সরল বিশ্বাস ছিল মর্মস্পর্শী। ক্রমে ক্রমে আমরা তাঁর পথে এলাম ও গুণগ্রাহী হলাম। যখন কোন কারণে মঠে আর্থিক অবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতো, তখন তিনি স্বীয় গুরুদেবের কাছে তর্ক-বিতর্ক ও আবেদন নিবেদন করতেন, তদ্‌গত চিত্তে প্রার্থনা করতেন। এ প্রার্থনা কখনই ব্যর্থ হতো না। এ সম্বন্ধে প্রচলিত কথা আছে, "দৈবম্ পুরুষরূপেণ"—ঈশ্বর মানুষ বা অন্য রূপের মাধ্যমে আসে, সাহায্য ও উৎসাহ তাঁর কাছে আসত রহস্যজনকভাবে ও অভাবনীয়ভাবে, অদৃশ্যভাবে।

তাঁর পরিচালনাধীনে মাদ্রাজ মঠ ও মিশনের কার্য সুগভীর, সুবিস্তৃত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। মাদ্রাজবাসী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম উৎসবের জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন। এটি ছিল বাৎসরিক আধ্যাত্মিক মিলন মেলা। আজও সেই প্রথানুসারে মাদ্রাজ মঠে উৎসবের সময় পূজা, ভজন, হরিকথা ও বক্তৃতা আয়োজিত হয়। দরিদ্রনারায়ণ সেবা তিনি আরম্ভ করেছিলেন এবং তিনি নিজেই পরিচালনা করতেন। এটি এখন মাদ্রাজ মঠে বাৎসরিক উৎসবের অঙ্গ। তিনি এক সহায় সম্বলহীন অনাথকে মানুষ করেছিলেন। এটি ছিল সুবিখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের সূত্রপাত। হোম এক বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় আজও অগণিত যুবককে আশ্রয় দিয়ে তাদের হৃদয় ও মনকে উজ্জীবিত করছে। এখানে তারা ঈশ্বর, মানব জাতি ও দেশসেবার জন্য নিজেদেরকে উপযোগী করে তুলেছিলেন।

মাদ্রাজে তার অবিরাম কার্যকালেও তিনি সময় বের করে নিতেন নগণ্য গ্রাম বা ছোট শহরগুলিতে গিয়ে বক্তৃতার জন্য। তিনি ত্রিবান্দ্রম ও ব্যাঙ্গালোরে মিশনের শাখাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই সমস্ত কার্যাবলী তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে পরিচালনা করতেন। তিনি নিজেকে সর্বদা ঈশ্বর ধ্যানে ও শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা-পুজোয় ব্যাপৃত রাখতেন। তিনি তাঁর গুরুদেবের ছবিতে তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি, পূত সংস্পর্শ অনুভব করতেন। তিনি ছিলেন একজন চরম গোঁড়া ও কঠোর নিরামিষাশী। তাঁর মধ্যে গোঁড়ামি থাকলেও তিনি অন্যের জীবনধারণ প্রণালী ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি চিরকাল সর্বধর্ম সমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর আলোকে জীবন ধারণ করতেন। প্রায়ই এই সহনশীলতা বর্তমানে উদারতার এবং রীতিনীতি ও পূজার সংক্ষিপ্তকরণের পথ ধরেছে। কিন্তু তিনি ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলেন। যেহেতু পূজার রীতিনীতি গতানুগতিক ও সুষমাপূর্ণ ধারাগুলি প্রাচীন মহাপুরুষদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং করণীয়, ঐগুলি খর্ব বা সংক্ষিপ্ত বা পরিমার্জিত বা পরিবর্ধন করা হয়নি। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল আধ্যাত্মিকতারই অধীন, যা ছিল গর্বের বিষয়। তবে এই গর্ববোধ নিজের উপর নয়, সত্যের পরিচালকের উপর। তিনি অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ, অদ্বৈত অনুভূতিই যে সর্বোচ্চ ও শেষের স্তর। কিন্তু তিনি জানতেন, অনুভব করতেন ও শিক্ষা দিতেন যে পুরুষকার ও দৈবী কৃপা ছাড়া এরূপ অনুভূতি কখনও সম্ভব নয়। ঠিক তাঁর গুরুর মতো সুমিষ্ট ও গভীর ভক্তিসংগীতে তাঁর মন ও অন্তর পূর্ণ থাকত এবং সমাধির উচ্চস্তরে বা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির জগতে নিয়ে যেত।

যদিও আমার এই স্মৃতিকথার উদ্দেশ্য তাঁকে প্রকাশিত করা, তাঁর শিক্ষাব্যাখ্যার জন্য নয়। যদি এই মহাপুরুষের পুজো ব্যতীত আধ্যাত্মিক উপদেশ দানই প্রধান কার্য হয়; তবে ছাত্র ও শিক্ষককে পৃথক করা যায় না, করলে অবিচার হয়।

সেই কারণে আমি তাঁর উপদেশগুলি বর্ণনা করে আমার লেখা শেষ করব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশিত করেছেন। তাঁর "Sri Krishna : the Pastoral and King Maker" বই-এর মাধ্যমে। তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত বই-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য "Universe and Man.", "The Soul of Man" এবং তাঁর "Path to Perfection" এবং "Necessity of

Religion, The Message of Eternal Wisdom" নামে এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর বিশেষ ও নিজস্ব উপদেশ বিশ্লেষিত হয়েছে প্রকৃতি ও মানুষ এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের তত্ত্বের মধ্যে। বিজ্ঞান আমাদের এই পদার্থের চরম ধ্বংসাতীতের কথা বলেছে। কিন্তু চরম সত্য বৈজ্ঞানিক আলোচনার দ্বারা জানা যায় না। একমাত্র অন্তর্দর্শনের দ্বারা জানা যায় যা বেদ ঘোষিত "ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্"। ঈশ্বর হলেন বিশ্বব্যাপী এবং ভাবাতীত, তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি বিশ্বের অন্তর্নিগূঢ় সত্য। ঠিক সেইভাবে ঈশ্বর আমাদেরও অন্তরতম সত্য, ক্ষুদ্র আমিই ইন্দ্রিয়-মনের সঙ্গে সংযুক্ত, যা অন্তঃস্পর্শী শাশ্বত অনন্ত সচ্চিদানন্দে রূপান্তরিত হবে। ঈশোপনিষদে সত্যান্বেষী প্রার্থনা জানাচ্ছে সূর্যদেবকে—তাঁর মূল স্বরূপ প্রকাশিত করার জন্য যা কিনা তার অন্তর্নিহিত শুদ্ধ সত্তা "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।"

অনাদি অনন্ত সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব হলো ভারতের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বারংবার জোর দিয়েছেন যে ধর্মই হলো চরম সত্যের অনুভূতি। তাঁরা আরেকটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন—সব ধর্মই একই পথে নিয়ে যাবে। সেজন্য সকলেই পরস্পর ভাবের আদান প্রদান ও সমন্বয় করবে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁর "Message of Sri Ramakrishna" গ্রন্থে বলেছেন, 'ইহ জগতের সকল ধর্মমতানুসারে সত্যানুসন্ধানের পরে আমরা দেখতে পাই যে যদিও তারা বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট এবং বহির্দৃষ্টিতে পার্থক্য থাকলেও তারা একই সত্যের দিকে নিয়ে যায়।"

আমি এই লেখাটির উপসংহারে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পুস্তক "The Soul of Man"-এর মুখবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত না করে পারছি না। সেখানে তিনি বলেছেন ঃ "এইভাবে আমরা দেখি অজ্ঞান, যা সকল দুঃখের মূল। সৃষ্টির আদি থেকেই অহংকার সেই আনন্দস্বরূপকে করে তুলেছে দুঃখপূর্ণ, সর্বজ্ঞকে করেছে অজ্ঞান-তমসাবৃত, সর্বশক্তিমানকে দুর্বল, সেই অসীমকে সসীম করে প্রভুর দাসরূপে প্রতিভাত করে সকল মানুষের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য জ্ঞান-খড়্গ সহায়ে এই অজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ করা। এই জ্ঞান মানুষকে শেখায় তার অসীম সত্তাকে কিভাবে এই সদ্‌গ্রন্থ প্রাচীন ঋষিকুলের পদাঙ্ক অনুসৃত মহান ত্যাগের আদর্শকে প্রচারিত করে মানব সেবায় ব্যবহৃত হবে? এর উত্তরে আমরা বলি, 'এখানে উল্লেখিত আদর্শগুলিকে মেনে

নেওয়ার ইচ্ছা মানুষের না থাকলেও মুনিজন প্রদর্শিত চরম লক্ষ্যকে অবজ্ঞা করতেই পারে না।' যদি এই চরম সত্য উপলব্ধি বিনা তার কোন কিছুতেই শান্তি না হয়; তখন নিরুপায় হয়ে সে নিশ্চয়ই এই বইটি পড়বে। বর্তমানে এই আদর্শকে মেনে নেওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও পরবর্তী কোন জন্মে যখন তার কাঙ্ক্ষিত স্বর্গের আসল স্বরূপ জানতে পারবে তখন মুক্তিলাভের উপায় সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী তার কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হবে। সেই কারণে যদিও বইটি প্রত্যক্ষভাবে খুব অল্প সংখ্যককেই সাহায্য করবে, কিন্তু পরোক্ষভাবে এর অবদান অসামান্য। এই আশা নিয়ে বইটি প্রকাশিত হলো।"

অনুবাদক ঃ স্বামী সংসিদ্ধানন্দ

[বেদান্ত কেশরী, আগস্ট, ১৯৫৩, পৃঃ ১৭৭-১৮৩]

[কে এস. রামস্বামী শাস্ত্রী ছিলেন অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের পুত্র। ১৮৯২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ আয়ারের বাড়িতে ছিলেন—তখন রামস্বামীর বয়স চৌদ্দ বছর। রামস্বামী স্বামীজীর পূতসঙ্গে এসে প্রভাবান্বিত হন। ১৮৯৭ সালে স্বামীজীর মাদ্রাজে থাকাকালীন আবার তিনি স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসেন। মাদ্রাজ মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের সংস্পর্শে আসেন রামস্বামী।]

স্মৃতিকথা

শ্রী এম. এ. নারায়ণ আয়েঙ্গার

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জীবনে অন্যতম একটি কর্ম অধ্যায় হলো মাইসোর রাজ্যে। ১৮৯৩ সালে আমেরিকাতে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের আগে স্বামী বিবেকানন্দ মাইসোরে এসেছিলেন এবং বিখ্যাত মিনিস্টার স্যার শেষাদ্রী আয়ারের বাড়িতে অতিথি হিসেবে একমাস ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় মহারাজ চামরাজ ওয়াদিয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি যেখানেই গিয়েছিলেন সেখানেই ধর্মের মূল্যবোধের প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি আমেরিকাতে তাঁর প্রজ্ঞাময় ভারতীয় চিন্তাধারার ভেতর দিয়ে হিন্দুধর্মের জয়গান গেয়েছিলেন। আর ব্যাঙ্গালোরের জনসাধারণ তাঁর সম্মানে জনসভা করেছিলেন ১৮৯৪ সালে এবং এই বিস্ময়কর কাজের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু মাইসোরে পরের নয়বছরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধুনিক চিন্তাধারার কোনরকম প্রচার ছিল না।

ব্যাঙ্গালোরের আলসুরের বেদান্ত সোসাইটির কাছ থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ও সেখানে ১৯ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট অবস্থান করেন। প্রায় চার হাজার লোক ও তিপ্পান্নটি ভজন দল তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে এবং তিনমাইল পথ শোভাযাত্রা করে তাঁকে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে আসেন। এ সময়-কালে তিনি বারোটি বক্তৃতা দেন এবং সকাল সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তর আলোচনা সভা পরিচালনা করেন।

তাঁর বক্তৃতাতে প্রায় এক হাজার শ্রোতা উপস্থিত থাকত। আর ঐ ক্লাসগুলিতে প্রায় শতাধিক লোক আসতেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় গুলি ছিল ঃ "জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী" (Message of Sri Ramakrishna to the World), "যোগ কি?" (What is Yoga) , এবং "বেদান্ত কি?" (What is Vedanta)। এই সকল সভায় রাজ্যের উচ্চাধিকারীরা সভাপতিত্ব করতেন এবং তাঁরা এই কাজকে সম্মানজনক বলে মনে করতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী নিজেই উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন এবং শ্রোতাদের মধ্যে শাশ্বত ধর্মের সত্য সম্বন্ধে ঐকান্তিক আগ্রহ সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার গুণে এক প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক

স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। এই স্থানে তার প্রভাবও পড়েছিল। ধর্ম আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো উদার ও অসাম্প্রদায়িকভাবে, অথচ তা ছিল গভীর ও সবকিছু ঐতিহ্য মেনে।

ঐ বছরের অক্টোবরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মাইসোরে নিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। পাঁচটি বক্তৃতা দিলেন তিনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সংস্কৃত কলেজে পণ্ডিতদের সভায় তাঁর সংস্কৃতে ভাষণ। মহান আচার্যদের বেদান্ত ও প্রস্থানত্রয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর আলোকে। তাঁর ভাষণ ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সকলেই আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতরা অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন বলে তাঁর ভাষণের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁর মন্তব্যের বিপক্ষে মতামত দিতে ভদ্রোচিত ভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে তাঁর শিক্ষাগুণে ব্যাঙ্গালোরে বেদান্ত সোসাইটি উজ্জীবিত হয়ে উঠল। ১৯০৪ সালে আগস্ট মাসে তিনি আবার আমন্ত্রিত হলেন একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী আত্মানন্দ। তিনি একের পর এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, ক্লাস আরম্ভ করেছিলেন। স্বামী আত্মানন্দকে রেখে গেলেন কার্যের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এবং তিনি নিজে মাদ্রাজে ফিরে গেলেন। তাঁর নির্দেশে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত আত্মানন্দ, পরে স্বামী বিমলানন্দ, স্বামী বোধানন্দ বেদান্ত প্রচার করেছিলেন। ১৯০৬ সালের আগস্টে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী আবার ব্যাঙ্গালোরে ও মাইসোরে এলেন। এবার সঙ্গে ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। স্বামী অভেদানন্দ সবেমাত্র এসেছেন আমেরিকা থেকে প্রায় দশবছর বেদান্ত প্রচারের পর। দুজনে বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং তাঁদের বেদান্তকার্য মাইসোরে একত্রীভূত করলেন। স্বামী অভেদানন্দজীর উপস্থিতি ব্যাঙ্গালোরের গণ্যমান্যদের আরও উদ্দীপিত করে তুললো। তাঁরা ঠিক করলেন তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে মিশনের একটি বেদান্ত কেন্দ্র উপযুক্ত স্থানে স্থাপনা করবেন। ব্যাঙ্গালোর শহরে বাসবানগুড়িতে দেওয়ান স্যার ভি.পি. মাধবরাও মিশনকে দু-একর জমি দান করলেন। এবং স্বামী অভেদানন্দ বর্তমান আশ্রমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা করেছিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী সেখানে একটি বাড়ি তৈরি করলেন এবং মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে উদ্বোধন করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯০৮ সালের আগস্টে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এলেন এবং তাঁর প্রার্থনা মতো বাড়িটির উদ্বোধন করলেন। ব্যাঙ্গালোরের জনসাধারণ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে বিপুল সম্বর্ধনা

জানিয়েছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী প্রায়ই ব্যাঙ্গালোরে আসতেন। প্রধানত তিনি স্বামী আত্মানন্দের মাধ্যমে আশ্রম ও মাইসোরের কাজ পরিচালনা করতেন। স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন আশ্রমের কর্মাধ্যক্ষ। এভাবে আট বছর ব্যাঙ্গালোরের সঙ্গে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর সম্পর্ক ছিল। এই সময়ে তিনি মাইসোরে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ শুরু করেন। অনেক বাধা অতিক্রম করার পর রামকৃষ্ণানন্দজীর শ্রীগুরু মহারাজের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, ভগবানের প্রতি তাঁর প্রেম, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা, ভক্ত ও গরিবের জন্য তাঁর ভালোবাসা ও আন্তরিকতা, তাঁর সংস্কৃত ও দর্শনে বিশাল পাণ্ডিত্য, তাঁর অতুলনীয় পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য, সরলতা, ক্ষমাদৃষ্টি, তাঁর সাবধানতা ও যত্ন, প্রত্যেকটি উক্তি ও কাজে তাঁর গভীর অনুভূতির কথা আমি অল্পই লিখতে সক্ষম হয়েছি।

অনুবাদক ঃ স্বামী বিমলাত্মানন্দ
[বেদান্ত কেশরী, সেপ্টেম্বর, ১৯২২,
পৃঃ ১০২-১০৪]

[শ্রীএম. এ. নারায়ণ আয়েঙ্গার (১৮৬৮-১৯৪৩) ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসার পর তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি ছিলেন উচ্চ সরকারি কর্মচারী। কর্মরত অবস্থায় তিনি ব্যাঙ্গালোর ও মাইসোরে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রস্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিশেষ করে ১৯০১ সালে ব্যাঙ্গালোরে বেদান্ত সোসাইটি স্থাপনা করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে সরকারি কর্ম থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজে যা উপার্জন করেছিলেন তা দিয়ে 'হোলি মাদার ট্রাস্ট' তৈরি করেন। এই ট্রাস্ট থেকে যুবকদের বেদান্ত শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়েছিল।]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যেরূপ দেখেছি

পি. এন. শ্রীনিবাসাচারি

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের গুরুভক্তি ও ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় জীবন সমর্পণ করা দেখে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে মঠের প্রধান স্তম্ভ বলতেন। তাঁর রক্ষণশীলতা ও পাণ্ডিত্যের জন্য স্বামীজী তাঁকে বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতে মিশনের প্রচার কার্যের জন্য মনোনীত করেন। সন্ন্যাসী হিসেবে তাঁর জীবনে বাহ্যিক কর্মে ছিল কঠোর রক্ষণশীলতা এবং সঙ্ঘের সন্ন্যাসিরূপে আধ্যাত্মিক জগতে তিনি ছিলেন যুগান্তকারী। তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধর্মজগতের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী প্রচার করা, যার দ্বারা ধর্মজগৎ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

১৮৯৭ সালে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর বাসধন্য বীচ রোডের ক্যাসল কার্নানের বহির্ভবনে প্রথমে বাস করতে থাকেন। কিন্তু মঠ পরিচালনা ও শ্রীরামকৃষ্ণের পুজোর জন্য যথেষ্ট স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তাঁকে যথেষ্ট অসুবিধে ভোগ করতে হয়। তিনি সহাস্যে সে সব মেনে নিয়েছিলেন এবং সব সময় 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক' এই ভাব অবলম্বন করে চলতেন।

তিনি রাস্তার কাছে সমুদ্রের সামনাসামনি একটি উঁচু বেদিতে বসতে খুব ভালোবাসতেন। এরকম অবস্থায় আমি একদিন তাঁর কাছে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন আমায় তিনি বলেছিলেন, "ঢেউ এর পেছনে সমুদ্রকে দেখ; সে ভাবেই চোখ বন্ধ করে বৃত্তিহীন চৈতন্যকে দেখ।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রথম মায়লাপুরে আসেন ১৯০৭ সালে। তখন ব্রডিজ রোড (বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ রোড) এর উপর নূতন নির্মিত মঠ ভবনে এসে বাস আরম্ভ করেন। ঠাকুরের পূজা ও কাজের জন্য অবশেষে একটি স্থায়ী আস্তানা হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু ঠিকাদারের অবহেলায় পরে মঠ বাড়িটি ভেঙে পড়ে। অবশেষে এক দশক পরে নতুন খোলামেলা জায়গায় মঠবাড়ি নির্মিত হলো।

অচিরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজোর সুবন্দোবস্ত হলো। উৎসাহে ও সুচারুরূপে

মিশনের প্রচারকার্য শুরু হলো। মঠবাড়ির একটি ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর হলো—মন্দির বলা হতো। মন্দিরে তিনি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গুরুভক্তির মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন। তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি শুধু ছবি বা মনের আরোপিত কোন বস্তু ছিল না। বরং তা ছিল ভক্তি ও পূজার দ্বারা ঘনীভূত জীবন্ত সচ্চিদানন্দের বিগ্রহস্বরূপ। সেই ছবি একাধারে গুরু ও ঈশ্বর—সাকাররূপে আবার নিরাকাররূপে। ব্যক্তি বা মানুষভাবের দৃষ্টিতে সেই মূর্তি ছিল রূপময় শরীরধারী রক্তমাংসের মানুষ; তাই তাঁকে নিত্য স্নান করানো, কাপড় পরানো, খাওয়ানো ও বিশ্রাম দেওয়া হতো। আবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনি হলেন দিব্যসত্তা—যিনি ভক্তকে শক্তি সঞ্চার করেন, তাঁকে দেবত্বে উন্নীত করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অসীম বিশ্বাস ছিল ঈশ্বররূপী গুরুর প্রতি এবং তাঁকেই তিনি দেশ-কাল নিমিত্ত এবং দেহ মনের অতীত এক অনন্ত সত্তা বলে জানতেন। পূজা ও প্রসাদ বিতরণের পর তিনি তাঁর প্রচারকার্য আরম্ভ করতেন। বিভিন্ন স্থানে তাঁকে ক্লাস নিতে বা বক্তৃতা দিতে হতো। তিনি যে শুধু নিজের গুরুর পূজা করতেন, তাই নয়। অপরের গুরুভক্তিকেও শ্রদ্ধা করতেন। একবার ডাঃ নাঞ্জুণ্ডা রাও তাঁর গুরু সচ্চিয়াম্মলের উৎসব সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আমন্ত্রণ জানান। সেদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী বলেছিলেন ঃ "আমি এখানে আপনার গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে আসিনি, কিন্তু আমি এসেছি আপনার গুরুভক্তিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।"

তাঁর ক্লাসগুলি খুব উঁচু দরের। কারণ তিনি ছিলেন মহান আচার্য। ছাত্রের মানসিক গঠন বুঝতে পারতেন ও তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে উপদেশ প্রয়োজন সেভাবেই তিনি বলতেন। একদিকে তিনি যেমন সক্রেটিক পদ্ধতিতে নিপুণ ছিলেন; অন্যদিকে বেদান্ত-আচার্যের শক্তিতে তিনি ছাত্রের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করতে পারতেন। আমরা যারা মায়লাপুরে থাকতাম, অবশ্য রামু এবং রামানুজকে নিয়ে, তাঁর প্রকৃত শিক্ষায় উপকৃত হয়েছিলাম। আমাদের কাছে আচার্যের উপদেশের চাইতে আচার্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ আচার্য ঈশ্বর স্বয়ং। মহারাজের ব্যাখ্যার ধরণ অদ্ভুত ছিল। কারণ সর্বদা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সার্বজনীন। ছকে বাঁধা পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত অর্থাৎ একটি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্য তত্ত্বগুলিকে খণ্ডন করার প্রবণতা তাঁর থাকতো না। এটি শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন পথ যাতে প্রত্যেকটি ধর্মমতের সারতত্ত্বটি গ্রহণ করা হয়। অথচ গোঁড়ামির উৎসস্বরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবগুলি একেবারেই থাকে না। যিশুখ্রিস্ট ও মহম্মদের ধর্মও সত্য; যদিও একমাত্র হিন্দুধর্মই সর্বাবগাহিত্ব ও

সমন্বয়ে বিশ্বাস করে। মহারাজ জোর করে ধর্মান্তরকরণের বিরোধী ছিলেন। এতে বলপ্রয়োগ বা প্রবঞ্চনা বা অন্য ধর্মের উপর অত্যাচার করা হয়।

তিনি যিশুখ্রিস্টকে মানতেন কিন্তু গির্জার মতবাদের বিরোধী ছিলেন। ধর্মসভার বক্তৃতাতে প্রখর যুক্তি ও তীক্ষ্ণ বিচার থাকত। তিনি বিবেকানন্দের মতো সুবক্তা বা বাগ্মী ছিলেন না, যাতে লোকে মন্ত্রমুগ্ধ বা সম্মোহিত হতো। কিন্তু তিনি তাঁর যুক্তি ও বিচার দিয়েই তাঁর সিদ্ধান্তকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে পারতেন। তিনি বিজ্ঞান ভালোবাসতেন, বিশেষ করে অঙ্ক। তিনি নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করার জন্য গণিতের সাহায্য নিতেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্তগুলি সুবিদিত। অনন্ত অর্থাৎ অদ্বিতীয় তত্ত্ব এবং অনন্ত কখনো দুই হতে পারে না। শূন্য এবং অনন্ত একই। প্রত্যেকটি ব্যাসার্ধ সেই এক কেন্দ্রে নিয়ে যায়। এই দেশকাল ও নিমিত্তাত্মক জগৎ বিনশ্বর ও সসীম। প্রকৃত আনন্দ অন্তরে রয়েছে; ইন্দ্রিয়জনিত সুখ ক্ষণিক। মহারাজ যোগের সমন্বয়ের উপর জোর দিতেন। তারা পরস্পর বিরোধী বা আপেক্ষিক নয়, যেহেতু প্রত্যেক যোগই স্বতন্ত্রভাবে একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। স্তরভেদে বা ক্রমান্বয়ে নয়। কর্ম ও জ্ঞান আলো অন্ধকারের মতো বিপরীত ধর্মী নয় বা ভক্তি শুধুমাত্র সগুণ ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ নয়। কর্ম ঈশ্বরের কৈঙ্কর্য ও পরব্রহ্মের উপাসনা। ভক্তি সসীম বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নয়, বরং জ্ঞানের তুল্য। কারণ দার্শনিক পূর্ণসত্তা বা নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন।

দর্শন ও ধর্ম এক; একথা বলা উচিত হবে না যে দর্শন নির্গুণ ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করে ও ধর্ম করে সগুণ ব্রহ্মের। ভক্তি নির্গুণকে সগুণ করে নেয়। যেমন জ্ঞান সগুণকে নির্গুণে রূপান্তরিত করে। বেদান্ত ধর্ম ও দর্শনের একত্ব প্রতিপাদন করে। কারণ ধর্মের দর্শন ধর্মীয় অনুভূতিগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা করে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তীক্ষ্ণ এবং গভীর প্রজ্ঞা বিকশিত হতো তাঁর প্রকাশ্য বক্তৃতাতে। আর তাঁর নিজ জীবনে প্রকাশিত হতো চরম আবেগ। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের ভাবে মগ্ন। প্রকাশ্য বক্তৃতাগুলিতে অদ্বৈতবাদের প্রতি তাঁর ঝোঁক দেখা যেত এবং তিনি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কান্ট, দেকার্তে ও বার্কলের যুক্তির সাহায্য নিতেন। কান্ট বলতেন দেশ, কাল ও কার্যকারণের (নিমিত্ত) অস্তিত্ব শুধু মনেই রয়েছে। দেকার্তে তাঁর 'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি (Cogitoergo-sum) এই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বার্কলে (essepercipi) তত্ত্বের দ্বারা বিজ্ঞানবাদী দর্শনের (Idealistic View) সূত্রপাত

করেছিলেন। কিন্তু এর প্রত্যেকটিই মূলগতভাবে জ্ঞাতার অস্তিত্ব ও আত্মজ্ঞানের দিকেই ইঙ্গিত করে। গণিত তাঁকে অদ্বৈতবাদের এক অদ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণে সাহায্য করেছিল। তর্কের দিক থেকেও বস্তু ও জ্ঞাতার নিত্য অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যেমন তাঁর মস্তিষ্ক ছিল বিচার-প্রবণ তেমনি তাঁর হৃদয় ছিল আবেগ কোমল। রামানুজের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি সর্বান্তঃকরণে রামানুজ ও চৈতন্যকে অনুসরণ করতেন। আবার তিনি বাহ্যিক কর্মেও নিরত থাকতেন এবং সমাজ সেবায় বিশেষ করে দরিদ্র ভোজনে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিতেন। এভাবেই একাধারে ত্রিমূর্ত ছিলেন—জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মযোগী।

তাই তাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল আপাতবিরুদ্ধ গুণগুলি। তিনি ছিলেন যোগীকর্মী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্জনে ধ্যান এবং পূজা, দরিদ্র ভোজন প্রভৃতি কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী এবং তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনই সন্ন্যাসী হতে পারে। একবার বৈরাগ্যের প্রেরণায় আমি গৃহ ত্যাগ করে তিরুক্কালিকুন্ড্রমে গিয়েছিলাম। যদিও আমাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। উদ্বিগ্ন হয়ে মহারাজ আমাদের বাড়িতে এসে বলেছিলেন, "এ তোমার কি খেয়াল? তোমার যুবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করা উচিত হবে না। বহু সাধক গৃহস্থ জীবনেই সিদ্ধিলাভ করেছেন।" এমনই ছিল তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও উদারতা। আমি স্বীকার করি, আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মহারাজ আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাতে আমার অন্তর্জীবন সমৃদ্ধই হয়েছে। এক গোঁড়া প্রচারকরূপে তিনি রামকৃষ্ণের উপদেশের আলোকে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার। একজন ঐকান্তিক নিষ্ঠাবানরূপে তিনি পরম্পরা ঐতিহ্য অনুসারে বহির্জগতের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। কিন্তু মানসিকভাবে তিনি ছিলেন একজন উদার হৃদয় সন্ন্যাসী। তিনি ছিলেন একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত। অথচ একজন জ্ঞানিরূপে তিনি তাঁর বিশ্লেষণী বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুমান বা শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি বিচার করে একত্রিত করতেন। মঠের পুজো সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি আচারগুলি তাঁর নখদর্পণে ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে সেগুলির দ্বারা মন শুদ্ধ হয় ও সত্ত্বগুণে মানুষকে উন্নীত করে। কিন্তু ভক্তিযোগের তিনি ছিলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যখন কোন ভজন গান হতো, তখন তিনি আধ্যাত্মিকভাবে উদ্দীপ্ত হতেন। তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো এবং কম্পিত কলেবরে ঐ বিশাল শরীর নিয়েও ভক্তদের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিতেন। তাঁর এই গভীর ভক্তি-ভাব অন্যান্যদের মধ্যেও সংক্রামিত

হতো এবং হলঘরের সকল ভক্তেরাও শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন্দ্র করে তাঁর সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিতেন। এমনকি ভক্তিহীন ব্যক্তিরাও পর্যন্ত এইভাবে ভাবিত হতেন এবং ভগবৎ প্রেমে উদ্বেল হয়ে উঠতেন। একবার ব্রডিজ রোডের প্রথম বাড়িটিতে (যেটি পরে ভেঙে ফেলতে হয়) ভজন গান হচ্ছিল। বাবাভারতী বলে এক সাধু সে সময় মাদ্রাজ শহরে শিবির করেছিলেন। ভজন শুনে তিনি সাশ্রুনয়নে নৃত্য করতে লাগলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না এবং তিনিও আবেশে নৃত্য করতে লাগলেন। তারপরই মহারাজের এক ভক্ত কে.সি. রঙ্গস্বামীও নৃত্য করতে লাগলেন। সমবেত ভক্তেরা তখন ভক্তির আবেগে প্লাবিত হয়ে ক্ষণিকের জন্য ভগবৎ আনন্দ ও সুখ অনুভব করেছিলেন।

রামানুজের উপদেশও তাঁর উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি রামানুজের ভাবে একেবারে একাকী অঙ্গীভূত হয়েছিলেন। মন শ্রীচৈতন্যের দ্বারা ভাবিত ছিল। আচার্য ত্রয়ের জীবন ও বাণী নিরবচ্ছিন্ন একই ধারায় তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়েছিল।

অনুবাদক ঃ স্বামী শুভকরানন্দ
বেদান্ত কেশরী, জুলাই ১৯৫৫
পৃঃ ১৩৮-৪১

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতি

জনৈক ভক্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদদের জীবন ও বাণী বর্তমানে কম বেশি বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু আমি যখন ৬০ বছর আগে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে দেখা করেছিলাম* পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি, একশো জন কলেজ ছাত্র বা শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে একজনও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে শোনেননি। অল্প কিছু সংখ্যক স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আমি প্রথম ছাত্রাবাসের একজন আবাসিকের কাছে শুনি যে বিবেকানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী আমেরিকা গেছেন এবং সেখানে বক্তৃতা দিয়েছেন ও কিছু আমেরিকানকে হিন্দু চিন্তাধারায় প্রভাবিত করেছেন। সে সময় প্রচলিত ধারণা ছিল যে পবিত্র ভস্ম, চন্দন প্রলেপ ধারণ করা এবং মন্দিরে যাওয়াই ধর্মের মূল অঙ্গ। এই সঙ্গে যদি কেউ ভগবানের নাম কীর্তন ও মন্ত্র জপ করে তাহলে ধর্মাচরণ বা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাতব্যের আর কিছুই বাকি থাকে না।

আমার আরও দুবছর সময় লেগেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনতে এবং এ সম্পর্কে কোন প্রবন্ধ পাঠ করতে যার মধ্যে তাঁর জীবন ও বাণীর উপর ম্যাক্সমুলারের লিখিত প্রখ্যাত গ্রন্থ ছিল। এর অল্প কিছুদিন পরে শুনলাম জনৈক সন্ন্যাসী, সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য, মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেনে আছেন। পরের দিনই সকালে আমি ট্রিপ্লিকেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সেই সন্ন্যাসীর সন্ধানে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গেলাম। শেষে একজন সন্ধান দিলেন যে কয়েকজন সন্ন্যাসী 'আইস হাউস' নামের এক বাড়িতে বাস করছেন। সমুদ্রতীরে ট্রিপ্লিকেনে এটি একটি তিনতলা বাড়ি। আমি সেই বাড়ির দিকে গেলাম। বাড়ির সামনের দিকে এক উঁচু চাতাল। আমি সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু পরে স্নান করে একজন যুবক এলেন। তাঁর এক হাতে ছিল ভিজে গেরুয়া কাপড়। আমি তাঁকে বললাম 'আমি সন্ন্যাসী স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' তিনি বললেন, "স্বামীজী শহরে গেছেন, দুপুরে ফিরবেন। আপনি দুপুরে খেয়ে আসার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।" তাঁর কথানুযায়ী আমি ফিরে গিয়ে খেয়ে দেয়ে পুনরায় ঐখানে এলাম। দরজা বন্ধ ছিল। সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। একজন

* ১৯০৬ সালে

সাধারণ ভদ্রলোক ভেতর থেকে এসে দরজা খুলে দিলেন ও ভেতরে যেতে বললেন। দরজা দিয়ে নেমে একটা ঘরে প্রবেশ করলাম।

প্রথম সাক্ষাৎকার

ঘরটি ছিল বেশ বড়। ঘরে ছিল চেয়ার, টেবিল ও বিছানা। দেয়ালে কয়েকটি ছবি টাঙানো ছিল। একটি চাদর কার্পেটের মতো করে ঘরে পাতা—দর্শনার্থীদের বসার জন্য। যিনি আমাকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনিও একজন দর্শনার্থী। তিনি দরজা আবার বন্ধ করে বসলেন। দেখলাম একজন গৈরিক বস্ত্র পরিহিত গুরুগম্ভীর সন্ন্যাসী বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর চক্ষু দুটি মুদ্রিত। ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি ভাবলাম সন্ন্যাসী দুপুরের আহারের পর বিশ্রাম করছেন এবং তাই ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেয়ালে লাগানো ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে শুনতে পেলাম তিনি দর্শনার্থীটিকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন এবং ব্যক্তিটি তাঁর উত্তর দিচ্ছেন। আমি সেই দিকে ফিরে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। আমি মনে করতে পারছি না যে তাঁকে প্রণাম করেছিলাম কি না; তবে এটা নিশ্চিত তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিনি। তিনি আমাকে বসতে বললেন এবং আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলাম। এত বোকা যে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করিনি। তবে এটুকু স্মরণে আছে যে আমি দুটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমার প্রথম প্রশ্নটি ছিল যে স্বামীজী (উনি) শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন কিনা। ধীর স্থিরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন 'হ্যাঁ'। মনে হলো তিনি গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন এবং উত্তরগুলো তাঁর এক অতল পরিসর থেকে আসছিল। তিনি কি অনুভব করছিলেন যে তিনি তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আছেন?

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল "জীবনের উদ্দেশ্য কি?" সোজা উত্তর এল—"তাঁকে যথার্থরূপে জানা।" আমি ভেবেছিলাম যে তিনি বলবেন জীবনের উদ্দেশ্য ভগবৎ উপাসনা বা মোক্ষলাভ। কিন্তু তাঁর উত্তর আমার পক্ষে অত্যন্ত দুর্বোধ্য ছিল। তিনি যখন বুঝলেন যে আমি তাঁর কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারিনি তখন তিনি তাঁর কথার অর্থ স্পষ্ট করার চেষ্টা করলেন। তবুও আমি তা বুঝতে ঠিক সক্ষম হইনি। আমার জ্ঞান ও বোঝার ক্ষমতা এ বিষয়ে একেবারে কম ছিল। আমি এখন ঠিক মনে করতে পারি না, যে তিনি কি সব বলেছিলেন।

তবে তিনি অন্য এক সময়ে এই বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা

করেছিলেন। উদাহরণটি এরকম ঃ একটি ছোট্ট মেয়ে ও তার ভাই এক সঙ্গে খেলছিল। কিছুক্ষণ পরে ভাই চলে গিয়ে মুখোশ পরে আবার ফিরে এল। মুখোশটি ছিল ভয় পাবার মতো। মেয়েটি ভয় পেয়ে ভাইকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল বাঁচাও বলে। কিন্তু ভাইকে দেখতে পাচ্ছিল না। তখন মেয়েটি ভয়ে ও দুঃখে কাঁদতে আরম্ভ করল। ভাই তক্ষুনি তার মুখোশ খুলে ফেলল। তখন উভয়েই হাসাহাসি করতে লাগল।

ঐদিন তিনি অল্প সময়ের জন্য কথাবার্তা বলছিলেন। তারপর তিনি উঠে কুলুঙ্গিতে রাখা একটা কৌটো থেকে একটা নারকেল নাড়ু দিয়ে বললেন—"তুমি এটি খেতে পার।" এটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় মিষ্টি। আকারে ছোট হলেও খুবই সুস্বাদু। পরে যখনই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতাম ঐ ধরনের লাড্ডু প্রসাদ দিতেন। আমি মনে করতে পারছি না—শ্রীরামকৃষ্ণ যেরকম কোন কোন ভক্তকে আবার আসতে বলতেন সেরকম বলেছিলেন কিনা। তবে আমি নিজেই অনুভব করলাম যে তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করি। এরপর তাঁর কাছে আমি বহুবার গিয়েছিলাম। আমি তাঁর মহত্ত্বের সামান্যতমও অনুধাবন এবং তাঁর কাছ থেকে উচ্চতত্ত্বের কথা জেনে নিজের জীবনকে ধন্য করতে পারিনি। এরকমই ছিল আমার মনের গতি।

আমি তাঁর কাছে যেতাম নিছক দর্শনার্থিরূপে, একজন সত্যিকারের ধর্মার্থিরূপে যাইনি। আমার মনে হয়েছিল যে তিনি একজন অনন্য সাধারণ ও মহান পুরুষ। গায়ের রঙ রক্তাভ সোনার মতন ও সুঠাম দেহ ছিল তাঁর। শরীর-এর গড়ন অনুযায়ী তাঁর ছিল দৈহিক উচ্চতা। তাঁর হাত পায়ের আঙুলগুলো ছিল নরম। যদিও তাঁর চোখ দুটি ছিল ছোট, কিন্তু জ্ঞানের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁর স্বর ছিল সুমিষ্ট, চালচলন ছিল দৃঢ়তাপূর্ণ ও সাহসী। আমি এর আগে এমন পরিপূর্ণ মানুষ কখনও দেখিনি। এজন্য তাঁকে আমার খুবই ভালো লাগত। আমি বার বার তাঁকে দেখতে যেতাম। তবুও আমি তাঁকে কখনও ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিনি। একদিন এক দর্শনার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন—"তিনি একজন মহামানব ছিলেন।" তা শুনে স্বামীজীর (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল। তিনি ভাবাবেগে বললেন—"একজন মহামানব! কারা তোমাদের মহামানব? যারা কি না পুতুল উপাসক, ইন্দ্রিয়াসক্তির দাস—তাঁরা তোমাদের মহামানব! রামকৃষ্ণ কখনও মৃত্তিকার উপাসক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন। তাঁর মন ছিল এই

পার্থিব জগতের ঊর্ধ্বে। তিনি ঈশ্বরকে দর্শন করেছিলেন এবং করুণার বশবর্তী হয়ে ঈশ্বরকে আমাদের কাছে এনেছিলেন। এরকমই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।”

আমি তাঁকে প্রায়ই একটি কথা বলতে শুনেছি—মানুষ মৃত্তিকা উপাসক ও কামের দাস। তার কথা ও কাজ ছিল বৈরাগ্যমণ্ডিত। জনৈক দর্শনার্থী একজন বিখ্যাত মানুষ সম্পর্কে বলেছিলেন—তখন স্বামী চিৎকার করে বললেন ঃ “তিনি তোমাদের এই নোংরা সংসারের মধ্যে ‘একজন’ হয়ে উঠতে চান! না, এটি তা নয়। কাজের এবং পবিত্র বলে গৃহীত এর মধ্যে তিনি নিজেকে একজন রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।”

আরেকবার আরেকজন ভদ্রলোক বলেছিলেন যে তিনি ভাগবত পাঠ করছেন। স্বামীজী তাঁকে তার থেকে কিছু শ্লোক আবৃত্তি করতে বললেন। তিনি শুরু করলেন ঃ “শ্রীকৃষ্ণ জিষ্ণুসখ’... ইত্যাদি।

স্বামীজী আবৃত্তি করলেন ঃ “সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্। সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ ॥” (২/২/৪) বলেই তিনি চুপ হয়ে আত্মানন্দে বিভোর হয়ে রইলেন।

তিনি নিজের জীবনযাত্রায় ও পোশাক আশাকে আপাত সুখ ও চাক্‌চিক্যের ধার ধারতেন না। তিনি কখনও জামা পরতেন না। নিত্য তিনি দাড়িও কামাতেন না। যখন তিনি বাইরে যেতেন তখন একটি কোট ও মাথায় পাগড়ি পরতেন। মাসে দু-বার করে মস্তক মুণ্ডন করতেন। তিনি চা বা কফি পান করতেন না। মঠের গোড়ার দিকে কোন রাঁধুনি ছিল না। তিনি নিজেই রাঁধতেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করতেন এবং পরে প্রসাদ পেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে যা নিবেদন করা হয়নি তা তিনি কখনও গ্রহণ করতেন না। এমনকি যখন আশ্রমে ব্রহ্মচারী বা রাঁধুনি থাকত তখনও তিনি ভোগের জন্য নিজেই তরি-তরকারি কুটতেন।

‘শ্রীগুরুমহারাজ’ যখন বলতেন তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বলতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব রান্না পছন্দ করতেন তা তিনি যত্নের সঙ্গে করতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ছবিরূপে দেখতেন না, ফটোতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করতেন।

তিনি দাস্যভক্তির স্বয়ং শ্রীমহাবীর ছিলেন, তিনি যখন স্তোত্র পাঠ করতেন তখন তিনি ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। তাঁর কণ্ঠ গম গম করতো। সে সময়ে ভগবানের নামে ডুবে যেতেন। একবার স্বামীজীর (বিবেকানন্দ) জন্মতিথিতে

ভজন-কীর্তন হচ্ছিল। স্বামীজীর একটি বড় প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্য দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। পঁচিশ তিরিশ জন ভক্ত কীর্তন করছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী সকলের মাঝে ধ্যানে বসেছিলেন। কীর্তন কিছু সময় ধরে চলছিল। হঠাৎ তিনি গভীর ভাবাবেগে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁর হাত দুটি উঁচুতে ও মাথা সামান্য ঝুঁকে। প্রায় পনের-কুড়ি মিনিট গানের তালে তালে একটি বৃত্তাকারে কখনও বাঁদিকে অথবা ডানদিকে নৃত্য করতে লাগলেন। কীর্তনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তারাও তাঁর নৃত্যসঙ্গী হয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণানন্দজীর স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ রচনা 'বিবেকানন্দ পঞ্চকম'ই তাঁর পরিচয়। একবার জনৈক দর্শনার্থী যা বলেন সেই কথার প্রমাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দেন। রামকৃষ্ণানন্দজী তৎক্ষণাৎ গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন—"স্বামীজী কখনও এরূপ বলতে পারেন না। তিনি ছিলেন সত্যস্বরূপ, তাঁর মুখ থেকে কখনও চিরন্তন সত্যের বিরুদ্ধে একটি শব্দও বের হতে পারে না।" দর্শনার্থী পরে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

অদ্বৈত অনুভূতির ব্যাখ্যার সময় রামকৃষ্ণানন্দজী ঈশ্বরের সাকাররূপ দর্শনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতেন। তিনি মনে করতেন অদ্বৈত সাধনা যদি ঈশ্বরের সাকাররূপ দর্শনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর না হয়, তাহলে প্রায়শই তার ফল হতাশজনক হয়। ঈশ্বরের সাকার রূপের ধ্যান কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। শাস্ত্রসম্মত উপায়ে সাধনা করলে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের নির্গুণ নিরাকার রূপের অনুভূতি হয়। সাধনার প্রারম্ভে মানুষের মন দীর্ঘ সময় দ্বৈতভাবে থাকে। সেজন্য কোন বস্তুকে মন আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। সাধারণ মানুষের মন এরকমই হয়। তখন সে মৃত্যুর চেয়ে আরও বেশি বেদনা অনুভব করে যখন তার মন কোন বাহ্যিক বস্তু ব্যাতিরেকে অনন্তে মিশে যেতে চায়। এই ধরনের সাধনা তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর। রামকৃষ্ণ লীলাতত্ত্ব এরূপভাবে ব্যাখ্যা করতেন।

এমনকি সাধারণ অবস্থায়ও রামকৃষ্ণানন্দজীর কোন দেহবুদ্ধি থাকত না। তিনি নিজ আত্মার চৈতন্যে ডুবে থাকতেন। একবার তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন মাদ্রাজ পরিদর্শনে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁর পাশের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে ভাইসরয়কে দেখতে যাবে কি না। তিনি না বলায় রামকৃষ্ণানন্দজী বললেন, 'তুমি একদম ঠিক, তুমি কেন সাক্ষাৎ করতে যাবে? তুমি তাঁর থেকেও বড়, এমনকি সম্রাট এডওয়ার্ডের থেকেও। তুমি এই

সাড়ে তিন হাতের দেহ নও। তুমি সেই পরমাত্মা। একবার আমি শুনলাম তিনি মঠের ব্রহ্মচারীদের কাছে 'অষ্টাবক্র সংহিতা' ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করছিলেন ঃ

যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রম্য তিষ্ঠামি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যামি॥

যদিও তিনি ভক্তের চূড়ামণি ছিলেন, তবুও তিনি পরম জ্ঞানী। একবার তিনি বলেছিলেন যে-যোগী সে তাঁর দেহকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে দেখবে। মনে হয় এটি ছিল তার নিজস্ব প্রত্যক্ষানুভূতি, তিনি কয়েকমাস রাজযোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন। একজন আদর্শ কর্মযোগিরূপে তিনি মাদ্রাজে এক নাগাড়ে ১৪ বছর কাজ করেছিলেন। তাঁর গভীর পরিশ্রমের ফল মাদ্রাজ, মহীশূর ও কেরালা রাজ্যে বেদান্তের বহুল প্রচার। যাঁরা এই ভাবান্দোলনের ইতিহাসের সূচনা থেকেই জড়িত, তাঁরা নিশ্চয়ই এই কথার সত্যতা স্বীকার করবেন।

যদিও আমি তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার ও গভীর আধ্যাত্মিকতার অনুধাবনে অসমর্থ, তবুও আমি তাঁর দরিদ্র ও আর্তের প্রতি ভালোবাসার বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। দুটি অনাথ বালকের জন্য তাঁর পরম করুণা এবং তাদের দুঃখ মোচনের প্রচেষ্টাই ছিল অধুনাখ্যাত মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের সূচনা। ধীরে ধীরে এর কার্য প্রসারিত হতে লাগল। মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্থাপন ও শ্রীবৃদ্ধি রামকৃষ্ণানন্দজীর মহত্ত্ব, ত্যাগ ও তপস্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

শেষ সাক্ষাৎকার

সুদীর্ঘ দিনের দৈহিক ও মানসিক শ্রমের জন্য এবং উপযুক্ত খাদ্য ও বিশ্রামের অভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার জন্য পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে কলকাতায় আসতে নির্দেশ দিলেন। তিনি কলকাতায় যাবার কিছুদিন পূর্বে আমার তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার হয়। আমি এই বেদনাদায়ক বিচ্ছেদের কথা জানতাম না। যদিও তাঁর দেহ ছিল দুর্বল তবুও তিনি ছিলেন কল্লোলহীন সমুদ্রের মতো শান্ত। তিনি জগতের ক্ষণিকত্বের কথা বললেন। আমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তাঁর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিলাম।

অনুবাদক ঃ স্বামী দিব্যসুখানন্দ
বেদান্ত কেশরী, জুলাই ১৯৬৬, পৃঃ ১৭১-১৭৪

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের স্মৃতিচারণ

পি. রামলিঙ্গম শাস্ত্রী

শ্রীগুরুং বিবুধং রামকৃষ্ণানন্দেতি কীর্তিতম্।
প্রণমামি দয়াসিন্ধুং বিজ্ঞানানন্দভাস্করম্ ॥
মহাপুরুষসংজ্ঞায় বুদ্ধায়াত্মস্বরূপিণে।
তারকায় শিবানন্দযতীন্দ্রগুরবে নমঃ ॥

যদিও স্বামী শিবানন্দ মহারাজ আমায় পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষা দেন, কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর কাছেই আমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা। তাঁরা দুজনেই আমার গুরু এবং এরকম দুজন মহাপুরুষের আশীর্বাদ লাভ করা আমার বিশেষ সৌভাগ্য। তাঁদের দুজনের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সম্ভবত ১৯০০ সালে আমি প্রথম স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সান্নিধ্যে আসি। সে সময়ে রায়াপুরমে কোন এক ভক্তের বাড়িতে তিনি গীতার ক্লাস নিতেন। বাড়িটি আমার বাড়ির খুব কাছেই। যদিও আমি আঠারো বছরের ছাত্র কিন্তু আমার বেদান্তের প্রতি অনুরাগ ছিল। আমি রামকৃষ্ণ মিশন ও স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় সাফল্যের কথা আগেই শুনেছিলাম। সেই স্বামী বিবেকানন্দের একজন গুরুভাই আমাদের এলাকাতেই শাস্ত্রব্যাখ্যা করছেন শুনে আমি গভীর আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে তার ক্লাস শুনতে গেলাম। তিনি বলেছিলেন, "মাদ্রাজের আইয়াররা মনে করে আমরা বাংলা থেকে প্রচার করতে নতুন ধর্ম এনেছি। তা নয়। আমরা কোন নতুন ধর্ম প্রচার করি না। আমরা হিন্দুকে বলি আরো ভালো হিন্দু হতে, খ্রিস্টানকে আরো ভালো খ্রিস্টান হতে, মুসলমানকে আরো ভালো মুসলমান হতে ও বৌদ্ধকে আরো ভালো বৌদ্ধ হতে। আমরা ধর্মান্তরিত করি না।"

এক সন্ধ্যায় তিনি আমাদের সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এ জগৎ সত্য নয় এর আপেক্ষিক সত্যতা আছে মাত্র। এই জগৎ চেতন ও জড় বস্তুর মিশ্রণ। যেমন জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন-এর মিশ্রণ। জাগ্রত অবস্থায় এই চেতন ও জড় একত্রিত হয় এবং তখন আমরা জগতের অস্তিত্ব অনুভব করি।

সুষুপ্তি অবস্থায় তারা পৃথক হয়ে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে জগতের অস্তিত্ব বিলোপ হয়।

সেই সময়ে তিনি অর্থ স্পর্শ করতেন না। সাধারণত একটি রুমালে তাঁর গাড়িভাড়ার পয়সা বেঁধে দেওয়া হতো। তিনি ঝটকাওয়ালাকে তা দেখাতেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর সে রুমাল থেকে গাড়িভাড়ার পয়সা বের করে নিত।

এর কিছু পরে আমি করণিকের চাকরি পাই। তিনি বললেন—এখন যেহেতু আমি আয় করি, তা থেকে প্রতি মাসে কিছু অর্থ যেন ক্লাসের জন্য খরচ করি। আমি তা পালন করেছিলাম। তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা হবার পর আমি লক্ষ্য করলাম তিনি একজন প্রকৃত আচার্য। তিনি শুধু ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ সত্য শিক্ষা দিবেন না, উপরন্তু যুবকদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর উপদেশগুলি ছিল খুবই সময়োপযোগী ও কার্যকরী। তিনি স্নেহশীল, শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনে ভর্ৎসনা করতে বা রাগভাব দেখাতে ছাড়তেন না। কিন্তু তা ছিল বিরল। একদিন মঠে এই শিশুস্বভাব মহারাজকে প্রচণ্ড রাগতে দেখলাম। মনে হয় কোন মঠবাসী কোন অন্যায় করেছিল এবং তিনি তাঁর দোষ সংশোধন করছিলেন। যদিও আমি বাংলা বুঝতাম না, তবু আমি ভেবে অবাক হচ্ছিলাম যে এমন একজন মহাত্মা এরকমভাবে কথা বলতে ও আচরণ করতে পারে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আমার ভয় ও বিস্ময় দূর করে দিয়ে তিনি আবার সেই পুরানো, কোমল স্বভাব ও মিশুকে মহারাজ হয়ে গেলেন।

জর্জ টাউনের মুথিয়ালপেট হাইস্কুল ও হিন্দু থিওলজিক্যাল হাইস্কুলে তিনি অধ্যাত্মবিষয় ব্যাখ্যা করতেন। মুথিয়ালপেটের ক্লাসে একদিন প্রকৃতি ও তাকে জয় করার সম্পর্কে কথা উঠল। ক্লাসে উপস্থিত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় কঠোরভাবে মন্তব্য করলেন ঃ "প্রকৃতিকে কিরূপে জয় করা সম্ভব? প্রকৃতি হলো স্বতঃস্ফূর্ত।" তৎক্ষণাৎ মহারাজ উত্তর দিলেন ঃ "প্রকৃতিকে পূর্ণ করতে হবে।" আমি বুঝলাম প্রকৃতিকে জয় করার অর্থ তাকে পূর্ণ করা। একবার তাঁর কাছে ঈশ্বরের জ্যামিতিক সংজ্ঞা শুনে আমোদিত হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বর হলো ইউক্লিডিও বিন্দু, যার কোন আকার ও বিস্তার নেই এবং যাকে কোন অংশে ভাগ করা যায় না।" একদিন তাঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "কিভাবে আমরা খারাপ মানুষের সাথে ব্যবহার করব? তিনি

বললেন, "খারাপ মানুষকে ঘৃণা করবে না। তুমি তাকে ভাববে যে সে অজ্ঞানতাবশত বিষপান করেছে। তোমার কি করা উচিত যদি সত্যিই এমন কাউকে তুমি খুঁজে পাও? তুমি তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি ডেকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে চিকিৎসার জন্য।" এরূপ মনজয়কারী মানুষের পক্ষেই একজন দুর্বৃত্ত বা পাপীর সাথে ওরূপ ব্যবহার সম্ভব। আমার মনে পড়ল মহর্ষি পতঞ্জলির শিক্ষা "পাপীর প্রতি উদাসীনতা।" এবং শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, "কামড়াবে না কিন্তু ফোঁস করবে।" যাই হোক, সকলেরই কিন্তু একটাই শিক্ষা—"ঘৃণা পরিহার করবে।" মহারাজের প্রিয় উক্তি ছিল—"ঘৃণাকে ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারাই তা সম্ভব।" থিয়োলজিক্যাল হাইস্কুলে একবার তিনি বলেছিলেন, "ভক্তকে তার চোখের সাহায্যে পার্থক্য করা যায়। ভ্রূযুগলের মধ্যে (ধ্যানের দ্বারা) ঈশ্বর উপলব্ধি সম্ভব। যাঁরা ঈশ্বরলাভ করেছেন তাঁরা বলেন ভ্রূমণ্ডলেই ভগবান দর্শন সম্ভব।"

অনেকবারই আমি লক্ষ্য করেছি তাঁর অদ্ভুত চোখের চাহনি। মনে হতো যেন তিনি সবেমাত্র গভীর ঘুম থেকে উঠে এসেছেন। নিশ্চিতভাবেই তা সাধারণ লোকের ঘুমের মতো ছিল না। সেটা ছিল 'যোগনিদ্রা' যা গভীর ঈশ্বর পরায়ণতা বা ঈশ্বর সান্নিধ্যের ফল। সাধারণত তাঁর হাসি ও কথাবার্তা ছিল নিষ্পাপ শিশুর মতো।

একবার শিবরাত্রির দিন আমি তাঁর সাথে ছিলাম, তখন তিনি 'ক্যাসল কার্নন'-এর বাইরের ঘরে থাকতেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আমি সেদিন সেখানে থাকব কিনা। আমি উত্তর দিলাম, "যদি আপনার অসুবিধা না হয়।" তিনি উত্তর দিলেন, "আমার কোন অসুবিধা হবে না। তোমার যদি কোন অসুবিধা না থাকে তুমি থাকতে পার।" আমি রয়ে গেলাম ও সারাদিন উপোস করলাম। তিনি খোঁজ নিলেন—আমি উপোস করতে অভ্যস্ত কিনা? কেননা অভ্যাস না থাকলে তা আমার স্বাস্থ্যের হানি হবে। আমি বললাম যে আমার উপোসের অভ্যাস আছে এবং আমরা দুজনেই সন্ধ্যা পর্যন্ত উপোস রইলাম। রাত্রে আর উপোস করে থাকি নি। রাত্রে পূজার পর অন্য দিনের মতোই প্রসাদ পেলাম। আমার কাছে ওই দিনটি স্মরণীয়, কারণ ঐ দিন বিকালে তিনি কৃপা করে একটু ব্যক্তিগত সেবার সুযোগ দিয়েছিলেন, আমি তাঁর গা টিপে দিয়েছিলাম।

রাত্রে শ্রীআলাসিঙ্গা পেরুমল মহারাজকে দেখতে এলেন। মহারাজ তাকে

কিছু বললেন। কি বললেন তা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। আমি ছোলা খাচ্ছিলাম যা খোসা ছাড়িয়ে বাচ্চাদের মতো দিচ্ছিলেন। শুনলাম—মহারাজ আলাসিঙ্গাকে বলছেন, "অপেক্ষা কর। তোমার সন্তান আছে"। সম্ভবত শ্রীআলাসিঙ্গা সন্ন্যাস নিতে চাইছিলেন। আর মহারাজ তাকে বারণ করছিলেন। রাত্রে ওখানেই ঘুমালাম। পরদিন মহারাজ ভোরবেলায় উঠলেন। আমি তখনও বিছানায় শুয়ে। তারপর তিনি 'ভগবদ্গীতা' পাঠ করতে আরম্ভ করলেন।

অন্যান্য মহান আচার্যদের মতোই তিনিও ভক্তিমার্গের গুণগ্রাহী ছিলেন। "আমরা এক বিষয়ে তত্ত্ব আলোচনা করি কিন্তু অনুসরণ করি অন্য পথ।" তিনি বলতেন, আমরা দার্শনিক আলোচনা করি বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করা ও আকর্ষণের জন্য। কিন্তু মুক্তির উপায় হিসাবে আমরা সকলেই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করি। সারা জীবনের দার্শনিক আলোচনা ও ভক্তি প্রকৃত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতেই পরিণতি লাভ করে। নিশ্চিতভাবেই প্রেম, শরণাগতি, প্রার্থনা ও ধ্যানের পথই সবচেয়ে সহজ, নিরাপদ ও শ্রেষ্ঠ পথ যা শাশ্বত শান্তি ও আনন্দধামে পৌঁছে দেয়। আবার ভক্তির সংজ্ঞা সম্পর্কে মতভেদ আছে। "দার্শনিকরা অর্থাৎ যারা জ্ঞানমার্গী তাঁরা শ্রীশঙ্করাচার্যের মতানুসারে বলেন মুক্তিলাভের সমস্ত উপায়ের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ" এবং 'নিজ চেতনার উন্মেষ' বা 'আধ্যাত্মিক জাগরণ'ই হলো ভক্তি—'স্বস্বরূপানুসন্ধানম্'।

মোক্ষসাধনসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥

এখানেই জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সমন্বয়সাধন সম্ভব যেখানে দুটি পথই মিলিত হয়।

ছাত্রদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। তাড়াহুড়ো করা বা আত্মপ্রসাদ লাভ করে থেমে যাওয়া নয়—ক্রমোন্নতি—এই ছিল ছাত্রদের প্রতি তাঁর উপদেশ। "তুমি বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নত হতে চেষ্টা কর।"—সাধকজীবনের এটাই মূল সত্য।

আমার গৃহস্থ জীবন সম্পর্কে আমি মাঝেমাঝেই তাঁর কাছে অনুযোগ জানাতাম। তিনি আমার কথা কানেই নিতেন না। অপরদিকে আমায় এই বলে উৎসাহ দিতেন—"অবতাররা বিবাহিত জীবনযাপন করেছেন"—কথাটা সত্যি!

একবার তিনি বলেছিলেন, কারও জন্য গৃহী জীবন, কারও জন্য সন্ন্যাসের, কারোর বা চোর হওয়া—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আবার এটা কত সত্য নিজে সন্ন্যাসী হয়েও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাননি। তিনি বলতেন, "যদি সন্ন্যাসীদের মধ্যে ত্রিশ শতাংশ ভালো হয়, তাহলে সত্তর শতাংশই মন্দ। আর গৃহীদের মধ্যে যদি ত্রিশ শতাংশ মন্দ তাহলে সত্তর শতাংশই ভালো।" (আমার শতকরা সংখ্যা ঠিক মনে নেই কিন্তু এরকমই কিছু তিনি বলেছিলেন। বেশি অংশ ও কম অংশ তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন।)

আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম "গুরু কিভাবে পাব?" এটা আমার অজ্ঞতারই পরিচয় এবং এখন লজ্জা হয় যে সে সময় আমি যে ব্যক্তির সামনে বসেছিলাম, তাঁর মহত্ত্ব সম্পর্কে আমি কোন ধারণাই করতে পারিনি। নিরাশভাবে শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, "ঠিক সময়ে তুমি পাবে", আমি তাঁকে বন্ধু ও আমার সমকক্ষ বলেই মনে করতাম। কারণ তিনিও সেভাবেই আমার সঙ্গে সর্বদা মিশতেন। একদিন মঠের অধ্যক্ষের আসনে বসে টেবিলের উপর রেখে খবরের কাগজ পড়ছি। তিনি সে সময় বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে আমায় সেভাবে দেখে শান্তভাবে বললেন, "অধ্যক্ষের আসনে তোমার বসা ঠিক হয়নি। বেশি সময় ধরে খবরের কাগজ পড়বে না। ওখানে উত্তেজক খবর থাকে। আমাদের গুরুমহারাজ আগে ওগুলো সরিয়ে দিতে বলতেন ও সেখানে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতে বলতেন, বড়জোড় ১৫ থেকে ২০ মিনিট তুমি তা পড়তে পার।"

যদিও আমি তাঁর প্রায় কিছুই সেবা করতে পারিনি, কিন্তু তিনি কখনো আমায় অবহেলা করেননি। যদি কখনো কিছু কড়া কথা বলতেন, তা স্নেহ থেকেই বলতেন। এ থেকেই বোঝা যায় তাঁর সান্নিধ্যে আসা যুবকদের সম্পর্কে তিনি কত যত্ন নিতেন ও আগ্রহ দেখাতেন। তিনি আমার বয়স ও পদমর্যাদার ধার ধারতেন না। তিনি আমার শ্রদ্ধা দেখতেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ ভালোবাসা আমি গভীরভাবে অনুভব করতাম। খাবার সময় তিনি আমাকে পাশে বসাতেন। তিনি আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছে আমাকে তাঁর শিষ্য বলে এবং সিস্টার দেবমাতার কাছে 'ভালো ছেলে' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন।

আমি যখন তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখবার আগ্রহের কথা জানালাম তিনি আমাকে রামায়ণ পড়াবেন বলেছিলেন। কারণ তা হবে আমার মনের আহার ও ঔষধের খোরাক। (যদিও আমি তা কোনদিনই স্থাপন করতে পারিনি)। তীর্থদর্শনে রামেশ্বর যাবার আগে তাঁর কাছে গেলে তিনি কিছু মূল্যবান উপদেশ

দিয়েছিলেন। একদিন সকালে তরকারি কাটার সময় (তিনি নিজেও তরকারি কাটতেন রান্নাঘরের কাজের সুবিধা হবে বলে) তিনি শ্রীদুর্গা সপ্তশতী (শ্রীশ্রী চণ্ডী) থেকে কয়েকটি সুন্দর শ্লোক আমায় বলেছিলেন।

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

বারংবার প্রণাম জানাই দেবীকে, যিনি সকলের মধ্যে বিষ্ণুমায়া নামে পরিচিতা। বারংবার প্রণাম জানাই দেবীকে, যিনি সকলের মধ্যে মাতৃরূপে অধিষ্ঠিতা। বারংবার প্রণাম জানাই দেবীকে, যিনি সকলের মধ্যে দয়ারূপে অধিষ্ঠিতা। বারংবার প্রণাম জানাই দেবীকে, যিনি সকলের মধ্যে নিদ্রারূপে অধিষ্ঠিতা।

একবার তিনি আমায় উপদেশ দিলেন, "মল্লিপু হও।" এটা আমি মনে করি, এটি আমার কাছে মন্ত্রের মতো। যুঁই ফুলকে নোংরা জায়গাতে রাখলেও যেমন তার সুগন্ধ হারিয়ে যায় না, তেমনি আমাকে তিনি এই সংসারের দুষ্ট ও অবাঞ্ছিত লোকেদের মধ্যে সেভাবে থাকতে বলেছিলেন। সুতরাং "মল্লিপু" হওয়া হলো আদর্শ যা আমি খুবই প্রশংসা করি, যদিও সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো আমার কাছে অত্যন্ত উচ্চ আদর্শ, "ক্ষমা, সহ্যগুণ ও মন্দের ভালো ব্যবহার", প্রভৃতি গুণগুলির প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন। ক্ষমা করা সহজ নয়। ক্ষমা সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা তপস্যা, শুদ্ধতা ও দেবত্ব।

ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্যং ক্ষমা ভূতং চ ভাবি চ।
ক্ষমা তপঃ ক্ষমা শৌচং ক্ষময়েদং ধৃতং জগৎ ॥

যাইহোক আমার শুভ ইচ্ছা যে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় আমি মহারাজের বলা ফুলের মতোই হয়ে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারি।

দশবছরের মধ্যে দুবার তিনি আমায় শাসন করেছিলেন। ১৯০১ সালের

এক সন্ধ্যায় আমি ক্যাসল কার্নানে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে সমুদ্রতীর ধরে ট্রিপ্লিকেন পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলাম। যখন তিনি শুনলেন যে আমি পড়াশুনায় অবহেলা করে এভাবে সময় নষ্ট করেছি, তখন তিনি আমায় তিরস্কার করেছিলেন। তিনি বেশ কড়াভাবেই বললেন পরীক্ষার পড়ার সময় নষ্ট করে তাঁর কাছে যাবার আমার দরকার নেই। তারপর অনেকদিন আমি তাঁর কাছে ভয়ে যাইনি। কিন্তু যাবার জন্য আকর্ষণ ছিলই। একদিন ভয় ও শঙ্কা নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু যখন দেখা হলো তিনি আমাকে এমনভাবে গ্রহণ করলেন যে আমার আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রইল না। আগের ঘটনার কোনও উল্লেখই তিনি করলেন না। এরপর থেকে আবার আগের মতোই তাঁর সাথে দেখা করতে যেতাম।

আবার ১৯১১ সালে শ্রীশ্রীমায়ের সাথে তিনি রামেশ্বর থেকে ফিরে আসার পর আমি দেখা করতে গেলাম। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে আমি মহারাজের কাছে গিয়ে আমার মানসিক অশান্তির কথা জানালাম। আমার সহযোগীরা বলতেন আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি তো হচ্ছেই না বরং তা অবনতির পথে। আমার ঐ চাকরি পছন্দ ছিল না। ঐ কাজ ব্রাহ্মণের উপযোগী নয় বলেই আমার মনে হতো। আমি চেয়েছিলাম ঐ চাকরি ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারি পড়ব এবং পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ডাক্তার হিসেবে যোগ দিয়ে সাধু ও গরিব দুঃস্থদের সেবা করব। মহারাজ কিন্তু সঙ্গদোষেই আমার মনের এই অবস্থা একথার উল্লেখ করে কঠোর স্বরে বললেন, "কে বলল তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে না? তুমি নিজেই নিজের বিচারক হতে পার না। করণিকের চাকরি কোন হীনবৃত্তি নয়। সরকারি অফিসে অনেক ব্রাহ্মণ কেরানির চাকরি করেন। নাগ মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যখন শুনলেন ডাক্তারের পেশা ভক্তের জন্য নয় তখনই ডাক্তারির বাক্স গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়েছিলেন। মিশন সম্পর্কে খবরের কাগজে যা কিছু পড়েছ তা শূন্যগর্ভ, থুঃ থুঃ—(তিনি বাস্তবিকই থুথু ফেললেন)। রামকৃষ্ণকে কি রামকৃষ্ণ মিশন তৈরি করেছিলেন? যখন তুমি চাইবে তখন ভগবান নিশ্চয়ই তোমায় অর্থ দেবেন।" শেষের এই কথাগুলি বলে তিনি আমায় আশীর্বাদ করলেন। আমি প্রণাম করে বিদায় নিলাম। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমি তাঁর কথামতো নিজেকে সংশোধন করেছিলাম ও পরবর্তী কালে তার সুফল পেয়েছিলাম।

এর কয়েক মাস পরে হঠাৎ এক সন্ধ্যায় খবরের কাগজে তাঁর তিরোধানের

সংবাদ পেয়ে দুঃখিত হলাম। আমি সাথে সাথেই বাড়ি গিয়ে স্নান করে গুরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন হিসাবে জপ ও আরাধনা করলাম।

সে সত্যিই ভাগ্যবান যে কোন মহাত্মাকে আধ্যাত্মিক জীবনে গুরু হিসেবে পায়। সেও ধন্য যে ভালোবাসার মতো কোন সঙ্গী পায়, মানবিকতা বিকাশের প্রথম শর্ত হলো, "এমন কিছু পাওয়া যাকে ভালোবাসা যায়।" দ্বিতীয় শর্ত হলো, "এমন কিছুর সান্নিধ্যে আসা যাকে শ্রদ্ধা করা যায়।" ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা, মানবিকতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[অনুবাদক ঃ স্বামী বিমলাত্মানন্দ
বেদান্ত কেশরী, আগস্ট ১৯৫৪, পৃঃ ৮৫-৮৯]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অনুস্মরণ

এস. রাজম. আইয়ার*

মাদ্রাজে স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত প্রথম সন্ন্যাসী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্ভবত ১৯০৪ সালে সইদাপেট-এর কর্নীস্বরার কয়েল স্ট্রিটের একতলার একটি ঘরে গীতার ক্লাস নিতেন। বাড়িটি ছিল স্থানীয় উকিল শ্রীভেঙ্কটাচার মহাশয়ের। তিনি অত্যন্ত আগ্রহে এই ক্লাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি সে সময়ে শ্রীভেঙ্কটাচার-এর বাড়ি থেকে প্রায় দুই ফার্লং দূরে বাস করতাম। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ থাকতেন ট্রিপ্লিকেনের 'ক্যাসল কার্নানে'। সেখান থেকে প্রত্যেক বুধবারের সন্ধ্যায় ঝটকা গাড়িতে করে তিনি গীতা ক্লাস নিতে আসতেন। ক্লাসে উপস্থিতির সংখ্যা কখনো ২০ জনের বেশি হতো না। তাঁর ক্লাস নেবার রীতি ছিল—প্রথমে তিনি সংস্কৃততে গীতার শ্লোকটি পড়তেন। তারপর ইংরেজিতে শ্লোকটির আক্ষরিক অনুবাদ করতেন। শেষে শ্লোকটির অন্তর্নিহিত ও গূঢ় অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। যদি কিছু জটিল তত্ত্ব ও প্রসঙ্গ থাকত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উক্তি দিয়ে তা ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো পুরো গীতাটা এইভাবে পাঠ হবার পর তিনি সংক্ষেপে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি মতধারার পারস্পরিক বিভিন্নতা ও কিভাবে এই মতগুলির সমন্বয় হবে তা আলোচনা করবেন। দুর্ভাগ্যবশত সইদাপেট-এর জেলাশাসকের দপ্তর থেকে আমার বেলারীতে বদলি হওয়ায় সেই শেষের ক্লাসগুলিতে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। সাধারণত প্রতি ক্লাসের শেষেই তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতো, আর তিনি যথার্থ ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেন। ক্লাসে আসার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুব নিয়মিত ও নিয়মনিষ্ঠ। কখনো খারাপ আবহাওয়ার জন্য আমরা কেউ হয়তো ভাবতাম যে আজ তিনি আসবেন না বা দেরিতে আসবেন; কিন্তু তিনি ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হতেন। সাধারণত কোন ভক্ত ট্রিপ্লিকেন থেকে সইদাপেট এই যাতায়াতের পথটুকু তাঁর সাথে থাকতেন ও তিনিই গাড়ির ব্যবস্থা করতেন। এই ঝটকা গাড়ি ভাড়া আমরা দিতাম। একবার আমি 'ক্যাসল কার্নান'-এ তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত সে সময় তিনি অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। আমাদের সকলের জন্যই তাঁর একইরকম স্নেহ ও ভালোবাসার জন্য আমরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতাম ও খুব ভালোবাসতাম।

অনুবাদক ঃ স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[বেদান্ত কেশরী, আগস্ট, ১৯৫৪, পৃঃ ১২০]

---

* রাজম আইয়ার (১৮৭২-১৮৯৮) ছিলেন স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক (১৮৯৬-১৮৯৮)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উপদেশ

বি. ভেঙ্কঁন্না

[ভেঙ্কঁন্না স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পুণ্য দর্শন লাভ করেছিলেন ১৯০৮ সনে 'ক্যাসল কার্নানে'। রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে আলোচনায় তাঁর মনের সব সন্দেহ দূর হয়েছিল। যদিও শশী মহারাজের ক্লাসে যেতে পারতেন না, সেজন্য অনেক ঘটনা তাঁর অজানা। তবে রামকৃষ্ণানন্দের প্রকাশিত পুস্তক পড়েছেন। ১৯১০ সালে ব্যাঙ্গালোরের বাসুবানগুড়িতে রামকৃষ্ণ আশ্রমে ভেঙ্কঁন্না রামকৃষ্ণানন্দজীকে এক ঘণ্টা ধরে ইন্টারভিউ করেছিলেন। এইটি ছিল তার সঙ্গে ভেঙ্কঁন্নার শেষ সাক্ষাৎকার। সে সময়ে রামকৃষ্ণানন্দজীর শরীর বেশ খারাপ—প্রচণ্ড কাশিতে ভুগছিলেন—যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। তবু তিনি ভেঙ্কঁন্নার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। ভেঙ্কঁন্না স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর উপদেশ সংগ্রহ করেছিলেন। এগুলি মাদ্রাজ মঠ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তারই অনুবাদ দেওয়া হলো]

১। ঈশ্বরকে সর্বোচ্চ মনে কর এবং তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর।

২। প্রত্যেকদিন ঈশ্বর উপাসনা অভ্যাস কর।

৩। সকলকে ভালোবাস, সকলকে শিক্ষা দাও এবং জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, দেশ নির্বিশেষে সকলকে সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে যাও অর্থাৎ সকলকে ঈশ্বর দর্শনে সাহায্য কর।

৪। অন্যের কাছ থেকে আঘাত পেলে ক্ষমা কর ও ভুলে যাও।

৫। যে যেখানে আছে সেখান থেকে তাদের জাগতিক, আধ্যাত্মিক, দারিদ্রতা ও অজ্ঞতার দোষ না দিয়ে সাহায্য কর। যতক্ষণ না সেখান থেকে কেউ জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি ও আনন্দ না পায় অর্থাৎ যতক্ষণ না কেউ সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ না করে, তাদের সকলকে সাহায্য কর।

৬। সর্বরকম সুবিধার নাশ হোক। একমাত্র ভক্তি ও প্রেমের সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে মানব জাতির সেবা কর।

৭। বেদান্তে নিহিত সর্বোচ্চ সত্য অনুসারে কেউ কারুর চেয়ে বড় নয়। কারণ সকলের মধ্যে এক ঈশ্বর বিরাজমান। সুতরাং কাউকে ঘৃণা করো না।

৮। শিক্ষা ও ধর্ম প্রত্যেককে তাঁর অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণতা দেবত্ব প্রকাশে সাহায্য করে। এটি জন্মগত অধিকার।

৯। মানুষে-মানুষে পার্থক্য একপ্রকার নয়—প্রকাশের তারতম্য আছে। কারুর মধ্যে অন্যের চেয়ে দেবত্ব বেশি প্রকাশিত এবং পবিত্রতম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মানুষই মানুষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সর্বদা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করেন, ঈশ্বরে সর্বদা মগ্ন থাকেন। তাঁরা তাঁদের দেহ-মন-অহঙ্কার সব ভুলে যান। এরূপ মহাত্মা যখন ধরাধামে আসেন তখন তাঁরা আধ্যাত্মিক সত্য শিক্ষা দেন। সেইসঙ্গে যখনই তাঁরা ইচ্ছা করেন ঈশ্বরে ডুবে থাকেন, এমনকি তাঁরা স্বপ্নেও ঈশ্বরকে ভোলেন না। এরূপ মানুষ জগতের সার—বাইবেলে আছে। জগতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে ঈশ্বর সেরূপ মানুষ পাঠান। সুতরাং কারুর ভয় করার প্রয়োজন নেই যে ঈশ্বর আমাদের ভুলে যান।

১০। প্রহ্লাদের মতো যদি আমরা একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাহলে ভগবান আমাদের কাছে আবির্ভূত হবেন।

১১। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সদা করুণাময় এবং আমাদের প্রত্যেককে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমাদের দোষ যে আমরা তাঁকে ভুলে যাই—আমরা শুধুমাত্র জাগতিক সুখ ভালোবাসি।

১২। আমরা কখনও একসঙ্গে ঈশ্বর ও সংসার ভালোবাসতে পারি না। তাঁকে দর্শন করার চেষ্টা কর।

১৩। প্রকৃত জ্ঞানী ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। প্রকৃত ভক্ত কিন্তু ঈশ্বরে সদা মগ্ন থাকেন।

১৪। প্রত্যেকেরই প্রথমে ঈশ্বর দর্শন করা উচিত। নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর। ভগবান বুদ্ধের মতো জগতের কল্যাণ করে অধিকতর সুখ অনুভব (কর)।

১৫। জন্ম হওয়া খুব ভালো; কিন্তু নিজে শাশ্বত শান্তি দিতে পারে না।

১৬। মহাপুরুষ বা সর্বজ্ঞ সন্তদের একমাত্র নিঃস্বার্থ ভক্তি ও সেবার দ্বারা শাশ্বত শান্তি পাওয়া যায়।

১৭। অপরের কল্যাণ কর ও নিজে ভালো হও এবং এভাবে সর্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হবে।

১৮। মন্দ প্রকৃতপক্ষে ভালো। কারণ মন্দ ব্যতীত আমরা একে অতিক্রম করার উপায় চিন্তা করতে পারি না। কারণ আমাদের অধিকাংশ জ্ঞানে মন্দ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা এবং মন্দ দূর করবার উপায়ও বলা হয়েছে। মন্দ থাকার অর্থ আমাদের জ্ঞানের পরিধির বৃদ্ধি পাওয়া। মন্দ ব্যতিরেকে কোন উন্নতি হয় না, কোন সভ্যতা থাকতে পারে না। সর্বোচ্চ জ্ঞান ও উপলব্ধির প্রয়োজন হয় মন্দের সম্মুখীন হওয়ার জন্য এবং তা ভালোভাবে অতিক্রম করা। এভাবে মন্দ আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি। সুতরাং মন্দ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করি না, বরং আমরা কৃতজ্ঞ।

১৯। ভালো-মন্দ যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ হয়। একজন ভালো এ্যাথলিটের ঘি খাওয়া ভালো; কিন্তু একই পরিমাণ কোন টাইফয়েড রোগীর ঘি খাওয়া তার মৃত্যুর কারণ হয়। প্রকৃতপক্ষে ভালো মন্দ বলে কিছু নেই। এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে অবস্থার উপর।

২০। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে মন্দ হলো আমাদের আসক্তিযুক্ত কর্মের ফল। যদি আমরা অনাসক্তভাবে কর্ম করি তাহলে আমাদের দুঃখ ভুগতে হয় না। জগতে যতটা পার ভালো কর, কিন্তু আসক্ত হয়ো না। কোনরকম নিজের লাভের আশা করো না। সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থপর হও। এই হলো শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

২১। নিরন্তর দুঃখ ও কষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরদর্শন হয়। সুতরাং আমাদের কোনভাবে দুঃখকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। বরং দুঃখকে আসতে দাও। এতে আমাদের সহ্য ও প্রতিরোধের অনন্ত শক্তি প্রকাশিত হবে।

২২। অমৃতত্ব একমাত্র ত্যাগের পথে আসে, কখনও কর্ম, ধন ও সম্পদের মাধ্যমে নয়। সুতরাং জাগতিক সম্পদ বা স্বর্গীয় সুখ শাশ্বত জীবন, জ্ঞান ও আনন্দ দেয় না। যা ক্ষণভঙ্গুর তাই আমাদের ত্যাগ করা এবং চব্বিশঘণ্টার মধ্যে অবিরাম ঈশ্বর-চিন্তা করা উচিত। তখনই ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের সচ্চিদানন্দ অবস্থা বা শাশ্বত জীবন জ্ঞান ও আনন্দ দেবেন।

২৩। ভগবানকে সন্তুষ্ট করা বড় কঠিন। তাঁদের প্রতি ভগবান সন্তুষ্ট হবেন যাঁদের মধ্যে পবিত্রতা, নম্রতা ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বিশেষ প্রকাশ

ঘটে। তিনি প্রত্যেক সাধককে কৃপা ও দয়ার জন্য পরীক্ষা করেন তাঁর উপর দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে। অবশেষে তাঁদের কৃপা করেন যাঁদের অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় ও তাঁর ইচ্ছার প্রতি একান্ত আনুগত্য থাকে। এইটিই হলো ভগবানের খেলা—এজন্য তাঁকে দোষারোপ করা যায় না। আমরা যিশু খ্রিস্টের মতো বলতে পারি "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

২৪। মনের মধ্যে ভালো মন্দ উভয়ই থাকে—বাইরের জগতে নয়। সুতরাং যদি আমরা ইচ্ছা করি মন্দ বা ভালোকে নির্মূল করব—তা কিন্তু অসম্ভব। সেজন্য ভালো মন্দ উভয়কেই নাশ করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের মনকে জয় করতে হবে। তবেই আমরা আমাদের আনন্দময় প্রকৃত অনন্ত সত্তার শাশ্বত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হব। এটি বেদান্ত মত।

২৫। আমাদের মধ্যে অহংকারই সবচেয়ে বেশি ভয়ানক। সাংঘাতিক শয়তান। আমাদের উপর ঈশ্বরকৃপা না হলে শয়তানকে জয় করা যাবে না। আর আমাদের মধ্যে শয়তানকে শায়েস্তা না করলে আমরা ভগবান লাভ করতে পারব না। কারণ আমাদের মধ্যে আছে কাম, স্বার্থপরতা ও পশুত্ব। যে মুহূর্তে পশুত্ব নাশ হয়, সে মুহূর্তেই আমাদের ঈশ্বর দর্শন হয়।

২৬। কোন মানুষই সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হতে পারে না, যদি না সে অপরের জন্য বাঁচে, যদি না সে সব কিছু জানে, যদি না সে চিরকালের জন্য সুখী হয়। একজন উপলব্ধিবান যোগীর অধীনে থেকে রাজযোগ অভ্যাস করলে এই অবস্থা সকলেই পেতে পারে।

২৭। ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন যে নির্বাণ হলো সব দুঃখের নিবৃত্তি এবং সকলেই উচ্চ জ্ঞানের দ্বারা এই অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে। জ্ঞান ব্যতীত মন্দকে নাশ করা যায় না। সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের অতি অবশ্যই অভ্যাস করতে হবে। সর্ব জীব ও মানুষের প্রতি ভালো হও ও ভালো কর।

২৮। জ্ঞানীরা বলেন—কায়িক, মানসিক ও বাচিক অহিংসাই সর্বোচ্চ পথে নিয়ে যায়।

অনুবাদক ঃ স্বামী বিমলাত্মানন্দ

বেদান্ত কেশরী, এপ্রিল, ১৯২৯, পৃঃ ৪৫৫-৪৬০

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—সন্ন্যাসী ও আচার্য

সিস্টার দেবমাতা

(১)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের যথার্থ জীবনালেখ্য আমার "Days in an Indian Monastery" এবং আমার পরবর্তী পুস্তক "Sri Ramakrishna and His Disciple" বই-এ দিয়েছি। কিন্তু ঐ জীবন চিত্র শুধু প্রধান প্রধান ঘটনা থেকেই নেওয়া হয়েছে। কতকগুলি ঘটনা বাদ দেওয়া হয়েছে যেগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

যেহেতু যত দিন যাচ্ছে এবং জ্বলন্ত ঘটনাগুলি স্মৃতিপটে ক্ষীণ হয়ে আসছে ততই প্রতিটি পরিত্যক্ত ঘটনাই যেন নতুনভাবে প্রতিভাত হচ্ছে এবং লিখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। এ কারণেই এই বিলম্বিত স্মৃতিচারণের পুনঃ প্রকাশ। মাঠ থেকে প্রধান ফসল তুলে নেওয়ার পর ইতস্তত পড়ে থাকা শস্যকণা যেন কুড়াচ্ছি।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে আমার স্মৃতি ভারতবর্ষে আমার সবচেয়ে মূল্যবান স্মৃতিগুচ্ছের মধ্যে অন্যতম। যে ধর্মসঙ্ঘে আমরা দুজনেই সদস্য—তিনি আমার চেয়ে সর্বতোভাবে জ্যেষ্ঠ। সে সম্পর্ক ছাড়া আমাদের দুজনের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব ছিল—এই বন্ধুত্ব ছিল গভীর শ্রদ্ধাযুক্ত। তিনি ছিলেন আমার কাছে মায়ের মতো, যিনি সদাই ছিলেন আমার কল্যাণকামী। তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তাভাবনায় আমি ছিলাম অংশীদার। তাঁর পুণ্যসঙ্গের ফলে আমি লাভ করেছিলাম দৃঢ় বিশ্বাস। একবার এক ঘটনাচক্রে যখন তাঁর নামের একটি পত্র আমাকে বাধ্য হয়ে পড়তে হয়েছিল এবং আমার এহেন আচরণের কারণ আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি তখন তিনি উত্তর দেন ঃ "তুমি আমার সকল চিঠিই পড়বে। তোমার কাছ থেকে গোপন করবার আমার কিছুই নাই।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভু গৌরাঙ্গের কথাই মনে পড়ে, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।" ঘাসের চেয়ে নমনীয় হও, ভূমার মতো সহ্য কর। সম্মানের প্রতি লালায়িত হয়ো না, কিন্তু সকলকে সম্মান দাও। ভক্তি ব্যতীত

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের চারিত্রিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করা যায় না। তাঁর আচরণে প্রকাশ পেত আভিজাত্য। এজন্য তাঁকে অনেকে উদ্ধত বলে ভাবতেন। কিন্তু বস্তুত তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। নম্রতা ছিল তাঁর সহজাত গুণ। একেবারে অহংকার শূন্য বললে ঠিক বলা হয় না। এটি ছিল সম্পূর্ণ শরণাগতি। শ্রীশ্রী ঠাকুর ছাড়া আর কিছুই তাঁর মনে স্থান পেত না। সেন্ট পল তাঁর গ্যালাশিয়ানদের প্রতি চিঠিতে লেখেন ঃ "তবুও আমি নয়, খ্রিস্টই আছেন আমার সঙ্গে।" এই উক্তিটি গুরু ও ইষ্টের প্রতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ভাবটি সঠিকভাবে প্রকাশ করে। তাঁর জীবন ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণময়।

তাঁর আগমন-গমন, আহার-নিদ্রা, কর্ম, শিক্ষা প্রদান—তাঁর সমগ্র জীবন সর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা অনুসারেই পরিচালিত হতো—কখনোই তাঁর নিজ ইচ্ছা বা সুবিধার জন্য নয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আইস হাউসের ঠাকুর ঘর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে নতুন মঠে গাড়িতে আসছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে নতুন মঠের ঠাকুর ঘরে আসবার সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। সে সময়ে তিনি নিজের বুকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আঁকড়ে ধরে থেকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করছিলেন। ঐ সময়ে যাঁরা এই অপরূপ দৃশ্য দেখেছেন তাঁরা সবাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তাঁর নিজ গুরুর প্রতি ভক্তি প্রেমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। সেন্ট পল যেমন তাঁর প্রভুর সম্পর্কে বলেছিলেন, ঠিক তেমনই রামকৃষ্ণানন্দজী বলতে পারতেন "রক্ত মাংসের এই শরীরে এখন আমি যে জীবন ধারণ করছি, ঈশ্বর তনয়ে আমিও একই বিশ্বাসে বাস করি।"

তাঁর এই অনুভব তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন ঃ যদি আমরা একটা গোলকধাঁধায় আটকা পড়ি এবং কেউ এসে বলে, "আমি তোমায় বাইরে যাবার পথ দেখাতে পারি।" তাহলে আমরা কি করি? তাঁকে আমরা অনুসরণ করি। তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা বোধকেই পূজা ও ভক্তি বলি। ইনিই গুরু এবং তাঁকে আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে অনুসরণ করব, যদি আমরা সেই গোলকধাঁধা থেকে বেরোতে চাই। কখনও আমরা আবার নিজেরাই চিন্তা করি কেন আমি তাঁকে অনুসরণ করবো? আমার পথ আমি নিজেই খুঁজে নেব। আমরা আমাদের নিজেদের মতো চলি। কিন্তু তিনি সর্বদা এতই ধৈর্যশীল ও প্রেমিক যে যতক্ষণ না আমরা একাকী নিজেদের পথ খুঁজতে গিয়ে ক্লান্ত না হয়ে পড়ি এবং তাঁর কাছে ফিরে না আসি ততক্ষণ তিনি অপেক্ষা করে থাকেন।

মায়লাপুর মঠে এক সন্ধ্যাকালীন আসরে তিনি বলেন ঃ "গুরু তাঁর কাজটি

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে করেন। কয়েকটি মাত্র সামান্য শব্দের দ্বারা গুরু জীবনকে এক নতুন পথে চালিত করেন—ঠিক যেমন যখন এক ব্যক্তি সাইকেল চালিয়ে রাস্তা দিয়ে যান এবং অন্য কোন ব্যক্তি দেখেন যে সাইকেল আরোহীর পথে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি তাঁকে অন্যদিকে যেতে বলেন। আরোহী পূর্বেরই মতো সাইকেল চালাতে থাকেন, কিন্তু এখন তাঁর গতি বিপদের দিকে না হয়ে উল্টোদিকে হয়। এরূপে গুরু দেখেন যে শিষ্যের চলার পথটি বিপদসঙ্কুল এবং তিনি বিপদ থেকে রক্ষা করেন। শিষ্যের সকল কাজ ও আচরণ আগের মতোই থাকে, কিন্তু তার গতিবিধি হয় বিপন্মুক্ত পথে। গুরুর কাজ হলো শিষ্যকে সঠিক পথে চালিত করা।”

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শিষ্য-সত্তা এত প্রবল ছিল যে তিনি গুরুর ভূমিকা পালনে অসমর্থ ছিলেন। তাঁর অনেক অনুগামী ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনোই তাদেরকে শিষ্য বলে সম্বোধন করতেন না। বা সেরকম চিন্তাও করতেন না। এমনকি ইচ্ছা প্রকাশও করতেন না।

কারুর বিফলতা বা ভুলের জন্য তিনি উৎসাহ ও আদেশ প্রদান করতেন ও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে তা বিচার করতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেকে নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করবে এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেবে। তাঁর সাথে যাঁরা থাকতেন তাঁদের জন্য তিনি এক অতি উচ্চমান নির্ধারণ করে দিতেন। তিনি চাইতেন—তারা প্রকৃত মানুষের মতো সমস্যার সম্মুখীন হবে—কোন অভিযোগ বা নালিশ নয়, তিরস্কৃত হলে কোন প্রত্যাঘাত নয় কোনরূপ অলসতা বা দুর্বলতা নয় এবং কখনোই সংগ্রাম পরিত্যাগ করবে না। “যতক্ষণ মানুষ সংগ্রাম করে, ততক্ষণ সে বীর”—এই ছিল তাঁর নিজের কথা।

“সর্বোপরি, তাঁর কাছে অহংকার ও স্বার্থপরতার কোন স্থান ছিল না। তাঁর আধ্যাত্মিকতাই ছিল আত্মসমর্পণ। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছেন তাঁরা যেন অহংকারের সঙ্গে কোনরূপ আপোস না করে। যখন মানুষ অপরের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে, তখনই তার দ্বারা সর্বপ্রকারের বর্বরোচিত কাজগুলি সম্পাদিত হয়।” একবার তিনি আমায় বলেন ঃ “যখন ঈশ্বর মানুষের উপরে তাঁর অধিকার বিস্তার করে, তখন মানুষ হয় ভালো, পবিত্র ও সৎ। এটি সত্য যে যতক্ষণ প্রত্যেক জীব দেহকে আশ্রয় করে থাকে ততক্ষণ তার মধ্যে কোন না কোন প্রকারের অহংকার থাকে। যদি অহংকার না থাকে তবে

জীবের কোন অস্তিত্ব থাকে না, কারণ অহং সরিয়ে নিজের কি আর বাকি থাকে? একমাত্র ঈশ্বর।"

"একজন সন্ন্যাসী কখনোই স্বার্থপর হতে পারে না। তাঁকে তাঁর ঘৃণ্যতম শত্রুকে যেমন সাহায্য করতে ঠিক ইচ্ছুক হতে হবে, তেমন সে হবে প্রিয়তম বন্ধুর ক্ষেত্রেও। এই জন্যেই আমরা সন্ন্যাসী হয়েছি। তারা আমাদের কি করবে না করবে, সেদিকে চিন্তা না করে প্রত্যেককেই সাহায্য করবে।"

পুরানো মায়লাপুর মঠের হলে এক সন্ধ্যায় কয়েকজন অতিথি রামকৃষ্ণানন্দের সাথে মিলিত হন। আমিও সেই সময় উপস্থিত ছিলাম। কেউ এক সন্ন্যাসীর কথা বলেন যিনি অসাধারণ শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী। কিন্তু তিনি অপরের সেবায় খুব অল্পসময় দেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অবজ্ঞাসূচক স্বরে মন্তব্য করেন—"স্বার্থপর লোকেরা সহজেই সবল ও সুস্থ হতে পারে। হয়তো বৃষ্টি পড়ছে এবং কেউ এসে বললে যে অমুক ব্যক্তি জ্বরে অসুস্থ হয়ে আছে। স্বার্থপর ব্যক্তি বলবে—এই বৃষ্টিতে বের হওয়া আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি, কিন্তু তাকে বলো যে আমি আসতে পারব না। বৃষ্টি থামলে আমি যেতে পারি। অন্যদিকে নিঃস্বার্থ ব্যক্তি তার কাপড়খানি গুটিয়ে ঘাড়ে একটি চাদর জড়িয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে নিজের বিপদ বা অসুবিধের কথা চিন্তা না করে সেই অসুস্থ ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হবেন। স্বামী বিবেকানন্দ যদি কখনো শুনতেন যে, তার কোন বন্ধু জ্বরে আক্রান্ত তাহলে দুর্যোগপূর্ণ ঝড়েও সেই বন্ধুর কাছে উপস্থিত হতেন। অপরের জীবন বাঁচাবার জন্য তিনি নিজের জীবন দিতে সদাপ্রস্তুত ছিলেন। স্বার্থপর ব্যক্তি তার নিজের স্ত্রী অসুস্থ হলেও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বের হতে চায় না। সে বলে স্ত্রী মারা গেলে আমি আবার বিবাহ করতে পারব। কিন্তু যদি আমি মারা যাই তাহলে বিবাহ করবে কে? এমন ব্যক্তি অবশ্যই সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করবে।" যতদিন আমরা স্বার্থপর থাকব, ততদিন আমাদের কাজ অবশ্য বিফল হবে। আমরা সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারি, নাম অর্জন করতে পারি, কিন্তু তার প্রকৃত ফল হবে শূন্য। যে মুহূর্তে আমাদের ক্ষুদ্র অহং বিদূরিত হবে, সেইক্ষণেই আমাদের প্রকৃত কাজ শুরু হবে। তখন আমরা এক প্রকৃত জীবনযাপন করতে পারি এবং কোথাও না যেতে পারি; কিন্তু আমরা আশ্চর্য কর্ম সকল করব।

"যখন আমরা আমাদের চেতনা থেকে 'অহং' বাদ দিই ও ঈশ্বরময় জীবনযাপন করি, তখন আমরা অসীম শক্তির অধিকারী হই। ঈশ্বরের অস্তিত্বই

একমাত্র সত্য, আর অপর সকল মিথ্যা। যার পশ্চাতে ঈশ্বরই আছেন। এই মায়া অতি অপ্রতিরোধ্য এবং এই মায়া আমাদের স্বার্থপর করে তোলে। শুধুমাত্র যখন ঈশ্বর আমাদের প্রতি করুণা পরবশ হন, তখন আমরা এই আবরণ উন্মোচন করে তার ক্ষণিক দর্শন পাই, তখন সকল স্বার্থপরতার নাশ হয়।"

" 'স্বার্থপরতা' শব্দটি সর্বদা সঠিক বোঝা যায় না। যখন আত্মা বলতে আমি দেহ বা ক্ষুদ্র আমিত্বকে বুঝি এবং তার জন্য কিছু করি তখন আমি স্বার্থপর। কিন্তু এই স্থূলদেহের অতীত এক পরমাত্মা আছে। যখন আমি তার জন্য কিছু করি তখন তা হয় ঈশ্বরের আরাধনা। যে মানুষ সেই পরমাত্মার মধ্যে থাকে সে কখনোই স্বার্থপর হতে পারে না। ঈশ্বরকে নিজের অন্তরে অনুভব করার চেষ্টা কর এবং তার দ্বারা তুমি সকল স্বার্থপরতাকে জয় করতে পারবে। যখন তুমি সর্বদা দেবত্বের মধ্যে থাক, তখন অহং তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যতক্ষণ অহংকার মানুষকে শাসন করে ততক্ষণ সে একটি ক্রীতদাস। তোমার সকল দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ আসে অহংকার ও স্বার্থপরতা থেকে। নিজের ক্ষুদ্র অহংকে বিসর্জন দাও সেইগুলিও বিদূরিত হবে।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আনুকূল্য লাভ করতে হলে খাঁটি হতে হবে। 'ফারিসীয় আধ্যাত্মিকতা' যাতে লোকে বাহবা দেবে বলে উপবাস করে—এহেন মনোবৃত্তিকে তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। মায়লাপুর মঠে কিছুদিনের জন্য একটি ছেলে এসেছিল, তাকে আমি খুব পছন্দ করতাম। সে মধুর প্রকৃতির ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। তিনিও তাকে খুবই পছন্দ করতেন ও কদাচিৎ তাকে তিরস্কার করতেন। কিন্তু তার কাছে অতি অল্প সেবা গ্রহণ করতেন। তাঁর এ হেন আচরণে আমি অবাক হতাম। কিন্তু পরে আমি এর অর্থ বুঝতে পারি। একদিন ভোরবেলায় ছেলেটি মঠ ত্যাগ করে ও আর ফিরে আসেনি। সে কর্মক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং ধ্যান ধারণাদি করার ইচ্ছা হয়েছিল। রামকৃষ্ণানন্দ স্মিতহাস্যে বললেন ঃ "ছেলেটি আধ্যাত্মিক জীবনে বেশি এগোতে পারবে না। সে অকপট নয়। উপবাস করার নাম করে সে লুকিয়ে লুকিয়ে খেত। স্নানের পরে ধ্যান করতে বসে সে তার মাদুরে শুয়ে পড়ত ও ঘুমোত। সে মনে করতো আমি কিছুই জানি না। এমনি করে কেউ কখনও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে পারে না। আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে গেলে অকপট হতে হবে। আপাতত মানুষকে প্রতারণা করতে পারা যায় কিন্তু ঈশ্বরকে প্রতারণা করা যায় না। অধিক কালের জন্য জনতাকে ঠকানো যায় না। তোমার মুখ তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার আচার ব্যবহার তোমার অজ্ঞাতে তোমার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করবে।"

(২)

আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে হলে ত্যাগের অভ্যাসই করতে হবে। জগৎকে বর্জন করে, আবার তাকে গ্রহণ করে আবার বর্জন করে—যতক্ষণ না ত্যাগ অভ্যাসের দ্বারা নিত্যকর্ম ও সংগ্রামে পরিণত হয়। এর কারণ, তারা তাদের সংস্কারকে ত্যাগ করে না, যে সংস্কার সংসার বন্ধনের কারণ। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না। তাঁর ত্যাগ ছিল অভূতপূর্ব এবং তার দ্বারা সেই সকল বন্ধন একেবারে ছিন্ন করেছিলেন, যে বন্ধনে তিনি পরিবার, সামাজিক সম্পর্ক, কুলগৌরব, নামযশের উচ্চাশা ও বাসনায় আবদ্ধ ছিলেন।

তিনি অন্তরতম বন্ধনটি ছিন্ন করেছিলেন; তিনি নিজের আমিত্বকেই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর নিরাসক্তি ছিল সম্পূর্ণ। তাঁকে আমি নৈরাশ্য, সমালোচনা, নিন্দা, বিরুদ্ধাচরণ, কর্মের সফলতা ও বিফলতা, এমনকি নিকট জনের মৃত্যুকেও স্মিত হাস্যে গ্রহণ করতে দেখেছিলাম। এক পায়ের উপর পা-টা তুলে আড়াআড়ি ভাবে রেখে পুরানো মায়লাপুর মঠে হলের দক্ষিণের দরজার কাছে একটি কম্বলাসনে বসে থাকতেন; (মাদ্রাজের গ্রীষ্মকালের রীতি অনুসারে) তার সুগঠিত দেহ কোমর পর্যন্ত অনাবৃত। এক হাত দিয়ে তার একটি পা কে ধরে রাখতেন ও স্বীয় ছন্দে শরীরটিকে ক্রমাগত অগ্রে ও পশ্চাতে দোলাতেন। অমন করে বসে তিনি আমাকে অতি সহজভাবে কোন ঘটনার কথা শোনাতেন, যার দ্বারা তিনি আঘাত পেয়েছেন; কিন্তু ধীর স্থিরভাবে সেই আঘাতটিও সহ্য করেছেন।

তিনি হৃদয়হীন ছিলেন না। "আমরা যদি অন্যদের ভালোবাসতে না পারি, অপরের সেবা করতে না পারি, তাহলে আমরা কি জন্য এখানে আছি?" একথাগুলি তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত। তাঁর হৃদয় ছিল বিশাল ও দয়ালু, আবেগহীন ভালোবাসায় পূর্ণ। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন সন্ন্যাসী—যিনি ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করেছেন, এবং তাঁর অর্থ হলো যে তিনি সর্বদা প্রশংসা-নিন্দা, মান-অপমান, জয়-পরাজয়ের সম্মুখে সমভাবাপন্ন থাকবেন। একদিন তিনি বললেনঃ "যখন মানুষ নিন্দিত হয়, কিন্তু তবুও ক্রুদ্ধ হয় না; তখন তুমি নিশ্চিত হতে পারবে যে, সে তার 'অহংকে' জয় করতে পেরেছে ও সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হতে পেরেছে।"

এমনটি মনে করা একেবারে উচিত নয় যে রামকৃষ্ণানন্দ নম্র স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। নম্র হওয়ার পক্ষে তিনি অতিমাত্রায় শক্তিশালী ও ইতিবাচক

মনোভাবাপন্ন ছিলেন। মৃদুতা, অপ্রতিরোধ্য, নীতিবাচক—তাতে বিশৃঙ্খলার বা সংগ্রামের চিহ্নমাত্র নেই। অথবা প্রকৃত প্রশান্তি আসে তীব্র আলোড়নের পরেই। তাতে গভীরতা ও সুপ্তশক্তি থাকে। অবশেষে সেই সুপ্তশক্তি বিকশিত হয়, যা কোন কিছুর অপেক্ষা থেকে নয়, সকল মহাপুরুষেরা যাঁরা জগতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা জীবনে নানা বাধাবিপত্তি ঝঞ্ঝাবাতের সম্মুখীন হয়েছেন। যিশুখ্রিস্ট ঘৃণাভরে সুদকারবারীদের (Money lenders) বিতাড়িত করেছিলেন। ফ্যারিসিদের (Pharisees) তিনি তীব্র তিরস্কার করেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রয়োজনবোধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যথাযথ ক্রোধ প্রকাশ করতেন। তার প্রতি কোন প্রকারের আক্রমণ বা বিরুদ্ধাচরণ তাঁকে বিচলিত করত না। আদর্শের প্রতি অশ্রদ্ধা, ভগবানের সেবায় অবহেলা বা অমনোযোগিতা, যা কিছু পবিত্র তার প্রতি অনীহা, ভণ্ডামি—এগুলি তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলত, যেমন সর্বদা এদের দ্বারা অতীতের মহাপুরুষরা কুপিত হতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কদাচিৎ জাগতিক বিষয়বস্তু আলোচনা করতেন। তিনি সংবাদপত্র পড়তেন না। সাধারণ মানুষের ধারণা হতো যে তিনি মানুষের প্রতি আগ্রহশীল নন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর সঙ্গীসাথিদের কথা গভীরভাবে ভাবতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত আগ্রহ কেবলমাত্র মানুষের সাথে মানুষের মতো ব্যবহার করার মধ্যে প্রকাশ পায় না। তাঁর ঐশীগুণসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। "যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করার জন্য সংসার ত্যাগ করেন; তাঁরা নিশ্চিতের জন্য অনিশ্চিতকে, নিত্যের জন্য অনিত্যকে ত্যাগ করেন।" —এই কথাটি তিনি প্রায়ই বলতেন।

তাঁর এই মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণাটি স্পষ্ট ছিল যে, তিনি ত্যাগকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। "ত্যাগই আমাদের সকল শক্তির উৎস"—এই কথা পুনঃপুনঃ তিনি উচ্চারণ করতেন। যখন আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করি, তখনই আমরা প্রকৃতপক্ষে জীবনযাপন করতে আরম্ভ করি। বর্তমানে আমরা বন্দিদের মতো কারারুদ্ধ। আমরা কখনও কখনও মুক্তির আভাস মাত্র পেতে পারি; কিন্তু পরমুহূর্তেই আমাদের অসাবধানতায় পুনর্বার সংসারের জালে আবদ্ধ হই; আবার সেই কারাগারে পতিত হতে হয়। যখনই মানুষ বুঝতে পারে যে আত্মার অসীম আনন্দের সঙ্গে এই দৈহিক সুখের তুলনাই হয় না, তখনই সে ত্যাগের পথ অবলম্বন করে। শুধুমাত্র ত্যাগ করার জন্যই সে ত্যাগ করে না, সে আরও অপার্থিব আনন্দের কথা অনুভব করতে পারে। সে

সাংসারিক সুখের অসারতাকে উপলব্ধি করেছে এবং কেবলমাত্র উচ্চতর আনন্দই তাকে তৃপ্ত করতে পারে। ত্যাগের অর্থ বৃহত্তর আনন্দের জন্য নিম্নস্তরের সুখ বর্জন।

দিনের তীব্র গরমের সময় আমি কদাচিৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সাথে দেখা করতে যেতাম। কিন্তু সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা হাওয়া বইত, মধ্যাহ্নের তাপ প্রবাহ স্নিগ্ধ হতো, তখন আমি আশ্রমে যেতাম। আমার জন্য নির্দিষ্ট সামান্য কাজগুলি করতাম ও আরাত্রিকে সাহায্য করতাম। তারপরে আশ্রমের হলটিতে রামকৃষ্ণানন্দজীর কাছে কম্বলের আসনে বসতাম ও তাঁর কথা শুনতাম। তাঁর কথা মনোযোগ সহকারে যা শুনতাম এবং ঘরে ফিরে এসে সেগুলি লিখে রাখতাম। কখনো অন্যান্যেরা থাকতেন, কখনো আমরা দুজনে থাকতাম, কিন্তু রামকৃষ্ণানন্দের ভাব একই রকম থাকত। এক সন্ধ্যার স্মৃতি আমার মনে এখনও জ্বলন্ত। সেদিন তিনি জগতের মায়াজাল বিস্তারের প্রসঙ্গ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন ঃ "যতক্ষণ নিয়ত সংগ্রাম আছে, ততক্ষণ আমাদের মধ্যে বাসনা থাকে। সেই বাসনা আমাদের আবদ্ধ করে। আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে জগতের অসারতা উপলব্ধি করিনি। যখন তা আমরা উপলব্ধি করি তখন পথ সরল হয়। জগৎ সেই স্থান, যেখানে অনিত্যে নিত্য বোধ হয় এবং নিত্যে অনিত্য প্রতিভাত হয়। যেখানে কিছু নেই সেখানে কিছু আছে এবং যেখানে কিছু আছে সেখানে কিছু নেই—মায়া আমাদের এভাবে মোহিত করে। এতে দুর্বলতা শক্তির ও শক্তি দুর্বলতার মতো বোধ হয়। অরণ্যের বৃক্ষছাল পরিহিত ও ভূমিতে শায়িত ঋষি জগতের কাছে দুর্বল বলে প্রতিপন্ন হন; জাঁকজমক পূর্ণ প্রাসাদে সিংহাসনোপরি আসীন রাজাকে জগৎ শক্তিমান বলে ভাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঋষি শক্তিসম্পন্ন, সে তুলনায় রাজা অতি তুচ্ছ। এজন্যই প্রাচীনকালে যখন কোন ঋষি রাজার দরবারে উপস্থিত হতেন, রাজা তার সিংহাসন থেকে নেমে এসে ঋষির পদতলে ভূলুণ্ঠিত হতেন।"

"মায়ার প্রভাব এমনই অপ্রতিরোধ্য যে, কেবলমাত্র ঈশ্বরের কৃপায় আমরা মায়ার আবরণ ভেদ করে তাঁর কিঞ্চিন্মাত্র দর্শন লাভ করতে পারি। মায়ার আধার অহং যেন ঘরের নড়বড়ে ভিতের মতো বাড়িটির অস্তিত্বই থাকবে না; তেমনি অহং দূর হলে মায়াও অদৃশ্য হয়। তখন তুমি এক গভীর প্রশান্তির আস্বাদ পাবে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মায়ার ফাঁদে আমরা পড়ি। যে ইন্দ্রিয় জয় করেছে সে সমগ্র জগৎ জয় করেছে।"

যদি কেউ ঈশ্বর দর্শন করে তবে সে কি চাইবে? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন ঃ "বাড়ি চাইবে, গাড়ি চাইবে? না। শুধুমাত্র ঈশ্বরদর্শন। এর চেয়ে আর তৃপ্ততম কিছু নেই।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এমনই ছিলেন। জগতের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ ছিল না। তিনি জগতের মোহিনীরূপ জানতেন, কিন্তু এও জানতেন যে এই মোহিনীরূপ ক্ষণিক মাত্র, অনিত্য। এর পশ্চাতে রয়েছে অপরিবর্তনীয় নিত্যবস্তু। "একমাত্র তারই অনুসন্ধান কর"—এই ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। "এই জগতের ক্ষুদ্র অনিত্যে সন্তুষ্ট হইও না। নিত্য ব্যতীত অন্য কিছুতে তৃপ্ত হইও না। তোমার লক্ষ্য হোক অসীমের প্রতি। ত্যাগ কর, কারণ তুমি জান যে যা তুমি ত্যাগ করেছ তা নশ্বর এবং এর ফলস্বরূপ যা তুমি লাভ করবে তা অবিনশ্বর ও অনন্ত। যত তুমি নিজের আমিত্বকে ভুলে গিয়ে ঈশ্বরে মনোনিবেশ করতে পারবে তত শীঘ্রই তুমি এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।"—এই কথাগুলি ছিল রামকৃষ্ণানন্দের শিক্ষার সারকথা। এগুলি ছিল তাঁর অসীমের প্রতি ক্রমাগত আহ্বান।

যেহেতু আমরা বাসনা দ্বারাই জগতে আবদ্ধ হই, সেহেতু বাসনার নিবৃত্তির জন্য সাধনা ছিল নিরন্তর ও আপসহীন। এক সন্ধ্যায় যখন আমরা এক সঙ্গে ভ্রমণ করছিলাম তখন তিনি আমায় বলেন ঃ "মনকে বাসনামুক্ত করা সহজ নয়। একমাত্র ঈশ্বরই তা পারেন। যে ব্যক্তির ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা নেই সে কখনই বাসনামুক্ত হতে পারে না। সে বলবে যদি আমার বাসনা না থাকে তবে আমার সঙ্গে প্রাণীকুলের মধ্যে কি তফাৎ? বাসনারই দ্বারা কেবল মাত্র সুখ ভোগ সম্ভব। প্রতিটি বাসনার জন্য জগতে তৃপ্তি ভাব আসে। তাহলে কেন আমি বাসনা ত্যাগ করব? যাই হোক ভগবানে যাঁর ভক্তি আছে, তিনি দেখেন যে বাসনার দ্বারা তো সুখ আসেই না বরং বাসনা সকল দুঃখের মূল। তিনি উপলব্ধি করেন যে একমাত্র ঈশ্বর দর্শনের মধ্যেই তাঁর সকল বাসনার নিবৃত্তি হবে। ঈশ্বর অনন্ত আনন্দস্বরূপ। বাকি সকল প্রকারের সুখই ভঙ্গুর ও নশ্বর। একমাত্র ভগবদ্দর্শনে অপার আনন্দ পাওয়া যায়।

(৩)

কথিত আছে যে একবার এক মহাপুরুষ গঙ্গাতীরের দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে এসেছিলেন এবং যখন তিনি মন্দিরের বিগ্রহের সামনে প্রার্থনা করছিলেন তখন তাঁর প্রার্থনায় সমগ্র মন্দিরটি ভাবে কম্পিত হয়েছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন পূজা করতেন তখন ঠিক এমন ভাবই বোধ হতো। যখন তিনি সংস্কৃত স্তোত্র

উচ্চারণ করতেন, তখন তাঁর সুললিত স্তোত্র পাঠে ভাবের বন্যা বয়ে যেত মন্দির প্রাঙ্গণে।

মায়লাপুরে তিনি সর্বদা পূজা করতেন না। কখনও সৌজন্যতাবশত তিনি কোন অতিথি সাধুকে সেই সুযোগ প্রদান করতেন অথবা রুদ্র (ব্রঃ) পূজা করত। রুদ্র ছিল তাঁর সেবক ব্রহ্মচারী। সে ছিল এক বিধবা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং পূজাদিতে সে সুচারুরূপে শিক্ষা লাভ করেছিল।

যখন রামকৃষ্ণানন্দ নিজে পূজা করতেন, তখন তিনি তাঁর চাদরটি চেয়ে তাঁর বিশাল শরীরে জড়িয়ে নিতেন এবং ঠাকুরঘরে তখন তাঁকে দেখা যেত রাজকীয় মহিমায়। কিন্তু এতে ছিল না কোন ঔদ্ধত্য। এই ঐতিহ্য ছিল তার সহজাত। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য, জগজ্জননীর সন্তান। তাঁদের শিক্ষায় তিনি নিজের জীবনটি গড়ে ছিলেন। "জগজ্জননী আমাদেরকে তাঁর দাস বলে ডাকতে চান না, আমরা তাঁর সন্তান, দাস নই। সর্বদা নিজেকে তাঁর সন্তান বলে চিন্তা করবে।"—এই কথাটি তিনি আমাকে বার বার বলেছেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জন্মসূত্রেই পূজক ছিলেন। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রভাব ও শিক্ষা ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, শাস্ত্রে পারদর্শী। তাঁর কুলগত আচার ও ধর্মপালন ছিল গোঁড়া। তিনি ভক্ত ও তপস্বী ছিলেন। তাঁর সন্তানের এই গুণগুলিকে পালন করা অতি স্বাভাবিক ছিল। যদিও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে অল্প সময়ের জন্য তিনি এর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পরে তিনি এ বিষয়ে আরো গোঁড়া হন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তির স্পর্শে শিষ্যের হৃদয়েও ভক্তি উদ্দীপিত হয়েছিল। তিনি আবার পূজায় মনোনিবেশ করেন। কোনরূপ বিদ্রুপ বা উপহাসই তাঁকে এ থেকে স্থানচ্যুত করতে পারে নি। তাঁর উদার গুরুভাইরা তাঁর এরূপ পুরানো ধরনের গোঁড়ামিকে উপহাস করতেন, তিনি কিন্তু অবিচল ছিলেন। তিনি জানতেন এগুলির প্রয়োজনীয়তা গৌণ, কিন্তু তাঁর কাছে এগুলি ছিল ধর্মীয় ভাবপ্রকাশের পবিত্র পথ মাত্র। তিনি মনে করতেন এগুলির সংরক্ষণ ও সম্মান করা উচিত।

ইহা আশ্চর্যজনক ছিল না যে এরূপ গোঁড়ামিপূর্ণ মন নিয়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আধুনিক জগতের জন্য দুঃখবোধ করবেন। তিনি একদিন বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন ঃ "বর্তমানে কেউই জগজ্জননীর উপাসনা করে না। আমরা সকলে

সংসারের ক্ষুদ্র জননীদের উপাসনা করছি এবং আর সেই জগজ্জননীকে ভুলে গিয়েছি। আমরা সকলেই জগতের ক্ষণিক সুখ চাই এবং সেই অসীম আনন্দের জন্য লালায়িত নই। আমরা সেই পাখিটির মতো যে বৃক্ষের একটি ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায় এবং অপর পাখিটি শান্ত, সমাহিত, ধীর স্থির হয়ে বসে থাকে। বৃক্ষটি রসাল ফলে পরিপূর্ণ। তা দেখে পাখিটি লোভের বশবর্তী হয়ে ভাবে ঃ 'আ! যদি আমি ঐটি আস্বাদন করতে পারতাম।' তখন সে ফলটির কাছে যায়—যদিও তার মস্তকটি কাঁটার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়, তবুও ফলটিকে কামড় দেয়। কিন্তু হায়! ফলটি একেবারেই তিক্ত। এভাবে সে বিশ-ত্রিশটি ফল আস্বাদন করে এবং বোঝে যে সবগুলিই তিক্ত। তখন সে তিক্ত ফলগুলি ত্যাগ করে যেই আর একটি ফলে কামড় দেয়, অমনি সে ফলটি মিষ্টি। এটি তার মনে নতুন আশা জাগায় এবং সে বার বার আরও মিষ্ট ফল খুঁজতে থাকে। এর পরে দশটি কি বারোটি তিক্ত ফল আস্বাদন করে। অবশেষে সে এই বৃথা সন্ধান ত্যাগ করে এবং বৃক্ষের উপরে আসীন সেই শান্ত ধীর স্থির পাখিটির সঙ্গে মিলিত হয়। ঠিক তেমনি ভাবেই আমরা অর্থ, ক্ষমতা, নাম, যশ ইত্যাদির মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাই, কিন্তু যখন তাদের তিক্ত স্বাদ আমরা বুঝতে পারি তখন আমরা ঈশ্বরাভিমুখী হই ও তাঁর উপাসনা করি।"

যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্থূলদেহে বর্তমান ছিলেন, তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন তাঁর একান্ত সেবক। পরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাসমাধি লাভ করলেন তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর স্মৃতির সেবক হলেন। বছরের পর বছর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত অস্থি ও পট যে মঠে স্থাপিত হয়েছিল সেই মঠটিকে প্রহরীর মতো আগলে রেখেছিলেন। তাঁর গুরুভাইগণ প্রায়ই প্রব্রজ্যা বা তীর্থভ্রমণে চলে যেতেন এবং মধ্যে মধ্যে মঠে ফিরে আসতেন; কিন্তু বরানগর মঠে তিনি গভীর ভক্তি ও ভাব সহকারে তাঁর নিত্য সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নানের জন্য গঙ্গা থেকে জল আনতেন, মঠ ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতেন। পূজার বাসন মাজতেন ও পূজা করতেন। তরকারি কাটতেন ও ভোগ রাঁধতেন। তিনি মঠের ও ঠাকুরঘরের নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও জগজ্জননীর সন্তান। তিনি গঙ্গার ধারে ঝুঁকে কলসিতে জল ভরে কাঁধে তুলতেন, তখন তাঁর আচরণে এমন কিছু থাকত যা গঙ্গার ঘাটে সমবেত অন্যান্য লোকজনদের মনে শ্রদ্ধা জাগাতো। তারা তাঁকে তাদেরই একজন মনে করে হাসি ঠাট্টা করতো।

যদিও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজাদির ব্যাপারে গোঁড়া ভাবাপন্ন ছিলেন, তবুও ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন। সহিষ্ণুতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত রকম গোঁড়ামিমুক্ত মনোভাব ছিল তাঁর চিন্তার মূলস্তম্ভ। তিনি ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ ''জড়ের বিরুদ্ধে আত্মার সংগ্রাম'' এবং যা কিছু এই সংগ্রামের যে কোন সহায়তাটাই ছিল তাঁর কাছে স্বাগত। যখন কেউ তাঁর কাছে অপর ধর্মের নিন্দা করত, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি—''কখনও অন্য ধর্মের দোষ দেখবে না। পার্থক্য শুধুমাত্র বাহ্যিক আচারাদিতে। বাহ্যিক রূপটি ধর্মের বহিরাবরণ মাত্র। এটি কঠিন, রুক্ষ এমনকি আমাদের অপছন্দ হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে মূল্যবান মূলবস্তু। ঈশ্বরই সকল ধর্মের মূল বস্তু। মানুষ যে ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন তিনি সেই একই ঈশ্বরের উপাসনা করেন। সকল ধর্মের মূল বস্তুটি এক। ধর্মের বহিরাবরণ মাত্রেরই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ ও বিশ্বাস সেই পরম সত্যের আংশিক প্রতিফলন মাত্র। যেহেতু তাদের মধ্যে সত্যের আলোক প্রতিফলিত হয়, সেহেতু আমরা তাদের সমগ্র সত্যস্বরূপ বলে মনে করি। ঈশ্বর যা কিছু দেন তাকেই ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করা যায়। ঈশ্বরই কেবলমাত্র জগতের প্রভু, তিনি আমারও প্রভু। এইটি জেনে তাঁকে সর্বস্ব অর্পণ করাই হলো ধর্ম। যে নিজের জন্য কিছু রাখে তাই অধর্ম। দূর কর 'আমি ও আমার' ভাবটি, সর্বস্ব ঈশ্বরকে দাও—এইটি হলো ধর্ম। এই শিক্ষাই সকল ধর্ম দেয়—কি খ্রিস্টান, কি ইসলাম, কি হিন্দু ধর্ম, কি পার্সি।''

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ নিরলসভাবে ও বিস্তৃতভাবে করতেন। যদি কোন দর্শক সংবাদপত্র বা জাগতিক বিষয় সম্পর্কীয় বই পড়তেন তখন তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করতেন ঃ ''এসব আপনি অন্যত্র করুন। এখানে আপনার শুধুমাত্র ঈশ্বরের চিন্তার চেষ্টা করা উচিত।'' তাঁর নিজের মন সর্বদা ঈশ্বর চিন্তায় পরিপূর্ণ থাকত। একবার তিনি আমাকে যা বলেছিলেন, তিনি তাঁর মূর্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ ''উপলব্ধিবান মানুষ সর্বদা সমগ্র জীবনেই উপলব্ধি করেন।'' তিনি বিশ্বাস করতেন—''ঈশ্বরলাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য—তা সে জানুক বা না জানুক।'' তিনি বলতেন ঃ ''কোন ব্যক্তি যার ঈশ্বরের প্রতি প্রেম নেই কখনোই সে ধার্মিক হতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণই ধর্ম জীবনের আরম্ভ এবং যতক্ষণ না সে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হচ্ছে ততক্ষণ সে কোন কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। যখন সে তাঁকে অনুভব করে তখন তার সকল বন্ধন ছিন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে সকল মানুষই

ঈশ্বরকে ভালোবাসেন। কারণ সকলেই অনন্ত জীবন, অনন্ত জ্ঞান ও অসীম আনন্দকে ভালোবাসে এবং এগুলি ঈশ্বরের প্রকাশ মাত্র। কিন্তু খুব কম মানুষই এই কথা জানেন। এমন মানুষও আছেন যিনি সারা জীবন আমের কথা শুনেছেন, কিন্তু কখনো চোখে দেখেননি। কেউ এসে বললে তিনি আম খেতে পারেন। ঠিক সেভাবে মানুষই ঈশ্বরকে ভালোবাসছে, কিন্তু কখনো কেউ এসে তাঁদের সেই কথা বললে তখনই তাঁরা তা জানতে পারেন। তাঁরা যদি একবার উপলব্ধি করতে পারেন যে এই সমগ্র বিশ্বসংসারে ঈশ্বরই প্রিয়তম বস্তু, তাহলে তাঁরা তাঁকে সজ্ঞানে ভালোবাসতে শিখবে; তাঁদের সকল চিন্তা তাঁর প্রতি প্রবাহিত হবে এবং স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা ধর্মীয় ভাবাপন্ন হবে।"

রামকৃষ্ণানন্দ বলতেন ঃ "এলোমেলো ভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি করা যায় না। তার একটি সুস্পষ্ট উপায় আছে। সর্বপ্রথম শ্রবণ, তারপরে ধারণা—ধারণা হতে উপলব্ধি। তোমাকে আলো জ্বালতে হবে। না হলে তুমি বিপরীত দিকে চলে যাবে। পরবর্তী উপায় তোমায় একজন আচার্যের কাছে এই বিষয়ে জানতে হবে। জানার পর তোমাকে নিজেকেই বুঝতে হবে এবং যখন তুমি তা সম্যগ্রূপে বুঝতে পারবে, তখন তোমার অনুভূতি হবে। যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ তোমাকে বিবেক বুদ্ধির দ্বারা তাকে অনুভব করার চেষ্টা করতে হবে।"

তাঁর চিন্তার গভীরতায় তিনি ক্ষণিকের জন্য নীরব থাকতেন। তারপর তিনি বলতে আরম্ভ করতেন ঃ "একথা সত্য যে সাধারণ মানুষ সত্যকে জানার জন্য আগ্রহী নয়। সত্যকে জানতে হলে তোমাকে সত্যস্বরূপ হতে হবে। তোমার জীবন সত্যেই প্রতিপালিত হবে এবং এটিকেও তোমার অনুভূতির বস্তু করে নিতে হবে। না হলে তুমি তা জানতে পারবে না। সসীম কখনই অসীমকে জানতে পারে না, কিন্তু আমরা অন্তত এর খানিকটা বৌদ্ধিক ধারণা করতে পারি। তা যদি না হতো তাহলে তাকে লাভ করার জন্যে আমরা এত উদ্‌গ্রীব কেন? নিজের অন্তর থেকে অথবা প্রকৃতির থেকে মানুষ সকল কিছু পায়। প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রামাণিক শাস্ত্র; তিনিই ধন্য যিনি তা পড়তে সমর্থ হন।"

(৪)

এক বৈকালে এক দাম্ভিক পণ্ডিত প্রায় এক ঘণ্টা মঠে কাটিয়ে যান। তিনি স্থান ত্যাগের পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিরক্তিসহকারে মন্তব্য করেন ঃ "যখন মানুষ তার বিদ্যার বৃথা অহংকার করে তখন সে তার থেকে কি লাভ করে? সে যদিও সেসব পড়েছে তবুও সে সত্যকে জানবার যোগ্য নয়। যে বিদ্যা

মানুষকে সত্য জানবার যোগ্যতা দেয় সে বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন—ভাত ভাত বলে উচ্চারণ করলে পেট ভরবে না। ঠিক তেমনই শুধুমাত্র শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠে তোমার আধ্যাত্মিক ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটবে না। কেবলমাত্র ঈশ্বর দর্শনের ফলে তা প্রকাশিত হবে। পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিকতা উভয়ের অবস্থান বিপরীত মেরুতে। পাণ্ডিত্যের আধার অহংকার। আর আধ্যাত্মিকতার আধার অহংকারের নাশ। এক লোক অত্যন্ত কুটিল, চালাক ও নিজের মতকে সদাই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সে কখনই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ সে অহংকারে পরিপূর্ণ। যতক্ষণ না তার সে অহংকার শূন্য হচ্ছে ততক্ষণ তার সে আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভই হবে না।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যে পাণ্ডিত্যকে অবজ্ঞা করতেন এমন নয়, কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যাভিমানকে সহ্য করতেন না। কারণ সে পাণ্ডিত্য শুধুমাত্র বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে ধার করা জ্ঞান। তিনি বিশ্বাস করতেন—মানুষের জ্ঞানের আধার হবে তার নিজের অনুভূতিতে, অপরের অনুভূতিতে নয়। তিনি মানব মনকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং মনকে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন ঃ "শুদ্ধ মন এবং মানুষের যথার্থ স্বরূপের কোন পার্থক্য নেই। মন যখন কেবল একটি বিষয়ে নিবদ্ধ হয় তখন সে শুদ্ধ এবং এটি তখনই হবে যখন মন কেবলমাত্র এক বিষয়াভিমুখী হবে। যদি তুমি ঈশ্বরদর্শন করতে চাও তাহলে তার একমাত্র উপায় হলো মনকে সকল স্বার্থ চিন্তা থেকে মুক্ত করে তাকে একমুখী করা।"

কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—"কেমন করে মনকে শুদ্ধ করব?" উত্তরে রামকৃষ্ণানন্দ বলেছিলেন ঃ "অহংনাশের চেষ্টা কর। এই ভাব আসবে সকলের প্রতি একত্ব ভাব থেকে। চিন্তা কর তুমি জগতের অন্য কোন জীবের থেকে উৎকৃষ্টতর নও। মৃত্তিকার উপর চলন্ত ক্ষুদ্রতম কীটটি তোমার-ই মতো; তারও ঠিক তোমারই মতো বেঁচে থাকার অধিকার আছে। যখন আমাদের সকল ভেদজ্ঞান দূর হবে, অহংকার দূর হবে, মন তখন এককেন্দ্রিক ও শুদ্ধ হবে। সেখানে কেবলমাত্র ঈশ্বর বিরাজমান। মন আয়নার মতো। যখন সেটি পরিষ্কার থাকে তখন তাতে নিখুঁত প্রতিবিম্ব পড়ে। যদি ধুলোয় ঢাকা থাকে, তাহলে তাতে কোনরকম প্রতিবিম্বই পড়ে না। যতই তুমি ধুলো পরিষ্কার করবে ততই তুমি পাবে ভালো প্রতিবিম্ব, প্রত্যেক মনই সেই চরম সত্যের প্রতিফলন হতে পারে। এরূপ মনে সত্য আরো ভালোভাবে প্রকাশিত হয়, আরও ভালোভাবে দৃষ্ট হয়। এই মনটি তৈরি হয় শাস্ত্রপাঠে।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ছিলেন একজন অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী। চিন্তা-ভাবনায় তাঁর নিজস্বতা ছিল অচিন্ত্যনীয় এবং তিনি ছিলেন বিদ্বান। কিন্তু তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল না। কিংবা এটি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনকে কোনভাবেই প্রভাবিত করেনি। ধর্ম ছিল তাঁর মজ্জাগত, আর জ্ঞানচর্চা ছিল তাঁর অবসর বিনোদনের। তিনি একজন সুদক্ষ গণিতজ্ঞ ছিলেন। ত্রিকোণমেত্রির জটিল সমস্যার সমাধান তাঁর কাছে ছিল দাবার চাল দেবার মতো। সংস্কৃতের কঠিন অংশ তাঁর কাছে ছিল কিশোরের অ্যাডভেঞ্চার বই পড়ার মতো। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সুপরিচিত সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি অন্যতম। সংস্কৃতে তিনি অনর্গল কথা বলতেন যখন অন্য ভাষাভাষীরা তাঁর কাছে আসতেন। মঠে একদিন বিকেলবেলায় কয়েকজন দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিতদের সাথে সংস্কৃতে আলোচনা করতে দেখেছি। সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শিতাই তাঁকে বেদ ও ভারতীয় অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনে সাহায্য করেছিল। এক সন্ধ্যায় শাস্ত্রচর্চার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন ঃ "উপনিষদ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এর প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করার জন্য প্রত্যেকের সংস্কৃত শিক্ষা করা উচিত। বিশ্বের সব মহান সত্যের সার উপনিষদে আছে। এর প্রতিটি ছত্র হলো উপলব্ধ মনের বহিঃপ্রকাশ। যাঁরা এগুলি প্রকাশ করেছেন তাঁরা ঈশ্বরোপলব্ধিবান পুরুষ। ঈশ্বর ও তাঁরা অভিন্ন। সে সমস্ত মহান ঋষিরা ছিলেন পবিত্রতার মূর্তি। ফলে এঁরা সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দের শুধুমাত্র ভারতীয় শাস্ত্রে জ্ঞানই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্য ধর্মের শাস্ত্রেও তার অগাধ জ্ঞান ও গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর মতে প্রত্যেক জাতিরই একটি ধর্মগ্রন্থ আছে যা ঈশ্বর সান্নিধ্যের পথ নির্দেশ করে।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সর্বদাই বিশ্বাস করতেন যে সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি তাঁর দক্ষিণ ভারতীয় কার্যে প্রধান সহায়ক ছিল। "আমার সংস্কৃত জ্ঞান ও কঠোর নিরামিষ ভোজী হওয়ার জন্যেই স্বামীজী আমাকে মাদ্রাজে পাঠিয়েছিলেন।"—একথা তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন। তিনি প্রায়ই পুরনো দিনের প্রসঙ্গ করতেন। যেটুকু শুনেছি তা হচ্ছে আত্মত্যাগের মহিমায় তাঁরা ছিলেন উজ্জ্বল। ভাড়া করা একটি ছোট্ট বাড়িতে তিনি থাকতেন। মঠের বাড়িতে কোন আসবাব ছিল না। কখনও বা আহারও জুটতো না। বর্ষাকালে মঠের বাড়িতে যাবার রাস্তার শেষ প্রান্ত এতই খারাপ ছিল, খুব কম ভাড়ায় গোরুর গাড়ি তাঁকে শহরের কোন জায়গা থেকে নিয়ে এসেও মঠ সন্নিকটে পৌঁছে দিতে—আর যেতে অস্বীকার করত। সারাদিন ব্যাপী পাঠ শেষে বৃষ্টিতে ভিজে কোথাও বা

হাঁটুজল অতিক্রম করে শ্রান্ত, বৃষ্টিসিক্ত অবস্থায় তিনি মঠে ফিরতেন। শুধু তাই নয় ফিরে এসে ঠাকুরের সন্ধ্যাকালীন নৈবেদ্য ও ভোগ রান্না করে নিবেদন করতেন। পরে নিজের আহার ও বিশ্রাম হতো। তারপরে তিনি 'আইস হাউসে'র ভূগর্ভস্থিত অপরিসর স্থানটিতে নিজে থাকতেন এবং তাঁরও পরে বর্তমান মায়লাপুর মঠে উঠে আসেন। যদিও বর্তমান মঠের বাড়িরও সাজসজ্জা খুবই সাধারণ ছিল। মনে হতো পুরাতনের তুলনায় বিলাস বহুল।

জীবনের পথে স্বাচ্ছন্দ্য বা কাঠিন্য যাই আসুক না কেন, রামকৃষ্ণানন্দের কাছে তা ছিল তুচ্ছ। তাঁর উৎসাহে কোন শিথিলতা ছিল না। ধ্যান, প্রার্থনা, সেবা ও শিক্ষা, পূজা পাঠ প্রভৃতি তিনি একাই নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে করতেন। তাঁর বাইরের পাঠের চেয়ে অন্তরের পাঠই ছিল বেশি। তিনি মনের গভীরে ডুব দিয়ে এর রহস্য উদ্‌ঘাটনে যত্নবান ছিলেন। যার ফলস্বরূপ "বহু মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার" সমাধানে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। যদিও এই প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের ফল এতই সূক্ষ্ম যে তা বাক্যাতীত। কিন্তু তিনি প্রায়ই এ বিষয়ে আমাদের বলতেন। এমনই এক সন্ধ্যায় যখন আমরা অনেকে মঠে হলঘরে উপস্থিত ছিলাম, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি—"আমরা জানতে চাই কেন? আমাদের অন্তঃস্থ সত্তাকে সন্তুষ্ট করা। সকল জ্ঞানের পরিসমাপ্তি সন্তোষে। আর সেই সন্তোষ সর্বদা এক। জ্ঞান তিন প্রকারের—প্রথমত আবেগপ্রসূত জ্ঞান, দ্বিতীয়ত বিচারপ্রসূত ও সর্বশেষে অনুপ্রেরণাজাত। নিম্ন শ্রেণির প্রাণীরা আবেগপ্রসূত জ্ঞানের দ্বারা চালিত। আমাদেরও বেশিরভাগ জ্ঞানই আবেগপ্রসূত। মানুষ বিচার করে এবং বিচার যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ অহংকার থাকবে। বিচার থেকে অনুপ্রেরণা। মানুষের জ্ঞানলাভ হয়। তবে এই বিচারের মধ্য দিয়ে নয়—প্রত্যক্ষ অনুভবে এবং ফলস্বরূপ তার সকল দাসত্বের অবসান হয় এবং মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করে।"

তিনি আরও বলেন যে—"মনেতে বদ্ধ থাকলে কখনোই সন্দেহমুক্ত হবে না। তুমি কতক্ষণ চিন্তা করবে? যতক্ষণ তোমার মনে সন্দেহ থাকে, যখন কোন বিষয়ে তুমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হও তখন তুমি চিন্তা মুক্ত হবে। তাই চিন্তা ও সন্দেহ একই গোত্রের। যত চিন্তা ততই সন্দেহ। মানুষেরা সাধারণত সন্দেহবাদী। কেন? কারণ তারা সকলে ক্ষুদ্র মনের বশবর্তী। কিন্তু মন কখনোই মানুষকে সঠিক পথে চালিত করে না। তাই মানুষকে মনাতীত, সন্দেহাতীত হতে হবে। আমাদের স্থূল শরীরের মধ্যে আছে বাসনা ও লোভ। মনের অন্তরে

সন্দেহ আছে। জগৎ পরিবর্তনশীল। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যতক্ষণ না এসবের পারে যাবে, ততক্ষণ কখনও উপলব্ধি হয় না। এই উপলব্ধি মানুষকে দেবে অনাবিল শান্তি ও আনন্দ।"

একজনের প্রশ্ন ছিল—"মনের পারে যেতে হলে কি বিবেক ত্যাগ করব?" "বিবেকের উচ্চস্তরের সোপান আরোহণের পরেই আমরা মনের পারে যেতে পারি"—এই ছিল রামকৃষ্ণানন্দের তৎক্ষণাৎ উত্তর। অপর এক দর্শক জিজ্ঞাসা করেন—"নিদ্রার সময়ে কি আমরা মনকে অতিক্রম করি?" রামকৃষ্ণানন্দের উত্তর ঃ "হ্যাঁ, যখন গভীর নিদ্রাতে যাই।"

আর একজনের প্রশ্ন ঃ "কিভাবে আমরা স্বপ্নকে মনে রাখি?" তাঁর উত্তর ঃ "তুমি যখন ঘুমিয়ে পড় এবং স্বপ্ন দেখ, তখন তোমার স্থুল শরীরের চেতনা থাকে না। কিন্তু আত্মচৈতন্য থাকে। ফলে তোমার স্বপ্নকে ধরে রাখা সম্ভব।"

আর একটি প্রশ্ন ছিল—"কিভাবে আমরা মনের চঞ্চলতা স্থির করতে পারি?" উত্তর ঃ "ঈশ্বরে মন স্থির করে। যতক্ষণ মন ইন্দ্রিয় বাহিত হয়ে বাহ্য জগতে বিচরণ করে ততক্ষণ তার চঞ্চলতা যায় না। আর মনও দুর্বল হয়। মন যতই অশান্ত হয় ততই দুর্বল হয়, আর যতই মন বেশি শান্ত ততই দৃঢ়।" এরপর আরো জোর দিয়ে বললেন—"তোমার অন্তর ও মনে জ্ঞানাগ্নি জ্বালাও। কোন দুর্বলতা বা অপবিত্রতা তোমাকে স্পর্শ করবে না। জ্ঞানাগ্নিতে সকল অপূর্ণতা ও অপবিত্রতা ভস্মীভূত হবে।"

(৫)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সদাশয় ছিলেন না বলে মনে হতো। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবন মানব জাতির সেবাতেই ব্যয়িত হয়েছিল। ক্ষুধার্তকে অন্ন বা বস্ত্রহীনকে বস্ত্র না দিয়েও তিনি ছিলেন অতি দানশীল। সেবাতেই তাঁর আনন্দ এবং তা ছিল আন্তরিকতায় পূর্ণ। মঠের একটি উৎসবে দরিদ্র নারায়ণ সেবার ব্যবস্থাপনায় আলোয় উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলের ছবি আমার স্মৃতি পটে আজও উদিত হয়। এসব সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে 'উপকার করছি' এই ভাব কখনো প্রকাশিত হতো না। রামকৃষ্ণানন্দের সেবার মনোভাবটি ছিল প্রথা বহির্ভূত। একদিন তিনি সেবার সংজ্ঞা আমায় দিলেন ঃ "অপরের সেবাই আত্মোন্নতির উপায়"। "অপরকে সাহায্য করাই দাতার একটি বিশেষ সুযোগ এবং গ্রহীতার দাতার প্রতি কোন অনুগ্রহ থাকে না।" আরও বলেন ঃ "আমাদের অপরের সেবা

করা প্রয়োজন। কারণ এতে আমাদের নিজেদের হীনমন্যতা ও স্বার্থপরতা দূর হবে এবং এজন্য গ্রহীতার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। কারণ তারাই আমাদের আত্মোন্নতির সুযোগ দেয়। এইটি প্রকৃত পথ যা অপরের জন্য কোন কিছু করা হয়। আমরা নিমিত্ত মাত্র।" অন্যের জন্য এরূপ কোন স্বার্থহীন কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে রামকৃষ্ণানন্দের তীব্র প্রতিক্রিয়া হতো। কেউ কোন ভালো কাজের জন্য দম্ভ প্রকাশ করলে তিনি কখনোই তার প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন না। তাঁর কাজে সেবার গুরুত্ব বিবেচিত হতো শুধুমাত্র কোন জিনিস প্রদানের জন্য নয়—"আমি দিচ্ছি না"—এই ভাব না থাকার জন্য। তিনি বলতেন—"গ্রহীতা উঠে দাঁড়াক ও অনুমতি দিক, দাতা নতজানু হয়ে ধন্যবাদ দিক। কারণ গ্রহীতা তাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছে। ইহা কোন অতিরঞ্জন নয়। বরঞ্চ বাস্তব সত্য। অন্যের উপকারে তোমার লাভ কি? এতে তোমার হৃদয় প্রসারিত হয় ও তুমি নিঃস্বার্থপর হও। মনে কর যদি কোন গ্রহীতাই নেই তাহলে তোমার অবস্থা কি হবে? তখন তুমি একটি স্বার্থপর নির্দয় দানবে পরিণত হবে।" তিনি আরো বলেন ঃ "তুমি যদি আর্তকে সুখী করার জন্য কিছু কর। তাতেই সন্তুষ্ট থাক। এইটি তোমার সঠিক কর্ম। কখনোই কারুকে দুঃখ দেবার চেষ্টা করো না। কারণ এটা পাপ।"

গরমের সন্ধ্যায় একদল বন্ধু তাঁদের অফিস থেকে সরাসরি মঠে আসেন। তাঁরা প্রায়ই আসেন। তাঁরা এসে হলের উত্তরের দরজার কাছে রামকৃষ্ণানন্দকে ঘিরে বসতেন। তাঁদের সাথে কথা বলার সময় তাঁর মুখ উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হতো, তাঁর দেহটি দুলত। সেই সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হতো। তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেন—"যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, ততক্ষণ মানুষের জন্য কাজ করা কি সম্ভব?" রামকৃষ্ণানন্দের উত্তর ঃ "কর্ম, অন্যের জন্য কর্ম করা বলতে তুমি কি বোঝ? ঈশ্বরের আদেশ ছাড়া তুমি কিছুই করতে পার না। ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত অন্যের জন্য কর্ম করলে তুমি সংসারে হারিয়ে যাবে।" কিছুক্ষণ থেমে তিনি আবার বললেন ঃ "তুমি যদি অন্যদের সাহায্য করতে চাও, তাহলে তুমি প্রত্যেকের গুণই দেখবে। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু তুমি সেগুলিকে উপেক্ষা করে ভালোটুকু নেবে এবং যদি বা কারো দোষ চোখে পড়ে তা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে।"

যখন রামকৃষ্ণানন্দ সাধারণ ভাবে কোন কিছু উপদেশ দিতেন, তখন তাঁর ভাব খুব ভালোভাবে প্রকাশিত হতো। শ্রোতার সংখ্যার দিকে কখনই তিনি

দৃক্‌পাত করতেন না, তা দুজন দু-শত বা দু-হাজার হোক না কেন। তিনি সমান তেজ ও আন্তরিকতার সঙ্গে তার বক্তব্য প্রকাশ করতেন। শ্রোতার সংখ্যা দিয়ে কখনোই তিনি অনুপ্রেরণার পরিমাপ করতেন না। তাঁর অনুপ্রেরণা আসত স্বাভাবিক ভাবে—তাঁর অন্তর থেকে।

একবার তিনি সুদীর্ঘ সময় ধরে কোন উচ্চভাবের কথা বলছিলেন, সে সময়ে আমি আবেগে বললাম ঃ "স্বামীজী, আপনি আমার কাছে এমনভাবে কথা বলছেন যে যেন আমি সহস্র শ্রোতাদের মধ্যে একজন।" "তুমি তাই ছিলে"। তিনি শান্তভাবে উত্তর দিলেন। তবে তিনি কোন সভায় বক্তৃতা দিতেন বা আবার ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা করতেন তখন তাঁর সব কথাই ছিল নিজস্ব ভাবের। তিনি আমার কাছে একদিন বলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে জগৎকে এক বিশেষ বাণী দেবার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন যা তিনি স্বামী বিবেকানন্দকেও দেন নি। এই সঙ্গে আরও বলেন ঃ "স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছিলেন বৃহৎ সার্বজনীন বাণী, কিন্তু ক্ষুদ্র বাণী ছিল শুধুমাত্র আমারই জন্য।" এই বাণী তিনি দক্ষতার সঙ্গে ও সাহসের সঙ্গে প্রচার করেছেন—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য তিনি কোন কৃতিত্ব দাবি করেন নি। বক্তৃতায় বা ক্লাশে তিনি কদাচিৎ নিজস্ব অনুভবের কথা বলতেন। তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সব বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ যা তিনি সর্বদাই উল্লেখ করতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বাগ্মী ছিলেন না, এমনকি বাক্‌পটুও নন। তবু যা বলতেন তা ছিল প্রাণপ্রদ। অন্তরের অনুভূতি থেকে বলতেন। কখনোই তিনি শ্রোতাদের উদ্দীপিত করার জন্য বা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বাক্‌চাতুরীর আশ্রয় করেননি। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সহজ সরল ভাষায় শ্রোতাদের মনকে নতুন নতুন চিন্তাধারায় উজ্জীবিত করা। সাহায্য করার চেয়ে উদ্বুদ্ধ করতেই তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন। যাঁরা শুনতেন তাঁরা নিজেরাই হতেন উদ্দীপিত।

তাঁর বাণী ছিল অতি উচ্চশ্রেণির। তিনি কখনো আমাকে তাঁর পদ্ধতি বা অভিপ্রায়ের কথা বলেননি। কিন্তু আমার বিশ্বাস—যেহেতু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পথ অবলম্বন করেছিলেন যা তিনি জগৎকে সেই একই ভাবের কথা বলেছেন—একথা আমি বিশ্বাস করি। তাঁর আবেদন ছিল সর্বদাই মর্মস্পর্শী। "তুমি পবিত্র পূর্ণ ও দেবস্বরূপ"—এই কথা বারংবার তাঁর মুখে উচ্চারিত হতো। একজন মানুষ দড়িকে সাপ বলে ভুল করতে পারে, কিন্তু কোন কল্পনাই দড়িকে সাপে পরিণত করতে পারে না। তেমনই তুমি পাপী বা অপরাধী ভাবলেও কোন

কিছুই তোমার পবিত্রতা বা দেবত্বকে পরিবর্তন করতে পারে না। ইহা সর্বাবস্থায় অপরিবর্তনীয় এবং তুমিই সর্বদা তৎস্বরূপ।"

"ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া কেউ তার অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে না। তা যতই অবিনাশী হোক না কেন!" শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সহজ ভাবে বলেছেন ঃ "এই মায়া যার দ্বারা আমি নিজেকে আবৃত করে রেখেছি, যা কেউ ভেদ করতে পারে না। যারা আমার শরণাগত হয় তারাই একমাত্র পারে। আবার যদি তুমি তোমার অনন্ত স্বরূপের জ্ঞান লাভ করতে চাও, তাহলে এমন একজনের কাছে যাও, যিনি নিজে সেই অনন্তকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর সেবা কর, তারপরে তুমি তোমার সন্দেহের কথা উত্থাপন করো। তখন তুমি জ্ঞান লাভ করবে। অর্থাৎ তোমাকে নিরহঙ্কার হতে হবে।"

জাগতিক সমস্যায় জর্জরিত কোন ব্যক্তি রামকৃষ্ণানন্দকে মনে করত অতীন্দ্রিয় জগতের মানুষ বলে। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃত বাস্তববাদী। তাঁর মতে সকল প্রকার উদ্বেগের প্রকৃত সমাধান হলো ঈশ্বরানুভূতি।

যখন আমাদের মনে দুঃখ ও জটিলতার সৃষ্টি হয় তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছি। ঈশ্বর কিন্তু আমাদের সকলকে দেখেন। যদি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রকৃত বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমরা কখনোই উদ্বিগ্ন হবো না। তিনি জানতেন যে সমস্যার সমাধান কখনওই সমস্যামুক্ত করতে পারে না, বরং নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। মুক্তির একমাত্র উপায় হলো এই বিরামহীন জটিলতার শিকলকে ছেদন করা। এর একমাত্র উপায় সকল জাগতিক বস্তুর চেয়ে শ্রেয় সেই ঈশ্বরকে নিজ অন্তরে অনুভব করা।

"কেন তুমি তোমার পূর্ণতাকে ভুলে অপূর্ণতাকে গ্রহণ করবে?"—তিনি জিজ্ঞাসা করেন। "কেন অনন্ত জীবন ত্যাগ করে ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে গ্রহণ করতে চাও? তুমি নিজেকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছ। সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, অবিনাশী অনন্ত পুরুষ মনে করছে সে মরণশীল, সীমাবদ্ধ, অজ্ঞ, দুর্বল ও অসহায়। তুমি পবিত্র অপাপবিদ্ধ। অলীক কল্পনাকে প্রশ্রয় দিও না। এই মিথ্যা কল্পনা তোমাকে তৈরি করবে যা তুমি কল্পনা করছ। তুমি ঠিক সেই ব্যক্তিটির মতো মিথ্যা শোন যে—তোমার সব ভবিষ্যৎ হারিয়েছ এবং এখন জিজ্ঞাসা করছ ঃ 'আমি কি করব? কিভাবে আমি বাঁচব?' "আমারও সর্বদা আগেকার মতো সম্পদ আছে। তুমি মনে করছ যে তুমি দুঃখী ও অসহায়; কিন্তু তুমি তোমার অনন্ত গরিমা হারাও নি। তুমি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ, আনন্দময় ও অমর।"

"তোমার বাহ্য অবয়ব শুধুমাত্র যন্ত্রস্বরূপ ও তুমি একে সীমিত করতে পার না, যদি না তুমি কিছু কর। প্রকৃতপক্ষে তোমার কিছুরই প্রয়োজন নেই। তুমি পূর্ব থেকে পূর্ণই আছ, কিন্তু তুমি তা বিস্মৃত হয়েছ। প্রকৃত রত্ন ছুঁড়ে দিয়েছ, আর রাস্তায় নুড়ি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছ। পৃথিবীর সকল তুচ্ছ বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়ো না। শিশুর খেলনার মতোই এই বিশ্ব, একে ছুঁড়ে ফেলে দাও। অনন্ত ঐতিহ্যের অধিকার দাবি কর। এই ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীবন তোমার নয়। তোমার জীবন আদি অন্তহীন।"

(৬)

স্পেনের বিখ্যাত কারমেলাইট সন্ন্যাসী ও অতীন্দ্রিয় ব্যক্তি সেন্ট জন ক্রশ তাঁর আধ্যাত্মিক বাণীতে বলেছেন ঃ "বিশ্বাস হলো আত্মার শ্রেষ্ঠ নির্ভরস্থল।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এই শ্রেষ্ঠ আশ্রয় স্থলেরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। যদি কখনও সন্দেহের ঝড় তাঁর মনকে প্রভাবিত করত, তাহলে তিনি একাই নীরবে অতিক্রম করতেন। কখনও তিনি অন্যের কাছে তা প্রকাশ করেননি। যে কোন পরিস্থিতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল অজেয়। যৌবনকালে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত কালে তিনি বৃথা প্রশ্নের দ্বারা জর্জরিত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে তা নিমেষেই দূরীভূত হলো। তাঁকে অবশ্য চরম পরীক্ষা দিতে হয়েছিল এবং কখনো কখনো তাঁর ব্যবহারিক জীবনে এমন মুহূর্ত এসেছিল যে মনে হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে পরিত্যাগ করে দিলেন। তাঁকে উদাসীনতায় ঠেলে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস কখনো চ্যুত হয় নি। একদিনের কথা এখানে উল্লেখ করি। তাঁর বিশ্বাসের এক জায়গায় টলমল ছিল যে তিনি তাঁর দুহাতে মুখ ঢেকে পরিত্রাণের জন্য চিৎকার করেছিলেন এবং তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সেই সর্বাবস্থায় তাঁর পরিত্রাতার প্রতি কোন সন্দেহ করেন নি।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে বিশ্বাসই ছিল আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান স্তম্ভ। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে বিশ্বাস ব্যতীত সত্যিকার ভক্তি, এমনকি উচ্চ অনুভবও কোন জীবনে সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে একদিন তিনি বলেন "ঈশ্বর বিশ্বাসই হলো আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের ভিত্তি। যদি তুমি ঈশ্বরে ভক্তি ও সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অপরদিকে রাখ তাহলে আমি ঈশ্বরের ভক্তিই বেছে নেব। সেই ধন্য যার ঈশ্বরে ভক্তি আছে। সকল মানুষের মধ্যে সেই সত্যকার সুখী, কারণ সে সকল উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্ত। আমরা সকলেই সেই ঈশ্বরের হাতের পুতুল

মাত্র। যখন আমরা বুঝতে পারি তখন সব গর্ব, আকাঙ্ক্ষা, মিথ্যা ও অহংকারের অবসান হয়। এ কারণেই সেই ধন্য যার বিশ্বাস আছে। কারণ সে তার নশ্বরতা বুঝতে পেরেছে।"

এক সন্ধ্যায় মায়লাপুর মঠে সমাগত অনেক দর্শনার্থীদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করেন—"আমরা কিভাবে প্রহ্লাদের মতো ভক্তি লাভ করতে পারি?" এর উত্তরে রামকৃষ্ণানন্দ বলেন—"যতই তুমি তোমাকে পবিত্র করতে পার, ততই বিশ্বাস আসবে। যদিও প্রহ্লাদকে ফুটন্ত তেলে, মত্ত হস্তীর পদতলে ও উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার কোন আঘাত লাগেনি। কারণ তার বিশ্বাস ছিল জ্বলন্ত। কিন্তু তাঁর এটা অন্ধবিশ্বাস নয়। তাঁর সেই বিশ্বাস উপলব্ধি সঞ্জাত। যদি তোমার মধ্যেও সেই বিশ্বাস থাকে তুমিও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকেও শক্তিশালী হবে। কোন কিছুই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।"

আমাদের বিশ্বাসও খুব দৃঢ় নয়। আমাদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র সর্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। আমাদের পকেটে যদি মাত্র তিন চারিটি টাকা থাকে, আমরা মনে করি আমরা আত্মনির্ভরশীল। শেষ পয়সাটি যখন ব্যয় হয়, তখনও জানি না কোথা থেকে আর একটি পয়সা পাব। তখন আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শুরু করি। যে মানুষ নিজের উপর নির্ভর করে সে কখনও বিপন্মুক্ত নয়। আর যে মানুষ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, সে কখনো বিপদে পড়ে না। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দৃঢ়ভক্তি তাঁর বিশ্বাসের স্বাভাবিক পরিণতি। তাঁর গুরুর নামেই তাঁর সন্ন্যাস নাম ছিল এর দৃষ্টান্ত। উপলব্ধিবান মহাপুরুষের কাছে আধ্যাত্মিক জীবনগঠন করেছিলেন বলেই তিনি অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সর্বদা তিনি এভাবেই থাকতেন বলে কেউ তাঁর সমীপে আগমন করলে অনুভব করতে পারত। তিনি নির্লিপ্ত হলেও উদাসীন ছিলেন না। তিনি অলসতা ও উদাসীনতাকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। মানুষ অবশ্যই ঈশ্বরকে সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে যদি সে চায়, তাঁর নিজের কথায় বলি—"যদি তুমি বুঝতে পার যে, সমগ্র জগতের সব কিছুর সত্তার পশ্চাতে একমাত্র সেই ব্রহ্ম আছেন, তাহলে তুমি তা অবশ্যই অনুভব করতে পারবে। মন-প্রাণ ঢেলে জীবন্ত মানুষের পূজা করতে হলে মরণশীল বস্তুর পূজা পরিত্যাগ করতে হবে। নচিকেতার মতো চরম সত্য ছাড়া সকলই অসার বোধ করতে হবে। ঐশ্বর্য, রাজত্ব, ভোগবিলাস ও ক্ষমতা তার কাছে একেবারে শূন্য ছিল। তিনি একমাত্র সত্যই

চেয়েছিলেন। এজন্য সত্য তিনি অনুভবও করেছিলেন। তোমারও নচিকেতার মতো পার্থিব জগৎ সম্বন্ধে যদি একই দৃঢ় ধারণা হয়, ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরলাভ করার চেষ্টা কর। তাহলে তিনি তোমার কাছে প্রতিভাত হবেন।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কখনই আপস করেননি এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের নিকট চাইতেন। ঈশ্বর লাভ বা আধ্যাত্মিক দর্শনের জন্য কোন বিনিময়ের প্রশ্নই ওঠে না। এর জন্য শুধুমাত্র একদিগ্-দর্শী পথই প্রয়োজন। এ বিষয়ে একদিন তিনি আমায় বলেন—"একমাত্র ভক্তিযোগই পথ। কর্মযোগী হয়তো বলবে সে বৈরাগ্য বা অনাসক্তির দ্বারা সত্যকে লাভ করবে। জ্ঞানী হয়তো বলবে নিত্যানিত্য বিচারের দ্বারা এবং রাজযোগী মনঃসংযমের দ্বারা। কিন্তু কর্মযোগীর যদি অনাসক্তির প্রতি অথবা জ্ঞানীর বিচারের প্রতি কিংবা রাজযোগীর মনঃসংযমের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে, তাহলে সে সত্য উপলব্ধি করতে পারবে না। ভক্তিই সকলের একমাত্র পথ।"

কেউ জিজ্ঞাসা করল ঃ "কোন্ ভক্তি আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়?" এর উত্তরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বললেন ঃ "ছেলের মায়ের প্রতি ভক্তি।" "কিন্তু এ কি তাঁর কাছে পৌঁছানোর যুক্তি সংগত উপায়?" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তৎক্ষণাৎ উত্তর ঃ "কতক্ষণ বিচার? যতক্ষণ না সত্যে উপনীত হচ্ছ। কেন শিশু মায়ের কাছে যায়? কারণ সে জেনেছে মা-ই তার প্রকৃত বন্ধু এবং তুমি ঈশ্বরের কাছে কেন যাও? কারণ তুমি জেনেছ একমাত্র তিনি ছাড়া অপর কেউ তোমায় সাহায্য করবে না। তাই শিশু যেমন মায়ের কাছে যায়, তুমিও তেমনি ঈশ্বরের নিকট যাবে।"

উপস্থিত জনৈক প্রশ্ন রাখলেন, "গীতায় একনিষ্ঠ ভক্তি বলতে কি বোঝায়?" এর উত্তরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বললেন—"একনিষ্ঠ ভক্তি বলতে বোঝায় যে তুমি নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও তোমার মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট হয়ে আছে। হয়তো তুমি এভাব সর্বদা অনুভব করতে পারবে না, কিন্তু যতক্ষণ তোমার মধ্যে ঈশ্বরানুরাগের ব্যাকুলতা থাকবে ততক্ষণ তোমার ভক্তিপথে একনিষ্ঠতা থাকবে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ভক্তির পরাকাষ্ঠা ছিল অতুলনীয় যা তাঁকে সম্পূর্ণ শরণাগতির পথে নিয়ে গেছল। তিনি আদর্শের জন্য সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন এবং কখনো নিজের ইচ্ছার দ্বারা চালিত হননি। তার কাছে অর্পণ শব্দের অর্থ হলো আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ জয়। তিনি বলেন, "শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য অবতারপুরুষরা ঈশ্বরলাভের বিভিন্ন পথ নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাদের

সকলের শেষ কথা শরণাগতি। সম্পূর্ণ অহংকার শূন্য হতে না পারলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তোমায় জানতে হবে যে তুমি নিজে কিছুই করতে পার না।"

যত দিন তোমার এ জ্ঞান না হয় ঈশ্বর লাভ সুদূর পরাহত। যদি মানুষ কোন বস্তুকে সঠিক ভাবে আত্মবিশ্লেষণ করে ও কোন বস্তুর সঠিক স্বরূপ চিন্তন করে, তবে বুঝতে পারে যে সে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর চালিত ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তখন তিনি বলেন, "যখন মানুষ অহংকার নাম যশ এবং বিষয় নিয়ে মত্ত থাকে, হে ঈশ্বর, তখন তোমাকে লাভ করার আশা সুদূর পরাহত। তুমি কেবল তাদের নিকটই নিজেকে প্রকাশিত কর যাদের আপন বলে কেউ নেই। তুমি দরিদ্র, নির্যাতিত, সর্বহারাদের জন্য। হে ঈশ্বর, আমার নিকট প্রকাশিত হও। আমার যা কিছু আছে সব তোমারই। আমার কখনও নয়। তুমিই আমার সর্বস্ব সম্পদ।"

"শরণাগতি ছিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রিয় বিষয়। তিনি বারবার এই বিষয়ে বলতেন এবং যখন এ সম্বন্ধে বলতেন তাঁর কথা অন্তর স্পর্শ করত। তিনি বিশ্বাস করতেন—আধ্যাত্মিক সিদ্ধি তার লাভ হবে যার ইচ্ছা ও শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবার শক্তি আছে। সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুলাভের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যই দিতে হয়।" এক সন্ধ্যায় তিনি আমায় বলেন ঃ "মানুষ প্রায়ই শরণাগতিতে ভয় পায়। সেভাবে যে সে কিছু হারাবে। কিন্তু ঈশ্বরকে সর্বস্ব নিবেদন করলে তার কোন কিছুই হারায় না, বরঞ্চ শুধুমাত্র ঈশ্বরে শরণাগতি যুক্ত মানুষই সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হয়। কারণ ঈশ্বরই তখন তার মাধ্যমে কাজ করেন, তার চোখ দিয়ে দেখেন, তার জিহ্বার দ্বারা কথা বলেন এবং তিনি ঈশ্বরের হাতের পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রস্বরূপ হন। তিনি সর্বকার্যে ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত হন।" ঈশ্বরের কাছে সর্বদা প্রার্থনা করবে ঃ "হে ঈশ্বর, আমি যেন আমার তুচ্ছতাকে বুঝতে পারি এবং তুমিই সর্বব্যাপী—এই অনুভূতি জানতে পারি। আমি তোমার হাতের যন্ত্রস্বরূপ এবং তুমিই সব কিছু কর—এই ভাবটি তুমি আমায় জানিয়ে দাও। যখন মানুষ এটা বুঝতে পারে তখনই সে প্রকৃত সুখী হয়, কারণ সে নিরুদ্বেগ বোধ করে। সে নিজে জানে যে তার সব কাজ ঈশ্বর চালিত এবং ঈশ্বর কখনোই তাকে ভুল পথে চালিত করবে না। যখন মানুষ তার নিজের দায়িত্বে কোন কাজ করে, তখন তার ভুল হতে বাধ্য। কিন্তু যে ঈশ্বরের শরণাগতি নিয়ে কাজ করে সে সর্বদা জ্ঞানীর মতো কাজ করে।"

(৭)

মধ্যযুগীয় খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে আমরা এক তরুণ সন্ন্যাসীর কথা পাই, যিনি ব্রাদার গিলের (সেন্ট ফ্রান্সিস অব আসিসির প্রথম দিককার অনুগামী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী) কাছে গিয়ে অনুযোগ করেছিলেন যে তাঁর দৈনন্দিন কাজের তুলনায় প্রার্থনার সময় খুবই কম। ব্রাদার গিল তাঁর দিকে তাকালেন ও কঠিন স্বরে বললেন, "যদি প্রভুর কাছে ভিক্ষা পেতে চাও, প্রথমে তার কাজ করো।" এই কথাগুলি যেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দেরই কথা। অবিকল তার ভাব প্রকাশক ও মনোমতো। তাঁরও প্রার্থনায় প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল; কিন্তু তা কাজ এড়ানোর জন্য নয়। একবার আমি তাঁকে কোন এক ভক্তের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছিলাম—সে যেন প্রতিদিন প্রভুর নিকট প্রার্থনা নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে করে। কিন্তু কখনো আমি শুনিনি যে তিনি অন্যদের হয়ে প্রার্থনা করেছেন, অথবা, অন্য কেউ এসে তাঁকে তাঁদের হয়ে প্রার্থনা করতে বলছেন। যদি কেউ বলত তাহলে হয়তো তারাও সেই উত্তর পেত যা ব্রাদার গিল কোন একজনকে বলেছিলেন : যখন সে এসে অনুতাপের স্বরে বলেছিল, "আমার জন্য প্রার্থনা করবেন"। ব্রাদার গিল জবাব দিয়েছিলেন : "তুমি নিজেই কেন নিজের জন্য প্রার্থনা করছ না।"

যারা ভগবানের কাছে নালিশ জানাতো কিংবা ভিখারির মতো ভিক্ষে করতো তাদের প্রতি রামকৃষ্ণানন্দের খুব কম সহানুভূতি ছিল। প্রার্থনা একজনকে বীরে পরিণত করে ভিক্ষুকে নয়। প্রার্থনায় ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়া যায়—এটি প্রশংসনীয় ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক কাজ। বর্ণনার কোন প্রয়োজন নেই। ভগবানের সান্নিধ্য একজনকে সব বৈষয়িক বাসনা থেকে মুক্ত করে। রামকৃষ্ণানন্দের নিজের কথায়—"কেউ যদি ঘোরতর স্বার্থপরের মতো কোন প্রার্থনা করে তবে সে ঘোরতর স্বার্থপর হোক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু দাবি করুক—তা হলো শ্রীভগবানকে লাভ করা।"

রামকৃষ্ণানন্দ কিছুই চাইতেন না। তাঁর কাছে স্বর্গ, এমন কি মুক্তি এতই তুচ্ছ ছিল যে তিনি তা চাইতেন না। তিনি বলতেন : "মায়া স্বর্গ সৃষ্টি করেছে; মানুষকে মোহিত ও প্রলুব্ধ করার জন্য। মাঝ সমুদ্রে অতি সুন্দরী সমুদ্র দানবীদের কথা আমরা শুনেছি যারা এত মধুরভাবে গান করে যে নাবিকরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাদের নিকটে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যখনই তারা নাবিকদের স্পর্শ করে, তখনই তারা পশুতে পরিণত হয়। সেইরকম, এই স্বর্গীয় সুখ ও ভোগ্যবস্তু

সমুদ্র দানবীদের মতো এই সংসার-সমুদ্রের নাবিকদেরকেও প্রলুব্ধ করে এবং যখনই তারা তাদেরকে স্পর্শ করে তারা দানবে পরিণত হয়। শাস্ত্র বলেন ঃ ঘুমানো, খাওয়া, বংশবৃদ্ধি করা—এই তিনটিতে আমাদের সঙ্গে পশুদের মিল আছে এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই এর চেয়ে আরো বেশি। যতক্ষণ না আমরা পশুবৃত্তির উর্ধ্বে উঠেছি, ততক্ষণ আমরা মায়া দানবীদের জালে থাকবো।

রামকৃষ্ণানন্দ বলতেন—"স্বর্গ কখনোই আমাদের আদর্শ নয়, কারণ এটির এতই ক্ষুদ্র লক্ষ্য যে তা আমাদের চেষ্টা করা উচিত নয় এবং তা আমাদের উচ্চতর অপার্থিবও কিছু দেয় না। স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করার প্রচেষ্টা আধ্যাত্মিকতা লাভের পথে বিঘ্ন হয়।" তিনি আরো বলতেন ঃ কর্মমুক্তি স্বর্গে নেই, নরকেও নেই। কেবলমাত্র এই পৃথিবীতে লোকের কর্মমুক্তি হয়। আর এর জন্য ঈশ্বরলাভ প্রচেষ্টা করতে হবে। এমনকি, যদি কোন দেবতা মুক্ত হতে চান, তবে তাঁকে এই পৃথিবীতেই জন্ম গ্রহণ করতে হবে। স্বর্গ হচ্ছে সর্বদা আনন্দ ও ভোগের স্থান। শাস্ত্র বলেন ঃ "এই জগৎ ও পরবর্তী লোকের ভোগবাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে।"

পাশ্চাত্যের একটি ধারণা হলো—মুক্তি ও স্বর্গ সমার্থক, কিন্তু ভারতে তা নয়। পাশ্চাত্যে এই ভ্রমের কারণ—একমাত্র সুখই জীবনের উদ্দেশ্য; কিন্তু ভারতে মুক্তিই একমাত্র কাম্য। এক দুপুরে আলোচনার সময় স্বয়ং রামকৃষ্ণানন্দ এ-বিষয়ে একই মত পোষণ করেন। "মুক্তির অর্থ স্বর্গে যাওয়া নয়। আমি ঈশ্বরময় এই উপলব্ধি করতে হবে, যদি তুমি বিশিষ্টাদ্বৈতী হও। যদি তুমি অদ্বৈতবাদী, তাহলে আমি এবং তিনি (ঈশ্বর) এক।" মুহূর্তের চিন্তার পরে তিনি বললেন—"যতক্ষণ মানুষ তার অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে এবং বিশ্বাস করে যে সে কর্তা, তাহলে সে কখনও ভগবানের প্রতি টান অনুভব করতে পারে না। একমাত্র যখন সে নতজানু হয়ে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়, তখনই তার মন ঊর্ধ্বগামী হয়। তখন সে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে যে আমি কিছুই করি না। হে ভগবান, তুমিই কর।" তখনই সেই পরম শক্তির প্রভাবের প্রকাশ শুরু হয়। যে মানুষ ভগবানের চরণে শরণাগত হয়ে বলে—এই সব তোমার; আমার দেহ, মন ও আত্মা সব কিছু তোমার, আমি অসহায়, তুমি আমায় কৃপা কর—সেই মানুষের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে ভগবান তাঁর হাত, পা, কান, চোখ ইত্যাদিকে তাঁর যন্ত্রস্বরূপ করেন। ভগবান তাঁর মাধ্যমে কথা বলেন, তাঁর হাতের মাধ্যমে কাজ করেন, তাঁর পায়ের মাধ্যমে চলেন। তখনই সেই মানুষ ভগবানের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়। এই হচ্ছে মুক্তি।"

আবার এক মুহূর্ত নীরব। তার চিন্তা স্রোত নিঃশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে। তারপর তিনি বললেন ঃ "ভক্তির দ্বারা হৃদয় পূর্ণ কর, স্বভাবতই সহজে তোমার মন ভগবানের প্রতি ধাবিত হবে। প্রকৃত ভক্ত নিজের সম্বন্ধে কখনই চিন্তা করে না। ভগবানে সে এত মগ্ন যে সে নিজেকে পর্যন্ত ভুলে যায়। মুক্তির জন্য এই শ্রেষ্ঠ উপায়।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের এই হলো মুক্তির উপর অভিমত।

ভগবান দর্শন কর ও নিজেকে ভুলে যাও। আর ভগবান দর্শনের জন্য শরণাগত হও। মুক্তি ও শরণাগত শব্দ দুটি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কথার সমার্থক। তিনি বলতেন ঃ "সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হও। যে মুহূর্তে তুমি সব কিছু ত্যাগ করে জানতে পারবে যে তুমি কিছুই নও, তখনই ভগবদ্দর্শন হয়ে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।"

অন্য একসময় তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় তৎক্ষণাৎ মুক্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তখনই এরূপ হবে যখন সে অনুভব করবে যে সে নিজে কিছুই নয়, ঈশ্বরই সব কিছু। যখন সে এইটি অনুভব করে তখন তার মুক্তি অনায়াসেই আসে। আমাদের ভগবৎ দর্শন কেন হয় না? কারণ আমাদের মধ্যে থাকে স্বার্থপরতা, অহংকার, বাসনা, দম্ভ, দর্প। এই সমস্ত দোষগুলি যত আমরা কমাতে পারি ততই আমরা ভগবানের সান্নিধ্য পাব। যদি আমরা এই দোষগুলি থেকে মুক্ত হতে পারি, তখনই আমরা মুক্তি লাভ করব।"

"আমরা যত বেশি আমাদের মন ভগবানে নিবিষ্ট করব, যতই আমরা নিজেকে ভুলতে পারব এবং ততই আমরা মুক্ত হবো। এটি করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো নিজেকে ভুলে ভগবানে মন একাগ্র করা।"

তিনি আরো বলেন, "যে ভগবান লাভ করেছে তার কোন অভাব থাকে না। তার প্রয়োজনীয় বস্তু তার কাছে পৌঁছে যায়। প্রথমেই স্বর্গ খোঁজ, তার পরে সব জিনিস তুমি পাবে—যিশুর উক্তিও এই ছিল। এটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল এবং ইতিহাসই এর প্রমাণ করে। যাঁরা ভগবানের জন্য সর্বত্যাগ করেন, ভগবান ছাড়া আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না। তারা এই বিশ্বে সম্মানীয় ও পূজ্য হন।

সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের শরণাগত হও, তখনই মুক্তি তোমার করলতলগত। তোমার আননের অধরে মৃদু হাস্য থাকবে, মুখমণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে আভাসিত হবে, তোমার মন নির্মল ও শান্ত হবে।"

(৮)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা। কোন সমস্যার সমাধানকে তিনি অর্ধসমাপ্ত রাখতেন না। ঐ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেই সমস্যা বিষয়ে কথা বলতেন, চিন্তা করতেন, ধ্যান করতেন। আমার মনে পড়ে মহাকাশ ও চিদাকাশের মধ্যে সম্বন্ধের জন্য তাঁর অবিরাম প্রয়াস। তখন তিনি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন, তিনি বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা, ঐ বিষয়ে চর্চা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানও করতেন। আমৃত্যু তাঁর এই অভ্যাস ছিল। তাঁর সমাধান সর্বদা সঠিক ছিল। তাঁর চিন্তায় অস্পষ্টতা ছিল না, ছিল দৃঢ়তা ও যুক্তিপূর্ণ। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসতো প্রত্যাবর্তনের সময় তারা অনুভব করত তাঁর ভালোবাসা ও সাদর অভ্যর্থনা। যখন কোন দর্শনার্থী আসতেন তখন তিনি হলঘরে নিজের আসনে বসেই দেব দুর্লভ হাসির সঙ্গে তাকে স্বাগত জানাতেন এবং ইশারায় তাঁকে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বসতে বলতেন। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাঁরা প্রতিদিন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং তাঁর আলোচনা শুনতেন। এভাবে তাঁদের মধ্যে চিন্তাস্রোত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতো। কোন কোন দিন অতি সাধারণ জিজ্ঞাসা থাকত।

একদিন একজন ভক্তের প্রশ্ন ছিল—নৈতিকতা কাকে বলে? স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উত্তর ছিল ঃ "নৈতিকতা হলো আমাদের ভগবান সমীপে নিয়ে যাওয়া। আর যা আমাদের ভগবানের থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা হলো অনৈতিকতা।

তিনি আরো বলেন ঃ "সমাজনীতি ও ধর্মনীতি আছে। যারা ভগবানকে অস্বীকার করে তাদের শাস্তি দেবার তিনি আদেশ দেন। তাদের শাস্তি কেন দেয়? কারণ তাদের ভগবানে শরণাগতি হবার জন্য। যিশু বলেছেন ঃ 'যখন কেউ তোমার একগালে চড় মারবে তখন তার দিকে তোমার অন্য গালটিও বাড়িয়ে দাও'—এই নীতিটি হলো ত্যাগীদের জন্য—সংসারীদের জন্য নয়। সমাজকে রক্ষার জন্য দোষীকে শাস্তি দেবেন। না হলে সব শুভ ধ্বংস হবে, দুষ্টের প্রভাব বাড়বে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, একজন ভগবান ছাড়া অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না। তার বাড়ি থাকতে পারে। অপর এক ব্যক্তি সেই বাড়িটি তার কাছ থেকে চায়। যে ব্যক্তি শুধু ভগবানকে চায়, সে বলতে পারে ঃ হ্যাঁ, তুমি নিয়ে নাও, আমার চাই না।"

শাস্তি শুধু খারাপই নয়। যদি শাস্তির দ্বারা কারুর সংশোধন করতে পারা যায় তাহলে শাস্তি তার মঙ্গলদায়কই হয়। তোমার কখনই দুষ্টুকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তোমার জমিতে অনেক আগাছা আছে। কিন্তু ভালো ফসল পেতে হলে আগে আগাছাগুলিকে নির্মূল করতে হবে। কিন্তু প্রতিশোধ স্পৃহা অত্যন্ত ক্ষতিকর। শয়তান সর্বদা প্রতিশোধ নিতে সচেষ্ট, ভগবান কিন্তু কখনও শয়তানের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না। তারা বলে যে ভগবান শয়তানদের পাতালে পাঠিয়ে দেন। একথা সত্য নয়, শয়তান নিজেই জ্বলতে এসেছে। কারণ সে স্বর্গে যা চায় তা পায় না। ভগবান শয়তানকে করুণার দৃষ্টিতেই দেখেন। কিন্তু শয়তানের সর্বদা থাকে ভগবানের প্রতি প্রতিশোধ, ঘৃণা ও হিংসা। এগুলি শয়তানের ও মাৎসর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পরবর্তী সন্ধ্যায় আলোচনা শুরু হয় অশুভের উৎপত্তি সম্বন্ধে। উপস্থিত ভক্তদের জনৈক প্রশ্ন করেন, "অশুভ কিভাবে এসেছে?" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উত্তরে বলেন, "দ্বৈতবাদীরা বলেন—মানুষের মধ্যে যা সদ্‌গুণ আছে তা ভগবানেরই। আর অসদ্‌গুণ মানুষের নিজের। অদ্বৈতবাদীরা বলেন সৎ ও অসদ্‌গুণ ভগবানেরই। বাস্তবে এই সমস্ত গুণ ভগবানেরই। সাধু ও পাপীকে ভগবানই কর্মে প্রবৃত্ত করান।"

"এক ব্যক্তি চিনির ছাঁচে গড়া আম, পাখি, কুকুর বিক্রি করছিল। ছোটছেলে তার পিতাকে বলে আমাকে ঐ পাখি কিনে দাও। কারণ, ছোট ছেলেটির ধারণা ঐ চিনির ছাঁচের পাখিটি আম কিংবা কুকুরের চেয়ে বেশি মিষ্টি। কিন্তু বাস্তবে ঐগুলি একই প্রকারের। ঠিক এ রকম মানুষ জগতকে দেখে আর ভাবে এ ভালো, এ মন্দ। প্রকৃতপক্ষে একই বস্তু হতে তৈরি। ভালো ও মন্দের স্রষ্টা ভগবান। কিন্তু ভগবান এই দুই-এর অতীত। এই ভালো মন্দের সৃষ্টি করে এদের জগৎ সংসারে লড়াই-এর জন্য ছেড়ে দিয়েছেন এবং নিজে সাক্ষী হয়ে দেখছেন সুখ ও দুঃখ, ভালো ও মন্দের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ভগবানের লীলামাত্র; এই সব সৃষ্টি ভগবানের হাসি মাত্র। একবার একজন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন : যখন ভগবান সবাইকে ভালো করতে পারেন তবে কেন তিনি মন্দ সৃষ্টি করেছেন? সবাইকে কেন ভালো করেন না? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উত্তর : 'তবে লীলা তিনি কিভাবে করবেন'?"

এর কারণ আমরা সৎ বস্তুকে অসৎ বলে আরোপ করি। আবার অসৎ বস্তুকে সদ্বস্তুর উপর আরোপ করি। এ আমাদের কাছে অহরহ ঘটছে।

ভগবানের লীলাকে সত্য বলে মনে করি; আর লীলাকারকে ভুলে যাই। একমাত্র ঈশ্বরই নিত্য আর তাঁর সৃষ্টি অনিত্য। আমরা নিজেদের জীবন দেখলেই বুঝতে পারি জীবন কত অনিশ্চয়তাতে ভরা—জন্ম-মৃত্যুও এর মধ্যে। মাত্র কিছুদিন আমাদের জীবন, অন্ধকার থেকে আমরা এসেছি; আবার অন্ধকারে ফিরে যাব। মাঝখানের দিনগুলিকে জীবন বলে।

প্রথমে কোন স্বপ্ন ছিল না। তারপরে স্বপ্ন দেখি। শেষে কোন স্বপ্ন নেই। এই স্বপ্ন যেমন অসত্য। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনও স্বপ্নের মতোই। যেরকম ঘুমের মধ্যে বা সুষুপ্তির মধ্যে স্বপ্ন দেখি তা অসত্য। যে কোন সময় মৃত্যু তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কথা বলতেন। সাংসারিক জীবনের নশ্বরতা, দ্বন্দ্ব ও দুঃখ তিনি গভীরভাবে অনুভব করতেন। এই জগৎ তাঁর কাছে কখনোই সত্য ছিল না। ভগবানের খেলাকে কখনও আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেননি। ভগবান একমাত্র বস্তু বলে সর্বদা মনে করতেন। তিনি কখনও দৈবী আবির্ভাব ভুলে যেতেন না। তিনি বলতেন ঃ "মানুষ ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তি। অর্থাৎ ঈশ্বরের সমস্ত শক্তিই মানুষের মধ্যে বর্তমান। সৃষ্টির ক্রমপর্যায় আছে। সৃষ্টির ক্রমপ্রকাশ হয়। যতই আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতি করব, ততই আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হবে। বিকাশের অর্থ অন্য কিছুর চাওয়া অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা। যখন মানুষ ভগবানকেই চায় তখন তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। আর যখন মানুষ জাগতিক কোন বিষয়কেই চায় তখন তার জাগতিক উন্নতি হয়। একই আকাঙ্ক্ষা বিভিন্নরূপে থাকে কীট, দেবদূত, মানুষ ও সাধকের মধ্যে। মানুষ কেন তার এই আকাঙ্ক্ষাপূরণের জন্য ভগবানের পূজা করে। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুদ্র দেবতার পূজার বিরুদ্ধে সাবধান করে দিয়েছেন। যারা ক্ষুদ্রদেবতার পূজা করে তারা ওর মধ্যেই সীমিত থাকে। কিন্তু আমার ভক্তেরা আমার আরাধনায় আমার কাছেই আসে। কোন্‌টি আমাদের কাম্য? ক্ষুদ্রদেবতা ও পরমেশ্বরকে লাভ করার কোন্‌টি কাম্য? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ যারা আমার শরণাগত আমি তাদের সব কিছু দিই, আমি তাদের যত্ন করি, আমি তাদের সেবক হই।"

প্রশ্ন ওঠে যে—মানুষ যা চায় তা কি সে করতে পারে? স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উত্তরে বলেন ঃ কখনও কখনও মানুষ মনে করে যে সে নিজে যা চায় তাই সে করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানই তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ভগবানই

একমাত্র কর্তা। মানুষ নিজে কিছু করতে পারে না।" সেই ভক্ত আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ "তবে মানুষের ভালো হওয়া বা ভগবান লাভ করার অর্থ কি?" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উত্তরে বলেন ঃ "তোমার স্বভাবই তোমাকে কর্মে প্রবৃত্ত করবে। তুমি এক মুহূর্তের জন্য কি পরম নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকতে পার? এই শরীর কর্মশরীর। তোমার হাত, পা, চোখ, কান স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কর্ম করে যায়। যতদিন তুমি কর্ম করবে ততদিন তুমি শুভফলদায়ী কর্মই করতে চাইবে। যতদিন তুমি কর্ম করবে, ততদিন তুমি ভালো হতে, ধার্মিক হতে, নিঃস্বার্থপর হতে চেষ্টা করবে। এইটি তোমার সর্বোত্তম কাম্য হওয়া উচিত। সুতরাং ভগবান লাভই যখন একমাত্র কাম্য, তা লাভ করার জন্য তোমার সবিশেষ যত্নপর হওয়া উচিত।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মধ্যে নিঃসঙ্গতার ভাব ছিল। কিন্তু সে ভাব লোক সংসর্গের অভাবের জন্য নয়। রাত্রির গভীর নীরবতা বা প্রভাবের উপর গভীর নৈঃশব্দ্য তিনি অল্পই পেতেন। নিদ্রাও হতো তার সামান্য। মঠের হলঘরটিতে তিনি বসতেন। সেখানে ভক্তদের আনাগোনা লেগেই থাকত। গৃহস্থরা আসতেন, দর্শনার্থীরাও আসতেন। সেবকরা পূজা বা ভোগের জন্য ফলমূল ও তরি তরকারি নিয়ে আসতেন। সারাদিনে নির্জনতার অবকাশই নেই। তবু যেন রামকৃষ্ণানন্দকে বড় একাকী মনে হতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তাঁর এই ভাব আসত সম্পূর্ণ নিঃশর্ত অনাসক্তি থেকে। এইভাবেই তিনি ভরপুর হয়ে থাকতেন। আমি জানি না—তিনি এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন কি না। এই বিষয়ে আমরা কখনো উত্থাপন করিনি। কিন্তু একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি এ সম্বন্ধে উল্লেখ করায় তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় যুক্ত উত্তর ছিল "আমি ঈশ্বরে পূর্ণ, আমার অন্য কাউকে কি প্রয়োজন?"

তিনি আর কিছুই বললেন না। কিন্তু এই চিন্তা হয়তো তাঁর মনে ছিল। কয়েকদিন পরে তিনি নিজেই এই প্রসঙ্গে বললেন ঃ "একাকীত্ব মানে অদ্বয়ত্ব। যখনই দুই আসে তখনই ভয়। আমরা মনে করি যে আমাদের সুরক্ষার জন্য একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। যদি রাত্রিতে আমাদের বাইরে যেতে হয় বা যদি কোনও অন্ধকার বাড়িতে আমরা প্রবেশ করি, তাহলে আমাদের আর একজন সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। আমরা বলি ঃ 'গোপালন আসুক, আমার একা যেতে ইচ্ছে করছে না।' প্রকৃতপক্ষে একাকীত্বের মধ্যেই অভয় আসে। যখন আমরা একাকী থাকি তখন নিজের ইচ্ছেমতো নাচি, গান গাই বা মুখ বিকৃতি করি—

যা ইচ্ছা তাই করি। কিন্তু যখনই কোন বন্ধু আসে তখন আমরা সাবধান হই—আমরা কি করবো। তখন জড়তার ভাব আসে। আমরা আত্মসচেতন হয়ে পড়ি। দুই থেকেই ভয়, যেখানে এক সেখানেই অভয়। সেজন্য যতক্ষণ ভয় ততক্ষণ আমরা অসুখী, আমরা অশান্ত। যদি আমি একা, আমি কিছুই চাই না, তাহলে আমরা তখন সুখী হব, শান্ত হব।"

উপরের কথাগুলি প্রমাণ করে যে তিনি মানুষের উপর একেবারেই নির্ভরশীল নন। ঈশ্বর সান্নিধ্যেই তিনি পূর্ণ ছিলেন। তবুও তাঁর হৃদয়ে মানুষের প্রতি ভালোবাসার কোন অভাব ছিল না। মানুষের প্রতি সর্বদাই তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। মানুষের ভুল বা ত্রুটিকে উপেক্ষা করতেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন ভুল হতো না। যদি তিনি কারুর দোষের কথা বলতেন তা তিনি সোজাসুজি বলতেন—কোন রাখ ঢাক ছিল না। তাঁর অন্তর ছিল সকলের প্রতি প্রেমময় করুণাপূর্ণ। একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন ঃ "সেই ভালোবাসা প্রকৃত ভালোবাসা নয়, যদি প্রেমাস্পদের প্রতি ঘৃণা বোধ হয়। প্রকৃত ভালোবাসা সর্বদাই গ্রহীষ্ণু এবং সার্বজনীন । যতদিন কোন মানুষের একজনও শত্রু থাকে এবং সে ঐ শত্রুর উন্নতি সহ্য করতে পারছে না, তাহলে সে জানেনা প্রকৃত ভালোবাসা কি? এ জন্যই যিশুখ্রিস্ট আমাদের বলেছেন ঃ "তোমার এক গালে কেউ চড় মারলে তাকে আর এক গাল বাড়িয়ে দাও। যদি কেউ আমার দৈনন্দিন ব্যবহৃত কৌপীনটি নিয়ে যায়, তবে তাকে আমার বহুমূল্য কোটটি দিয়ে দেব। তা সে যেই হোক না কেন। যতদিন না আমরা এইভাব অনুভব করি ততদিন আমরা প্রকৃত ভালোবাসা অনুভব করতে পারব না। প্রকৃত প্রেম অবশ্যই সর্বানুগ্রাহী।"

এর কিছুদিন পরে একজন দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "কিভাবে আমরা ঈশ্বরে অনুরাগ অভ্যাস করতে পারি?" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উত্তর ছিল ঃ "প্রেমের স্বভাবই সুন্দরকে ভালোবাসা। যখনই আপনি কোন সুশ্রী মানুষ দেখেন স্বভাবতই আপনি তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। আবিশ্বে ঈশ্বরই সর্বোত্তম, সুন্দরতম। সুতরাং তাঁকে ভালোবাসা কখনই কঠিন নয়। এখন তোমার মনে হতে পারে যে ঈশ্বরকে ভালোবাসা অপেক্ষা এই জগতকে (জগতের বস্তুকে) ভালোবাসা সহজ। তার কারণ, অহংকার আমাদের অন্ধ করেছে। সেজন্য আমাদের ঈশ্বরের সৌন্দর্য অনুভবই হয় না। এই অহংকারকে বিনাশ করতে হবে। অহংকার সর্বদাই মিথ্যাদ্যোতক। অহংকার নিজেকে ঈশ্বরের জন্য নির্দিষ্ট

সিংহাসনে বসে ঈশ্বরকেই আড়াল করছে। যতক্ষণ আমাদের সিংহাসনে এই অহংকার থাকবে ততক্ষণ ঈশ্বরকে আমরা কখনোই দেখব না। ঘৃণা ও ক্রোধ অহংকারের চিহ্ন। যদি একজন মানুষ আর একজনকে ঘৃণা করে বা অন্যের উপর রাগ করে, নিশ্চিত জেনো যে সে অহংকারকে জয় করতে পারেনি এবং সে তার অন্তরে প্রকৃত প্রেমের স্বাদ পায়নি। এই অহংকার কিরকম? সাবানের ফেনার বুদ্‌বুদের মতো। ছোট কোন আঘাতেই বুদ্‌বুদ উবে যায় এবং অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশিত হয়। আমাদের অবশ্যই এই অহংকারকে জয় করতে হবে এবং সেই অবস্থায় পৌঁছাতে হবে; যখন আমরা আন্তরিকতার সাথে বলব আমি নই, আমি নই, তুমি। যখন তুমি এই অহংকারকে বিনাশ করবে তখন তোমার ঈশ্বরানুরাগ আপনিই আসবে।"

রামকৃষ্ণানন্দ পার্থিব জিনিসের প্রতি নিজের মনোভাব প্রকাশ করতেন না বললেই চলে। আমি তাঁকে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের কথা বলতে খুব কমই শুনেছি। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি তাঁর সিদ্ধান্ত কখনো তাদের তাঁর উপর প্রতিক্রিয়া থেকে নির্ণীত হতো না। তিনি সর্বদা আদর্শের সাথে বিচার করে দেখতেন বা তুলনা করতে হলে এককের হিসাবে সর্বোত্তম এই ব্রহ্মাণ্ডের সাথে করতেন। তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থায় পাওয়া যেত যখন তিনি ভগবান সম্পর্কে বা তাঁর গুরুদেব সম্পর্কে কিছু বলতেন। আর অন্য জিনিসের প্রতি তাঁর নিস্পৃহতার ভাব ছিল। এমনকি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যাবলী তাঁর কাছে তুচ্ছ ছিল। আমার এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। আমি তাঁর দৃষ্টি এক অসাধারণ সুন্দর সূর্যাস্তের দিকে আকর্ষণ করেছিলাম। তাঁর প্রত্যুত্তর ছিল ঃ "এই সময়ে ঈশ্বরের চিন্তা করা উচিত, তাঁর সৃষ্টির প্রতি নয়।" বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর এই সাবলীল উদাসীনতা এসেছিল তীব্র অন্তর্মুখিনতা থেকে। প্রকৃতির প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব থেকে নয়।

তিনি সৌন্দর্যের কেন্দ্রটিকেই চিন্তা করতেন। সেটাই তাঁর কাছে প্রকৃত সত্য ছিল। তিনি একবার বলেছিলেন, "হিমালয়ে কি আছে? পাথরের উপর পাথর সাজানো; বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখবে অসংখ্য সৌরজগত আর নক্ষত্রমণ্ডলী। আর পৃথিবী এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুমাত্র। এর আর কি গুরুত্ব? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর একমাত্র প্রকৃত সত্য ঈশ্বরই।"

এই অধ্যায়ের সাথে সাথেই আমার নোট বইএর লেখা শেষ হলো। ১৯০৯ সালে আমার ভারত পরিচয়ের প্রথমদিকে রামকৃষ্ণানন্দ কথিত কিছু উপদেশ

এখানে লিখে রাখা আছে। তিনি ১৯১১ সালে লোকান্তরিত হন। সেই সময় থেকে আমি এই অমূল্য সম্পদ নিয়ে অপেক্ষা করছি সুযোগের অপেক্ষায় কখন আমি জগতকে এই সম্পদ দেব। এই নোট বই-এর কিছু কথা আমার পুরানো লেখায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেটা বাদ দিয়ে এই স্মৃতিকথায় তা প্রকাশিত হয়। একটা শক্তিদায়ক বাণী এই স্মৃতিকথার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। সেই মহাপুরুষ যাঁর কথা এখানে লিপিবদ্ধ তাঁর স্মরণের জন্য এর চেয়ে উপযোগী অন্য কিছু হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। তাঁর বাণী বিলিয়ে দিয়ে গেলাম, আমার কাজ সাঙ্গ হলো।

বেদান্তকেশরী, জুন ১৯৩২, পৃঃ ৫৯-৬২, জুলাই; পৃঃ ১০৫-০৭, সেপ্টেম্বর, পৃঃ ১৭৬-১৭৮, ডিসেম্বর, পৃঃ ২৯৬-২৯৮, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩, পৃঃ ৩৭১-৩৭৩, মার্চ ঃ পৃঃ ৪৫৮-৪৬০

অনুবাদক ঃ স্বামী যোগস্বরূপানন্দ

[সিস্টার দেবমাতার নাম মিস লরা গ্লেন। জাতিতে আমেরিকান। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও পূতসঙ্গ লাভ করেছিলেন কলকাতায়। ভারতে তিনি ছিলেন প্রায় তিন বছর (১৯০৮-১০)। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদদের মধ্যে স্বামীজী এবং আরো অনেকজনের তিনি দর্শন পেয়েছিলেন। বিশেষ করে মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের সঙ্গে কিছুকাল ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। কলকাতা ও মাদ্রাজ থাকার ফলশ্রুতি তাঁর দুটি অপূর্ব বই—"Days in an Indian Monastary" এবং "Sri Ramakrishna and his Disciples"। তিনি ছিলেন সুলেখক। তবে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও ক্যালিফোর্নিয়ার লা ক্রেসেন্টা বেদান্ত সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী পরমানন্দের কাছে। মিস গ্লেনের নাম দেওয়া হয়েছিল দেবমাতা। স্বামী পরমানন্দের যোগ্য সহকারিণী এবং ঐ বেদান্ত সেন্টারের সন্ন্যাসিনী ছিলেন।]

নির্বাণ

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিতে]

এফ. জে. আলেকজান্ডার

উপলব্ধি—অসীম সর্বোত্তম
পৃথিবীর পারে, আত্মাই যার এলাকা,
শাশ্বত সর্বোচ্চ সত্যের সেখানে বাস
সীমাহীন স্বাধীনতা হয়ে, অপার সমুদ্রের মতো
সাধকের হয়েছে এতে পরিণতি।
শরীরের মৃত্যুর সঙ্গে, আত্মা তাঁর
পবিত্রতম চিন্তায় আরোহণ করেছিল—
সেই উচ্চতায়, যেখানে চিন্তা নিশ্চল,
যেখানে ঋষিদের জ্ঞানই কেবল স্থায়ী॥
সেটি জেগেছিল—অবয়বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে,
মহৎ স্বর্গীয় শান্তির শুভ্র ডানায় ভর করে,
নিত্য আত্মার সেই বিশালতার মাঝে;
চিরন্তন দীপ্তি তার আকার, অসীম অনুভূতি তার আত্মা,
পৃথ্বীর ঊর্ধ্বে তা গিয়ে পৌঁছয় ঈশ্বরে॥

অন্তর্হিত হয় অসংখ্য পার্থিব বন্ধন
যেগুলি সৃজন করেছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব—
এখন তিনি অবস্থান করেন—স্বয়ং প্রকাশ ভগবানরূপে।
জীবনে তিনি 'তত্ত্বমসি' শিখিয়েছিলেন
তার চেতনাই দেয় শাশ্বত জীবন।

এখন সেই সত্য—'তত্ত্বমসি'
তাঁর প্রকৃতই হয়েছে—'অহং ব্রহ্মাস্মি'।
তিনি 'ভক্ত' বিলীন হয়েছেন 'ভক্তি'তে
'ভক্ত' ও 'প্রভু' হয়েছেন অভেদ,
নির্বাণের ভূমির সেই আলোয়
পৃথিবীর অজ্ঞান ও আধারের পারে॥

অনুবাদক ঃ স্বামী ত্যাগরূপানন্দ

প্রবুদ্ধ ভারত, অক্টোবর, ১৯১১, পৃঃ ১৮৩

নরেন্দ্রনাথ কাশীপুর উদ্যানে ১৮৮৬

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
(শশী মহারাজ)

শ্রীরামকৃষ্ণের পূত অস্থি
সংরক্ষণ কলস

শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকা

বরাহনগর মঠ ঃ নবীণ সঙ্ঘের গোড়াপত্তন

বরাহনগর মঠে নবীন সন্ন্যাসী ও অন্যান্য ভক্ত
৩০ জানুয়ারি ১৮৮৭
(বৃত্ত চিহ্ন দিয়ে শশী মহারাজকে শনাক্ত করা হয়েছে)

বরাহনগর মঠে তরুণ শশী মহারাজ
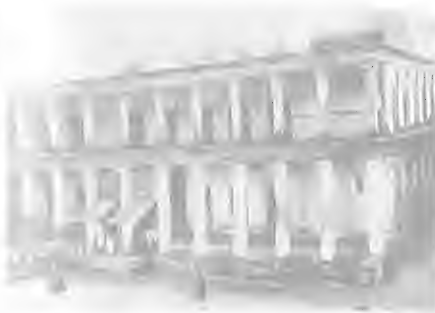
আলমবাজার মঠ

দ্বিতলে ঠাকুরঘর
আলমবাজার মঠ

ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ তে গোপাল লাল শীলের
বাগানবাড়িতে তোলা গ্রুপ ফটো
(শশী মহারাজ বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় চেয়ারে উপবিষ্ট)

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার বেলুড়মঠ

বেলুড়মঠের মূল ভবন (স্বামীজির কক্ষ দ্বিতলে)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
(শশী মহারাজ)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
(শশী মহারাজ)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
(শশী মহারাজ)

১৯ আগস্ট ১৯০৬ মহীশূর মহারাজার প্রাসাদে গৃহীত গ্রুপ ফটো
(শশী মহারাজ ডানদিক থেকে দ্বিতীয় চেয়ারে উপবিষ্ট)

শ্রী সি রামানুজাচারিয়ার

শ্রী সি রামস্বামী আইয়াঙ্গার

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
(শশী মহারাজ)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ভক্তদের সঙ্গে মাদ্রাজে

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
(শশী মহারাজ)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
(শশী মহারাজ)

মায়ের বাড়ী (উদ্বোধন)
কলকাতা

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহাসমাধি

স্বামী সারদানন্দ

"প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রিঃ মহারাত্রিঃ মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥"—চণ্ডী

বিগত ৪ ভাদ্র, সন ১৩১৮, ইংরেজি ২১ আগস্ট, ১৯১১ খ্রিঃ বেলা ১টা ১০ মিনিটের সময় সাধারণের সুপরিচিত মাদ্রাজস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অশেষগুণালঙ্কৃত অধ্যক্ষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রাচীন প্রচারক রামকৃষ্ণগতপ্রাণ স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ মহারাত্রির নিবিড় অঞ্চলাবরণে মহাসমাধিতে সুখশয়ন লাভ করিয়াছেন।

১৭৮৫ শকে স্বামীজী ইহ সংসারে আগমন করিয়াছিলেন এবং ১৮৩৩ শকে অভয়ধাম প্রাপ্ত হইলেন—অতএব একোনপঞ্চাশ বৎসর মাত্র মনুষ্যলোকে আমাদের সহিত নানাভাবে বিচরণ করিয়াছেন।

গুরুগতপ্রাণতা, উদ্দেশ্যের একতানতা, সেবাপরায়ণতা, জ্বলন্ত ত্যাগ ও ঈশ্বরভক্তি একদিকে যেমন প্রিয়দর্শন স্বামীজীকে ভক্তের নিকট আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে আবার তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, শাস্ত্রজ্ঞান, সহানুভূতি ও সহৃদয়তা তাঁহাকে সংসারদাবদগ্ধ জীবগণের নিকট আশা ও শান্তিপ্রদ আশ্রয়স্থল-স্বরূপে অবলম্বনীয় করিয়াছিল।

প্রথমে আলবার্ট কলেজে এবং পরে মেট্রোপলিটন কলেজে পাঠকাল হইতেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনে আধ্যাত্মিকতালাভের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। বাল্যকালে পূজাদি, পরে নিত্য নিয়মিত ভাবে বাইবেল ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থপাঠ, ভক্তাচার্য কেশবচন্দ্রের ধর্ম-বক্তৃতা-সকলে ও সময়ে সময়ে উপাসনামন্দিরে সাগ্রহে যোগদান প্রভৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় ঐ পিপাসা তাঁহার প্রাণে ক্রমে ক্রমে কতদূর প্রবল হইতেছিল।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর, শরৎ ও হেমন্তের মধুর সম্মিলন! পূর্বোক্ত পিপাসার চরম পরিণতিতে স্বামীজীরও দক্ষিণেশ্বরের চিরশান্তিপ্রদ শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিত হওয়া।

এইবার অনুরাগের প্রবল ঝটিকায় জীবনের আমূল পরিবর্তন। প্রথম, শ্রীগুরুসকাশে বাটি হইতে গমনাগমন, পরে গৃহত্যাগ ও কাশীপুর উদ্যানে গুরুগৃহবাস; পরে, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীগুরুর অদর্শনে তাঁহার শ্রীপাদুকার সেবা ও পূজামাত্রাবলম্বনে বরাহনগর মঠে প্রায় দ্বাদশবর্ষকাল একভাবে অবস্থিতি।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে পূজ্যপাদাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম পাশ্চাত্যবিজয় করিয়া মঠে প্রত্যাগমন এবং গুরুভ্রাতাগণের সহায়ে ভারতের নানা স্থানে নানা শুভকার্যের 'লোকহিতায়' সংস্থাপন। ঐ বৎসরের শেষ ভাগেই স্বামীজীর আদেশ শিরে ধারণ করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ ও মিশনের কেন্দ্র-স্থাপনে গমন। খ্রিস্টাব্দ ১৮৯৮-১৯১১, প্রায় চতুর্দশ বৎসর সাম্প্রদায়িক ভাব-সমাকুল দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের পদানুসরণে শ্রীগুরুনামাঙ্কিত 'যত মত তত পথ' রূপ বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের দীর্ঘকাল বাস।

গুরুপদাশ্রিত বীর শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের সহায়ে মাদ্রাজে ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ঐ কালে কোন্ কোন্ মহৎ কার্য সাধিত হইয়াছে? হে পাঠক, জীবনপাতী পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ঐ সকল কার্য ও এই দেবোপম জীবনের বিবরণ শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের অদর্শনে মুহ্যমান মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্য-নিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর; দেখিবে, তাহারাই শত মুখে সহস্রমুখে সে সকল কথা বলিতে বলিতে নয়নধারায় বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতেছে।

অথবা স্বার্থশূন্যতা, অধ্যবসায় ও উদ্দেশ্যের একতানতা দেখিয়াই যদি বুদ্ধিমান তুমি মনুষ্যজীবন ও তৎকৃত কার্যকলাপের গুণাগুণ বিচার করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাক, তবে আইস, আমাদের সহিত যোগদান করিয়া অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে বল—ঈদৃশ জীবন সংসারে দুর্লভ। স্বার্থকলুষপূর্ণ পৃথিবীতে উহার আদর নাই দেখিয়াই জগতের আরাধ্য দেব উঁহাকে অল্পকালে নিজ সকাশে সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

রোগ দুঃসাধ্য জানিতে পারিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ স্বামীজীকে কলকাতায় চিকিৎসার্থ আনয়ন করেন। বিগত ২৬ জ্যৈষ্ঠ তিনি কলকাতা পৌঁছান। ঐ দিন হইতেই কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কবিরাজগণের হস্তে তাঁহার চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়। এইরূপে প্রায় আড়াই মাস কাল কলকাতা বাগবাজার পল্লির অন্তর্গত ১২/১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-শাখা-মঠে রোগের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্বামীজী সমাধিতে দেহরক্ষা করেন। সমাধিতেই যে

তিনি দেহত্যাগ করেন, তদ্বিষয় তাঁহার ঐ কালে সর্বাঙ্গে অসাধারণ বহুক্ষণব্যাপী পুলক দেখিয়াই তদীয় গুরুভ্রাতাগণ অনুমান করিয়াছিলেন।

শরীরত্যাগের পর কলকাতা হইতে বেলুড় মঠে লইয়া যাইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শরীর পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি-মন্দিরের নিকটে অগ্নিসাৎ করা হইল।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে
হরিঃ ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ!!!

(বিবিধ প্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহাপ্রয়াণ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-জননী শ্রীসারদাদেবী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দাক্ষিণাত্যে লইয়া যাইবার জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অতীব আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া স্থানীয় ভক্তগণ ধন্য হইবে এবং তাঁহাদের শুভাগমনে দক্ষিণ-ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে—এই আশায় তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য এত উৎসুক ছিলেন। তাঁহাদিগকে বিভিন্ন সময়ে রামেশ্বরাদি তীর্থ দর্শন করাইয়া রামকৃষ্ণানন্দজী বলিয়াছিলেন, "এই আমার শেষ।" শশী মহারাজের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা ১০৮টি সোনার বেলপাতা দিয়া রামেশ্বরের পূজা করেন। শ্রীশ্রীমা কলকাতা ফিরিবার অল্পকাল পরেই তিনি মাদ্রাজে রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। শ্রীগুরুর ভাবপ্রচারে এবং হিন্দুধর্মের নবজাগরণের জন্য প্রায় চৌদ্দ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ইতোমধ্যেই ভগ্ন এবং তাঁহার শরীর বহুমূত্র, কাশি ও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার রোজ সামান্য জ্বর হইত এবং কাশিও আরম্ভ হইল। ভক্তগণের পরামর্শে তিনি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গমন করেন। তথায় তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হইল না। ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ইহা দুরারোগ্য যক্ষ্মা। শশী মহারাজ বুঝিলেন তাঁহার কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি অন্তরে শ্রীগুরুর আহ্বান অনুভব করিয়া মহামিলনের অপেক্ষায় উৎফুল্ল হইলেন।

সঙ্ঘের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক তাঁহাকে চিকিৎসার্থ অবিলম্বে কলকাতায় আসিতে লিখিলেন। সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন পুরীধামে ছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দজীর রওনা হইবার তার পাইয়া তিনি পুরী হইতে খুরদা রেলওয়ে স্টেশনে আসিয়া মাদ্রাজমেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রতীক্ষা করিলেন। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মানন্দজী তাঁহার কামরায় উঠিলেন। তখন রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সবল দেহ জীর্ণ শীর্ণ এবং স্বর্ণকান্তি মলিন দেখিয়া মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "শশী এ সব কি? সব ঝেড়ে ফেলে দাও!" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "রাজা, তুমি আশীর্বাদ করলেই হবে।" মহারাজ পুনরায় এইরূপ বলিলে তিনি

আবার একই উত্তর দিলেন। কলকাতায় যথাবিধি চিকিৎসা করিবার পরামর্শ প্রদানকালে মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ডাক্তার কবিরাজ যেমনটি বলেন তেমনটি করিবে।" মহারাজের এই আদেশ তিনি রোগশয্যায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। গাড়ি ছাড়িবার সময় মহারাজ প্ল্যাটফর্মে নামিয়া আসিলে রামকৃষ্ণানন্দজী পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ইহাই উভয়ের শেষ সাক্ষাৎ।

শশী মহারাজ ১০ জুন (২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) কলকাতায় আগমন করেন। বাগবাজার উদ্বোধন বাড়িতে তাঁহাকে চিকিৎসার্থ রাখা হয়। তিনি কলকাতায় মাত্র দুইমাস এগার দিন জীবিত থাকিয়া ২১ আগস্ট (৪ ভাদ্র) মহাসমাধিমগ্ন হন। গুরুভ্রাতাগণ তাঁহার চিকিৎসার এবং সেবাশুশ্রূষার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেন। স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধন অফিসে অবস্থান করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলিল। স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ বেলুড় মঠ হইতে নিয়মিত ভাবে আসিয়া শশী মহারাজের অন্তিম শয্যায় বসিয়া তাঁহার সংবাদ লইতেন। ডাঃ বিপিন ঘোষ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহা galloping phthisis (ক্রমবর্ধমান যক্ষ্মা) শরীর তিন মাসের বেশি থাকিবে না।" ডাঃ ঘোষের কথা সত্য হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেনও তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়া ছিলেন। ঠাকুর যখন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট চিকিৎসার্থ গিয়াছিলেন তখন বালক দুর্গাপ্রসাদ গঙ্গাপ্রসাদের ছাত্র ছিলেন এবং ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া তিনিই স্বীয় গুরুকে বলিয়াছিলেন, এ যোগজ ব্যাধি। দুর্গাপ্রসাদ শশী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি স্বপ্নে শ্মশান, তুলসীকানন প্রভৃতি দেখেন কি?" তদুত্তরে শশী মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ওসব দেখি না। তবে ঠাকুর, মা, স্বামীজী, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্বপ্নে দেখি।" মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে অকালে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "Madras life was too straining—অর্থাৎ মাদ্রাজে আমাকে কঠোর পরিশ্রম ও অত্যন্ত কষ্ট করিতে হইয়াছিল।" তথায় নানাস্থানে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বক্তৃতা প্রদান, ঠাকুরের পূজা, সেবা, ভোগরন্ধন ও নিবেদনাদি বহু কাজ তাঁহাকে একলাই করিতে হইত। মাদ্রাজ মঠে প্রথম কয়েক বৎসর তিনি নিজেই নিজের পাচক, নিজেই নিজের চাকর ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রিঃ স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাইবার সময় যখন মাদ্রাজ বন্দরে উপস্থিত হন তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পনের সের ময়দা আনিয়া একাকী সবগুলি জলে মাখিয়া ঠেসিয়া কড়া পাকের নিমকি, গজা প্রভৃতি আহার্য তৈরি করিয়া কয়েকটি টিনে পুরিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে জাহাজে খাবার জন্য প্রদান

করেন। এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় তিনি দেহ তুচ্ছ করিয়া ঠাকুরের কাজে মাতিয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি এতই নিরভিমান ও সুনম্র ছিলেন যে, মাদ্রাজ অঞ্চলে বিপুল কর্মানুষ্ঠানের প্রসঙ্গে বলিতেন, "ঠাকুরের কৃপা ও স্বামীজীর আদেশ, নিজের কোন গুণে নয়।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শরীর পিত্তপ্রধান ছিল এবং তাঁহার গাত্রে শুষ্ক বিখাউজ (eczema) হইত। দুইটি বড় তাল-পাখায় দুইজন সেবক দুইদিকে তাঁহাকে হাওয়া করিতেন। কখনও কখনও একটি ছোট তাল-পাখা দিয়া মাথায়ও হাওয়া করিতে হইত। তাঁহাকে হাওয়া করা ছিল সেবকগণের প্রধান কাজ। তিনি ঢালা বড় বিছানাতে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতেন ও ছট্‌ফট্ করিতেন এবং বলিতেন, "জয় প্রভু, জয় গুরুদেব।" বিশ্বরঞ্জন মহারাজ (স্বামী হরিহরানন্দ) তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইতেন এবং তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন। তিনি বলেন, "শশী মহারাজের সেবা করা খুব শক্ত ছিল। কারণ ডাকা মাত্রই সাড়া দেওয়া এবং বলা মাত্রই করে দেওয়া চাই। নচেৎ বিরক্ত হইতেন ও বকতেন। এই তাঁর স্বভাব ছিল।" তিনি কিরূপ কড়া মেজাজের সাধু ছিলেন তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে বোঝা যায়।

মাদ্রাজ মঠে একদিন স্বামী ধ্যানানন্দ (রুদ্র মহারাজ)-কে দিয়া একখানি চিঠি লিখাইতেছিলেন। চিঠিখানি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর পোর্টব্লেয়ার নামক স্থানে যাইবে। রুদ্র মহারাজ খামের উপর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ লেখা অনাবশ্যক মনে করিয়া পোর্টব্লেয়ার লিখিয়াছিলেন। ঠিকানা পড়াইয়া শুনিয়া যখন দেখিলেন যে, আন্দামান শব্দটি লেখা হয় নাই তখন তিনি রুদ্র মহারাজকে আঘাত করেন। আঘাতে ধ্যানানন্দজী পড়িয়া যান এবং তাঁহার হস্তস্থিত কলমটি শশী মহারাজের পায়ে বিঁধিয়া যাওয়ায় রক্তপাত হয়। ধ্যানানন্দজী উঠিয়া যখন তাঁহার পায়ের রক্ত মুছিয়া ব্যান্ডেজ করিতেছিলেন তখন শশী মহারাজ তাঁহাকে সুশান্তভাবে ও সুমিষ্ট স্বরে বলিলেন, "আমি জানি তুমি যে ঠিকানা লিখেছ তাতেই চিঠি যাবে। তথাপি আমি রেগেছিলাম কেন জান? যেমনটি বললাম তেমনটি না লিখে নিজের বুদ্ধি খাটালে কেন? আমরা যেমনটি বলি তেমনটি করলে তোমাদের প্রভূত কল্যাণ হবে। ঠাকুর আমাদের এইরূপ শিক্ষা দিয়েছেন।"

পরদিন মঠে পাকা আম এসেছিল। খাবার সময় সবচেয়ে বড় আমটি তাঁহার পাতে দেওয়া হয়। তিনি আমটিতে একটি কামড় দিয়া বলিলেন, "বা! বেশ মিষ্টি।" এই বলিয়া আমটি পার্শ্বে উপবিষ্ট ধ্যানানন্দজীর পাতে দিয়া বলিলেন, "এইটি তুমি খাও।" তিনি কখনো বজ্রবৎ কঠোর এবং কখনো কুসুমবৎ কোমল

হইতেন। তাঁহার চরিত্রে কঠোর ও কোমল ভাবের অদ্ভুত সমাবেশ ছিল। যোগীন ঠাকুর নামক এক ব্যক্তির অনেক যুবক অনুগত ছিল। তিনি তাহাদের দ্বারা পাড়ায় পাড়ায় দুঃস্থ ও পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা ও সৎকাজ করাইতেন। তিনি ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর শশী মহারাজকে প্রায়ই সেবা করিতেন। জনৈক ব্রহ্মচারী সেবকের গামছা ছিঁড়িয়া যায় এবং তাঁহার বসিবার মাদুর ছিল না। শশী মহারাজ যোগীন ঠাকুরকে বলিয়া একখানি ভালো গামছা ও একটি সুন্দর মাদুর আনাইলেন। পরে সেবককে ডাকিয়া গামছাখানি ও মাদুরটি দিয়া বলিলেন, "এই মাদুরে একটু শোও।" সেবক অত্যন্ত ক্লান্ত এবং রাত্রি জাগরণ হেতু অত্যন্ত নিদ্রালু ছিলেন। মাদুরে একটু শুইয়া থাকিতেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণানন্দজীও সেবককে নিদ্রিত দেখিয়া আনন্দিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকায় তাঁহারও ঘুম আসিল এবং তিনিও কিছুক্ষণ ঘুমাইলেন। ঘুম থেকে উঠে সেবককে বলিলেন, "তোমাকে ঘুমুতে দিয়ে আমারও খুব ঘুম হলো।"

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বংশজ বলিয়া শশী মহারাজের গভীর নিষ্ঠা ছিল। ঠাকুর বলিতেন, ভক্তের জাত নাই। ঠাকুরের কথায় তাঁহার এত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি একজন অব্রাহ্মণ সেবকের হাতে খাইতে রাজি হইলেন এবং তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রঞ্জন, তুমি রান্না করো; তুমি ঠাকুরের ভক্ত ও ব্রহ্মচারী। তোমার হাতে খেতে আমার কোন আপত্তি নেই।"*

শ্যামবাজারের শ্যামাপদ মুখার্জী নামক জনৈক কলেজের ছাত্র (পরবর্তী কালে তিনি এম্-বি ডাক্তার) শশী মহারাজের নিকট মাঝে মাঝে আসিতেন। মহারাজ তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা প্রায়ই বলিতেন। একদিন তাঁহাকে বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে বলিলেন, "এমন মহান দয়ার্দ্রহৃদয় মহাপুরুষের জীবন প্রত্যেক হিন্দুযুবকের সম্মুখে রাখা উচিত। যখন তিনি বিদ্যার্থী যুবক ছিলেন তখন কত প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও বড় হলেন; মনুষ্যত্ব হারান নি। তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যও অসামান্য ছিল।" শ্যামাপদবাবু সেই সময় একবার পুরী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পুরীতে তিনি জনৈক সাধুকে দর্শন করিয়া প্রীত হন নাই। তিনি কলকাতায় ফিরিয়া শশী মহারাজের কাছে পুরীর অভিজ্ঞতা বর্ণনার সময় বলিলেন, "সাধুর প্রতি বিশ্বাস করা কঠিন। আমার পুরীবাস ভালো লাগেনি।" শশী মহারাজ শ্যামাপদবাবুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "কেন সাধুকে পরীক্ষা

---

* বিশ্বরঞ্জন মহারাজের (স্বামী হরিহরানন্দ) নিকট হইতে এই তথ্য সংগৃহীত।

করতে গেলে? এইরূপ মন লইয়া তীর্থ দর্শন করলে কোন ফল হয় না।" সেই সময় গিরীশবাবুর শঙ্করাচার্য নামক নাটক নূতন প্রকাশিত হয়। তাঁহার আদেশে উক্ত নাটকের প্রথম কয়েকটি দৃশ্য পড়িয়া তাঁহাকে শুনানো হইয়াছিল। দুপুরে আহারান্তে এই নাটক শুনিয়া তিনি খুব আনন্দ করিতেন। উক্ত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে চণ্ডালবেশী ব্যাসদেব ও তাঁহার চারিটি কুকুরের কথা আছে। কাশীতে শঙ্করাচার্য মণিকর্ণিকা ঘাটে গঙ্গা স্নানার্থ যাইতেছিলেন। পথে তাঁহার সহিত চণ্ডালরূপী ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ হইল। শঙ্কর অস্পৃশ্য চণ্ডালকে পথ ছেড়ে দিবার জন্য আদেশ করিলেন। কিন্তু চণ্ডাল তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তৎসঙ্গে বেদরূপী কুকুর চারিটির সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। চণ্ডাল তাঁহার কুকুরদের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "আরে কেলে, আরে ভুলো, কি বলে?" (অন্য কুকুরকে সম্বোধন করিয়া) "ওরে ধোলো, কি বলছে?" চণ্ডালিনী বলিলেন, "আরে কে বটে রে কে বটে?" এই অংশ শুনিয়া শশী মহারাজ খুব হাসিতেন এবং "কে বটে রে কে বটে" এই কথাটি বারবার উচ্চারণ করিতেন। এই নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এ কলমের খোঁচা বইত নয়।" তারপর তিনি ঐ নাটক আর শুনেন নাই। যখন তিনি প্রসন্নমনে থাকিতেন সদানন্দ বালকবৎ "তাক্ ঝিঙ্গে ফুল তাকুড় তাকুড়" এই অর্থহীন বাক্যটি বার বার আওড়াইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। রথযাত্রার দিন শশী মহারাজ ব্রহ্মচারী সেবককে কয়েকটি পয়সা দিয়া বলিলেন, "কাছে কোথাও রথ দেখে এস এবং দু চার পয়সার কিছু কিনে এনো।" সেবক তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতে ইতস্তত করায় তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "কাশীপুর বাগানে ঠাকুরও আমাকে রথ যাত্রার দিন এইরূপ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি প্রথমে তাঁহার সেবা ফেলিয়া যাইতে রাজি হই নাই। পরে তিনি যাইতে বিশেষভাবে বলায় আমি স্থানীয় রথযাত্রা দেখিয়া তাঁহার জন্য দুই পয়সা দামের একটি ছুরি (লেবু কাটিবার জন্য) আনিয়া ছিলাম। তাহাতে তিনি আমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন, "এইগুলি মেনে চলতে হয়। গরীব লোকে দু পয়সা পাবার জন্য দোকান দেয়। এই সব মেলাতে দু চার পয়সার কিছু কেনা উচিত।" এই ঘটনাটি শুনিয়া সেবক শশী মহারাজের আদেশ পালনের জন্য বাগবাজারের রথ দেখিয়া তাঁহার জন্য একটি ছোট হাতপাখা (অল্পদামের) কিনিয়া আনিয়াছিলেন। সেবকের উক্ত কার্যে শশী মহারাজ তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রীত হন।

বাবুরাম মহারাজকে শশী মহারাজ অতিশয় ভালোবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন বাবুরাম মহারাজকে কাছে বসাইয়া শশী মহারাজ অত্যন্ত

প্রীতির সহিত তাঁহার হাত পা সপ্রেমে টিপিয়া সেবা করিলেন। তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া বাবুরাম মহারাজকে শুকনো ফল খাওয়াইতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার আদেশে সেবক অল্পপরিমাণে নানা রকম ফল একটি পাত্রে বাবুরাম মহারাজকে খাইতে দিলেন। বাবুরাম মহারাজ ফলগুলি নিঃশেষে আহার করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন শশী মহারাজ উচ্ছিষ্ট থালাটি কাছে আনিয়া দেখিলেন যে, উহাতে আদৌ ফলাবশেষ নাই। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া সেবককে এত অল্প পরিমাণে ফল পরিবেশন করার জন্য ভর্ৎসনা করিলেন। পরে থালাটি নিজ হাতে মুছিয়া নিজের গায়ে মাখিলেন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি বাবুরাম মহারাজের প্রসাদ গ্রহণ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তাহাতে অসমর্থ হইয়া তিনি এরূপ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ দু একদিন অন্তর বেলুড় মঠ হইতে শশী মহারাজকে দেখিতে আসিতেন। একবার কয়েকদিন তাঁহাকে না দেখিয়া শশী মহারাজ খোঁজ করিয়া জানিলেন যে, বেলুড় মঠের গরুগুলির জন্য খড় কাটিতে কাটিতে বাবুরাম মহারাজের দুইটি আঙুল কাটিয়া গিয়াছে এবং সেইজন্যই তিনি আসিতে পারেন নাই। শশী মহারাজ এই সংবাদে বিশেষ দুঃখিত হইয়া সমীপবর্তী ব্রহ্মচারিগণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর বাবুরামকে এত ভালোবাসতেন। তোরা কোথায় তাঁর সেবা করবি, না তাঁকে দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছিস! এঁরা ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। এঁদের সেবা করলেই তোদের সব হবে।"

কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক শ্যামাদাস কবিরাজও কিছুদিন শশী মহারাজকে সেবা করিয়াছিলেন। তিনি মধুর অনুপানসহ খাইবার জন্য একটি ঔষধ দিয়াছিলেন। প্রত্যেক বটিকার সহিত ঠিক কত পরিমাণে মধু দিতে হইবে তাহা তিনি বলিয়া যান নাই। ঔষধ বৈকালে চারিটার সময় খাইতে হইবে। তিনটার পরে সেবক ঔষধ খাওয়ার কথা তুলিতেই শশী মহারাজ মধুর পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেবকের তাহা জানা না থাকায় তিনি তাঁহাকে তখনি শ্যামাদাস কবিরাজের বাটিতে পাঠাইলেন। অসময়ে ব্রহ্মচারীকে আসিতে দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় ব্যস্ত হইয়া খবর জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বারো হইতে পনের ফোঁটা মধু দিয়া প্রত্যেকবার ঔষধ খাওয়াইতে বলিলেন। খুরদা স্টেশনে ব্রহ্মানন্দজী চিকিৎসার যেরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা আক্ষরিকভাবে পালন করিবার জন্যই শশী মহারাজ এরূপ করিলেন। তাঁহার নিকট গুরুভ্রাতার বাক্য গুরুবাক্যতুল্য অলঙ্ঘনীয় ছিল।

শশী মহারাজের ছোট ভাই তাঁহার রোগশয্যার পাশে প্রায়ই আসিয়া বসিতেন। একদিন তাঁহাকে শশী মহারাজ বলিলেন, "আমার আড়াই বা তিন বছর বয়সের সময় দেবীকে একটি পাঁঠা মানত করা হয়েছিল। বাল্যকালে সেই মানত দেওয়া হয়নি। মাকে জিজ্ঞাসা করে মানতটি দিয়ে দিও।" ছোট ভাই বাড়ি ফিরিয়া মায়ের কাছে জানিলেন, সত্যই সেই মানত দেওয়া হয় নাই। তখন তিনি মানত দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া মুমূর্ষু সন্ন্যাসী ভ্রাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

একদিন বাবুরাম মহারাজ শশী মহারাজের রোগ-শয্যার পাশে বসিয়া কিছু ফল কাটিয়া একটি থালায় তাঁহাকে খাইতে দিলেন। থালায় ফল দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বালকের ন্যায় বলিলেন, "শেষে তুমিও এরূপ কল্লে? আমায় থালায় খেতে দিলে?" তখন বাবুরাম মহারাজ ফলগুলি নিজের হাতে লইয়া এক একটুকরা তাঁহার মুখে দিলেন। শশী মহারাজ সানন্দে ফলগুলি খাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, এমনটি তোমার কাছে চাই। ভাই তুমি তো এমনি করেই খাওয়াবে।"

প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগের আদৌ উপশম হইল না। বরং দুরারোগ্য ব্যাধি ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। শশী মহারাজের সর্দি ও কাশি বাড়িয়া চলিল। তিনি এত দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে, পায়খানায় বসিয়া উঠিতে পারিলেন না, সেবক তাঁহাকে হাতে ধরিয়া তুলিতেন। শেষে তিনি ঘরের মধ্যেই মলমূত্র ত্যাগ করিতেন, পায়খানায় যাইতে পারিতেন না। তাঁহার খাওয়াও একেবারে কমিয়া গেল। সকালে তিনি ক্রীমক্র্যাকার (Cream Cracker) বিস্কুট দু-চার খানি দুধে ভিজাইয়া খাইতেন। ভাত খাওয়ার সময় শরৎ মহারাজ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতেন ও বলে কয়ে দুই এক গ্রাস বেশি করিয়া খাওয়াইতেন। একদিন শশী মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই শরৎ, আমার খাওয়া উঠে যাচ্ছে। মহামায়া খেতে দিচ্ছেন না। তুমি খাবার সময় আর এসো না।" ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রায় রোজই আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ইউনান্ এবং বিখ্যাত এলোপ্যাথ স্যার নীলরতন সরকারকে আনা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শরৎ মহারাজের ভাই সতীশ চক্রবর্তী ডাক্তার-কবিরাজগণের ব্যবস্থাপত্রগুলি যত্ন করিয়া পড়িতেন। যখন কোন চিকিৎসায় কিছু ফল হইল না তখন সতীশ বাবু নিজে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শরৎ মহারাজ শশী মহারাজকে সতীশ

বাবুর অনুরোধ জানাইলেন। তাহাতে শশী মহারাজ কোন মত প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "পরে বলব।" পরে তিনি সেবককে দিয়া শরৎ মহারাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "এ দেহ মন প্রাণ ঠাকুরের চরণে বিলিয়ে দিয়েছি। তাঁর প্রতিনিধি মহারাজ, বাবুরাম ইত্যাদি আছেন। তাঁদের নির্দেশমতো যেন চিকিৎসা করা হয়। শরৎ যেন নিজের খামখেয়ালিতে কিছু না করে। এই বিষয়ে আমার নিজের কোন মতামত নেই।" এক এক দিন সকালে শশী মহারাজ ভাত খাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভাতের থালা সামনে আসিলে আদৌ খাইতে পারিতেন না। একদিন তাঁহার গর্ভধারিণী ভবসুন্দরী দেবী তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি মাথা বাড়াইয়া জননীকে বলিলেন, "মা, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কর।" মা মুমূর্ষু পুত্রের মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। মাদ্রাজি ভক্ত রামস্বামী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "মাদ্রাজের সব ভক্তকে আমার ভালোবাসা দেবে। আচার্যগণের পুণ্য জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যেই আমার দেহত্যাগ করতে ইচ্ছা হয়।"

বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণবাবু, পল্টুবাবু, মাস্টার মহাশয়, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি আসিলে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইতেন। মৃত্যুশয্যায় পরমানন্দ স্বামীকে দেখিবার জন্য তিনি খুব আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমানন্দ স্বামী আমেরিকা হইতে ইউরোপ হইয়া ভারতে আসিতেছিলেন। তিনি কলকাতায় পৌঁছিবার পূর্বে শশী মহারাজের দেহত্যাগ হয়। যোগীন ঠাকুরকে শশী মহারাজ পরমানন্দ স্বামীর সম্বন্ধে জননীর ন্যায় সস্নেহে প্রায়ই বলিতেন "তুমি জাহাজ ঘাটে গিয়ে ওকে নিয়ে আসবে। ও বড় ছেলে মানুষ, কিছু বোঝে সোঝে না। তুমি না গেলে ওর খুব কষ্ট হবে। তুমি নিশ্চয়ই যেও।" গিরিশবাবুর নদিদি গঙ্গা স্নানান্তে প্রায় শশী মহারাজকে দর্শন করিয়া যাইতেন। একদিন জনৈক সেবককে শশী মহারাজের সেবার জন্য খুব পরিশ্রম করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আহা! তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে গো।" তাহাতে শশী মহারাজ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ওরা ঐসব করবে না তো আর কারা করবে? ওরা বাড়ি ঘর ছেড়ে এসেছে, সাধু হয়েছে। এসব কাজ করে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। এও ঠাকুরের কাজ। এতেও ঠাকুরের সেবা হচ্ছে।"

শেষের দিকে শশী মহারাজ রক্তবমি করিতেন এবং এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বিছানা ছেড়ে উঠিতে পারিতেন না। প্রচুর রক্তবমি এবং

ভীষণ কাশির পর ঠাকুরের ছবির দিকে তাকাইয়া বলিতেন, "আর কষ্ট দিওনা প্রভু! দেহ তো আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। একটু শান্তি দাও।" তিনি যখন শুইয়া কাশিতেন তখন হাত পা শূন্যে উঠিয়া যাইত। একদিন খুব রক্তবমি হওয়ার পর ঠাকুরের ছবিখানি দেয়াল হইতে নামাইয়া আনাইয়া সম্মুখে ধরিয়া অভিমান-ভরে বলিলেন, "এই শরীর দিয়ে কোন পাপ করিনি। তবুও এত কষ্ট দিচ্ছ। এত যন্ত্রণা দিয়েও তোমার প্রাণে দয়া হলো না। কি অপরাধ করেছি যে এত কষ্ট দিচ্ছ।" পরে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, "শত অপরাধ করেছি। ক্ষমা করো প্রভু।" ঠাকুরের ছবিখানি সেবকের হাতে দিয়া বলিলেন, "প্রাণারামকে যথাস্থানে রেখে দাও।" রাত্রে তাঁহার আদৌ ঘুম হইত না। দিনরাত শুইয়া থাকিতে ভালো লাগিত না, উঠিয়া বসিতেও পারিতেন না। মাঝে মাঝে বলিতেন, "চারদিকে বালিশ দিয়ে বসিয়ে দাও।" ঘুম না হওয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে বালকবৎ বলিতেন, "মা যেমন ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, তেমনি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। মা যেমন ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় তেমনি আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও।" রোগযন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া তিনি প্রায়ই তন্ময় হইয়া ঠাকুরের কথা বলিতেন। কথা বলিলে তাঁহার কষ্ট হয় এইজন্য সেবক তাঁহাকে নীরব থাকিতে প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কথা যখন বলি তখন দেহজ্ঞান থাকে না, মৃত্যুযন্ত্রণা তুচ্ছ হয়।" 'দুর্গা', 'দুর্গা', 'শিব', 'শিব', 'শ্রীগুরু', 'শ্রীগুরু' উচ্চারণে তাঁহার প্রলাপও প্রার্থনায় পরিণত হইত, মৃত্যুশয্যা তপঃক্ষেত্রে পরিণত হইত। জ্ঞানী মৃত্যু জয় করিলেন। এই সময় তিনি যিশুখ্রিস্টের কথাও খুব বলিতেন।

শরীর যাইবার দুই তিন দিন পূর্বে একদিন সকাল ৮/৯টার সময় তিনি চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। সেবক নিঃশব্দে অদূরে উপবিষ্ট।* কিছুক্ষণ পরে তিনি সহসা উঠিয়া ব্যস্তভাবে সেবককে বলিলেন, "ঠাকুর এসেছেন। আসন দে।" সেবক এই বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তখন শশী মহারাজ সেবককে বলিলেন, "দেখতে পাচ্ছনা? ঠাকুর এসেছেন, মা এসেছেন, স্বামীজী এসেছেন, মাদুর পেতে দে, আর তিনটে তাকিয়া দে।" সেবক বিস্মিত হইয়া আদেশ পালন করিলেন। তখন শশী মহারাজ হাত জোড় করিয়া তিনবার প্রণাম করিলে নির্নিমেষ নয়নে কোন অদৃশ্য বস্তু দেখিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন, "তাঁরা চলে গেছেন। এখন মাদুর

---

* স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ)

ও তাকিয়া তুলে নে।" তাঁহার বিরাট দেহ রোগে এত শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়াছিল যে, তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র মানুষ বলিয়া মনে হইত, চক্ষু প্রায়ই শূন্যদৃষ্টি ও পলকশূন্য থাকিত। একদিন স্বামী বিবেকানন্দের গৃহী শিষ্য সুগায়ক শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ মিত্র আসিলে শশী মহারাজ তাঁহাকে স্বামীজীরচিত "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর" এই গানটি গাহিতে অনুরোধ করিলেন। এই গান যখন পুলিনবাবু গাহিতে ছিলেন, তখন শশী মহারাজ তাহা তন্ময় হইয়া শ্রবণ করেন এবং শুনিতে শুনিতে গভীর ধ্যানমগ্ন হন। অন্তিমকাল সন্নিকট বুঝিতে পারিয়া রামকৃষ্ণানন্দজী দেহত্যাগের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সন্দর্শন প্রার্থনা করেন। মাতাঠাকুরানি সেই সময় কলকাতায় ছিলেন না, জয়রামবাটীতে ছিলেন। স্বামী ধীরানন্দ তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই। তিনি স্থূলশরীরে আসিতে না পারিলেও সন্তানকে দিব্য দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন। সম্ভবত তাঁহার এই অলৌকিক দর্শন মৃত্যুর পূর্বরাত্রিতে হইয়াছিল; কারণ, শেষদিন প্রভাতে পুলিনবাবুর নিকট দর্শনের ভাবটি ব্যক্ত করিয়া গানের প্রথমচরণ "পোহাল দুঃখরজনী" ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রকে বলিয়া পাঠান। মহাকবি পূর্ণ গানটি অচিরে এইভাবে রচনা করিয়া দেন—

বেহাগ—একতাল

পোহাল দুঃখ-রজনী।
গেছে 'আমি' 'আমি' ঘোর কুস্বপন,
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ,
হের জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী ॥
বরাভয়করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চতাল, গাও জয় জয়
বাজাও দুন্দুভি, শমন-বিজয় মার নামে পূর্ণ অবনী ॥
কহিছে জননী "কেঁদো না, কেঁদো না;
রামকৃষ্ণ-পদ দেখনা।
নাহিক ভাবনা, রবেনা যাতনা ॥"
(হের) মম পাশে করুণার দুটি আঁখি ভাসে।
ভুবন-তারণ গুণমণি ॥

গানটি পুলিনবাবু বহুক্ষণ ধরিয়া গাহিলেন এবং শশী মহারাজ মুদ্রিত নয়নে

আবিষ্ট ভাবে শুনিলেন। গানটি তাঁহার এত মনোমতো হইয়াছিল যে ইহা শ্রবণে তিনি পরম শান্তি পাইলেন। শেষ দিনে ডাক্তার কাঞ্জিলাল তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ তিনি একটু সুস্থ।" সেইদিন "উদ্বোধন" পত্রিকার নূতন সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। তিনি নূতন সংখ্যা একখানি হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিয়া দিলেন। ঐ দিন তাঁহার জন্য যে ভাত রান্না হইয়াছিল সেই ভাতের হাঁড়িটি সেবকের হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। "ঐদিন প্রভাত কাল হইতেই তিনি ঘন ঘন সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং শেষ তিন ঘণ্টা আচ্ছন্ন ভাবে ছিলেন। মহাসমাধির কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি ঠাকুরের চরণামৃত পান করিলেন। বেলা একটার কিছুপূর্বে তাঁহার নাড়ি বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। একটার সময় তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাঁহার শরীরে এক অপূর্ব ভাবের সমাবেশ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সর্বশরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মুখ এমন লাল হইল যেন শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়াছে। শরীরে একটু ঘামও দেখা দিল। মাথার চুলগুলি পর্যন্ত খাড়া হইয়া গেল।"* ১৩১৮ সালের ৪ ভাদ্র, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট, সোমবার বেলা ১টা ১০ মিনিটের সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শিবনেত্র হইয়া মহাসমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার চতুর্দিকে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ দাঁড়াইয়া ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। মহাসমাধির পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার পবিত্র শরীরে রোমাঞ্চের লক্ষণ বর্তমান ছিল। স্বামী সারদানন্দ ১৩১৮ সালের "উদ্বোধন" পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন, "সমাধিতেই যে তিনি দেহরক্ষা করেন তদ্বিষয়ে তাঁহার ঐকালে সর্বাঙ্গে অসাধারণ দীর্ঘকালব্যাপী পুলক দেখিয়াই তদীয় গুরুভ্রাতৃগণ অনুমান করিয়াছিলেন।"

শশী মহারাজের নশ্বরদেহ পত্র পুষ্পমাল্যে শোভিত ও চন্দনলিপ্ত করিয়া একটি খাটে স্থাপিত হইল। উদ্বোধন মঠের প্রাঙ্গণে ভগ্নি নিবেদিতা নতজানু হইয়া স্বর্গত স্বামীজীর পদদ্বয়ে স্বীয় শির স্পর্শ করিলেন। মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ খাটটি স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। শবযাত্রিগণের সঙ্গে সংকীর্তনদল হরিনাম গান করিতেছিল। পুষ্প, ধূপাদির সৌরভে বায়ু সুগন্ধিত হইয়াছিল। সাধু ও ভক্তগণের মুখনিঃসৃত 'জয় শ্রীগুরু মহারাজকী জয়', 'জয় মহামায়ীকী জয়', 'জয় স্বামীজী মহারাজকী জয়', 'জয় গঙ্গামায়ীকী জয়', জয় রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজকী জয়' ইত্যাদি জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা গৃহের বাহিরে আসিয়া এই স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনে রাস্তার উভয়

* 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকার ১৩১৮ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পার্শ্বে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের স্থান কাশীপুর বাগানে আসিয়া মৃতদেহ রাখা হইল এবং সকলে মিলিয়া সমগ্র রামনামকীর্তন করিলেন। পুনরায় কাশীপুর শ্মশানঘাটে মৃতদেহ কিয়ৎক্ষণ রক্ষিত হইল। এই পুণ্যস্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূলদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছিল।

শবযাত্রিগণকে বেলুড় মঠে লইয়া যাইবার জন্য কুঠিঘাটে বহু নৌকা প্রস্তুত ছিল। তখন সন্ধ্যা সমাগতা। গঙ্গাদেবী দেবোপম পুত্র হারাইয়া শোকাকুলা হইয়া নিঃশব্দে প্রবাহিতা। বেলুড় মঠ নীরব, নিঝুম। শান্তসমীরণ শোকার্তগণের দৈহিক ক্লান্তি দূর করিতেছিল। চন্দন কাষ্ঠের চিতা সজ্জিত হইল। বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি-মন্দিরের পার্শ্বে শশী মহারাজের পাঞ্চভৌতিক দেহ অগ্নিসাৎ করা হইল। তাঁহার প্রাণমন যেমন গুরুপাদপদ্মে বিলীন হইয়াছিল তাঁহার স্থূলদেহও তদ্রূপ রামকৃষ্ণাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। শ্রীগুরুর পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত তাঁহার দেবজীবন ইহধামে মাত্র ঊনপঞ্চাশ বৎসর হোমশিখার ন্যায় জ্বলিয়াছিল। তাঁহার শ্মশানে কোনও স্মৃতিফলক আজও নির্মিত হয় নাই যাহা দ্বারা দর্শক স্থানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবে।* কিন্তু তাঁহার অমরস্মৃতি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। তাঁহার জীবৎকালে লোকে যেমন তাঁহার পূত স্পর্শে আসিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে তেমনি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে তাঁহার লোকোত্তর জীবন ও দেববাণী স্মরণে অনেকে ধর্মজীবন লাভ করিবে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহাসমাধির সংবাদে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, "একটি দিকপাল চলে গেল। দক্ষিণ দিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।" ১৯১৬ খ্রিঃ ব্রহ্মানন্দজী যখন দ্বিতীয়বার মাদ্রাজে গমন করেন তখন মাদ্রাজ মঠে তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীর কথা অনেক সময় উল্লেখ করিতেন। একদিন তথায় তাঁহার প্রসঙ্গে বলিলেন, "শশী মহারাজের প্রভাব দিগ্বিজয়ী শঙ্করের মতো এই প্রদেশে জ্বলজ্বল করছে। তাঁর হাতের তৈরি রামু ও রামানুজ; ঠাকুরের উপর তাদের কী গভীর ভক্তি। তারা মাদ্রাজ মঠ ও স্টুডেন্টস্ হোমের জন্য প্রাণপাত করে খাটছে। আমাদের উপর তাদের কী গভীর ভক্তি আর শ্রদ্ধা। মঠের প্রতি তাদের কত যত্ন আর প্রীতি।"

মাদ্রাজের অধুনালুপ্ত ইংরেজি মাসিক 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় এই সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল ঃ "স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মৃত্যুতে

* বর্তমানে ঐ স্থানে স্মৃতিফলক হয়েছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ব্যতীত আরো কয়েকজন পার্ষদদের পুণ্যদেহ এখানে দাহ করা হয়েছে।

মাদ্রাজের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। বেদান্তের বাণী প্রচারের এবং উহার সনাতন তত্ত্ব জনসাধারণকে অবগত করাইবার জন্য মন্দস্বাস্থ্য লইয়া তিনি প্রায় চৌদ্দবৎসর প্রধানত মাদ্রাজে এবং সাধারণত সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁহার প্রাণপাতী প্রচেষ্টা ও আদর্শ জীবন যাপনের অমৃতপ্রসূ ফল। আধুনিক কোন কোন ধর্মান্দোলনে যে রহস্যবিদ্যার প্রচার দেখা যায় তাহা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ধর্মব্যাখ্যানে বা বক্তৃতায় লক্ষিত হইত না। উক্ত ভাব মানবমনকে নিম্নগামী, সংকীর্ণ ও দুর্বল করে বলিয়া তিনি ধর্ম ও সত্যের এইরূপ রুগ্‌ণভাবপ্রদ ব্যাখ্যা পছন্দ করিতেন না। অভয়লোকগত স্বামীজীর আশীর্বাদ আমরা সদাই ভিক্ষা করিতাম। জীবিতাবস্থায় আমরা তাঁহাকে অশেষ ভক্তি করিতাম। তাঁহার পুণ্যস্মৃতিও এখন আমরা গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিব।''

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মৃত্যুসংবাদ কলকাতা হইতে অচিরে মাদ্রাজে প্রচারিত হইল। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে মাদ্রাজ, ত্রিচিনোপল্লি, ভিজাগাপট্টম্, মহীশূর এবং দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য স্থানে শোকসভা আহূত হয়। মাদ্রাজে পাঁচাইয়াপ্পা কলেজ হলে ৪ সেপ্টেম্বর স্থানীয় বিশিষ্ট হিন্দুগণের একটি শোকসভা হয়। হাইকোর্টের জজ সুন্দর আয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি দীর্ঘকাল স্বামীজীর পূতসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ''স্বামীজীর অভাব আর পূর্ণ হইবে না। তিনি একাকী এত কাজ কিরূপে করিতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার উৎসাহে বহু প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে, বহু নরনারীর জীবন আধ্যাত্মিক আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহার মতো মহাপুরুষের কখনও মৃত্যু হয় না। তিনি আমাদের সহিত এখনও বর্তমান। তাঁহার আশীর্বাদ, তাঁহার আশ্বাসবাণী আমাদের জীবন পথের সম্বল।'' সভায় বহু টেলিগ্রাম ও পত্র পঠিত হয়। ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট মাদ্রাজিগণ স্বামীজীর অনুপম চরিত্র ও কর্মময় জীবনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা দেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল পি. এস. শিবস্বামী আয়ার এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন যে, ''দক্ষিণ-ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জীবনপাত করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল মাদ্রাজের হিন্দুসমাজ তাহা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে স্বীকার করিতেছে।'' শিবস্বামী বলিলেন—''অশেষ গুণালঙ্কৃত স্বামীজী আমাদের পরম প্রিয় ছিলেন। সুদীর্ঘ পনের বৎসর এই অঞ্চলে কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি বহু নরনারীর জীবনে যে ধর্মবীজ রোপণ করিয়াছেন তাহা অদূর ভবিষ্যতে বিশাল বৃক্ষে

পরিণত হইবে। বিন্দুমাত্র স্বার্থপরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রতিষ্ঠা বা প্রশংসা তিনি ঘৃণা করিতেন। স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব সৃষ্টি। মাদ্রাজে স্বামীজী যেস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা দীর্ঘকাল শূন্য থাকিবে। তিনি যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহা সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে।"

টি.ভি. শেষগিরি আয়ার দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, "স্বামীজীর সহিত সুপরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ নিঃস্বার্থপরতা এবং গভীর মানবপ্রীতি। তিনি করুণার প্রতিমূর্তি ছিলেন। আমি যতদূর জানি তাঁহাকে একটিও কর্কশ কথা বলিতে শুনি নাই। তিনি এত মিষ্টভাষী ও সৌম্যদর্শন ছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলে একজন প্রাচীন ঋষি মনে হইত। তাঁহার সহানুভূতি সার্বজনীন ছিল। মাদ্রাজে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ অতিবাহিত হইয়াছে।" অধ্যাপক এম রঙ্গাচারিয়ার স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সি পি রামস্বামী আয়ার বলেন, স্বামীজী যে কর্ম করিয়া গিয়াছেন সেইগুলিকে পুষ্ট ও বিস্তৃত করাই তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিরক্ষার জন্য উক্ত সভায় একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল।

২৯ আগস্ট সন্ধ্যায় ত্রিচিনোপল্লির হিন্দুস্কুলে একটি শোকসভা হয়। টি বি শ্রীনিবাসাচার্য এবং এস জি দীক্ষিত স্বামীজীর স্মরণে দুইটি সংস্কৃত কবিতা রচনা করেন। সভায় কবিতা দুইটি পঠিত হয়। সভাপতি রাধাকৃষ্ণ আয়ার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের গুণরাশির ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া একটি বক্তৃতা দেন। স্থানীয় হিতকারিণী সমাজের উদ্যোগে ভিজাগাপট্টমেও একটি শোকসভা হয়। সমাজের সম্পাদক স্বর্গগত স্বামীজীর মহত্ত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন, "তিনি বর্তমান ভারতের আদর্শ ঋষি ছিলেন। কর্মজীবন যাপন করিলেও তিনি সর্বদা নিজেকে সকলের পশ্চাতে রাখিতেন। তাঁহার সহিত ক্ষণকাল আলাপ করিলে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা হইত। এই জড়বাদ ও ভণ্ডামির যুগে তিনি ছিলেন আমাদের পথপ্রদর্শক গুরু।" বানিয়ামবাদী বিবেকানন্দ-সঙ্ঘের উদ্যোগে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। সভাপতি প্রকাশ করেন যে, স্বামীজীর স্মৃতিতে অদূরবর্তী পুদুর নামক গ্রামে একটি ছত্র স্থাপিত হইবে। বানিয়ামবাদী হইতে ছয় মাইল দূরে নেট্টারামপল্লিগ্রামে একটি রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামীজীর প্রাণপাতী পরিশ্রমে তাঁহার জীবনকালে দক্ষিণ-ভারতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে প্রায় পনেরটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

(উদ্বোধন ঃ ৪৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

(মহাসমাধি)

কিরণচন্দ্র দত্ত

ভেদিয়া অবনী কেন শোক-ধ্বনি
কেন থর থর কাঁপিছে কায়।
ত্যজিয়া ধরণী ভক্ত-চূড়ামণি
কে আজ কোথায় চলিয়া যায়॥

জয় রামকৃষ্ণ জয় জগদিষ্ট
কাঁপায়ে গগন উঠিছে ধ্বনি।
নগরে-বাহিরে ভাগীরথী-তীরে
এক(ই) মহানাম শ্রবণে শুনি॥

ভক্তি-প্রেম-মাখা, জ্ঞান-রাগে ঢাকা
কার ও বিশাল সোনার দেহ।
ফুলের শয্যায় কারে লয়ে যায়,
আঁধার করিয়া ধরার গেহ॥

ন্যাসি-শিরোমণি ভক্ত-বীরাগ্রণী
শুনায়ে গুরুর অমৃত কথা
রাম-কৃষ্ণ-লোকে পরম পুলকে
চলিলে, রাখিয়া স্মৃতির ব্যথা॥

অপূর্ব সাধনা গুরু-আরাধনা
তোমার সমান জগতে নাই।
ভক্তির প্রবাহ সাকার বিগ্রহ
প্রেমোচ্ছ্বাস অত কোথায় পাই॥

ছিন্ন করি পাশ জীবন-প্রভাতে
গুরু-পদে প্রাণ সঁপিলে আসি!
সাধনার বলে নিরবাণ-পথে
ভ্রমিয়া লভিলে অমৃত-রাশি॥

উত্তরীয়ে বাঁধি বরফের কণা
এক ক্রোশ দূরে, শ্রীগুরু পাশে।

লয়ে গেলে তুমি আশ্চর্য ঘটনা
কেবা পারে হেন মরত-বাসে॥
জন্ম-তিথি-পূজা, সারা দিবানিশি,
কে আর সক্ষম তোমার মতো।
সেবিয়া গুরুরে একাসনে বসি
'সিদ্ধাসন' নামে হয়েছ খ্যাত॥
জ্যেষ্ঠ গুরু-ভ্রাতা বিবেক-আনন্দ
আজ্ঞা শিরে ধরি প্রবাসে দূরে।
প্রচারিলে ধর্ম রাম-কৃষ্ণানন্দ
'রাম-কৃষ্ণ-তত্ত্ব' প্রেমের ভরে! (১)

শেষ অবতার লক্ষণের মত
চতুর্দশ বর্ষ থাকিয়া ব্রতী! (২)
শেষাচার্য দেশে গুরু-কার্যে রত
করি প্রাণ-পণ ছিলে হে যতি॥
উজ্জ্বল সে দেশ তব প্রতিভায়,
ব্রহ্মবাদী গায় মহিমা-গান!
জয় রামকৃষ্ণ জয় সমন্বয়
চারিদিকে সেথা উঠিছে তান॥
'শ্রীকৃষ্ণ-চরিত' 'রাখাল-বালকে' (৩)
তোমার লেখনী-গৌরব গায়।
সেই কৃষ্ণ-কথা 'সাম্রাজ্য-স্থাপকে' (৪)
তোমার প্রতিভা প্রকাশ পায়॥

'পূর্ণত্বের পথ' 'তত্ত্ব-জীবাত্মার', (৫-৬)
'বিশ্ব ও মানব' বেদান্ত কথা। (৭)

---

১ "Sri Ramakrishna and His Mission"

২ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯১১ অব্দ পর্যন্ত মাদ্রাজে 'রামকৃষ্ণতত্ত্ব'-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। ১৪ বর্ষ কঠোর পরিশ্রমে শরীর ভগ্ন হইয়া গেল।

৩,৪ "Sri Krishna, the Pastoral" and "Sri Krishna, the King Maker" নামক পুস্তিকাদ্বয়।

৫ "Path to Perfection"

৬ "The Soul of Man" নামক গ্রন্থ।

৭ "The Universe and Man" নামক গ্রন্থ।

কে আর শুনাবে নাশি অন্ধকার?
কে আর হরিবে অজ্ঞের ব্যথা ॥
'রামানুজ'-কথা লিখি 'উদ্বোধনে' (৮)
আচার্য-মহিমা গাহিলে তুমি।
কাঁদে চারিভিতে তোমার বিহনে
কি তব মহিমা গাহিব আমি ॥
ভক্তি, নিষ্ঠা, ত্যাগ অপূর্ব তোমার
কঠোর তপস্যা বিরল নরে।
বুঝেছে যে জন মাহাত্ম্য অপার
পূজিবে মানসে প্রেমের ভরে ॥
গুরু-প্রেমাবদ্ধ রাম-কৃষ্ণানন্দ
গুরুগত-প্রাণ আদর্শ ঋষি।
অভেদ সম্বন্ধ গুরু-নামানন্দ
যাও গুরু পাশে মহর্ষি 'শশী' ॥
যাও দেব, যাও সেই মহালোকে
যথা রাম-কৃষ্ণ বিরাজমান!
কীর্তি-গান তব ভরিল ভূলোকে
দ্যুলোকে জ্যোৎস্না করগো দান ॥

একবিন্দু প্রেম একবিন্দু জ্ঞান
তোমার অনন্ত ভাণ্ডার হতে
দিও দয়া করে অধম সন্তান
চলে যেন তব চালিত পথে!

(উদ্বোধন : ১৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা)

---

৮ 'রামানুজ-চরিত' নামক বিরাট-চরিতাখ্যান, উদ্বোধনে প্রকাশিত।

চতুর্থ পর্ব

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্রাবলী

প্রথম পর্ব

(১)

নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায়

আলমবাজার
২-৩-৯৩

মহাশয়,

মহোৎসব উপলক্ষে আপনি ১০ টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহা যথা সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রী বিশ্বেশ্বর স্বরূপ ভগবান রামকৃষ্ণের প্রসাদবলে তাঁহার জন্ম মহোৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রায় ৫ সহস্র জনের সমাগম, ত্রিংশ সম্প্রদায় হরি সংকীর্তনকারিগণের গগনভেদী মানস মুগ্ধকারী ধ্বনি আনন্দ কোলাহল সুমধুর বংশিনিনাদ প্রভৃতি সুখময় ব্যাপারে গত রবিবার যে কিরূপ ও কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বলিতে পারি না। মহাশয়, যিনি স্বপ্রকাশ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে হয় না। তিনি আপনিই আপনাকে প্রকাশ করিয়া মনুষ্য হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিয়া দেন ও জ্ঞানালোকে সকলের নিমীলিত চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন। অধিক আর কি লিখিব। আপনি সকলই অবগত আছেন। আমাদের শারীরিক অবস্থা মন্দ নহে। সকলই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা। আপনার কুশল সংবাদ প্রার্থনা করি।

পুনঃ নরেন্দ্র ও গঙ্গাধরের সমাচার বহুদিবস প্রাপ্ত হই নাই। নিমন্ত্রণ পত্র আমাদের নিকট হইতেই গিয়াছিল।

ইতি শুভানুধ্যায়ী
শশী (রামকৃষ্ণানন্দ)

East India
Babu Pramadadas Mitra
Chowkhamba
Benares City

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা

1-3-1894
আলমবাজার

মহাশয়,

এই মাত্র আপনার প্রেরিত ১০৲ টাকা প্রাপ্ত হইলাম। এবার লোক সমাগম অত্যধিক হইবে এরূপ আশা করা যায়। আপনি যদি মহোৎসবের দিবস এখানে আসিয়া উহাতে যোগ দেন তাহা হইলে যে আমাদের কি পর্যন্ত আনন্দ হয় বলিতে পারি না। নরেন্দ্র এখন চিকাগোতেই আছেন। গঙ্গাধর রাজপুতনায় মানসীশর নামক স্থানে আছেন। তারক স্বামী ৺রামেশ্বর ধামে আছেন। অনুগ্রহ করিয়া যদি শ্রীমদদ্বৈত স্বামীর সংবাদ লইয়া আমাদের জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে আমরা বড় বাধিত হইব। আপনার উপস্থিতি আশীষ প্রার্থনীয়। ইতি

Yours truly
রামকৃষ্ণানন্দ

Post Card
EAST INDIA
Babu Pramadadas Mitra
Chowkhamba
Benares City

(৩)

Math, 26-12-95

My dear Baburam,

গতকল্য হৃদয় মুখোপাধ্যায় মঠে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের বৃন্দাবন দর্শন যাহা শুনিলাম তাহা যথাযথ লিখিতেছি। শ্রীশ্রীগুরুদেব প্রথমত মথুরায় নামিয়া ধ্রুবঘাট প্রভৃতি দর্শন করেন। পরে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের নিকটবর্তী একটি বাড়িতে থাকেন। সঙ্গে মথুর, হৃদয় প্রভৃতি ছিলেন। বৃন্দাবনে তিনি সর্বদাই ভাবাবেশে থাকিতেন। এক পাও হাঁটিতে পারিতেন না। পালকি করিয়া লইয়া যাইতে হইত। পালকির দ্বার খোলা থাকিত। তিনি দর্শন করিতে করিতে যাইতেন। যখন ভাবে অধীর হইয়া পালকি হইতে লাফাইয়া পড়িতে চাহিতেন তখন হৃদয় নিবারণ

করিত। হৃদয় পালকির বাড় ধরিয়া যাইত। তিনি ঐরূপে হৃদয়ের সহিত শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড দর্শনে যান। মথুরবাবুর সঙ্গে যান নাই। পথে যাইতে যাইতে শ্বেতময়ূরের পাল তিনি অগ্রে দর্শন করেন ও হৃদয়কে দেখান এবং ভাবে অধীর হইয়া পালকি হইতে লাফাইয়া পড়িতে চান। পরে হরিণের দল দেখিয়া তাঁহার খুব ভাবোদয় হয়। তিনি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড দর্শন করত তাহাদের সমীপবর্তী সমুদয় দেবালয়গুলি দর্শন করেন। মথুর প্রায় ১৫০ টাকার সিকি ও দু আনি বিতরণের জন্য হৃদয়ের হস্তে দিয়াছিল। তিনি সাধু, বৈষ্ণব দেখিলেই হৃদয়কে কিছু কিছু দিতে বলিতেন। পরে গোবর্ধন দর্শনে যান। তথায় উলঙ্গ হইয়া একেবারে গিরিরাজের উপর উঠিয়া পড়েন। পাণ্ডারা ধরিয়া নামাইয়া আনে। তৎপরে নিধুবনে গঙ্গামাতার নিকট যান। গঙ্গামাতা তাঁহাকে দর্শন করিয়াই চিনিতে পারেন। তিনি তাঁহার নিকট প্রায় ৬/৭ দিন ছিলেন। তাঁহার ভালোবাসায় এমনই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে গঙ্গামাতার নিকট হইতে আসিতে চান নাই। গঙ্গামাতাও তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন নাই। শেষে মথুরবাবু ইহা শুনিয়া হৃদয়কে কহে যে তুমি যে কোন উপায়েই পার গঙ্গামাতার নিকট হইতে তাঁহাকে লইয়া আইস। আমরা উহাকে ছাড়িয়া কিরূপে শূন্য হৃদয়ে বাড়ি ফিরিব?

হৃদয় তদনুসারে গঙ্গামাতা ও তাঁহার একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে নিধুবন হইতে লইয়া আসে। সে সময়ে গঙ্গামাতা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার বৃন্দাবন দর্শন শেষ হইলে তিনি মথুরের সহিত মথুরায় ফিরিয়া আসেন ও তৎপরে কলকাতার দিকে প্রত্যাগমন করেন। তিনি বৃন্দাবনে ভেক গ্রহণ করেন। তদ্বিষয়ে পরে লিখিব। ইতি

দাস শশী

(৪)

ভাই বাবুরাম,

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ রাধাকুণ্ডের নিকটবর্তী চতুরা পাণ্ডা নামে একজনের নিকট ভেক গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দর্শনের সময় তাঁহার হাতে সর্বদাই একটি কাঁচা কঞ্চির ছড়ি থাকিত। তাহা যদি হৃদয় কখনও কখনও কাড়িয়া লইত তিনি

তাহাতে অতিশয় কাতর হইতেন এবং যতক্ষণ না ফিরিয়া পাইতেন ততক্ষণ স্থির হইতেন না—এক পাও হাঁটিতে পারিতেন না—এমনকি পালকির ভিতর বসিয়া যমুনায় স্নান করিতেন ! ইতি দাস

শশী

[উদ্বোধন, ৪৪তম বর্ষ, ১৩৪৯, পৌষ, পৃঃ ৭২২]

(৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা

Alambazar
2.2.97

বিশ্বনাথৈকশরণ পূজনীয় মহাশয়,

আপনার প্রেরিত নস্য যাহা আপনি অখণ্ডানন্দকে পাঠাইয়াছেন তাহা আসিয়া পঁহুছিয়াছে। সেই নস্যের কিয়দংশ আমি আমার প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিয়াছি। অবশিষ্টাংশ আমরা ব্যবহারার্থ রাখিয়াছি। আপনি আমাদের যথেষ্টই স্নেহ করেন। যখন যাহা আবশ্যক হয় আপনি তখনই তাহা সমাচার প্রাপ্তি মাত্রই পাঠাইয়া দেন। আপনার প্রেমপূর্ণ প্রশস্ত হৃদয় সর্বদাই শান্তিরূপ অমৃতে সিক্ত। সুতরাং আমরা আপনাকে আর কি ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ দিতে পারি? আমরা অকিঞ্চন সন্ন্যাসী। "অকিঞ্চনানাং ধর্মং" একমাত্র যিনি, তিনিই আপনার হৃদয়ে নিরন্তর শান্তিরস সিঞ্চন করুন ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। ইতি

শুভানুধ্যায়ী রামকৃষ্ণানন্দ

Post Card
Babu Pramadadas Mitra
Chowkhamba
Banares City

(৬)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মশরণম্

1-4-1897

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথৈকশরণ শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আমি আজ প্রায় এক পক্ষ হইল এ নগরীতে সমাগত হইয়াছি। এখানে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অনেক ভক্ত আছেন। আমি তাঁহাদের মধ্যে আছি। তাঁহাদের

নিকট আমায় আজকাল গীতা ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে, ইঁহারা দ্রাবিড়ীয় ভাষায় কথাবার্তা কহেন। সুতরাং ইঁহারা যাহা বলেন তাহা আমার বোধগম্য হওয়া দুঃসাধ্য। তবে সুবিধার মধ্যে এই যে ইঁহারা প্রায় সকলেই ইংরেজিতে অভিজ্ঞ। আমি ইঁহাদিগকে ইংরেজিতেই বুঝাইয়া থাকি। আপনার ইংরেজি গীতা যদি একখানি পাঠান তো উপকৃত হই। Alasinga Perumal-এর ঠিকানায় পাঠাইলেই হইবে। আপনি আমার ভালোবাসাদি জানিবেন।

ইতি শুভানুধ্যায়ী রামকৃষ্ণানন্দ

Post Card
Babu Pramadadas Mitra
Chowkhamba
Benares City

(৭)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শরণম্

Madras
15.4.1897

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথৈকশরণ মহাশয়,

আপনার ইংরেজি গীতা ও স্নেহপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। পত্র কিছু বিলম্বে পাওয়ায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে। আপনার নমস্কার Alasinga-কে জানাইয়াছি ও আপনি তাঁহার পত্র পাইয়াছেন তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছি। আপনার গীতানুবাদ বড় সুন্দর হইয়াছে। ইংরেজি ভাষায় ব্যাখ্যাকরণ কালে ইহা আমার বড় কাজে লাগে। আপনার স্নেহে আমরা আপনার নিকট সর্বদা ঋণী। আপনি আমার ভালোবাসা জানিবেন। ইতি একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

রামকৃষ্ণানন্দ

Post Card
Babu Pramadadas Mitra
Chowkhamba
Benares City

(৮)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা

Triplicane
Madras

My dear Master,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া বড় আনন্দ হইল। তত্ত্বমঞ্জরী বাহির হইয়াছে শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। মাঝে২ লিখিতে চেষ্টা করিব। 'ব্রহ্মবাদিন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' যথাসময়ে যাইবে। তোমরা তাহাদের Office-এ exchange করিয়া পাঠাইয়া দিও। রামদাদা ও মনোমোহনবাবুকে আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ নিবেদন করিও এবং তুমি ও অন্যান্য সকল ভক্ত আমার প্রণাম ও ভালোবাসা জানিও। এখানে একরকম কার্য চলিতেছে মন্দ নয়। এখানকার লোকেরা বড় ভক্ত। রামদাদাকে বলিয়া তাঁহার রচিত শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জীবনী ও তাঁহার যাবতীয় Lecture এর শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের উক্তি যদি পাঠাইতে পার তো বড় ভালো হয়। আমি ঐ সকল কিছু২ ইংরেজি তর্জমা করিয়া ব্রহ্মবাদিন প্রভৃতি কাগজে লিখিব। ইতি

Post Card — শুভানুধ্যায়ী
Babu Akshaya Kumar Sen — দাস শশী
C/o. Sj. Ramchandra Dutta
@ Yogodyana
15 Kankurgachi
East of Calcutta.

[উদ্বোধন, ৮৫তম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৯০, পৃঃ ৩৬০]

(৯)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা

Triplicane
15-04-1898

My dear Narendra,

তুমি বোধহয় আমার ও আলাসিঙ্গার পত্র এতদিনে পাইয়াছ। আলাসিঙ্গা তোমায় ব্রহ্মবাদিন সম্বন্ধে সকলই লিখিয়াছে। তাহার শরীর আজকাল তত ভালো নাই। বড় কাহিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমই তাহার কারণ। তাহার ইচ্ছা যে

এক বৎসরের জন্য স্কুল হইতে ছুটি লয়। বোধ হয় তাহার ছুটি মঞ্জুর হইতে পারে।

আলাসিঙ্গা কহিল যে ব্রহ্মবাদিন প্রকাশ করিতে তাহার ২০০০ টাকা দেনা হইয়াছে। প্রেসটা অতি রোখা। একটি machine না হলে ভালো কাজ হবে না। তুমি যদি উহাকে ঋণস্বরূপ কিছু টাকা দাও (১০০০ হাজার কি, ১৫০০) তাহা হইলে প্রেসটিকে খুব ভালো করিতে পারিবে এবং নানা রকমের job work করিয়া শীঘ্রই লাভ দাঁড় করাইতে পারিবে ও পরিশেষে তোমায় শোধ করিয়া দিবে। এখন তার school এর কার্য না করিলেও চলিবে। মাদ্রাজের ভিতর এক আলাসিঙ্গাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। ala এবং g.g., যে অতি সজ্জন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি যদি নিজে আস এবং একটা বন্দোবস্ত করে দাও তো বড় ভালো হয়। ওদের বুদ্ধি শুদ্ধি বড় কম। ব্রহ্মবাদিন বুক form এ করেছে, তাতে পুরো খরচ বেড়েছে, কিন্তু দাম বাড়ায় নি। এতে কোন বই আর কি হবে? তুমি যদি একটি double crown machine press এবং কিছু ভালো type জোগাড়ের সুবিধা করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়। যাহা ভালো বুঝিবে করিও। বর্তমানে স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ তাতে আলাসিঙ্গার ছুটি লওয়াই ভালো। ব্রহ্মবাদিন ও স্কুল করা একসঙ্গে হয়ে উঠবে না। এখানকার কার্য পূর্ববৎ চলিতেছে।

এখানে এখনি ভয়ানক গরম পড়েছে যে রোদের দিকে চাওয়া যায় না। তোমার এখানে এলে একটু কষ্ট হবে। বসন্তকে কি এখানে পাঠাবে? এই রোদে আবার মঠের টাকার জন্য ভিক্ষে করতে যেতে হবে, আলাসিঙ্গার ভাইও ভিক্ষা করতে বেরোবে। তোমার কি মত? যদি ভিক্ষে করাই মত হয়, তাহলে একজনকে এখানে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। বসন্ত হলেই খুব ভালো হয়। নয়তো হরিবাবু। আহা, গঙ্গাধর যদি ইংরেজি জানতো, তাহলে ও একা সব করে দেখাতে পারতো। সারদা কি এক্ষণে lecture করতে ... পারবে?...

Suggest করো। তুমি যাকে ভালো বুঝ ও spare করতে পারো তাকেই পাঠিও। Alasinga কে সাহায্য না করলে বেচারা আর পেরে উঠবে না। কিছু টাকাকড়ি পাঠিয়ে দিও। আমার ভালোবাসা জানিও। ইতি দাস

শশী

জি.সি.র এক কন্যা সন্তান হইয়াছে।

(১০)

Triplicane
5.2.1903

My dear Kali,

তোমার প্রেরিত 'How to be a Yogi' এবং 'The Philosophy of Work' দুখানি সুন্দর পুস্তক পাইয়াছি। তোমার কার্যকলাপ বেশ চলিতেছে জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তোমার শরীর কেমন আছে? সারদা কেমন আছে? নরেন তো কার্য হইতে অবসর লইয়াছেন।* এখন তোমরাই তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছ। এখানে আমার কার্য একপ্রকার চলিতেছে, তবে আমিও অবসর লইবার অপেক্ষায় আছি। আর পারি না এবং ভালোও লাগে না। তবে যতদিন কর্মভোগ আছে করিতে হইবে।

মঠের সমাচার ভালো। সম্প্রতি শ্রীশ্রীবিবেকানন্দজীর জন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় চারি হাজার কাঙালি এবং ৫০০ শত ভদ্রলোক প্রসাদ পাইয়াছিলেন। এখানে আমরা প্রায় ৮০০ শত গরিবকে খাওয়াইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মোৎসব 1st of March and Public Celebration on the 8th. বোধ হয় শেষ দিন তুমি আমার এই পত্র পাইবে।

তোমার lecture গুলি বড় প্রাঞ্জল এবং সুপাঠ্য। ভারতবর্ষে তোমার কত প্রতিপত্তি! Coconada নামক একটি স্থানে Industrial Exhibition হয়। তাহাতে তোমার এক বৃহৎ প্রতিকৃতি দর্শকগণের বিনোদনার্থ রচিত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দজীর তুমিই উপযুক্ত গুরুভাই—ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। আমি ইহাতে যে কত আনন্দিত তাহা তোমায় কি বলিয়া জানাইব! 'ইতরে নামধারিণঃ'—আমরা তাই। সারদাও একটি মহাপুরুষ শীঘ্রই হইতে চলিলেন। তাঁহাকে আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ ও ভালোবাসা জানাইও এবং তুমিও জানিও। তোমার কি এদেশে আসিবার আর ইচ্ছা করে না?

তোমায় একবার দেখিবার ইচ্ছা করে। তবে দুষ্কৃতের স্বর্গদর্শন যেরূপ আশা করা বৃথা আমারও সেইরূপ। আমরা এখানে আজকাল পাঁচজন আছি, যথা

* স্বামী বিবেকানন্দ এর আগেই ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই মহাসমাধিতে শরীর ত্যাগ করেন।

গুপ্ত[২], তাহার ভাগিনেয়*, পরমানন্দ, যোগীন নামা একজন ব্রহ্মচারী ও আমি। শ্রীমন্মঠে (বেলুড়স্থ) শরৎ, বাবুরাম, গোপালদা, খোকা[৩], তুলসী চাটুয্যে, কানাই[৪], নন্দ এবং অনেকগুলি কুঁচো ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী।

লাটু[৫], খোড়ো কেদারকে ও অনেককে কৃতার্থ করিতেছেন। Sister Nivedita ব্যাঘ্রহট্টে একটি বাঘের দোকান খুলিবেন বলিয়া বড়ই ব্যস্ত। অর্থাৎ তিনি তেজোবীর্যওজঃ বিশিষ্ট হর্ষ-ভয়োদ্দীপক কতিপয় ভারত নন্দনকে লইয়া ভারত মেলার শোভাবর্ধন করিতে গিয়াছেন। মতলব যে পরম শ্লাঘ্য এবং নিরতিশয় উদার তাহা আমার ন্যায় অর্বাচীন ভিন্ন আর কে সন্দেহ করিতে পারে। তিনি সম্প্রতি স্বীয় প্রতিভাবলে দাক্ষিণাত্য উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই প্রসুপ্ত দেশকে consciousness of nationality দিয়া প্রবুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। উদ্দেশ্য যে আসমানের ন্যায় নেহাৎ উচ্চ তাহা সন্দেহ করা বাতুলতা। তুমি মনে করো না যে, আমি গম্ভীরভাবে বা soberly বলছি না, যা বলছি তাহা সমুদয় sober অবস্থায়। গঙ্গাধর[৬] orphanage চালাইতেছেন মুর্শিদাবাদের নিকট। হরিপ্রসন্নাদয়ঃ[৭] এলাহাবাদে একটি ধর্মের club খুলিয়াছেন, নাম The Brahmavadin Club। তারকদাদা[৮] ৺কাশীধামে Poor Man's Relief Association এ অনেক আতুরের জরা দ্বারাই হোক বা রোগের দ্বারাই হোক দুঃখ অপনোদন করিতেছেন মঠীয় কয়েকজন স্বামীজীদের সহিত।

মতিলাল[৯], কালীকৃষ্ণ[১০], খগেন[১১], স্বরূপানন্দ, মাতাজী Mrs Savier এর সহিত মায়াবতী নামক হিমালয় দুর্গ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রচণ্ড অদ্বৈতবাদের সুপ্রচণ্ড আওয়াজে যাহার নাম 'প্রবুদ্ধ ভারত', সমগ্র নিদ্রিত ভারত প্রবুদ্ধ হয় হয় হইয়াছে। ভয় কিছুই নাই তবে যদি ঘুমটা না পেকে থাকে তাহলে কাঁচা অবস্থায় ভাঙ্গলে মাথাধরা প্রভৃতি রকমের রোগ পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ বিষয়ে তো ঠিক বলা যায় না, পাকতেও পারে। তা হলে প্রবোধ যে অমৃতবৎ হবে তাহা নিশ্চয়।

পীড়িত সাধুগণ কনখলে ও হৃষিকেশে মনোযোগ সহকারে চিকিৎসিত হইতেছেন। কল্যাণানন্দ এবং সত্যকাম (সারদার ভাই) এই মওড়াটি (মোহড়া) রক্ষা করিতেছেন। ভারতে অনেক স্থলেই Vivekananda Society সমূহপ্রসূত,

---

২ স্বামী সদানন্দ ৩। স্বামী সুবোধানন্দ ৪। স্বামী নির্ভয়ানন্দ ৫। স্বামী অদ্ভুতানন্দ

* অমূল্য—স্বামী শঙ্করানন্দ। ৬। স্বামী অখণ্ডানন্দ ৭। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি ৮। স্বামী শিবানন্দ ৯। স্বামী সচ্চিদানন্দ (ছোট) ১০। স্বামী বিরজানন্দ ১১। স্বামী বিমলানন্দ

নবপ্রসূত ও প্রসবোন্মুখ হইয়াছে। দিগ্‌দিগন্ত মহাপুরুষের যশোগানে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এইতো আমি তোমায় তোমার জন্মভূমির ছবি দিলাম। আশাকরি তোমার কর্মক্ষেত্রের তুমিও এরূপ একখানি ছবি পাঠাইবে—at least etiquette-এর খাতিরে। বাবা! তোমরা আজকাল সাহেব বনে গেছ। সুতরাং আমাদের ন্যায় অগণ্যের চাল দোরস্ত না হলে হয়ত মনে মনে চোটতে পার। সেই ভয়ে আগে ছবি চাইলুম। এই তো সাহেবদের দস্তুর? গড়িমসি করিয়া কাল কাটাইতেছি যে, আমি (This is just like an American compound) সেই আমায় পত্রোত্তর দানের বিলম্বে স্বীয় মহত্ত্বগুণে অপরাধ গ্রহণ না কর ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

ইতি

তোমার দাস—শশী।

(১১)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন

৬-২-০৫

প্রিয় গঙ্গা,

দু-তিন দিনের মধ্যে তোমার ডায়েরি পাঠানো হবে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব কেমন পালন করলে? এখানে আমরা প্রায় তিন হাজার গরিবদের খাওয়াতে সমর্থ হয়েছি। অনেক ভজনের দল এসেছিল। দিনটি খুব চমৎকার ভাবে অতিবাহিত হয়েছিল।

আমার গভীর ভালোবাসা ও প্রণাম জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(১২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Triplicane

14.3.05

My dear Ganges,

এখানে মহোৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় সাতহাজার

গরিব প্রসাদ পাইয়াছে। সংকীর্তন, হরিকথা, lecture প্রভৃতি খুব হইয়া গিয়াছে। তোমার ওখানকার reportও কিছু পড়া হইয়াছে। তুমি বোধহয় Diary পাইয়া থাকিবে। ইহা অনেক দিন হইল পাঠান হইয়াছে। তাহার প্রাপ্তি স্বীকার কর নাই কেন? ঠিকানায় তো গোল হয় নাই? আমরা Bhabda P.O. লিখিয়াছি বোধ হয় আমাদের চিঠিপত্র সেইজন্যই পাও নাই। ইহার নিশ্চিত খপর লিখিও। আমি পরশ্ব Rangoon যাইব। তোমার কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিও। ইতি

Yours affly. শশী

(১৩)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Triplicane
08.10.05

My dear Ganges,

তুমি আমার, বসন্ত ও শুকুলের বিজয়ার সাষ্টাঙ্গ প্রণামাদি ও আলিঙ্গনাদি জানিবে। এখানে পূজা এক প্রকার ভালোই হইয়া গিয়াছে। তোমার Orphanage এর ছেলেগুলিকে আমাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাইবে। এখানে বৃষ্টি হইতেছে। Bangalore-এ খগেন, হরিপদ ও এক ব্রহ্মচারী ভালো আছে।

ইতি
Yours affly.
শশী

(১৪)

শ্রীশ্রীগুরুদেব—শ্রীপাদপদ্ম ভরসা

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলম্বো
২৮/০৬/১৯০৬

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণকমলেষু
মা,

আপনার আশীর্বাদে কালী (স্বামী অভেদানন্দ), আমি ও বসন্ত (পরমানন্দ) ভালো আছি। কালী এখানে অনেক বক্তৃতা দিয়াছে। এই লঙ্কাদ্বীপের যাবতীয় লোক কালীর প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখাইয়াছে। কালী অনেকগুলি বক্তৃতা এখানে

করিয়াছে। আমরা এদেশের অনেক শহর দর্শনাদি করিয়াছি এবং সেখানে সেখানে কালীর বক্তৃতা হইয়াছে।

আমরা অদ্য সন্ধ্যার সময় জাহাজ করিয়া তুতকুড়ি নামক ভারতবর্ষের দক্ষিণে অবস্থিত একটি শহরে যাইব। কাল সকালে তথায় পৌঁছাইব। সেখানকার লোকেরা কালীকে বিশেষ সমাদর ও অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুত আছে। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন কালী দীর্ঘায়ু হইয়া শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কার্য করিতে সমর্থ হয়। আপনার আশীর্বাদ যেন বসন্ত ও আমার প্রতি চিরকাল থাকে।

ইতি
আপনার সন্তান
শশী

আপনি আমাদের সকলের অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানিবেন।

ইতি
সন্তান
শশী

[সৌজন্যে ব্রঃ অক্ষয়চৈতন্য। শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে, সম্পাদক ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৩য় খণ্ড (পৌষ ১৪০৯) পৃঃ ৮৪০]

(১৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Triplicane
6-3-1907

ভাই কালী,

অনেক দিনের পর তোমার হস্তলিপি পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। তুমি মহৎকার্যে ব্রতী, তোমার সময় অল্প, সুতরাং তোমার কাছে সব সময় চিঠি পাওয়া অসম্ভব। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ নিরক্ষর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহার কারণ বোধ হয় তিনি জগৎকে বর্তমান শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই ওইরূপ পরম নির্মল শিশুতুল্য হইয়া আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম বিষময় ফল এই যে, ইহা ভগবদ্ভক্তি ও গুরুভক্তি হৃদয় হইতে একেবারে অপসারিত করিয়া দেয়। অসংখ্য সংশয় মনে আনিয়া মানুষকে পশুতুল্য করিয়া ফেলে। পরকালে বিশ্বাস না থাকায় ইহ জীবনেই যাবতীয় সুখভোগ করিতে

ইচ্ছা করে, সুতরাং কামিনী ও কাঞ্চনের দাবীই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিয়া তাদের উপাসনায় ব্যস্ত হয়। মান-ক্যাংলা, দেহসর্বস্ব, স্বার্থপর ও নিষ্ঠুরহৃদয় হইয়া দেবতুল্য মানবজীবনকে পশুতুল্য করিয়া ফেলে!

হ-র দোষ নাই, উহার শিক্ষার দোষ। ঐ যে একটু ইংরেজি বলতে পারে, দাঁড়িয়ে lecture দিতে পারে, ওতেই বেচারার সর্বনাশ করেছে। জান না কি, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ যে ছেলেগুলো lecture দিতো তাদের দুচক্ষে দেখতে পারতেন না? শিক্ষক হওয়া বড় কঠিন। যার উপলব্ধি আছে তিনিই শিক্ষক হতে পারেন। আমি রাজা মহারাজকে[১] উহার সম্বন্ধে জানাইয়াছি। তিনি উহাকে উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর কৃপায় উহার মঙ্গলই হউক ইহা আমার একান্ত প্রার্থনা।

কতকগুলো লোক মনে করে মুখে স্বামীজীর প্রশংসা কল্লেই তাঁকে মানা হলো! যারা তাঁকে মুখে প্রশংসা করে তারা তাঁকে কখনও ঠিক ঠিক মানে না। ভালোবাসা ও ভক্তি হৃদয়ের জিনিস। যে গুয়োর বেটা বলে বেড়ায় যে, আমি ভগবানকে খুব ভক্তি করি সে শালা কোন কালে ভক্ত নয়। স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো মনে করেন যে, তুমি তাঁদের মতো তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা কর না। ছোঁড়াগুলো এও বোঝে না যে, যাঁরা তাঁর সঙ্গে একত্র খেয়ে, বসে, শুয়ে এলেন, যাদের সঙ্গে তিনি অভিন্নভাবে থেকে যাবতীয় কথা প্রকাশ করতেন, তারা যে তাঁকে কখনও অভক্তি করতে পারবে না—চেষ্টা করলেও পারবে না! এরূপ মনে করা কেবল বুদ্ধির দোষ। যাহা হউক তুমি নিজ গুণে হ-কে ক্ষমা করে যাহাতে উহার মঙ্গল হয় সেই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখ।

বসন্তের[২] প্রশংসা তোমার মুখে শুনে বাস্তবিক বড় আনন্দ হলো। তুমি উহার উপর কৃপাদৃষ্টি রেখো। ও ছেলেটি স্বভাবতই নির্মল; সুতরাং উহাতে আমার কোন বাহাদুরি নাই। ছেলেমানুষ, যেন অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ না করে। শুনছি নাকি হপ্তায় চাট্টে করে ক্লাস নেয়। আমার বোধ হয়, অতটা একবারে ঠিক নয়, যাহোক তুমি যেমন বোঝ সেরূপ করিও। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ তোমায় বড় বুদ্ধিমান বলতেন। তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার ধৃষ্টতা। তুমি Mysore-এর রাজাকে তোমার Bulletin[৩] এক এক সেট—মায় গোড়া থেকে

---

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২। স্বামী পরমানন্দ

৩। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকায় 'বেদান্ত মান্থলি বুলেটিন' (Vedanta Monthly Bulletin) নাম দিয়ে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকা বার করতেন।

Gratis পাঠাইবে। Regularly প্রতিমাসে যেমন সমস্ত subscriber কে পাঠাও তেমনি পাঠাবে এবং দুজনকেই বেশ মিষ্টি করে দু-খানি চিঠি লিখবে। তাহলেই কার্য হাসিল হবে। আমিও দু-তিন মাস পরে গিয়ে দেওয়ানের guest হয়ে বসে গোটা দুই-চার Public Lecture দিয়ে যাতে জমি ও বাড়ি শীঘ্র শীঘ্র পাওয়া যায় তারই চেষ্টা কর্ব্বো।

সকলে মিলেমিশে কার্য কল্লে সুফল জন্মে। তুমি শরৎকে[১] খুব মিষ্টি করে একখানি চিঠি লেখো দক্ষিণে এসে দিন কতকের জন্য আমায় সাহায্য কর্ত্তে। হরিবাবুকেও[২] লেখো। কেউ কিছু কর্ব্বে না। সব্বাই সাধু হলে চলবে কেন? মিশনের কার্য সুসম্পন্ন করিতে গিয়ে যদি সহস্র বাপান্ত গালাগাল খেতে হয় তাও স্বীকার করে যে মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায় ব্রতী হয়েছেন তিনিই ঠিক মহাপুরুষ। স্বামীজী কি না কষ্ট সহ্য করে গেছেন? আমাদের সকলের তাঁরই অনুসরণ করা উচিত। Miss Glenn -এর[৩] পত্রে জানিলাম যে তুমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেছ। সেটা ঠিক নয়। শরীরটা রাখা চাই। যদি স্বামীজীর শরীর আরও দিনকতক থাকতো তাহলে কার্য কত সহজ হতো বলো দেখি? শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সন্তানগণ ও স্বামীজীর শিষ্যগণ যাহাতে দীর্ঘায়ু হইয়া লোকহিতকর কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন তাহাই করা উচিত।

এদেশের লোকের অনেক গুণ আছে; কিন্তু দোষও ঢের। বহুকাল হইতে দাস্য করিয়া তমোগুণাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং উহাদের মাঝে মাঝে না চেতালে যেমন নিদ্রিত তেমন নিদ্রিতই থাকিবে। অতএব তুমি ওখান থেকে উৎসাহপূর্ণ চিঠি যদি Mysore-এর রাজাকে, দেওয়ানকে, নারায়ণ আয়েঙ্গারকে, ডাঃ পল্লুকে লেখো তাহলে বড় ভালো হয়। আমার লেখায় তত জোর হবে না। কারণ আমি তাঁদেরই মতো একজন Indian মাত্র। আমার বিলাতি ছাপ গায়ে নাই। আমরা হাজারো স্বদেশী স্বদেশী করে চেঁচিয়ে মরি, বিলাতি ভাব লাগানো জিনিসের উপর যে একটা শ্রদ্ধা জন্মে গেছে সেটা কখনও সহজে যাবার নয়। বেদ ভালো কেন? কারণ Max Müller, Schopenhauer বলেছেন ইত্যাদি। স্বামীজীকে ও তাঁহার সহকারীদিগকে এইজন্যেই এখানকার লোক মানিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা স্বামীজী বেশ জানিতেন। তিনি তাঁহার পত্রেও আমায় এরূপ লিখিয়াছিলেন। যদি তুমি ওদেশে কৃতকার্য হও, এদেশে কৃতকার্য হওয়া কঠিন হইবে না। প্রকৃত সুপণ্ডিত সদ্ব্রাহ্মণের কথা কে আজকাল

১। স্বামী সারদানন্দ, ২। স্বামী তুরীয়ানন্দ, ৩। সিস্টার দেবমাতা

মানে? শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে বাতুল বলিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু অমুক সাহেব বা অমুক বিবি আমাদের ধর্মকে খুব ভালো বলিয়াছেন, অতএব ইহা নিশ্চয়ই ভালো। এরূপ ধারণা প্রায় সকলেরই। সুতরাং আমরাও সুবিধা ছাড়িব কেন? তোমার একটা মিষ্ট কথার জোর যত হবে, আমার সহস্র সহস্র চাটুবচনে তাহার সহস্রাংশের একাংশও হবে না। অতএব তুমি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া দশ বিশ লাইন ওদের লিখো, দেখবে কার্য কত সহজ হয়। ইতি—

তোমার দাস
শশী

পুনঃ এই খামের মধ্যে বসন্তকে ও Miss Glenn-কে লিখিলাম। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দিও। খগেন[১] ও যোগীন বেলুড় মঠে গিয়াছে। যোগীনকে রাজা[২] সন্ন্যাস দিয়াছেন।

[স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজকে বাংলায় লিখিত]

(১৬)

মায়লাপুর, মাদ্রাজ
১৯০৭

My dear Raja Saheb (প্রিয় রাজা সাহেব),

তুমি এই চিঠি পড়িয়া যেরূপ হরিপদকে পরামর্শ দেওয়া উচিত সেরূপ দিও। তোমার আশীর্বাদে এখানকার সব মঙ্গল। তবে একটি ছোকরাকে যত শীঘ্র পার পাঠাইতে পারিলে বড় ভালো হয়। কারণ, আমায় শীঘ্রই lecture (বক্তৃতা) দিবার জন্য বাহিরে যাইতে হইবে। আমার অবর্তমানে একজন মঠে না থাকিলে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সেবা চলিবে না। আমি তাঁহার সেবা বন্ধ করিয়া কখনও কোথাও lecture (বক্তৃতা) দিতে যাইতে পারিব না। তুমি ও বাবুরাম আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানিও এবং শরৎ প্রভৃতিকে জানাইও। ইতি—

Yours affectionately (তোমার স্নেহের)
শশী

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মেদিনীপুর ১৩৫৫, পৃঃ ৩২৫)

১। স্বামী বিমলানন্দ, ২। স্বামী ব্রহ্মানন্দ

(১৭)

ওঁ শ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

(১৯০৭)

ভাই কালী,

তোমার স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। তোমার ন্যায় মহাপুরুষও যে হ-র দুর্ব্যবহারে এতদূর অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বাস্তবিকই তাহার অতি অত্যাচারের ফল। মূর্খের অশেষ দোষ। এই মূর্খগণই ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া গোঁড়ামির অন্ধকারে জ্ঞানচক্ষু আবৃত করিয়া মহাঘোর অধর্মকে ধর্ম বলিয়া জনসমাজে ঘোষণা করতঃ হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা এবং এমনকি নিরর্থক রক্তপাতেরও অরতারণা করিয়াছে। হ-র তোমার প্রতি এত কুদৃষ্টি পড়িবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। মানুষকে অসময়ে স্বাধীনতা দিলে বিপরীত ফল হয়। যে বালক ছুরিকার ব্যবহার জানে না সে তদ্দ্বারা আপনারই হিংসা করে।

স্বাধীনতা, মুক্তি প্রভৃতি বড় উচ্চ জিনিস! কিন্তু বদ্ধ হস্ত-পদ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিলে সে কোন দিকে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না, বরং এদিক ওদিক যাবার চেষ্টা করিতে গিয়া কুস্থান ও পতন-দোষে অশেষ কষ্ট ভোগ করিবে। এই জন্যই শাস্ত্রকার শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।' অহঙ্কারান্ধের কখনও জ্ঞানপ্রভাব বিকাশ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ অহঙ্কার-বিমর্দনকারিণী সেবার উপদেশ দিয়াছেন। গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণের সেবা না করিলে, শ্রীহরির দাস্য না করিলে কখনও এ অন্ধতা মানবকে পরিত্যাগ করে না। একটু আধটু মান যশ পাইলে ইহা আরও বদ্ধমূল হয় এবং আরও অধঃপতনের কারণ হয়।

বর্তমানে বেদান্ত প্রচার এক প্রকার অহঙ্কার প্রচার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অহঙ্কারী বিমূঢ়াত্মা লোকেরা ইহা বুঝিতে পারে না। তাহারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যকে 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপে ধারণা করতঃ সার্ধত্রিহস্ত পরিমিত অস্থি-মাংস-শোণিতময় দেহাত্মাভিমানীকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলিয়া মনে করে এবং ইহাই অন্যের নিকট প্রচার করে। সমগ্র জগৎ এই গোঁড়ারদলেই পরিপূর্ণ। রা-বাবু তাহার একটি নিদর্শন। আপনার কোট বজায় রাখিতে গিয়া যাঁহাকে গুরু ও ভগবান বলিয়া পূজা করেন, তাঁহার কথায় তাঁহারই সম্মুখে অশ্রদ্ধা করিয়াছেন, ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তিনি যখন রা-বাবুর ব্যয়ে চিত্রিত তাঁহার প্রতিকৃতি

দেখিয়া বলিলেন—'এ চেহারা আমার নয়', রা-বাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই ছবিরই পূজা করা বিধেয় মনে করিয়া প্রকৃত প্রতিকৃতির পরিবর্তে তাহাকেই বেদিতে স্থাপনপূর্বক পূজা করিতেন, ইহা তুমি বিশেষ জান। শুনিয়াছি শরীর ত্যাগের অতি অল্পদিন পূর্বে তাঁহার চৈতন্য হইয়াছিল এবং তিনি মঠের স্বামিগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট নিজ দোষ স্বীকার করিয়া অনুতাপ করিয়াছিলেন। ভগবান করুন যেন হ-র সেরূপ চৈতন্য হয়।

ভাই, কি করিবে! সারা জগৎটাই এইরূপ। তুমি তো বুদ্ধিমান, পণ্ডিতের দেশে বাস কর এবং অনেক পণ্ডিত মহাশয়গণের সহিত সঙ্গ করিয়া থাক। এখানে আমায় যে কত হীনবুদ্ধির সহিত থাকিতে হয় তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ। কি করিব, সকলই সহ্য করিয়া যাই। 'সকলই তোমার ইচ্ছা মা' বলিয়া যাহাতে হ-র মন নির্মল হয় তজ্জন্য আমি শ্রীগুরুমহারাজের নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করি! তুমি তাহার দুর্ব্যবহারে অশান্ত না হইয়া স্বীয় কর্তব্যপালনে পশ্চাদপদ হইও না। ওখানকার society যাহাতে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইও। যেন অসংখ্য নরনারী ওখানে আসিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে। তুমি আরও দু-তিন বৎসর class এবং public lecture না দিলে কোন কার্য হইবে না, ব- নেহাত দুগ্ধ পোষ্য বালক। তাহার উপর সমস্ত class এর ভার দিলে এবং public lecture চড়াইলে, তাহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং তোমার lecture এ যেরূপ ফল হয় সেরূপ ফলও হইবে না। দেখিও যেন সে স্ত্রী-বুদ্ধির দ্বারা সর্বতোভাবে পরিচালিত না হয়। স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! হ-কে পিটাসবার্গে পাঠাইয়া দিয়াছ তো? কতকগুলো দুষ্টলোক আছে, তাহারা নির্মল মনেও নিজেদের দুষ্টভাব সংক্রমিত করে। যাহাতে ব-এরূপ লোকের হাত থেকে রক্ষা পায় তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইও।

তুমি বুদ্ধিমান। তোমায় অধিক লেখা বাহুল্য। তুমি আমার ৺বিজয়ার কোলাকুলি এবং অসংখ্য প্রণাম জানিও। মায়াময় জগতে তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানের সর্বাঙ্গ সুন্দর পরিসমাপ্তি কোন বিষয়ের সম্বন্ধেই আশা করা উচিত নয়—'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।' তবে যতটা পারা যায় ততটা ভালো করিতে চেষ্টা করা উচিত। যখন প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়েই তোমার আমার হাত নেই, যখন এক মহাশক্তির দ্বারা সকলই পরিচালিত, তখন সেই মহামায়া মহাশক্তিরই নিকট সর্ববিষয়ের সংশোধনের জন্য প্রাণের সহিত প্রার্থনা করাই পরম মঙ্গলের কারণ।

এবার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরানী শ্রীযুক্ত গিরিশবাবুর বাটিতে ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে কলকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বোধহয় অদ্য শ্রীশ্রীজয়রামবাটী গমন করিয়াছেন। তাঁহার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। নরেনের ছোট ভাই ভূপেন জেলে গিয়াছে, মহীন নয়। সু— দু-তিন দিন হলো মাদ্রাজ আসিয়াছে। লেকচারখোর মাদ্রাজিগণ তাহাকে বহু সমাদরের সহিত পূজা করিতেছে। গোটা আষ্টেক ওদিশি বুড়িমাগী সঙ্গে করিয়া সর্বত্র এক অদ্ভুত বাহার দিয়া বেড়াইতেছে। শীঘ্রই একটি নূতন সম্প্রদায় পাকাইবার চেষ্টায় আছে। বেদান্তবাদের প্রতি হাড়ে চটা। ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ গৃহস্থগণ তাহার উপাসনাত্মক ধর্মকে যে বহুমান করিবে ও নীরস সত্যসার বেদান্তকে ভীতির চক্ষে দেখিবে ইহা স্বাভাবিক। এ মায়ার রাজ্যে মেকিরই আদর বেশি।

নূতন মঠে এক সপ্তাহের মধ্যে যাইব। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের ঘর নির্মাণে প্রায় ১৫০০ (দেড় হাজার) টাকা লাগিতে পারে। সহজে যাহা পাঠাইতে পার তাহা পাঠাইও। ইতি

তোমার দাস
শশী

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্রে উপদেশাবলী

দ্বিতীয় পর্ব

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের পত্রাবলী মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ সংগ্রহ করে একটি ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিল ১৯২৭ সালে। পুস্তিকাটির নাম 'CONSOLATIONS'। পুস্তিকাটিতে শুধুমাত্র নির্বাচিত অংশ আছে—কাকে কোন্ সালে তিনি লিখেছিলেন সে-সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নাই। এই পুস্তিকাটির পুরো বাংলা অনুবাদ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। নাম ছিল "স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্রসংকলন"। অনুবাদকের নামও নেই। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ৮৪তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৮৯, পৃঃ ২৪৪-২৪৬); ৭ম [শ্রাবণ, ১৩৮৯, পৃঃ ২৯২-২৯৩, ১১১ (অগ্রহায়ণ ১৩৮৯, পৃঃ ৫৫৩-৫৫৫)] এবং ১২শ [পৌষ ১৩৮৯, পৃঃ ৬১০-৬১৩] সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'পত্র সংকলন'। 'CONSOLATIONS' পুস্তিকার ভূমিকা লিখেছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের গুরুভ্রাতা ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ। এই ভূমিকাটির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো।]

শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ছিলেন প্রেম ও পবিত্রতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। দেহ ও মনের ওরকম পবিত্রতা আজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি ও প্রেম ছিল অনন্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শশী মহারাজের ভক্তি-ভালোবাসা বোধ হয় একমাত্র শ্রীমহাবীরের শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসার সঙ্গে তুলনীয়। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ অন্যান্য গুরুভাইদের প্রতিও তাঁর ছিল অতুলনীয় স্নেহ-ভালোবাসা। তিনি গুরুভাইদেরকে শ্রীরামকৃষ্ণের এক একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গজ্ঞানে পূজা করতেন।

তাঁর কাছে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু কোন ভেদাভেদ ছিল না। সকলের কল্যাণের প্রতি তাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি। তিনি সকলকে সাদরে গ্রহণ করতেন এবং সকলকে সর্বরকম সাহায্য করতেন। সকলের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন—এইবোধে পূজা এবং মানুষকে তাঁর অন্তর্নিহিত দেবত্বের উপলব্ধিতে সহায়তা করাই ছিল শশী মহারাজের একমাত্র পালনীয় কর্তব্য এবং এই কর্তব্যের যজ্ঞবেদিতে তিনি

নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। অপরের কাছে যে আচরণের কথা বলতেন, তা তিনি নিজের জীবনে অনুশীলন এবং অপরেও করুক—এই প্রত্যাশা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যই তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করেছেন এবং তাঁর কাছেই তিনি ফিরে গেছেন। এজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাস নাম দিয়েছিলেন "রামকৃষ্ণানন্দ"।

এই পুস্তিকায় মুদ্রিত শশী মহারাজের চিঠিগুলি খুবই আকর্ষণীয় এবং মানুষের মনে শান্তি দেবে। শশী মহারাজ ছিলেন একনিষ্ঠ গুরুগতপ্রাণ। এছাড়া তিনি অন্য কিছু আর জানতেন না। তাঁর সমগ্র হৃদয়মন শ্রীরামকৃষ্ণে ভরপুর থাকত। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা তাঁর মনে স্থান পেত না। যারাই তাঁর চিঠিগুলি আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে পড়বে, তারাই তাঁর প্রভাবের কথা অনুভব করবেই। তাঁর জীবন, প্রভাব ও কর্মসাধনার ভিত্তির উপরেই দক্ষিণভারতে আজ নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সৌধ নির্মিত হয়েছে ও হচ্ছে। দিনে দিনে সকলেই তাঁকে আরো বেশি প্রশংসা করবে। এই পুস্তিকাটির প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ রইল। যারা এই পুস্তিকা পড়বে, তাদের মনে প্রশান্তি আনয়ন করুক—এই প্রার্থনা।

শিবানন্দ

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বেনারস
১১ ডিসেম্বর ১৯২৭

* * *

তুমি জানতে চেয়েছ—এই ভব-বন্ধন থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়? এর উত্তরে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জন্ম-জন্মান্তরের প্রারব্ধের ফল একদিনেই কাটানো যায় না। তুমি অবশ্য ঠিকই বলেছ যে, আমাদের কর্তব্য এই মুহূর্তেই সংসার-পাশ থেকে মুক্ত হওয়া। কারণ কে জানে কখন মৃত্যু এসে প্রিয়জনের স্নেহ-ভালোবাসার আলিঙ্গন থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই জন্মেই আমাদের হঠাৎ একটা সংকল্প করে বসতে হবে। সাফল্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে—শ্রীভগবান দয়া করে আমাদের যে অবস্থায় রেখেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। সেই সঙ্গে তোমার মনকে সর্বদা তাঁতেই নিমগ্ন রাখতে হবে—যেমন শিশু তার মা-বাপের মুখের দিকে সর্বদা তাকিয়ে থাকে সাহায্যের জন্য।

প্রভু দয়া করে তোমাকে যে অবস্থায় যেখানে রেখেছেন, সেখানে শান্তিতে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী পাঠ করে সেগুলির অনুধ্যান কর। তাঁর কথায়, "চারাগাছকে সযত্নে বেড়া দিয়ে ঘিরে রক্ষা করতে হয়, যাতে ছাগলে মুড়িয়ে না দেয়। কিন্তু চারাগাছটা বড় হয়ে গেলে শত শত ছাগল তার ছড়িয়ে পড়া ডালপালার তলায় আশ্রয় নিতে পারে।" তাই সৌভাগ্যক্রমে কারো মনে যদি বিশ্বাস ও ত্যাগের ভাব একটুও অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে, তাহলে বিষয়ীদের সংসর্গ এড়িয়ে তাকে বিশেষ যত্নে সংরক্ষণ ও পরিপুষ্ট করা একান্ত কর্তব্য। তারপর অন্তরে সেটির মূল যখন দৃঢ়বদ্ধ হবে, তখন তাকে নড়াবার সাধ্য আর কারো হবে না।

*　　　*　　　*

ভালো ভালো বই পড়। যেমন ধর—"Imitation of Christ" (ঈশানুসরণ)। এই বইটি পড়ে তুমি খুবই শান্তি পাবে। লেখক টমাস এ কেম্পিস একজন যথার্থ ভগবদ্ভক্ত ও খ্রিস্টানুরাগী। এই মহামূল্য পুস্তকটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে—সান্ত্বনা ও সত্যিকারের ভক্তির কথা—হৃদয়ে সেগুলি আঁকড়ে ধরে থেকো।

*　　　*　　　*

মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে—যতদিন আহার ও আশ্রয় পায়, পশু ততদিন সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু সত্যিকারের মানুষ সর্বদা উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থায় উত্তরণের চেষ্টা করে চলে। উচ্চতর আদর্শের প্রতি নিরন্তর অনুরাগই প্রকৃত মানুষের বৈশিষ্ট্য। সৎ ও মহৎ জীবন-যাপনে অভিলাষী মানুষ মাত্রেরই প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই বাণী অনুসরণ করে চলা।

*　　　*　　　*

তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমরা সকলেই খুব চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের পথই ভিন্ন। প্রত্যেককে তার নিজের পথ নিজেই তৈরি করে নিতে হবে এবং ভগবান আমাদের যে সব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, সেগুলির সদ্ব্যবহার করেই আমাদের এই পথে অগ্রসর হতে হবে।

*　　　*　　　*

আমাদের সকলেরই উচিত শৃঙ্খল ভেঙে ফেলা, কিন্তু কখনো কি একেবারে এক আঘাতেই শৃঙ্খল চূর্ণ হয়ে যেতে দেখেছ? শৃঙ্খল যদি ভাঙতে চাও, তাহলে ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত হানার ধৈর্য তোমাকে ধারণ করতেই হবে। হঠাৎ করে বসলে কোন কিছুই মঙ্গল হয় না। মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হলে কোন বন্ধনই আর তোমাকে সংসারবৃক্ষে আবদ্ধ রাখতে পারবে না—তুমি তখন পাকা ফলের মতো আপনি বৃক্ষচ্যুত হয়ে শ্রীহরির কোলে আশ্রয় নেবে।

* * *

তুমি বল যে সংসার বড়ই প্রলোভনের জায়গা—সেকথা সত্য! কিন্তু এটা কি তুমি জানো যে, প্রবল ঝড়ের আঘাতে দুর্বল গাছের মূল আরও দৃঢ় হয়? তোমার মধ্যে যেসব নীতিবোধ এখনও তেমন পাকা হয়নি, প্রলোভনের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামের ফলে সেগুলি নিশ্চয়ই তোমার মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যাবে। নিয়ত অনুশীলন ও শ্রমের দ্বারা দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যও এই নিয়মের ঊর্ধ্বে নয়। অবশ্য মাটি এত পিছল যে পদস্খলন ব্যতীত কারো পক্ষে তার উপর দিয়ে হেঁটে চলা সম্ভব নয়, কিন্তু এগিয়ে চলার পথে পতনের প্রতি বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করে, যে নির্ভীকভাবে অগ্রসর হতে পারে, সে নিশ্চয়ই এই কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হবে। তোমাকে সর্বদা সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে সাহসের সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়াবে, কিন্তু কখনই দমে যাবে না—এইভাবেই তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিতভাবে জানছ যে এমন একজায়গায় এসে পৌঁছেছ, যেখানে আর পাঁক নেই—যেখানে তোমার একমাত্র বাঞ্ছিত বস্তু, দীর্ঘকালের সাধনার ধন—সেই সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করেছ। মাঝে মাঝে যদি পিছলে পড়ে যাও, ভেবো না, মানুষ মাত্রেই ভুল করে। ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ো না। দৃঢ়পদে এগিয়ে চল। কোন মানুষই সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সংসারের পিছল পথ অতিক্রম করার আশা করতে পারে না। আর কর্দমাক্ত পথ পার হতে গিয়ে পড়ে যাওয়ার ভয়ে কাদার মধ্যে বসে পড়াটাও নিছক মূর্খতা। "চেষ্টা কর, চেষ্টা কর—বার বার চেষ্টা কর"—এই মহামূল্য উপদেশবাণী ভুলে যেও না। স্কটল্যান্ডের ব্রুসের কথা স্মরণ কর, যিনি ছ-বার পরাজিত হয়েও হাল ছাড়েন নি এবং অবশেষে সপ্তমবারে জয়লাভ করেন।

* * *

যা কিছু ঘটেছে তা সবই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই—এই কথা মনে

রেখে সব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থেকো। তাঁর কাছে সর্বদা প্রার্থনা জানাতে ভুলো না। যাতে তোমার প্রকৃত কল্যাণ হয়, সে সবই তিনি তোমাকে দিতে পারেন, তাঁর কৃপা হলে। সব সময়ে তাঁর শরণাগত হয়ে থেকো। শান্ত ও উদ্বেগহীন চিত্তে থাকতে চেষ্টা কর। অস্থিরচিত্ততা একটা রোগ বিশেষ। একথা জেনে রেখো যে, ধর্মের অর্থই হচ্ছে—দয়া এবং পরমেশ্বরের নিকট আত্মনিবেদনের আনন্দ।

"কাজ কর কাজ কর, সমুখে সময় বর্তমান;
অন্তরে তব জাগিছে হৃদয় মাথার উপরে ভগবান!"

* * *

সুখ ও দুঃখ মানুষের চির সঙ্গী। যখন একটি আসে তখন অপরটি চলে যায়, কিন্তু কোনটিই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কাজেই এদের প্রভাবে আমাদের বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়া কখনই উচিত নয়। ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরতা রেখে নিজের কর্তব্য পালন করে চল। ঈশ্বরের বিধান সর্বদা মাথা পেতে নিও এবং সব কিছুর ভালো দিকটা নিয়েই তার বিচার কর। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তা সবই আমাদের মঙ্গলের জন্যই; কারণ মঙ্গলময়ের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে। এরই মধ্যে আমাদেরই উচিত কর্তব্য-নিষ্ঠ হয়ে চলা। তোমার নিজের প্রতি এবং স্ত্রী-সন্তানাদি থাকলে তাদের প্রতি কর্তব্য-পরায়ণ হতে চেষ্টা কর। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের প্রতি যথাসাধ্য কর্তব্য পালন করে চল। দয়ালু, সৎ, সরল ও সত্যনিষ্ঠ হও। সর্বোপরি তোমার স্রষ্টা ভগবানের প্রতি তোমার যেন ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ থাকে। এইভাবে জীবন-যাপন করে চল—যতদিন না এটা তোমার স্বভাবে পরিণত হয়। কারণ এটা সত্য বলে জেনো যে, দেহ ও মনে পবিত্র ও শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কারো যোগের পুণ্যপীঠে প্রবেশাধিকার জন্মায় না। কারণ 'যোগ' বলতে মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে রাখা, প্রাণায়ামাদি ও বিভিন্ন অঙ্গবিন্যাসকেই বোঝায় না। যোগ হচ্ছে—সকল চিত্তবৃত্তি বা কামনা বাসনা থেকে মুক্তিলাভ। কেবলমাত্র পবিত্র ব্যক্তির পক্ষেই কুবাসনা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। সুতরাং তোমার মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য-পরায়ণ হতে সতত সচেষ্ট থেকে নিজেকে শুদ্ধসত্ত্ব করে তোলার জন্য যত্নবান হও। আগে আদর্শ গৃহী হও, কারণ তা হওয়ার পরেই তোমার পক্ষে প্রকৃত যোগী হওয়া সম্ভব হবে। তুমি জেনে খুশি হবে যে, আমাদের সঙ্ঘাধ্যক্ষকে[১] সঙ্গে করে

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

এখানে[২] নিয়ে আসার জন্য আমি পুরী যাচ্ছি। তাঁর মতো শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষ যা কিছু স্পর্শ করেন, তা শুধু পবিত্রই হয়ে ওঠে না—পাবনী শক্তি লাভ করে। তিনি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এখানে আসছেন না—আসছেন ধর্মার্থীদের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চার করতে। সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিয়ে বিশেষ কোন কাজ হয় না। শুধু অন্তঃসার শূন্য কথায় কি লাভ? ধর্ম-বিষয়ে কথা সবাই বলতে পারে, কিন্তু অন্যের হৃদয়ে ধর্মভাব সঞ্চার করতে পারে এমন লোক কোথায়? ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর আশীর্বাদ যন্ত্রণা ক্লিষ্ট হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করে, যিনি মানুষের মনে ধর্মভাব সঞ্চার করে তাদের জীবনকে ঈশ্বরাভিমুখী করে তুলতে পারেন। বর্তমান যুগের তথাকথিত তত্ত্বকথার চরম অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে তোমাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বাস্তবিক সংসারবদ্ধ ব্যক্তিদের রচিত বই পড়ে মানুষের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। কারণ এই সব লেখকদের মন সত্যের অনন্ত আকাশে উড্ডীন হতে সক্ষম নয়। এদের চিন্তাধারার পরিণতি অজ্ঞেয়বাদ, সন্দেহবাদ অথবা নিরীশ্বরবাদে। এদের নীতি জ্ঞানের ভিত্তি সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে এদের বইগুলি অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। অজ্ঞানতার ফলে এরা জন্ম-মৃত্যুর বেড়াজালে-ঘেরা এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মধ্যেই বদ্ধ হয়ে আছে।

...তুমি এতদিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পবিত্র কাজের জন্য যে উৎসাহ দেখিয়ে আসছ, তা এখন আরো সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাবে এইটি জেনে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের মূর্তিমান বিগ্রহ, পরম পবিত্র পুণ্যাত্মা দাক্ষিণাত্যে শীঘ্র আসছেন।

* * *

কখনও অলসভাবে সময় কাটাইও না, কারণ অলসতাই সকল কুচিন্তার মূলে। সর্বদা সতর্ক হয়ে কর্তব্য পালন কর। মন থেকে সব জড়তা ঝেড়ে ফেল। অলসতার চেয়ে বড় পাপ আর নেই। পূর্ণতা লাভের কোন কুসুমাস্তীর্ণ পথ নেই। ভাবাবেগে কোন লাভ হয় না। কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং ভগবান তোমাকে যে অবস্থাতেই রাখুন না কেন, তাতেই সব সময়ে সন্তুষ্ট থাকবে। যদি ভগবানের জন্য সামান্য একটু সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ না করতে পারো তাহলে তাঁর প্রতি তোমার প্রকৃত ভালোবাসা নেই বলতে হবে। যে ব্যাপারগুলো এখন তোমার কাছে অপ্রিয় বলে বোধ হচ্ছে, সেগুলোই পরে তোমার পরম

২ মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মঠে

বন্ধু বলে মনে হবে। ভগবান যে কোন মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। তোমার কি প্রয়োজন আর কোথায় তোমাকে রাখতে হবে, তা তিনি ভালোই জানেন। যদি তাঁর বিধানে তুমি ক্ষুব্ধ হও, তবে তো তাঁর অনন্ত প্রেম ও করুণায় তুমি অসন্তোষ প্রকাশ করলে। আজ্ঞানুবর্তিতা দৈবী সম্পদ, অবাধ্যতাই আসুরিক।

* * *

শুধু নির্বুদ্ধিতার জন্যই আমরা অকারণ দুশ্চিন্তায় আমাদের মন ভারাক্রান্ত করে তুলি। কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়। নেতা এমন হবে যে, যার মধ্যে আমিত্বের লেশমাত্র নেই। নাহং নাহং—তুঁহু তুঁহু—এই হবে তাঁর নীতি। এই ভাবটি মনে রেখে কাজ করে যাও—জয়ী তুমি হবেই। সকলের সঙ্গে মধুরভাবে কথা বলো। হঠাৎ সব কিছুর সমাধান করে ফেলার চেষ্টা করো না। তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) আবির্ভাবে আধ্যাত্মিকতার যে প্রবল স্রোত সারা জগতে এমন অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হয়েছে, তাকে বাধা দিতে পারে, এমন শক্তি স্বর্গে বা মর্ত্যে কারো নেই। তুমি প্রভুর মনোনীত সন্তান—এইটি জেনে আনন্দিত হও। বেদান্ত সমিতির সকল সদস্যকে জানাইও, কেবলমাত্র তাদের নিজেদের চৈতন্যলাভই যে অবশ্যম্ভাবী তা নয়, তাদের স্পর্শে যারাই আসবে, তাদেরও চৈতন্যের জাগরণ হবে।

* * *

নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখো। আত্মোন্নতির প্রযত্ন যাদের আছে, তারাই দৈবী সহায়তা লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে অপরের কাজেও সহযোগিতা কর। বাইরে থেকে যদি সাহায্য আসে—ভালো, না আসে—সেও ভালো। জেনো যে শ্রীগুরু মহারাজের কাজের জন্য তুমি আহূত এবং যে কেউ এই কাজে তোমার সঙ্গে যোগ দেবে, সে যেন নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যবান মনে করে। কারণ, ভগবানের জন্য কাজ করার সৌভাগ্য সব লোকের সব সময় হয় না।

তাঁর কাজ কারো দ্বারা কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে—এ দুশ্চিন্তা করো না। যদি কেউ উপরের দিকে থুতু নিক্ষেপ করে, সে থুতু তাকেই ময়লা করে। শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা সম্পর্কে নিশ্চিত থেকো। তাঁর সদা পবিত্র কার্যে কোথাও এতটুকু ভুল হতে পারে না। আমার শ্রীগুরুমহারাজের জন্য যদি কখনও কখনও তোমার কাছে কিছু চাই, জেনো তা তোমারই কল্যাণের জন্য। ভগবান তোমাকে পবিত্র স্বভাবের অধিকারী করেই গড়েছেন এবং তুমি চেষ্টা করলেও

অপবিত্র হতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাজে তোমার ঐকান্তিক ও প্রাণঢালা পরিশ্রমের জন্য, তুমি সতত আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁর আশীর্বাদ তুমি তো লাভ করেছ। নিশ্চিত জেনো যে, ঐকান্তিক ও সৎ লোকমাত্রেই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাগ্যবান, আর যখন তুমি তাদেরই একজন, তখন তাঁর কৃপা তো তুমি পেয়েই গেছো।

* * *

কোন কাজ সফল হোক—এটা যদি ভাগবত ইচ্ছা হয়, তাহলে সে কাজের অগ্রগতি কোন কিছুরই দ্বারা ব্যাহত হতে পারে না। যাকে দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয় নি, সে ঠিক 'মানুষ' হয়েছে—একথা বলা যায় না। আপদ বিপদ থেকে আমরা অনেক কিছু শিক্ষালাভ করি। প্রভুর শ্রীচরণে যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারবে, তখনই শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় জীবনের প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করবে। জীবন একটা নিরন্তর সংগ্রাম। ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে তোমাকে কঠিন সংগ্রাম করতেই হবে—ফল যা কিছু সব ভগবানের হাতে। সংগ্রামই তোমার কাজ—হারজিত সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপরে নির্ভর করে।

কেবলমাত্র সন্তোষ মন্ত্রটিই প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে আমাদের নিশ্চিতভাবে নিরাপদে নিয়ে যায়। ভগবান মঙ্গলময়—তিনি সব কিছু করেন। কাজেই তিনি ভালো ছাড়া মন্দ করতে পারেন না। সব ধর্ম এই শিক্ষাই দেয়। এই শিক্ষা মেনে চল—মনের শান্তি আপনিই আসবে। আমরা কারো মনে বৈরাগ্য জোর করে ঢুকিয়ে দিতে পারি না। সকলের উদ্দেশ্য সন্ন্যাসী অথবা সন্ন্যাসিনী হওয়া নয়। প্রত্যেকের জীবনে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রভু তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করে যাও। যারা শান্তি দিতে পারে, তারা ধন্য, কারণ তারাই তো ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।

* * *

বিপদে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ো না। পাণ্ডবজননী কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন তাকে দুঃখ দিয়েই ঘিরে রাখেন, কেন না দুঃখেই তো তাঁকে বেশি স্মরণ হয়।... যৌবনে ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই প্রবল হয়ে ওঠে। তার জন্য তোমাকে অবশ্যই শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে—সেগুলি যাতে তোমার উপর আধিপত্য করতে না পারে। কামাসক্তি যুবকদের প্রধান

শত্রু। সব নারীকেই জগন্মাতার বিভিন্ন রূপ বলে মনে করবে। নিজেকে কায়িক ও মানসিক কর্মে নিবিষ্ট রেখো। এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তোমার মন সর্বদা স্থির রেখো। মনকে নিরন্তর ভগবানে নিমগ্ন রাখা যদি সম্ভব নাও হয়, তবু তাকে কোন একটা বিষয়ে নিবদ্ধ রাখা সব সময়েই বুদ্ধিমানের কাজ। মন এই ভাবে তৈরি হয়ে উঠলে তার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে স্থির হয়ে থাকাটা তেমন কঠিন হবে না। জানবে যে তুমি ঈশ্বরস্বরূপ এবং তাই ইন্দ্রিয়গুলিরও প্রভু। তুমি কেন ইন্দ্রিয়গুলিকে তোমার উপর প্রভুত্ব করতে দেবে? দুর্বললোক কুলোকের পাল্লায় যেমন পড়ে, তেমনি কুপ্রবৃত্তির ফাঁদেও পড়ে। মানসিক দুর্বলতা শারীরিক দুর্বলতার মতো একই রকম ক্ষতিকর।

*　　　*　　　*

গীতার কয়েকটি শ্লোক তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—যা অত্যন্ত বিষাদক্লিষ্ট মানুষের মনেও সান্ত্বনা এনে দেয়, তাকে সঞ্জীবিত করে তোলে, আর তার হতাশা দূর করে দেয়। অর্জুন যখন শ্রীভগবানের কাছে জানতে চাইলেন যে, কোন লোক সাধনমার্গে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, তাহলে তার ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয় কুলই নষ্ট হয় কিনা; তখন ভগবান তার উত্তরে বললেন, 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।' —হে প্রিয় সখা! যে সামান্যতম শুভানুষ্ঠান করে, পরের জীবনে তার কোন দুর্গতি হয় না। ধার্মিক সদাচারসম্পন্ন কারও গৃহে সে জন্মগ্রহণ করে এবং পবিত্র ভাগবত জীবন শুরু করে। সুতরাং মুহূর্তের জন্যও যদি তোমার মনে কোন সদ্ভাবের উদয় হয়, বা তুমি কোন সচ্চিন্তা কর, তাহলে সেটা অবশ্যই তোমার পক্ষে মহতী লাভ। কখনও হতাশায় ভেঙে পড়ো না। কারণ স্বয়ং ভগবানই প্রতিটি মানব সন্তানকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে— 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' হে অর্জুন! সর্বসমক্ষে প্রচার কর যে, আমার ভক্ত কখনও বিপন্ন বা বিনষ্ট হয় না।

*　　　*　　　*

সংসারে মানুষ স্বভাবত যে-সমস্ত প্রতিকূলতায় পড়ে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠে, তেমনি অবস্থায় আমরাও যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে হাজির হতাম, তখন তিনি এই বলে আমাদের সান্ত্বনা দিতেন, 'কামারশালার নাই হবি। সারাদিন তার উপর হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু সে ধীর, শান্ত, নির্বিকার। সংসারে যখন তখন তোদের উপর আঘাত আসতে পারে, কিন্তু কামারশালার নাই-এর

মতোই তোরা নির্বিকার থাকবি। তোদের ধর্মবিশ্বাসে তোরা থাকবি অটল এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দয়া ও করুণার উপর দৃঢ় প্রত্যয় রাখবি। তাহলে সংসারের দুঃখ বিপদ ঝড়-ঝঞ্ঝা তোদের আর বিচলিত করতে পারবে না। তোদের হয়রান করতে গিয়ে নিজেরাই হয়রান হবে।' গীতাকে তোমার নিত্যসঙ্গী করো এবং সর্বদা আনন্দে থেকো। তোমার আত্মা নিত্যমুক্ত ও আনন্দময়। দুঃখ অথবা হতাশাকে যেন কখনও তোমার আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করতে দিও না।

তোমার চেষ্টায় সফল হচ্ছ না, এজন্য অনুযোগের প্রয়োজন নেই। প্রায় সকলেরই এইরকম হয়, যাঁরা ইতোমধ্যেই পূর্ণতা লাভ করেছেন, এমন কয়েকজন মহাত্মাই শুধু নিশ্চয় করে বলতে পারেন, তাঁরা কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ শুদ্ধ। মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে। মাত্র একটি বিষয়ে আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে—কখনও তাঁকে—জগৎপ্রভুকে ভালোবাসতে যেন ভুল না হয়। তাই বলছি উৎসাহে বুক বাঁধো। যদি মাঝে মাঝে পড়েও যাও, আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কর। হাঁটতে শেখার আগে সব শিশুই শত-সহস্রবার পড়ে যায়। আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, যারা নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, ভগবান তাদেরই সাহায্য করেন।

এটা স্থির জেনে রেখো, একজন যত মন্দই হোক না কেন, সারা পৃথিবীর লোকও যদি তাকে পরিত্যাগ করে, তবুও ভগবানের ভালোবাসা একজন ধার্মিক ব্যক্তির উপর যতটা গভীর, ঠিক ততটা তার উপরও থাকে। সন্তান যদি একজন খুনি হয়েও ওঠে, মায়ের ভালোবাসা কিন্তু তার জন্য কিছুমাত্র কমে না। ভগবানের ভালোবাসা ও করুণা, সমষ্টি মাতৃহৃদয় অপেক্ষা অনেক বেশি। তাঁর স্নেহ করুণায় কখনও বিশ্বাস হারিও না। নিকৃষ্ট পাপীদের প্রতিও তিনি অনুক্ষণ কৃপাদৃষ্টি রাখছেন। এই কথা জেনে তুমি আনন্দে থেকো।

তুমি নিজের উপর অসন্তুষ্ট হয়ো না। তুমি তো ঈশ্বরেরই সৃষ্টি; তাই তোমার নিজের উপর অসন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের সন্তানের উপর অসন্তুষ্ট হওয়া। এটা কি খারাপ নয়? তাই নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। কারণ তুমি ঈশ্বরের সন্তান এবং তিনি তোমাকে সৃষ্টি করে কোন ভুল করেননি, যেহেতু তিনি সকল ভুল ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে দিয়ে এমন কোন কাজ করিয়ে নেবেন, যার জন্য তিনি তোমাকে এই সংসারে নিয়ে এসেছেন। ভগবানের প্রতি তোমার ভালোবাসা যত বৃদ্ধি পাবে ততই তোমার কামাসক্তি হ্রাস পাবে। সর্বদা ন্যায়পথে চলার চেষ্টা কর। সত্যনিষ্ঠ ও সদ্ভাবাপন্ন হও এবং

ভোগ-সুখের বাসনা মনের মধ্যে রেখো না। এই যেন তোমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়। কঠোর সংগ্রাম কর। এই সংগ্রাম চলাকালে যদি তোমার পদস্খলন হয় এবং তোমাকে বার বার পড়েও যেতে হয়, তাতেও বা কি এসে যায়? আবার উঠে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাও। নিশ্চিত জেনো, শেষে তোমার জয় হবেই। যে পর্যন্ত না তুমি পূর্ণতা লাভ করছ, অর্থাৎ নিজে যা হতে চাও তা না হচ্ছ, সে পর্যন্ত তুমি কখনও সংগ্রাম থামিও না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তোমাকে সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করুন এবং তোমাকে নিরাপদে ও সুস্থ রাখুন।

হ্যাঁ, তোমার কথাটি ঠিক। ভিক্ষুকের মতোই হোক কিংবা রাজার হালেই হোক—কোন না কোন ভাবে জীবন আমাদের কাটাতেই হবে। কিন্তু যে অবস্থাতেই থাকি না কেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা কখনও ভুলে থাকব না—এটাই হওয়া উচিত আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য। এটাও নিশ্চিত যে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন ভগবান কখনও আমাদের পরিত্যাগ করেন না। তিনিই আমাদের জীবনের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় নিয়ে যান। এটা জেনে আনন্দে থাক। আমি প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করি এবং তোমার জন্য আমার শ্রীগুরু মহারাজের কাছে প্রার্থনা জানাই। তোমার কাছে তো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো আছেই। তাঁকে তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার বলেই মনে করো। এই উপদেশটি তোমাকে আমি না দিয়ে পারি না। তাঁর ফটোর সামনে তুমি তোমার প্রার্থনা নিবেদন করো; তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবেই। তাঁর চেয়ে করুণাময় কেউ নেই। আহা! তাঁর মহিমা, তাঁর মহত্ত্বের কথা মনে পড়লেই আমি সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত হয়ে পড়ি। তিনি তোমার সঙ্গে নেই—তা মনে করো না। যারা ভালো তিনি সর্বদাই তাদের পাশে থাকেন। আর যেহেতু তুমিও খুব ভালো ছেলেদেরই একজন, তোমাকে নানা প্রলোভন থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি অনুক্ষণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। তাঁর আলোকচিত্র তাঁরই চৈতন্যময় সত্তা। এটিকে একটি ফটো মাত্র মনে করো না। তাঁর নিজের প্রাণময় সত্তা ওটি। যদি পাওয়া যায়, তাহলে ফুল ও ধূপ তাঁকে নিবেদন করো; আর তা না পাওয়া গেলে, অনুরাগ ও আর্তির ফুল ও ধূপের অর্ঘ্য তাঁকে দিও। পৃথিবীর রাশিকৃত পুষ্প ও ধূপের চেয়েও একটি বেদনার্ত হৃদয় তাঁর কাছে বেশি প্রিয়। আন্তরিক চাইলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবেন। তিনি যে প্রেম ও করুণার মূর্তরূপ।

* * *

আমার অনিয়মিত চিঠি-পত্র থেকে ধরে নিয়ো না যে, আমি তোমার বন্ধুদের ভালোবাসি না। ভালোবাসা বাইরের চেয়ে অন্তরেরই বস্তু। আমি সর্বদা প্রার্থনা করি যেন শ্রীগুরুমহারাজের আশীর্বাদ তোমার ও তোমাদের সকলের উপর বর্ষিত হয়।

* * *

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "জলের যেমন নির্দিষ্ট কোনও আকার নেই—যে পাত্রে তাকে রাখা যায় তারই আকার সে ধারণ করে"—তেমনি ভগবানেরও কোনও নির্দিষ্ট আকার নেই। কিন্তু ভগবান সকল জীবেরই ভগবান; সুতরাং তাঁকে কেবলমাত্র মানুষের আকারের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা উচিত নয়। তোমার বাবা বিদেশী পোশাকে থাকলেও তাঁর প্রতি তোমার শ্রদ্ধা-ভক্তি ঐ জন্যই চলে যায় না। সুতরাং ভগবানের আকার যাই হোক না কেন, যেহেতু তিনি তোমার ভগবান, তাই তাঁকে সদা সর্বদা তোমার ভালোবাসা উচিত। অবশ্য ইষ্টমূর্তিরূপে তাঁর কোনও রূপ বিশেষকে কেউ পছন্দ করতে পারেন। বৈষ্ণব কৃষ্ণরূপ ভালোবাসেন, শাক্ত শক্তিরূপ এইরকম সব। যেরূপটি তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে সেই রূপেই তুমি তাঁর আরাধনা করো। হিন্দু গৃহস্থ ঘরের বধূ যেমন পরিবারের সকলকেই সম্মান করে, কিন্তু শয্যাগ্রহণ করে একমাত্র তাঁর স্বামীর সঙ্গে, তেমনি যে সকল বিভিন্ন রূপে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেছেন তাঁদের সকলের প্রতিই তোমার ভক্তি থাকবে, কিন্তু একমাত্র ইষ্টই হবেন তোমার জীবন-সর্বস্ব।

* * *

এটা খুবই শুভ যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি গভীর। তাঁর আরাধনাতেই তুমি আর মায়ের ভক্ত থাকবে না—তা নয়। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিরই বিগ্রহ। শক্তি অনন্ত, তাই দুরধিগম্যা। সকলের কাছে যাতে তিনি সুগম হতে পারেন, সেইজন্যই তিনি বর্তমান কালে করুণাঘন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এই যুগের আদিতে যখন তিনি (শক্তি) শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তাঁর বার বার অবতার রূপে আবির্ভাবের কারণ-স্বরূপ স্বয়ং বলেছিলেন ঃ

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥"

* * *

তিনি মরদৃষ্টির অন্তরালে যাওয়ার পরেও শ্রীরামকৃষ্ণের অধিকাংশ সাক্ষাৎ শিষ্যই তাঁর দর্শন লাভ করেছেন। তাঁকে দর্শন করার জন্য তোমার যদি প্রকৃত ব্যাকুলতা থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই তোমারও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন। ঈশ্বরের রূপ কিছু কাল্পনিক নয়। সেগুলি সত্যি। নির্বিকল্প সমাধিতে সৃষ্টি নেই, স্রষ্টা নেই—পূজাও নেই। সে কথা এখন থাক—কারণ নুনের পুতুল সাগরে গিয়ে নিজেই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ ব্যক্তি বোধ থাকবে, ততক্ষণ ভগবানের সাকার (সগুণ) রূপও থাকবে। স্রষ্টা ঈশ্বর সকল সময়েই সাকার ও সগুণ, তাঁর প্রতিটি প্রকাশই তাঁর নিজের মতোই সত্য। ভগবানের পূজা করা কেবলমাত্র তাঁর সগুণরূপেই সম্ভব। এই পথ গ্রহণ করতেই তোমায় আমি বলছি। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যই তোমার জীবন ও কর্ম হোক। সমস্ত অন্তর ঢেলে দাও তাঁর উপাসনায় এবং এই জীবনেই মুক্ত হয়ে যাও। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করবে। পিতা ও পুত্রের অথবা জননী ও সন্তানের মাঝে কোনও ভেদ নেই। পাথরে তৈরি ঈশ্বরের প্রতিমা পুজো করে লোকে যদি মোক্ষ লাভ করতে পারে, তবে তাঁর জীবন্ত মূর্তির আরাধনা করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছান তো আরও অনেক বেশি সম্ভব। সাক্ষাৎ ভগবানকে তুমি সরাসরি পূজা করতে পার না, কারণ এইরকম দেবমানবদের মাধ্যম ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণাই তুমি করতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো দেবমানবেরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করলে, ভগবানের সম্পর্কে কে আর কতটুকু জানতে পারত? তাঁরা যেন আধ্যাত্মিক জগতের কলস্বাস।

* * *

শিকড় ছাড়া গাছ হয় না; ভিতর বাদ দিয়ে বাহির হয় না। তোমার অন্তরে ও বাহিরে উভয় দেশেই তাঁর আরাধনা হওয়া উচিত, কারণ তিনি সর্বব্যাপী। তিনি প্রতিমায় যেমন, তেমনি আছেন তোমার অন্তরে। সুতরাং সর্বদা তাঁর সন্তান অথবা দাস ভাবে, নিজেকে স্বতন্ত্র রেখে, তাঁকেই সর্বত্র পূজা করো। দ্বৈতবাদী বলে "আমি ব্রহ্মের", অদ্বৈতবাদী বলে "আমি ব্রহ্মের সহিত একাত্ম"। এই দুই কথার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই; কারণ যিনি ব্রহ্মের তিনি তাঁর সঙ্গে একাত্মও তো বটে। অভেদ উপলব্ধি শুধু নির্বিকল্প সমাধিতেই হয়ে থাকে এবং আগেই বলেছি যে তখন আর পূজা-অর্চা থাকে না। তাঁকে লাভ করার একমাত্র উপায় ঐকান্তিকী ভক্তি। এই-ই হচ্ছে উপদেশ—সাধারণ এবং বিশেষ উভয় অর্থেই। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তোমার ভক্তি হোক পরিপূর্ণরূপে

ঐকান্তিক। তুমি ঠিক বলেছ—কাঁচা আমিটি চূর্ণ হয়ে গেলে, তবে তিনি দেখা দেন। যে কাঁচা আমি নিজেকে দুর্বল ও পাপী মনে করে, নিজের ভিতরকার সেই পশুটিকে বিসর্জন দেওয়াই হচ্ছে নরবলি। এটি কেবলমাত্র প্রকৃত বীরের পক্ষেই করা সম্ভব; কারণ "জিতং জগৎ কেন মনো হি যেন"—জগৎ জয় করতে পারে কে? না, যে নিজের মনকে জয় করেছে!

* * *

যে ধর্ম দুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা নিতান্তই মিথ্যা এবং ক্ষতিকারক। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—শ্রুতি বলেছেন যে, দুর্বলের পক্ষে ভগবান লাভ কখনোই সম্ভব নয়। আমি যদি ঈশ্বরের সন্তান হই, তাহলে আমি তাঁরই ছাঁচে তৈরি এবং তিনি যদি পূর্ণ শুদ্ধ, আমিও অবশ্যই পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধ। তাই, তুমি যদি সত্যিই ভগবানকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে তোমাকে ভগবানই হতে হবে। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"। ভগবানের পূজা করতে হলে, তোমাকে ভগবান হতে হবে। নিজেকে পাপী মনে করার কি দরকার? তুমি অনন্ত; শুধু অজ্ঞান বশেই তুমি নিজেকে সান্ত ভাবছ। প্রত্যেকের আদিতে রয়েছে অসীমতা। তোমার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে অনন্ত শক্তি। সুতরাং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিও না। যে পথই তুমি গ্রহণ কর না কেন, সফল তুমি নিশ্চয়ই হবে। ভক্তির পথই প্রকৃষ্ট, কারণ এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। তোমার মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন তাঁর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও। তুমিই ভগবানের সবচেয়ে সত্যিকারের মন্দির। বাইরের মন্দিরগুলি শুধু অন্তরের সত্য মন্দিরকেই স্মরণ করায় মাত্র। দুর্বলতা-জনক ভাবগুলিকে যখন তুমি মন থেকে দূর করতেই চাইছ, তখন চিন্তাগুলোর উপর নজর রাখাটা কিছু অন্যায় নয়। নেই নেই করতে করতে দেখবে সাপে কামড়ালেও তোমার মধ্যে বিষ থাকবে না। "আমি পাপী নই। আমি স্বয়ং ঈশ্বরের সন্তান।" —যার এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, সে ক্রমে বুঝতে পারে যে সে ঈশ্বরের সন্তান।

* * *

একটা বদ অভ্যাসকে তাড়াতে হলে তোমাকে আর একটা প্রতিযোগী সদভ্যাসকে অনুশীলন করতেই হবে। এর জন্য তোমার প্রবল রজোগুণের অথবা ক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

"আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া অতিক্রম করা সত্যি দুরূহ। যারা শুধু আমার শরণাপন্ন, কেবলমাত্র তারাই পারে এই মায়াকে অতিক্রম করতে।" মায়া ঈশ্বরের শক্তি; ঈশ্বর ও তাঁর শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মিষ্টত্ব ছাড়া চিনির, ধবলত্ব ব্যতীত দুধের যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি ঈশ্বরের শক্তিকে বাদ দিয়ে তাঁকেও ধারণা করা যায় না। শক্তিহীন লোকের কাছে আমরা কোন প্রার্থনা জানাই না, কারণ আমরা জানি যে, সে প্রার্থনা নিষ্ফল হবে। ভগবান সর্বশক্তিমান এবং তাই আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করি। যে কেউ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, সে শক্তিরই উপাসনা করে। সংসারের প্রত্যেকেই এক একজন শাক্ত, কারণ এমন কে আছে যে শক্তির পূজা করে না?

* * *

ভগবান মেঘের ওপারে কোথাও কোন ঊর্ধ্বলোকে বাস করেন না। তিনি আছেন সকল জীবের হৃদয়ে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি"—"হে অর্জুন! ভগবান সকল জীবের হৃদয়ে বাস করেন।" সাধারণ জীব একথাটা জানে না। ভগবান আমাদের সামনে আসেন মূর্খ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, নিঃস্ব, ক্ষুধার্তের রূপ ধরে—যাতে আমরা তাঁকে এই সব রূপে সেবা করে নিজেদের চিত্ত শুদ্ধি করতে পারি। কর্মেই আমাদের অধিকার—তার ফলে নয়। ফল আমাদের হাতে নয়। অন্যদের উপকার করব—এই ভেবে কাজ করার চেয়ে নিজেদের কল্যাণের জন্যই বেশি করে কাজ করা উচিত, কারণ ভগবান তাদেরও প্রভু এবং ভগবানই তাঁদের বর্তমান অবস্থায় রেখেছেন। ভগবানকে তো আমরা সংশোধন করতে পারি না বা তাঁর কর্মপ্রণালীর খুঁতও ধরতে পারি না। সেটা ডাহা বোকামি হবে। অন্যের সেবা করে আমরা নিজেদেরই সেবা করি—কিভাবে? না নিজেদের হৃদয়ের বিস্তার করে।

* * *

তার সব আবদার মিটবেই—এই পূর্ণ বিশ্বাসেই না শিশু তার যা কিছু প্রয়োজন তা বাবা-মাকে জানায়? ঠিক এমনি ভাবেই আত্মোপলব্ধির জন্য যা কিছু আবশ্যক তার জন্য তোমার ইষ্টের কাছে প্রার্থনা জানানো উচিত। ঈশ্বরের সন্তান তুমি হতে চাও কেন? জগজ্জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য—তাই না? অতএব ভক্তি আর জ্ঞানের মধ্যে তফাতটা কোথায়?

* * *

এই কথাটা তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, শান্তি হচ্ছে নিজের মানসিক সম্পদ। সুতরাং সাংসারিক বা সামাজিক কোনও বিষয়কে তোমার চিত্তের পবিত্র ত্রিসীমানার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। সেখানে একমাত্র পরমশিবই একচ্ছত্রভাবে আধিপত্য করুন আর তোমার উপর শান্তি ও আনন্দ বর্ষণ করুন।

* * *

পূর্ণ আত্মসমর্পণ অবশ্য তখনই সম্ভব যখন মানুষ তার দুর্জয় শত্রু অহঙ্কার থেকে মুক্তি পায়। "আমি এই, আমি সেই"—এই মনোভাবই বারংবার জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। তোমার আত্মসত্তার আবরণকারী এই 'অহং' থেকে যতই মুক্ত হবে, ততই তুমি সক্ষম হবে আপন স্বরূপের উপলব্ধিতে। ব্যাকরণের এই উত্তম পুরুষ-সর্বনামটিই আমাদের যত দুঃখের মূল। সুতরাং আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত, যেন তেন প্রকারেণ এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। সেটা পারা যায় মহৎজনের সেবার জোরে, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন সৎ কর্ম দ্বারা এবং একনিষ্ঠ বিবেকের ফলে। প্রথমটিই সবচেয়ে সহজ ও সর্বোত্তম। যদি সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করতে পার, তাহলে তোমার ঐ দাস্যভাবের জন্যই তোমার অহংভাব ক্রমশ লোপ পাবে। যদি কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত পথানুসরণে ঠিক ঠিক নিজেকে নিয়োজিত করে, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করবেন। কিন্তু সেরকম লোক সংখ্যায় এত কম যে, তা প্রায় কেউই করতে পারে না বললেই চলে। কারণ প্রত্যেক লোকই কম-বেশি অহং-অভিমানী। যদি অপরের পাপ গ্রহণকে আত্মাহুতি বলো—এবং আমার মনে হয় সেটাই এর ঠিক অর্থ—তাহলে তার জন্য যোগ্য অধিকারী সংসারে নেই বললেই চলে। যখন সংসারে আমি রয়েছি এবং যখন আমি এখানে সুখী হতেই চাই, তখন আমাকে এমন কিছু করতে হবে যা আমাকে সর্ব-ভয়-মুক্ত সুখ দিতে পারে। ভগবান সর্বশক্তিমান এবং অনন্ত করুণাময়। আমি তাঁরই সন্তান এবং তিনিই আমাকে দেখবেন। তাই আমার কোনও ভয় নেই। ভগবান তোমার পিতা ও মাতা দুই-ই

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ॥"

"হে আমার দেবাদিদেব, তুমি আমার জননী। তুমিই আমার পিতা; তুমি

আমার বন্ধু; তুমিই আমার সখা; তুমি আমার বিদ্যা; তুমিই আমার সম্পদ তুমি আমার সর্বস্ব।"

আর জানবে শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন এই সবগুলিই। "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

* * *

স্বামী পরমানন্দকে (বসন্তকে) লেখা পত্রসংগ্রহ

[ভালো চিঠি সর্বদা সাহিত্যের মর্যাদা পায়। এতে শুধুমাত্র লেখকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় না, যাঁকে লেখা হয় তাঁরও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়কার চিত্রও পাওয়া যায়। পত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় যখন একজন সাধক ভাবী সাধককে চিঠি লেখে। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের স্বামী পরমানন্দকে লেখা একগুচ্ছ চিঠি আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করছি। স্বামী পরমানন্দ বহু বছর আমেরিকা ও পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার করেছিলেন। স্বামী পরমানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সুরেশচন্দ্র। তিনি বেলুড় মঠে ১৯০০ সালে যোগদান করেন এবং স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন। পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ এই যুবকের প্রতি এতই স্নেহশীল ছিলেন যে তাঁকে যা বলা তাই করতেন। এজন্য তিনি যুবকের নাম রেখেছিলেন বসন্ত। মাদ্রাজ মঠে পূজ্যপাদ শশী মহারাজের কঠোর সপ্রেম শাসনে বসন্ত মহারাজের সাধু জীবনের ভিত রচিত হয়েছিল। ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত। ১৯০৬ সালের শেষের দিকে স্বামী পরমানন্দ স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে আমেরিকায় যান।

শশী মহারাজ প্রায়ই স্বামী পরমানন্দকে চিঠি লিখতেন। এই চিঠিগুলি আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স এর কোহাসেট বেদান্ত সেন্টারের সৌজন্যে পাওয়া গেছে। চিঠিগুলির অধিকাংশ বাংলাতে লেখা। আমরা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছি। মূল চিঠিগুলি উক্ত বেদান্ত সেন্টারে রক্ষিত ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা যে সেন্টারে আগুন লেগে অন্যান্য জিনিসপত্রসহ সব চিঠিগুলি আগুনে পুড়ে যায়। সেজন্য আবার আমরা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছি।[১]]

---

১ মাদ্রাজ মঠ থেকে প্রকাশিত 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। জুলাই ১৯৮৪, পৃঃ ২৬০-২৬২; সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃঃ ৩৩১-৩৩৩; আগস্ট ১৯৮৪, পৃঃ ২৯৭-২৯৯; অক্টোবর ১৯৮৪, পৃঃ ৩৭৪-৩৭৫; জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃঃ ২২; ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, পৃঃ ৫৯-৬০; এপ্রিল ১৯৮৫, পৃঃ ১৩৫-১৩৬; জুন ১৯৮৫, পৃঃ ২১৪; জুলাই ১৯৮৫, পৃঃ ২৫১-২৫২; আগস্ট ১৯৮৫, পৃঃ ২৯১-২৯৩

(১)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
২৪-০১-১৯০৭

শ্রীপরমানন্দ স্বামীজী
প্রিয় বসন্ত,

তোমার ২৫ ডিসেম্বরের চিঠি পেয়ে আমি যে কত সুখী হয়েছি, তা আমি তোমায় বলতে পারব না। এর চেয়ে আনন্দের কথা কি আছে যে তুমি তোমার গন্তব্য স্থলে নিরাপদে পৌঁছেছ! আমার ভালোবাসা ও প্রণাম কালী মহারাজকে জানাবে। আশা করি সে ভালো আছে। বোধানন্দকে আমার স্নেহ আশীর্বাদ জানাবে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির আশীর্বাদ পত্র তুমি পেয়েছ জেনে আমি চিন্তামুক্ত হলুম। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তুমি তাঁর আশীর্বাদে সর্বত্র পারদর্শী ও জয়ী হবে। আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জেনো। আমি মায়ের নিকট তোমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

তোমার অনুরোধ মতো 'Lectures from Colombo to Almora' বইটি পাঠিয়েছি। হার্ডবাউন্ড কপি পাওয়া গেল না, পেপার ব্যাক পাঠিয়েছি। আমি নিরঞ্জন মহারাজের ছবি খুঁজছি। বই এর সঙ্গে খুব সম্ভবত পাঠাতে পারব না। পরের বার আমি পাঠাব। 'গস্‌পেল'[১] কবে প্রকাশিত হবে? যত শীঘ্র হয় ততই ভালো। মাদ্রাজ হতে ভারতীয় সংস্করণ বেরুবে।[২]

কয়েকদিন পূর্বে তোমাকে চিঠি লিখেছি। তুমি কি পাওনি? আমার চিঠি লেখার ততটা অভ্যাস নেই। আমি যদি উত্তর না দিই বা দেরিতে উত্তর দিলে, তাহলে কিছু মনে করো না। যখনই তোমার সুবিধা হবে, তখনই আমাকে চিঠি লিখো।

মাত্র তিন-চারদিন পূর্বে আমি মঠে ফিরেছি। কিছুদিনের জন্য আমি বাবুরাম

---

১ The Gospel of Sri Ramakrishna প্রকাশিত হয় নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি থেকে ১৯০৭ সালে। শ্রীম লিখেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সম্পাদনা ও পুনর্বিন্যাস করেন।

২ শ্রীম কর্তৃক অনূদিত গস্‌পেল মাদ্রাজের ব্রহ্মবাদিন অফিস থেকে একই বছরে প্রকাশিত হয়। ১৯১১ সনে শ্রীম আবার পুনঃসম্পাদনা করেন ও মাদ্রাজ মঠ থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ সালে স্বামী নিখিলানন্দ 'গস্‌পেল' এর পুরো ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সেন্টার থেকে প্রকাশিত হয়।

মহারাজ, তাঁর মা-বোনেদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের তীর্থে গিয়েছিলাম। এইমাত্র পুরী থেকে বাবুরাম মহারাজের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম। তারা সকলেই নিরাপদে পৌঁছেছে। কালী মহারাজের সঙ্গে যা দেখেছিলাম, আবার সেই দেখলাম। এই তীর্থযাত্রায় আমি কন্যাকুমারী, তিরুপতি, তিরুকামা সুন্দরম্, চিদাম্বরম্, কাঞ্চিভরম্ প্রভৃতি স্থান দর্শন করেছি। এইসব জায়গায়ও আমি বক্তৃতা দিয়েছি।

এবছর স্বামীজীর জন্মতিথি পূজা ও উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়েছিল। আমরা এখনও একই কুটিরে[৩] আছি। আশা করছি কোন্ডিয়া চেট্টিয়ার প্রদত্ত জমিতে মঠ বাড়ি শীঘ্রই হবে। এখানে আমরা শ্রীগুরুমহারাজের জন্মতিথি পূজা পালন করতে পারব। তিথিপূজা ১৪ ফেব্রুয়ারি পড়বে। আর সাধারণ উৎসব ১৭ ফেব্রুয়ারি। আর বেশি দিন নেই। আমরা উৎসবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

কিছুদিন পূর্বে রামু[৪] সমুদ্রে প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। শ্রীগুরু মহারাজের কৃপায় বেঁচে গেছে। গত অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণের দিন অন্যান্যদের সঙ্গে তার এক বন্ধু সমুদ্রে স্নান করছিল। হঠাৎ সেই বন্ধুটি জলের ঘূর্ণি আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। সে সাঁতার জানত না। রামুর যেই চোখ পড়ল, সে তক্ষুনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে তার কাছে গেল উদ্ধার করতে। সে তাকে টেনে সমুদ্রতীরে নিয়ে আসছিল। কিন্তু বিশাল ঢেউ তাদেরকে আছড়ে দিল। সেই বন্ধুর আর দেখা পাওয়া গেল না। বেচারা ডুবে মারা গেল। এক সপ্তাহ লাগল তার গায়ের ব্যথা সারতে, সে অসুস্থ হয়ে গেল। তবে এখন ভালো আছে।

বইগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করো। এই সপ্তাহে নিরঞ্জনের ফটো পাঠাতে সমর্থ হব না। পরের সপ্তাহে পাঠাব। মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লিখো। এখানে সকলে ভালো আছে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

---

৩ 'আইস হাউসে' মঠ ছিল।

৪ শ্রী সি. রামস্বামী আয়েঙ্গার (১৮৭২-১৯৩২) 'রামু' নামে সুপরিচিত। প্রথম থেকেই মাদ্রাজ শহরে রামকৃষ্ণ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোমের অন্যতম পথিকৃৎ ।

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন[১], মাদ্রাজ
মার্চ ১৬, ১৯০৭

প্রিয় বসন্ত,

তোমার চিঠিতে কাজের বিবরণ পড়ে আমি কিরকম খুশি হয়েছি তা আমি বলতে পারব না। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ এবং শ্রীশ্রীস্বামীজীর কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হও এবং সমগ্র জগতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করে ধন্য হও—তাঁর শ্রীচরণে এই আমার সতত প্রার্থনা। তোমার শরীর কেমন? তুমি আমাকে লিখেছ যে বর্তমানে তোমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। আশাকরি তুমি বর্তমানে সবল ও সুস্থ। তোমার সুস্থতার সংবাদ পাওয়ার জন্য আমি খুবই উদ্বিগ্ন মনে অপেক্ষা করছি। এই চিঠি পাওয়া মাত্র তোমার সব সংবাদ জানিয়ে আমাকে চিন্তামুক্ত করবে। মাদ্রাজে তোমার সব বন্ধুরা তোমার কাজের দক্ষতা জেনে খুবই আনন্দিত। মনে হচ্ছে তোমাকে কেউ কেউ এ বিষয়ে চিঠি লিখবে। নারায়ণ আয়েঙ্গার তো আহ্লাদে আটখানা। কিছুদিন আগে সে আমায় চিঠি লিখেছে। এই চিঠিতে সে তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছে ঃ তোমার ও বুদ্ধের মধ্যে অনেক মিল; তুমিও বুদ্ধের মতো মানুষকে ভালোবাস এবং সাহায্য কর। তাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখে সুখী করিও।

তোমার কাজের বোঝা বেশি। এখনও তুমি বালক[২]। সপ্তাহে চারটি ক্লাস করা কম কথা নয়। শরীরের দিকে নজর দেবে। প্রত্যেক মানুষের দেহ ভগবানের স্থান। এই দেহ মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সদা বিরাজমান। এজন্য শরীরের অযত্ন করার অর্থ ভগবদ্‌গৃহের এবং ভগবানের প্রতি অবহেলা। সুতরাং তুমি তোমার শরীরের যত্ন অবশ্যই নেবে। তোমাকে সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীস্বামীজী রক্ষা করছেন। তোমার চিন্তার কারণ নেই। তুমি জন্মগত পবিত্র। তোমার সংস্পর্শে যারা আসবে, তারাও তৎক্ষণাৎ পবিত্র হবে। যখনই কেউ তোমার সংস্পর্শে আসবে, তখনই সে তোমাকে ভালোবাসবে। তোমার

---

১ ট্রিপ্লিকেনে 'আইস হাউসে' মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ ছিল। যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন পাশ্চাত্য থেকে ফিরবার পরে। বর্তমানে আইস হাউসের নাম 'বিবেকানন্দ হাউস' বা 'বিবেকানন্দ ইলম্'। মঠ পরে মায়লাপুরে স্থানান্তরিত হয়।

২ স্বামী পরমানন্দের বয়স তখন ২৩ বছর।

মতো পবিত্র, অকপট ও ব্যক্তিত্বময় সাধুকে আমেরিকার ভক্তেরা ভালোবাসবে ও যত্ন করবে—এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তোমার প্রতি মিস গ্লীনের[১] খুবই শ্রদ্ধা। সম্প্রতি সে আমাকে চিঠিতে তোমার সম্বন্ধে জানিয়েছে যে তুমি 'পবিত্র শিশু'। সত্যি এ জগতে পবিত্রতা ব্যতীত অন্য কিছু এত শক্তিশালী নয়। যে পবিত্র হয়, তাকে সবাই ভালোবাসে। তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীস্বামীজীর কৃপায় এই পবিত্রতা অর্জন করেছ। যত্নের সঙ্গে রক্ষা করবে। যদিও তোমার কিছু অজানা নেই, তবুও তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। অখণ্ড পবিত্রতা সর্বদা একমাত্র বজায় থাকবে যখন তুমি সকল নারীকে মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করবে। মানুষের মন বড়ই দুর্বল। ইন্দ্রিয় বড়ই প্রবল। —এক চোখে যাকে মাতৃরূপে দেখবে, অন্যদৃষ্টিতে তাকে অন্যভাবে দেখবে। এভাবে পরম সম্পদ পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ হীন হয়ে পড়ে। আমি আগেই বলেছি যে তুমি শ্রীগুরু মহারাজ ও শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজ কর্তৃক সুরক্ষিত। তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তবুও তোমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। যেহেতু তিনি তোমাকে রক্ষা করছেন। সুতরাং তোমার মনে অন্য কুচিন্তা আসা উচিত নয়। কামের কবলে বহু বোকা তাদের নিজেদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা ভুলে যায়। তারা তখন নিজেদের কেউকেটা মনে করে, সর্বশক্তিমান মনে করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ মনে করে—তাঁকে অনুকরণ করে। তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। কেউ যেন ঘুণাক্ষরে নিজেকে অননুকরণীয়, সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয় বাসুদেবের সঙ্গে সমান মনে না করে। এর চেয়ে পাপ আর নেই। আমি শুনেছি যে আমেরিকাতে স্ত্রীলোকদের প্রভাব বড়ই প্রবল। যদি কোন দুর্বল মানুষ তাদের খপ্পরে পড়ে, তাহলে তার সর্বনাশ। কিন্তু যারা শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত তারা সর্বদা স্ত্রীলোকদের দ্বারা রক্ষিত হবে—যেন নিজের মায়েরা রক্ষা করছেন। তুমি এ বিষয়ে জান, তবুও তোমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

তোমার প্রেরিত দশ ডলার (ত্রিশ টাকা দশ আনা) পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমি শুনেছি যে তুমি মঠেও ১০ ডলার পাঠিয়েছ। এরকমভাবে টাকা পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। তাহলে তোমার দারিদ্রগ্রস্ত ভারতীয় বন্ধুরা তোমাকে অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। আমার ইচ্ছা যে কিছু অর্থ,

---

১ সিস্টার দেবমাতা নামে পরিচিতা ও স্বামী পরমানন্দের প্রথম শিষ্যা দেবমাতা ভারতে একবছর (১৯০৮-০৯) ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর দুটি চমৎকার গ্রন্থ আছে 'Days in an Indian Monastery' এবং 'Sri Ramakrishna and his disciples'

সেখানে মাঝে মাঝে পাও, তোমার খরচের জন্য রাখবে। তোমার কোন ভারতীয় বা বিদেশী বন্ধু কখনও জানতে না পারে যে তোমার অর্থ আছে অথবা তুমি মাঝে মাঝে অর্থ পাও। কারণ, সাধারণ মানুষের দৈবশক্তির চেয়ে অর্থশক্তির প্রতি বড়ই বিশ্বাস ও নির্ভরতা আছে। লোকেরা অর্থের জন্য স্বামীজীর উপর প্রায়ই জ্বালাতন করত। তিনি চিঠিতে বহুবার এ বিষয়ে আমাকে লিখেছেন। আমি তোমার প্রেরিত অর্থ ভালোবাসার দানস্বরূপ খুব সাবধানে রেখেছি। আমি তোমাকে দুটি চিঠি লিখেছি। 'From Colombo to Almora'[১] বইটিও পাঠিয়েছি। তুমি আমার চিঠি ও বইটি পেয়েছ কিনা জানিয়ে আমাকে চিন্তামুক্ত করো। এখন তোমার শরীর কেমন আছে? আমি তা জানার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

রামকৃষ্ণ মিশন
ট্রিপ্লিকেন, মাদ্রাজ
মার্চ ২০, ১৯০৭

প্রিয় বসন্ত,

তোমার ও কালী[২] মহারাজের চিঠি পেয়ে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। প্রায় দেড়মাস যাবৎ আমি এখানে একা। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার শরীর বেশ ভালো। আমি শুনেছি যে মঠ[৩] থেকে দশ পনেরো দিনের মধ্যে একজন ব্রহ্মচারী আসবে। অচ্যুত রাও প্রায় সব কাজই করে। সে খুব ভালো ও বিশ্বাসী। কস্তুরী ধোয়াধুয়ি করে। আর প্রায় সবই পূর্বেকার মতন। আমি একই কুটিরে আছি। মঠে কেউ না থাকায় আপাতত সমস্ত ক্লাস বন্ধ। পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরানি ভালো আছেন। তিনি তোমাকে স্নেহ-আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। যদিও আমার শরীর মোটামুটি ভালো, তবে আগের মতো আর কাজ করতে পারি না। কাজও করতে আর ইচ্ছা হয় না। পূর্ণ বিশ্রাম চাই।

---

১ বাংলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামে পাওয়া যায়।

২ স্বামী অভেদানন্দ ৩ বেলুড় মঠ

তোমার কাজের বর্ণনা শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী'—এই ভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। এইটি প্রকৃত জ্ঞান আর সব অজ্ঞান। যখন কেউ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে তখন সে এই ভাব অনুভব করে। যার এই অনুভব হয়, তার কখনও বেচালে পা পড়ে না। যখন কেউ শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের আশ্রয়ে থাকে, তার মন কি অসৎ পথে মগ্ন হয়? শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের বিশেষ কৃপা তোমার উপরে। সেজন্য তিনি তোমাকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তাঁর পাদপদ্মে তোমার সর্ববিধ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

কালী মহারাজকে আমার ভালোবাসা ও প্রণাম জানাবে। সে আমাকে তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে বলেছে। কিন্তু আমার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা এমনই যে আপাতত আমি তা করতে পারব না। সেজন্য আমি এই কাজ ডঃ পি. ভেঙ্কটরঙ্গম্ কে দিয়েছি। সে আনন্দের সঙ্গে করবে। আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সারদা[১], মতিলাল[২], সুশীল[৩] ও হরিপদকে[৪] জানাবে। শ্রীমহারাজের[৫] শরীর আগের মতো ভালো নয়। সেজন্য তিনি বাবুরামের[৬] সঙ্গে শীঘ্রই বায়ু পরিবর্তনের জন্য পুরী যাবেন। সাত আট দিনের মধ্যে এই মঠের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে।

মিস গ্লীনকে এবং সোসাইটির সকল সদস্যদের আমার শুভেচ্ছা জানিও। স্নেহ-আশীর্বাদ সহ ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মাদ্রাজ
৪-৪-১৯০৭

প্রিয় বসন্ত,

তোমার কাছ থেকে কয়েকটি চিঠি পেয়ে আমি খুবই সুখী হয়েছি। তোমার মন স্বভাবতই পবিত্র। সুতরাং অসৎ চিন্তা তোমার মনে আসতেই পারে না। মিস গ্লীন ও তোমার চিঠিতে জানতে পারলুম যে তোমাকে খুবই পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তোমার চিঠি না পেলে আমি চিন্তিত হই। শাস্ত্রানুযায়ী কারুর অতিরিক্ত

---

১ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ২ স্বামী সচ্চিদানন্দ ৩ স্বামী প্রকাশানন্দ ৪ স্বামী বোধানন্দ ৫ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৬ স্বামী প্রেমানন্দ

দৈহিক অথবা মানসিক কাজ করা উচিত নয়। এরকম করো না। যা নিজে শিখবে অপরকে তাই শিক্ষা দেবে। এর থেকে যদি লোকেরা উপকৃত হয়, তাহলে তা প্রভুর ইচ্ছায় হয়েছে। প্রত্যেকের উচিত অন্তরে সৎচিন্তা দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করা। তা সম্ভব হয় সর্বদা সৎসঙ্গ ও আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের মাধ্যমে।

শ্রীগুরু মহারাজ কখনও দুটি শব্দ সহ্য করতে পারতেন না ঃ গুরু ও কর্তা। যদি কেউ তাঁকে গুরু বা কর্তা বলে ডাকতো, তিনিই তখন বলতেন যে ঈশ্বরই একমাত্র গুরু ও কর্তা। মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। গুরু সেই হবে যে নিজের সীমাবদ্ধতাকে দৈবীসত্তায় রূপান্তরিত করবে এবং দেবত্ব লাভ করবে। যতদিন পর্যন্ত তা হবে না, ততদিন সে ভ্রমবশত নিজেকে গুরু বলে ভাববে না। যদি কেউ এসব করে, তাহলে সে ভুল পথে যাবে এবং কষ্ট পাবে। 'বন্ধু, যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি'—আমি প্রথম এইটি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কাছ থেকে শুনি। যে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে নিজেকে বড্ড জাহির করে, সে তখন পশুর সমান হয়ে যায়। তার মধ্যে অহংকার দানা বাঁধে, সে তখন পশু প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে স্বার্থপর হয় এবং অজ্ঞান সমুদ্রে হাবুডুবু খায়। ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে অনেক সময় লাগে। মেয়েমানুষের প্রশংসায় এই সব ভুলে যাবে না। 'স্ত্রী বুদ্ধি ভয়ংকর' এইটি শাশ্বত সত্য। মেয়েমানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য, ব্যবহার ও অঙ্গভঙ্গি দেখে আকৃষ্ট হয় এবং শেষে তারাও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে প্রলুব্ধ করে। তারাই মানুষের পতনের মূলে। অবশ্য কয়েকজন স্ত্রীলোক আছেন যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া।[১] কিন্তু যখন স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে আসে, তখন এমনকি পবিত্রসম্পন্না স্ত্রী ও পবিত্রমান পুরুষ তাদের নিজস্ব পবিত্রতা হারায়। অন্য কথায়—যদি তুমি মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাক, তাহলে তুমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে নিরাসক্তভাবে থাকতে—পদ্মপত্রের উপর জলের মতো। আর তা সম্ভব হবে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে শরণাগত হয়ে থাকা। গুরুকৃপা বিশেষভাবে তোমার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে একমাত্র তিনি সর্ব বিপদ হতে তোমাকে রক্ষা করবেন। ঈশ্বর বাইরে নেই, তিনি অন্তরে আছেন, তাঁকে জানতে হলে ভিতরে ডুব দিতে হবে। 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন

---

১ সাধারণত সকালে ভগবানের নাম নেয়। কয়েকজন স্ত্রীলোক আছেন যাঁদের জীবন অত্যন্ত পবিত্র। ভারতীয় শাস্ত্রে এরূপ পাঁচজন স্ত্রীলোক আছেন—অহল্যা, দ্রৌপদী, সীতা, তারা ও মন্দোদরী তাঁদের নাম করলে পাপ নষ্ট হয়।

অহল্যা, দ্রৌপদী, সীতা, তারা, মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্‌॥

তিষ্ঠতি'—'হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন।' (গীতা ১৮/৬১)।

অত্যধিক ধ্যান করা ভালো নয়। এজন্য ক্ষতি হতে পারে। যতটা সহ্য হয়, সেভাবে ধ্যান করবে। কালী মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য। সে সংস্পর্শে এসেছে ও সেবা করেছে, সে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র। তার পক্ষে ভুল পথে যাওয়া অসম্ভব। সে মহাপুরুষ। তার পক্ষে সব কিছু খাটে। কিন্তু তুমি তাকে অনুকরণ করবে না। ... সহজেই অন্যের প্রতি যন্ত্রণার কারণ হয়—যে কেউ করতে পারে। কিন্তু সেই মহৎ যে তা সহ্য করতে পারে, শেষে সেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম লাভ করে ধন্য হয়। মনোযোগ সহকারে স্বামীজীর বক্তৃতাবলী মাঝে মাঝে পড়বে। সবসময় বই পড়া ভালো নয়। মধ্যে মধ্যে বই পড়বে। ভারতে টাকা পাঠাবার সম্বন্ধে তোমায় লিখেছি। তা তুমি বিব্রত থেকে বাঁচবে। তুমি সাধু; এটা খুব ভালো যে অর্থের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কম। চিল ও মাছের গল্প স্মরণ করো।[১] যদি কেউ ভালোবেসে তোমাকে কিছু টাকা দেয়, তাহলে তুমি তা রাখবে। সময়ে প্রয়োজন হবে। যদি তুমি তা কর, তাহলে তুমি অর্থ থেকে চিন্তা মুক্ত হবে। অর্থ প্রায়ই অনর্থের মূল।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় এখানে সকলে ভালো। মঠের[২] নির্মাণ কার্য প্রায় সম্পূর্ণ। খুব সম্ভবত পূজার[৩] পর মঠের নতুন বাড়িতে যাবো। আমার গভীর স্নেহ-আশীর্বাদ জানবে এবং হরিপদকে জানাবে।

কালী মহারাজকে আমার ভালোবাসা ও প্রণাম জানাবে। সে এখন কোথায়? সারদা মহারাজকে আমার ভালোবাসা ও প্রণাম জানাবে। সুশীল ও মতিলালকে আমার স্নেহ-আশীর্বাদ জানাবে। কখনও কখনও আমি তোমার চিঠির জন্য উদ্বিগ্ন থাকি। সেজন্য তুমি মাঝে মাঝে চিঠি লিখে আমার উদ্বেগ দূর করবে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ তোমার সর্ববিধ কল্যাণ করুন। শ্রীমহাবীরের মতো তুমি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন কর, তুমি তোমার কর্তব্য ও সাধনা কর এবং এই জীবন-যুদ্ধে তুমি জয়ী হও। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

---

১ The Gospel of Sri Ramakrishna (Madras Sri Ramakrishna Math, 1980) 20/1p 314.

২ মায়লাপুরে মঠ তৈরি হচ্ছিল।

৩ ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

(৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন

১৬-৫-১৯০৭

প্রিয় বসন্ত,

তোমার কার্ড ও চিঠি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার স্নেহ ও আশীর্বাদ জানবে। আমি পৃথক ডাকে গীতা, চণ্ডী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির ফটো, ব্রহ্মচর্যের মন্ত্র তোমাকে পাঠিয়েছি। প্রাপ্তি স্বীকার করো। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ও স্বামীজীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিতে তুমি যা করবে, তাতেই তুমি সাফল্য লাভ করবে। তোমার মনের মধ্যে অহংকার নেই। তোমার সুস্বাস্থ্যের জন্য যা প্রয়োজন তাই করবে। তোমার সুসংবাদ জানিয়ে আমাকে চিন্তা মুক্ত করবে। মিস গ্লীন আমাকে দীর্ঘ চিঠি লিখেছে। তোমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখেছে। আমার স্নেহ ও আশীর্বাদ তাকে জানাবে।

ব্যস্ততার জন্য এই সময়ে আমি বেশি লিখতে পারছি না। পরের চিঠিতে তোমাকে আমি অনেক লিখব। কালী মহারাজকে আমার ভালোবাসা ও অনেক অনেক প্রণাম জানাবে। যখন তুমি হরিপদকে চিঠি লিখবে তাকেও আমার স্নেহ ও আশীর্বাদ জানাবে। তুমিও আমার স্নেহ ও আশীর্বাদ জেনো। বর্তমানে আমার সঙ্গে রুদ্র চৈতন্য নামে একটি ছেলে থাকে, খুব ভালো ছেলে। তাকে তোমার আশীর্বাদ জানিও।

ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৬)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মাদ্রাজ

১৩-৬-১৯০৭

প্রিয় বসন্ত,

সুদীর্ঘ কাল তোমার চিঠি না পেয়ে আমি বড়ই উদ্বিগ্নে আছি। তোমার শরীরের কথা জানিয়ে অবিলম্বে আমাকে চিঠি লিখে আমার উদ্বিগ্নতা দূর করো। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় বর্তমানে এখানে সকলে ভালো আছে। গত কয়েকদিন এখানে খুব গরম। আমাদের ভীষণ কষ্ট। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় এখন অনেকটা

ঠাণ্ডা। বর্তমানে একজন আমাদের কর্মীর নাম—রুদ্র চৈতন্য—কুমিল্লার[১] ছেলে, অচ্যুৎ রাও আর আমি। মায়লাপুরে মঠের নির্মাণ কার্য প্রায় শেষ। এক দু মাসের মধ্যে আমরা ওখানে যাব।

ভালোভাবে থেকো। এখানে প্রত্যেকের তোমার প্রতি দৃষ্টি আছে। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাবধান হইও। ভালো-প্রকৃতি, বিদ্বান, সুন্দরী, ধনী স্ত্রীলোকদেরকে কাল কেউটের মতো মনে করবে। তুমি স্থির, আত্মসংযমী ও ঈশ্বর-ভক্তিমান। বেচালে পা পড়া তোমার পক্ষে অসম্ভব। তবুও আমি তোমাকে এ সবের জন্য সাবধান করে দিচ্ছি। তোমার অনুরোধমতো শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির ফটো, ভগবদ্‌গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী এবং ব্রহ্মচর্যব্রতের মন্ত্রগুলি পাঠাচ্ছি। প্রাপ্তি স্বীকার করো।

তোমরা ওখানে কি খাও? তোমার পক্ষে যা ভালো তাই খাবে। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বলতেন—যদি কেউ গোমাংস খায় এবং সেই সঙ্গে তার মন ভগবানে নিবিষ্ট থাকে, তাহলে সে প্রকৃত নিরামিষাশী ও সন্ন্যাসী। আর যে হবিষ্যান্ন খায়, কিন্তু কামকাঞ্চনে আসক্ত, সে কাকমাংস ভক্ষণের চেয়ে আরো বেশি অধম। যদি মাছ মাংস তোমার পক্ষে অনুকূল হয়, তা হলে তাই খেও। প্রত্যেকে নিজের শরীরের যত্ন নেবে।

ব্যাঙ্গালোরে শুকুল[২] ভালো আছে। রাজা মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ পুরীতে আছেন। তোমার ওখানে কি কি ফল ও সবজি পাওয়া যায়—আমাকে জানিও। পরেরবার তোমার কাছে ব্রহ্মচর্য-ব্রত মন্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ পাঠাব। কালী মহারাজ এখন কোথায়? তাকে আমার ভালোবাসা ও প্রণাম জানিও।

ওদেশ তোমার কেমন লাগছে? কেউ যদি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কাজের জন্য সব প্রতিকূলতা সহ্য করে নিজের জীবন উৎসর্গ করে, তাহলে সে মহৎ ও ধন্য।

আমার আন্তরিক স্নেহ-আশীর্বাদ জানবে এবং তোমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকব।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

---

১ বর্তমানে বাংলাদেশে

২ স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও ব্যাঙ্গালোর মঠের অধ্যক্ষ।

(৭)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মাদ্রাজ

২৭-৬-১৯০৭

প্রিয় বসন্ত,

তোমার ২৮ মে-র চিঠি পেয়েছি ও সব খবর জানলুম। তোমার সংবাদের জন্য আমি একটু চিন্তিত ছিলাম। এখন আমি চিন্তামুক্ত।

যখন কেউ কাজ করে, সে সর্বদা বাধার সম্মুখীন হয়। এজন্য স্বামীজী বলেছেন, "যেখানে বাধা নেই সেখানে সফলতা নেই।" তুমি ঠিকই লিখেছ। 'দুঃখ ও কষ্ট পাওয়া ভালো, সুখ হতে মানুষ পশু-প্রবৃত্তি লাভ করে।' স্বামীজীও তাঁর কর্মযোগে মন্তব্য করেছেন ঃ "সেই সবচেয়ে ভালো কাজ করে, যার স্বার্থ নেই, যে অর্থ, যশ ও অন্য কিছুর জন্য করে না। কেউ যদি এরূপ কাজ করে তাহলে সে বুদ্ধ হবে। তাঁর মধ্যে কাজের জন্য এত শক্তি আসবে যে সে জগৎকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। এই ব্যক্তি কর্মযোগের সর্বোচ্চ আদর্শ।"[১]

প্রকৃত জ্ঞানী অসম্মানকে অমৃত এবং সম্মানকে বিষ বলে মনে করে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ও স্বামীজী কত কষ্ট সহ্য করেছেন। তারা কত অপমান সহ্য করেছেন ! এসব কেউ বুঝতে পারবে যদি সে তাঁদের জীবনী গভীরভাবে অধ্যয়ন করে। সে জন্য শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বলতেন ঃ বর্ণমালায় এক একটি অক্ষর এক একটি শব্দ হয়—যেমন ক, খ, গ ইত্যাদি। কিন্তু তিনটি শ, ষ, স আছে। এটি যেন শ্রীপ্রভুর সকল মানুষের প্রতি প্রথম উপদেশ ঃ হে মানুষ, জগতে সহ্যশক্তি সর্বোত্তম গুণ। যে সহ্য করে সে বাঁচে, যে সহ্য করে না, সে শেষ হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ ও স্বামীজীর কৃপা তোমার উপর আছে। তাঁরা তোমাকে সহ্যগুণ শিখিয়েছেন। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলতেন ঃ "যখন কামার কোন ধাতুকে নির্দিষ্ট আকার দিতে চায়, তখন সে ধাতুকে অনেকক্ষণ আগুনে রাখে। যখন সে ধাতু গরমে গনগন করে লাল হয়, সে তখন নেহাই-তে রেখে বড় হাতুড়ি দিয়ে পেটায়। এভাবে ধাতুর নির্দিষ্ট আকার তৈরি হয়।" তোমার অনন্ত সহ্যশক্তি আছে। সুতরাং তোমার কষ্ট কেন হবে? বৃক্ষ সকলকে ছায়া দেয়—এমনকি যে ব্যক্তি বৃক্ষের ক্ষতি করে। প্রকৃত সাধুর বৃক্ষের মতো সহ্য শক্তি থাকবে। এজন্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছেন ঃ

---

১ কর্মযোগ—স্বামী বিবেকানন্দ, অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৩০-১৩১

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

"সেই একমাত্র শ্রীহরির নাম গুণকীর্তন করতে পারে যে তৃণের চেয়ে নমনীয়, বৃক্ষের চেয়ে সহ্যগুণী আর মানকে যে তুচ্ছ জ্ঞান করে।" যদি মন সর্বদা পবিত্র, আনন্দ ও শান্তিতে থাকে তাহলে কেউ এসব অনুসরণ করতে পারে। 'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী'-হও। নিন্দা ও স্তুতিতে মৌন হয়ে এবং শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ ও স্বামীজীর কাজ করে যাও। তুমি অনন্ত শক্তি ও দীর্ঘজীবন পাবে; অবশেষে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

শ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় এখানে সকলেই ভালো। আমাদের সকলের কালী মহারাজের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সে যদি শেষ কয় বছর ব্রহ্মচর্য পালন না করত, সব কষ্ট সহ্য না করত, তাহলে কি ও দেশে থাকতে পারত? আজকের বেদান্ত সোসাইটির অস্তিত্ব থাকত? প্রত্যেকেরই দোষ আছে; "মিশ্রিত ধাতু ছাড়া অলংকার গঠন হয় না।" শ্রীগুরু মহারাজ বলেছেন দোষ দেখার পরিবর্তে, যতটা সম্ভব প্রত্যেকের গুণ আমাদের দেখা উচিত। তুমি এসব জান তোমাকে বলা নিরর্থক।

তোমার শরীরের প্রতি নজর দিও। শরীর খারাপ হলে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। ... যে মেয়ে মানুষের মায়ারূপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে, সেই প্রকৃত সাহসী—স যুক্তঃ স সুখী নরঃ—'তিনি যোগে প্রতিষ্ঠিত, তিনি সুখী মানুষ।' যদি তুমি ঐ দেশে তিন-চার বছর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করে থাকতে পার, তাহলে তুমি অনেক বড় কাজ করতে পারবে।

ঘেরণ্ড সংহিতা থেকে একটি শ্লোক দিচ্ছি তোমার অভ্যাসের জন্য ঃ

নাস্তি মায়াসমঃ পাশো নাস্তি যোগ সমং বলম্।
নাস্তি জ্ঞান সমো বন্ধুঃ নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ ॥

"মায়ার চেয়ে বন্ধন বড় নয়, যোগের চেয়ে শক্তি বড় নয়, জ্ঞানের চেয়ে বন্ধু বড় নয়, অহংকারের চেয়ে শত্রু বড় নয়।" অহংকারকে নির্মূল করার জন্য শ্রীশ্রীগুরুদেব মেথরের মতো পায়খানা পরিষ্কার করেছিলেন। আমাকে গালমন্দ কর। কি! আমাকে গালমন্দ করবে না? আমি কি পূজার যোগ্য? না। ভগবান একমাত্র পূজ্য। আমি গালমন্দের পাত্র। আমার কি এমন গুণ আছে যে লোকে আমাকে পূজা করবে? অহংই হলো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার ও জিঘাংসার মূল। অহং-এর জন্য গালমন্দ আমার কাছে পুরস্কার।

প্রহ্লাদ কি দোষ করেছিল? তাঁর একমাত্র দোষ ছিল সে শ্রীহরির গুণগান করতে ভালোবাসত, তাঁর ধ্যান করতে ভালো লাগত, তাঁর নাম জপ করতে ভালোবাসত এবং এজন্য তাঁর পিতা তাঁকে কিভাবে অত্যাচার করেছে। তুমি জান কিভাবে সে হাসিমুখে কত অত্যাচার সহ্য করেছে ঃ হাতির পায়ের তলায় ফেলেছে; আগুনে ছুঁড়ে দিয়েছে, পর্বতের চূড়া থেকে ফেলে দিয়েছে, বিষ খেতে দিয়েছে—আরো কতো কি! তাঁর মতো বালক এসব সহ্য করেছে। তাঁর কষ্টের সামান্যতম কষ্ট সহজেই আমাদের সহ্য করা উচিত।

এই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য ব্রত মন্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ পাঠালুম। উত্তর দিয়ে আমার চিন্তা মুক্ত করবে।

গভীর স্নেহ ও আশীর্বাদ সহ— ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

[স্বামী পরমানন্দকে লিখিত] মাদ্রাজ

২৭.৬.০৭

অবিবাহিত ও বিবাহিতের জন্য ব্রহ্মচর্যের মন্ত্র।

(১) সূর্যোদয়ের অন্তত আধঘণ্টা পূর্বে আমি শয্যাত্যাগ করব। আমার হাত, মুখ, পা শরীরের অন্যান্য কৃতকর্মের পর আমি ধ্যানের জন্য চুপচাপ বসব।

(২) ধ্যানের পূর্বে আমি সর্বদা নিজেকে পবিত্র ও ভদ্র ভাবব। আমি আমার পূর্ব অসৎ কাজের কোনরকম চিন্তার আরোপ করব না। ঈশ্বরের নিকট শক্তির জন্য প্রার্থনা করব যাতে ভালো ও পবিত্র হবার শুভবাসনা জাগ্রত করতে সক্ষম হই।

(৩) সূর্যোদয়ের পর আমি আমার কর্তব্যে মনোযোগ দেব।

(৪) আমার সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করার সময় আমি সর্বদা আন্তরিক হতে চেষ্টা করবো। আমার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত—সকলের সঙ্গে ভালোভাবে ও ভালোবেসে কথা বলা—এমনকি শত্রুদেরও সঙ্গে পর্যন্ত।

(৫) আমি সর্বদা সক্রিয় ও পরিশ্রমী হবার চেষ্টা করব। যখন কোন ক্ষুধার্ত

পুরুষ বা নারী খাদ্যের জন্য আসবে, তখন তার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সর্বতোভাবে ও যথাশক্তি করার চেষ্টা করব কোন খাবার দিয়ে, কিন্তু অর্থ দিয়ে নয়। যদি সে বস্ত্র চায়, তাহলে আমি যথাসাধ্য তার প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করব—নতুন বা পুরানো কাপড় দিয়ে।

(৬) রাত্রে আমি ভরাপেট খাব না। রাত্রের খাবার কখনও বেশি হতে পারে। কিন্তু কোনপ্রকারে আমার যেন তা না হয়।

(৭) আমি মৌমাছির মতো ব্যবহার করব, গোবর গাদা মাছির মতো নয়। আমি অন্যের মধ্যে শুধু ভালো, পবিত্রতা দেখার চেষ্টা করব। তাদের ত্রুটি বা বিচ্যুতি দেখব না। আমি ভালোমতো জানব যে মানুষ মাত্রেই ভুল করে।

(৮) আত্মপ্রশংসা, আত্মসুখ, আত্মসুবিধা, আত্মগর্বের পরিবর্তে আত্মলক্ষ্য ও আত্মকৃচ্ছ্র আমার হওয়া উচিত। আমার জানা উচিত যে অন্যের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা ও অপরের দোষ দর্শনের চেয়ে আত্মনিরীক্ষণ ও আত্মনিন্দা আমার চরিত্রকে আরো বেশি উন্নত করবে।

(৯) দৈহিক ও মানসিক অত্যধিক পরিশ্রম, অত্যধিক উপবাস বা নিজের জেদ বজায় রাখাকে পরিহার করা উচিত। মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করা উচিত।

(১০) পার্থিব সুখ, যেমন পিতা-মাতা, গৃহ, অর্থ, নাম-যশের চেয়ে আমি ঈশ্বর বা সত্যকে ভালোবাসার চেষ্টা করব। আমি বিশ্বাস করার চেষ্টা করব যে ঈশ্বরই হলো আমার সত্যিকারের পিতা এবং সত্যিকারের মাতা প্রভৃতি। শাস্ত্রই ঈশ্বরের বাক্য—এই শাস্ত্রকে সম্মান ও মানা উচিত এবং সেই সঙ্গে সন্দেহাতীতভাবে আজ্ঞাবহতা থাকা উচিত।

(১১) আমি আমার একগুঁয়েমি ও আকাশকুসুম কল্পনাকে প্রশ্রয় দেবার চেষ্টা পরিহার করব। কিন্তু অনুকূল স্থানে আমার শরীর ও মনের উন্নতির জন্য আমি বর্তমান জীবনে থাকব। যখন আমি সম্পূর্ণতা লাভ করব তখন আমার অন্যদের কাছে প্রচার করা উচিত, যদিও দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে যথাসাধ্য অন্যদের সাহায্য করা উচিত।

(১২) যত দীর্ঘদিন পারি আমি ব্রহ্মচর্য পালনের চেষ্টা করব, আমি মনে করব যে ঐ সময়ের মধ্যে আমি সকল নারীকে নিজের মা-বোনরূপে

দেখার চেষ্টা করব। শেষদিন পর্যন্ত আমার অবিবাহিত জীবনযাপন করা উচিত। ভগবান আমার সহায় হোন।

[বিবাহিত পুরুষদের জন্য নিম্নলিখিত ১৩ নং ব্রত পালন করা উচিত]

(১৩) আমার স্ত্রী ব্যতীত, আমি অন্য সকল নারীকে আমার মা, বোনরূপে দেখব। এরূপ স্পষ্ট চিন্তা করে আমি আমার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করব। জীবনকে ভোগ করব না বরং বেঁচে থাকার উপভোগ করব। উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী আমি আমার ছেলেমেয়েদের ও শিষ্যদের লালনপালন করার চেষ্টা করব।...

[মূল বাংলায়] কালী মহারাজ কোথায়? তাঁহাকে আমার ভালোবাসা ও প্রণাম। মিস গ্লীন ও তোমার সকল ছাত্রদের আমার কথা বলো।

রামকৃষ্ণানন্দ

(৮)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর
মাদ্রাজ
১৯-১২-১৯০৭

প্রিয় বসন্ত,

তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তুমি প্রতি সপ্তাহে অনেক বক্তৃতা ও ক্লাস করছ জেনে খুবই আনন্দিত। কিন্তু তুমি তোমার শরীরের দিকে নজর দিও। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমি আগের তুলনায় অনেকটা ভালো। কিন্তু এখনও দুর্বল। বর্তমানে তোমার শরীর কেমন?

মিস গ্লীনকে তাঁর চিঠিগুলির জন্য আমার ধন্যবাদ জানাবে। চিঠিগুলি খুবই ভালো। আমি গভীর আগ্রহের সঙ্গে এগুলির জন্য প্রত্যেক দিন অপেক্ষা করে থাকি। কিভাবে তুমি ওখানে সব পাচ্ছ? তুমি কি আমাদের অন্যান্য কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছ? ত্রিগুণাতীত, প্রকাশ, সচ্চিদানন্দ ও হরিপদ কেমন আছে? আশা করি মাঝে মাঝে তোমার কাছ থেকে চিঠি পাব। আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তুমি ও তোমার বন্ধুরা নেবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৯)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর, মাদ্রাজ
২৬-১২-১৯০৭

প্রিয় বসন্ত,

শুভ নববর্ষে তুমি ও তোমার বন্ধুরা সকলে শুভেচ্ছা জানবে। তোমার পাঠানো খ্রিস্টমাসের উপহার পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তোমার দেওয়া ফাউন্টেন পেন আমার বেশ কাজে লাগবে। তোমার দেওয়া নোটবুক, পেন ওয়াইপার, লেটার ওপেনার, ক্যালেন্ডার প্রভৃতি যেই দেখে সেই আমোদিত হয়। শ্রীগুরু মহারাজ তোমাকে আশীর্বাদ করুন। বর্তমানে নতুন মঠে আমি প্রতি সকালে বক্তৃতা দিই। ইতোমধ্যে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছি। আগামী কাল আরেকটি বক্তৃতা দিয়ে শেষ করব। এই সঙ্গে আমি এখানকার কার্যাবলীর ছোট্ট বিবরণ পাঠাচ্ছি। এখানে আমাদের সকল বন্ধুরা তোমার কাজের কথা জেনে অবাক হয়েছে। কেউ আশা করতে পারেনি যে তুমি এত কম সময়ের মধ্যে এরূপ সফলতা লাভ করতে সমর্থ হবে। সবই শ্রীগুরুমহারাজের ইচ্ছা।

মিস গ্লীনের প্রত্যেকটি চিঠি আমার কাছে আদরণীয়। তাঁর তোমার প্রতি মাতৃস্নেহ ও তোমার যত্ন নেওয়া এত আন্তরিক যে আমরা এরূপ দেখি না— সত্যিই বিরল। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। তুমি কি আমাদের সকল বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাবে? আমার স্নেহ-ভালোবাসা সকলকে জানাবে। তোমার কাজের সততা ও পবিত্রতা চিরকালের জন্য বৃদ্ধি হোক। এই অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন জগতের উপর স্ত্রী-পুরুষের আশীর্বাদ সর্বদা বর্ষিত হোক এবং সকলকে আরও সুখী করুক।[১]

তোমার শরীরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখো। কালী মহারাজকে আমার ভালোবাসা ও প্রণাম জানাবে।

আমার স্নেহ-আশীর্বাদ সহ

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

---

১ এই প্যারাগ্রাফটি ইংরেজিতে লেখা।

(১০)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

৩০-১-১৯০৮

প্রিয় বসন্ত,

তোমার পুস্তক 'The Path of Perfection' খুবই চমৎকার। এটি পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি। আশ্চর্যের কথা, বইটি ঠিক স্বামীজীর জন্মদিনে এসেছে! এটি আমার মনে হয়েছে যে স্বামীজী স্বয়ং তোমার ভিতর কাজ করছেন। তাঁর কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হও। বই-এর মধ্যে যে নির্দেশাবলী তা অমূল্য। সত্যই এর জীবন, চৈতন্যই মূলবস্তু, প্রেমই জীবাত্মা, সম্পূর্ণ পবিত্র হৃদয়ই অধিষ্ঠান, আর শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মই লক্ষ্য। পবিত্র হৃদয় হতে বইটি লেখা হয়েছে। শ্রীপ্রভুর কৃপায় এরূপ আরও অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হোক শ্রীপ্রভুপাদপদ্মে ইহাই আমার সতত প্রার্থনা। আমি আশাকরি মিস গ্লীন এরূপ আরোও বই বিক্রির জন্য প্রকাশ করবে। আমি তার আসার অপেক্ষায় আছি। আমরা লক্ষ্য রাখব যাতে তার কোন অসুবিধা না হয়।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(১১)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

পুরী
১৪-১০-০৮

প্রিয় বসন্ত,

তুমি জেনে সুখী হবে আমি পুরীর শশী নিকেতনে আছি। রাখাল মহারাজের চরণতলে বেশ আনন্দে আছি। এখানে আমার আসার কারণ তাঁকে মাদ্রাজে নিয়ে যাব যাতে মঠ পবিত্র হয়। ব্যাঙ্গালোরে তিনি মঠ প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁকে রামেশ্বর ও অন্যান্য তীর্থস্থানে নিয়ে যাব। শ্রীমহারাজ আসতে রাজি হয়েছেন। খুব সম্ভবত এক সপ্তাহের মধ্যেই মাদ্রাজে রওনা হব। রাজা মহারাজ, নীরোদ, কৃষ্ণলাল এবং যোগীন এখানে আছে। যোগীন রাজা মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়েছে—নাম হয়েছে উমানন্দ। সে রাজা মহারাজের সেবক। রাজা মহারাজও তার সেবায় খুবই সন্তুষ্ট।

ব্যাঙ্গালোর মঠের নির্মাণ শেষ হতে আরও একমাস লাগবে। শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার খুবই চেষ্টা করছে যাতে ব্যাঙ্গালোর মঠের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়। তিনি রাখাল মহারাজকে আমন্ত্রণ করেছেন উদ্বোধন করার জন্য। সিস্টার দেবমাতা মাদ্রাজে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সবকিছু প্রস্তুত রাখছে। সে অত্যন্ত আনন্দের জোয়ারে ভাসছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্রের দর্শনের জন্য।

তোমার শরীরের অবস্থা কেমন?...শ্রীরাজা মহারাজ তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাঁর প্রভূত আশীর্বাদ তোমার উপর আছে। সত্যি তুমি ভাগ্যবান। শ্রীগুরু মহারাজ ও তাঁর সন্তানেরা তোমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। তাঁকে লাভ করবার জন্য তাঁর কর্ম অকুতোভয়ে কর। কারুর প্রতি শত্রুতা করবে না। সর্বদা চিন্তা করবে তুমি যন্ত্র আর কিছু নয়। আর তিনি যন্ত্রী। এমনকি দুঃখ ও কষ্টের মধ্যেও জানবে যে তাঁর ইচ্ছায় সব কিছু হচ্ছে। এই জ্ঞান তোমাকে দুঃখ ও বিপদ হতে মুক্ত করবে। মনের মধ্যে অহংকার পুষতে দেবে না।... শ্রীভগবান তোমাকে যে অবস্থায় রাখুন না কেন, তিনি তোমাকে প্রতিক্ষেত্রে ভালোভাবে রক্ষা করবেন। এইটি জানবে এবং তুমি নিজেকে ভাগ্যবান রূপে মনে করবে। তুমি কি ভাবে ওখানে জীবনযাপন করছ তা আমাদের জানাতে দেরি করো না। মাদ্রাজ মঠে চিঠি লিখবে। সকল সহকর্মীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার বিশেষ প্রচেষ্টা করবে। যদি না করতে পার, তাহলে অবিলম্বে আমাদের জানিও। স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশানুযায়ী কাজ করে তুমি তোমার জীবনের লক্ষ্য লাভ কর। শ্রীপ্রভু যাতে তোমাকে ভালো রাখেন তার জন্য আমার প্রার্থনা রইল। আর কি লিখব? আমি তোমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকব।

সিস্টার দেবমাতা খুব ভালো আছে। তার দেহ ও মন পরিপুষ্টতা লাভ করছে। তোমার প্রতি তার শ্রদ্ধা অতুলনীয়। সে এখানে খুব ভালো আছে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

প্রিয় বসন্ত,

নিউইয়র্কে তোমার কাজের সফলতা জেনে খুবই খুশি হয়েছি। আমি খুশি যে রামকৃষ্ণানন্দ আমাদের মধ্যে আছে। সে আমাকে তার নবনির্মিত মঠ দেখতে অনুরোধ করেছে।

ভালোবাসা জানবে।

ইতি
তোমাদের
ব্রহ্মানন্দ

(১২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

পুরী
২১-১০-০৮

প্রিয় বসন্ত,

তোমার ২২ সেপ্টেম্বরের চিঠি পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছি। রাখাল মহারাজ তোমাকে ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। তিনি তোমার প্রতি খুবই কৃপালু। পরের বুধবার (২৮ অক্টোবর) সে, নীরোদ, কৃষ্ণলাল, যোগীন ও আমি মাদ্রাজ যাব। সিস্টার দেবমাতা, রুদ্রচৈতন্য, বৈরাগ্যানন্দ, জীতেন (বিশুদ্ধানন্দ—যে মায়ের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়েছে) রামানুজ, রামু এবং অন্যান্য সকলে আমাদের অপেক্ষায় মাদ্রাজে আছে। শ্রীরাখাল মহারাজ ব্যাঙ্গালোর মঠ উদ্বোধন করবেন। তিনি রামেশ্বরম ও অন্যান্য বিখ্যাত দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির দর্শন করবেন।

সিস্টার দেবমাতার জন্য চিন্তিত হইও না। শ্রীগুরুমহারাজ ও তাঁর শিষ্যদের দেবমাতার প্রতি বিশেষ স্নেহ ভালোবাসা আছে। তার গুণের শেষ নেই। সে বহু গুণান্বিতা। তাঁদের কৃপায় তার ছোট-খাট দোষ নির্মূল হবে।

আমাকে মাদ্রাজে সব কথা জানিয়ে লম্বা চিঠি লিখো। বিশেষ করে রাজা মহারাজ সব জানতে চান। এরপর কি করতে হবে সে তোমার কাছ থেকে সব শোনার পর জানাবে।

শ্রীরাজা মহারাজের মন শ্রীগুরু মহারাজের মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। আহাঃ, কি আশ্চর্য অবস্থা তার! কি অবর্ণনীয় মহত্ত্ব! তুমি কত ভাগ্যবান যে তার কৃপা তুমি পাচ্ছ!

আমি প্রায়ই শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাই ও মহাপ্রসাদ ধারণ করে ধন্য হই। শ্রীমহারাজের সঙ্গলাভে বহু লাভ হচ্ছে। আমি মনে করি তার সঙ্গ পাওয়া মহাভাগ্যের কথা। এমনকি বাস্তবিক দেবতারা ভাগ্যবান হবেন তার সঙ্গ গুণে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ ওখানকার তোমার সব বন্ধুদের জানাবে। আর তুমি আমার অন্তরের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। আমি জানি তোমার ও আমার হৃদয় অভিন্ন। তুমি নিষ্কাম ব্রহ্মচারী হও, আদর্শ সন্ন্যাসী হও, জগতের কল্যাণের জন্য দীর্ঘজীবী হও—শ্রীগুরুদেবের কাছে এই আমার সতত প্রার্থনা।

শ্রীগুরু মহারাজের আশীর্বাদে আমরা সবাই ভালো। আমার ভালোবাসা ও প্রণাম প্রণম্য সন্ন্যাসীদের জানাবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(১৩)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর, মাদ্রাজ
সেপ্টেম্বর ৯, ১৯০৯

প্রিয় বসন্ত,

দেবমাতা তোমাদের কাছে আগামী কাল রওনা হচ্ছে। এমনকি তোমার টেলিগ্রাম পাবার পর, যে কারণেই হোক যদি সে যেতে চায়, তাহলে তার আগে যাওয়াই ভালো। তোমার কাজের আরম্ভ হবার পূর্বেই সে পৌঁছলে তোমাকে সে সাহায্য করতে পারবে। শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদে এখানে সকলে ভালো। আশাকরি তাঁর কৃপায় তুমিও দৈহিক ও মানসিক ভাবে ভালো আছ।

দেড় বছর এখানে দেবমাতা থাকায় তার প্রভূত উপকার হয়েছে। সে পরম ভাগ্যবান। কারণ পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি, শ্রীবাবুরাম মহারাজ, শ্রীরাখাল মহারাজ এবং অন্যান্যরা তাকে বিশেষ কৃপা করেছেন। তুমি তাঁর কাছ থেকে বিস্তৃতভাবে জানবে। যা হোক, মহিলা হয়ে সে একটু বাড়াবাড়ি করেছে। কিন্তু নিঃসন্দেহভাবে এই বিষয়ে দেবমাতা অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে অনেক ভালো। ধর্ম বিষয়ে তার গভীর আগ্রহ আছে। ক্রমশ সে আরও ধর্মপিপাসু হবে। দেবমাতার কর্তৃত্ব ভাব আছে। তুমি যা ভালো বোঝ তাই করবে। তোমার মিষ্টি কথা ও মধুর ব্যবহারের মাধ্যমে দেবমাতা ও অন্যান্য মেয়েদের ভালোভাবে রাখবে। তুমি যে তাকে নাম (দেবমাতা) দিয়েছ তা সকলের কাছে সুপরিচিত। এখানে সকলেই তাকে দেবমাতা বলে জানে। তুমিও তাকে কখনো মিস গ্লীন বলে সম্বোধন করবে না। তাকে দেবমাতা ডাকবে। সে এতে খুব খুশি হবে। বাবুরাম মহারাজ, শ্রীমাস্টার মহাশয় এবং অন্য সবাই তাকে সিদ্ধযোগী বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রীগুরুদেবের প্রতি খুবই ভক্তি আছে। এজন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি তাকে বিশেষ স্নেহ ও যত্ন করেন। একথা তার কাছ থেকে শুনবে।

এখানে সকলে তোমাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে। এখানে সবাই তোমার বিস্ময়কর শক্তির কথা বলে এবং তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।

সুতরাং পবিত্র জীবনযাপন করো। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীস্বামীজীর মহিমা প্রচার কর এবং নিজেকে সর্বদা ধন্য মনে কর। যদি তুমি মেয়েদের পাল্লায় না পড় তাহলে সর্বত্র তোমার জয় হবে। তোমার উন্নত পবিত্র ও মধুর প্রকৃতি একেবারে মন্দ প্রকৃতিকে ভালো করতে পারে। জন্ম লগ্ন থেকেই তুমি শ্রীগুরু মহারাজের নিকট এ সকল গুণ পেয়েছ। এই সঙ্গে তুমি যদি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারো, যেন সোনার পাতের মধ্যে হীরা বসানো আছে।

ভারতে তোমার বইগুলি উচ্চ প্রশংসিত। আমরা প্রায়ই তোমার বই বিক্রি করি। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তোমার শরীর আগের চেয়ে ভালো জেনে আমার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তাঁর কৃপায় আমি অনেকটা ভালো, কিন্তু আগের মতো আমার শক্তি নেই। এসকল বৃদ্ধ বয়সের চিহ্ন।

আমার আন্তরিক ভালোবাসা জেনো। নিশ্চিত জানবে যে আমার আশীর্বাদ তোমার উপরে আছে। শ্রীশ্রীমা তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন। শ্রীরাখাল মহারাজও তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন। শ্রীগুরুদেবের কাছে আমি প্রার্থনা করি—দেবমাতা যেন তোমার কাজে সহায়তা করে।

"জগতে সব জীব লোভ ও কামের মধ্যে বাস করে। যদি এই দুটি ত্যাগ করা যায় তাহলে জগতের কোন মূল্য নেই।" সেই বীর যে নিজের আহার ও কাম সংযত করতে পারবে। নিঃসন্দেহে তুমি এইরূপ একজন বীর।... শ্রীশ্রীগুরুদেব ও স্বামীজী তোমার সর্ববিধ কল্যাণ করুন। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(১৪)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর, মাদ্রাজ
সেপ্টেম্বর ১২, ১৯০৯

প্রিয় বসন্ত,

দেবমাতার চিঠিতে তোমার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। তোমার শরীরের বিশেষ যত্ন নেবে। শরীর ভগবানের মন্দির। যদি এর যত্ন না নেওয়া হয়, তাহলে ঈশ্বরকে অবহেলা করা হয়। যদি বোস্টনের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তোমার শরীর না টিকে, তাহলে এই বছর তোমার ক্লাস ও বক্তৃতা বন্ধ রাখ,

তুমি অন্যত্র কোথাও যাও এবং শরীরের যত্ন নিও—এই আমাদের সকলের ইচ্ছা। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহলে ভারতে এস। আমি তোমার বিশেষ যত্ন নেব। অথবা তুমি যদি এখানে আসতে ইচ্ছা না কর, তাহলে আমেরিকার কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাও এবং কিছুকাল থাকো। শরীর ভালো হবার পর আবার তোমার কাজে মন দাও। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি, শ্রীরাখাল মহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজ তোমাকে ভালোভাবে আশীর্বাদ করেছেন।

আগের তুলনায় আমার শরীর অনেকটা ভালো। ডাঃ নাঞ্জুণ্ডা রাও-এর চিকিৎসায় আমি বর্তমানে ভালো বোধ করছি। আর এক সপ্তাহের মধ্যে আশা করছি আমি আমার পূর্বের শক্তি ফিরে পাব।

সুরেন্দ্র বিজয় নামে চট্টগ্রামের একটি ছেলে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির কাছে ব্রহ্মচর্য নিয়েছে ও আমার কাছে আছে। সে খুব ভালো ছেলে এবং ফার্স্ট আর্টস অব্দি পড়াশুনা করেছে। বর্তমানে মঠে রুদ্রচৈতন্য, সুরেন, আমি ও অচ্যুৎ রাও আছি। বেলুড় মঠে সব মহারাজরা ভালো আছেন। শ্রীরাখাল মহারাজ পুরীতে ভালো আছেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেব তোমাকে আশীর্বাদ করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার শরীর ভালো হোক—তাঁর শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা।

আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(১৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

শ্রীশ্রীসপ্তমী পূজা
মঠ, বেলুড়, পোঃ হাওড়া
২১-১০-১৯০৯*

প্রিয় বসন্ত,

আমি গত দু-তিনটি মেলে তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি। শ্রীশ্রীগুরুদেবের

* 'বেদান্ত কেশরী'-তে তারিখ দেওয়া আছে ২১-১১-১৯০৯। কিন্তু নভেম্বরে শ্রীশ্রীদুর্গা সপ্তমী হতে পারে না। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অফিস থেকে জানা গেছে যে ১৯০৯ সালে শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তমী ছিল ২১ অক্টোবর। সেজন্য চিঠির তারিখ আমরা ২১-১০-১৯০৯ রেখেছি।

কৃপায় তুমি ভালো আছ—আমি নিশ্চিত জানি এবং দেবমাতা তোমার কাছে যথাসময়ে ইতোমধ্যে পৌঁছেছে। আমি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি, শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ ও অন্যান্য ভক্তদের দর্শন করতে বেলুড় মঠে এসেছি। মধ্যিখানে পুরীতে শ্রীরাজা মহারাজের কাছে ছিলাম। তিনি এখনও পুরীতে আছেন। নীরোদ ও কৃষ্ণলাল আমার সঙ্গে আছে। মঠে বাবুরাম মহারাজ ও অন্যান্যরা ভালো আছে। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানিও ভালো আছেন। এখানে প্রত্যেকের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

মাদ্রাজ মঠে রুদ্র চৈতন্য, একজন মাদ্রাজী ব্রহ্মচারী ও পুরাতন রাঁধুনি অচ্যুত রাও আছে। পূজার পরই আমি মাদ্রাজে ফিরে যাব। তোমার কাছ থেকে অনেকদিন কোন খবর পাইনি বলে আমি চিন্তিত ছিলাম। খুব সম্ভবত তোমার কাজ ইতোমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। বেশি পরিশ্রম করো না। তোমার কর্তব্য করে যাও, ফল তাঁর হাতে। প্রভুর কৃপা হলে যে কেউ আত্মচৈতন্য লাভ করতে পারবে। তুমি-আমি যন্ত্র মাত্র। সিস্টার দেবমাতার কাছ থেকে বিস্তৃত ভাবে তুমি সব সংবাদ পাবে। কলকাতায় প্রত্যেকে তাকে স্নেহ করে। মাদ্রাজেও তাকে সবাই ভালোবাসে।

সে এখানে খুব পবিত্র ও উপযোগী জীবনযাপন করত। সে সবাই-এর কাছে খুবই প্রিয় ছিল। আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তাকে জানাবে।

আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। আমার তোমাকে দেখবার জন্য মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছা করে। আমাদের সকল বন্ধুদের ভালোবাসা জানিও।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(১৬)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর, মাদ্রাজ
২৩-১২-০৯

প্রিয় বসন্ত,

তোমার ২৩ নভেম্বরের চিঠির উত্তর আমি গত চিঠিতে পাঠিয়েছিলাম।

অর্থাৎ ইতোমধ্যে আমার গত চিঠিতে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি যা তুমি এই চিঠিতে জানতে চেয়েছ। এই থেকে মনে হয় যে তোমার ও আমার মন একই সূত্রে গাঁথা—একমাত্র শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের চরণে। যা আমার মনে উঠে, তা একই সঙ্গে তোমার মনেও উঠে। এর অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের জন্য যদি দোতলায় একটি ঘর তৈরি করা হয়, তাহলে খরচ পড়বে তিন থেকে চার হাজার টাকা। খুব সম্ভবত তোমার কাছে কিছুই থাকবে না, যদি তুমি এই টাকা এক সঙ্গে দাও। সুতরাং তুমি যদি তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকে সংগ্রহ কর, তাহলে খুব ভালো। তোমার কাছে সর্বদা কিছু অর্থ থাকা উচিত। কারণ, তোমার যদি ভারতে আসার একান্ত ইচ্ছা হয়, তাহলে তুমি অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর না করে সহজেই আসতে পারবে। অবশ্য তোমাকে যারা ভালোবাসে তারা কখনও তোমার অভাব রাখবে না, ভবিষ্যতেও না। তবুও প্রবাদ বাক্য আছে—সর্বং পরবশ্যং দুঃখম্, সর্বং আত্মবাসং সুখম্। অন্যের উপর নির্ভর করলে দুঃখ পাবে, স্বনির্ভরতাই আসল সুখ। এক সময়ে শ্রীগুরু মহারাজের সব কাপড় ছিঁড়ে যায়। একটি মাত্র ছিল। মথুরবাবুকে বললে একশ জোড়া কাপড় সহজেই পেয়ে যেতেন। কিন্তু তা না করে, তিনি একটি কাপড় দুটুকরো করে পরতে লাগলেন। সম্ভবত তুমি এঘটনা শুনেছ। কারুর কাছ থেকে কিছু চাওয়ার অর্থ নিজেকে ছোট করা। যদি কিছু চাইতে হয়, তাহলে ভগবানের কাছে চাইবে। অথবা তাঁর ভক্তদের কাছে চাওয়া উচিত। এইটি সর্বদা মনে রাখবে।

এ বছর তুমি নিজে পরিশ্রম করো না এবং বোস্টনে যাওয়া একদম উচিত নয়। প্রত্যেকের উচিত নিজের দেহমন্দিরের যথাযথ যত্ন নেওয়া। খুব ভালো কথা যে দেবমাতা তোমার কাছে গেছে। সে মায়ের মতো তোমাকে স্নেহ করে।

আমি তোমার প্রেরিত ২৫ ও ৫০ ডলার পেয়েছি। তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমি পনেরো টাকা করে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানিকে, শ্রীমহারাজকে, শ্রীবাবুরাম মহারাজকে দিয়েছি, দশটাকা শ্রীগুরুমহারাজের পূজার জন্য দিয়েছি এবং বাকি এখানকার জন্য রেখেছি। পুষ্টিকর আহার করার জন্য আমার শরীর আগের তুলনায় ভালো। আগামী কাল হতে আমি আবার ক্লাস আরম্ভ করব। খ্রিস্টমাসে মঠে আমি চারটি বক্তৃতা দেব। (১) ২৬ ডিসেম্বর ঃ রবিবার— 'সায়েন্স, মডার্ন এন্ড অ্যানসিয়েন্ট (২) ২৭ ডিসেম্বর সোমবার ঃ 'ডিটারমিনেশন অফ কনশাস টেন্‌ডেনসিজ' (৩) ২৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ঃ

'রিজিয়নস্, হায়ার এন্ড লোয়ার' (৪) ২৯ ডিসেম্বর বুধবার ঃ 'লোকাস অফ সোল।' এই বক্তৃতাগুলি প্রতিদিন সকাল আটটায় আরম্ভ হবে।

এখন বক্তৃতা দেবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না। প্রথমত শারীরিক ভাবে সুস্থ হও এবং পরে যত খুশি পার বক্তৃতা দিও।

সত্যপ্রাণাকে (মিস কিস্‌সম্) আমার শুভেচ্ছা জানাবে। সে খুবই প্রেমিক ও দয়ালু! তুমি যখন ভালো ছিলে না তখন সে প্রায়ই আমাকে চিঠি লিখত। এভাবে আমাকে চিন্তা থেকে মুক্ত করেছে! আমি তাকে বারবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব। আমারও তাকে আলাদা চিঠি লেখা উচিত। কিন্তু আমি জানি—তোমাকে চিঠি লেখা মানে তাকেও লেখা। তাকে আর পৃথক ভাবে চিঠি লিখব না। তাকে আমার প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা জানিও। সিস্টার দেবমাতাকে বলো যে তাকে মিস কিস্‌সমের নামে আমি দু-প্যাকেট বই পাঠিয়েছি মেসার্স কুক্ এ্যান্ড সন্সের মাধ্যমে। তাতে ১১৭ কপি 'ইনস্‌পায়ারড টক' এবং ৫০ কপি 'দি গস্‌পেল অব রামকৃষ্ণ' আছে। আমি রসিদ শীঘ্রই পাঠাচ্ছি। তাকেও লিখেছি।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। প্রার্থনা করি শ্রীগুরুমহারাজ তোমাকে অজস্র আশীর্বাদ করুন। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(১৭)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর, মাদ্রাজ

১৭-২-১৯১০

প্রিয় বসন্ত,

গতকাল তোমার প্রেরিত ১০০০ টাকা পেয়েছি। কিন্তু আমাকে জানিও যে এই টাকা ব্যক্তিগত খরচের জন্য, না, মঠের দোতলার তৈরির জন্য। তাহলে সে মতো আমি খরচা করবো। তোমাকে আর কি লিখব? শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ তোমাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ দিন। কিন্তু তোমার শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখবে।

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ভারতে বিভিন্ন স্থানে শ্রীস্বামীজীর জন্মতিথি খুব ভালোভাবে হয়েছে। এখানকার

লোকেরা ক্রমশ স্বামীজীর মহত্ত্ব বুঝতে পারছে। মানুষের কি শক্তি আছে ভগবানকে প্রচার করার? স্বয়ং ভগবানই নিজেকে প্রচার করেন এবং যাঁর অন্তরে ভগবান প্রকাশিত, যিনি ভগবানের গরিমা গান, তিনিই একমাত্র প্রচার করেন। অন্যেরা কেউ নন। ভগবান তাঁর অন্তরে প্রকাশিত হন যিনি অহংকারকে সমূলে নাশ করেন, অন্যের হৃদয়ে নয়। তোমার মধ্যে কোন অহংকার নেই। সুতরাং তিনি তোমার হৃদয়ে সর্বদা বর্তমান। যাঁর কোন প্রকার অহংকার নেই, তিনি অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করুন। কাম কাঞ্চনের মধ্যেও তিনি বিস্মৃত হন না। তাঁর হৃদয়ে শাশ্বত আনন্দ থাকে। তিনি নিজেকে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ জেনে পরম সন্তুষ্ট থাকেন। বেচালে তার পা পড়ে না। এভাবে তিনি আত্মাভিমান, আত্মগর্ব, ঔদ্ধত্য, হিংসা, ঘৃণা থেকে মুক্ত হন। আর তিনি আনন্দে ভরপুর থাকেন।

আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(১৮)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর, মাদ্রাজ

২৪-৩-১৯১০

প্রিয় বসন্ত,

আমি তোমাকে 'সোল অব্ ম্যান' বইটি গত মেলে পাঠিয়েছি। এই সঙ্গে আমি এক কপি মিস শেরউডের জন্য দিয়েছি। এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন' নামে ছোট পুস্তিকাও পাঁচ কপি তোমার কাছে পাঠিয়েছি। শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদে, তাঁর জন্মোৎসব খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে হয়েছে। তাঁর কৃপায় আমার শরীর আগের তুলনায় অনেক ভালো। আমার জন্য চিন্তিত হইও না, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কাজ শান্তি মনে করবে। তুমি নিজেকে ও অপর সকলকে সুখী রাখবে। বর্তমানে শ্রীরাখাল মহারাজ বেলুড় মঠে আছেন। তিনিও খুব ভালো আছেন। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরানি তাঁর জন্মস্থানে ভালো আছেন। তাঁর আশীর্বাদ জেনো। অন্যের সমালোচনায় কান দেবে না। নিজের কর্তব্য সম্পাদন করবে। যারা আজ তোমাকে সমালোচনা করছে, পরে তারাই তোমাকে প্রশংসা করবে। নিশ্চিত জানবে ভগবানের সেবক কখনও দুঃখ পায় না।

আমরা সকলেই জেনে খুশি যে, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় তোমার শরীর ধীরে ধীরে ভালো হচ্ছে ও তুমি নিজেকে ভালো বোধ করছ। তুমি দীর্ঘজীবী হও, তুমি তাঁর সেবা করে যাও এবং আনন্দের সঙ্গে এই জগতে বাস কর— তাঁর পাদপদ্মে ইহাই আমার সতত প্রার্থনা। যতই তোমার শ্রীভগবানের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে, ততই জাগতিক সুখ অসার বলে বোধ হবে। তিনি তোমাকে রক্ষা করে চলেছেন। কোন নারী তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এই সংসারে নিজের জননী ব্যতীত অন্য কেউ আপনজন নন। সুতরাং তুমি যদি সকল নারীকে নিজের মা বলে মনে কর, তাহলে তোমার মধ্যে কামের উদ্রেক হবে না। শ্রীগুরু মহারাজের এই অমূল্য উপদেশ কখনও ভুলবে না, যে নারীকে ঘৃণা করে, তার মধ্যেও কামনার রেশ আছে। এ নিশ্চিত যে একদিন না একদিন তার মরণ হবে। কিন্তু যে সকল নারীকে নিজের মা রূপে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসতে শিখেছে সে কখনও কামের বশবর্তী হয় না।

শ্রীগুরু মহারাজের কৃপায় তোমার সর্ববিধ উন্নতি হোক। আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(১৯)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর, মাদ্রাজ
৩০-৬-১৯১০

প্রিয় বসন্ত,

অনেক দিন তোমার কোন চিঠি আমি পাই নি। আশা করি তুমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভালো আছ। আমি পূর্বাপেক্ষা ভালো আছি। এখন এখানে গরম বেশি নেই। মঠ থেকে কোন কর্মী আসে নি। সুতরাং এখনই বায়ু পরিবর্তনের জন্য আমি ব্যাঙ্গালোর যাব না। তাছাড়া, এমনকি আমি যদি এখন যাই, তাহলেও কোন ক্ষতি হবে না। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার শরীর এখন অনেকটা ভালো এবং গরমের তীব্রতাও বেশ কম।

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি তিন চার দিনের মধ্যে কলকাতায় আসবেন।

সেজন্য যে কর্মী এখানে আসবে, তার দেরি হচ্ছে। সে এখন শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরানির সঙ্গে আছে। তিনি কলকাতায় এলে সে মাদ্রাজ রওনা হবে।

আশাকরি তুমি ছুটি উপভোগ করছ। কাজের কোন শেষ নেই। কিন্তু অনাবশ্যক পরিশ্রম করা ঠিক নয়। আমরা নিজেদের উপকারের জন্য কর্ম করি। একমাত্র ভগবান অন্যের কল্যাণ করেন। অন্যের কল্যাণ করার শক্তি আমাদের কি আছে? আমরা নিজেদের কল্যাণ করতে সমর্থ নই, অন্যের জন্য তো কথাই নেই। এইটি জেনে জ্ঞানী কখনও আত্মগর্ব করেন না, বিভ্রান্ত হন না। স্বামীজী আমাকে সর্বদা বলতেন, "শশী কখনও উদ্বিগ্ন হবি না। শান্ত থাকবি।" একমাত্র যে অহংকারী সেই উদ্বিগ্ন হয়। উদ্বিগ্নতার জন্য তার ঘুম হয় না। ঈশ্বর তনয় মায়ের কোলে সর্বদা শিশুর মতো নিশ্চিন্ত থাকে। সর্বদা চিন্তা করবে যে তুমি সারাক্ষণ মায়ের কোলে আছ, তিনি সর্বদা তোমাকে রক্ষা করছেন। সুতরাং উদ্বিগ্ন হবার আদৌ কোন কারণ নেই। সমগ্র জগৎ তাঁর সংসার। নিশ্চিন্ত মনে তাঁর নাম ও গরিমা প্রচার কর এবং চিরকালের জন্য পরম আনন্দে বাস কর।

আমার গভীর ও আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(২০)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর, মাদ্রাজ
৫-১-১৯১১

প্রিয় বসন্ত,

শুভ নববর্ষ। আশাকরি তোমরা সকলে ভালো আছ। গত মেলে তোমার চিঠি আমি পাইনি। মনে হচ্ছে তুমি খুব ব্যস্ত আছ। তোমার প্রেরিত অর্থ এসেছে। এর থেকে পনেরো টাকা করে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি, শ্রীরাখাল মহারাজ, শ্রীবাবুরাম মহারাজকে এবং দশ টাকা কামারপুকুরে শ্রীশ্রীরঘুবীরকে তোমার নামে দিয়েছি। আমি ছাড়া শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সব ভক্তেরা বেলুড় মঠে আছেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁরা সবাই ভালো। তাঁর কৃপায় আমিও একপ্রকার ভালো, বর্তমানে রুদ্র, প্রকাশ, ডাঃ হ্যালক ও আমি আছি। সম্প্রতি

আমার বাঁ পা মচকেছে ও একটু কষ্টও হয়েছিল। কিছুদিন আমি শয্যাগত ছিলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমি এখন ভালো। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরানি এখন কোঠারে[১] আছেন। তিনি ভালো আছেন। তিনি তোমাকে ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। শ্রীরাখাল মহারাজ ও শ্রীবাবুরাম মহারাজের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জেনো। তোমার প্রেরিত ৭৬ টাকা সবাইকে দেওয়ার পর বাকি ২১ টাকা আমি রেখেছি।

তোমার পাঠানো পঞ্চাশ কপি 'দি পাথ অব ডেভোসান' আমি পেয়েছি। প্রেস থেকে এখনও 'ইন্‌সপায়ারড টক্‌স' আসেনি। পরেরবার তোমাকে পাঠাবো।

অতিরিক্ত কাজ করো না। আমি জেনে সুখী যে শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় তোমার শরীর একটু ভালো। ভুলে যেও না যে বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদের কল্যাণ করছি। ভগবান ছাড়া অন্য কেউ মানুষের অজ্ঞান দূর করতে সমর্থ নন। সে বাস্তবিকই ধন্য যে মানুষের প্রশংসাকে তুচ্ছ মনে করে শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ করে জীবনযাপন করে।

সিস্টার দেবমাতার নববর্ষের চিত্রিত পোস্টকার্ডের জন্য অনেক ধন্যবাদ। নববর্ষ থেকে তার কাজ আরম্ভ হোক। আমি খুবই দুঃখিত যে আমি আলাদাভাবে তাকে চিঠি লিখতে সমর্থ নই। কিন্তু সে জানে যে আমার চিঠি লেখা অনিয়মিত। আশাকরি সে আমাকে ক্ষমা করবে। আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ তাকে জানিও। তাকে বলো যে আমরা লরেন্স এসাইলাম এর সঙ্গে রফা করেছি। দুর্ভাগ্যবশত এখন কিছু অর্থ দিই নি। সে যেন মিঃ এস. এর সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান না করে। সে ভালো লোক নয়। মিস কিস্‌সম্‌ এবং মিস শেরউডকে আমার শুভেচ্ছাদি জানিও। তাদেরকে শুভ নববর্ষের আমার শুভেচ্ছা জানিও।

তোমার নিজের খরচের জন্য বেশি নজর দিও না। তুমি ওখানে একাকী। তোমার শরীরের জন্য টাকা খরচা করতে দ্বিধা করো না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমার কোন অভাব নেই। আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

---

১ রামকৃষ্ণ ভক্ত বলরাম বসুর উড়িষ্যার জমিদারি কোঠার। বসু পত্নী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি ওখানে ছিলেন।

(২১)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ব্যাঙ্গালোর
৪-৫-১৯১১

প্রিয় বসন্ত,

বায়ু পরিবর্তনের জন্য আমি এখানে এসেছি। শরীর ভালো নয়। ডাক্তারের পরামর্শে আমি এসেছি। এখানে আসার পর আমি একটু ভালো বোধ করছি। শরীর ভালো না লাগার জন্য আমি আগে চিঠি লিখতে পারিনি। আর আমিও তোমার কোন চিঠি পাইনি। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায়, আশাকরি, তুমি ভালো আছ। আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। অত্যধিক পরিশ্রম কোর না। সিস্টার দেবমাতা, মিস শেরউড ও মিস কিস্‌সম্‌কে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(২২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ব্যাঙ্গালোর
২৫-৫-১৯১১

প্রিয় বসন্ত,

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার শরীর এখানে একটু ভালো। যে অসুখে ভুগছি তা সারতে অনেকদিন লাগবে। বৃষ্টিকালের দরুন আবহাওয়া খুব খারাপ। আমার অসুস্থতার পক্ষে ভালো নয়। এজন্য ডাক্তাররা আমাকে অন্যত্র যেতে বলছেন। আমি মনে করছি—অন্য কোথাও বায়ু পরিবর্তনের জন্য যাব।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় তুমি মানসিক ও শারীরিক সম্পূর্ণ ভালো আছ। অত্যধিক কাজের জন্য আমার এই অবস্থা। আমার জীবন সকলের জন্য সতর্কবাণী। তুমিও কখনও অত্যধিক পরিশ্রম করবে না। যাতে বেশি বেঁচে থেকে শ্রীশ্রীগুরুদেবের বাণী প্রচার করতে পার, সে ভাবেই কাজ করবে। তাহলে তুমি ও জগতের সকলে ধন্য হবে।

তোমার লেকচারের প্রোগ্রাম দেখে আমি অত্যন্ত খুশি। নারায়ণ আয়েঙ্গার

এখন অন্যত্র গেছেন। দু-একদিনের মধ্যে আসবে। সে এলেই আমি মাদ্রাজ যাবো। কারণ বর্তমানে এখানকার চেয়ে মাদ্রাজের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শুকনো। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ও শ্রীস্বামীজীকে কখনও ভুলো না। তাঁদের আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করবে।

সিস্টার দেবমাতাকে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাবে। আশা করি তার চোখ বেশি কষ্ট দিচ্ছে না। মিস কিস্‌সম্‌ ও মিস শেরউডকে শুভেচ্ছা জানিও। রাখাল মহারাজ পুরীতে এসেছেন ও ভালো আছেন। তাঁর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। তুমি আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

[এইটি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের খুব সম্ভবত শেষ চিঠি। তাঁর টি.বি. হয়েছিল। তিনি জুন মাসের (১৯১১) মধ্যিখানে কলকাতায় চলে যান এবং আগস্ট মাসে মহাসমাধি লাভ করেন।]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অন্যান্য পত্র

(১)

কলকাতা
১৩ জুন, ১৮৯৩

শ্রদ্ধেয় খেতড়ি মহারাজ,

আমার অসুস্থতার খবর নেওয়ার জন্য মহারাজকে অনেক ধন্যবাদ। মহেন্দ্রনাথ খুব ভালো ছেলে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সেবা করেছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দের পরিবারের বিষয়ে আন্তরিকতার সঙ্গেই আগ্রহ দেখিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ত্যাগের পূর্বে আপনার সম্পর্কে অতি উচ্চ প্রশংসা করেছেন; এইরকম মহানুভব মহারাজ যখন পরিবারটির সম্পর্কে সদাই উদ্বিগ্ন, আমি নিশ্চিত যে তাদের সমস্যা অচিরেই দূরীভূত হবে।

আপনার শিশুপুত্র আরোগ্য লাভ করেছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আশাকরি মহারাজ ও তাঁর শিশু পুত্র ভালোই আছেন।

মহারাজের জন্য আশীর্বাদ ও প্রার্থনা সহ—

আপনার বিশ্বস্ত
রামকৃষ্ণানন্দ
প্রযত্নে ঃ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল
গভর্নমেন্ট স্টেশনারি অফিস, কলকাতা[১]

(২)

কলকাতা
৫ জুলাই, ১৮৯৩

শ্রদ্ধেয় খেতড়ি মহারাজ,

অনেককাল যাবৎ মহারাজের কোন সংবাদ পাই নি। কিন্তু পুত্রের সঙ্গে

---

১ Swami Vivekananda—A Forgotten Chapter of His Life, by Benishankar Sharma, Publishers : 1963, Oxford & Stationary Co. Page : 162-163

মহারাজ আনন্দে আছেন জানালে সুখী হব। ভারত থেকে যাত্রাকাল পর্যন্ত আমাদের অতি প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দের কোন সংবাদ পাইনি। মহারাজ যদি তাঁর সম্পর্কে কোন সংবাদ পেয়ে থাকেন আমাদের অনুগ্রহ করে জানাবেন।

স্বামীজীর ছোটভাই মহেন্দ্রনাথের কলেজ খুলেছে, সে মনোযোগের সঙ্গেই পড়াশুনো শুরু করেছে; কিন্তু আমি কয়েকদিন আগে তাকে অস্থির হতে দেখেছি।

এইবছর গত বর্তমান মাসে প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়ায় মানুষের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখন কিছুটা পরিস্থিতি ভালো।

শিশুপুত্রটি কেমন আছে?—আশাকরি ভালোই আছে।

আমরা এখানে ভালো আছি, আশাকরি আপনি ও শিশুপুত্র ভালো আছেন। মহারাজের জন্য আশীর্বাদ ও প্রার্থনা সহ—

আপনার বিশ্বস্ত—

রামকৃষ্ণানন্দ
প্রযত্নে ঃ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল
গভর্নমেন্ট স্টেশনারি অফিস, কলকাতা[১]

(৩)

কলকাতা
১৮ আগস্ট, ১৮৯৩

মহাশয়,

অনেকদিন হলো আমাদের অতি প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দের কোন সংবাদ পাইনি। যদি আপনি তাঁর কোন সংবাদ পেয়ে থাকেন, তবে অনুগ্রহ করে কি আপনার সুবিধা মতো আমাদের জানাবেন? মহারাজ ও তাঁর শিশুপুত্র কেমন আছেন? ঈশ্বরের কৃপায় সবাই কুশলে থাকুক। মহারাজ, আপনাকে ও তাঁর শিশু পুত্রকে শুভকামনা জানাচ্ছি। হে শুভানুধ্যায়ী! আপনাকে আমার আশীর্বাদ।

---

১ Swami Vivekananda—A Forgotten Chapter of His Life, by Benishankar Sharma, Publishers : 1963, Oxford & Stationary Co. Page : 190-191

আমাদের এক গুরুভাইয়ের কৃমিরোগের সেবার জন্য সবাই ব্যস্ত ছিলাম, তাই প্রায় একমাস হলো স্বামীজীর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। এখন ঐ গুরুভাইয়ের অবস্থা ভালো হচ্ছে।

মহারাজ স্বামীজীর সহায়-সম্বলহীন পরিবারের যথা সম্ভব দেখাশুনা ও সাহায্য করবেন বলে আমার বিশ্বাস। এই বিষয়ে আমার আর কি বলার আছে। আশাকরি আপনারা সকলে কুশলে আছেন।

আপনার জন্য রইল আশীর্বাদ। প্রার্থনা সহ—

আপনার বিশ্বস্ত
রামকৃষ্ণানন্দ

মুন্সী জগমোহন লাল
প্রযত্নে খেতড়ি

প্রযত্নেঃ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল[১]
(লিখিত)

(৪)

কলকাতা
১০ অক্টোবর, ১৮৯৩

প্রিয় মুন্সীজী,

স্বামীজীর চিঠিগুলি অনুগ্রহ করে আমাদের পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। আমরা সবকটি আনন্দের সঙ্গে পাঠ করেছি এবং আপনাকে ফেরত দেবার জন্য মহেন্দ্রনাথকে দিয়েছি, আশাকরি এর মধ্যে ঐগুলি আপনি পেয়ে থাকবেন। ইতোমধ্যে আপনি যদি স্বামীজীর কোন সংবাদ পেয়ে থাকেন, তবে আমাদের জানাবেন। স্বামী অভেদানন্দের অসুখ ভালো হয়েছে। সে এখন হাঁটাহাঁটি করতে পারে। মহেন্দ্রনাথকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গাজীপুরে পাঠানো হয়েছে, এই মাসের শেষ নাগাদ সে ফিরে আসবে। শুনেছি, ওখানে তার অবস্থা ভালো নয়। আমার মনে হয় তার অসুস্থতা অনিয়মিত অভ্যাসের জন্য নয়, মানসিক ও বর্তমান অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার চিন্তায়। আর যে পর্যন্ত না ঐসব চিন্তা দূর হচ্ছে, তার শরীর ভালো থাকবে না ও সে আনন্দেও থাকতে পারবে না।

---

১ "বিবেক জ্যোতি"—হিন্দি মাসিক পত্রিকা,
সম্পাদকঃ স্বামী বিদেহাত্মানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রম, রায়পুর (ছত্রিশগড়) কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৭, "স্বামী বিবেকানন্দ ঔউর রাজস্থান", পৃষ্ঠাঃ ৪৩১

আশাকরি মহারাজের শিশুপুত্র শারীরিক কুশলে আছেন, মহারাজ ও তাঁর পরিবারের সকল কাজ, আশাকরি, ঠিক মতো চলছে। মহারাজ এবং তাঁর সন্তানসহ পরিবারের সকলকে শুভকামনা জানাচ্ছি। আশাকরি আপনিও ভালো আছেন, এখানে আমরা সকলে ভালো আছি।

মহারাজের জন্য আশীর্বাদ এবং প্রার্থনা সহ—

আপনার বিশ্বস্ত
রামকৃষ্ণানন্দ
প্রযত্নে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল (লিখিত)
গভর্নমেন্ট স্টেশনারী অফিস, কলকাতা[১]

(৫)

কলকাতা
২৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৩

প্রিয় মুন্সীজী,

আমার বিশ্বাস—ধর্ম্মমহাসভার শেষে আমার অতি শ্রদ্ধেয় গুরুভাই বিবেকানন্দকে, তাঁকে আমেরিকানরা তাঁর মহত্ত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তা আপনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে পড়ে থাকবেন। এখানে কলকাতায় প্রতিদিন এই সব পড়ে আমরাও খুবই আনন্দিত। মহারাজ স্বামীজীর সম্পর্কে আনন্দ সংবাদ শুনে খুশি হবেন মনে করে আমেরিকার সংবাদ পত্রের কয়েকটি খবরের নমুনা এইসঙ্গে রইল।

বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত ভাষণগুলির মধ্যে অধিকাংশই বাগ্মিতাপূর্ণ ছিল, তবুও ধর্ম্মমহাসভার মূল নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঐ হিন্দু সন্ন্যাসী যত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঐ রকম আর কেউ করেন নি। আমি তাঁর পুরো বক্তৃতা উদ্ধৃতি করছি, কিন্তু শ্রোতার উপর তাঁর যা প্রভাব পড়েছিল, সে সম্পর্কে এইমাত্র বলতে পারি যে তিনি দৈবী-অধিকার সম্পন্ন বক্তা। তিনি নিজের সরল ও মধুর ভাষণ, তাঁর গৈরিক বস্ত্র ও মেধাদীপ্ত তেজস্বী মুখমণ্ডল অপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয় ছিল।

"তাঁর শিক্ষা, বাগ্মিতা, মনোহর ব্যক্তিত্ব আমাদের সামনে হিন্দু সভ্যতার

১ বিবেক জ্যোতি, ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৫

এক নবীন ধারাকে তুলে ধরেছে। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল, গম্ভীর এবং সুললিত স্বর অনায়াসে মানুষকে বশীভূত করে ফেলেছে। আর এই দৈবী সম্পদের সহায়ে ঐ দেশের অনেক গির্জা ও অন্যান্য স্থানে তাঁর বক্তৃতাতে তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে জানতে পেরেছি, তিনি কোন প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই ভাষণ দেন। নিজের বক্তব্য ধারাবাহিকতার সঙ্গে বলতে বলতে অপূর্ব কৌশল ও আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চতানে নিয়ে যান। তিনি বলতেন অন্তঃস্তল থেকে। আর সেইসঙ্গে ছিল তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতা।" —নিউইয়র্ক ক্রিটিক

"বিবেকানন্দ মহাসভার মহানতম ব্যক্তি। তাঁর বক্তব্য শোনার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে ঐ প্রজ্ঞাবান রাষ্ট্রে ধর্মপ্রচারক পাঠানো মূর্খতা।"

—হেরল্ড

আমাদের এখনও তাঁর প্রতিলিপি পাবার সৌভাগ্য হয়নি, তবে তা শীঘ্র পাবার আশা করছি। আমাদের একজন বন্ধু মিস্টার ব্যারোজকে চিঠি লিখে ঐ মহাসভার সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাঠানোর জন্য অর্থ পাঠিয়েছেন, যাতে স্বামী বিবেকানন্দের পুরো বক্তৃতাগুলি আমরা পাই এবং সেগুলি ছাপাতে পারি। এগুলি আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের আগামী জন্মদিনে হাজার হাজার ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করতে পারি। তা প্রকাশিত হলে সর্বপ্রথম তা আমরা মহারাজের পড়বার জন্য পাঠাব। কিন্তু ইতোমধ্যে যদি মহারাজ (তাঁর) স্বামীজীর সম্পর্কে কোন সংবাদ পেয়ে থাকেন, তা কি কৃপা করে আমাদের পাঠাবেন?

গতকাল বিকালে মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছি। সে তার মা, ভাই ও অন্যান্যদের সঙ্গে ভালো আছে। সে বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তার কলেজের বাৎসরিক খরচ তথা পরীক্ষার ফি ১২৫/- টাকা জমা করা ও সেইসঙ্গে সংসার চালানোতে অসুবিধা আছে। আবার যদি ৫ জানুয়ারি ১৮৯৪-এর মধ্যে ফি জমা দেওয়া না হয়, তবে কলেজ থেকে তার নাম কেটে দেওয়া হবে। মহারাজ নিজে যখন স্বামীজীর পরিবারের প্রতি এত সহানুভূতিশীল, সাহায্য আসবেই ও চিন্তার অবসান হবে। মহারাজ, রাজকুমার এবং তাঁর পরিবারকে আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাবেন। আশাকরি আপনাদের সকলের শরীর ভালো। রাজকুমার দিন দিন আনন্দে বেড়ে উঠুক।

ম্যালেরিয়াতে ভোগার পর আমরা সবাই ভালো আছি। আমার প্রিয় মুন্সীজী আপনাকেও জানাচ্ছি আশীর্বাদ।

আপনার বিশ্বস্ত

রামকৃষ্ণানন্দ

প্রযত্নে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল

গভর্নমেন্ট স্টেশনারী অফিস, কলকাতা[১]

(৬)

কলকাতা

১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

প্রিয় মুন্সীজী,

আপনাকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের অতিপ্রিয় গুরুভাই স্বামী বিবেকানন্দের একটি চিঠি পেয়েছি। তিনি এখনও শিকাগোতে ভালো আছেন। আপনি শুনে খুশি হবেন যে আমেরিকা তাঁর খুব প্রশংসা করেছে। তাঁরা তাঁর সকল উদ্দেশ্যের জন্য সহায়তা করছেন। হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ তাঁর কথা শোনার জন্য তাঁর চারপাশে জড় হন এবং কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে ঘুরছেন। তাঁরা তাঁকে ভালোবাসেন, সম্মান করেন, গুরুর মতো শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁকে একদম ছাড়তে চান না। তিনি লিখেছেন—সেখানে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। পুরো দেশ অর্থাৎ উত্তর আমেরিকায় ২ থেকে ৫ ফুট বরফে ঢাকা আছে। নদী, সরোবর এমনকি বিশাল নায়াগ্রা জলপ্রপাত—সব জমে পাথরের মতো। হাতিরাও তার উপর দিয়ে সহজে রাস্তার মতো যেতে পারে। ঠাণ্ডা এত বেশি পড়ে যে দেশের উত্তর ভাগে সাধারণ থার্মোমিটার জমে যায় এবং অ্যালকোহল থার্মোমিটার ব্যবহার করতে হয়। আর আশ্চর্যের বিষয় যে সেখানে লোকেরা এক টুকরো বরফ না দিয়ে জল খায় না, কারণ তাঁদের গৃহ এবং যাত্রীবাহী গাড়ি যন্ত্রের সাহায্যে গরম রাখে। যদি কাউকে বাইরে যেতে হয় তবে তাকে গরম জামার উপর ফার কোট এবং উলের মোজার উপর চামড়ার জুতো পরতে হয়। ওখানে সবকিছুর দাম খুব বেশি। একজন কুলির দৈনিক মজুরি ৬ টাকা; একটি সিগারের দাম ৪ আনা, একজোড়া সাধারণ জুতো ২৪ টাকা এবং স্যুটের দাম ৫০০ টাকা। তিনি লিখেছেন—আমেরিকাবাসীরা কার্যকুশলতা ও বিলাসিতায়; অর্থ আয় ও ব্যয়ে অদ্বিতীয়। প্রথম দিকে তিনি (স্বামীজী) ভেবেছিলেন যে ওখানকার ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারবেন না, কিন্তু এখনও

১ বিবেক জ্যোতি, ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ২৩৫

পর্যন্ত সুস্থ-সবল আছেন, শুধুমাত্র দুঃখের বিষয় এই যে তাঁকে অনেক শীতবস্ত্র ব্যবহার করতে হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য ওখানকার মহিলারা বিদ্যা-বুদ্ধি, স্বাধীনতা এবং সহানুভূতির দৃষ্টিতে পৃথিবীতে সর্বোত্তম, বস্তুত তাঁরাই সমাজে সবকিছু এবং করুণা ও ধর্মপ্রাণতার প্রতিমূর্তি, এখানে এমন হাজার হাজার মহিলা আছেন, যাঁদের চরিত্র বরফের মতো শুচিশুভ্র।

আপনাকে মূল পত্রটি পাঠাতে পারলে আনন্দ হতো, কিন্তু দুঃখের বিষয় চিঠিটি বাংলায় লেখা এবং আমাদের মধ্যে অনেকের এখনও তা পড়া হয়নি। আমাদের ঠাকুরের জন্ম-উৎসব ১১ মার্চ ১৮৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যার জন্য আপনাকে দুটি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাচ্ছি—একটি আপনার ও অপরটি মহারাজের জন্য। যদি আপনি আমাদের এখানে আসতেন, তাহলে আমাদের বড়ই আনন্দ হতো। আমাদের ইচ্ছা যে আপনি এসে দেখুন ঐদিনের উৎসব কেমনভাবে হয়। কলকাতার উচ্চ তথা মধ্যবিত্ত ঘরের হাজার হাজার মানুষ—সংসারের দুশ্চিন্তা দূর করার ও শান্তি, সুখ ও প্রকৃত আনন্দ লাভের আশায় এই যোগোদ্যানে (দক্ষিণেশ্বরে) মিলিত হন, যেখানে আমাদের ঠাকুর বাস করতেন। দলে দলে লোক এসে সবকিছু ভুলে একসঙ্গে প্রার্থনা করে, গান করে। আর আমাদের ঠাকুরের ছিল সর্বগ্রাসী প্রেম, উদার শিক্ষা ও সহিষ্ণুতা। তাই যে যা আনে তিনি সব গ্রহণ করেন। এককথায় বলতে গেলে পুরো উদ্যানবাটী অসাধারণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। প্রভু অলক্ষ্যে থেকেও জাতি-মত নির্বিশেষে সকলের অন্তরে অধিষ্ঠান করে তাদের দুঃখ নিবারণ করে দেন এবং তাদের পরম সুখ, শান্তি ও আনন্দে ভরপুর করে দেন। আপনি কি এরকম অভাবনীয় দৃশ্য দেখতে আসবেন না?

কয়েকদিন আগে মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে, তার ছোট ভাই ও পরিবারের অন্য সকলে ভালো আছে। সে পড়াশুনাতে ব্যস্ত এবং প্রতিদিনই কোন না কোন বই পুনঃ পাঠ করে। তার পরীক্ষা সম্ভবত ২৬ তারিখে হবে। যখন মহারাজ স্বয়ং স্বামীজীর পরিবারের দেখাশুনা করেন, তখন তিনিই ভালো জানেন তাদের সাহায্য করবার উপায়; সেজন্য এই বিষয়ে আমার ভাববার কিছু নেই।

আশা করি মহারাজ, রাজকুমার ও তাঁর পরিবারের সকলেই সুস্বাস্থ্য, শান্তি

ও সমৃদ্ধি উপভোগ করছেন। আশাকরি আপনিও কুশলেই আছেন। মহারাজের জন্য আশীর্বাদ ও প্রার্থনা এবং আপনার জন্য শুভ কামনা।

আপনার বিশ্বস্ত
রামকৃষ্ণানন্দ
প্রযত্নে ঃ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল
গভর্নমেন্ট স্টেশনারি অফিস, কলকাতা[১]

(৭)

বিবেকানন্দের নিউইয়র্কের ছাত্রদের প্রতি

আলমবাজার মঠ
২৬.২.৯৬ (১৮৯৬)

প্রিয় বন্ধুগণ,

আপনাদের ২২ তারিখের টেলিগ্রাম আমাদের কাছে এসেছে। ঠিক এই সময়ে আমাদের অন্যতম ভাই স্বামী সারদানন্দকে ইংল্যান্ডে পাঠাবার তোড়জোড় করছিলাম। বর্তমানে অভূতপূর্ব আন্দোলনে নেতার ইচ্ছানুযায়ী তিনি ইংল্যান্ড যাচ্ছেন, যিনি সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের প্রতি যত্নবান এবং যিনি আপনাদের মধ্যে উদার ও সার্বজনীন মতবাদ ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাচ্ছেন, 'একীকরণ, ধ্বংসাত্মক নয়, সমন্বয় ও শান্তি এবং বিরোধ নয়'। প্রেমময় ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ সুরভিত সংবাদ হঠাৎ ও অভাবনীয়ভাবে এলো। আমাদের মঠে তা পরম গুরুত্ব পেল এবং অবিমিশ্র আনন্দের শতগুণ বৃদ্ধি হলো। এই সংবাদ এমন সময়ে এলো যখন আমাদের অন্তর ভালবাসায় পূর্ণ। আমাদের সমগ্র বিসৃত জগৎ এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছু কর্মক্ষেত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং আপনাদের ভাবপূর্ণ সংবাদ আমাদেরকে আরো সতেজ ও উদ্দীপিত করে তুলল, যা ইতোমধ্যে আমাদের অনুভূতিকে উদ্দীপিত করেছিল।

স্বামী সারদানন্দ ইংল্যান্ড যাচ্ছেন এবং মিঃ স্টার্ডির সঙ্গে থাকবেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেম ও করুণার বাণী প্রচারে সহায়তা করবেন। যদি নেতার ইচ্ছা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তিনি আপনাদের ওখানে (আমেরিকায়) যাবেন এবং আপনারা লাভবান হবেন—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধুমাত্র

---

১ Swami Vivekananda—A Forgotten Chapter of His Life, by Benishankar Sharma, Publishers : 1963, Oxford & Stationary Co. Page : 195-199

বিবেকানন্দের ঔজ্জ্বল্যের ও শক্তিতে নয়, কিন্তু তিনি তাঁর (স্বামী সারদানন্দের) মধুর ও অমায়িক ব্যক্তিত্বে শান্তি ও প্রেম বিলাবেন। আপনাদের শান্তি দেবেন যেখানেই তিনি যান না কেন। আপনারা তাঁর মধ্যে জগতের কোন কালিমা দেখতে পাবেন না। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। স্বামী বিবেকানন্দের অফুরন্ত শক্তি, প্রভূত নৈতিক বল অনুজ্জ্বল ও বিপরীত পরিবেশ সহজেই কাটিয়ে দিতে পারে। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে। অন্যদের কাছে তা রহস্যময় ও অবোধগম্য হতে পারে। তাঁর অন্তর মানুষের জন্য প্রেম-স্নেহের ভাণ্ডার। তাঁর মধুর স্বর ও ভাবপূর্ণ মনোরম মুখমণ্ডল। এগুলি হৃদয়ে অভ্যন্তরীণ মধুর অনুভূতি প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম। এসকল এই অত্যাধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দকে মহান সংস্কারক রূপে রূপান্তরিত করেছে। তিনি জগদম্বার উপযুক্ত আধার। এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অনিশ্চয়তা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে তাঁর বাণীই তাঁর নীতি। সত্যের জন্য তিনি এই কার্য গ্রহণ করেছেন। মানবজাতির জন্য তাঁর হৃদয় হতে আন্তরিক প্রেম উৎসারিত হতো। তাঁর অসাধারণ শক্তি এবং ভগবৎ কৃপাই হলো তাঁর চরম সাফল্যের অন্যতম কারণ। তাঁর ঘোরতর বিরোধীরাও এসকল একবাক্যে স্বীকার করেন। এই পুণ্য তারবার্তা ভারত ও আমেরিকার পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ, ভালবাসা ও হৃদয় মিলনের পরিচয়। এসব কোন পৃথক নয়। সমুদ্র দুটি দেশকে আলাদা করতে পারে কিন্তু তারা এক। সার্বজনীন উদারতার প্রবক্তা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁর এই মহৎ ভাব বিবেকানন্দের মাধ্যমে আবিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে এবং যিনি তাঁর উপযুক্ত শিষ্য—আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রাখুক—এই আমাদের প্রার্থনা।

আমরা সকলে আমেরিকার সকলের কাছ থেকে এই মহান কাজের সফলতা-বাণী মাঝে-মাঝে পেতে পরম আগ্রহী।

ইতি

আপনাদের

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

পুনশ্চ ঃ স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য কৃপানন্দ 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় সুন্দর চিঠি পাঠাচ্ছেন। এজন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। ঐ পত্রিকায় তাঁর পাঠানো চিঠি পড়ার জন্য আমরা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি। তিনি আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করলে আমরা অত্যন্ত খুশি হব।

(৮)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
১১.৯.৯৭ (১৮৯৭)

প্রিয় আয়েঙ্গার,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি এবং জেনে আরো খুশি যে শেষে তুমি সঠিক বস্তুর উদ্ভাবন করেছ। সন্তোষই এখানে একমাত্র নীতিবাক্য যা সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমাদের নিশ্চিত পথ। ঈশ্বরই শুভ। ভগবান সব করেন। সুতরাং তিনি ভালো বই মন্দ করেন না। এইটি সব ধর্মের শিক্ষা। এইটি পালন করলে মনের সন্তোষ ও শান্তি তখন স্বতঃই প্রবাহিত হবে। জানবে—আমি সর্বদা তোমার কথা ভাবি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তোমাকে নিরাপদে ও অক্ষতদেহে রাখুন।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

এন. কৃষ্ণ আয়েঙ্গার
সাব-ওভারসিয়ার
নম্বর ১৬৪, সুলতানপেট
ব্যাঙ্গালোর

(৯)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
২০-৯-৯৭

প্রিয় লালাজী,

তোমার ভালোবাসাপূর্ণ চিঠি পেয়েছি। স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দের খবর জেনে বেশ খুশি হয়েছি। আমেরিকার মিস মেরি ফিলিপের কাছ থেকে এইমাত্র আমরা চিঠি পেয়েছি। তাতে তিনি লিখেছেন—"৬ আগস্টে স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁদের সকলের তাঁর উপর খুব ভালো ধারণা হয়েছে। আমরা তাঁকে পেয়ে খুবই আনন্দিত।" সুতরাং আমি আশা করি আমাদের অভেদানন্দ কাজের ভালো ক্ষেত্র পাবে। তোমার ব্রহ্মবাদিনের বর্তমান রূপ কেমন লাগছে? আমার খুব পছন্দ হয়েছে। মিঃ গুড্‌উইন এই পত্রিকার জন্য খুবই পরিশ্রম করছে। তোমার

মতামত তাকে, আলাসিঙ্গা ও অন্যান্যদের জানাবে। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের কি খবর? সে কি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে? এখানে প্রচণ্ড গরম। কিছু কিছু বৃষ্টি হওয়ায় গরম কমেছে। আমার ক্লাস যথারীতি চলছে। তোমার এখন শরীর কেমন? তুমি কি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছ? তুমি কি তোমার আগের শক্তি ফিরে পেয়েছ? তুমি জয়রাম, ধনীলাল, মোহনলাল ও তোমার পরিবারের সকলে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। তোমার পুত্র সিদ্ধদাস কেমন আছে? আমার অসংখ্য ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাবে।

স্বামী সারদানন্দের লেখা বহু আমেরিকান সংবাদপত্রে প্রশংসিত হয়েছে। আমরা কয়েকটি আমেরিকান সংবাদপত্রের অংশ পেয়েছি যাতে শরৎবাবার বক্তৃতা ছাপা হয়েছে। সেগুলি খুবই চমৎকার ও সুন্দর। ব্রহ্মবাদিনের পরবর্তী সংখ্যাতে এগুলি প্রকাশিত হবে। তাহলে ঐগুলি পড়তে পারবে। পাশ্চাত্যে সারদানন্দ বিবেকানন্দের নাম রাখবে। আমি আশাকরি শীঘ্রই তোমার উত্তর পাব।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নেবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুনশ্চ ঃ স্বামী নির্মলানন্দ ও সুবোধানন্দ এখানে আছে। তারা রামেশ্বরম দর্শনে যাচ্ছে।

(১০)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
২-২-৯৮ (১৮৯৮)

প্রিয় শ্রীআয়েঙ্গার,

তোমার চিঠি পড়ে খুব খুশি হয়েছি। জেনে অত্যন্ত সুখী যে তুমি নিজেকে প্রভুর চরণে সঁপে দিয়েছ। এখন তুমি শান্তি ও আনন্দপূর্ণ জীবনের সৌরভ জেনেছ। এরূপ তোমার মনের অপরিবর্তিত অবস্থা থাকুক—শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এইটি আমার নিরন্তর প্রার্থনা।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুঃ পুস্তিকা ছাপা হবে। তোমাকে একটি কপি দেব।

(১১)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

২৭.৩.৯৮ (১৮৯৮)

প্রিয় শ্রীআয়েঙ্গার,

আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। এজন্য আমি চুপচাপ ছিলাম। আমি অত্যন্ত খুশি যে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর তুমি নিজেকে নির্ভর হতে শিখেছ। জীবনই অনবরত সংগ্রাম। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতেই হবে। ফল ঈশ্বরের হাতে। তোমার জয় বা পরাজয় যা হোক না কেন, একমাত্র সংগ্রামই কর্তব্য হওয়া উচিত। এগুলি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

শ্রীএন. কৃষ্ণ আয়েঙ্গার
সাব-ওভারসিয়ার
চিন্তামণি ওয়াটার ওয়ার্কস
চিন্তামণি, কোলার জেলা

[পিতা শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের তিনটি পত্র]

(১২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন, মাদ্রাজ

সেবকের অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম জানিবেন।

বাবা, আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রপাঠে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আপনার আশীর্বাদেই আমার মন সংসারের দিকে না গিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণে অভিলাষী হইয়াছে। এখানে একপ্রকার আছি, মন্দ নয়। সকলই আপনার আশীর্বাদ ও ভগবানের কৃপা। আপনি যে, আমাকে সংসারের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া ভগবানের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা কেবল আপনার ন্যায় পিতাতেই সম্ভব। আপনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। কিন্তু আমার পূর্ণ বিশ্বাস, আপনি যে শ্রীশ্রীশ্যামাদেবীর শ্রীচরণে আত্মবিসর্জন দিয়াছেন সেই

জগজ্জননী আপনাকে কখনও ঋণগ্রস্ত রাখিবেন না। মাঝে মাঝে হয়ত তিনি ভক্তকে এইরূপ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়কে আমার প্রণাম ও ভালোবাসা জানাইবেন। চারুর পত্রে জানিলাম যে, তাঁহার মাঝে মাঝে জ্বর হয়। তিনি এক্ষণে কেমন আছেন? আমি চারুকে 'ব্রহ্মবাদিন' তাহার অফিসের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছি। সে বোধ হয় এতদিনে সেগুলি পাইয়া থাকিবে এবং প্রত্যেক বারই যখন কাগজ বাহির হইবে, যাহাতে একখানি করিয়া নিয়মিতরূপে তাহার অফিসের ঠিকানায় পৌঁছায় সে বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। মা, জ্যেঠিমা প্রভৃতিকে আমার সাষ্টাঙ্গ নিবেদন করিবেন। চারু, সতীশ, নরেশ, প্রকাশ, রাম, নীরোদ, ক্ষীরোদ প্রভৃতি সকলকে আমার ভালোবাসা। ইতি

আপনার স্নেহাস্পদ সন্তান

শশী

(১৩)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন, মাদ্রাজ

৩-১১-৯৮

শ্রীশ্রীপিতাঠাকুর শ্রীচরণকমলেষু

বাবা, আপনার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি ৩০০্ টাকার জন্য নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যেখান হইতে পারি আপনাকে জোগাড় করিয়া দিতে চেষ্টা করিব। জ্যাঠা মহাশয় এবং জ্যাঠাইমাকে আমার প্রণাম ও ভালোবাসা জানাইবেন এবং আপনি জানিবেন। সমস্ত ছেলেদের আমার ভালোবাসা।

ইতি

আপনার সন্তান

শশী

(১৪)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন, মাদ্রাজ

১৭ নভেম্বর ৯৮

বাবা,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনি ওখানে টাকার জন্য অপেক্ষা না করিয়া কলকাতায় মঠে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি আপনাকে ৩০০্ টাকা দিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে। আপনি তজ্জন্য

নিশ্চিন্ত থাকিবেন। জ্যাঠা মহাশয় ও জ্যাঠাইমাকে আমার প্রণাম জানাইবেন এবং আপনি জানিবেন। আপনার আশীর্বাদে আমি এখানে একপ্রকার ভালো আছি। ছেলেদের সকলকে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। অনুগ্রহ করিয়া পত্রের উত্তর দিয়া নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি—

আপনার সন্তান
শশী

[এই চিঠি তিনটি বাংলায় লিখিত। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মেদিনীপুর, ১৩৫৫, পৃঃ ৩১৯-৩২১]

(১৫)
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
২৮-৭-৯৯

প্রিয় লালাজী,

আমার স্বাস্থ্যের বিষয়ে খোঁজ নেবার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি জেনে অত্যন্ত দুঃখিত যে তুমি জ্বরে খুব ভুগছ। শ্রীগুরু মহারাজের কৃপায় আশাকরি, তুমি শীঘ্রই সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠবে। আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তুমি, সিদ্ধদাস ও পরিবারের সকলে জানবে। শ্রীগুরু মহারাজের কৃপায় আমি ভালো আছি এবং যথারীতি কাজ করছি। আমি শুনেছি যে একজন নূতন মঠে যোগদানের জন্য গেছে। তুমি কি শুনেছ?

এই চিঠি পাবার পূর্বে আশাকরি তুমি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে এবং এজন্য শ্রীগুরুমহারাজের কাছে প্রার্থনা করছি। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(১৬)
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
২২-২-০১

প্রিয় রঙ্গস্বামী,

... পোস্ত, পান, ফুল, ফল ঠিক সময়ে পাঠাবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ

জানবে। এগুলি ২০ তারিখে শ্রীগুরুমহারাজকে ভোগ দেওয়া হয়েছে। তাঁর জন্ম সময়ের ঠিক এক ঘণ্টা পূর্বে ফুল পৌঁছেছে। প্রত্যেকটি জিনিস খুব ভালো ও সুন্দরভাবে প্যাক করা হয়েছে। ফলগুলি সন্ধ্যায় নিবেদন করা হবে। রান্না খুবই ভালো ছিল। রাত বারোটায় হোম সহ পূজা শেষ হয়েছিল।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(১৭)
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
২৮-৮-০১

প্রিয় লালাজী,

এইমাত্র তোমার চিঠি ও ফলের পার্শেল পেলাম। তোমার ভালোবাসা ও দয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। শ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় এখন আমি ভালো আছি। তোমরা ওখানে কেমন আছ? আশাকরি শ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় তোমরা সকলে ভালো আছ। তোমার স্বাস্থ্য শরীর ও মন ভালো থাকার জন্য আমি তাঁর কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি। স্বামী প্রেমানন্দজী এখন কোথায়? শ্রীকে. কে. ঠাকুর কতদিন ওখানে থাকবেন?

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সকলে জানবে। সিদ্ধদাস কেমন আছে? আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তাকে জানাবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(১৮)
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
১৪-১২-০১

প্রিয় লালাজী,

তোমার চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। তোমায় বলতে আমি দুঃখিত যে বর্তমানে আমার সঙ্গে এমন কারুর পরিচয় নেই যে ঐ সব তথ্য দিতে পারবে যা তুমি আমার কাছ থেকে চেয়েছ। আমি ভেবেছিলাম যে আলাসিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা

করব। কিন্তু বেচারী, সে তার দুটি ছেলেকে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে হারিয়েছে। যাইহোক, আমি তোমাকে যতশীঘ্র প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করব যখন আমার ক্লাস আরম্ভ হবে। এ বছর আমি ক্লাস বন্ধ রেখেছি।

এক্ষেত্রে আমি আমার ব্যবসায়ী ছাত্রদের কাছে হিমালয় হতে বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র সম্বন্ধে খোঁজ নেব। আমি শুনে খুশি যে তোমরা সকলে ভালো আছ। শ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় আমি খুব ভালো আছি। গুজব রটেছে যে স্বামীজী এখানে শীঘ্রই আসছেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ভালো নেই। সেজন্য এখানে তাঁর আসার বিষয়ে আমাদের খুব সন্দেহ আছে। যাইহোক, এটা সত্যি যে মিস ম্যাকলাউড তাঁর জাপানী বন্ধুদের নিয়ে আমাদের স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সিদ্ধদাস, তুমি ও তোমার পরিবারের সকলে জানবে।

ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(১৯)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন

২৮-১-১৯০২

প্রিয় শ্রীআয়েঙ্গার,

শ্রীগুরুমহারাজের সেবায় চন্দন ধূপকাঠি পাঠাবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ ব্যাঙ্গালোর থেকে শ্রীবিলিগিরি ফিরে এসেছে। আমি শুনেছি যে তার টুমকুর অয়েল মিলে তোমাকে মাসিক ৩০ টাকা বেতনে একটি পদের জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। এর চেয়ে আর কি ভালো হতে পারে? তুমি ওখানে শীঘ্রই যোগদান করছ না কেন? আমি জোর করে বলতে পারি যে এতে তোমার বেশ ভালো হবে। তোমার অভিজ্ঞ বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে যত তাড়াতাড়ি পার ওই পদে যোগ দাও।

শ্রীগুরুমহারাজের জন্মতিথি আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি এবং সাধারণ উৎসব ২৪ ফেব্রুয়ারি (রবিবারে) হবে। তোমার কাছ থেকে শীঘ্রই জানতে চাই।

ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(২০)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
২-৫-০২

প্রিয় বন্ধু

ব্যাঙ্গালোরে বেদান্ত সোসাইটি, মঠ ও অনাথালয় স্থাপনের জন্য মহীশূরের মহারাজের কাছে তোমার আবেদনে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আমাদের শ্রীগুরুমহারাজ ও প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তোমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তোমাকে আমার আপনজন করে নিয়েছে। আমাদের দুজনের মধ্যে একই আধ্যাত্মিক রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তোমার মহান উদ্দেশ্য সফল হবার জন্য ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন।

আমাদের স্বামীজীর শরীর ভালো ও সন্তোষজনক নয়। শ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় তিনি প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। সকলের জন্য এটি প্রকৃত ভালো সুখবর—যাঁরা আমাদের স্বামীজীকে ভালোবাসেন। আমাকে তোমার নিজের মনে করা উচিত। যখনই তোমার কোন প্রয়োজন হবে, আমি সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার ডাকে সাড়া দেব। তোমার এই মহান প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তুমি এবং সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও সদস্যরা নেবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(২১)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
২-৬-০২

প্রিয় শ্রীভেঙ্কটরঙ্গম,

খুব ভালো আমের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আশাকরি তোমার নতুন বেদান্ত সোসাইটির কাজ ক্রমশ অগ্রগতি হচ্ছে এবং মহীশূর মহারানির সমর্থন লাভ করেছে। সব কিছু বিস্তৃত শুনতে ইচ্ছা করি।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুনশ্চ ঃ হাওড়ার বেলুড় মঠেতে আমাদের স্বামীজী অপেক্ষাকৃত ভালো আছেন।

(২২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি

ট্রিপ্লিকেন
মাদ্রাজ
২৭-১-০৩

প্রিয় ডাক্তার,

যেহেতু স্বামী বোধানন্দ চলে আসছেন, সেজন্য স্বামী বিমলানন্দ আগামী সন্ধ্যায় যাত্রা করছেন।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

ডাঃ পি. ভেঙ্কটরঙ্গম (আলসুর, ব্যাঙ্গালোর)

(২৩)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
১২-০৫-০৩

প্রিয় জি. জি.,

গতকাল আমি এখানে পৌছেছি। তোমাদের কাছে যেতে বড্ড উৎসুক, কিন্তু ত্রিবান্দ্রমে ক্রমাগত বক্তৃতার জন্য আমি খুবই ক্লান্ত। মনে করছি এক মাস বা তারও পরে আমি তোমাদের কাছে যাব। অনেক দিন থাকবো ও শ্রীগুরুমহারাজের বাণী প্রচার করব। ত্রিবান্দ্রমের লোকেরা শ্রীগুরু মহারাজের ও শ্রীস্বামীজীর খুব অনুরাগী। তাঁরা ওখানে একজন স্থায়ী স্বামী চাইছেন। আমাদের কাজ ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। ঈশ্বর যেখানে সাফল্য চান, সেখানে কোন শক্তি নেই তা খর্ব করার বা বাধা দেবার। নিকট ভবিষ্যতে তোমাদের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করব।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তুমি ও বেদান্ত বা বিবেকানন্দ সোসাইটির সদস্যরা জানবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুনশ্চঃ তোমার শাশুড়ি অপেক্ষাকৃত ভালো। আমি আর. এ-এর কাছে শুনেছি। আগামী কাল তাকে দেখতে যাচ্ছি। দুলকাপুরের শ্রী আর. রাও এখানে এসেছিলেন। আগামী কাল তিনি ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছেন। তুমি তাঁর কাছ থেকে সব জানতে পারবে।

(২৪)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন, মাদ্রাজ
১৫-০৫-০৩ (১৯০৩)

প্রিয় তাম্বি,

গত সোমবার আমি দিয়েছি। আমার সঙ্গে স্বামী যোগেশ্বরানন্দ আছে। সে তোমাদের ওখানে যেতে ও কাজ করতে রাজি। যদি তুমি ঐ স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ছাত্রদের উপর প্রভাব খাটাও, আর সেই সঙ্গে তার নিত্য খরচের জন্য কমপক্ষে পনেরো বা কুড়ি টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

তার বাসস্থানের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তার কোন অসুবিধা না হয়। আমি তোমার ঘর দেখিনি। এটি যদি তুমি উপযুক্ত মনে কর, তাহলে তা মহামান্য মহারাজার উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা কর এবং কি হলো আমাকে লিখবে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(২৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
২-০৬-০৩

প্রিয় তাম্বি,

তোমার চিঠি পড়ে আমি অত্যন্ত খুশি। তুমি প্রকৃত ভগবানের সেবক। ভগবান তোমাকে অজস্র আশীর্বাদ করুন। আমি আমাদের প্রেসিডেন্টকে লিখেছি স্বামী যোগেশ্বরানন্দকে তোমার ওখানে পাঠাতে। যখনই আমি তাঁর কাছ থেকে

অনুমতি পাব, তখনই তোমাকে জানাব। আমি নিশ্চিত যে তিনি তা দেবেন। তখন তোমাকে যোগেশ্বরানন্দের যাতায়াতের খরচা পাঠাতে বলব। আমি তোমাকে জোর করে বলতে পারি যে আমাদের সন্ন্যাসীদের মধ্যে সে একজন পণ্ডিত ও অমায়িক এবং তোমাদের কাছে প্রেরণা স্বরূপ। সংস্কৃতে খুবই পারদর্শী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নে এম.এস.সি। সুতরাং তুমি সহজেই বুঝতে পারছ যে তার বক্তৃতা সেকেলে হবে না। বরং সকলের উপযোগী হবে, এমনকি, পাশ্চাত্যভাবাপন্নদেরও ভালো লাগবে।

তুমি ও আর সকলে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। তোমার বাবা ও ছেলেদেরকে আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(২৬)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ক্লোরেনডন হল
আলসুর, ব্যাঙ্গালোর
২১-০৭-০৩

প্রিয় শ্রীপদ্মনাভন তাম্বি,

তোমার চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, তোমার চিন্তাধারা একেবারে ঠিক। একজন সন্ন্যাসীকে তোমাদের ওখানে পাঠাতে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী উপযুক্ত সময় মনে করছেন না। আমি তোমার চিঠি পড়ে খুব খুশি যে তুমি আমিষ আহার ত্যাগ করেছ। যদি তোমার নিরামিষ আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, তাহলে সেটাই ধরে রাখা উচিত। তোমার ধ্যানে যা ঘটছে, তা ঠিক—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। একটি বিষয়ে তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই। তা হলো তোমার মনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মূর্তি চিন্তা করার জন্য তুমি তোমার মস্তিষ্কের উপর অযথা জোর করো না। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হলো প্রকৃত ধ্যানের মূল কথা। যে কোন প্রকারে তোমার মস্তিষ্কের উপর চাপ দিও না। যদি মূর্তির চিন্তা উদয় হয়, তাহলে ওদিকে মন দেবে না। এসব আসতে যেতে দাও। এসবের জন্য তুমি শান্তভাবে দ্রষ্টার মতো থাক। আমি জেনে খুশি যে ত্রিবান্দ্রমের আমার সকল ছাত্র ও বন্ধুরা আমাকে এখনও মনে রেখেছে। শ্রীভগবান তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

পুনঃ আমি এখন ব্যাঙ্গালোরে। আমি এখানে বক্তৃতা দিতে এসেছি। আমাদের ব্যাপারে এখানকার লোকেরা খুবই দয়ালু ও উৎসাহী। তাঁরা এখানে স্থায়ী কেন্দ্র আরম্ভ করছেন।

(২৭)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন

২৭-০৮-০৩

প্রিয় ডাক্তার,

তোমার ব্যবস্থামতো স্বামী যোগেশ্বরানন্দ ৫ তারিখ সন্ধ্যায় রওনা হবে। এবং পরের দিন ৬ তারিখের সকালে পৌঁছাবে। মিঃ পিল্লানাকে এ সম্বন্ধে জানিও যাতে সে ভুল তারিখ না ছাপে। প্রেসিডেন্ট মিঃ নারায়ণ আয়েঙ্গারকেও জানিও। আমি জেনে অত্যন্ত খুশি যে সোসাইটির জন্য একটি ভালো বাংলো সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছ। ঈশ্বর তোমাদের এবং রামকৃষ্ণ মিশন সদস্যদের আশীর্বাদ করুন।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

পোস্টকার্ড ঃ

ডাঃ পি. ভেঙ্কটরঙ্গম

তত্ত্বাবধায়ক, হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারী

আলসুর, ব্যাঙ্গালোর

(২৮)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন

১৪-৯-০৩

প্রিয় ভেঙ্কটরঙ্গম,

ব্রহ্মচারী যোগেন্দ্রনাথ আজ সন্ধ্যায় ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছে। সে তোমার প্রত্যক্ষ

তত্ত্বাবধানে তোমার সঙ্গে থাকবে। তাকে যত্ন করবে। সে খুবই ভালো ব্রাহ্মণ বালক।... আমি অত্যন্ত সুখী হবো যদি তুমি তাকে ভাই-এর মতো শ্রদ্ধা কর। আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সকলে জানবে।

পুঃ কাজ কি রকম চলছে? স্বামী কেমন আছে?

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পোষ্টকার্ড
ডাঃ পি. ভেঙ্কটরঙ্গম
তত্ত্বাবধায়ক, হাসপাতাল
আলসুর, ব্যাঙ্গালোর

(২৯)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Triplicane
16.09.03

My dear Suresh,

তোমার পত্র ১ পোঃ কাঃ পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। মিঃ পিলেনা যদি কোন agreement এর ভিতর না আসে, তাহাকে আমাদের seal ব্যবহার করিতে দিও না। We should be us one body; Narayana Aiyengar should be the general President & Dr. P. Venkatarangam should be the general Secretary. Everything should be under direct supervision.

Yours affly Ramakrishnananda.

India Post Card
The Swami Yogeswarananda
C/o. Dr. P. Venkatarangam
Incharge of the Hospital
Ulsoor, Bangalore

(৩০)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

12.10.03

My dear Suresh + Yogen,

আজ নিরাপদে এখানে পঁহুছিয়াছি। এখানকার সকলই মঙ্গল। বসন্ত ও কালী

ভালো আছে। কালী শীঘ্রই কলকাতায় যাইবে। তুলসী Bombay দিয়া America যাত্রা করিয়াছে। মাদ্রাজে আসে নাই। তুমি কার্পেটের জুতা পায়ে দিও। তাহাতে দোষ হইবে না। কিন্তু কেহ ওরূপ জুতা দিতে চাহিলে আর লইও না। আমরা যত সাত্ত্বিক ভাবে থাকিতে পারিব ততই ভালো। যোগীনের কাপড় নাই। তাহাকে এক জোড়া কাপড় কিনিয়া দিতে কহিও। তোমরা দুজনেই আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিও। ইতি

তোমাদের রামকৃষ্ণানন্দ

(৩১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

১২-১০-০৩

প্রিয় ডাক্তার,

আজ সকালে ভালো মতো পৌঁছেছি। আমার জন্য তুমি যা করেছ—সেজন্য ধন্যবাদ জানাই। শ্রীগুরু মহারাজ তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। বেদান্ত সোসাইটির সকল সদস্যদের এবং যাঁরা স্টেশনে আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন—সবাইকে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাবে। তুমি তোমার শরীরের যত্ন নেবে। একসঙ্গে অনেক কাজ নিজের দায়িত্বে নেবে না।

ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৩২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন

১৬-০১-০৪

প্রিয় ডাক্তার ও জি.জি.,

স্বামী যোগেশ্বরানন্দ সম্বন্ধে তোমাদের উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। শীঘ্রই তাকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তার অসংযততার বিষয়টি আমাদের অধ্যক্ষ ইতোমধ্যে জেনেছেন। তিনি চান না এরূপ লোক মিশনের প্রতিনিধিত্ব করুক। এই সময়কালে তোমরা তার সঙ্গে আমাদের প্রিয় স্বামীজীর গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করবে না। সে সামান্য ও তুচ্ছ প্রাণী। একমাত্র স্বামীজীর আশীর্বাদে

সে বর্তমান পদে আছে এবং সে নিজেই তা খর্ব করেছে। তার বিকৃত মনের প্রকৃতি দেখ! বর্তমানে সে যা করছে, তাই করতে দাও। তার সময় হয়েছে এবং তাকে চিরতরের জন্য এ-স্থান ত্যাগ করে যেতে হবে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৩৩)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
১৬-০২-০৪

প্রিয় ডাক্তার,

তোমার জন্য সুখবর আছে। আমাদের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কৃপা করে আত্মানন্দজীকে ব্যাঙ্গালোরে কাজ করতে আদেশ করেছেন। সে এখন ব্যাঙ্গালোরে আছে এবং স্বামী বিবেকানন্দজীর খুব প্রিয় শিষ্য ও ভালোবাসার পাত্র। এ খবর তুমিই শুধু জানবে এবং একমাত্র জি.জি. কে বলবে। শ্রীগুরু মহারাজের জন্মতিথি পূজা দর্শন ও যোগদানের জন্য আগামী কাল আসছ না কেন? তোমাকে এখানে দেখলে আমি বাস্তবিকই খুব সুখী হব, যদি তুমি তোমার হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছুটি নিতে পার। তোমার দুঃখ পাওয়া উচিত নয় এই চিন্তা করে যে কারুর খারাপ কাজের ফলে স্বামীজীর নাম ক্ষতি হতে পারে। যদি মানুষ নিজের উপর থুতু ফেলে, তাহলে থুতু তাকে নোংরা করে দেবে। শ্রীরামকৃষ্ণের অপার কৃপায় সব ঠিক হবে। তাঁর পবিত্র মিশনে কোন বিপথ চালিত হবে না। যখন আমি এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করব, তখন আমি ঠিকানা দেব যেখানে তাকে টাকা পাঠাবে। যে স্বামী আসবে জি. জি. তাকে জানে। শ্রীশুকুলও জানে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুঃ বর্তমানে এই খবর খুবই গোপনীয় রেখো।

(৩৪)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
২২-০৩-০৪

প্রিয় ভেঙ্কটরঙ্গম,

স্বামী যোগেশ্বরানন্দ মিশনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেছে এবং সে স্বাধীনভাবে কাজ করবে। সে বলেছে যে আমাদের ভ্রাতৃ সঙ্ঘের অধীনে সে সেবা করতে সমর্থ হবে না। এইটি ভালো। সে স্বাধীনভাবে কাজ করুক। বৈচিত্র সর্বদা উচ্চ আদর্শ ধরে রাখে। আজ্ঞাবহতাই দৈবীগুণ ও অবাধ্যতা শয়তান তুল্য। সুতরাং তোমরা সেই সব দৈবী নিয়ম পালন করে ভালো করেছ, যা শ্রীস্বামী বিবেকানন্দজীর অন্তর থেকে প্রবাহিত হয়েছিল। ঐ নিয়মগুলি দৈবী মিশনের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমি সেই সকল বেদান্ত সোসাইটির সদস্যদের প্রতি সন্তুষ্ট যারা দেরী হলেও তাদের দাবী ত্যাগ ও তাঁদের একগুঁয়েমি ও কপটতা বর্জন করেছে। এটি তাদের নৈতিক মানসিক শক্তির পরিচয়।

শ্রীগুরুমহারাজ এরূপ সকল সৎলোকদের আশীর্বাদ করুন। স্বামী যোগেশ্বরানন্দের সংস্রব ত্যাগের কথা সকল বন্ধুদের জানিও। তার ও তার লোকজনের সাথে কেউ যেন আর যোগাযোগ না রাখে। সোসাইটিকে তোমরা সুদৃঢ় কর। সকল কপট ও বদ লোকেরা এখান হতে দূর হোক। এটি শ্রীভগবানের মিশন। সুতরাং মিশনের সকল সদস্যদেরও ঈশ্বর-তনয় হওয়া উচিত। আমাদের জন্য তোমরা যা দৃঢ়ভাবে স্থাপনা করেছ, তা কয়েকজন ভক্তের আন্তরিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তোমাদের মধ্যে আমি স্বামী আত্মানন্দজীকে পাঠাচ্ছি। এই স্বামীজী খুবই পবিত্র ও শ্রীস্বামী বিবেকানন্দজীর বিশ্বস্ত শিষ্য। তাঁর সঙ্গে যে কেউ ভাগ্যবান সংস্পর্শে আসবে তার মধ্যে স্বামীর পবিত্রতা স্বতঃই প্রবাহিত হবে। তোমরা সত্যিকারের খুবই ভাগ্যবান যে এরূপ স্বামীকে আচার্য হিসাবে পেয়েছ। তাঁকে সম্মান জানানোর অর্থ একজন মহান স্বামীকে সম্মান করছ।

কারুর সঙ্গে বিবাদ করো না। এটি তোমাদের মর্যাদাহানিকর।... আমি বলতে চাই যে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না যেহেতু তাদের সঙ্গ অপকৃষ্ট। রামকৃষ্ণ মিশনের আমাদের প্রিয় সোসাইটির সকল সদস্যদের ভগবান আশীর্বাদ করুন। ... আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুনঃ জি.জি., ভি.পি. মাধবরাও, ডাঃ পাল্পু, ডাঃ শ্রীনিবাস রাও, তাদেরকে আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাবে। আমাদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গারকে জানাবে।

(৩৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন

৮-০৪-০৪

প্রিয় ডাক্তার,

তোমার ভালোবাসাপূর্ণ চিঠি পেয়েছি। আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। তা হলো কোন কাজে কখনও তুমি তাড়াতাড়ি করবে না। খুবই ভালো সংবাদ। আরো ভালো যে স্বামী যোগেশ্বরানন্দ ওখান থেকে চলে গেছে। তোমার সুখী হওয়া উচিত যে তুমি এরকম জঘন্য রোগ থেকে মুক্তি পেলে, যা তোমাকে দীর্ঘকাল ভোগাচ্ছিল। এখন তুমি মুক্ত। নতুন করে কারও খপ্পরে পড়ো না—বাইরে থেকেও নয়, ভেতর থেকেও নয়। শান্ত হও, নীরব থাক। চঞ্চলতাই হলো রোগ।

স্বামী আত্মানন্দজী এখানে বেশ ভালো আছেন। আমি এ পর্যন্ত যাদের দেখেছি—তার মধ্যে সে খুবই শান্ত। এজন্য তুমি চিন্তিত হইও না। শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার আসুক এবং সে তার ও জি.জি.-র মতামত সহ আলোচনা করুক। যা ভালো মনে হয়, তাই করো। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ওখানে রোপিত হয়েছে। স্বর্গ বা পৃথিবীতে কোন শক্তি নেই যা একে ধ্বংস করতে পারে। তোমাদের সকলের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত—তোমাদের ওখানে পুনঃ শান্তি স্থাপন করতে সাহায্য করা। যদি সর্বনাশকারীরা তোমাদের জিনিসপত্র না দেয়—দিক—তাদের থাকুক। তোমরা নিজেদের বিব্রত করবে না। এরূপ ছোটখাট স্বার্থত্যাগ তোমাদের অবশ্যই করা উচিত। জানবে যে ধর্ম মানে দান, সন্তোষ ও ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৩৬)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন

২৫-০৫-০৪

প্রিয় ডাক্তার,

আম পাঠানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পি.বি. মুথাস্বামী মুদালিয়র আজ সকালে কিছু সব্‌জি ও তোমার আম নিয়ে এখানে এসেছিল। ঈশ্বর তাকে ও তার ভাবী স্ত্রীকে আশীর্বাদ করুন। সে খুব ভালো ছেলে।

আজ আমি শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গারের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। সে বিষয়টির প্রতি নিষ্ক্রিয় নয়। সে ও ডাঃ পাল্পু—উভয়েই রামকৃষ্ণ মিশনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছে। সুতরাং হে আমার প্রিয় ডাক্তার, তোমার শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গারের জন্য উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই।

ব্যাঙ্গালোর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনও মুছা যাবে না। তোমাদের মতো মানুষের অন্তরে তিনি বসেছেন। সুতরাং তাঁর কাজে কারুর ক্ষতি করা সম্ভব নয়। বিরুদ্ধ পক্ষের জন্য কখনও চিন্তা করো না। তাদের ছিদ্রান্বেষণ বা অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টি দেবে না। প্রস্তরের মতো দৃঢ় হও। শ্রীগুরু মহারাজের সর্বশক্তির উপর বিশ্বাস রাখো।

আমি শুনেছি যে তোমার সন্তানও স্বামীজীর সংস্পর্শে এসেছে। তাকে আমি দেখতে যেতে পারি। তুমি সত্যিই ভাগ্যবান যে শ্রীগুরুমহারাজ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তোমার ভক্তি আছে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৩৭)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন

১৩-০৬-০৪

প্রিয় রঙ্গস্বামী,

তোমার ভালো আম পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। এগুলি আমি

শ্রীগুরুমহারাজকে ভোগ দেব। আশাকরি তুমি ভালো আছ। এখানে অসহ্য গরম। আশাকরি ব্যাঙ্গালোরের ভক্তেরা ভালো আছে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৩৮)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মঠ

পোঃ বেলুড়, হাওড়া

০৪-০৭-১৯০৪

প্রিয় ভেঙ্কটরঙ্গম,

আমি এখন বেলুড়ে মঠে আছি। আমার অবসর না থাকায় আমি তোমাকে লিখতে পারিনি। এতে তোমার চিন্তা করা উচিত নয় যে আমার অবহেলার জন্য তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ। এক পক্ষকালের মধ্যে মাদ্রাজে ফিরে যেতে পারি। আমার অবর্তমানে স্বামী আত্মানন্দজী মঠের কাজকর্ম দেখাশুনা করছেন। আমি না যাওয়া পর্যন্ত তাকে ছাড়তে পারা যাবে না। তোমার প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। মাদ্রাজে শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গারের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, আমি তখন তাকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলুম। সে কি তোমার কাছে এসেছিল? সম্ভবত সে সময় পায়নি। আমাদের প্রেসিডেন্ট চান যে স্বামী আত্মানন্দজী ব্যাঙ্গালোরে থাকুন। তিনি তোমাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। আমি খুশি হব যদি তুমি তাঁর সান্নিধ্য পাবার জন্য আমার এখানে থাকাকালীন আস। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তা তোমার ছুটি পাওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তোমার আন্তরিক ও গভীর ভালোবাসার জন্য আমরা সর্বদা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। সত্যিই তুমি ভাগ্যবান। তিনি তোমাকে সর্বদা আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৩৯)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মঠ
বেলুড়—পোঃ
হাওড়া, বাংলা
২৮-০৭-০৪

প্রিয় ভেঙ্কটরঙ্গম,

তোমার চিঠি পেয়েছি। স্বামী আত্মানন্দজীর খরচের বাবদ মাসিক ২৫ টাকা করে দেবার জন্য ডাঃ পাল্পুকে ধন্যবাদ। আমি বেলুড়ে মঠে আছি। যতদিন না আমি ফিরে যাচ্ছি, ততদিন তাকে পাঠানো সম্ভব নয়। যখন আমি মাদ্রাজে যাব, তখন আমি দিন ঠিক করব। আমি প্রায় এক সপ্তাহ কাজের জন্য থাকব। আমি শোলাপুর যেতে পারি। প্রায় একমাস লাগবে। এজন্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ ডাঃ পাল্পু ও অন্যান্য বন্ধুদের জানাবে ও তুমি জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুনঃ আমি স্বামী আত্মানন্দজীর সঙ্গে ব্যাঙ্গালোর যেতে পারি।

(৪০)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
১০-০৮-০৪

প্রিয় রঙ্গস্বামী,

যেহেতু আমি ব্যস্ত ছিলাম বলে তোমার চিঠির উত্তর দিয়ে উঠতে পারিনি। এজন্য আমাকে ক্ষমা করো। শ্রীগুরু মহারাজের পূতাস্থি (রেলিক্স) আনতে পারিনি। আমি যখন ওখানে ছিলাম তখন অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি ঠিক জায়গাটা উপভোগ করতে পারিনি। কারণ, প্রায় প্রত্যেকেই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছিল। আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলাম। আমি শোলাপুরে এসেছিলাম। আমি শীঘ্রই ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছি। ওখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৪১)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন

১২-০৮-০৪

প্রিয় ডাক্তার,

আমরা ঠিক করেছি এখান থেকে সোমবার ১৫ এর সন্ধ্যায় রওনা হব। এবং পরের দিন মঙ্গলবার ১৬ এর সকালে পৌঁছাব। প্রয়োজনীয় টাকা পাঠিও—দুটি দ্বিতীয় শ্রেণি ও একটি তৃতীয় শ্রেণির ভাড়া আত্মানন্দজী, একজন রাঁধুনি ও আমার জন্য।

নারায়ণ আয়েঙ্গারকে আমি চিঠি লিখেছি। তুমিও লিখো। ডাঃ পাল্পুকে এ সম্বন্ধে বলো। তাকে আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানিও। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এখানে তাকে অভ্যর্থনা করতে পারিনি, যখন সে আমার কাছে এসেছিল। আমরা সমস্ত বন্ধুদেরই সহযোগিতা চাই। জি.জি. কেমন আছে? আশাকরি সে তার পরিবারদের নিয়ে ভালো আছে। তাকে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিও। আর তাকে বোলো যে আমি তার নিজের বাড়িতে দেখা করব।

স্টেশনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করো। আশা করি দেখা হবে। আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৪২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন

১৪-০৮-০৪ (১৯০৪)

প্রিয় শ্রীযুত চোকালিঙ্গম,

তোমার নিজের সম্বন্ধে পড়ে খুবই আনন্দিত হলাম। এ খুব ভালো কথা যে তুমি একজন যোগী হতে চাও। এসব চেষ্টা করার পূর্বে তোমাকে কয়েকটি

জিনিস অবশ্যই পালন করতে হবে। যেমন বাড়ি তৈরি করতে হলে ভিত তৈরি করতে হবে।

তোমার নিজের প্রতি এবং স্ত্রী-সন্তানাদি থাকলে তাদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হতে চেষ্টা কর। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের প্রতি যথাসাধ্য কর্তব্য পালন করে চল। দয়ালু, সৎ, সরল ও সত্যনিষ্ঠ হও। সর্বোপরি তোমার স্রষ্টা ভগবানের প্রতি তোমার যেন ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ থাকে। এইভাবে জীবন-যাপন করে চল—যতদিন না এটা তোমার স্বভাবে পরিণত হয়। কারণ এটা সত্য বলে জেনো যে, দেহ ও মনে পবিত্র ও শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কারো পুণ্যপীঠে প্রবেশাধিকার জন্মায় না। কারণ 'যোগ' বলতে মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে রাখা, প্রাণায়ামাদি ও বিভিন্ন অঙ্গ-বিন্যাসকেই বোঝায় না। যোগ হচ্ছে—চিত্তবৃত্তি বা কামনা-বাসনা থেকে মুক্তি লাভ। কেবলমাত্র পবিত্র ব্যক্তির পক্ষেই কুবাসনা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। সুতরাং তোমার মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হতে সতত সচেষ্ট থেকে নিজেকে শুদ্ধসত্ত্ব করে তোলার জন্য যত্নবান হও। আগে আদর্শ গৃহী হও, কারণ তা হওয়ার পরেই তোমার পক্ষে প্রকৃত যোগী হওয়া সম্ভব হবে।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।*

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৪৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ জয়তি

ট্রিপ্লিকেন
মাদ্রাজ, ২৫-১-০৫

প্রিয় ডাক্তার,

স্বামী বিবেকানন্দের কাপড়ের জন্য তোমার ১০ (দশ টাকা) পাঠানোয় অসংখ্য ধন্যবাদ। যেহেতু স্বামী বোধানন্দ এখন আসেনি, সেজন্য স্বামী বিমলানন্দকে শুক্রবারের আগে না পাঠানোর জন্য আমি দুঃখিত। পরের শনিবার-এর সন্ধ্যায় সে অবশ্য যাত্রা করবে এবং পরের দিন সকালে ব্যাঙ্গালোর

* প্রবুদ্ধ ভারত, ডিসেম্বর ১৯১৫, পৃঃ ২৩৭

সিটি স্টেশনে পৌঁছবে। তার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করো। সোজা মঠে নিয়ে যাবে এবং কিছু জল খাবার দেবে। দেখো, যেন সে অত্যধিক পরিশ্রম না করে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৪৪)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
৮-০২-০৫

প্রিয় ডাক্তার,

তোমার শীল পাঠানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। একেবারেই নাম পরিবর্তন করবে না। স্বামী আত্মানন্দকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমি স্বামী বোধানন্দকে পাঠিয়েছি। শ্রীগুরুমহারাজের জন্মোৎসব ১২ মার্চ পড়েছে। আর ৮ মার্চ তাঁর জন্মতিথি।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৪৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
১৭-০২-০৫

প্রিয় ডাক্তার,

'বিবেকানন্দ মঠ' বলার জন্য আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বর্তমানে লোকেরা ভুল ব্যাখ্যা করবে এবং ভাববে যে যোগেশ্বরানন্দের মঠ শ্রীরামকৃষ্ণের ও আমাদের মঠ বিবেকানন্দের অঙ্গীভূত। এবং যে লোকের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্ক নেই, তাকেও তাঁর আপন শিষ্যরূপে সহানুভূতির চক্ষে দেখ।

এই কারণে নামকরণটি খুবই আপত্তিকর। আর শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার ও ওখানকার স্বামীজীদের সঙ্গে আলোচনা না করে কোন কিছু করা উচিত নয়। অধিকাংশের মত অনুযায়ী চলা উচিত। এইটি শ্রীস্বামী বিবেকানন্দজী আমাদের করতে বলেছেন। সুতরাং প্রিয় ডাক্তার, মিশনের কোন সদস্যের মতের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার আমার ক্ষমতা নেই। তুমি প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে আলোচনা কর এবং অধিকাংশের মত এক হলে, সেটাই কর।

আমি তোমাকে তিন টাকা পাঠাতে বলেছিলাম যাতে স্বামীজীদের জন্য একজন রাঁধুনি এখান থেকে পাঠাতে পারি। তা শীঘ্রই পাঠিও।

নিয়মগুলি তোমার নিজের ব্যবহারের জন্য জানা ও লেখা উচিত। সেগুলি শ্রী স্বামী বিবেকানন্দ সকলের জন্য তৈরি করেছেন, যারা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করতে চায়।

শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার ও ডাঃ পাল্পু এগুলি পছন্দ করবে। তুমিও করবে, যখন তুমি স্বামী বিমলানন্দজীর কাছ থেকে জানতে পারবে। মঠে যাও এবং তোমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নিয়মগুলি লিখে নিও। কাউকে দেখাবে না। এগুলি মিশনের অন্তরঙ্গ সদস্যদের জন্য।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সকলকে জানাবে—স্বামীজীদেরকে, ব্রহ্মচারীকে, শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গারকে এবং তুমি নিজে নেবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৪৬)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
৬-০৫-০৫

প্রিয় ডাক্তার,

অনেককাল তোমার কাছ থেকে কোন খবর পাইনি। তুমি ও তোমার পরিবারের লোকেরা কেমন আছ? স্বামী বিমলানন্দ, বোধানন্দ ও ব্রহ্মচারী কেমন আছে? সকল বন্ধুদের আমার শুভেচ্ছা জানিও। দিন দুই আগে আমি

পুডুকোটালি ও ত্রিচিনোপুলি থেকে ফিরেছি। তোমার বন্ধু শ্রীচিদাম্বরম ও পুডুকোটালির অনেকেই আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিল। আমি সেখানে পাঁচদিন ছিলাম এবং সাতটি বক্তৃতা দিয়েছি। ত্রিচিতেও আমি তিনটি বক্তৃতা দিয়েছি। তুমি কি শ্রীগুরু মহারাজের জন্য ভালো আম পাঠাতে পার? স্বামী পরমানন্দ এখানে আমাদের কাছে আছে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৪৭)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
৬-১০-০৫

প্রিয় রঙ্গস্বামী,

খুব ভালো সব্‌জি পাঠানোর জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। সব্‌জিগুলি অত্যন্ত ভালো অবস্থায় আছে। শ্রীগুরু মহারাজ তোমাকে ও তোমার পরিবারকে সতত আশীর্বাদ করুন। বাংলার মানুষ এখন একতাবদ্ধ আছে। দেখা যাক, এরূপ চলে কি না। তুমি শুনে খুশি হবে যে সৈয়দাপেটে তোমার জামাতা আমার বক্তৃতা শুনেছে এবং একদিন তার বাড়িতে আমি ক্লাস নিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে সে খুব ভালো ছেলে।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুঃ তোমার স্ত্রী কেমন আছে? শুনেছি তার শরীর ভালো নয়।

(৪৮)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
২৪-১১-০৫

প্রিয় ডাক্তার,

তোমরা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ও শ্রীস্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে একদিন সাধারণোৎসব করতে মনস্থ করেছ শুনে আমি খুশি হয়েছি। দিনটি আবার স্থির

করবেন আমাদের পবিত্র মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী। সকল বিচক্ষণ সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই, যারা এমন ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সকলকেই আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাবে।

তোমার পরীক্ষায় তুমি কেমন করেছ? ফল বেরিয়েছে? যদিও তোমাকে কোন চিঠি লিখিনি, তবুও তোমার সাফল্য কামনা করে শ্রীগুরু মহারাজের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। ফল জানার জন্য উদ্গ্রীব। যখনই তুমি তা জানতে পারবে, তখনই আমাকে জানিও।

শীলটি আমার কাছে নেই। এটি প্রকাশক শ্রীনাটেশনের কাছে আছে। যখনই আমি তাঁর কাছ থেকে পাব, তখনই আমি তোমার কাছে পাঠাব। আমাদের মিশন কেন্দ্রগুলিতে প্রকাশনার নতুন বইগুলি পাঠাতে তাকে আমি বলব। স্বামী আত্মানন্দ ভালো নেই। পুরানো ডায়েরিয়াতে খুবই ভুগছে—একেবারে কঙ্কালসার চেহারা। আমরা খুবই সুগন্ধি ফুল পাচ্ছি। ওখানকার জলবায়ু কিরকম? খুব স্বাস্থ্যকর? ওখানে কি প্লেগ হয়েছে?

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৪৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

ট্রিপ্লিকেন

২০-০১-০৬

প্রিয় তাম্বি,

আমি জেনে সুখী যে তুমি উচ্চতর পদ পেয়ে তোমার নতুন বাড়িতে চলে গেছ এবং তুমি অন্তর্মুখিনতার ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছ। তোমার পাঠানো আট টাকা অত্যন্ত সময়োপযোগী। কারণ, অন্তত একদিন বহুমানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৫০)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
৩০-০৪-০৬

প্রিয় ডাক্তার,

তোমার চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। ব্যাঙ্গালোরে স্বামী বিমলানন্দজীকে রাখবার জন্য আমি মঠে লিখব। আমরা সবাই ভালো আছি। এখানে শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার ও তোমার দুজনের সঙ্গে দেখা হলে খুব খুশি হব। শ্রীগুরু মহারাজের জন্য কিছু আম পাঠিও।

স্বামী, যোগীন, জি.জি., ডাঃ পাল্পু এবং সকল বন্ধুদের আমার কথা বলো।

আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৫১)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Triplicane
10.3.06

My dear Haripada,

তোমার কার্ড পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। তুমি বোধহয় শুনিয়া থাকিবে যে নির্মলানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিতেছে, বোধ হয় সে এতদিনে মঠে আসিয়াছে। এইজন্য কালী মহারাজ আর একজনকে তাঁহার সাহাযার্থে চাহেন। কাহাকে পাঠান হইবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। তোমায় রাজাসাহেব শীঘ্রই পত্র লিখিবেন। তুমি ওখান হইতে কলকাতায় রওনা হইলে শুকুল ও বসন্ত তোমার স্থানে যাইবে। যোগীনকে আমি মাদ্রাজে লইয়া আসিব। আপাতত দিনকতক এরূপ চলুক, তারপর যদি তুলসী মহারাজ, Bangalore এ কার্য করিতে চাহেন তাঁহাকেই ওখানে আনা হইবে। তুমি আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে এবং যোগীনকে জানাইবে। খগেনকে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। আমি অদ্য তাহার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছি। হয়তো

আমি ও বসন্ত Bangalore এ শীঘ্র যাইতে পারি। Yours affly

রামকৃষ্ণানন্দ

Post Card
The Swami Bodhanandaji
Sri Ramakrishna Mission
Bangalore city

(৫২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
মাদ্রাজ

প্রিয় শ্রীআয়েঙ্গার,

তোমার দীর্ঘ চিঠি আমার কাছে এসেছে। এইমাত্র চিঠিখানা পড়লুম। যুবা বয়সেই ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই সক্রিয় হয়। তোমাকে নিজেকে অতি অবশ্যই শক্ত হতে হবে, যাতে এগুলি তোমাকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে। সাহায্যের জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। যুবকদের প্রধান শত্রু কাম। তুমি এখন কি করছ? তোমার উচিত সর্বদা কাজে আত্মনিয়োগ করা (দৈহিক ও মানসিক)। অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় অবশ্যই হাঁটবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সর্বদা তোমার মন মগ্ন রাখবে। প্রতিজ্ঞা কর যে কোন নারীর প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং একেবারেই লিঙ্গ স্পর্শ করবে না। দৃঢ় হও। জানবে যে তুমি ঈশ্বর এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভু। কেন তুমি ইন্দ্রিয়ের প্রভুত্ব স্বীকার করবে? দুর্বল মানুষ সমস্ত খারাপ লোকেরও আসক্তির শিকার হয়। দৈহিক দুর্বলতা যেমন খারাপ, তেমনি মানসিক দুর্বলতাও খারাপ। কোন রোগকে তোমার মধ্যে প্রশ্রয় দিও না। অক্ষমতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তোমার কিছু প্রতিরোধ করা উচিত। অক্ষমতা দেহ-মনে আরো দুর্বল হয়। তার ভগবানের কাছে যাওয়ার শক্তি নেই। সুতরাং যত শীঘ্র পার এই রোগ থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা কর। তোমার জীবনের গোপনীয় কথা কাউকে বলো না। এতে ভালো হবে না, অপর পক্ষে তা ক্ষতিকারক হবে। আমার সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রেখো। এখানেই থামছি।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৫৩)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মাদ্রাজ
২৩-০৭-০৭ (১৯০৭)

প্রিয় শ্রীনাইডু,

কয়েকটি পারিবারিক ও সামাজিক গোলযোগের দরুন তুমি নিদারুণ মানসিক অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছ জেনে খুব দুঃখিত হলাম। তুমি অতি সজ্জন, ধার্মিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি—এজন্য তোমাকে একটি কথা বলি। মনের প্রশান্তি হলো মানুষের একেবারেই নিজস্ব সম্পত্তি। এতে কারুর হাত দেবার অধিকার নেই। তোমার মানসিক প্রশান্তি বলয়ে কেবল পরম শিবমই শুধুমাত্র থাকবেন—তিনি তোমাকে শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন। ঐ শান্তি-নিলয়ে তুমি গৃহে বা সামাজিক ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রবেশ অধিকার দিচ্ছ কেন? আশাকরি এই চিঠি পাবার পূর্বেই তোমার মনে শান্তি ফিরে আসবে।*

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৫৪)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর
মাদ্রাজ
২১-১১-১৯০৭

প্রিয় নারায়ণ,

গত রবিবার শ্রীগুরুমহারাজ তাঁর নতুন বাড়িতে এসেছেন। শ্রীবিলিগিরির সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থেকে এই নবনির্মিত বাড়িটি দেখতে সুন্দর, বিস্তৃত ও আরামদায়ক। শ্রীগুরু মহারাজ ও তাঁর সেবক খুবই সন্তুষ্ট। তাঁরা নতুন জীবন, শক্তি ও উদ্যম পেয়েছেন। মধ্যবর্তী হলঘরে চেয়ারে তিনশ জন বসতে পারে। উপরে চার কোণে চারটি ঘর—খোলামেলা ও বেশ আরামদায়ক। নিকট ভবিষ্যতে এখানে আমি তোমার সঙ্গে কয়েকদিন থাকতে ইচ্ছা করি। রান্নাঘর, স্টোর ও স্নানের ঘর আলাদা। ডব্লিউ. সি বাইরে। পনেরোটি নারকেল গাছ, একটি বেলগাছ প্রাঙ্গণে আছে। এখান থেকে ডাঃ নাঞ্জুন্ডা রাও এর বাড়ি কয়েক

* প্রবুদ্ধ ভারত, অক্টোবর ১৯১৫, পৃঃ ১৯৩

হাত মাত্র দূরে। শহরের বিখ্যাত শিবমন্দির (শ্রীকপিলেশ্বরম) মাত্র কয়েক ফার্লং-ও হবে না।

স্বামী পরমানন্দ ও মিস গ্লীনের কাছ থেকে আমি চিঠি পেয়েছিলাম। তাঁরা তাঁদের কাজের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা খুবই চমৎকার ও অপ্রত্যাশিত। আমরা মনে করছি—এটি 'ব্রহ্মবাদিন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারতে' ছাপাব। ঈশ্বরের কৃপায় তার অনেক কাজ সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ভালো আছে—এ কাজে তার মতো যুবককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্গালোরে যে জমিতে স্বামী অভেদানন্দ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন, সে জমি কি তোমরা ক্রয় করেছ? জমি তোমাদের অধীনে আছে তো? তারপরে ক্রমে বাড়ি তৈরি হবে। আমাদের কাজ জীবন্ত মানুষের মতো স্বাভাবিক ও জীবনপ্রদ ভাবে বৃদ্ধি পাবে। হঠাৎ করে লাফিয়ে বাড়বে না। ভূত প্রেতাদির আবির্ভাবের মতো যা শুকিয়ে যায়। কোন উন্নতি হঠাৎ করে হয় না, কিন্তু ধীর ও নিশ্চিত ভাবে। সুতরাং ব্যাঙ্গালোরে মঠ তৈরির ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে না।

কিছুকাল পূর্বে তুমি আমাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছিলে। এই টাকা খরচ হবে আমাদের প্রেসিডেন্ট ও স্বামী প্রেমানন্দের কাপড় কিনবার এবং কিছু ভালো ফল সেখানে ও আমাদের শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির কাছে পাঠাবার জন্য। তোমার নামে দুজন স্বামীর জন্য ৩৫ টাকা ও শ্রীমাতাঠাকুরানির জন্য ১৫ টাকা পাঠিয়েছি। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি তাঁর সেবকদের মাধ্যমে তোমাকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন—"শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গারকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।" সুতরাং তুমি খুবই ভাগ্যবান।

আশাকরি তোমার কাছ থেকে শীঘ্রই উত্তর পাবো। আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৫৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মাদ্রাজ
০৫-১২-১৯০৭

প্রিয় নারায়ণ,

তোমার চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। খুব উদ্বিগ্নতা থেকে আমাকে মুক্ত

করেছো। তোমার অভিপ্রায়ের সব কথা আমি স্বামী আত্মানন্দজীকে লিখেছি। আশাকরি সে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে না। তার প্রধান উদ্দেশ্য মাসিক ৭ টাকা ঘর ভাড়া না দেওয়া। কিন্তু তুমি সম্পূর্ণভাবে ঠিক যে আমাদের প্রথমে উচিত ভগবানের জন্য বাড়ি তৈরি করা, তারপরে মানুষের জন্য। ইহা আমাদের জন্য নয়, ভগবানের মহিমার জন্য আমাদের কাজ করা উচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য তোমার মহান ত্যাগের আমি খুব প্রশংসা করেছি। তুমি তাঁর জন্য ইতোমধ্যে আড়াই হাজার টাকা ব্যয় করেছ। তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসার এইটি প্রমাণ। আমি ভালো ছিলাম না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমি এখন প্রায় সুস্থ। এই সঙ্গে স্বামী পরমানন্দের কার্যের প্রোগ্রাম পাঠাচ্ছি। কাজ হয়ে গেলে ফেরত দিও। তার কাজ আশ্চর্যজনক নয় কি?

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

শ্রীএম. এ. নারায়ণ আয়েঙ্গার, বি.এ.
এ্যাসিস্টান্ট কমিশনার
সকলেশপুর, মহীশূর রাজ্য

(৫৬)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ব্যাঙ্গালোর
০৮-০৬-০৮

প্রিয় লালাজি,

পোস্টকার্ডের জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বর্তমানে স্বামী আত্মানন্দজী ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। সিস্টার দেবমাতা ও আমি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য এসেছি। আবহাওয়া চমৎকার।

আশাকরি তিন চার মাসের মধ্যে এখানে আমরা আমাদের নতুন মঠ পাব। অর্থ সংগ্রহের জন্য আমরা প্রতিদিন বাইরে যাচ্ছি। মহীশূর সরকার আমাদেরকে পৌনে চার একর জমি দিয়েছেন। বাড়ি তৈরি আরম্ভ হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ছ-হাজার টাকা ব্যয় হবে। তোমার অবগতির জন্য আমি একটি আবেদন পাঠাচ্ছি।

আশাকরি তোমার ও তোমার পরিবার ও সিদ্ধদাসের শরীর ভালো আছে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সিদ্ধদাস ও অন্য সকলকে দেবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুঃ ঠিকানা
স্বামী আত্মানন্দজী
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
ব্যাঙ্গালোর সিটি, মহীশূর রাজ্য

(৫৭)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর
১৩-০৯-০৮

প্রিয় জয়ন্ত্রিস্বামী,

১০ তারিখের ভালো চিঠির জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি জেনে খুশি যে তুমি আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে (শশীনিকেতন, পুরী, উড়িষ্যা) কিছু রাঙালু পাঠাচ্ছ। আমিও শ্রীসোকানাথনকে লিখেছি। এই সময়ের মধ্যে সে আমার চিঠি পাবে। শ্রীস্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী হিসেবে সকলকে জানানো উচিত যে একই আত্মা বিভিন্ন ক্ষেত্রে খেলা করছে। তোমার প্রিয়পাত্ররূপে তোমার কাছে অনেকে আসবে। কিন্তু তোমার জানা উচিত যে অজ্ঞানই সকল মন্দের মূল। যখন অজ্ঞান দূর হবে তখন মন্দ সর্বোচ্চ প্রশংসায় রূপান্তরিত হবে। তোমাদের সকলের প্রতি রইল আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ।

আমি জানি—অজ্ঞানতাই তোমাকে ভোগাচ্ছে। যখন তা চলে যাবে তখন তুমি অন্য ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

সিলোনের কাজের জন্য কি একজন স্বামীকে পাঠানোর জন্য তুমি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে চিঠি লিখবে? ... তুমি কি রাঙা আলু পাঠিয়েছ? পরের চিঠিতে তা জানব আশাকরি।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

শ্রীসি.এস.জয়ন্ত্রিস্বামী
৩. প্রিন্সেস গেট
কলম্বো, সিংহল

(৫৮)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

২১-০৯-০৮

প্রিয় নারায়ণ,

সিস্টারের চিঠিতে যা লেখা আছে, তার জন্য তোমার উদ্বিগ্ন হবার কোন প্রয়োজন নেই। আগের চেয়ে সে এখন অনেকটা ভালো আছে। দু-তিন দিনের মধ্যে সে ভালো হয়ে যাবে, সে নিজেই চিঠি লিখতে সমর্থ হবে। অর্থাৎ তার আর জ্বর নেই। শ্রীগুরুমহারাজের কাজ চলবে ধীরে অথচ সুদৃঢ়ভাবে। আমরা ভালো আছি। দেওয়ান অমনোযোগী নয়। সঙ্গের চিঠিটি তার প্রমাণ। তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান হবে। এটিও এরকম মূল্যবান। "শরীরং আদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্"। তুমি তা ভালোভাবে জান।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৫৯)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর

মাদ্রাজ

৮-১০-১৯০৮

প্রিয় ডাক্তার,

তুমি জেনে খুশি হবে যে আমাদের প্রেসিডেন্টকে এখানে আনবার জন্য আমি আগামী কাল সন্ধ্যায় পুরী রওনা হচ্ছি। ইতোমধ্যে তুমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করে চিঠিতে অনুরোধ জানাও যাতে তিনি তোমাদের আলসুর আশ্রমকে পবিত্র করেন। তাঁর মতো ঈশ্বরতনয় যেখানেই স্পর্শ করেন, সেখান শুধুমাত্র পবিত্র হয় না, সেখানে পবিত্র শক্তিও সঞ্চারিত হয়। তিনি এখানে বক্তৃতা দিতে আসছেন না। তিনি ধর্ম দেবেন যাঁরা চাইবেন, যাঁদের প্রয়োজন থাকে। প্রত্যেকেই ধর্ম নিতে চায়, কিন্তু কে আছেন যিনি দিতে পারেন? এখানে একজন মহাপুরুষ আছেন, যিনি তাপিত হৃদয়ে আশীর্বাদ দেবেন, যিনি ধর্ম ও মানুষকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেবেন।

আধুনিক যুগের তথাকথিত শূন্যবাদী জ্ঞানীদের মনে করার প্রয়োজন নেই। মনুষ্য রচিত পুস্তক পাঠ করে মানুষ জ্ঞানী হয় না। কারণ, রচয়িতাদের সাংসারিক মন অনন্ত সত্যে যাবার কোন শক্তি নেই। তাঁদের কল্পনা অজ্ঞেয়বাদে, সাম্প্রদায়িকতাতে ও নিরীশ্বরবাদেই সীমাবদ্ধ। তাদের অজ্ঞতা তাদেরকে জন্ম ও মৃত্যুর পরিবেষ্টিত মূল্যবান জীবনের সীমাবদ্ধ সময়ে আবদ্ধ রেখেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মহান উদ্দেশ্যের জন্য তোমরা যে উৎসাহ দেখিয়েছ, তা এখন হাজার গুণে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। যেহেতু সেই মিশনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি পরম শ্রদ্ধেয় মহারাজজীর তোমাদের ওখানে শুভাগমন হচ্ছে তোমাদের আশীর্বাদ করার জন্য।

তোমার নিমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে কিছু অর্থ পাঠিও (২৫ টাকা) তার যাতায়াতের ব্যয় বহনের জন্য। একপক্ষকালের কম সময়ের মধ্যে তিনি মাদ্রাজে পৌঁছুতে পারেন। তোমাকে আমি জানাব যখন আমরা পুরী ত্যাগ করে মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে রওনা হব। মাদ্রাজের নাগরিকগণ তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা করার জন্য উদ্গ্রীব। আশাকরি আমি পুরীতে যখন পৌঁছুবো, তখন তোমার কাছ থেকে উত্তর পাব।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

প্রেসিডেন্টের ঠিকানা
স্বামী ব্রহ্মানন্দজী
শশী নিকেতন
পুরী, উড়িষ্যা

(৬০)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মাদ্রাজ
২০-১১-১৯০৮

প্রিয় বন্ধুগণ,

তোমাদের সভার বিবরণ পড়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন ও দীর্ঘ জীবন দিন। তোমাদের সভার কোন কাজে লাগলে সুখী হব। আমি তোমাদের কাছে খুবই অনুগৃহীত হব যদি তোমরা আমাকে

তোমাদের আপনজন মনে কর। তোমাদের উদ্বিগ্ন হবার কোন প্রয়োজন নাই যদি তোমাদের কাজ তোমরা ভালো মতো কর। সভার কাজ চালাতে গেলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা, বিনয়, পবিত্রতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণ থাকার প্রয়োজন। এগুলি প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের চাবিকাঠি।

আমি জেনে খুশি যে তোমরা ছেলেদের শিক্ষার কাজ হাতে নিয়েছ। এই শিক্ষার কাজে এগিয়ে যাও। কিন্তু ভারতের মেয়েরা সবচেয়ে অবহেলিত। সুতরাং আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তোমাদের কাছে অনুরোধ জানাই—যে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা-পদ্ধতি আসা উচিত। আমাদের মেয়েরা রীতিনীতি ও প্রথা পুরোপুরি অনুকরণ করবে না। তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলি পরিচালিত হবে। আমরা তাদের কাছে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর মতো নারীত্বের উচ্চতম আদর্শ উপস্থাপিত করব। এরকম বহু আদর্শ নারী আছেন যাঁরা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত উজ্জ্বল দেবীর মতো বিরাজমানা। তাঁদের জীবনেতিহাস খুব আকর্ষণীয় সরল ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা উচিত। কাজের দিনে সপ্তাহে দুবার এরূপ বর্ণনার ব্যবস্থা থাকবে। তাদেরকে আদর্শ হিন্দুনারী হিসেবে গড়ে তোলা উচিত যাতে তারা আমাদের সকল দেব-দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। ধ্রুব, প্রহ্লাদ এবং মহান ঈশ্বরজানিত পুরুষদের কাহিনি তাদের কাছে বর্ণনা করা উচিত যাতে তারা প্রভাবিত হতে পারে। এতে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয় যাতে কচিমন বুঝতে অসমর্থ হয়। তাহলে এগুলি নীরস এবং সবরকম চেষ্টা নিষ্ফল হবে, অরণ্যে রোদনের মতো হবে। আশাকরি এগুলি কিছু তোমাদের সভার কাজে আসবে। আমাদের পরম পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ভালোবাসা জানবে এবং আমারও ভালোবাসা নেবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৬১)

প্রিয় শ্রীথাম্পি,

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের জন্য তোমার পাঠানো ৫ টাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশাকরি তুমি তোমার পরিবার ও ছেলেমেয়েরা ভালো আছে। তুমি জান যে মায়লাপুরে আমরা একটি নতুন বাড়ি পেয়েছি।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৬২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর

১.১.০৯

প্রিয় চন্দ্র,

তোমার কার্ডের জন্য অনেক ধন্যবাদ। তুমি, দুলাল ও আমাদের সকল বন্ধুরা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানবে। শ্রীমৎ লাটু মহারাজকেও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাবে। যখনই পরের বছরের গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকা পাওয়া যাবে তখনই এটি পাঠাতে ভুলো না। শ্রীরাজা মহারাজ তাঁর গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তোমাকে, নন্দলাল ও অন্যান্য বন্ধুদের জানাচ্ছেন। আশাকরি নন্দলালের শরীর এখন অপেক্ষাকৃত ভালো। সকল বন্ধুদেরকে আমার কথা বলবে। তুমি কি কিছু প্যাকেট পাঠিয়েছ যাতে আমাশয়ের ওষুধ আছে। সেরটাক পাঠালেই চলবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৬৩)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর

১-১-০৯

প্রিয় সোমানন্দ,

আমরা তোমাদের সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সুদীর্ঘকাল পর তোমার সম্বন্ধে জেনে শ্রীমহারাজ খুব খুশি হয়েছেন। আমি তোমার চিঠি শ্রীবরদাচারীকে দেখাব যখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তুমি এজন্য মোটেই উদ্বিগ্ন হয়ো না। শ্রীগুরু মহারাজ তোমার জন্য সব কিছু করবেন—শুধু তাঁর কাজ করে যাও। নতুন মঠ উদ্বোধনের জন্য আমরা ব্যাঙ্গালোরে আগামী ২৩ তারিখে যাচ্ছি। আশাকরি তোমরা সকলে ভালো আছ।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৬৪)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মাদ্রাজ

০৮-০২-০৯

প্রিয় ডাক্তার,

আমাদের পরম পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্টের জন্য তুমি যেরকম পাঠাতে সেরকম প্রতি সপ্তাহে সব্জি ও ফল পাঠিও। তিনি প্রায় এক মাসাধিক এখানে থাকবেন। এবং তিনি তোমাকে আরও কয়েকদিন সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। তোমার বর্তমান ঠিকানা না জানার জন্য বাধ্য হয়ে আমি তোমার পূর্বতন ঠিকানায় চিঠি দিচ্ছি। আশা করব ওখান হতে যথাসময়ে তোমার কাছে পুনর্বার পাঠাবে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জেনো। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

(৬৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর

মাদ্রাজ ১৬-২-০৯

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর আদেশে আমি শ্রীএস. আর দোরাইস্বামী আইয়ারকে, বি.এ. অনুমতি দিচ্ছি আমাদের সকল প্রকাশনা তামিল ভাষীদের সুবিধার্থে তামিলে অনুবাদ করার জন্য। এইসঙ্গে আমাদের মধ্যে চুক্তি থাকবে যে তিনি নিজের খরচে বইগুলি প্রকাশ করবেন এবং এর জন্য যে অর্থ আয় হবে তা দুভাগে সমান করে ভাগ করতে হবে—এক ভাগ পাবে মিশন, অন্য ভাগ নিজে নেবে। এই চুক্তি প্রস্তুত করা হলো ১৯০৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই চুক্তিকে আশীর্বাদ করুন যাতে এটি উন্নতি ও সাফল্য লাভ করতে পারে।

রামকৃষ্ণানন্দ

আমি উপরোক্ত প্রস্তাব স্বীকার করছি।

এস.আর. দুরাইস্বামী আইয়ার।

(৬৬)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর
২০-০২-০৯

প্রিয় তাম্বি,

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে তোমার পাঠানো দু-টাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি শুনে অত্যন্ত খুশি যে তুমি তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য লেগে আছ। ভগবান তাঁদের সাহায্য করেন, যাঁরা নিজেরা উন্নতির চেষ্টা করে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তুমি ও তোমার পরিবারের সকলে জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৬৭)

মায়লাপুর
১০-০৫-১৯০৯

প্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণাইয়া,

তোমার পূর্বের চিঠি ও বর্তমান কার্ডখানি যথাসময়ে পেয়েছিলাম, কিন্তু নানান কাজের চাপে উত্তর দিতে দেরি হলো।

'আমি শ্রীরামকৃষ্ণাইয়া' ভাবটি তোমার বারংবার জন্ম-মৃত্যুর কারণ। যতই তুমি এই ভাবটি হতে মুক্তিলাভ করবে, ততই তুমি তোমার যথার্থস্বরূপ জানতে পারবে।

মানুষের প্রকৃতস্বরূপ কাঁচা আমি দিয়ে ঢাকা থাকে। সর্বদুঃখের কারণ এই 'আমি'। সুতরাং আমাদের প্রথম কর্তব্য যেন তেন প্রকারেণ 'আমি'র নাশ হওয়া। এইটি করা যায় মহান পুরুষদের সেবা করে, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা, একাগ্র সাধনা করে বা বিবেকের দ্বারা।

প্রথমটি সহজতম ও সর্বোত্তম পথ। যদি তুমি প্রকৃত গুরুর চরণতলে আশ্রয় পাও, তোমার আমিত্ব নাশ হয়ে যাবে—তুমি নিজেকে তোমার গুরুর চাকররূপে

ভাবতে পারবে। বিনয় অহংকার-নাশের উত্তম ওষুধ এবং বিনয় আসে সেবকের ভাব থেকে, প্রভুর ভাব থেকে নয়।

আশাকরি আমি তোমাকে যথেষ্ট নির্দেশ দিয়েছি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ[১]

(৬৮)

মায়লাপুর
১৭-০৫-০৯ (১৯০৯)

প্রিয় রামকৃষ্ণাইয়া,

এই জগৎ প্রপঞ্চের পশ্চাতে সেই অনন্ত বিদ্যমান। তোমার মধ্যে সেই অনন্ত শক্তি আছে। সুতরাং ঘাবড়াচ্ছ কেন? যে কোন পথে তোমার সাফল্য নিশ্চিত। ভক্তির পথ শ্রেষ্ঠ। কারণ, এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। তোমার মধ্যে যে ঈশ্বর আছে, তাঁর প্রতি ভক্তিমান হও। তুমিই ঈশ্বরের প্রকৃত মন্দির। বাইরের মন্দির তোমাকে অন্তরের মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রত্যেক জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। সুতরাং মানুষের সেবা করাই ঈশ্বরের সেবা।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ[২]

(৬৯)

মায়লাপুর
১৭-০৫-০৯ (১৯০৯)

প্রিয় ভেঙ্কটসম,

তোমার চিঠি মন দিয়ে পড়লাম। চিঠিটি দীর্ঘ হলেও পড়তে আমার ক্লান্তিবোধ হয়নি। আমি জেনে আনন্দিত যে তুমি তোমার মূল্যবান সময় এত ভালোভাবে, এত নিঃস্বার্থভাবে কাটাচ্ছ। ফলে আমাদের অধিকার নেই। কর্মে অধিকার আছে, ফলে নেই। অপরের উপকারের চেয়ে আমাদের নিজেদের

১ প্রবুদ্ধ ভারত, জানুয়ারি ১৯১৫, পৃঃ ১৩-১৪
২ প্রবুদ্ধ ভারত, জানুয়ারি ১৯১৫, পৃঃ ১৪

উপকারের জন্য আরো বেশি কর্ম করা উচিত। কারণ, সকলেই ঈশ্বরের লোক, ঈশ্বর তাদের তৈরি করেন—তাদের যেমন প্রবৃত্তি। আমরা ঈশ্বরকে শোধরাতে পারি না। অথবা আমরা তাঁর কর্মের দোষও দেখতে পারি না। এরকম করলে ভয়ানক বোকামির কাজ হবে। অন্যের সেবা করলে আমরা নিজেরাই উপকৃত হই অর্থাৎ আমাদের বিস্তার হয়।

ঈশ্বর আমাদের কাছে আসেন অজ্ঞরূপে, আর্তরূপে, রোগিরূপে, খঞ্জরূপে, ক্ষুধার্তরূপে যাতে করে আমরা তাঁর এসকলরূপের সেবা করতে পারি এবং ধন্য হই। যতই তুমি বাধা পাবে, ততই তুমি শক্ত হবে। "বিনা বাধায় সফলতা আসে না।" সুতরাং যারা তোমাকে বাধা দেয়—তাদের ধন্যবাদ দাও।

শ্রী... একজন ভালো ভদ্রলোক। তাঁর মন অত্যন্ত সেবাভাবপূর্ণ। তুমি যদি তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ কর, তাহলে ফল হবে অপূর্ব। এজন্য তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ তোমরা একসঙ্গে কাজ কর। যে কর্ম তোমার আত্মিক উন্নতি করে, তা কি অর্থ দিয়ে মাপা যায়? অর্থ দিয়েও কেনা যায় না। প্রকৃত কর্মীর কাছে ঠিক সময়ে অর্থ আসবে যখন সে কর্ম রহস্য জানবে যে অন্যদের চেয়ে নিজেরই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।

শীঘ্রই তোমার কাছ থেকে উত্তর পাব।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

রামকৃষ্ণানন্দ[১]

পুঃ নানান কাজের চাপে উত্তর দিতে দেরি হলো মনে কিছু করো না।

(৭০)

মায়লাপুর

১৭-০৫-০৯ (১৯০৯)

প্রিয় শ্রীরাই,

তোমার ১৬ তারিখের পত্র যথাসময়ে পেয়েছিলাম। কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তোমাকে তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে পারিনি।

১. ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "ভগবান জলের মতো। যেরকম জলের কোন আকার নেই এবং যে পাত্রে থাকে, তারই আকার নেয়, সেরকম ভগবানের

---

১ প্রবুদ্ধ ভারত, জানুয়ারি ১৯১৬, পৃঃ ১৩

কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। তিনি তাঁর ভক্তদের জন্য বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেন।" তুমি মানুষ, সুতরাং তুমি মানুষকে ভালোবাস। কিন্তু ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান। সেজন্য তাঁকে শুধুমাত্র মনুষ্যরূপের ভাববে না। যদি তোমার পিতা বিদেশী পোশাক পরিধান করে, তাহলেও তুমি তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে। যেহেতু ভগবানের যেইরূপ হোক না কেন, তিনিই তোমার ভগবান এবং ভগবানের সকলরূপকে সর্বদা ভালোবাসবে। হয়তো কোন নির্দিষ্টরূপ কারুর ভালো লাগতে পারে। ঐ নির্দিষ্টরূপকে আমরা বলি ইষ্টমূর্তি। যেমন বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণরূপকে ভালোবাসেন, শাক্তরা ভালোবাসেন শক্তিরূপের। যে রূপ তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগবে, সেইরূপের তুমি পূজা কর। কিন্তু সেইসঙ্গে অন্য সকল রূপের প্রতিও তোমার ভক্তি থাকবে। যেমন নাকি হিন্দু পরিবারের বধূ পরিবারের অন্য সকলের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, কিন্তু রাত্রে একমাত্র স্বামীর সঙ্গে একত্রে বিছানায় শোয়। সেরকম তুমি ভগবানের সকলরূপকে ভক্তি করবে, কিন্তু তোমার ইষ্টমূর্তি জীবনের একমাত্র প্রভু। খুবই ভালো যে তোমার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। তুমি তাঁকে পূজা কর বলে শক্তির আরাধনা থেকে বিরত হবে না। কারণ, তিনি নিজেই শক্তির আপন সন্তান।

২. ভগবানের রূপ কাল্পনিক নয়। তাঁদের রূপ সত্য। নির্বিকল্প সমাধিতে সৃষ্টিও নেই, স্রষ্টাও নেই। সুতরাং ওগুলির কথা বাদ দাও। নুনের পুতুল সমুদ্রেই মিলিয়ে যায়—কে তাঁকে পূজা করবে? যতক্ষণ ব্যক্তি আছে, ততক্ষণ সাকার সগুণ ভগবান আছেন। সৃষ্টিকর্তা ভগবান সর্বদা সাকার সগুণ—প্রত্যেকটি তাঁরই প্রকৃতরূপ। একমাত্র সাকার সগুণরূপের প্রতি পূজা সম্ভব। আমি তোমাকে বলি—এই ভাবটি তুমি নাও। নির্বিকল্প সমাধিতে কোন পূজা নেই।

৩. শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের প্রায় সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর তাঁকে দর্শন করেছেন। যদি তোমার তাঁকে দর্শন করার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে তিনি তোমাকে দর্শন দিবেন।

৪. মূল ছাড়া বৃক্ষ হয় না, সেরূপ অন্তর্জগৎ ব্যতীত বহির্জগৎ হয় না। উভয়েই পরস্পর সংপৃক্ত। জাগ্রত অবস্থায় তুমি যেমন তোমার বন্ধুদের দেখ, ঠিক তেমনি তুমি ভগবানের সাকার রূপ দেখতে পাবে। তখন ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হয় কিন্তু আরো বেশি সজাগ থাকে।

৫. যেহেতু তিনি সর্বত্র বিদ্যমান, সেইহেতু তোমার অন্তর ও বাহির পূজা

করা উচিত। তিনি যেমন মূর্তিতে থাকেন, ঠিক তেমনি তোমার অন্তরেও। সর্বত্র তাঁর পূজা কর, তাঁর সন্তান বা ভৃত্যরূপে নিজেকে সর্বদা মনে কর এবং এভাবে তুমি তাঁর থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারবে। নির্বিকল্প সমাধিতে একমাত্র একত্র মিলন সম্ভব—যেখানে কোন পূজা নেই। একথা তোমাকে আগেই বলেছি।

৬. তাঁর দর্শন পাওয়ার একমাত্র পথ একাগ্র পরাভক্তি। এইটি সাধারণ ও বিশেষ উপদেশ। তোমার ক্ষেত্রে বলা যায় যে তোমার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি একাগ্র পরাভক্তি আছে।

৭. স্বামী বিবেকানন্দজীর ভক্তিযোগ, দেববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও তাঁর একজন শিষ্য শ্রীম কর্তৃক রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—অন্যান্য বই পড়।

৮. একজন প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকার শেক্সপীয়রকে প্রকৃত প্রশংসা ও ভালোবাসতে পারে। একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি মিল্‌টনকে প্রকৃত প্রশংসা ও ভালোবাসতে পারে। গণিতের একজন স্কচ অধ্যাপক মিল্‌টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' (Paradise Lost) পড়ে বিরক্তির সঙ্গে বলবে, "শেষ পর্যন্ত কি প্রমাণ করল?" সুতরাং যদি তুমি ভগবানকে প্রকৃত ভালোবাসতে পার, তাহলে তোমাকে নিজেকে ভগবান হতে হবে। 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ' অর্থাৎ ভগবানকে পূজা করার জন্য তোমাকে ভগবান হতে হবে। 'তুমি পাপী'—এই ভাবটি দূরে নিক্ষেপ করো। "মানুষকে পাপী বলাই পাপ"। এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বৈত ও অদ্বৈতের সমন্বয় করেছেন। যদি তুমি এটি বুঝতে পার, তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের কথা পরস্পর বিরোধী লাগবে না।

৯. দুর্বলতার উপর দ্বৈত প্রতিষ্ঠিত যা একেবারে মিথ্যা ও দোষকারক। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য' অর্থাৎ দুর্বলেরা কখনোও আত্মা লাভ করতে পারবে না—শ্রুতি বলেন। (যদি আমি ভগবানের সন্তান, তাহলে আমি তাঁর জাতিভুক্ত এবং যদি তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হন, তাহলে আমিও পবিত্র)। শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তির মধ্যে পার্থক্য নেই—শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন। তুমি একেবারে ঠিক, যখন তুমি বল, "যদি আমরা আদর্শের পদতলে নিজেদের সঁপে দিই, তাহলে 'আমি-আমার' ভুলে যায়—সবই একই অদ্বৈত।" সুতরাং তাহলে তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তর্কবাগীশরা পার্থক্য দেখেন।

১০. দ্বৈতবাদীরা বলেন, "আমি ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত।" অদ্বৈতবাদীরা বলেন, "আমি ব্রহ্মের সঙ্গে এক।" এই দুই উক্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই—যিনি ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত আর যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে এক। দ্বৈতবাদীরা যেমন শ্রীশঙ্করের

বেদান্তসূত্রের ভাষ্য পড়ে লাভবান হবেন, অদ্বৈতবাদীরাও তাই হবেন। এই আমার অনুভূতি। শ্রীশঙ্কর ভগবানকে আমাদের সামীপ্যে এনেছেন—অন্য ভাষ্যকাররা তা পারেননি। তুমি ঠিকই বলেছ, তিনি দর্শন দেন যখন আমাদের কাঁচা আমির নাশ হয়। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর লক্ষ্য এই কাঁচা আমিকে দূর করা।

১১. শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করলে তোমাকে শাক্তপথ ত্যাগ করতে হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই শক্তির প্রকাশিত রূপ—তিনিই তোমার কুল দেবতা। শক্তি হচ্ছে অনন্তরূপিণী তিনি আমাদের বোধবুদ্ধির অগম্য। গম্য হবার জন্য সেই শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণরূপে এই যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে দ্বাপরযুগে এসেছিলেন, তখন তিনি তাঁর বহু অবতারত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন—"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি..."।

সুতরাং, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য কাজ কর ও বেঁচে থাক। মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর পূজা কর। তাহলে এই জীবনেই তুমি মুক্তিলাভ করবে।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ[১]

(৭১)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর

২৬-০৬-০৯ (১৯০৯)

প্রিয় বন্ধু,

১. স্বামী বিবেকানন্দ 'ব্রহ্ম' বলতে সগুণ ব্রহ্ম বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বয়ং ঈশ্বররূপে দেখবে। পিতা ও পুত্র, অথবা মাতা ও পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ঈশ্বরের মূর্তিতে পূজা করে যদি কেউ মুক্তিলাভ করতে পারে, তাহলে তাঁর জীবন্ত মূর্তিতে পূজা করে আরো বেশি সম্ভব হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার—স্বয়ং ঈশ্বর। তুমি সরাসরি ঈশ্বরকে পূজা করতে পার না। কারণ, তোমার তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। একমাত্র এরূপ মানুষরূপী ঈশ্বরের মাধ্যমেই করতে হবে। যদি শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মানুষ-রূপী ঈশ্বর জন্মগ্রহণ না করতেন তাহলে কে ঈশ্বরকে জানতে পারত? তাঁরাই হলেন আধ্যাত্মিক জগতের কলম্বাস। আকাশে কোথাও ঈশ্বর বাস করেন না—তিনি থাকেন সর্বজীবের

---

১ প্রবুদ্ধ ভারত, জুলাই ১৯১৫, পৃঃ ১৩৫-১৩৭

অন্তরে। 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি' (গীতা)—হে অর্জুন, ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে বাস করেন। সাধারণ মানুষ তা জানতে পারে না। যিনি জানতে সমর্থ হন তিনি তাঁর মধ্যে মিলিয়ে যান। তিনি হলেন সগুণ ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বর্তমান যুগের এরূপ সগুণ ব্রহ্ম।

২. উপনিষদ-পাঠে কোন ক্ষতি নেই। কলিযুগে জাতিভেদ প্রথার উপর বেশি জোর দেওয়া উচিত নয়। অবতারদের পূজা করে তুমি ঈশ্বরকে পূজা করতে পার।

৩. ঈশ্বরকে পিতা বা মাতারূপে দেখা ভালো।

৪. শিশু কি তার বাবা বা মার কাছে কিছু চায় না? সে কি জানে না যে সে যা চায় তাই পাবে? তোমার অনুভূতির জন্য ঈশ্বরের কাছে একইভাবে প্রার্থনা করবে। কেন তুমি ঈশ্বর-পুত্র হতে চাও। সংসারের জ্বালা (জগৎ জ্বালা) থেকে মুক্ত হও। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৫. ধ্যান ও প্রার্থনার উপযুক্ত সময় সকাল ও সন্ধ্যা। যে দেবতাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাস তাঁর নামই করবে।

৬. তোমার চাওয়াই তোমাকে প্রার্থনা করতে বাধ্য করবে। ক্ষুধা পেলে খাদ্যের সন্ধান করে, তৃষ্ণা পেলে জলের সন্ধান করে, কামের উদ্রেক হলে কামিনীর সন্ধান করে ইত্যাদি।

৭. ঈশ্বর পিতা-মাতা উভয়েই ঃ

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ॥

তুমি আমার মাতা, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সখা, তুমি আমার বিদ্যা, তুমি আমার সম্পদ, তুমি আমার সর্বস্ব। তুমি আমার প্রভুর প্রভু। শ্রীরামকৃষ্ণ এসবের সমষ্টি।

৮. যার অহংকার হতে মুক্তি হয়েছে তারই সম্পূর্ণ শরণাগতি আসে। আর অহংকার হলো মানুষের সবচেয়ে ঘোর শত্রু। যদি কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ শরণাগতি নেয়, তাহলে তাকে তিনি সর্বদা রক্ষা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ তা পারে না—কারণ প্রত্যেক মানুষের অল্প-বিস্তর অহংকার আছে। আমার তো

মনে হয় পূর্ণ শরণাগতির অধিকারী পৃথিবীতে প্রায় কেউ নেই। সুতরাং এর বিকল্প খুঁজতে হবে। যদি আমি জগতে থাকি এবং যদি আমি সুখী হতে চাই, তখন আমি এমন কিছু করব যার দ্বারা আমি পূর্ণ সুখী হতে পারি। আমি অবশ্যই ঈশ্বর-সন্তান হব এবং তখন আমি সম্পূর্ণ সুখী হব, সকল ভয় হতে মুক্ত হবো। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, করুণাময়—তিনি আমাকে দেখবেন; কারণ আমি তাঁর সন্তান।

৯. দৈবী হি এষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীতা)

"আমার দৈবী মায়া গুণময়ী—একে অতিক্রম করা বড়ই দুরূহ। তবে আমার শরণ নিলে এই মায়াকে অতিক্রম করা যায়।" মায়া ভগবানের শক্তি। ভগবান ও তার মায়াশক্তির মধ্যে পার্থক্য নেই। চিনিকে এর মিষ্টত্ব থেকে পৃথক করার কল্পনা করা যায় না। দুধ থেকে দুধের ধবলত্ব পৃথক করা যায় না। ঠিক এরকম ঈশ্বরকে মায়াশক্তি থেকে পৃথক করা যায় না। শক্তিহীন লোকের কাছে আমরা প্রার্থনা করি না। কারণ, জানি শক্তিহীন পুরুষের কাছে প্রার্থনা করা অর্থহীন। ভগবান সর্বশক্তিমান—এজন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। যেই ভগবানকে পূজা করে, সেই শক্তিরও পূজা করে। জগতে প্রত্যেকেই শক্তি—সুতরাং শক্তির পূজা কে না করে?

১০. ঐ বইগুলি বারবার পড়। কালে এর অর্থ বোঝা যাবে। পুরাতন সব বইগুলি পড়—যেমন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, স্বামী বিবেকানন্দজীর বাণী ও রচনা (Complete Works) এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের উপদেশ। শ্রীম লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড় (The Gospel of Sri Ramakrishna) —তাহলে তোমার সব সন্দেহ দূর হবে।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

রামকৃষ্ণানন্দ [১]

(৭২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর
১৯-০৭-০৯

প্রিয় ভেঙ্কটস্বামী,

তুমি শুনে খুশি হবে যে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট তোমার ডাল

১ প্রবুদ্ধ ভারত আগস্ট, ১৯১৫ পৃঃ ১৫৬-১৫৭

পেয়েছেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্টকে ডাল পাঠিয়ে তুমি তোমার জীবনে প্রশংসনীয় কাজ করেছ। প্রত্যেক মানুষের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এরূপ সেবা করা, যে ঈশ্বর দর্শন করতে চায়। যে সেবা তুমি ঈশ্বর-তনয়ের জন্য করেছ, তা থেকে তুমি এই জগতে ও অপার্থিব জগতে আশীর্বাদ পাবে।

আশা করি তুমি তোমার ছেলে মেয়ে, আত্মীয় স্বজন বন্ধুরা ভালো আছে ও তোমার মহান কার্য অব্যাহত সফলতার সঙ্গে চলছে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৭৩)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর
৮-৯-০৯ (১৯০৯)

প্রিয় শ্রীরায়,

আমরা পুস্তকের মূল্য (২/২ আনা) পেয়েছি।

১. তোমাকে ভগবান হতে হবে না। তুমি ভগবানই আছ। তুমি নিজেকে পাপী বলে কল্পনা করছ কেন? তুমি অনন্ত—অজ্ঞানবশত তুমি নিজেকে কল্পনা করছ তুমি শূদ্র। তোমার নিজের চিন্তাধারার প্রতি সজাগ থাকা ভুল নয় যখন তুমি দুর্বল চিন্তা দূর করতে চাও। নাই নাই করলে সাপের বিষ থাকে না। সুতরাং বল 'না' 'না' এবং কোন সাপের বিষ নেই। "আমি পাপী নই, আমি ঈশ্বরের সন্তান"—যে এইটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, জানবে, ক্রমে সে ঈশ্বরের তনয় হয়।

২. 'নরবলি'র অর্থ "নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বকে বলি দেওয়া। এই ক্ষুদ্র আমিত্ব নিজেকে দুর্বল ও পাপী মনে করে।" পশুবলির অর্থও একই প্রকার। যে তা করতে পারে সেই বীর। "জিতং জগৎ কেন মনো হি যেন" (যার দ্বারা জগৎ জয় করা যায়, যিনি নিজের মনকে জয় করেছেন)। এরজন্য মনের প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন। যদি তুমি বদ অভ্যাস পরিত্যাগ কর, তাহলে সেইসঙ্গে ভালো অভ্যাসের উন্নতি কর। এরজন্য চাই প্রচণ্ড রজোগুণ বা দুর্বার কর্মশক্তি।

৩. 'দি ইউনিভার্স এ্যান্ড ম্যান' নামক পুস্তিকার 'ভক্তি' অধ্যায়টি প্রথম

থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে পড় এবং তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

৪. প্রতি মূহূর্তে তুমি চিন্তা কর যে তুমি ঈশ্বরের সন্তান। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার আশীর্বাদ ও ভালোবাসা জানবে। ইতি

রামকৃষ্ণানন্দ[১]

(৭৪)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর

২৩-০৯-০৯

প্রিয় লালাজী,

আপেল পাঠাবার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ভালো অবস্থায় পৌঁছেছে। তুমি শুনে খুশি হবে যে এগুলি শ্রীগুরু মহারাজের ভোগে দেওয়া হয়েছে। এবার প্যাকিং ভালো ছিল না এবং ঠিকানাও ঠিক ছিল না। এখন আমি ক্যাসেল কার্নানে থাকি না। মাদ্রাজের জনসাধারণ শ্রীগুরু মহারাজের জন্য মায়লাপুরে একটি ছোট্ট মঠ তৈরি করেছে এবং আমি এখন সেখানে থাকি। আমার বর্তমান ঠিকানা দিচ্ছি,

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
মায়লাপুর, মাদ্রাজ

তুমি শ্রীগুরু মহারাজের প্রকৃত ভক্ত। সেজন্য তুমি যে ফল এত ভালোবাসা ও ভক্তির সাথে পাঠিয়েছ তা কখনও খারাপ হবে না। কিছু খুব ভালো অবস্থায় ছিল, বাকিগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। ঈশ্বর সংখ্যা দেখেন না। তিনি দেখেন ভালোবাসা, যে ভালোবাসায় ভক্তের প্রদত্ত জিনিস তিনি গ্রহণ করেন। যা হোক সংখ্যা বা উৎকর্ষতা তুচ্ছ ব্যাপার। ভক্তিই একমাত্র শর্ত যা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হয়, যা জগতের মানুষের দৃষ্টিতে তুচ্ছ বস্তু বলে প্রতীয়মান হবে।

১ প্রবুদ্ধ ভারত অক্টোবর ১৯১৫, পৃঃ ১৯২

আশাকরি তোমার স্বাস্থ্য ভালো আছে। আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তুমি, সিদ্ধদাস ও বাড়ির সকলে জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৭৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

শশীনিকেতন
পুরী
৬-১০-১৯০৯

প্রিয় রুদ্র,

আজ সকালে আমি নিরাপদে পৌঁছেছি। যাত্রা খুব ভালো ছিল। শ্রীএস.এস. ও পার্থসারথি আয়েঙ্গার নিজেই স্টেশনে এসেছিলেন এবং আমাকে চারজনের খাবার দিয়েছিলেন। বহরমপুরে শ্রীযোগেশ পট্টনায়েক নিজেই রাত্রের খাবার এনেছিলেন। সারাপথ আমার কামরায় মোটেই ভিড় ছিল না। বেশির ভাগ পথে আমি একাই ছিলাম। শ্রীমহারাজ খুব ভালো আছেন। তিনি কৃপা করে তোমার, নারায়ণ রাও, রামানুজ, শ্রীবালসুব্রামনিয়াম আইয়ার, রঙ্গস্বামী ও অন্য বন্ধুদের খবর নিয়েছেন। পরের রবিবার আমি কলকাতা যাত্রা করব।

তোমার সাবধানে থাকা উচিত। খুব বেশি পরিশ্রম করবে না। আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তুমি, নারায়ণ রাও, রামানুজ, শ্রীবালসুব্রামনিয়াম আইয়ার, গোপালন, রঙ্গস্বামীর স্ত্রীকে জানাবে। আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নীরোদ ও কৃষ্ণলালকে জানাবে।

পুনঃ শ্রীমহারাজ সুপারি ও একজোড়া কাপড় পেয়ে খুশি হয়েছেন। প্যাকেট ভালোমতো পৌঁছেছে।

(৭৬)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

শশীনিকেতন
পুরী
৯-১০-১৯০৯

প্রিয় রুদ্র,

আগামী সোমবার আমি কলকাতা রওনা হব। নারায়ণ রাও সহ তোমরা সকলে ভালো আছ। কমপক্ষে এক সপ্তাহ বেলুড় মঠে থাকব। তারপরে মাদ্রাজ যাত্রা করব।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তুমি ও নারায়ণ রাও জানবে।

ইতি তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৭৭)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

The Math
Belur P.O.
13-10-09

My dear Rudra,

গতকল্য আমি নিরাপদে মঠে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। কল্য সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির শ্রীপাদপদ্মও স্পর্শ করিয়াছি। মা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং তোমায় খুব আশীর্বাদ করিলেন। তোমার প্রেরিত Mr. P.V. Vasudeva Rao যে দশটাকা শ্রীশ্রীমার সেবার জন্য দিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। আমি যখন শ্রীশ্রীমার নিকট যাইব তখন ঐ টাকা লইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিব। তুমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিও না। শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ তোমায় আশীর্বাদ করিয়াছেন। এখানকার সকলই মঙ্গল। তুমি আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে।

ইতি Yours afftly.
রামকৃষ্ণানন্দ

Please convey my love & blessings to Ramanuja, Mudalyear Rao, Rangaswami, Mr. Balasubramanium.

Please remember me to Mr. P.V. Vasudeva Rao, Gopalan & all friends.
Post Card
Brahmachari Rudra Chaitanya
Sri Ramakrishna Mission
Mylapore
Madras

(৭৮)
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

18-10-09

My dear Rudra,

তোমার চিঠি পেয়েছি। এবার ৺দুর্গাপূজার সময় এখানে থাকতে হবে। তুমি স্বামী পরমানন্দের ঠিকানা আমায় লিখে পাঠাবে। শ্রীশ্রীমার পূজা, কিন্তু করো না। খুব সাবধানে থাকবে। তুমি আমার ও অন্যান্য স্বামিগণের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে।

ইতি
Yours affly
রামকৃষ্ণানন্দ

(৭৯)
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

The Math
Belur.
28.10.09

My dear Rudra,

তুমি আমার ৺বিজয়ার আলিঙ্গন ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। আমি আগামী রবিবার (৩১ অক্টোবর) এখান হইতে যাত্রা করিব। তোমার জন্য মাস্টার মহাশয়ের নিকট হইতে ৩ sets কথামৃত লইয়াছি। তুমি যে নবম্যাদি কল্পারম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিয়াছ ইহাতে আমরা সকলে অতি সুখী হইয়াছি। My love & blessings to Ramanuja, Ramoo, Ranga Swami, Gopalan, Mr. Bala Subramonium & Auanger & all other

friends & to yourself & the climate of this place does not suit my health. Our Holy Mother will be coming to the Math tomorrow. I shall be ... know the exact date of my arrival. With my hearty love & blessings.

I am yours afftly Ramakrishnananda

Post Card
Brahmachari Rudra Chaitanya
Sri Ramakrishna Mission
Mylapore
Madras.

(৮০)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

The Math
Belur
3-11-09

My dear Rudra,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া পরম সুখী হইলাম। আমি এখানে দুইবার ম্যালেরিয়ায় ভুগি। যদিও এখনও জ্বর নাই তথাপি দুর্বলতা আছে। শুনিতেছি R.W. লাইনও দু-এক জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখনও completely repaired হয় নাই। অশ্লেষা ও মঘাও সন্নিকট। সুতরাং দু-তিন দিন পরে যাত্রা করাই বিধেয়। আমার বোধ হয় আর জ্বর হইবে না। Please tell Ramu & Ramanuja, that on account of the weakness which I still feel, it is not desirable to take up the journey so soon. I should wait for two or three days more here in order to enable me to bear the fatigue of travelling. I am very glad to hear that Ramoo has come. I expect to meet you all soon. The climate of this place does not agree with me & although S. Premanandaji is sparing no pains to make me comfortable yet the place is not for me. My love & blessings to Narayan Rao, Ramoo, Ramanuja, Ranga Swami, Mr. Bala Subramonium, friend, Gopalan, yourself as well as all other friends. I hope you are not over working yourself.

I am yours affly.
Ramakrishnananda

One or two Brahmacharis will accompany me.

Post Card
Brahmachari Rudra Chaitanya
Shri Ramakrishna Mission
Mylapore
Madras

(৮১)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

All the works of Swami Vivekananda are always available. For details apply to the Manager of this Office for a catalogue with a half anna Postage Stamp.

UDVODHAN OFFICE
12, 13 Gopal Chandra Neogi Lane.
Baghbazar, P.O. Calcutta.
Dated the 7.11.1909

My dear Rudra,

আগামী কল্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বিজয় নামে একটি ব্রহ্মচারী তোমার নিকট যাইতেছে। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি তাহাকে ব্রহ্মচর্য দিয়াছেন। নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাহাকে যত্ন করিবে। সে আগামী বুধবার মধ্যাহ্নে মাদ্রাজ পঁহুছিবে। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে নারায়ণ রাওকে station এ পাঠাইয়া দিবে। সে পঁহুছিলে তাহার দু-এক দিন পরেই নারায়ণ রাওকে directly বেলুড় মঠে পাঠাইও। আমি ৺কালীপূজার পর মাদ্রাজ যাত্রা করিব।

Yours affly.
রামকৃষ্ণানন্দ

Brahmachari Rudra Chaitanya
Sri Ramakrishna Mission
Brodies Road
Mylapore
Madras

(৮২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

The Math
Belur P.O.
11-11-09

My dear Sris,

তোমার পত্রপাঠে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। যে-কেহ পরমপূজ্য শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি ইহ জীবনেই আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তুমি অন্য কোনও গুরুর নিকট গমন করিও না। এক গুরুর নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। অন্যত্র গিয়াছিলে বলিয়া হৃদয়ে শান্তি পাও নাই। অন্যত্র গমনে দোষ হয়। ইহা তোমার শিক্ষা হইল। কদাচ ভুলিও না। যে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। তুমি ইহাতে কেন সন্দেহ কর? সন্দেহের ফল কষ্ট। যাঁহার সন্দেহ নাই তিনিই পরম সুখী। সর্বসময়ে যথাসাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম চিন্তা করিও, তাহা হইলে সন্দেহাসুরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

তুমি আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

Yours afftly.
রামকৃষ্ণানন্দ [১]

(৮৩)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

The Math,
Belur, P.O. Howrah
Dated 26/11/1909

My dear Rudra,

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার শরীর এক্ষণে অনেকটা ভালো। সম্ভবত আমি দু-একদিনের মধ্যেই Madras যাত্রা করিব। আশা করি তুমি ও সুরেন্দ্র ভালোই আছ। Please convey my love & blessings to Ramoo,

১ উদ্বোধন, ৭৩ তম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮, পৃঃ ২৫৪

Ramanuja, Mr. Balasubramonium, Ranga Swami, Gopalan & all our friends. Please convey the same to Veera Raghabachari, Raghavacharies, both of Triplicane & Mylapore & all other friends. The climate here is now better.

Narayan Rao is doing well. He likes this place.

With my best love & blessings to all of you.

I am yours affctly
Ramakrishnananda

(৮৪)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
২৮-১১-০৯

প্রিয় ডাক্তার,

স্বামী আত্মানন্দ ভালো আছে। শুনেছি যে স্বামী বিমলানন্দ কলেরা ও হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় খুব ভুগছে। মাদ্রাজে তাকে শিগ্‌গির জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পাঠিয়ে দাও। আশা করি এতে তার স্বাস্থ্য ভালো হবে। আগামী কাল ট্রেনে তাকে পাঠাবার চেষ্টা কর। তুমি কেমন আছ? শুনেছি তোমারও শরীর ভালো নয়।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুনশ্চ ঃ তোমার ওষুধ পেয়েছি। ধন্যবাদ।

(৮৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

প্রিয় রুদ্র,

দেনা শীঘ্র পরিশোধ করিয়া দিও। যদি "গস্‌পেল" ছাপানোর টাকা দিবার সামর্থ্য না থাকে তাহা নাঞ্জুন্ডা রাওকে দিবে (মূল বাংলা)। ডাঃ নাঞ্জুন্ডা রাও গস্‌পেল ছাপার ও প্রকাশের দায়িত্ব নিক। ঋণে জড়িত হইও না। তুমি

বিষ্ণুচৈতন্য, রামু ও অন্যান্য সকলে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে

ইতি

তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

পুনঃ বালসুব্রামনিয়ামকে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাবে। সময়মতো দশটাকা পাঠানোর কথা তাকে মনে করিয়ে দেবে।

(৮৬)

My dear Suren,

তুমি যে মঠে নিরাপদে পঁহুছিয়াছ ইহা জানিয়া আমি যে কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। শ্রীশ্রীগুরুদেব তোমায় যে সংসার রূপ মহারাক্ষসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আনিয়াছেন ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমি দু-চারিদিনের মধ্যেই মাদ্রাজ যাত্রা করিব। এখানে ক্রমে শীত পড়িতেছে এবং বৃষ্টি বাদল ও ঝড় তো লাগিয়া আছেই। শীতের সহিত plague-ও বাড়িয়া ওঠে, সুতরাং এক্ষণে এখানে কাহারও আসা উচিত নয়। আমি মঠে গিয়া তোমাদের পড়া ও সাধন ভজনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব। পূর্বে যেমন আনন্দে ছিলে এবার তদপেক্ষা অধিক আনন্দে যাহাতে তোমরা সকলে কালযাপন করিতে পার তদ্বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হইব। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় তোমাদের কাহারও কোনও কষ্ট থাকবে না। তুমি ও সকলে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি ও শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের কুশল সম্বাদ পাইয়া কি পর্যন্ত যে আনন্দিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না। ইতি

Yours afftly

রামকৃষ্ণানন্দ

পরমানন্দের ঠিকানা—
The Swami Paramanandaji
16. St. Botolph street.
Boston, Mass, U.S. America

Envelop
S. Ramakrishnananda to Suren Also. 5/9/10.
Brahmachari Sriman Rudra Chaitanya.

Sri Ramakrishna Mission.
Brodies Road.
Mylapore, Madras

(৮৭)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ব্যাঙ্গালোর
২৬-৭-১০

প্রিয় রুদ্র,

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার শরীর এখানে আসিয়া বেশ ভালো আছে। এখানে আজকাল খুব বৃষ্টি হইতেছে ও বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। আমি খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব strict আছি। Dr. Hallock আমার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ প্রকার যত্ন লইতেছে। ... আমার এক প্রকার ভালো। নানা প্রকার ভালো ভালো জিনিস তৈয়ার করিয়া খাওয়াইতেছে। বোধ হয় অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমি অনেকটা সুস্থ হইতে পারিব। গত মেলে বসন্তের কি কোন চিঠি আসে নাই? তাহার ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইও। ওখানে আজকাল কি বৃষ্টি হইতেছে? শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের ঘর মেরামত হইতে আরম্ভ হইয়াছে কি? রামু রাজমিস্ত্রিদেরকে আনিয়া কি কাজে লাগাইয়া দিয়াছে? যাহাতে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের ঘর শীঘ্র মেরামত হয় তাহারই চেষ্টা করিও। পরে রান্না ঘর। তোমরা দুজন খুব সাবধানে থাকিও। সময় বাজে কথায় নষ্ট করিও না। প্রকাশকে কি কি পড়িতে হইবে ঠিক করিয়া দিও। অর্থাৎ তাহাকে প্রতিদিন কিছু ব্যাকরণ পড়াইও এবং তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য পড়াইও। তাহা হইলে তোমারও চণ্ডীপাঠ অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। তুমিও রামায়ণ আবার পাইলেই পড়িবে। অযোধ্যা কাণ্ড না পড়িয়া অরণ্য কাণ্ড আরম্ভ করিও এবং ওখানে আমার আসার পূর্বেই যেন সব কাজগুলি সমাপ্ত করিয়াছ—দেখিতে পাই। জিতেন আমার খুব সেবা করিতেছে।

এখানকার অন্যান্য সকল মঙ্গল। তুমি ও প্রকাশ আমার ভালোবাসাদি জানিবে। আশাকরি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সেবা উত্তম রূপে হইতেছে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৮৮)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ব্যাঙ্গালোর
২৯-৭-১০

প্রিয় রুদ্র,

আমি শুনে খুশি যে তুমি শ্রীগুরুমহারাজকে শ্রীমহারাজের ঘরে নিয়ে গেছ। আশা করি ইতোমধ্যে মেরামতির কাজ আরম্ভ হয়েছে। রামুকে বলো—কাজটা যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করা হয়। না হলে পুরো বাড়িটি ভেঙে পড়বে। রান্নাঘরও খুব তাড়াতাড়ি মেরামত করা উচিত। বর্ষাকাল আসছে। যদি এই সময়ের মধ্যে মেরামতির কাজ শেষ না হয়, তাহলে সমগ্র বাড়িটি ধূলিসাৎ হতে পারে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তুমি, রামু ও রামানুজ, শ্রীনিবাসাচারী, পঞ্চপাকাথা আইয়ার, সুব্বারাও ও অন্যদের জানাবে।

ইতি

আমি ধীরে ধীরে ভালো হচ্ছি। তোমাদের

রামকৃষ্ণানন্দ

পুনঃ (বাংলায় লিখিত) গাছের নারিকেলগুলো কি পাড়ান হইয়াছে? না হইয়া থাকে তো শীঘ্র পাড়াইয়া লইবে।

(৮৯)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ব্যাঙ্গালোর
৩১-৭-১০

প্রিয় রুদ্র,

আমি শুনে খুশি যে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীকৃষ্ণস্বামী আইয়ার মেরামতির কাজ দেখাশুনা করছে। ভগবান তাকে আশীর্বাদ করুন এবং দীর্ঘজীবন ও উন্নতি দিন। আশাকরি একপক্ষকালের কি তার আগেই মেরামতির কাজ শেষ হবে। আমি নতুন বই এর দ্বিতীয় প্রুফ সংশোধন করে রামুকে পাঠিয়েছি। তাকে বোলো যে সংশোধনগুলি ভালো করে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

আমি এখানে অনেকটা ভালো বোধ করছি। ডাঃ হ্যালক আমাকে বিশেষ যত্ন নিয়ে দেখাশোনা করছেন। এখানে প্রায় সর্বক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছে।

পাশের ঘর থেকে ভোগ আনতে তুমি বেশ অসুবিধা বোধ করছ। কিন্তু কি আর করা যাবে? যতক্ষণ না রান্নাঘর ও ঠাকুরঘর সম্পূর্ণভাবে মেরামত হয় ততক্ষণ তোমাকে এটি সহ্য করে যেতে হবে।

তোমাদের দুজনের স্বাস্থ্য ভালো আছে তো? আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ প্রকাশ ও তুমি জানবে। আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ রামু, রামানুজ ও সকল বন্ধুদের জানাবে।

আমাদের নতুন হোমে নতুন ছেলেরা আসছে তো? যদি না হয় আমাদের কি করা উচিত? রামুকে বলো যে এটি বন্ধ করা ভালো নয়।

আজকের মেল থেকে আমি জানতে পারলাম যে স্বামী পরমানন্দ বোস্টনে ভালো আছে। রামুকে বলো যত শীঘ্র সে নতুন বই-এর দ্বিতীয় ফর্মা পাঠায়। এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর প্রথম ফর্মার অর্ডারটা যেন দেয়। তাকে বলো সে যেন বই-এর প্রস্তাবনা লিখেও আমার কাছে পাঠায়।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৯০)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Bangalore
8-8-1910

My dear Rudra,

বোধ হয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় তোমরা (তুমি ও প্রকাশ) উভয়েই ভালো আছ। শ্রীশ্রীমহারাজের পত্রে জানিলাম যে এখানে মঠে বড় লোকাভাব। তজ্জন্য তিনি এখানে বিশ্বরঞ্জনকে পাঠাইতে চাহেন না। আমিও তজ্জন্য তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে এক্ষণে বিশ্বরঞ্জনকে পাঠাইবার আবশ্যকতা নাই। পুস্তকগুলি অদ্য আসিয়া পঁহুছিয়াছে। ফলগুলিও পরশ্ব আসিয়া পঁহুছিয়াছিল। তুমি পঞ্চাশটা পাঠাইলেই ভালো করিতে, কারণ এখানে খুব ফল পাওয়া যায়। কিন্তু তোমার প্রেরিত ফলগুলি বড় সুমিষ্ট। আমরা এখনও খাইতেছি ও বিতরণ করিতেছি।

আমার নামে America হইতে টাকা আসিয়াছে, তুমি তাহা এখানে redirect করিয়া দিও। রামুকে বাকি proof শীঘ্র পাঠাইতে বলিও। আমার শরীর অনেকটা ভালো। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের ঘর কি মেরামত হইয়া গিয়াছে? ঘর বেশ শুকাইয়া গেলে ভালো দিন দেখিয়া তবে তাঁহাকে তাঁহার ঘরে লইয়া যাইও। রান্নাঘর মেরামত হইতে আর কতদিন লাগিবে? তোমাদের দুজনের শরীর ভালো আছে? নূতন হোমে কতগুলি ছেলে আসিয়াছে? এই সঙ্গে পাইখানার উপর একটি নারিকেল পাতার ছাউনি করাইয়া লইও, শ্রীশ্রীমহারাজের সময় যেমন ছিল। আমার শরীর শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় অনেকটা ভালো। তোমরা উভয়ে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিও।

ইতি yours affly
রামকৃষ্ণানন্দ

খুব সাবধানে থাকিবে। আমি সুরেন্দ্র বিজয়কে লিখিয়াছি। With love & blessings to Ramesh, Ramanuj and friends.

Post Card
Brahmachari Sriman Rudra Chaitanya
Sri Ramakrishna Mission
Brodies Road, Mylapore
Madras

(৯১)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Bangalore
10.8.10

My dear Rudra,

তোমার শরীর কেমন আছে। গত রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তোমার শরীর তত ভালো নাই। খুব সাবধানে থাকিবে। আমার শরীর ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। আগামী শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর দিন সম্ভবত আমায় একটি Public Lecture দিতে হইবে। Subject—Sri Krishna & His teachings. বাড়ি মেরামতের কতদূর বিলম্ব। Has Ramoo been able to get the necessary money for it ? He has not yet sent me the last proof. Where is he going to order to strike ? The book should be published before Sri Jayanti.

Hoping to hear from you soon with my best love & blessings to you, Prakash, Ramoo, Ramanuja & all friends.

I am yours affly.
Ramakrishnananda

(৯২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Bangalore
10.8.10

My dear Rudra

তুমি Udbodhan Office-এ "শ্রীকৃষ্ণ" পাঠাইয়া দাও এবং চারকপি Inspired Talksও পাঠাইতে পার। তাহাদিগকে লিখিও যে Inspired talks পুনরায় মুদ্রিত হইলে যাহা তাঁহাদের আবশ্যক তাহা পাঠান যাইবে। The Path to Perfection এর cover যেমন নূতন পুস্তকের coverও তেমনি করিতে বলিও। Ramoo has not yet sent the rest of the proof. Please tell him to send it as soon as possible. Before he orders to strike if he kindly sends the whole book bound, as a sample. I can then judge what sort of a cover will be good for it. তুমি অন্যের প্রেরিত পোস্টকার্ডে কখনও কিছু লিখিও না। এরূপ করিলে আইন অনুসারে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে নূতন একখানি পোস্টকার্ড ব্যবহার করিও। এক পয়সা বাঁচাইতে গিয়া পঞ্চাশ টাকা হারাইও না। আশাকরি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সেবা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের ঘর কি মেরামত হইয়া গিয়াছে? আমি অনেকটা ভালো বোধ করিতেছি। বসন্তের প্রেরিত টাকা গতকল্য পাইয়াছি। তুমি ও প্রকাশ আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে এবং Ramoo, Ramanuja প্রভৃতিকে জানাইবে। ইতি

Yours afftly Ramakrishnananda

My love & blessings to Narayan Rao. Where is he staying now?

Post Card
Brahmachari Sriman Rudra Chaitanya
Sri Ramakrishna Mission
Brodies Road
Mylapore, Madras

(৯৩)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Bangalore
12-8-10

My dear Rudra,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। Please tell Ramoo to take unity the title "Vedanta Philosophy" from the title page of the new book. অদ্য নারায়ণ আয়েঙ্গার এখানে আসিয়াছে। আগামী কল্য চলিয়া যাইবে। এখানকার অপরাপর সমস্তই কুশল। আমার বোধ হয় দেবমাতা এতদিনে বই এর বাক্স দুটি পাইয়াছে। তুমি ও প্রকাশ আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিও।

I hope Ramoo, Ramanuja, Mr. Punchapakathum Aiyar, Srinivasachari, Rao & all other friends are taking particular care of the boys of the new home. I am feeling far better & if the improvement continues steadily, I may return to Madras in a fortnight. Please tell Ramoo to send me the whole book bound so that I may go through it once more, before he orders to strike. With my best love and blessings to all of you,

I am your affly.
Ramakrishnananda

Post Card

Brahmachari Sriman Rudra Chaitanya
Sri Ramakrishna Mission
Brodies Road.
Mylapore, Madras

(৯৪)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ব্যাঙ্গালোর
৩০-৮-১০

প্রিয় রুদ্র,

তুমি আগামী কাল স্বামী সারদানন্দজীকে (শশী নিকেতন, পুরী, উড়িষ্যা) সব চার্টার্ড ফর্ম পাঠিও। রামু এখনও নতুন বই পাঠায়নি। কবে মঠে মেরামতির

কাজ শেষ হবে? আমি ভালো বোধ করছি না। এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই মাদ্রাজে ফিরে যাব। এর মধ্যে কি তারা কাজ শেষ করতে পারবে? আমি শুনেছি যে সুরেন্দ্রবিজয় মাদ্রাজ রওনা হয়েছে। যাবার পথে সে পুরীতে কয়েকদিন থাকবে।

আশাকরি তুমি, প্রকাশ, রামু, রামানুজ ও সকল বন্ধুরা ভালো আছে। আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুঃ বহুমূত্র রোগ ধরিয়া গিয়াছে। সর্দিতে ভুগিতেছি। (বাঙলায় লেখা)

(৯৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Bangalore
3.9.10

My dear Rudra,

বোধহয় অদ্য মধ্যাহ্নে শ্রীমান সুরেন্দ্র বিজয় মাদ্রাজ মঠে পঁহুছিয়াছে। তাহাকে বলিও আমি তাহার তিনখানি card পাইয়াছি। আজকাল এখানে plague এর প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইতেছে। এবং ক্রমাগত বৃষ্টি ঝড় ও শীত পড়িয়া আসিতেছে। সুতরাং এক্ষণে তাহার বা তোমার এখানে আসা তত ভালো বোধ করি না। যদিও যেখানে আমাদের মঠ আছে সেখানে plague এর একপ্রকার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। সুরেন্দ্র বিজয় ওখানে দিন কতক বিশ্রাম করুক এবং ইতোমধ্যে আমিও আগামী সপ্তাহের শেষভাগে মাদ্রাজ যাত্রা করিব। বোধহয় repair কার্য শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার শরীর তত মন্দ নাই। তোমরা তিনজন খুব সাবধানে থাকিবে। তুমি, প্রকাশ, সুরেন, রামু, রামানুজ ও অন্যান্য বন্ধুবর্গ আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিও।

ইতি
Yours afftly.
রামকৃষ্ণানন্দ

Post Card
Brahmachari Sriman Rudra Chaitanya
Sri Ramakrishna Mission
Brodies Road
Mylapore, Madras

(৯৬)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Bangalore
5.9.10

My dear Rudra,

তোমার প্রেরিত ১২ copy নূতন বই পাইলাম। সুরেন্দ্র বিজয়ের আগমন বার্তায় আমরা সকলে বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। আশাকরি তোমরা সকলে ভালো আছ। আগামী মেলে তুমি ২৪ কপি নূতন বই আমেরিকায় পরমানন্দের ঠিকানায় পাঠাইও। বেলুড় মঠে পাঁচ কপি তাহার মধ্যে এক কপি যেন উদ্বোধনের (for review) জন্য পাঠান হয়। দু কপি Prabuddha Bharata-এ for review পাঠাইও। Please tell Ramoo to send the new book to those papers of Madras which are likely to review the book. শ্রীমান সুরেন্দ্র বিজয় আনীত এবং তোমার প্রেরিত শ্রীশ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ ধারণ করিয়া আমরা সকলে বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। এখানে আজকাল জলবায়ু বড় প্রখর। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেক ভালো আছে। মঠের repair কার্য শেষ হইলেই আমায় খবর দিও। তুমি সুরেন্দ্র, প্রকাশ, রামু, রামানুজ প্রভৃতি যাবতীয় বন্ধুবর্গ আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিও।

ইতি yours afftly
রামকৃষ্ণানন্দ

(৯৭)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Bangalore City
5.9.10.

প্রিয় রুদ্র চৈতন্য,

এখানকার ডাক্তার Hallock আমাকে মাদ্রাজে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন।

আমার শরীর ভালো আছে। সুতরাং আমি আগামী বৃহস্পতিবার ৮ অক্টোবর প্রাতে ৬-৫০ মিনিটের express এ এখান হইতে রওনা হব ও মাদ্রাজে ২-৩০ টার সময় পৌঁছিব। যদি সুবিধা হয় একখানি গাড়ি station এ তুমি কিম্বা অপর কেহ লইয়া আসিও। পূর্বে যেরূপ গয়লার বন্দোবস্ত ছিল সেইরূপ করিবে। এখানকার আর[২] সমস্ত কুশল। তুমি, সুরেন, প্রকাশ, রামু, রামানুজ প্রভৃতি সকলে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে।—

ইতি I am yours affectly
Ramakrishnananda

(৯৮)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ব্যাঙ্গালোর
৭-৯-১০

প্রিয় রুদ্র,

আমি আগামী কাল সকালের এক্সপ্রেসে রওনা হব ও মাদ্রাজে বেলা তিনটা বা আরো একটু আগে পৌঁছাব। যদি তোমার সুবিধা হয়, তাহলে গাড়ি নিয়ে স্টেশনে আসবে।

শ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় তোমরা সকলে ভালো আছ। আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তুমি প্রকাশ, সুরেন্দ্র, রামু, রামানুজ জানবে ও অন্য বন্ধুদের জানাবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(৯৯)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ট্রিপ্লিকেন
মাদ্রাজ

প্রিয় লালাজী,

তোমার চাল ও পাঁচ টাকা যথাসময়ে পেয়েছি। পরবর্তী মেলে আমি আমেরিকাতে পাঠাবার চেষ্টা করব। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কি ওখানে পৌঁছেছে? তাকে আমার ভালোবাসা ও প্রণাম জানাবে। এবং তাকে বলো যে আলাসিঙ্গা শীঘ্রই যাচ্ছে। নিরঞ্জন যে ফটো চেয়েছিল, সে আলমোড়াতে নিয়ে যাচ্ছে।

আলাসিঙ্গা ও তার শালা বদ্রীনারায়ণের পথে তোমার ওখানে থাকবে। এখানে আমরা সবাই ভালো। স্বামী সদানন্দ তার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তোমাদের সকলকে জানাচ্ছে। আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তুমি, জয়রাম, গাঙ্গী, দামু, অমরনাথ, গোপী, ধনলাল ও তোমার পরিবারের সকলে জানবে। আমার বিশেষ ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সিদ্ধদাসকে জানাবে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় আমি এখানে গীতা ক্লাস নিই। মাঝে মাঝে আমাকে লিখবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(১০০)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর
১৯-১১-১০ (১৯১০)

প্রিয় নাইডু,

ক্রিয়া আসে আমাদের ভিতর থেকে, আর প্রতিক্রিয়া বাইরে থেকে। কর্ম ভিতর-বাহির উভয় থেকেই আসে। এটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার ফল আসে না; কর্মই আমাদের ফল আনে। ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও কর্ম জীবের মধ্যে থাকে, তারা একত্রে জীবের মধ্যে থাকে। সুতরাং কর্ম জীবকে সংক্রামিত করে। সেজন্য জীব জানে না কিভাবে নিজেকে কর্ম থেকে পৃথক করতে হবে। জ্ঞানীরা জানে কিভাবে পৃথক করতে হবে। সেজন্য তাঁদের উপর মন্দ বা ভালো কর্মের ফলের প্রভাব পড়ে না। অজ্ঞ ব্যক্তিরা জানে না কিভাবে পৃথক করতে হবে। ফলে তাঁরা কর্মের ফলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁরা কষ্টভোগ করেন এই অজ্ঞানতার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—জ্ঞানাগ্নি সব কর্মকে নাশ করে। সুতরাং জ্ঞানী হও এবং তাহলে কর্ম তোমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি
রামকৃষ্ণানন্দ [১]

---

১ প্রবুদ্ধ ভারত, জানুয়ারি ১৯১৬, পৃঃ ১৩

(১০১)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর, মাদ্রাজ
১৯-১১-১০

প্রিয় বন্ধু,

আপনার পত্রের উত্তর দিতে দেরি হলো, সেজন্য কিছু মনে করবেন না। অসুস্থতা এবং তজ্জনিত দুর্বলতা তার কারণ। আপনার সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার "মানবের আত্মা" বইটি মনোযোগ সহকারে আর একবার পড়তে আপনাকে অনুরোধ করি। এতে এমন কিছু বলা হয়নি যা কেবলমাত্র বিশ্বাস করতে হবে। আমার পাঠকদের তাদের বিচার শক্তি পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে আমি বলেছি। মূর্খরাই না বুঝে বিশ্বাস করে।

আমাদের মতে যা যুক্তিগ্রাহ্য তাই ধর্ম। যে ঘটনাগুলিকে আমরা পছন্দ করি না সেগুলি হতে অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরানো আমাদের উচিত নয়। স্বর্গ ও নরক পৃথিবীর ন্যায় স্বতন্ত্র লোক। কিন্তু সেগুলি তাদের পক্ষে সত্য যারা বিশ্বের বাস্তব সত্তায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ যারা মহামায়ার প্রভবাধীন। কিন্তু জ্ঞানের নিকট স্বর্গ বা নরক বা মর্ত্য মিথ্যা। জ্ঞানী জানেন যে একমাত্র সনাতন সত্য জগতে আছে। তা এখানে এবং এখনি সংবেদ্য। তিনি স্বীয় আত্মার মহিমা দর্শন করেন এবং অন্য কিছুই দর্শন করেন না।

আমাদের দৃষ্টি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত অনেক প্রাণী আছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আমাদের স্থূল দৃষ্টি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করে। কিন্তু আর একপ্রকার উন্নত উপায় আছে যার দ্বারা দৃষ্টিকে অসীম করা যায়। স্বভাবতই আমাদের চক্ষু সীমাবদ্ধ। সেই চর্মচক্ষু হতে দৃষ্টিকে বিযুক্ত করতে পারলেই তা অনন্তপ্রসারী হয়। চক্ষু আমাদের অসীম দৃষ্টিকে সসীম করে। এবং যদিও অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র চক্ষুর সসীমতা অনেক পরিমাণে দূর করে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে করতে পারে না। যদি একাগ্রতার সাহায্যে ক্রমশ দৃষ্টিশক্তিকে উহার ইন্দ্রিয়, নেত্রস্নায়ু ও মস্তিষ্ক হতে পৃথক করা যায় তাহলে আমাদের দৃষ্টি অসীম হবে। সেই দৃষ্টির দ্বারা যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, দেবতা এবং উপদেবতা প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। স্নায়ুজালে আবদ্ধ হয়ে অসীম সসীমরূপে প্রতিভাত হয়। মানসিক একাগ্রতার দ্বারা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধিকে উক্ত স্নায়ুজাল হতে মুক্ত করতে পারি।

যদি আপনি শ্রীমদ্ভাগবতম্ (একটি ইংরেজি অনুবাদও চলবে) পাঠ করেন, তাহলে স্বর্গ, নরক এবং পাতাললোকের অবস্থান জানতে পারবেন। যদি কতগুলি বড় বড় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার দ্বারা আমার পুস্তকে ঐ সকল বিষয় আপনাকে বুঝাতে চেষ্টা করতাম, তা অনায়াসে পারতাম। কিন্তু তাতে আপনার সংশয় না কমে বরং বৃদ্ধি পাবে। বড় বড় বাক্য আমরা যতই ব্যবহার করব, ততই আমাদের বক্তব্য সহজবোধ্য হবে। এবং আমরা ততই সেপথে স্বাভাবিক চিন্তক হতে পারব।

যদি অদূর ভবিষ্যতে আপনি মাদ্রাজে আসেন এবং অনুগ্রহপূর্বক আমার সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে আমরা পরস্পর সাক্ষাৎভাবে আলোচনা করে সন্দেহ নিরাকরণ করতে পারি। আপনার প্রশ্নগুলির যে সামান্য ও অসন্তোষকর জবাব দিয়েছি, তাতে আপনাকে ততদিন পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। আপনি যে এমন সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে বুঝা যায় যে আপনি পরমার্থ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। যারা একান্ত অজ্ঞ বা যারা পূর্ণজ্ঞানী তাদের জিজ্ঞাস্য নেই। জিজ্ঞাসা উঠলে জবাব নিশ্চয়ই আসবে। আপনার সকল প্রশ্নের সমাধান ঈশ্বরকৃপায় আসুক অন্তর হতে, যেখানে পরমাত্মার চির আবাসস্থল। তাঁর নিকট প্রার্থনা করুন এবং আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, যদি আপনি সত্যই আগ্রহান্বিত হন তাহলে উত্তর তাঁর নিকট হতে নিশ্চয়ই আসবে। আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন।

ইতি

আপনাদের শুভানুধ্যায়ী

রামকৃষ্ণানন্দ[১]

(১০২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

প্রিয় রামু,

সে সর্বদা ভালো কিছু করে। আজ সকালে রঙ্গস্বামী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে বেশ ভালো লোক! আশাকরি আমাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত

১ প্রবুদ্ধ ভারত, ১৯১৫। তেলিচেরী থিওসফিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক শ্রীভি. কুনহীকাঞ্চন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের "মানবের আত্মা" নামক ইংরেজি পুস্তকের পাঠ শেষ হবার পর যে পত্র লিখেছিলেন তার উত্তরে শশী মহারাজের এই পত্র।

হোমের জন্য তুমি নতুন ছেলেকে পাচ্ছ। যদি না পাও তাহলে চুক্তির চিঠি দিও না। ...আমরা নিতে পারি, না হলে ত্যাগ করা উচিত। আশাকরি শ্রীপঞ্চপাকাথা আইয়ার, রামানুজ, শ্রীনিবাসাচারী, সুব্বারাও ও তুমি নতুন হোমের ছেলেদের দেখাশুনা করছ। রুদ্র ও প্রকাশ আছে? আশা করি তুমি তাদেরকে মঠের খরচের অর্থ যোগান দিচ্ছ। এখানের জলবায়ু খুব ভালো। মঠ বাড়ির মেরামত কি আরম্ভ হয়েছে? যত শীঘ্র পার, কর। কারণ, বৃষ্টিকালে বাড়ির আরও ক্ষতি হবে। বিস্তৃত করে সব কিছু লিখো। 'হিন্দু'র সম্পাদক ছ-মাস মঠে কাগজ পাঠাবার জন্য ছ-টাকা মূল্য ধরেছে। কিন্তু তাদেরকে পাঠাতে না বলো। কারণ এত পরিমাণ অর্থ দেওয়া মঠের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তুমি রামানুজ ও অন্য বন্ধুরা জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুনশ্চঃ শ্রীসেথেলুকে তার ১০ টাকা দানের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিও। ব্যাঙ্গালোর মঠ-ফান্ডের জন্য দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। বর্তমানে মঠের টাকার দরকার। সেজন্য তোমাকে এই খাতে সেথেলু যেন টাকা দেয়। তা দেখো। যদি পাও তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিও। —রামকৃষ্ণানন্দ

(১০৩)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মায়লাপুর
১-০৪-১১

প্রিয় নারায়ণ,

আমাদের পরম প্রিয় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি আজ সন্ধ্যায় কলকাতা যাত্রা করছেন। আশা করি গত রাত্রে ডাঃ হ্যালকের সঙ্গে তোমার যাত্রা মঙ্গলমত হয়েছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি তোমার উপহারে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁর জন্য সুন্দর রূপোর চুমবুনত, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য সুন্দর ছোট পাত্র, রাধুর জন্য আর একটি সুন্দর চুমবুনত প্রায় ৩৫ টাকা খরচা হয়েছে। দুজন মহিলার জন্য সিল্কের কাপড় পাওয়া যায় নি এবং এজন্য তাদের প্রত্যেককে আট টাকা দিয়েছি।

আজ সকালে স্বামী নির্মলানন্দ এখানে এসেছে। সে কলকাতায় এঁদের নিয়ে যাবে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির অজস্র ভালোবাসা ও আশীর্বাদ তোমরা সকলে জানবে।

তোমার প্রিয় পিতাকে আমার কথা বোলো। আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির আশীর্বাদ তাকে জানাবে।

আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

(১০৪)
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Mylapore
14.05.1911

My dear Rudra,

তোমার পত্র পাইয়া পরম সুখী হইলাম। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভালো আছে। তবে দুর্বলতা সারিতে অনেক দিন লাগিবে। তুমি অতুলকে কহিবে সে যেন তাহার পিতাকে ও ভ্রাতাকে স্নেহপূর্ণ পত্র লিখে। প্রকাশ এখান হইতে যাইলে তাহাকে কলকাতায় এখনি ভালো দিন দেখিয়া যাওয়া উচিত। কারণ মঠে একা থাকা তোমার পক্ষে ভালো নয়। যে ছেলেটিকে শ্রীশ্রীমহারাজ আমার নিকট পাঠাইয়াছেন আমি তাহাকে তোমার নিকট পাঠাচ্ছি। একা থাকা বড় কঠিন। কত প্রলোভন আসিতে পারে। I shall write to Ramoo seperately ...

My love & blessings to him. তুমি ও প্রকাশ আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

yours Afftly.
রামকৃষ্ণানন্দ

Post Card
Brahmachari Sriman Rudra Chaitanya
Sri Ramakrishna Mission
Brodies Road
Mylapore, Madras

(১০৫)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Bangalore
24-05-1911

My dear Rudra,

অনেকদিন তোমার কোনও পত্র না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত আছি। আশাকরি তুমি ভালোই আছ ও শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সেবা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। তুমি এইবার বসাককেও বাড়ি যাইতে কহিও। আর অধিক বিলম্ব করা ভালো নয়। পিতা মাতার মনে কষ্ট দিলে ধর্ম হয় না। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেক ভালো। তবে কাশিটা প্রায় সেইরূপই আছে। একটু কম। এখানে আজকাল বৃষ্টি বেশ হইতেছে। climate তজ্জন্য একটু dampy এবং রোগ সারিতে একটু বিলম্ব হইবে। তুমি কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সেবা করিয়া যাও। তাহা হইলে তোমার চতুর্বর্গ লাভ হইবে এ ইহজীবনে। সেবা বিনা সিদ্ধবস্তু নাহি হয় লাভ। তুমি আমার হৃদয়ের প্রগাঢ় ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। Please convey my love & blessings to Ramoo, Basak & all friends.

I am yours afftly.
Ramakrishnananda

(১০৬)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ব্যাঙ্গালোর
৪.৬.১১

প্রিয় রুদ্র,

স্বামী নির্মল, ব্রহ্মচারী প্রকাশ এবং আমি পরশুদিন সন্ধ্যায় মাদ্রাজ রওনা হচ্ছি এবং পরের দিন সকালে পৌঁছবো। একই দিনে কলকাতায় সন্ধ্যায় যাত্রা করব। আমি ভালো বোধ করছি। আশা করি শীঘ্রই তোমাদের সকলকে সুস্থ দেখব। রামু ও অন্যান্য বন্ধুদের আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাবে। তুমি আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নেবে। ইতি

তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পুঃ—পরে বিষ্ণু চৈতন্য আসবে।

(১০৭)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

১৫/৬/১১
১২, ১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেন
বাগবাজার, কলকাতা

প্রিয় রুদ্র,

তুমি ও মাদ্রাজের অন্যান্য বন্ধুরা জেনে খুশি হবে যে আমি আগের চেয়ে ভালো। ডাঃ নীলরতন সরকারের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের অভিমত যে আমার অসুখ বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এবং যদি ভালোমত যত্ন নেওয়া হয় তাহলে খুব অল্পদিনের মধ্যে সেরে যাবে। শ্রীগুরুমহারাজের সকল পুরাতন ভক্তদের শুভেচ্ছায় আমার রোগের অর্ধেক কমে গেছে। আশাকরি মঠের সুনাম বজায় আছে। আমার সকল চিঠি উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠিও। আমি এখানে একমাসের উপর থাকতে পারি।

তুমি, বিষ্ণু চৈতন্য, রামু, রামানুজ, বালসুব্রামনিয়াম আমার গভীর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

প্রকাশ আমার খুব দেখাশুনা করিতেছে। (মূল বাংলা)

ইতি
তোমাদের
রামকৃষ্ণানন্দ

পঞ্চম পর্ব

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের রচনা-সংগ্রহ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন। তিনটি ভাষায় তিনি লিখেছেন ও অনুবাদ করেছেন। সংস্কৃত ও ইংরেজিতে তিনি ভাষণ দিয়েছেন মাদ্রাজসহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে, রেঙ্গুন ও বোম্বাইতে। তাঁর ভাষণগুলি খুবই উচ্চমানের এবং বহুল প্রশংসিত। তাঁর বক্তৃতাগুলি একত্রিত করে বেশ কয়েকটি বই মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, তাঁর অনেক বক্তৃতা 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'বেদান্ত কেশরী' ও 'ব্রহ্মবাদিন্'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি অনুবাদ করা হয়েছে বাংলাতে। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত শ্রীরামানুজ জীবনী এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ। কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ বাংলাতে লিখেছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য। আলমবাজার মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ সংস্কৃতে পদ্যছন্দে অনুবাদ করেছিলেন এবং অধুনালুপ্ত 'বিদ্যোদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত 'বিবেকানন্দ পঞ্চকম্' আমাদের কাছে অমর গাথা। স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত 'অম্বাস্তোত্রম্'-এর বাংলা পদ্যানুবাদ এবং রাজা কুলশেখরের 'মুকুন্দমালা স্তোত্রম্' বাংলায় সরল অনুবাদ বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের এসকল প্রবন্ধ, অনুবাদ ও স্তোত্র একত্রে এখানে সন্নিবেশিত হলো। নামকরণ করা হয়েছে 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের রচনা সংগ্রহ'।

কিছু বক্তব্য

২৪ পরগণার ভাটপাড়ার 'দি ওরিয়েন্টাল নোবিলিটি ইনস্টিটিউট' 'বিদ্যোদয়' নামে উচ্চমানের একটি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করত। 'বিদ্যোদয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়। পত্রিকাটি আলমবাজার মঠে আসত। পত্রিকাটির নিয়মিত পাঠক ছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ। তিনি নিজেও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। সময় ১৮৯৬ সাল। ঐ সময়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-গৃহি-শিষ্য শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' নামক পুস্তিকা হতে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি নির্বাচিত উপদেশ সংস্কৃত শ্লোকে রচনা করেন এবং 'বিদ্যোদয়' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান। 'বিদ্যোদয়' পত্রিকা এগুলি সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে ১৮৯৬ সালের জুন-জুলাই (আষাঢ় পৃঃ ১৪৪-১৪৭) এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (ভাদ্রঃ পৃঃ ১৯৩-১৯৯) সংখ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিঃ' নামে প্রকাশ করেন।

১৯৭৭-৭৮ সালে আমাদের ইংরেজি মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধভারত'-এর (মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত) তৎকালীন সম্পাদক স্বামী বলরামানন্দ 'বিদ্যোদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের রচিত শ্লোকগুলির কথা জানতে পারেন। তাঁরই উদ্যোগে আমাদের শুভানুধ্যায়ী শ্রীশৌতিরকিশোর চৌধুরী আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে 'বিদ্যোদয়' পত্রিকার খোঁজ পান। জাতীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় শ্রীচৌধুরী 'বিদ্যোদয়' পত্রিকা হতে এগুলি কপি করেন। এ বিষয়ে শ্রীচৌধুরীকে সাহায্য করেছিলেন আমাদের ভক্ত শ্রীসঞ্জয় মণ্ডল ও তাঁর পিতৃবন্ধু শ্রীভট্টাচার্য। 'প্রবুদ্ধভারত' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের রচিত শ্লোকগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। মূল শ্লোকসহ ইংরেজি অনুবাদ 'Teachings of Sri Ramakrishna' 'শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিঃ', 'প্রবুদ্ধভারত' পত্রিকায় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত। শ্লোকগুলির সংখ্যা ছাপান্ন।

আমরা ইংরেজি অনুবাদ নিইনি। যেহেতু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' পুস্তিকা হতে উপদেশগুলি নির্বাচন করেছিলেন,

সেজন্য আমরাও ঐ পুস্তিকার অনুসরণ করেছি। কম-বেশি আমরা সব উপদেশগুলি পেয়েছি—একটি বাদে। শ্লোকগুলি পড়ে আমাদের মনে হয়েছে যে কতকগুলি উপদেশ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সোজাসুজি সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ করেছেন—এগুলির তথ্যটীকা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া আছে। তিনি অনেকগুলি উপদেশের ভাবার্থ নিয়ে নিজের মতো শ্লোক রচনা করেছেন—এগুলির অনুবাদ আমরা করেছি এবং এর তুলনীয় উপদেশ পাদটীকায় (ফুট নোট) দেওয়া হয়েছে। তারও তথ্যটীকা বন্ধনীর মধ্যে আছে। আমরা 'দি হরমোহন পাবলিশিং এজেন্সি' (২৪ কাশীদত্ত স্ট্রিট, কলকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ" [অষ্টম সংস্করণ (মাঘ ১৩৩৩ সাল)] থেকে সব তথ্যসূত্র দিয়েছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'বিদ্যোদয়' পত্রিকার প্রকাশনা বহু বছর পূর্বে বন্ধ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিঃ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

চিন্ময়মণ্ডলে সূর্যবিভাপ্রভাবাৎ
যথা দিবা যে ন বিভান্তি ভানি।
বিভুস্তথা মোহবলাদদৃষ্টা
নিরীশ্বরং কেঽপি বদন্তি বিশ্বম্ ॥ ১ ॥

রাত্রে আকাশে কত তারা দেখ, সূর্য উঠলে দেখতে পাওনা বলে কি বলবে দিনের বেলায় আকাশে তারা নেই? সেরকম অজ্ঞান অবস্থায় ঈশ্বরকে দেখতে পাওনা বলে কি বলবে ঈশ্বর নাই?

অপ্যব্ধিনীরং লবণেন পূর্ণম্
নাস্বাদনাৎপ্রাগবগম্যতে কৈঃ?
ইদং জগৎপূর্ণমপীশশক্ত্যা
কস্তাং বিজানাতি বিনা সুচেষ্টাম্ ॥ ২ ॥ [১]

অন্তত এক গণ্ডুষ পান না করে সমুদ্রের জলে লবণের অস্তিত্ব কি টের পাওয়া যায়? একই ভাবে বিনা প্রচেষ্টায় সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে জানা যায়?

উড্ডীয়মানো বিয়তীহ গৃধ্রো
দৃষ্টিং যথায়ং কুণপেষুধত্তে।
দৃষ্টিস্তথা যাত্যপি পণ্ডিতানাং
নিরর্থকেষ্বর্থযশঃসু নিত্যম্ ॥ ৩ ॥

শকুনি অতি ঊর্ধ্বে উড়ে, কিন্তু তার দৃষ্টি থাকে গোভাগাড়ে, বইপড়া পণ্ডিতেরা অতি উঁচু উঁচু জ্ঞানের কথা বলে বটে, কিন্তু তাঁদের মন থাকে অসার চাল-কলা, ধন-মান ও বিদায়ের উপর।

ইত্যুপাখ্যানেন অভ্যাসজন্মস্য স্বভাবস্যৈব প্রাধান্যং প্রদর্শিতং ভগবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবেন। অভ্যাসবশাদেব কুসংসর্গী সাধুসঙ্গমিচ্ছন্নপি ন তমনুষ্ঠাতুং শক্নোতি; ভবতি তু তস্য সমধিকা প্রীতির্দুঃসঙ্গেন। কামিনীকাঞ্চনসংসর্গী পুরুষঃ

---

১ সমুদ্রের জল পান করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার মধ্যে যেমন লবণের অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন, এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতির অস্তিত্ব সেইরূপ নিশ্চয়রূপে বোঝা যাইতে পারে।

ন কদাপি তদাসক্তি বিহায় শুদ্ধে সচ্চিদানন্দময়েঽবিগ্রহে পরব্রহ্মনি চিত্তং সমাধাতুং শক্নোতি।

অতএব

যতোঽভ্যাসাৎ স্বভাবোঽয়ং স্ত্রীপুংসাং জায়তে ধ্রুবম্।
যতঃ সর্বঃ সদৈবেহ স্বভাবমনুবর্ততে ॥ ৪ ॥
কদভ্যাসং ততঃ সর্বো বিহায় তৎস্বভাবতঃ।
সদ্ভাবান্ সমনুষ্ঠায় বিমলানন্দভাগ্ ভবেৎ ॥ ৫ ॥

এই কাহিনির মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখালেন মানুষের বহুদিনের অভ্যাসজাত স্বভাবের প্রাধান্য কত বড়! বস্তুতই কুসংসর্গে থাকতে থাকতে এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে তখন ইচ্ছা থাকলেও আর সাধুসঙ্গ করা সম্ভব হয় না। তার দুঃসংসর্গেই প্রীতি বেশি। তাই দেখা যায় কামিনীকাঞ্চনে সদাসক্ত পুরুষ কখনই কামিনীকাঞ্চনাসক্তি পরিত্যাগ করে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে মনকে নিবিষ্ট করতে পারে না।

এই ভাবে দেখা যাচ্ছে যে নিরন্তর অভ্যাসের মধ্য দিয়েই স্ত্রী-পুরুষের নিজ নিজ স্বভাব বা প্রবৃত্তি গড়ে উঠে এবং তারা এই স্বভাবের বশবর্তী হয়েই সদা সর্বদা চালিত হয়। এমনকি কদভ্যাসের তাড়নায় তারা তাদের সুপ্রবৃত্তিকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করে। অতএব সকলের সর্বদা সু-অভ্যাসের যত্নশীল অনুশীলনের মাধ্যমে বিমলানন্দ লাভের চেষ্টা করা উচিত।

কৃপণেষু যথাঽর্থেষু স্পৃহাস্তি বলবত্তমা।
তথৈব তব লোভোঽস্তু শ্রীহরেঃ পাদসেবনে ॥ ৬ ॥[২]

কৃপণের লোভ যেমন টাকাতে অত্যন্ত প্রীতি, তেমন শ্রীহরির পাদসেবায় এরূপ লোভ জন্মাক।

ফলোদয়ে ক্ষয়ং যান্তি যথা পুষ্পদলানি বৈ।
জ্ঞানোদয়ে তথা হি অত্র মানমোহমদান্ধতাঃ ॥ ৭ ॥[৩]

(বৃক্ষে) ফল আসার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প-পাপড়িগুলি যেমন খসে পড়ে, ঠিক তেমনি হৃদয়াকাশে জ্ঞানসূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানমোহমদাদি সকল অপসারিত হয়।

২ তাঁর প্রতি কিরূপ মন চাই? ...কৃপণের যেমন টাকাতে মন, তেমন তাঁতে চাই।

৩ আমিত্ব কি সম্পূর্ণ দূর হবে না? পদ্মের পাপড়ি খসে যায়, কিন্তু তার দাগ যায় না, আমিত্ব যায়, কিন্তু একটু দাগ থাকে, সে দাগে কোন কার্য হয় না।

হৃদাকাশমিদং যাবৎ বাসনাতমসাবৃতম্।
ব্রহ্মসূর্যোদয়স্যাস্মিন্ তাবদ্বৈ সম্ভবঃ কুতঃ ॥ ৮ ॥ [৪]

মানুষের হৃদয়াকাশে যতক্ষণ বাসনার ঘন তমিস্রায় সমাবৃত থাকে, ততক্ষণ সেখানে ব্রহ্মজ্ঞান-সূর্যের উদয়ের সম্ভাবনা কোথায়?

তাবৎ গুঞ্জতি ভৃঙ্গোঽয়ং যাবৎ পুষ্পং ন গচ্ছতি।
পুষ্পালিঙ্গনমাসাদ্য নিঃশব্দো মধুপস্তদা ॥ ৯ ॥
তথায়ং পণ্ডিতস্তাবৎ বাদতর্কপরায়ণঃ।
পাণ্ডিত্যঘোষণায়োচ্চৈঃ শাস্ত্রার্থকথনোৎসুকঃ ॥ ১০ ॥
শাস্ত্রাণাং প্রতিপাদ্যস্য সর্বেষামীশ্বরস্য তু।
যাবন্ন লভতে ভক্তিং পাদপঙ্কজযুগ্ময়োঃ ॥ ১১ ॥
যদা তু তৎকৃপালেশাৎ তদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।
তদালোকননির্বৃত্যা নিশ্চেষ্টো জায়তে তদা ॥ ১২ ॥[৫]

ফুলে বসে মধুপান না করা পর্যন্ত ভ্রমর গুনগুন করে গুঞ্জন করতে থাকে। ফুলকে আলিঙ্গন করে নিঃশব্দে মধুপান করে। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিরা যুক্তির সাহায্যে তর্ক করে এবং শাস্ত্রার্থব্যাখ্যানে উৎসুক থাকে যতক্ষণ না শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য সর্বান্তর্যামী ভগবানের পাদপদ্মে তার ভক্তি জন্মায়। কিন্তু ভগবানের অশেষ কৃপায় একবার তাঁর ভক্তি লাভ হলে পাণ্ডিত্য দেখানোর ছটফটানি একেবারে থেমে যায়। তখন তিনি শান্ত হয়ে যান।

চিত্তে মায়াপরিচ্ছিন্নে বিভুর্নৈব বিকাশতে।
রূপং মলসমাচ্ছন্নে দর্পণে কিং প্রকাশতে ॥ ১৩ ॥

যেমন আরশিতে ময়লা পড়লে মুখ দেখা যায় না, তেমনি হৃদয়ে ময়লা পড়লে ঈশ্বরের ছবি পড়ে না। ময়লা মুছে ফেললে যেমন আরশিতে মুখ দেখা যায়, তেমনি হৃদয় নির্মল হলে ঈশ্বর প্রকাশ পান।

যথা ঘনঘটাকাশে সূর্যমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
মহামায়া তথৈবেহ বিভুমাবৃত্য বর্ততে ॥ ১৪ ॥

---

৪ বিষয়াসক্তি যতই কমিবে, ঈশ্বরের প্রতি মতিগতি ততই বাড়িবে।

৫ মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চারদিকে গুনগুন করে, ততক্ষণ সে মধু পায় নাই। মধু পেলে আর সে গুন গুন করে না, চুপ করে মধু পান করে। মানুষ যতক্ষণ ধর্ম লয়ে গোল করে, ততক্ষণ সে ধর্মের আস্বাদ পায় নাই, পেলে চুপ করে যায়।

মায়ায়াং বিনতায়াস্তু বিভুঃ সর্বত্র ভাব্যতে।
জলদেঽপগতে সূর্যো যথা সর্বত্র দীপ্যতে ॥ ১৫ ॥

মেঘেতে যেমন সূর্যকে ঢেকে রাখে, মায়াতে তেমনি ঈশ্বরকে ঢেকে রেখেছে, মেঘ সরে গেলেই যেমনি সূর্যকে দেখা যায়, মায়া দূর হলে তেমনি ঈশ্বরকে দেখা যায়।

তরঙ্গসংকুলেঽম্ভোধৌ চন্দ্রবিম্বানি খণ্ডশঃ।
খেলন্তীব যথা চন্দ্রং সংবিভগ্য সহস্রশঃ ॥ ১৬ ॥
তথা সুচঞ্চলে চিত্তে সংসারাবদ্ধচেতসাম্।
পবিত্রেঽপি ব্রহ্মভাবাঃ ক্ষণমায়ান্তি যান্তি চ ॥ ১৭ ॥[৬]

তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের ঢেউতে চন্দ্রের শতসহস্র খণ্ডিত প্রতিবিম্ব যেমন খেলা করতে থাকে, সংসারাবদ্ধ চঞ্চলচিত্ত জীবের মনেও তেমনি ক্ষণকালের পবিত্রতার জন্য ব্রহ্মভাব দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়—স্থায়ী হয় না।

সহস্রবৎসরব্যাপি তমঃ-পূর্ণগৃহোদরম্।
সর্বত্র দ্যুতিমদ্ভাতি দীপযোগাদ্যয়া জবাৎ ॥ ১৮ ॥
মনোমলং কিল্বিষ্যাখ্যং সহস্রজন্মসঞ্চিতম্।
শ্রীহরেঃ করুণালেশাৎ তথা তূর্ণ পলায়তে ॥ ১৯ ॥ [৭]

হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে পিদ্দিম জ্বাললে তখুনি আলো হয়। তেমনি হাজার জন্মের সঞ্চিত পাপ শ্রীহরির একবার করুণাকটাক্ষে দূর হয়ে যায়।

ত্যজন্তি সাত্ত্বিকাঃ সর্বং কথং গোবিন্দমানসাঃ।
ধনং ধান্যং যশোমানং পুত্রদারগৃহাদিকম্? ॥ ২০ ॥
বিস্মৃত্য নিখিলান্ ভোগান্ বিহায় জীবিতস্পৃহাম্।
পতঙ্গোঽয়ং যথা যাতি প্রদীপ্তজ্বলনং প্রতি ॥ ২১ ॥
যথা হি মক্ষিকা তূর্ণ তুচ্ছিকৃত্য স্বজীবিতম্।
পরমানন্দাস্থায় মধুভাণ্ডে নিমজ্জতি ॥ ২২ ॥
তথেতররসান্ সর্বান্ বিস্মৃত্য সন্বিহায় চ।
শ্রীবিষ্ণুমুপগচ্ছন্তি ভগবৎ-পরায়ণাঃ ॥ ২৩ ॥

---

৬ তরঙ্গপূর্ণ ময়লা জল মধ্যে চন্দ্রবিম্ব যেমন খণ্ড খণ্ড দেখায়, মায়াপূর্ণ সংসারী মানবের অন্তরে সেইরূপ ঈশ্বরের আংশিক আভামাত্র দেখা যায়।

৭ হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে পিদ্দিম জ্বাললে তখুনি আলো হয়। হাজার জন্মের পাপ তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

(প্রশ্ন ঃ) সাত্ত্বিক ভক্ত কেন ও কিসের টানে ধন-মান এবং স্ত্রীপুত্রগৃহাদি সুখ পরিত্যাগ করে শ্রীগোবিন্দের শরণাগত হয়?

(উত্তর ঃ) পতঙ্গ যেমন সকল ভোগস্পৃহা এবং এমনকি নিজের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে আগুনের দিকে ধেয়ে যায়, মধুলোভী মৌমাছি যেমন নিজের জীবন তুচ্ছ করে কেবলমাত্র পরমানন্দলাভের আশায় মধুভাণ্ডে ঝাঁপ দেয়, ঠিক ঠিক ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিও তেমনি কেবলমাত্র শ্রীবিষ্ণুর সান্নিধ্যলাভের জন্য সর্বপ্রকার জাগতিক ভোগসুখের চেষ্টা পরিত্যাগ করে।

এবং জলং যথা ভিন্ননামভির্ব্রুবতে জনাঃ।
'বাঁটর'—ইতি বা কেচিৎ 'অক্বা'—ইতি বা পরে ॥ ২৪ ॥
'পানী'তি বা বদন্ত্যেকে অভিন্নং সলিলং ভুবি।
তথৈব সচ্চিদানন্দং নামভির্বহুভিঃ পৃথক্।
বদন্তি ভিন্নপুরুষা 'অল্লা', 'গাঁড' 'জিহোবে'তি বা ॥ ২৫ ॥

যেমন এক জলকে কেউ বারি বলে, কেউ পানি বলে, কেউ ওয়াটার বলে, কেউ একোয়া বলে, তেমনি এক সচ্চিদানন্দকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কেউ আল্লা বলে, কেউ গড্ বলে, কেউ জিহোবা বা অন্য কিছু বলে।

অধুনৈব ময়া দৃষ্টঃ বৃকলাসো মনোহরঃ।
বৃক্ষশাখাগ্র-ভাগোঽস্মিন্ রক্তবর্ণঃ সমুজ্জ্বলঃ ॥ ২৬ ॥
পত্রান্তরং প্রবিষ্টোঽসৌ ইদানীন্তু ন দৃশ্যতে।
কিং ভ্রাতঃ স ত্বয়া দৃষ্টঃ সরটো ভৃশমদ্ভুতঃ ॥ ২৭ ॥
'ভ্রাতর্ময়াপি দৃষ্টোঽসৌ নূনং পীতো ন রক্তভাক্।'
তস্য তদ্বচনং শ্রুধাঽব্রবীত্তং প্রথমোঽধ্বগঃ ॥ ২৮ ॥
'কিং কামলরুজা ভ্রাতরং দৃষ্টিস্তে কলুষীকৃতা।
কথং ত্বং মন্যসে পীতমমুং কোকনদচ্ছবিম্' ॥ ২৯ ॥
পরিহাসমিমং শ্রুত্বা তমুবাচ ততোঽপরঃ।
নাহং কামলবানস্মি ন মে দৃষ্টির্ভ্রমাত্মিকা ॥ ৩০ ॥

দুজন লোক ঘোর তর্ক আরম্ভ করেছে। একজন বলছে অমুক খেজুর গাছে সুন্দর লাল রঙের একটা গিরগিটি আছে। আর একজন বলছে তোমার ভুল হয়েছে গিরগিটি লাল নয়—নীল। তর্কে ঠিক না হওয়ায়, শেষে দুজনে খেজুর

তলায় গিয়ে যে সেখানে থাকতো তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন হে তোমার এই গাছে লালরঙের গিরগিটি আছে?"

সে বললে, "আজ্ঞা হ্যাঁ।" আর একজন বললে, "বল কি? সেটা তো লাল নয়—নীল।" সে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" সে জানতো গিরগিটি বহুরূপী, এই জন্যে যে যে রঙ বললে সে তাতেই হ্যাঁ দিলে।

সচ্চিদানন্দ হরিরও বহুরূপ। যে সাধক হরির যেরূপ দেখেছে, সে তাঁর সেই রূপই জানে। কিন্তু যে তাঁর বহুরূপ দেখেছে সেই কেবল বলতে পারে এ সকল রূপ সেই একই হরিরই বহুরূপ। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার এবং তাঁর আরো কত আকার আছে তা আমরা জানি না।

যথা বিলিপ্তে তু রসৈঃ প্রকাশতে
কাচস্য পৃষ্ঠে প্রতিরূপসঞ্চয়ঃ।
হৃল্লগ্নশুক্রে চ তথোর্ধ্বরেতসা-
মাদর্শবৎ সর্ববিভুঃ প্রকাশতে ॥ ৩১ ॥ [৮]

আয়নার একদিকে পারা মাখানো থাকে বলে অন্যদিকে বস্তুর প্রতিরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, একইভাবে ঊর্ধ্বরেতা জিতেন্দ্রিয় পুরুষের বিশুদ্ধ হৃদয়রূপ আয়নাতেই একমাত্র বিভুরূপে সর্বত্র অবস্থানরত শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রকাশ পায়।

বাষ্পালোকা যথৈবেহ পুরবর্ত্মগৃহাদিকম্।
নানারুগ্‌ভির্দ্যোতয়ন্তি হি এককোশাৎ সমাগতাঃ ॥ ৩২ ॥
নানাজাতিকুলোদ্ভূতা অবতারাস্তথা ভৃশম্।
সর্বান্ দেশান্ ভাসয়ন্তি হি অদ্বয়েশাৎ সমাগতাঃ ॥ ৩৩ ॥ [৯]

গ্যাসের আলো যেমন রাজপথ থেকে শুরু করে গৃহের নানাস্থানে নানাভাবে জ্বলতে থাকলেও গ্যাসের একটি সুনির্দিষ্ট আধার থেকেই সর্বত্র আলো প্রবাহিত হয়। একমেবাদ্বিতীয় পরব্রহ্মও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও কুলে অবতীর্ণ হন।

---

৮ ময়লা আয়নাতে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু স্বচ্ছতে হয়। মায়ামুগ্ধ, ময়লা ও অপবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের আভা দেখতে পায় না, কিন্তু বিশুদ্ধাত্মা দেখতে পান। অতএব বিশুদ্ধ হবার চেষ্টা কর।

৯ গ্যাসের আলো নানা স্থানে নানাভাবে জ্বলছে, কিন্তু এক আধার হতে আসছে। নানা দেশের নানা জাতির ধার্মিক লোক সেই একই পরমেশ্বর হতে আসছে।

যথা স্পর্শমণিং স্পৃষ্টা লোহঃ কাঞ্চনতাং গতঃ।
স্থাপিতো যত্র কুত্রাপি বিকৃতিং নৈব গচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥
তথা সদ্‌গুরুসংসর্গাদ্ যদা নির্মলতাং ব্রজেৎ।
শুভান্বিতো জনঃ কোঽপি ন পুনঃ কিল্বিষো ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

লোহা যদি একবার স্পর্শমণি ছুঁয়ে সোনা হয়, তাকে মাটির ভিতর রাখ, আর আস্তাকুড়েই ফেলে রাখ, সোনাই থাকবে লোহা হবে না। যিনি ঈশ্বর পেয়েছেন তাঁর অবস্থা সেইরকম। তিনি সংসারেই থাকুন, আর বনেই থাকুন তাঁর গায়ে আর কিছুতেই দাগ লাগবে না।

যথা স্পর্শমণেঃ স্পর্শাৎ তরবারো হি অয়োময়ঃ।
হিরণ্ময়ত্বমাসাদ্য ন তু রূপং ত্যজেৎস্বকম্ ॥ ৩৬ ॥
তথাপি পূর্ববন্ নান্যদ্ধিংসিতুং ক্ষমতে ত্বসৌ।
তথা হরিপদস্পর্শাৎ কশ্চিৎ পুণ্যবতাং বরঃ ॥ ৩৭ ॥
নির্মলত্বং সমাসাদ্য পূর্বদেহং সমাশ্রয়েৎ।
তথাপ্যসৌ পুনর্নেহ গচ্ছেদ্বৈ রিপুবশ্যতাম্ ॥ ৩৮ ॥

লোহার তরবারে স্পর্শমণি ছোঁয়ালে সোনার তরবার হয়, কিন্তু গড়নটা সেইরকম থাকে, তবে কি না তাতে আর হিংসার কাজ চলে না। সেরকম ঈশ্বরকে ছুঁলে আকার সেইরকমই থাকে, কিন্তু তার দ্বারা আর অন্যায় কাজ হয় না।

অয়স্কান্তগিরির্গুপ্তঃ সমুদ্রসলিলান্তরে।
বিশ্লেষয়ত্যয়ঃকীলান্ পোতেভ্যঃ ক্ষণমাত্রতঃ ॥ ৩৯ ॥
তথা হরিকৃপাকর্ষাৎ নরো বিগতবন্ধনঃ।
তৎ প্রেমার্ণবগর্ভে বৈ হি আত্মারামো নিমজ্জতি ॥ ৪০ ॥ [১০]

সমুদ্রের ভিতর লুকানো চুম্বক পাথর যেমন জাহাজের লোহার পেরেক খুলে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে তাকে জলে ডুবিয়ে দেয়, শ্রীহরিরকৃপাকর্ষণে আত্মারাম ব্যক্তিও তেমনি জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে শ্রীভগবানের প্রেমসায়রে নিমজ্জিত হয়।

---

১০ সমুদ্রের ভিতরে লুকানো চুম্বক পাথর যেমন হঠাৎ জাহাজের লোহার পেরেক খুলে ফেলে তাকে খণ্ড খণ্ড করে ডুবিয়ে দেয়, সেরকম জ্ঞান-চৈতন্য উদয় হলে অহংকার ও স্বার্থপূর্ণ জীবনকে মুহূর্তের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করে ঈশ্বরের প্রেম সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

সিদ্ধকন্দমূলাদীনি ভজন্তে মৃদুতাং যথা।
অসিদ্ধানি যথা তানি সন্ত্যেব কঠিনানি চ ॥ ৪১ ॥
নিষ্ঠুরোঽপি তথা সিদ্ধঃ পুরুষো জায়তে যদা।
কোমলত্বমবাপ্নোতি কাঠিন্যং সম্বিহায় সঃ ॥ ৪২ ॥
অসিদ্ধঃ স্বল্পসিদ্ধো বা স্বভাবাদ্ বিকৃতো ভবেৎ।
ভৃষাচারী ভৃষাভাষী সুদুষ্টো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৪৩ ॥ [১১]

আলু-পটল সিদ্ধ না হলে শক্ত থাকে, কিন্তু সুসিদ্ধ হলে নরম হয়ে যায়। তেমনি সিদ্ধাবস্থায় অন্য ব্যক্তির কা কথা, নিষ্ঠুরতম ব্যক্তির স্বভাবও কাঠিন্যহীন কোমলতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু অসিদ্ধ বা স্বল্পসিদ্ধ ব্যক্তির স্বভাব ক্রমশ বিকৃত হয়ে উঠে এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই মিথ্যাচারী, ভ্রষ্টাচারী ও ভণ্ড ব্যক্তিতে পরিণত হন।

স্বপ্ন-মন্ত্র-হঠ-কৃপা-নিত্যত্বাদি-বিভেদতঃ।
সিদ্ধা পঞ্চবিধাঃ জ্ঞেয়াঃ পৃথ্বীশোভাবিবর্ধনাঃ ॥ ৪৪ ॥[১২]

পাঁচ প্রকারের সিদ্ধপুরুষ পৃথিবীর শোভাবর্ধন করে বলে জানবে—এঁরা হলেন স্বপ্নসিদ্ধ, মন্ত্র বা সাধন সিদ্ধ, হঠাৎ সিদ্ধ, কৃপা সিদ্ধ এবং নিত্যসিদ্ধ।

স্বপ্নকালে যদা কোঽপি মন্ত্রং প্রাপ্য তু চেতনম্।
তেনৈব সিদ্ধিমাপ্নোতি স্বপ্নসিদ্ধঃ স উচ্যতে ॥ ৪৫ ॥

স্বপ্নকালে যদি কেউ মন্ত্র পেয়ে জ্ঞান লাভ করে, তাহলে সেই সিদ্ধি পাওয়াকে স্বপ্নসিদ্ধ বলে।

গুরুদত্তং শুভং মন্ত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
যো জপ্ত্বা সিদ্ধিমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধঃ স এব হি ॥ ৪৬ ॥

গুরুর মুখ হতে মন্ত্রোপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সেই মন্ত্র জপ দ্বারা ক্রমশ চিত্তশুদ্ধি করে যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহাদিগকে মন্ত্র সিদ্ধ বলা যায়।

হঠাৎ পাপ্য ধনং দীনো ভবেত্তূর্ণং ধনী যথা।
দুষ্টোঽপি সাধুতামেতি সহসৈব ক্বচিৎ ভুবি ॥ ৪৭ ॥

---

১১ সিদ্ধ হলে কিরূপ অবস্থা হয়? যেমন আলু, বেগুন ইত্যাদি সিদ্ধ হলে নরম হয়ে যায়। সেরকম মানুষ সিদ্ধ হলে নরম হয়ে যায়; তার অহঙ্কারাদি কেটে যায়।

১২ একটি বন্ধু বলেন, ঠাকুর বলতেন, পাঁচরকম সিদ্ধলোক দেখতে পাওয়া যায়—নিত্যসিদ্ধ, মন্ত্র বা ধ্যানসিদ্ধ [কেহ কেহ সাধন সিদ্ধও বলে], কৃপাসিদ্ধ, হঠাৎ সিদ্ধ ও স্বপ্নসিদ্ধ।

যেমন হঠাৎ কোন গরিব লোক মাটির ভিতর, কি অন্য উপায়ে টাকা পেয়ে বড়লোক হয়ে যায়, সেরকম অনেক পাপী লোক হঠাৎ বদলে গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে চলে যায়।

এদের হঠাৎ-সিদ্ধ বলে।

দীর্ঘকালতপস্যাভির্যৎ ফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ।
মুহূর্তেনৈব তৎপ্রাপ্য হঠসিদ্ধঃ স জায়তে ॥ ৪৮ ॥

সুদীর্ঘকাল তপস্যা করে মানুষ যে কোন মুহূর্তে এ ধরনের ফল পায়। এরূপ মানুষকে হঠসিদ্ধ বলে।

দীনং হীনং যথা দৃষ্ট্বা ধনী কৃপাপরায়ণঃ।
তস্যাপনয়তি ক্লেশং ধনদানেন সর্বথা ॥ ৪৯ ॥

বীক্ষ্যং কচিৎ দীনচিত্তং দুরাচারং নরং তথা।
করোতি সাত্ত্বিকশ্রেষ্ঠং গোবিন্দো দীনবৎসলঃ ॥ ৫০ ॥

তস্যৈব নরদেবস্য সর্বপূজ্যস্য বৈ তদা।
কৃপাসিদ্ধ ইতি খ্যাতির্ভবাতীহ ধরাতলে ॥ ৫১ ॥

যখন কোন ধনী কৃপাপরবশ হয়ে দীনহীন মানুষকে ধনসম্পত্তি দেয়, তখন সেই মানুষের কষ্ট লাঘব হয়। সেরকম কৃপাপরায়ণ ভগবান অসৎ ও দুষ্ট মানুষকে সাত্ত্বিক মানুষে উন্নীত করে। এধরনের মানুষকে সর্বত্র পূজা করে। এই মানুষকে বলে কৃপাসিদ্ধ।

কুষ্মাণ্ডালাবুবল্লীনাং যথা ফলোদয়াৎ পরম্।
পুষ্পাণি সম্ভবন্তীহ ফলানি চ ততঃ পরম্ ॥ ৫২ ॥

তথা যে নিত্যসিদ্ধাস্তে জন্মসিদ্ধা ভবন্তি বৈ।
তেষাং ত্বাজন্মসিদ্ধানাং কর্তব্যানীহ সন্তি ন ॥ ৫৩ ॥

তথাপি তেঽনুতিষ্ঠন্তি যানি কর্মাণি সিদ্ধয়ে।
তান্যেব লোকশিক্ষার্থং নিত্যসিদ্ধাস্ত এব হি ॥ ৫৪ ॥

যেমন লাউ-কুমড়োর ফুলের পর ফল ও সেই ফলের বাড়ন্ত হয়, সেরকম সেইসকল মানুষই নিত্যসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে যারা জন্মসিদ্ধ তাদের কোন কর্তব্য থাকে না। তবুও জগৎবাসীদের পথ দেখাবার জন্য তারা সাধনার জন্য সাধনা করেন। এরূপ মানুষকে নিত্যসিদ্ধ বলে।*

---

* উক্তিগুলি (৪৮-৫৪) সরাসরি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল বই-তে পাওয়া যায়নি।

যথা দূরতো হট্টকোলাহলোঽয়ং
অবোধ্যঃ সদা ভাতি সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ।
সমীপে তু বাণিজ্যকার্যোৎথ-শব্দাঃ
ক্রয়াদ্যর্থমুৎথাপিতা ভ্রান্তি নিত্যম্ ॥ ৫৫ ॥

হাট হতে দূরে থাকলে কেবল হাটের হো হো শব্দ শুনতে পায়, কিন্তু হাটের ভিতর ঢুকলে আর সে শব্দ শুনতে পায় না, তখন স্পষ্ট শুনতে পায় কেউ আলু চাচ্ছে, কেউ পটল চাচ্ছে। ঈশ্বর হতে দূরে থাকলে কেবল তর্কযুক্তি মীমাংসার গোলমালের মধ্যে পড়ে থাকতে হয়, কিন্তু তাঁর কাছে যেতে পারলে আর তর্ক মীমাংসা থাকে না, তখন সকলই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

তথা সৃষ্টিকাণ্ডমনন্তং বিলোক্য
হি অনীশং স্বতন্ত্রং বদন্তীহ মূঢ়াঃ।
সুধীঃ সূক্ষ্মদর্শী তু জানাতি নিত্যং
বিধাতাস্য নেতা প্রভুর্বিশ্বকর্তা ॥ ৫৬ ॥

ঠিক এভাবে এই অনন্ত সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কেবল মূঢ় ব্যক্তিরা একে ঈশ্বরহীন ও স্বয়ংসৃষ্টি বলে থাকে। কিন্তু জ্ঞানী তাঁর অন্তর্দৃষ্টিসহায়ে বুঝতে পারে যে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা হলেন স্বয়ং ঈশ্বর।

জেলেদের স্ত্রীরা ও তাদের আঁশঝুড়ির কাহিনি

একদা কোন সময়ে কয়েকজন জেলেদের স্ত্রীরা ঝুড়িভর্তি মাছ ধরার পর দূরদেশে মাছ বিক্রি করতে গিয়েছিল। সারাদিন তাদের সেখানে কাটল। সন্ধ্যায় খালি মাছের ঝুড়ি মাথায় করে বাড়ি ফিরছে। অর্ধেক রাস্তা আসার পর সন্ধ্যা হয়ে গেল। পথে নির্জন স্থান অতিক্রম করতে হবে—তাতে রাত্রি হয়ে যাবে। এদিকে আকাশ কালো হয়ে উঠল, বজ্র-বিদ্যুৎ সকলকে ভয় পাইয়ে দিল। ভয় পেয়ে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে আশ্রয় খোঁজ করতে লাগল। কাছেই এক বাগান দেখতে পেল। এক দৌড়ে সেখানে তারা গেল। সৌভাগ্যের কথা সেখানকার মালি দয়ালু ও ঈশ্বর ভক্ত। তাদের দুঃখে তার মন গলল। তাদের দুরবস্থা দেখে সে বাগানের একটি ঘর দেখাল রাত্রির আশ্রয়ের জন্য। এক প্রহর হলো, বৃষ্টি ও বজ্রপাত বন্ধ হলো। আকাশ পরিষ্কার হলো—তারা উঠল। সমগ্র জগৎ ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু মেছুনিদের চোখে একটুও ঘুম নেই—তারা যে ফুলের গন্ধে আছে। এরকম গন্ধে তারা অভ্যস্ত নয়। তারা তো মাছের গন্ধে অভ্যস্ত। তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলল ঃ 'বোনেরা, আমরা কি মন্দকর্ম করেছি, তার ফল ভোগ করছি—আমরা মালির ঘরে আশ্রয় পেয়েছি! আমরা এক মুহূর্তও ঘুমুতে পারিনি।' তার কথা শুনে অন্য সকল মেছুনিরা নিজেদের ভাগ্যকে দোষ দিতে আরম্ভ করল। এভাবে কিছুক্ষণ তারা বিলাপ করতে লাগল। তাদের একজন ছিল বুদ্ধিমতী। তার মাথায় এক ভাব এল। সে আনন্দে চিৎকার করল ঃ 'বোনেরা, আমি এক উপায় বের করেছি—এতে আমরা এক সেকেন্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ব।' একথা শুনে অন্য সকলে বলল ঃ 'ও বোন, তাড়াতাড়ি বল—আমরা কি করে ঘুমাব।' তখন সেই বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকটি গর্বের সঙ্গে বলে উঠল ঃ 'তোমরা সকলে খালি মাছের ঝুড়ি নিয়ে এস; ভালো করে জল ছিটিয়ে দাও আর তোমাদের মাথার কাছে রাখ। তাহলে আমাদের অভ্যস্ত মাছের গন্ধে আমরা ঘুমিয়ে পড়ব।' তার উপদেশের মতো অন্য মেছুনিরা তাই করল। অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল, তাদের নাক ডাকতে লাগল। ('প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় সংস্কৃত অনুবাদ নেই। আমরা ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবাণীতে এই কাহিনি আছে। আমরা শেষোক্ত দু-বইতে যেমন আছে, ঠিক সেভাবে এখানে

দিচ্ছি ঃ) পথে যেতে যেতে রাত্রি হয়ে পড়ায় এক মেছুনি এক মালির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মালি যথাসাধ্য তার সেবা করলে। কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম হলো না। শেষে সে বুঝতে পারলে বাগানের ফুলের গন্ধে তার ঘুম হচ্ছে না। সে তখন আঁশ চুপড়িতে জল ছিটিয়ে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ঘুমালো। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাতে লাগল। কামিনীকাঞ্চন আঁশ চুপড়ি। সাধুসঙ্গ ফুলের গন্ধ। [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশচন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত, অষ্টম সংস্করণ, দি হরমোহন পাবলিশিং এজেন্সি, ২৪ কাশীদত্ত স্ট্রিট, কলকাতা, নম্বর ঃ ২১৮, পৃঃ ৭৩ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বাণী—শ্রীকৃষ্ণকুমার নন্দী সংকলিত, ২য় সংস্করণ (১৩৪১) ব্রজমোহন দত্ত, স্টুডেন্টস লাইব্রেরি, ৫৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা —২৮, পৃঃ ৭৭]

শ্রীমদ্বিবেকানন্দপঞ্চকম্

অনিত্যদৃশ্যেষু বিবিচ্য নিত্যং
তস্মিন্ সমাধত্তে ইহ স্ম লীলয়া।
বিবেক-বৈরাগ্য-বিশুদ্ধচিত্তং
যোঽসৌ বিবেকী তমহং নমামি ॥ ১ ॥
বিবেকজানন্দ-নিমগ্ন-চিত্তং
বিবেকদানৈকবিনোদশীলম্।
বিবেকভাসা কমনীয়কান্তিং
বিবেকিনং তং সততং নমামি ॥ ২ ॥
ঋতঞ্চ বিজ্ঞানমধিশ্রয়ৎ যৎ
নিরন্তরং চাদিমধ্যান্তহীনম্।
সুখং সুরূপং প্রকরোতি যস্য
আনন্দমূর্তিং তমহং নমামি ॥ ৩ ॥
সূর্যো যথান্ধং হি তমো নিহন্তি
বিষ্ণুর্যথা দুষ্টজনান্ ছিনত্তি।
তথৈব যস্যাখিলনেত্রলোভং
রূপং ত্রিতাপং বিমুখীকরোতি ॥ ৪ ॥
তং দেশিকেন্দ্রং পরমং পবিত্রং
বিশ্বস্য পালং মধুরং যতীন্দ্রম্।
হিতায় নৃণাং নরমূর্তিমন্তং
বিবেক-আনন্দমহং নমামি ॥ ৫ ॥

নমঃ শ্রীযতিরাজায়
বিবেকানন্দসূরয়ে।
সচ্চিৎসুখস্বরূপায়
স্বামিনে তাপহারিণে ॥

(ঊনপঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে মাদ্রাজে রচিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ইহাই শেষ রচনা। উদ্বোধন, ১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩১০, পৃঃ ৬০-৬১)

শ্রীশ্রীমুকুন্দমালা স্তোত্রম্

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দেনানুবাদিতম্)

পূর্বকালে শ্রীশ্রীকুলশেখর নামা রাজর্ষি কেরল দেশকে (Travancore) স্বকীয় শাসনে পবিত্র ও সৌভাগ্যশালী করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় সর্বদাই পূর্ণ থাকিত। সেই ভাবময় পবিত্র হৃদয় সরোবর হইতে শ্রীশ্রীমুকুন্দমালারূপ সর্ব মনোহারিণী সহস্রদল কমল প্রসবিনী অপূর্ব কমলিনীর উদয় হইয়াছে। আমাদের দেশে সেই ভাবোচ্ছ্বাসগুলির অধিকাংশই অদ্যাবধি উপনীত হয় নাই। সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য আমরা আজ সাদরে পাঠকবর্গকে উক্ত মনোহর, সদ্ভাবোদ্দীপক, প্রেমিক কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসগুলির উপহার প্রদান করিতেছি। ইহা যে প্রত্যেকেরই অতি আদরের সামগ্রী হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহমাত্রও নাই। আসুন পাঠকবর্গ, আমরা ভক্ত কবির নির্মল কবিতা-তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিবার পূর্বে, তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া প্রণত হই।

ঘুষ্যতে যস্য নগরে রঙ্গযাত্রা দিনে দিনে।
তমহং শিরসা বন্দে রাজানং কুলশেখরম্ ॥

যাঁহার নগরে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের উৎসবকাহিনি গীত হয়, আমি সেই রাজা কুলশেখরকে মস্তক অবনত করিয়া বন্দনা করি।

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি
ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠনকোবিদেতি।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-
ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ ॥ ১ ॥

হে স্বর্গ এবং পৃথিবীর পতি মুকুন্দদেব। আমি যাহাতে প্রতিদিনই তোমার "হে শ্রীবল্লভ, হে বরদ, হে দয়াপর, হে ভক্তপ্রিয়, হে ভবব্যাধির সুচিকিৎসক, হে নাথ, হে নাগশয়ন, হে জগন্নিবাস" বলিয়া ডাকিয়া তোমার পবিত্রনামগুলি কীর্তন করিতে পারি, তাহাই কর।

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু দেবো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।

জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বিভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥

যিনি দেবকীর আনন্দ বর্ধন, তাঁহার সর্বতোভাবে জয় হউক; যিনি বৃষ্ণিবংশের উজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ, সেই দেববরের সর্বাঙ্গীণ জয় হউক; যিনি নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামকান্তি বিশিষ্ট এবং যাঁহার সুকুমার অঙ্গ কোমলতার আদর্শস্থল, তাঁহার জয় হউক, জয় হউক; যিনি পৃথিবীর দুঃখভার মোচন করেন ও যিনি স্বেচ্ছায় স্বর্গ ও পৃথিবীর আধিপত্য দান করিতে পারেন, তাঁহার নিরন্তর জয় হউক।

মুকুন্দ মূৰ্দ্ধ্ণা প্রণিপত্য যাচে
ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে
ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ ॥ ৩ ॥

হে মুকুন্দ! ভবদীয় চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি, যেন জন্মে জন্মে তোমার কৃপা বলে ত্বদীয় শ্রীচরণপদ্ম কখনও বিস্মৃত না হই।

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥ ৪ ॥

হে সর্ব সন্তাপহারিন্! শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, ভয়ঙ্কর কুম্ভীপাক নরক নিবারণের জন্য, অথবা চিত্তরঞ্জিনী রমণীগণের সুকোমল শরীরলতা আলিঙ্গন করিয়া স্বর্গস্থ নন্দনকাননে ক্রীড়া করিবার জন্য তোমার চরণপ্রান্তে প্রণত হইতেছি না; কিন্তু যাহাতে জন্মে জন্মে হৃদয়মন্দিরে তোমার নিরন্তর ধ্যান করিতে পারি, তাহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়।

নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ যদ্ ভাব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎ পাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্! সৎকর্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় ধনোপার্জন বা কামের ভোগে আমার অভিলাষ নাই; পূর্বে যেরূপ কর্ম করিয়াছি, তদনুযায়ী যাহা ঘটিবার

তাহাই ঘটুক। যাহাতে জন্মে জন্মে তোমার শ্রীপাদপদ্ম যুগলে অচলা ভক্তি থাকে তাহাই আমার অন্তরের একমাত্র প্রার্থনা।

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি ॥ ৬ ॥

হে নরকান্তকারিন্! স্বর্গে, ধরাতলে, এমনকি নরকেও যদি আমার দীর্ঘকাল বাস হয়, ইহাই বিধান কর, যেন, মৃত্যুযন্ত্রণাতেও তোমার যে চরণযুগল শরৎকালের সুবিকশিত ও প্রফুল্ল কমলকেও সৌন্দর্যে পরাজিত করে, সে দুটিকে বিস্মৃত না হই।

কৃষ্ণ ত্বদীয় পদপঙ্কজপঞ্জরান্তম্
অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥ ৭ ॥

হে কৃষ্ণ! অদ্যই আমার চিত্তরূপ রাজহংস তোমার শ্রীচরণরূপ পদ্মের কেশরে যাইয়া প্রবেশ করুক, কারণ প্রাণপরিত্যাগের সময় যখন কফ্, বায়ু ও পিত্তে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন তোমায় কিরূপে স্মরণ করিতে পারিব?

চিন্তয়ামি হরিমেব সন্ততং
মন্দমন্দহসিতাননাম্বুজম্।
নন্দগোপতনয়ং পরাৎপরং
নারদাদিমুনিবৃন্দবন্দিতম্ ॥ ৮ ॥

আমি সর্বদাই সর্বসন্তাপহারী হরির ধ্যান করি। তাহার মুখপদ্ম মধুর মন্দ হাস্যে অতি রমণীয়, তিনি গোপরাজ নন্দের পুত্র, তিনি সকলের অগ্রগণ্য এবং নারদ প্রভৃতি মুনিগণ সর্বদাই তাঁহাকে বন্দনা করেন।

করচরণসরোজে কান্তিমন্নেত্রমীনে
শ্রমমুষিভুজবীচিব্যাকুলেঽগাধমার্গে।
হরিসরসি বিগাহ্যাপীয় তেজোজলৌঘং
ভবমরুপরিখিন্নঃ খেদমদ্য ত্যজামি ॥ ৯ ॥

সর্বসন্তাপহারী হরি একটি প্রকাণ্ড সরোবর। তাঁহার অঙ্গকান্তি সেই

সরোবরের জল, তাঁহার করতলদ্বয় ও চরণযুগল তাহার পদ্ম, মনোহর চক্ষু দুটি তাহাতে মৎস্য হইয়া আছে। ক্লেশনাশক ভুজদ্বয় তরঙ্গে তাহা নিয়ত তরঙ্গিত। সেই সরোবরে যাইবার পথ অতি দুর্গম। (কারণ তাহা সংসার-মরুভূমি মধ্যে অবস্থিত।) এই মরুতে পরিভ্রমণ করিয়া আমি সাতিশয় পরিশ্রান্ত। সুতরাং অদ্য সেই হরি সরোবরে অবগাহনপূর্বক (প্রাণ ভরিয়া) তাঁহার কান্তিরূপ নির্মল সুশীতল সলিল পান করত সমুদয় খেদ দূর করিব।

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে
মুরভিদি মা বিরমস্ব চিত্তরন্তুম্।
সুখতরমপরং ন জাতু জানে
হরিচরণস্মরণামৃতেন তুল্যম্ ॥ ১০ ॥

হে চিত্ত! পদ্মনয়ন, শঙ্খচক্রধারী মুরহরের সহিত সম্মিলিত হইতে বিরত হইও না। কারণ হরির শ্রীচরণ ধ্যান রূপ অমৃত পানের তুল্য আর অধিক আনন্দদায়ক কিছুই নাই।

মাভীর্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনাঃ
নামী নঃ প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং
লোকস্য বাসনাপনোদনকরো দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥ ১১ ॥

হে নির্বোধ মন! বহুকালব্যাপী নানাবিধ যমযন্ত্রণা কল্পনা করিয়া ভীত হইও না। যদি হরি আমাদের প্রভু হন, তাহা হইলে উক্ত বিষম শত্রুগণ আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। অতএব আলস্য ত্যাগ করিয়া, যাঁহাকে ভক্তিদ্বারা অতি সহজে লাভ করা যায়, সেই নারায়ণকে ধ্যান কর। যিনি লোকত্রয়ের সমুদয় বিঘ্ন নাশ করিতে পারেন, তিনি কি নিজ দাসের দুঃখ মোচন করিতে পারিবেন না?

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারার্দ্দিতানাম্।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতা নরাণাম্ ॥ ১২ ॥

মনুষ্যগণ সংসার সাগরে পতিত হইয়া শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ঝটিকায় নিয়ত তাড়িত হইতেছে। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ সেই সাগরের জল; উড়ুপ (ভেলা) না থাকায় তাহাতে (তাহারা) নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর

পুত্র কন্যা, ভার্যা প্রভৃতির পরিত্রাণ চিন্তায় চিত্ত সর্বদা ব্যাকুল। এরূপ নিঃসহায় মানবগণের বিষ্ণুরূপ নৌকাই একমাত্র অবলম্বন।

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ম্
কথমহমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্।
সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা
নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্ ॥ ১৩ ॥

হে চিত্ত! এই অতল স্পর্শ অপার সংসার সমুদ্র কিরূপে পার হইব, ইহা ভাবিয়া কাতর হইও না। কারণ কমল নেত্র, নরকনিহন্তা দেববরের প্রতি তোমার নিশ্চলা ও ঐকান্তিকী ভক্তি স্থাপিত হইলে তাহা তোমায় অবশ্যই পরপারে লইয়া যাইবে।

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূতমোহোর্মিমালে
দারাবর্ত্তে তনয়সহজগ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং নস্ত্রিধামন্
পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তিভাবে প্রসীদ ॥ ১৪ ॥

হে ত্রিলোকপতে! হে বরদ! আমরা সংসার রূপ মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। ভোগ বাসনা এই সাগরের জল, স্ত্রীসম্ভোগলিপ্সারূপা ঝটিকা ইহাতে অজ্ঞান-তরঙ্গ উত্থিত করিয়াছে। ভার্যা তাহার আবর্ত (জলভ্রমি), এবং সন্তান ও ভ্রাতা কুম্ভীরস্বরূপ হইয়া তাহাকে অতিশয় ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে যাহাতে আমাদের ভক্তিভাব সর্বদাই জাজ্বল্যমান থাকে তাহা কর।

মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো ভক্তিহীনান্ পদাব্জে
মা শ্রৌষম্ শ্রাব্যবন্ধং তব চরিতমপাস্যান্যদাখ্যানজাতম্।
মা স্মার্ষং মাধব ত্বামপি ভুবনপতে চেতসাপহ্নুবানান্
মা ভূবং ত্বৎসপর্য্যাব্যতিকররহিতো জন্মজন্মান্তরেঽপি ॥ ১৫ ॥

তোমার শ্রীপাদপদ্মে যাহাদের ভক্তি নাই, সেই সকল পুণ্যহীন লোকের সহিত আমার যেন ক্ষণকালের জন্যও সাক্ষাৎ না হয়। যে সকল আখ্যায়িকায় তোমার চরিত্র বর্ণিত হয় নাই, সুশ্রাব্য পদবাক্যসমন্বিত হইলেও সে সমুদয় যেন আমি কখনও শ্রবণ না করি। হে ত্রিলোকনাথ! হে লক্ষ্মীপতে! যাহারা তোমারও অপলাপ করিতে চায়, সেই সকল নাস্তিকদিগকে যেন আমি কখনও মনেও

স্থান দান না করি এবং কোন জন্মেও যেন তোমার কায়িক বাচিক ও মানসিক সেবা বিরহিত না হই।

> জিহ্বে কীর্তয় কেশবং মুররিপুং চেতো ভজ শ্রীধরং
> পাণিদ্বন্দ্ব সমর্চয়াচ্যুতকথাঃ শ্রোত্রদ্বয় ত্বং শৃণু।
> কৃষ্ণং লোকয় লোচনদ্বয় হরের্গচ্ছাঙ্ঘ্রিযুগ্মালয়ং
> জিঘ্র ঘ্রাণ মুকুন্দপাদতুলসীং মূর্ধন্নমাধোক্ষজম্ ॥ ১৬ ॥

হে জিহ্বে। তুমি সর্বদা কেশবের নামই কীর্তন কর; হে চিত্ত! তুমি সর্বদা মুরহরের ভজনা কর; হে হস্তদ্বয়! তোমরা সর্বদাই লক্ষ্মীপতির পূজা কর; হে কর্ণদ্বয়! তোমরা সর্বদাই সনাতন হরির কথাই শ্রবণ কর; হে নেত্রদ্বয়! তোমরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন কর; হে পদদ্বয়! তোমরা সর্বদা বিষ্ণুমন্দিরেই গমন কর, হে নাসিকে! তুমি সর্বদা মুকুন্দের শ্রীচরণ তুলসীর আঘ্রাণ লও; হে মস্তক। তুমি সর্বদাই সেই অব্যয় পুরুষের সম্মুখে অবনত হও।

> হে লোকাঃ শৃণুত প্রসূতিমরণব্যাধেশ্চিকিৎসামিমাং
> যোগজ্ঞাঃ সমুদাহরন্তি মুনয়ো যাং যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ।
> অন্তর্জ্যোতিরমেয়মেকমমৃতং কৃষ্ণাখ্যমাপীয়তাং
> তৎপীতং পরমৌষধং বিতনুতে নির্বাণমাত্যন্তিকম্ ॥ ১৭ ॥

হে মানবগণ! যাজ্ঞবল্ক্যাদি যোগজ্ঞ মুনিগণ জন্মমরণরূপ ব্যাধির যেরূপ চিকিৎসা বিধান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। স্বাভাবিক জ্যোতির্ময় ও অপরিমেয় শ্রীকৃষ্ণনামক অমৃত পান কর; উক্ত পরমৌষধ পান করিলে চিরকালের জন্য সমুদয় বাসনাজাল নির্বাণ হইয়া যাইবে।

> হে মর্ত্যাঃ পরমং হিতং শৃণুত ভো বক্ষ্যামি সংক্ষেপতঃ
> সংসারার্ণবমাপদুর্ম্মিবহুলং সম্যক্ প্রবিশ্য স্থিতাঃ।
> নানা জ্ঞানমপাস্য চেতসি নমো নারায়ণায়েত্যমুম্
> মন্ত্রং সপ্রণবং প্রণামসহিতং প্রাবর্তয়ধ্বং মুহুঃ ॥ ১৮ ॥

হে মানবগণ! সংসার মহাসমুদ্র বহুবিধ বিপত্তিরূপ তরঙ্গে সর্বদাই অতি ভয়ঙ্কর। সেই সাগরে তোমরা সম্যগ্‌রূপে নিমগ্ন হইয়াছ; অতএব যাহাতে তোমাদের পরম মঙ্গল হয়, আমি সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অন্য সমুদয় জ্ঞানলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া সভক্তি প্রণাম সহকারে প্রণব (ওঁ মন্ত্র) উচ্চারণপূর্বক সর্বদাই 'নমো নারায়ণায়' এই মহামন্ত্র মনোমধ্যে ধ্যান কর।

পৃথ্বীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুস্ফুলিঙ্গো লঘুঃ
তেজো নিঃশ্বসনং মরুৎ তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ
দৃষ্টে যত্র স তাবকো বিজয়তে ভূমা বিধূতাবধিঃ ॥ ১৯ ॥

তোমার অসীম সর্ব্বব্যাপী ভূমামূর্তি সকলকেই পরাজিত করিয়াছে। সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিলে পৃথিবীকে পরমাণু বলিয়া বোধ হয়, সাগরসকল জলবিন্দুবৎ, প্রত্যেক জ্যোতির্মণ্ডল ক্ষুদ্র অগ্নিকণার ন্যায়, সমগ্র বায়ুমণ্ডল ক্ষণিক শ্বাস ক্রিয়ার ন্যায়, বিশ্বব্যাপী আকাশ একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রের ন্যায়; জগদুৎপত্তি প্রলয়কারী ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে সামান্য জীবের ন্যায় এবং অন্যান্য দেবতাগণকে কীটের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়।

বদ্ধেনাঞ্জলিনা নতেন শিরসা গাত্রৈঃ সরোমোদ্গমৈঃ
কণ্ঠেন স্বরগদ্গদেন নয়নেনোদ্গীর্ণবাষ্পাম্বুনা।
নিত্যং ত্বচ্চরণারবিন্দযুগলধ্যানামৃতাস্বাদিনাম্
অস্মাকং সরসীরুহাক্ষ সততং সম্পদ্যতাং জীবিতম্ ॥ ২০ ॥

হে কমলনেত্র! করতলদ্বয় যুক্ত করিয়া অবনত মস্তকে, রোমাঞ্চিত কলেবরে, গদ্গদস্বরে, প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে নিয়ত তোমার শ্রীপাদপদ্ম দুটির ধ্যান দ্বারা অমৃত আস্বাদপূর্বক যাহাতে আমাদের জীবন সতত অতিবাহিত হয়, সেইরূপ বিধান কর।

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব।
হে রামানুজ হে জগত্ত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥ ২১ ॥

হে গোপাল! হে করুণাসাগর। হে লক্ষ্মীপতে! হে কংসমর্দন হে গজেন্দ্র মোক্ষদাতঃ! হে মাধব! হে রামানুজ লক্ষ্মণ! হে ত্রিলোকগুরো। হে কমলাক্ষ! হে গোপীজনবল্লভ! আমায় পালন কর। আমি তদ্ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না।

ভক্তাপায়ভুজঙ্গগারুড়মণিস্ত্রৈলোক্যরক্ষামণিঃ
গোপীলোচনচাতকাম্বুদমণিঃ সৌন্দর্যমুদ্রামণিঃ।
যঃ কান্তামণিরুক্মিণীঘনকুচদ্বন্দ্বৈকভূষামণিঃ
শ্রেয়ো দেবশিখামণির্দিশতু নো গোপালচূড়ামণিঃ ॥ ২২ ॥

যিনি ভক্তগণের বিপত্তিসর্পসমূহের গরুড়মণিস্বরূপ, যিনি ত্রিভুবনের

রক্ষাকবচস্বরূপ, যিনি গোপীগণের নেত্রচাতকসমূহের মেঘরত্নস্বরূপ, যিনি সৌন্দর্যের উৎকৃষ্ট আদর্শস্বরূপ, যিনি রমণীরত্ন শ্রীমতি রুক্মিণীদেবীর ঘন স্তনদ্বয়ের একমাত্র অলঙ্কাররত্নস্বরূপ, যিনি যাবতীয় দেবগণের মস্তকের মণিস্বরূপ, যিনি গোপালকগণের শিরোভূষণস্বরূপ, তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

শত্রুচ্ছেদৈকমন্ত্রং সকলমুপনিষদ্বাক্যসম্পূজ্যমন্ত্রং
সংসারোত্তারমন্ত্রং সমুপচিত তমঃসঙ্ঘনির্যাণমন্ত্রম্।
সর্বৈশ্বর্যৈকমন্ত্রম্ ব্যসনভূজঙ্গসন্দষ্টসন্ত্রাণমন্ত্রং
জিহ্বে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রং জপ জপ সততং জন্মসাফল্যমন্ত্রম্॥ ২৩॥

যে মন্ত্রে শত্রু নাশ হয়, সমুদয় উপনিষদ্‌বাক্য যে মন্ত্রের পূজা করেন, যাহাতে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সঞ্চিত অজ্ঞানরাশি নাশ হয়, সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য লাভ হয়, বিপত্তিরূপ সর্পদংশন হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, জন্ম সফল হয়, হে জিহ্বে! তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র সতত জপ কর।

ব্যামোহপ্রশমৌষধং মুনিমনোবৃত্তিপ্রবৃত্ত্যৌষধম্।
দৈত্যেন্দ্রার্ত্তিকরৌষধং ত্রিভুবনীসঞ্জীবনৈকৌষধম্।
ভক্তাত্যন্তহিতৌষধং ভবভয়প্রধ্বংসনৈকৌষধম্
শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিকরৌষধং পিব মনঃ শ্রীকৃষ্ণদিব্যৌষধম্॥ ২৪॥

হে মনঃ! যে ঔষধ মোহ নাশ করে, মুনিগণের মনকে সদ্‌বৃত্তিতে প্রবর্তিত করায়, দৈত্যরাজগণের দুঃখ জন্মায়, ত্রিভুবনকে জীবিত রাখে, ভক্তগণের সাতিশয় হিতসাধন করে, সংসারের ভয় নাশ করে, সমস্ত মঙ্গল লাভ করায় তুমি সেই দিব্য শ্রীকৃষ্ণৌষধ পান কর।

আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং বেদব্রতান্যন্বহং
মেদশ্ছেদফলানি পূর্তবিষয়ঃ সর্বে হুতং ভস্মনি।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ-
দ্বন্দ্বাম্ভোরুহসংস্মৃতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ॥ ২৫॥

যে নারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ না করিয়া, বেদাভ্যাস করিলে তাহা অরণ্য-রোদনের ন্যায় হয়, বৈদিক কর্মানুষ্ঠান সকল হিংসিত পশুর মেদোমাংসভোজনেই পর্যবসিত হয়, অতিথিশালা-নির্মাণ প্রভৃতি সৎকর্ম সকল ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় হয়, নানাবিধ তীর্থে স্নান গজস্নানের ন্যায় নিষ্ফল হয়, সেই দেববর নারায়ণই সর্বোপরি জয় লাভ করেন।

শ্রীমন্নাম প্রোচ্য নারায়ণাখ্যং
কে ন প্রাপুর্বাঞ্ছিতং পাপিনোঽপি।
হা নঃ পূর্বং বাক্ প্রবৃত্তা ন তস্মিন্
তেন প্রাপ্তং গর্ভবাসাদিদুঃখম্ ॥ ২৬ ॥

এরূপ কে পাপ-কর্মা আছে যে, শ্রীমন্নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই? হায়! পূর্ব জীবনে আমাদের জিহ্বা সেই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার প্রবৃত্তি পায় নাই, সেইজন্যই আমাদের গর্ভবাসাদিরূপ বহুবিধ যন্ত্রণা পাইতে হইতেছে।

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্যভৃত্যপরিচারক ভৃত্যভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥ ২৭ ॥

হে মধুকৈটভনাশিন্! হে ত্রিলোকপতে! তোমার প্রতি আমার এই একমাত্র অনুগ্রহ প্রার্থনা যে, তুমি আমাকে তোমার দাসানুদাসের যে পরিচারক, তাহার দাসানুদাসের যে সেবক, তাহার সেবক বলিয়া অঙ্গীকার কর। তাহা হইলেই আমার জন্ম সফল হইবে।

নাথে নঃ পুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা
সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি সুরে নারায়ণে তিষ্ঠতি।
যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমন্দার্থদং
সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ম্ ॥ ২৮ ॥

যিনি সর্বপুরুষের শ্রেষ্ঠ, ত্রিলোকের অধিপতি, যাঁহাকে হৃদয় দ্বারা সেবা করিতে হয়, যিনি নিজের পদ দান করিতেও কাতর হয়েন না, সেই দেবদেব নারায়ণ থাকিতেও যে কেহ কতিপয় গ্রামের ভূম্যধিকারী, সে যদিও অতি নীচ প্রকৃতি ও কৃপণস্বভাব হয়, তথাপি আমরা তাহার দাসত্ব করিবার জন্য লালায়িত হই। অহো, আমরা কি মূঢ় ও নির্বোধ!

মদন পরিহর স্থিতিং মদীয়ে
মনসি মুকুন্দপদারবিন্দধাম্নি।
হরনয়নকৃশানুনা কৃশোঽসি
স্মরসি ন চক্রপরাক্রমং মুরারেঃ ॥ ২৯ ॥

হে মদন! আমার মন মুকুন্দের পাদপদ্ম রাখিবার স্থান, সুতরাং তাহা আর

অধিকার করিতে সাহস করিও না। তুমি ইতঃপূর্বেই মঙ্গলময় সদাশিবের নয়নাগ্নি দ্বারা অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছ, মুরশত্রুর চক্রের মহাপরাক্রম কি তোমার স্মরণ নাই?

তত্ত্বং ব্রুবাণানি পরং পরস্মাৎ
মধু ক্ষরন্তীব সতাং ফলানি।
প্রাবর্তয় প্রাঞ্জলিরস্মি জিহ্বে
নামানি নারায়ণগোচরাণি ॥ ৩০ ॥

হে জিহ্বে! আমি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তোমার নিকট ইহাই প্রার্থনা করি যে, যে পবিত্র নামসকল নারায়ণকে সাক্ষাৎকৃত করায়, যাহারা সর্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ববস্তু জানাইয়া দেয়, যে সমুদয়কে সাধুগণ মধুক্ষরণকারী ফলের ন্যায় উপভোগ করিয়া থাকেন, সেই সুমধুর নামসকল তুমি উচ্চারণ কর।

ইদং শরীরং পরিণামপেশলং
পতত্যবশ্যং শ্লথসন্ধিজর্জরম্।
কিমৌষধৈঃ ক্লিশ্যসি মূঢ় দুর্মতে
নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব ॥ ৩১ ॥

এই দেহ পরিণামী অর্থাৎ বিনশ্বর সুতরাং এক সময়ে শিথিলসন্ধি ও জরা জর্জরিত হইয়া ইহার নাশ হইবেই হইবে। অতএব হে মূর্খ দুর্বুদ্ধে! কেন নানাবিধ ঔষধ খাইয়া যন্ত্রণা পাইতেছ? সর্বরোগবিনাশী কৃষ্ণনামরসায়ন পান কর (তোমার সকল যন্ত্রণাই দূর হইবে)।

দারা বারাকরবরসূতা তে তনূজো বিরিঞ্চঃ
স্তোতা বেদাস্তব সুরগণো ভৃত্যবর্গঃ প্রসাদঃ।
মুক্তির্মায়া জগদবিকলং তাবকী দেবকী তে
মাতা মিত্রং বলরিপুসুত ত্বয্যতোঽন্যান্ ন জানে ॥ ৩২ ॥

জলনিধির কন্যা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী তোমার ভার্যা, ব্রহ্মা তোমার দেহ হইতে জন্মিয়াছেন, বেদসমুদয় তোমার স্তব পাঠ করেন, দেবতাগণ তোমার ভৃত্য স্থানীয়, তুমি প্রসন্ন হইলে মুক্তি দান কর। এই সমগ্র জগৎ তোমার মায়া, তোমার মাতা দেবকী, তোমার মিত্র ইন্দ্রপুত্র অর্জুন। ইহা ছাড়া তোমার সম্বন্ধে আমি আর কিছু জানি না।

কৃষ্ণো রক্ষতু নো জগত্ত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণং নমস্যাম্যহং
কৃষ্ণেনামরশত্রবো বিনিহতাঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ।

কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণস্য দাসোঽস্ম্যহং
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং হে কৃষ্ণ রক্ষস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিজগতের গুরু কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমি সর্বদা কৃষ্ণকেই নমস্কার করিব। দেবশত্রুগণ কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হইয়াছে, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার। কৃষ্ণ হইতেই এই জগৎ সমুত্থিত হইয়াছে। আমি কৃষ্ণের দাস। অখিল চরাচর জগৎ কৃষ্ণেই অবস্থিত রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! তুমি আমায় রক্ষা কর।

স ত্বং প্রসীদ ভগবন্ কুরু ময্যনাথে
বিষ্ণো কৃপাং পরমকারুণিকঃ কিল ত্বম্।
সংসারসাগরনিমগ্নমনন্তদীনং
উদ্ধর্ত্তুমর্হসি হরে পুরুষোত্তমোঽসি ॥ ৩৪ ॥

হে ভগবন্! তুমি উক্তগুণবিশিষ্ট, সুতরাং আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বিষ্ণো, আমি অনাথ, আমায় কৃপা কর, কারণ, তুমি অতি দয়াময়। সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া আমি চিরকাল কষ্ট পাইতেছি, হে পুরুষোত্তম! হে সর্বসন্তাপহারিন্! সুতরাং আমায় কৃপা করিয়া উদ্ধার কর।

নমামি নারায়ণপাদপঙ্কজং
করোমি নারায়ণপূজনং সদা।
বদামি নারায়ণনাম নির্মলং
স্মরামি নারায়ণতত্ত্বমব্যয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

আমি যেন নারায়ণের পাদপদ্মে নমস্কার করি, সর্বদা তাঁহার পূজা করি, তাঁহার নির্মল নাম নিয়ত জপ করি এবং তাঁহারই নিত্য তত্ত্ব যেন ধ্যান করি।

শ্রীনাথ নারায়ণ বাসুদেব
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রিয় চক্রপাণে।
পদ্মনাভাচ্যুত কৈটভারে
শ্রীরাম পদ্মাক্ষ হরে মুরারে ॥ ৩৬ ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিৎ
অহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্ ॥ ৩৭ ॥

হে শ্রীনাথ! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে শ্রীকৃষ্ণ! হে ভক্তপ্রিয়! হে চক্রপাণে! হে শ্রীপদ্মনাভ! হে অচ্যুত! হে কৈটভারে! হে শ্রীরাম! হে পদ্মনেত্র! হে হরে! হে মুররিপো! হে অনন্ত! হে বৈকুণ্ঠপতে! হে মুকুন্দ! হে কৃষ্ণ! হে

গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! এইরূপে তোমায় ডাকিবার শক্তি থাকিলেও, কেহই ডাকে না। অহো! মানবগণ বিপদকে আলিঙ্গন করিতেই অগ্রসর হয়।

ধ্যায়ন্তি যে বিষ্ণুমনন্তমব্যয়ং
হৃৎপদ্মমধ্যে সততং ব্যবস্থিতম্।
সমাহিতানাং সততাভয়প্রদং
তে যান্তি সিদ্ধিং পরমাঞ্চ বৈষ্ণবীম্ ॥ ৩৮ ॥

যিনি সর্বব্যাপী, অনন্ত এবং অচ্যুত, যিনি হৃৎপদ্মকোষে সর্বদাই বাস করেন, যিনি তাঁহাতে একাগ্রচিত্তদের সর্বদা অভয় দিয়া থাকেন, যে সকল সৎপুরুষ সেই শ্রীহরির ধ্যান করেন, তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

ক্ষীরসাগরতরঙ্গশীকরা-
সারতারকিতচারুমূর্তয়ে।
ভোগিভোগশয়নীয়শায়িনে
মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গোত্থ বিন্দুবর্ষণে যাঁহার মনোহর মূর্তি তারকাবলির দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, যিনি অনন্ত নামক নাগের দেহ-রূপ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, সেই মধুরিপু লক্ষ্মীপতিকে নমস্কার।

যস্য প্রিয়ৌ শ্রুতধরৌ কবিলোকবীরৌ
মিত্রে দ্বিজন্মবরপদ্মশরাবভূতাম্।
তেনাম্বুজাক্ষচরণাম্বুজষট্পদেন
রাজা কৃতা কৃতিরিয়ং কুলশেখরেণ ॥ ৪০ ॥

বেদজ্ঞ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, দ্বিজশ্রেষ্ঠ 'পদ্ম' ও 'শর' নামে যাঁহার দুই অতি প্রিয় বন্ধু ছিল, যিনি কমলনয়নের শ্রীপাদপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ, এই স্তোত্র সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ কুলশেখর নামক রাজার রচিত।

ওঁ তৎ সৎ।

"পদ্ম" ও "শর" এ দুইটি গুণপ্রকাশক উপাধিস্বরূপ। পদ্মদর্শন করিলেই চিত্তে আনন্দের উদয় হয় এবং শরদর্শন করিলেই শত্রুগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। তিনি কোন শমগুণাবলম্বী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রজাপালন করিতেন। এবং এক ভূজবীর্যসম্পন্ন ধনুর্বিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠের সাহায্যে শত্রুদিগকে দূরে রাখিতেন। ইহাই "পদ্ম" ও "শর" গ্রহণের অভিপ্রায়।

(উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা , পৌষ ১৩০৫, পৃঃ ৪৪-৪৯)

দাক্ষিণাত্যের দেবমন্দির

আর্যাবর্তনিবাসী যদি কখনও মাদ্রাজ নগরে আসিয়া তথা হইতে বাষ্পীয় শকটযোগে ৺রামেশ্বর দর্শনে বহির্গত হন, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যের গিরিশিখর সদৃশ, শিল্পবিদ্যাদেবীর প্রিয়তম ভূষণ স্বরূপ, মনোমুগ্ধকারী দেবমন্দিরসমূহের বিশাল সৌন্দর্যে তাঁহাকে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হইবে। যখন মুসলমানগণ পশ্চিমদেশ হইতে তরবারি হস্তে দলে দলে আসিয়া স্বভাব নির্মল শান্তিপ্রিয় ভারতসন্তানগণের শোণিতপাতে, এই ঋষিজননী মাধুর্য রসময়ী সর্বকল্যাণশালিনী অসীমশৌর্যবীর্যসম্পন্ন নরদেব প্রসূতি ভারতমাতার প্রকৃতি কোমল হৃদয়কে ব্যথিত করে নাই; যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা মাতৃজঠরে বীজাকারে অবস্থান করিতেছিল; যখন বেদবিহিত মার্গই সকলের অনুসরণীয় ছিল; যখন ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র বংশানুগত-ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী না হইয়া সর্বভূতে সমদর্শী ছিলেন এবং এইরূপে ব্রাহ্মণ নামের সার্থকতা করিয়াছিলেন; যখন শাক্যসিংহ বুদ্ধ তাঁহার কোনও অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষের অঙ্গে বিলীন ছিলেন, সেই সময় হইতেই, অমর ভূমি সদৃশ এই সকল বিশাল সুন্দর মন্দির নবপ্রস্ফুটিত কমলকূলের ন্যায়, সকলের নয়নমনের হর্ষবর্ধন করিয়া আসিতেছে।

মন্দিরগুলির রচনাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিলে এরূপ বোধ হয়, যেন কোনও প্রেমোন্মত্ত সাত্বত প্রধান আপনার ব্রহ্মালোক সদৃশ পবিত্র হৃদয় রাজ্যকে পরোক্ষ ভূমি হইতে উৎখাত করিয়া, সকলকে ব্রহ্মানন্দের ভাগী করিবার জন্য বাহিরে বসাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিকই ভবিষ্যতে তত্ত্বৎ দেববিগ্রহ ও দেবমন্দির সন্দর্শন করিয়া কত নরনারী যে ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। মাণিক্য বাচকর, মহামনা নন্দ, তিরুপ্পান আলোয়ার, তিরুমঙ্গই আলোয়ার, নাথমুনি, যামুনাচার্য, পেরিয়া নম্বি, রামানুজ প্রভৃতি মহাভাগবৎগণ, শ্রীশ্রীচিদম্বরস্থ নটরাজন্ ও শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর মন্দির প্রান্তে আপনাদের দেবতুল্য পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমার ন্যায় ক্ষুদ্রলোকের বর্ণনা দ্বারা কখনও তাহাদের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের একাংশও কাহারও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারে না। যাঁহার পৃথিবীতে স্বর্গশোভা দেখিবার ইচ্ছা, তাঁহাকে আমার এই নিবেদন, যেন তিনি স্বচক্ষে এই সকল বিশাল মন্দির

সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। এক একটি মন্দির যেন এক একটি দেবতার নগর। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই বোধ হইবে যেন মর্তভূমি ছাড়িয়া দেবলোকে উপনীত হইয়াছি। অসংখ্য দাসদাসী প্রত্যেক দেব-বিগ্রহের সেবায় অহরহ নিযুক্ত আছেন। নানাবিধ মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি বেদধ্বনির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব স্বর্গীয় ভাব হৃদয়ে আনিয়া দেয়। ভক্তি আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। শিল্পনৈপুণ্যের মনোহর ও নিরন্তর বিকাশ, চিত্তে পরমানন্দ আনিয়া দেয়। দেববিগ্রহ-বিলম্বিত কুসুমমালিকাগুলি বায়ুসহায়ে চারিদিকে দিব্য সৌরভ বিস্তার করে। সেবক মণ্ডলীর উৎফুল্ল মুখকমলগুলি অবলোকন করিলে দুঃখ দগ্ধ হৃদয়েও আনন্দ সঞ্চার হয়। কোথাও কোথাও সমবেত প্রেমিক কণ্ঠোত্থিত ভগবদ্ভক্তি রসপরিপ্লুত মধুর গীতধ্বনি নবাগতের প্রাণমন পুলকিত করিয়া স্বর্গের সোপান দেখাইয়া দেয়।

মন্দিরগুলি প্রায়শঃই পঞ্চ বা সপ্তপ্রাকার পরিবেষ্টিত। সেই সকল সুবিশাল প্রাকারের অভ্যন্তরে বিশ্বশক্তির অদ্বিতীয় কেন্দ্রস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবন্মূর্তি বিরাজ করিতেছেন। যেমন অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সংজ্ঞক পঞ্চকোষের মধ্যে বিশ্বভাসক পরমাত্মার অবস্থান, অথবা যেমন সপ্তভূমির অপর পারে তাঁহার অধিষ্ঠান, সেইরূপ পঞ্চ বা সপ্ত প্রাকারের অভ্যন্তরে শ্রী বিগ্রহের ভক্ত হৃদয়মুগ্ধকারী নিত্য বিকাশ, দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরেই নয়ন গোচর হইবে।

বর্তমান সভ্য সমাজের চক্ষে এই সকল মন্দির দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় প্রতিভাত হইবে। বাস্তবিকই কর্ণাট যুদ্ধের সময় যখন ইংরেজ ও ফরাসিগণ ভারতবর্ষে আধিপত্য লাভের জন্য পরস্পর ঘোর সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় সুবিপুল ফরাসি সৈন্য শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর মন্দিরস্থ "সহস্র স্তম্ভে" আশ্রয় লইয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই, এক সহস্র "অটল অচল সুমেরুবৎ" প্রস্তর স্তম্ভের উপর শ্রীশ্রীভগবানের জন্য যে মহতী সভা নির্মিত রহিয়াছে, তাহারই নাম সহস্রস্তম্ভ। লক্ষাধিক লোক অনায়াসে সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারে। আর্যাবর্তে উক্ত প্রকার বিশাল সভাগৃহ আছে কিনা সন্দেহ। কথিত আছে চিদম্বরস্থ নটরাজের মন্দিরে ইংরেজের ভয়ে দাক্ষিণাত্যের জনৈক নবাব আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইংরেজগণ তাহা জানিতে পারিয়া মন্দিরের বহিঃপ্রাকারে গোলাবর্ষণ করিয়াও কিছুই করিতে পারেন নাই। অদ্যাবধি প্রাকারে ও গোপুর দ্বারে গোলার দাগ বর্তমান আছে।

গো শব্দ নানার্থে প্রয়োগ হয়। গোপুর শব্দের অর্থ পৃথিবীপুর ও স্বর্গপুর উভয়ই হইতে পারে। পৃথিবীপুরের ভিতর দিয়া স্বর্গপুরে যাইতে হয়, এই জন্যই মন্দিরের বহির্দ্বার গোপুর নামে খ্যাত। বহির্দ্বারগুলি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে থাকিয়া চারিটি গিরিশিখরের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তু নরনারী ও তাহাদের কার্যকলাপ, ভাবভঙ্গি ও নানারূপ অবস্থা, দেবতা ও তাঁহাদের লীলা প্রভৃতি সর্ব বিষয় সুনিপুণ শিল্পী এরূপ দক্ষতার সহিত নির্মিত ও চিত্রিত করিয়াছেন যে, দেখিলে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মাই এই সকলের নির্মাতা ও রচয়িতা। দুর্বল মনুষ্যের হস্ত হইতে যে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার বহির্গত হইয়াছে, সহসা এরূপ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয় প্রাকারের গোপুরগুলি বহির্দ্বার অপেক্ষা কিছু উচ্চ। তৃতীয় প্রাকারের গোপুরগুলি দ্বিতীয় প্রাকারের দ্বারাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। এইরূপ ক্রমে ক্রমে মন্দিরগুলি নিম্নতর নিম্নতম হইয়া গিয়াছে। প্রাকারগুলিরও আয়তন এবং পরিসর ক্রমে ক্রমে কমিয়া গিয়াছে। শেষে এই বিশাল দেবরাজ্যের কেন্দ্রভূমিতে উপনীত হইলে, স্বর্ণরৌপ্যখচিত নাতিনিম্ননাত্যুন্নত হেমকলসমণ্ডিত বিমান বা গর্ভগৃহ নামক মূল বিগ্রহের পরম রমণীয় মন্দির নয়নগোচর হইবে।

তিন চারিদিন ধরিয়া ক্রমাগত না দেখিলে একটি মন্দির ভালো করিয়া দেখা হয় না। অভ্যন্তরে পাঁচ ছয়টি দীর্ঘ সরোবর আছে। তাহাদেরই পবিত্র সলিলে দেববিগ্রহসমূহের পূজাস্নানাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেকটিই গঙ্গার ন্যায় পবিত্র বলিয়া সকলের বিশ্বাস। ভক্তগণ সেই সকলে অবগাহন ও স্নান করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র মনে করেন। জলে কেহ নিষ্ঠীবন বা উচ্ছিষ্টোদক পরিত্যাগ করেন না। স্থলে স্থলে পুষ্পোদ্যানগুলি পুষ্পিত লতা গুল্ম ও তরুরাজিতে মণ্ডিত হইয়া এবং চতুর্দিকে সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া দেবনগরের সম্যক শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। দেবদেব যেন নগর পর্যবেক্ষণের ভার স্মিতবিকশিতাননা শান্তিদেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। "ভূতলে অতুল শোভা" দেখিতে হইলে দগ্ধচিত্তকে শান্তিরসাভিষিক্ত করিতে হইলে, পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে হইলে অতীন্দ্রিয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য যোগানন্দের কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে হইলে, ভক্তহৃদয়ের পরম পবিত্র উচ্ছ্বাস উপলব্ধি করিতে হইলে, সজ্জনমাত্রেরই এই সকল অমরভূমি দর্শন করা একান্ত বিধেয়।

চিদম্বরস্থ নটরাজের মন্দির অতি বিশাল। ইহার সত্ত্বাধিকারী ব্রাহ্মণেরা দীক্ষিতর নামে বিখ্যাত। কথিত আছে পূর্বে এই সকল দীক্ষিতর এক সহস্র

পরিবারে ব্যাপ্ত ছিল এবং ইঁহাদেরই বংশে ভগবান নটরাজের আবির্ভাব হয়। অধুনা সেই সহস্র পরিবারের সংখ্যা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ইঁহারাই শ্রীশ্রীনটরাজের সেবাকার্যে অহরহ নিযুক্ত থাকেন। ইঁহারাই মন্দিরের সর্বতোভাবে সত্ত্বাধিকারী। নীচকুলোদ্ভব মহামনা ভক্তশ্রেষ্ঠ নন্দ এবং মাণিক্য বাচকর নামক আর একজন ঈশ্বরপ্রেমিক এই সুবিশাল মন্দিরের দুইটি সমুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ। তাঁহারা নটরাজের গুণগান করিয়া সর্বদাই শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন। প্রেমোন্মত্তহৃদয়ে কত কত সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন। সজ্জনগণ তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীনটরাজের সচলমূর্তি বলিয়া বিশ্বাস ও পূজা করিতেন।

দীক্ষিতরগণ চিদম্বরমকে এত পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া কদাচ অন্যত্র গমন করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মানবলীলার আরম্ভ ও পর্যবসান উভয়ই সেই পবিত্র ভূমিতে হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীনটরাজ মহাদেবের নৃত্যমূর্তি। কথিত আছে যে, একদা মহেশ্বরী স্বীয় সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে এরূপ নৃত্যোন্মত্তা হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পদভরে ধরিত্রীদেবী সাতিশয় কাতরা হইয়া শ্রীশ্রীসদাশিবের শরণাগতা হয়েন। তিনি অশেষ অনুনয় বিনয় সহকারেও যখন পার্বতীকে নিরস্তা করিতে পারিলেন না, তখন আপনিই এমনি তাণ্ডবোন্মত্ত হইলেন যে, দেবীর নৃত্য তাহার নিকট সাতিশয় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। সুতরাং তিনি লজ্জিতা হইয়া আপনার নৃত্য নিরস্ত করিলেন। মহাদেবও আপনার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, শান্ত হইলেন।

পঞ্চভূত সদাশিবের পঞ্চমূর্তি। কালহস্তী নামক স্থানে তাঁহার বায়ুমূর্তি বিরাজ করিতেছেন। ত্রিচিনপল্লির নিকট শিবের জলমূর্তি জম্বুকেশর নামে শোভা পাইতেছেন। এই মন্দিরটিও অতিশয় বিশাল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এখানে পার্বতীপতি সর্বদাই জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া আছেন। সপ্তপ্রাকারের মধ্যে গর্ভগৃহ। সেই গর্ভগৃহের মধ্যে ভূমিগর্ভ হইতে প্রসবণমুখ দিয়া অহরহ সলিলরাশি বহির্গত ত্রিলোকপতির স্নানকার্য সম্পাদন করিতেছে। পূজক সেখানে জলমূর্তির জলের উপরই পূজা করিয়া থাকেন। কাঞ্চীপুরস্থ একাম্বরেশ্বর মহাদেবের পৃথিবীমূর্তি। তিরুবন্নামলাই নামক স্থানে তাঁহার অগ্নিমূর্তি বা রুদ্রমূর্তি বিরাজ করিতেছেন। চিদম্বরস্থ বিশাল মন্দিরে তাঁহার আকাশমূর্তির অধিষ্ঠান। যখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন পালন-কর্ম হইতে অবসর লইয়া জগতের একমাত্র মাতা পার্বতী এবং জগতের একমাত্র পিতা মহেশ্বর স্বানন্দোল্লাসে নৃত্যরসে মগ্ন হয়েন, তখনই প্রলয়কালের

আবির্ভাব। এই প্রলয়ের সময় রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ শব্দাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অদৃশ্য হইয়া যাইলে কেবল আকাশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই আকাশমূর্তিই শ্রীশ্রীনটরাজের প্রকৃত মূর্তি। পূজকেরা সেই অরূপ রূপেরই এখানে পূজা করিয়া থাকেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীশিবমন্দিরেরই সংখ্যা ও প্রাধান্য অধিক। ত্রিচিনপল্লিস্থ তায়মানবরের গিরিমন্দির, মথুরাস্থ মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বরের মন্দির, পাম্বান দ্বীপস্থ শ্রীশ্রীরামেশ্বরের বিরাট মন্দির পৃথিবীর মধ্যে বাস্তবিকই অতি বিস্ময়কর দৃশ্য। আগামী বারে আমরা এই সকল মন্দির সম্বন্ধীয় দু-একটি আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়া পাঠকগণের তৃপ্তি সাধন করিতে চেষ্টা করিব ইচ্ছা রহিল।

(উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫ ফাল্গুন ১৩০৬, পৃঃ ১০৬-১১০)

উদ্যমশীল মার্কিন যুবক

জন্ স্মীথ নামক এক কৃষকনন্দন ইউনাইটেড স্টেটসের পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিতেন। দুইটি ভ্রাতার মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ। অল্পবয়সেই তাহাদের পিতার মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষিকর্ম পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাহা উপায় করিতেন, তদ্দ্বারা সংসারযাত্রা নির্বাহ হইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত। তাহাতে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিদ্যোপার্জন ব্যয়ের সম্যক কুলান হইবে জানিয়া, সৌভ্রাত্রনিবন্ধন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে সুদূর পূর্বদেশান্ত কোনও বিখ্যাত বিদ্যালয়ের অন্তর্বাসী করিয়া দিলেন।

স্বীয় মেধাগুণে জন্ স্মীথ শীঘ্রই প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া এফ.এ. পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইলেন। পরে বি.এ. শ্রেণিতে উন্নীত হইয়া পত্রদ্বারা অবগত হইলেন যে, সে বৎসর তাঁহাদের ক্ষেত্রে শস্য নামমাত্র জন্মে নাই এবং সাংসারিক নির্বাহ করাই তাঁহার ভ্রাতার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, গৃহ হইতে অধিক সাহায্যের কোনও সম্ভাবনা নাই জানিয়া, জন্ স্মীথ প্রথমত হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, তিনি বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ধনীদের গৃহে গিয়া কি অর্থ ভিক্ষা করিবেন? ভিক্ষা করা অতি নিচের কর্ম ভাবিয়া তিনি সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরিশেষে এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া, তৎক্ষণাৎ একটি কাগজ লইয়া তদুপরি এইরূপ লিখিলেন—

"বিজ্ঞাপন"

অদ্য হইতে জন্ স্মীথ বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের নিম্নলিখিত অভাবগুলি পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবে—

(১) আমি ছাত্রগণের ক্ষৌরকর্ম করিব, প্রত্যেক ক্ষৌরের জন্য তাহাদিগকে দশ সেন্ট দিতে হইবে [দশ সেন্টে পাঁচ আনা, আমেরিকায় ভারতবর্ষাপেক্ষা সকল বিষয়েই অতি মহার্ঘ।]

(২) তাঁহাদের পাদুকার চিক্কণতা সম্পাদন করিব। প্রত্যেক পাদুকা যুগলের জন্য পাঁচ সেন্ট করিয়া দিতে হইবে।

(৩) জামার বোতাম সীবন প্রভৃতি কর্ম সমুচিত মূল্যে সম্পাদন করিব।

(৪) চীনের বাদাম সুন্দররূপে ভর্জন করিয়া অল্পমূল্যে সকলকেই যোগাইব।

(৫) তর্ক, বাদ প্রভৃতির মীমাংসা ও বক্তৃতার বিষয়গুলিকে প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করা প্রভৃতি কর্ম সর্ববাদিসম্মত মূল্যে সম্পন্ন করিব।

(৬) টুপি সকলের সংস্কার ও রঞ্জন প্রভৃতি কর্ম এখানে স্বল্পমূল্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৭) পাঠ্য পুস্তক সকল ন্যায়মতো মূল্যে ক্রয় বিক্রয় বা পরিবর্তন করিতে পারা যাইবে।

(৮) কাগজ, কলম, পেনসিল; মসি, মসিপত্র প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে দেওয়া হইবে।

(৯) দেশীয় দ্রব্য সকল সাদরে গৃহীত হইয়া, অত্রত্য শিল্পিগণের উৎসাহ বর্ধন করা হইবে।

(১০) অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৫টা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১০ টা পর্যন্ত আমি পূর্বোক্ত যাবতীয় বিষয় সাধারণকে যোগাইতে চেষ্টা করিব।

(১১) জন্ স্মীথের নাম বিস্মৃত হইবেন না।

(১২) স্মরণ রাখুন, ক্ষৌরকর্ম হইতে দর্শনাদি শাস্ত্রের মীমাংসা কর্ম পর্যন্ত সকল কর্মগুলিই অতি সুলভ মূল্যে স্বল্প লাভ লইয়া সম্পন্ন করা হইবে। সুতরাং ক্রেতা সাধারণের সংখ্যা বৃদ্ধি সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়। সকলে আসিয়া আমার কার্য পর্যবেক্ষণ করুন।

অনতিবিলম্বে প্রায় বিদ্যালয়ের দুইশত ছাত্র এই অভিনব বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া কেহ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, কেহ মনে করিল যে, ইহা ভণ্ডতা মাত্র, কেহ কিছুই তত্ত্বোদ্ভাবন করিতে না পারিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রহিল এবং যখন জন্ তাহাদের সম্মুখীন হইলেন তখন প্রত্যেকেই তাহাকে নানারূপে উপহাস করিতে লাগিল। কেহ কেহ এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, জন্ অন্য কোন উত্তর না দিয়া বিজ্ঞাপনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক দেখাইয়া দিয়া আপনার কার্য করিতে লাগিলেন। সে দিন প্রাতঃকালে তিনি বিদ্যালয় হইতে অবসর লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া তৎকালে নগরস্থ পণ্যবিথীকায় গিয়া তাহার নিকট যে দশটি মুদ্রা ছিল, তদ্দ্বারা যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলেন। চীনের বাদাম ভর্জন করিবার একটি নাতিপুরাতন লৌহময় যন্ত্র পূর্বদিবস ভ্রমণকালে তিনি একস্থলে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, অতি সুলভ মূল্যে তাহা ক্রয় করিলেন। ক্ষৌর কর্মের জন্য একটি সুন্দর কাষ্ঠাসনও ক্রয় করিলেন

এবং বিজ্ঞাপনে যে সমুদয় দ্রব্য উল্লেখ করিয়াছিলেন, সকলগুলিরই কিয়ৎ কিয়ৎ পরিমাণ আনয়ন করিয়া অপরাহ্ণ ১টার সময় নূতন বাণিজ্যকর্মে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত হইলেন। প্রথম প্রথম তাহার কিঞ্চিৎ সঙ্কোচভাব আসিয়াছিল, কিন্তু স্বীয় মানসিক শক্তি বলে তিনি বৃথা অভিমানকে প্রায় চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং লিখিত সময়ানুসারে ক্রেতাবর্গের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিলেন এবং দেখিলেন যে বিংশতিজন সহাধ্যায়ী বহির্দেশে তাহার অপেক্ষা করিতেছে, জন্ গম্ভীরভাবে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আসুন মহাশয়েরা আপনাদের কোন্ বস্তু আবশ্যক? ক্ষৌরকর্ম বা স্নান বিচার ইচ্ছা করেন, পাদুকার চিক্কণতা সম্পাদন অথবা ভৃষ্ট চীনের বাদাম?"

সহাধ্যায়িগণ আশ্চর্যান্বিতের ন্যায় তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল এবং পরিশেষে উচ্চহাস্য করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশপূর্বক ইতস্ততঃ পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

গৃহে আসনের সংখ্যা অত্যল্প থাকায় সকলেই গৃহসামগ্রী সমূহের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে জন্ ব্যাপার কি? তুমি কি সত্য সত্যই দোকান খুলিয়াছ, না পরিহাসচ্ছলে এরূপ করিয়াছ?

জন্ উত্তর করিলেন "বিজ্ঞাপন পাঠ করুন।"

ইহাতে তাহাদিগের মধ্যে একজন সাহসে ভর করিয়া কহিল "আচ্ছা, আমার ক্ষৌর করিয়া দাও।" ইহাতে তৎক্ষণাৎ একটি ক্ষুদ্র অন্তর্গৃহ হইতে ক্ষৌরোপযোগী একখানি সুন্দর আসন বাহির করিয়া আনিলেন। ইহা তিনি পূর্বদিবস ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তাহার বন্ধুগণ আরও চমৎকৃত হইল। তদুপরি সহাধ্যায়ীকে উপবেশন করাইয়া একজন অভিজ্ঞ নাপিতের ন্যায় জন্ ক্ষৌরকর্ম করিতে লাগিলেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি পূর্বে মধ্যে মধ্যে তাহার ভ্রাতার ক্ষৌরকর্ম করিয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তাহার বন্ধুবর্গ কত উপহাস করিতে লাগিল, যদিও তাহারা ক্ষৌরাসনে উপবিষ্ট সহাধ্যায়ীকে কত প্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল, তথাপি জন্ এমন সুন্দররূপে আপনার কার্যসম্পন্ন করিলেন যে, তদ্দর্শনে সবাই অবাক হইয়া গেল। ক্ষৌর শেষ হইলে নাপিতদের প্রথা অনুসারে তিনি জিজ্ঞাসিলেন "ইহার পর আর কে ক্ষৌর করিতে চাহেন? এবং প্রথম বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "অনুগ্রহ করিয়া অর্থাধিকারীর নিকট আপনার দেয় দিউন।" ইহাতে সকলে উচ্চহাস্য

করিয়া উঠিল। এবং উক্ত বন্ধু তাহার হস্তে একটি ডাইস্ (দশসেন্ট) দিলে তিনি স্বীয় অঙ্গবস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া, অপর ক্ষৌরার্থীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এতদ্দর্শনে তাহার বন্ধুবর্গ তদীয় অবস্থার কুশল সম্বন্ধে কিছু সন্দিহান হইলেন। তাহারা তাঁহার অবস্থান্তরের কথা শুনে নাই, কিন্তু যখন বুঝিল যে জন্ পরিহাসচ্ছলে এরূপ করিতেছে না, তখন তাহারা তাঁহার অবস্থার বিষয় বিশেষ বুঝিতে পারিল। অনেকে ভাবিতে লাগিল যে জন্ এরূপ করিয়া কয়দিন চালাইতে পারবে? এরূপ কর্ম ভদ্রসন্তানের উপযোগী নহে। হয়তো দিন কয়েকের মধ্যে বিরক্ত হইয়া তাহাকে স্বদেশে প্রস্থান করিতে হইবে। ইহার পর দুই ঘণ্টা ধরিয়া এরূপ সুন্দরভাবে জন্ স্মীথের কার্য চলিতে লাগিল, যে তিনি ততদূর আশা করেন নাই। নূতন নূতন বন্ধুর দল আসিতে লাগিল। ভৃষ্ট চীনের বাদামের ক্রেতা এত অধিক হইল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। কাগজ কলম প্রভৃতির বিক্রয়ও অত্যধিক হইয়া ছিল, কারণ সেই দিবস বিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্রগণের পরীক্ষা হইতেছিল।

পাঁচটার পর জন্ স্বীয় গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। আর কোন ক্রেতা ভিতরে আসিতে পারিল না। ইতোমধ্যে তিনি কিছুক্ষণের জন্য আপনার পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিয়া, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া লইলেন এবং দ্রব্যাদি কত বিক্রয় হইল তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া সাতটার সময় পুনরায় দ্বার খুলিয়া দিলেন। সেই সময় বোধ হইল যে, বিদ্যালয়ের যাবতীয় ছাত্র তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই কিছু না কিছু আবশ্যক। চীনের বাদামের ছল্লিতে গৃহতল পূর্ণ হইয়া উঠিল। জন্ তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইলেন, কারণ তাহা বহু বিক্রয়ের দ্যোতক।

রাত্রি দশটা বাজিলে, তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেন ও তৎপরে সমস্ত দিবস ধরিয়া কত বিক্রয় করিয়াছেন তাহা গণনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে নিজেই চমৎকৃত হইলেন। তিনি সাতজন সহাধ্যায়ীকে ক্ষৌর করিয়াছেন, প্রত্যেককে দশ সেন্টের হিসাবে; পনেরো জোড়া চর্ম পাদুকার চিক্কণতা সম্পাদন করিয়াছেন, প্রত্যেক জোড়াটি পাঁচ সেন্টের হিসাবে; ছয় ডলার মূল্যের কাগজ, পেনসিল ও কালি বিক্রয় করিয়া তিনি তাহাতে এক ডলার ২০ সেন্ট লাভ করিয়াছেন এবং চীনের বাদাম বিক্রয় করিয়া দুই ডলার লাভ করিয়াছেন। ব্যয় বাদে তাঁহার আয় সর্বশুদ্ধ

সার্ধ চারি ডলার হইয়াছে। অধিকন্তু তিন চারিজন ছাত্র পুরাতন টুপি রঞ্জিত করিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত করিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অলস প্রকৃতির পণ্ডিত বিচারার্থ কতকগুলি প্রশ্নের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত কোন বাদসভার সভাপতি; তিনি সাতিশয় অলস ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া, যখন শুনিলেন যে, জন্ স্মীথ বিচারার্থ প্রথম তালিকা যোগাইবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তখন মূল্য দ্বারা যদি তাহা অনায়াসে লাভ করা যায়, তাহা হইলে তিনি কেন তজ্জন্য বৃথা কষ্ট স্বীকার করিবেন। পরদিন অপরাহ্ণে বিদ্যালয়ের যাবতীয় লোক এই উদ্যমশীল যুবকের সম্বন্ধে পরস্পরে কথোপকথন করিতে লাগিল। সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইতে না হইতে তিনি এত ক্রেতা পাইতে লাগিলেন যে, তাঁহার আর অবসর রহিল না। সুরঞ্জিত করিবার জন্য কত কত টুপি, বোতাম সীবনের জন্য কত জামা যে আসিতে লাগিল, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। তাহার কার্যে একটু আধটু ত্রুটি থাকিলেও ছাত্রেরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না, সমস্ত দিন ধরিয়া চীনের বাদাম ভৃষ্ট হইতে লাগিল এবং চর্ম পাদুকার চিক্কণতা সম্পাদনে তিনি সাতিশয় সুখ্যাতি লাভ করিলেন। ক্ষৌরকর্ম হইতে তাঁহার অধিক লাভ হইতে লাগিল।

জুন মাস উপস্থিত। সভাপতি বি.এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বিদ্যালয়ের বহির্দেশে একটি বৃহৎ তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে, নানাবিধ উপদেশ সম্বলিত এক মনোহর বক্তৃতা করিলেন, জন্ স্মীথও তাহাদের মধ্যে একজন। সুধীবর সভাপতি মহাশয় এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন, "যে সদুপায় ও সদুদ্যম অবলম্বন করিয়া তোমাদের মধ্যে একজন গত একবৎসর ধরিয়া বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া আমি প্রীতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছি, তোমাদের সহাধ্যায়ী—যেরূপে আপনাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে সমর্থ করিয়াছেন, বিদ্যালয়ের আরম্ভ হইতে অদ্যাবধি অন্য কেহই সেরূপ করেন নাই। যে মনুষ্যত্ব সৎপথে থাকিয়া কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রমকে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর ও হেয় বলিয়া মনে করে না, সেই মনুষ্যত্বের জন্য আমি তোমাদের সহাধ্যায়ীকে সবিশেষ মান্য করি ও তোমাদেরও তদ্বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং মনুষ্যত্বের আদর্শস্বরূপ জন্ স্মীথকে বারংবার ধন্যবাদ দিবার জন্য আমি সকলকে অনুরোধ করি। উনি বাস্তবিকই আমাদের অনুকরণীয় হইয়াছেন।" সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে, সকলে উচ্চৈঃস্বরে জন্ স্মীথকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিল ও বলিতে লাগিল "জন্ স্মীথ তুমি আমাদের কিছু বল, বল"।

ইহাতে জন্ স্মীথ স্বীয় অধ্যাপক ও সহাধ্যায়িগণের প্রীতি সম্ভাষণে বাস্তবিকই অভিভূত হইয়া পড়িলেন, পরিশেষে দণ্ডায়মান হইয়া এই কয়েকটি কথা কহিলেন।

"বন্ধুগণ, আমি তোমাদের তাদৃশ প্রশংসাভাজন হইবার উপযুক্ত নই, আমি স্বভাবত কিঞ্চিৎ অভিমানী। অথচ আমার অন্য কোনও উচ্চকর্ম করিবার শক্তি নাই, সুতরাং আমাকে ক্ষৌরকর্ম ও বিচার কর্ম সম্পাদনের জন্য এক প্রকার আগম খুলিতে হইয়াছিল এবং তোমরা সকলে যাইয়া আমায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছ। সভাপতি মহাশয় অদ্য আমার প্রতি অত্যধিক দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে সমুচিত উত্তর দিবার আমার শক্তি নাই। বিশেষত বক্তৃতাকরণ বিষয়ে আমি অতিশয় অপটু। তোমরা সকলে আমার গৃহে আইস, আমি ভৃষ্ট চীনের বাদাম দিয়া যথাসাধ্য তোমাদের প্রীতি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিব।" এই কয়েকটি কথা বলিয়া জন্ স্মীথ সহসা উপবিষ্ট হইলেন এবং সকলে একবাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। এই আখ্যায়িকাটি মিথ্যা নহে, একটি সত্য ঘটনা। তবে যুবকের বর্তমান নাম যদি জন্ স্মীথ না হয়, তাহাতে তাঁহার কিছু অপরাধ নাই।

("দি অ্যাডভান্স" The Advance—নামক কোন এক মার্কিন কাগজ হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক অনূদিত)

(উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১ বৈশাখ ১৩০৭, পৃঃ ২০৯-২১৫)

নির্বাণ তত্ত্ব

পদার্থ মাত্রেরই এক এক বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বই ইহাকে অন্যান্য পদার্থ হইতে বিশেষ বা পৃথক করিয়া ইহার নিজত্ব বিধান করে। এই নিজত্ব বিধায়ক বিশেষ ভাবটির নামই স্বভাব। সুতরাং বস্তুর স্বভাব জানা হইলেই তাহাকে যথার্থ জানা হইল। এরূপ জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান। কোন বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান জানিতে হইলে তাহার স্বভাব জানিলেই হইল, এই স্বভাব রাগদ্বেষাত্মক; ইহা কতকগুলিকে গ্রহণ করিতে চায়, কতকগুলিকে ত্যাগ করিতে চায়; কতকগুলির সহিত ইহার নিত্য প্রীতি কতকগুলির সহিত নিত্য অপ্রীতি। পদার্থ সমুদয় জড় ও চেতন এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। জড়পদার্থ সমূহের ভিতরেও রাগদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। যেমন অন্ধকারের সহিত অন্ধকারেরই ঘনিষ্ঠতা হয়, আলোকের কখনও হয় না, সেইরূপ স্বজাতীয় বস্তুর সহিতই বস্তুর ঘনিষ্ঠতা হইয়া থাকে, বিজাতীয়ের সহিত কখনই হয় না। জলীয় ও স্নেহময় পদার্থ বিজাতীয় বলিয়া মিলিত হইতে পারে না। জলীয় জলীয়ের সহিত স্নেহময় স্নেহময়ের সহিত মিলিত হয়। স্থাবর জীবেও (যথা বৃক্ষলতাদি) রাগদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। বায়ু, জল এবং সূর্যালোক ইহাদের অভিমত; অনাবৃষ্টি, অতিরিক্ত উত্তাপ, এবং অন্ধকার ইহাদের অনভিমত। বায়ু, জল এবং আলোকের সহায়ে বর্ধমানা লতা স্বীয় সুকোমল অগ্রভাগ দ্বারা কেবল সূর্যালোক তপ্ত স্থানই অন্বেষণ করে, তুমি যতই তাহাকে ছায়ার দিকে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা কর না, কখনও সফল হইবে না। অদ্যই ফিরাইয়া দাও, কল্য দেখিবে, তাহা সূর্যাভিমুখী হইয়াছে। আলোকের প্রতি অনুরাগ এবং ছায়ার প্রতি দ্বেষই ইহার স্বভাব। সুতরাং জড় ও উদ্ভিদ পদার্থসমূহ যে রাগদ্বেষের অধীন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

জীব জগৎ রাগদ্বেষ দিয়া গঠিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। গো, মহিষ প্রভৃতি শস্যপ্রিয় জন্তুগণ তৃণ, পল্লব, লতা প্রভৃতিতেই বিশেষ অনুরক্ত, কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল মাংসাশী বলিয়া, তৎসমুদয়ে উহাদের কোনও অনুরাগ লক্ষিত হয় না। প্রতি জীবেরই এই রাগদ্বেষের পার্থক্য দৃষ্ট হয় বলিয়া, তদ্দ্বারাই তাহাদের স্বভাব নির্ণয় করিতে হয়। স্বভাব রাগাদ্বেষাত্মক হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা রাগাত্মক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, আলোকই আমার একমাত্র অনুরাগের কারণ বলিয়া তদ্বিপরীত অন্ধকার সহজেই হেয় হইবে। অতএব

দ্বেষ অনুরাগ জন্য বলিয়া, ইহা অনুরাগেরই অন্য এক রূপ; এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত। রাগে গ্রহণ ও দ্বেষে ত্যাগ করায় এই জন্য রাগ ভাবাত্মক এবং দ্বেষ অভাবাত্মক অর্থাৎ রাগেরই সত্তা আছে, দ্বেষের সত্তা নাই। সুতরাং স্বভাব রাগাত্মক। যে যাহা চায়, তাহাই তাহার স্বভাব, যে যাহা দ্বেষ করে, তাহাই তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক। মৎস্য জলে বাস করিতে চায়। জলে বাসই সুতরাং তাহার স্বভাব। আবার স্থলে বাস ইহার পক্ষে অত্যন্ত হেয় বলিয়া, তাহা উহার পক্ষে অস্বাভাবিক।

এইরূপে মনুষ্যস্বভাব পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাও রাগদ্বেষাত্মক। আনন্দভোগে ঈপ্সা, দুঃখ ভোগে জিহাসা কাহার না হয়? জীবনে প্রীতি এবং মরণে ভীতি সকলেরই দৃষ্ট হয়। মননশীল মনুষ্য মনন সহায়ে জ্ঞানোপার্জনে একান্ত অনুরক্ত; অজ্ঞানের উপাসনা, সূর্যের অন্ধকার উপাসনার ন্যায়, তাহার পক্ষে অসম্ভব; জ্ঞানে আদর এবং অজ্ঞানে অনাদর তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। এইরূপে মনুষ্যের স্বভাব, অর্থাৎ মনুষ্য কি কি দিয়া গঠিত জানিতে হইলে আমরা সহজেই পাই যে, আনন্দভোগই তাহার স্বভাব, দুঃখ নহে; জীবন ধারণই তাহার স্বভাব, মরণ নহে এবং জ্ঞানই তাহার স্বভাব, অজ্ঞান নহে। আনন্দভোগ, আনন্দ পদবাচ্য, জীবন ধারণ সৎপদ বাচ্য এবং জ্ঞান চিৎপদবাচ্য। ঋষিগণ এইরূপে মনুষ্যকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

মানব সচ্চিদানন্দময় স্থির হইলে, যাহা মরণশীল তাহা মনুষ্য নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে। দেহবান মনুষ্যের জন্ম ও মরণ আছে, সুতরাং তিনি প্রকৃত মনুষ্য নহেন। এইরূপে ক্রিয়াময়, মননশীল কর্তা ও ভোক্তা পদবাচ্য মনুষ্য নিদ্রাবস্থায় লয় হয়েন বলিয়া তিনিও প্রকৃত মনুষ্য নহেন, কারণ সৎস্বভাবের লয় হওয়া অসম্ভব। এই জন্যই পণ্ডিতগণ মনুষ্যকে পঞ্চকোষাতীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কোষান্তর্গত মানব প্রকৃত মনুষ্যের ছায়ামাত্র। কোষ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন বলিয়া প্রকৃত মানব অসীম, বিভু, মহতো মহীয়ান, আর্য ঋষিকুলের এইরূপ মীমাংসা।

ক্ষত্রিয় কুল গৌরব শুদ্ধোধন নন্দন শাক্যসিংহের জীবনে প্রকৃত মনুষ্যের বিকাশ যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মনুষ্য সচ্চিদানন্দময় হইলেও পৃথিবীর প্রায় সমগ্র মানব মণ্ডলীই আপনাদিগকে নামরূপবিশিষ্ট, সোপাধিক নশ্বরজীব স্বরূপ ধারণা করিয়া সন্তুষ্ট আছেন।

তাঁহাদিগকে দেখিলে এরূপ বোধ হয় না যে, তাঁহারা নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন, সর্বতঃপূর্ণ, পরমানন্দময় পরম পুরুষ। ঘট কুড্যাদির ন্যায় তাঁহারাও নশ্বর, নানাবিধ অবস্থার অধীন, সুখ-দুঃখের তরঙ্গ মধ্যে দোদুল্যমান হইয়া নিত্যই কৃপাপাত্র ও কৃপাভিক্ষুক। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনেই তাঁহাদের যাবতীয় শক্তি ব্যয়িত হয়। তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ অন্যরূপে জীবনযাপন করিতে চাহেন, অমনিই তিনি স্বীয় স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির ভাবভঙ্গি দেখিয়া, সেরূপ সঙ্কল্প হইতে বিরত হয়েন। সুতরাং এই সংসার এক ধারায় আহার নিদ্রাদির বশবর্তী মানবকুলকে লইয়া আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একজন এই মহাস্রোতের উপর মস্তক উত্তোলন করিয়া বজ্র নির্ঘোষে বলেন, "পশুবৎ জীবনযাপন করা মানবের উদ্দেশ্য নহে। স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এই দুঃখ সঙ্কুল সংসার সমুদ্র হইতে আপনাদের উদ্ধার কর।" সেই শব্দে কেহ কেহ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠেন এবং সেই দেবতুল্য সৌম্যমূর্তির দিব্য মুখজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া এবং তাঁহার অবিশ্বাসরূপ অন্ধকার বিনাশী সুযুক্তির আলোকপূর্ণ, সুমধুর, সহজবোধ্য, উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া, হৃদয়ে আশা ও বলপ্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারাও তৎসঙ্গে সংসার সমুদ্রের উপর স্ব স্ব মস্তক উত্তোলন করেন এবং দেখেন যে, তাঁহাদের প্রাণের ক্ষুধা ও পিপাসা মিটাইবার একমাত্র বস্তু সম্মুখে জাজ্বল্যমান। তাহার অন্বেষণে এতদিন তাঁহারা মিথ্যা সংসার সমুদ্রের অতল তলে হাবুডুবু খাইতেছিলেন, তাহা যে ঐ ভয়সঙ্কুল, দুঃখময় সাগরের বাহিরে অবস্থিত, ইহা কেবল এই মহাপুরুষের বাক্যে জানিতে পারিয়া আপনাদের কৃতার্থ করিলেন। মধ্যে মধ্যে এইরূপে কেহ কেহ মহাপুরুষ সহায়ে আপনাদের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। এবং ঐ মহাপুরুষও মধ্যে মধ্যে এখানে দেখা দিয়া অনেক দুঃখী, হতাশ, শোকসন্তপ্ত মানবকে নিত্য শান্তিনিকেতনে লইয়া যান। এই সকল পরদুঃখকাতর, শান্তিদান সমর্থ, মহাপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে আসেন বলিয়াই এই দুঃখের সংসারে দুঃখী তাপীর অবসান আছে। তাহা না হইলে ইহা নরকতুল্য ভয়ঙ্কর হইত, অজ্ঞান অন্ধকার কখনও ইহা হইতে অপসৃত হইত না।

শাক্যসিংহ যে এইরূপ এক মহাপুরুষ ছিলেন, ইহা তাঁহার যুব জীবন পর্যন্ত আলোচনা করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। সর্ব সৌন্দর্যের আদর্শ, সর্ব সুলক্ষণসম্পন্ন, সর্ব সৌভাগ্যের আস্পদ, সুকোমল হৃদয় সেই রাজপুত্র নিখিল আরাম নিলয় স্বীয় দিব্য প্রাসাদে যুবতীজায়া ও নবজাত সন্তানের সহিত অশেষ দাসদাসী পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। তাহাকে সর্ববিধ সুখে ও স্বচ্ছন্দে

রাখিবার জন্য তাঁহার স্নেহময় পিতা রাজা শুদ্ধোধন কোন যত্নেরই ত্রুটি করেন নাই। প্রাসাদের চতুঃপার্শ্বে ক্রোশব্যাপী ইন্দ্রের নন্দনকানন তুল্য মনোহর উদ্যান। তন্মধ্যে কত প্রফুল্ল কমলহংসকারণ্ডবাকীর্ণ, চিত্তমুগ্ধকারী সরোবর, কত কেলিসদন, কত দেবদেবী নরনারীর প্রস্তরময়ী, মনোহারিণী মূর্তি, কত কেলি তরুণী সমাকীর্ণ সরোবর হইতে সরোবরান্তরগামী, ঈষৎ তরঙ্গাকুল খাত, তাহা কে গণনা করিতে পারে? কিন্তু সেই পরিখা ও প্রাকার পরিবেষ্টিত সুবিশাল উদ্যান সীমাবদ্ধ বলিয়া স্বাধীনচেতা, মুক্ত স্বভাব রাজকুমারের পক্ষে অনতি বিলম্বেই বিষম বন্ধন ভূমির ন্যায় বোধ হইল। তিনি একদা প্রাতঃকালে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, "দেখিতে হইবে এই প্রাকারের বহির্দেশে কি আছে?" এরূপ স্থির করিয়া ছন্দকনামা স্বীয় সূতকে কহিলেন, "অদ্য সন্ধ্যার পূর্বে আমি উদ্যানের বহির্দেশে গমন করিব, তুমি রথ লইয়া প্রস্তুত থাকিও।"

সমাচার পিতার কর্ণে উপনীত হইল। তিনি অমনি প্রজাবর্গকে স্বীয় রাজধানী সুসজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন; কুরূপ, কুশব্দ ও কুগন্ধ যাহাতে রাজকুমারকে ব্যথিত না করে, এই বিষয়ে সকলকে বিশেষ সতর্ক হইতে কহিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত। উদ্যানের উত্তর দ্বার দিয়া ছন্দক পরিচালিত রথ নগরে প্রবেশ করিল। অসংখ্য নরনারী মনোহর বেশে সুসজ্জিত হইয়া রাজকুমারের দর্শন লালসায় উদ্‌গ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। কুমার রাজপথে উপনীত হইলে সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। গায়ক ও নর্তকগণ মধুর স্বরে মঙ্গলগীতি গান করিতে লাগিলেন। যুবরাজের তদ্দর্শনে ও তচ্ছ্রবণে অপার আনন্দ হইল।

সন্ধ্যা প্রায় অতীত হইয়া যায়। এমন সময় ছন্দক উদ্যানাভিমুখে রথ ফিরাইলেন। সেই সময় এক জরাতুর বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন বলিয়া যষ্টির উপর ভরকরতঃ নিকটবর্তী কোনও পান্থকে পথ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং যদিও সেই পান্থ তাঁহাকে বার বার দক্ষিণে যাইতে কহিতেছিলেন, তথাপি শ্রবণ শক্তিহীন বলিয়া স্থবিরও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। তাঁহার শ্বেত কেশ ও শ্মশ্রু, রদনহীন বক্ত্র, কম্পিত কলেবর ও ভগ্নস্বর দর্শন ও শ্রবণ করতঃ কুমার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সূত এ কোন্ জাতীয় জীব?" সূত কহিলেন, "প্রভো, ইনি বৃদ্ধ, বার্ধক্যে সকল মনুষ্যেরই এই অবস্থা হয়।" কুমার কহিলেন, "আমাকেও এরূপ হইতে হইবে?" সূত তাহাতে উত্তর দিলেন, "যুবরাজ, জরাবশে মনুষ্য

মাত্রকেই এরূপ ইন্দ্রিয় শক্তিশূন্য, অজ্ঞান শিশুর ন্যায় হইতে হয়।" ইহা শুনিয়া তিনি নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। যান প্রাসাদে উপনীত হইল। সে রজনী তিনি সুখে আরাম করিতে পারিলেন না, দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় ছন্দক পরিচালিত রথ কুমারকে লইয়া উদ্যানের দক্ষিণদ্বার দিয়া বহির্গত হইল। পূর্ব দিবসের ন্যায় নগরবাসিগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং মধুর মঙ্গলগীতিরব চিন্তাকুল কুমারের চিন্তাকে ক্ষণকালের জন্য তিরস্কৃত করিয়া দিল। কিয়দ্দূর গিয়া যুবরাজ দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে এবং আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তাহার স্বজনগণ বিবিধ উপায়ে তাহাকে স্থির করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কোন মতেই কৃত কার্য হইতে পারিতেছেন না। কুমার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "কুমার, এ ব্যক্তি জ্বরে অভিভূত হইয়া বিষম যন্ত্রণা পাইতেছে। মনুষ্য দেহে ধাতু বৈষম্য উপস্থিত হইলে এরূপ হয়। যতদিন ধাতুসমূহ সমতাপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন ইহাকে এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।" ইহাতে যুবরাজ কহিলেন, "সকলকেই কি এইরূপে সর্ব সুখবিনাশক অতীব ক্লেশজনক জ্বরের অধীন হইতে হইবে?" ছন্দক কহিলেন, "সর্বকাল মনুষ্যের হিতাহিত বিবেচনাশক্তি থাকে না, সুতরাং তিনি অনেক সময়েই অত্যাচার করিয়া ফেলেন। সেই অত্যাচার হইতে ধাতুবৈষম্য ও তাহা হইতে জ্বরের উদয় হয়।" যুবরাজ ব্যাকুলচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রজনীতে উত্তমরূপ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না।

তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় কুমারের রথ নগরের পশ্চিমদিকে উপনীত হইল, পূর্ব পূর্ব দিনের ন্যায় জয়ধ্বনি ও মঙ্গলগান আর তাঁহাকে অধিক উল্লসিত করিতে পারিল না। কিয়দ্দূর গিয়া যুবরাজ দেখিলেন যে, চারিব্যক্তি খট্টার উপর শায়িত পুরুষকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ কতিপয় স্ত্রী-পুরুষ আর্ত স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে গমন করিতেছেন। এই করুণ দৃশ্যে ব্যথিত হইয়া কুমার ছন্দককে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন, "হে কুমার খট্টায় শয়ন পুরুষ আর জীবিত নাই। তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহমাত্র এখানে আছে। সকলকেই কোন না কোন সময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। মনুষ্য শতবৎসর কাল মাত্র এ ভবধামে থাকিবার অধিকার পাইয়াছেন। তাহার পর তাঁহাকে ইহা ত্যাগ করিতেই হইবে, অধিকাংশই ষষ্ঠিবৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে চলিয়া যান।"

এই নূতন সম্বাদে যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন। ব্যাকুলান্তকরণে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি সে রজনী মুহূর্ত মাত্রও নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যে জ্ঞান আমার এত প্রিয়, যাহার আমি স্পর্ধা করিয়া থাকি, বার্ধক্যে তাহার অপলাপ হইবে, যে আনন্দ পৃথিবীর একমাত্র আকর্ষণ, রোগ তাড়নায় তাহার লোপ হইবে। যে জীবন এত আশাময়, এত মনোহর, মৃত্যুতে তাহারও অবসান হইবে। তবে কিসের জন্য সকলে এই পার্থিব জীবনকে এত আদর করিয়া থাকে?

মনুষ্য মাত্রেই উন্মাদ রোগগ্রস্ত। যাহার স্থিরতা নাই, তাহাকে স্থির জ্ঞান করা কি বাতুলতা নয়? এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া তিনি অতিকষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন।

প্রভাত হইল প্রফুল্ল কুসুমকুল প্রাতঃ সমীরণে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া চারিদিকে আপন আপন সৌরভ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। পক্ষিসমূহ পরমানন্দে প্রাভাতিক গান আরম্ভ করিয়া দিল। প্রকৃতির সকলই মনোহর, সকলই উৎফুল্ল ও সজীব। যুবরাজের বদনকমলের অদ্য আর সেরূপ বিকাশ নাই। পাছে গোপা মনে ব্যথা পান, এই হেতু তিনি স্বীয় ভাব গোপন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সম্যক কৃতকার্য হইলেন না। পতিপ্রাণা গোপা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার আরাধ্য দেবতার কোনও গভীর মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সশঙ্কিত চিত্তে যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আর্যপুত্র, অদ্য তোমাকে এরূপ বিমনা দেখিতেছি কেন? আমি কি তোমার নিকট কোনরূপে অপরাধিনী হইয়াছি?" সুমধুর প্রিয় সম্ভাষণে কুমার স্বীয় জায়ার শঙ্কা দূর করিলেন এবং তিনি কোন দুর্বোধ্য বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন আছেন বলিয়া কিছুক্ষণ একান্তে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, গোপা অন্যত্র গমন করিলেন।

ছন্দক-পরিচালিত রথ সন্ধ্যার সময় অদ্য উদ্যানের উত্তর দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। নাগরিকগণ জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া যুবরাজ এক ভিক্ষাপাত্রধারী, কাষায় বসন, উদাসীন দৃষ্টি ভিক্ষুককে দেখিয়া ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তির এরূপ উদাসীন ভাবে থাকিবার কারণ কি?" ছন্দক উত্তর করিলেন, "হে কুমার এই মহাপুরুষ জগতের অকিঞ্চিৎকরত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন। ইনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র পরিবার প্রভৃতির সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ পূর্বক এক্ষণে যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট হইয়া পৃথিবীর সর্বস্থলেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইঁহার কোনও নির্দিষ্ট গৃহ নাই।

যখন যেখানে থাকেন, তাহাই উহার গৃহ। উঁহার আত্মপর কেহ নাই। উনি সর্বদাই নিশ্চিন্ত। এই সমাচারে ভাবিবুদ্ধের যাবতীয় চিন্তা দূর হইয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন যে, সংসারের মধ্যে এই ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী। অনিত্যে নিত্য জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বাতুলতা মাত্র। যদিও তাঁহার নিদ্রা হইল না, তথাপি তিনি সে রজনী আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "অজ্ঞান দুঃখ ও মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় কি? জগতের ক্ষণভঙ্গুর সুখে সর্বতোভাবে উদাসী না হইলে সে উপায় কখনও উদ্ভাবিত হইবে না।"

যুবরাজ ইহা স্থির নিশ্চয় করিলেন এবং কিয়দ্দিবস পরে গোপনে রাজ্য হইতে পলাইয়া গিয়া ভিক্ষুবেশে ক্রমাগত ছয় বৎসর অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া এবং বহুগুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক অকৃতকার্য হইয়া, পরিশেষে স্বচেষ্টায় সেই পথ আবিষ্কার করিলেন, যদ্দ্বারা গমন করিলে অজ্ঞান, দুঃখ ও মৃত্যু সর্বতোভাবে নির্বাণপ্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞান (চিৎ) আনন্দ ও চিরজীবন (সৎ) পথিকের লাভ হয়। সুতরাং বুদ্ধাবিষ্কৃত নির্বাণ, ঋষিদৃষ্ট সচ্চিদানন্দময় স্বস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(উদ্বোধন, ৪র্থ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ১ পৌষ ১৩০৯, পৃঃ ৬৪১-৬৪৭)

অহং তত্ত্ব

সাধারণত আমাদের তিনটি অবস্থা হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রদবস্থায় আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনন্ত দেশকালব্যাপী এই বিশ্বসংসার উপলব্ধি করিয়া থাকি। তখন বিশ্বের সহিত পৃথিবীর তুলনা করিয়া দেখিতে পাই যে, ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতগণ অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রাদির দূরত্ব, পরিমাণ প্রভৃতির বিষয় পর্যালোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে, আমাদের সুবৃহৎ পৃথিবীকে একটি বিশ্বস্বরূপে কল্পনা করেন। অন্যান্য জ্যোতির্মণ্ডল সমূহের সহিত তুলনায় ইহাকে বিন্দুতুল্য বলিয়া স্বীকার করিলে গণনায় কোন ভ্রম প্রমাদ উপস্থিত হয় না। এইরূপ গণনা দ্বারাই তাঁহারা অন্যান্য অনেক জ্যোতির্মণ্ডলের যথাযথ দূরত্ব ও পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন। সূক্ষ্ম অঙ্কশাস্ত্রের মতে শূন্য একটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সংখ্যা বিশেষ। শূন্যদ্বারা পরিমাণাদির সর্বাঙ্গীণ অভাব বুঝায় না। যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র সংখ্যা আর হইতে পারে না, তাহাই শূন্য। ইহা স্বীকার করিলে পৃথিবীকে শূন্য বলা অযৌক্তিক নহে। কারণ, "ক্ষুদ্র" "বৃহৎ" প্রভৃতি রেখাগুলি আপেক্ষিক, অর্থাৎ ক্ষুদ্র বলিলে আমরা অন্য কোন পদার্থ অপেক্ষা ক্ষুদ্র এরূপ বুঝিয়া থাকি। সুতরাং অনন্ত দেশের সহিত যদি কোন সান্ত দেশের তুলনা করা যায়, তাহা তদপেক্ষা যে অনন্তগুণে বৃহৎ হইবে এবং সান্ত পদার্থটি যে অনন্তের অনন্ত ভাগের এক ভাগ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। অর্থাৎ সান্ত পদার্থটি যে অনন্তের তুলনায় শূন্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে। অসংখ্য গিরিকন্দরনির্ঝর নদনদী বিভূষিতা, সমুদ্রমেখলা অগণন জীবনিবহের জননী, ধনধান্যময়ী, সুধিপূজা ধরিত্রীদেবীই যদি বিশ্বের মধ্যে এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মানা হয়েন, তাহা হইলে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রতম জীবের সত্তাই উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। বিচার করিয়া দেখি যে জাগ্রত সময়ে আমাদের এই অবস্থা।

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত আত্মার প্রিয়কর নহে। কেহ আপনাকে নীচ ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া প্রীতি পান না। মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট কিনা। যদিও তিনি কোটিপতি হইতে পারেন, যদিও তাঁহার অসংখ্য অসংখ্য দাসদাসী থাকিতে পারে, যদিও সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া তাঁহার যশোরাশি দেদীপ্যমান হয়, যদিও স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননী, পতিপরায়ণা সহধর্মিণী, আজ্ঞাকারী, বিনয়নম্র, রূপগুণসম্পন্ন, সুস্থকায়, যুবক পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া

তিনি আপনাকে সময়ে সময়ে কৃতার্থ মনে করিতে পারেন, তথাপি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর তিনি তাঁহার আশায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন কিনা। অমনি শুনিবে যে, তিনি আরও কত কি আকাঙ্ক্ষা করেন। এরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্যের পক্ষে আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া সন্তুষ্ট থাকা অসম্ভব। মানুষের এ বাসনার, আকাঙ্ক্ষার শেষ কোথায়? সমগ্র পৃথিবী যদি তোমার করতলগত হয় তাহা হইলেই কি তুমি সুখী ও শান্ত হইতে পার? না। অমনি তোমার চন্দ্রমণ্ডল আক্রমণ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা লাভ হইলে সূর্যমণ্ডল, এইরূপ এক এক করিয়া তুমি প্রত্যেক গ্রহনক্ষত্রকে স্বীয় আয়ত্তে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবে এবং যখন এমন কিছুই থাকিবে না যাহা তোমার না হইবে, তখনই তুমি শান্তি লাভ করিবে। অর্থাৎ যখন তুমি অনন্তের সহিত এক হইয়া যাইবে, তখনই তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে, অন্য কোন উপায়ে নহে।

এটি মানুষের ভিতরকার কথা হইলেও তাঁহাকে সচরাচর সন্তুষ্ট থাকিতে দেখা যায়। তাহার কারণ পূর্বোক্ত আত্মতুলনা। যখন মনুষ্য আপনাকে সার্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত, নামরূপ বিশিষ্ট, জন্মমরণশীল, ক্ষুদ্রপ্রাণ, ক্ষুদ্রমনা, ক্ষুদ্রশক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন, তখনই তিনি আপনাকে ক্ষুদ্র বলিতে বাধ্য হয়েন। এবং ক্ষুদ্রভাবে থাকিয়া যে কোন উপায়ে জীবনযাপন করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু এ বিশ্বাস যে তাঁহার অন্তরাত্মার রুচিকর নহে, তাহা পূর্বে দেখাই নাই, তবে কেন তিনি দেহে আত্মাভিমান করিয়া থাকেন? ইহার আর এক কারণ আছে। মানুষ সুখ চাহেন এবং সুখাভাব ও দুঃখমাত্রই ঘৃণা করেন। এ সুখ পাইতে গেলে তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতেই হইবে। পরম রমণীয় মনোহররূপ, মধুর সঙ্গীত ধ্বনি, সুখস্পর্শ, মৃদুমন্দবায়ু, অমৃতোপম নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য সামগ্রী, চিত্তবিনোদন-কুসুমাদির সৌরভ, আত্মপ্রশংসাবাদ, স্বীয় গৌরব ব্যঞ্জক কার্যকলাপ, প্রণয়ালাপ প্রভৃতি যাহা কিছু মানবমনে প্রীতি আনয়ন করে, তাহা ইন্দ্রিয় সাহায্যেই তদ্রুপ করিতে পারে বলিয়া এই ইন্দ্রিয় সমষ্টিভূত দেহে তাঁহার এতাদৃশী আস্থা ও ভালোবাসা। যতকাল পর্যন্ত তিনি দেহকে সুখের কারণ বলিয়া জানিবেন, ততকাল তাহার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভালোবাসা থাকিবেই। কিন্তু এরূপ জ্ঞান অসম্যক, এরূপ দর্শন একদেশ দর্শনমাত্র। স্নায়ুময় ইন্দ্রিয়গণ যে কেবল সুখের কারণ, তাহা নহে, তাহারা দুঃখেরও কারণ। এ জগৎ কেবল সুন্দর, স্নায়ুতৃপ্তিকর পদার্থে গঠিত নহে। ইহাতে সুরূপ অপেক্ষা কুরূপের, সুস্বর অপেক্ষা কুস্বরের, সুস্বাদজনক অপেক্ষা বিস্বাদজনক পদার্থের, সুখস্পর্শ অপেক্ষা দুঃখস্পর্শের, সুগন্ধ অপেক্ষা দুর্গন্ধের,

সংখ্যাই অধিক। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের সুখদান অপেক্ষা দুঃখদানের শক্তিই অধিক। শুদ্ধ তাহাই নহে। যদিও মানব এই দেহকে অতি আদর যত্ন করেন, যদিও ইহার সেবাতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় নষ্ট হয়, যদিও তিনি ইহাকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করেন, যদিও তিনি অনন্তকাল ইহার সহবাস আকাঙ্ক্ষা করেন, তথাপি পরিশেষে ইহা তাঁহাকে নির্ম্মমের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তাঁহার, আজীবন সেবার এই লাভ। যাঁহাকে এত আত্মীয় জ্ঞান করিলেন, এত যত্ন করিলেন, তাহা তাঁহার জন্য একদণ্ডও অপেক্ষা করিল না, একবার ফিরিয়াও চাহিল না। ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়?

মনুষ্য পরসেবা করেন লাভের জন্য। যাহাতে আনন্দ লাভ হয়, জীবন লাভ হয় তাহারই জন্য সেবা করা। যদি সেই সেবা দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে তাহা তখনই ত্যাগ করা উচিত। দেহসেবা কি সেইরূপ নয়? বলিতে পার, ইহাতে দুঃখ হয় বটে, কিন্তু সুখও হয়। কিন্তু বল দেখি, তুমি দুঃখবহুল বা দুঃখলেশশূন্য সুখ চাও? বলিতে পার, দুঃখ স্পর্শশূন্য সুখ পৃথিবীতে অসম্ভব, সুতরাং নিষ্কলঙ্ক, সুপক্ব ও সুমিষ্ট ফলের অভাবে কাকভক্ষিত, বিস্বাদু ফল খাওয়াও ভালো, কারণ না খাইলে ক্ষুধার শান্তি হয় না। অতএব অনন্যগতি হইয়াই ইহা গ্রহণ করিতেছ। অন্যগতি থাকিলে অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক সুমিষ্ট ফল পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে ইহা কখনও গ্রহণ করিতে না। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এরূপ ফল পাওয়া যায়। না, এবং যদি যায়, বুদ্ধিমান মাত্রেই কি তাহা লাভ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাওয়া উচিত নয়? মানব কত পরিশ্রম করিলে, তবে এই দুঃখবহুল সুখলব লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং যদি তিনি পরমানন্দ লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে কি বিনা পরিশ্রমে তাহা লাভ হইয়া থাকে? নিশ্চয়ই তল্লাভে বিশেষ যত্নের আবশ্যক।

দেখা যাউক, এরূপ সুখ সম্ভাবনা কোথায় আছে। ইহা সত্য যে দেহে নাই। যাবতীয় দৈহিক সুখ, দুঃখাদি ও দুঃখান্ত। "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" অতএব দেহে বা দেহজন্য জগতে সে সুখ নাই। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, দেহ ছাড়া আত্মা আছেন কি না। এ সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান ও নিরন্তর পরিবর্তনশীল সংসারে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহা সর্বদা পরিবর্তিত না হইতেছে। এখানে কোনও বস্তুর স্থিরতা হওয়া অসম্ভব। পৃথিবী কখনও একস্থানে থাকে না। উত্তাপে বৃদ্ধি ও শৈত্যে হ্রাস, বস্তুমাত্রেরই ধর্ম। এবং উত্তাপের পরিমাণ প্রতি মুহূর্তেই ভিন্নরূপ। সুতরাং কোন

বস্তু এ জগতে কখনও একভাবে থাকে না। এই নিত্য পরিবর্তনই কালজ্ঞানের উৎপাদক। যেখানে কোন পরিবর্তন নাই, সকলই একাকার, সেখানে ভূতভবিষ্যৎ বর্তমানাত্মক কাল কখনই থাকিতে পারেন না, কারণ ভিন্নতা উপলব্ধি না হইলে কিরূপে অতীত ও অনাগতের জ্ঞান হইবে? অতএব কাল পরিবর্তনশীল। বলিতে পার, দেশ অপরিবর্তনীয়। দেশের উপরেই কালের ক্রীড়া চলিতেছে। যেমন পরিবর্তনশীল নাট্যাভিনয়, স্থির একভাবাপন্ন রঙ্গমঞ্চের উপর অনুষ্ঠিত হয়। সেই শূন্যাত্মক এক অদ্বিতীয় অনন্ত আকাশের মধ্যেই এই বিশ্বলীলার মহানুষ্ঠান অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ আকাশটি কি? যেখানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে, সেইখানেই আকাশ জ্ঞান হয়, যেখানে এগুলি নাই, সেখানে আকাশ কিরূপে থাকিবে? অতএব আদ্যন্ত হীন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ বিশিষ্ট শূন্যাত্মক দেশই আকাশ। কিন্তু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এ তিনটি পরিমাণ। যাহা পরিমাণ, তাহা অপরিমেয় হইতে পারে না। সুতরাং আদ্যন্তহীন দৈর্ঘ্যাদির অস্তিত্ব অসম্ভব। ইহারা চিরকালই আদ্যন্তবান অর্থাৎ ইহারা সীমাবিশিষ্ট বস্তু সমূহেরই পরিমাপক। অতএব দৈর্ঘ্য শূন্য আকাশের উপলব্ধি যদি অসম্ভব হয় এবং দৈর্ঘ্যাদি আদ্যন্তবান হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বস্তু সত্তাই আকাশ সত্তা উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায়। ইতঃপূর্বে দেখাইয়াছি যে বস্তুমাত্রই নিয়ত পরিবর্তনশীল। যাহার সত্তা ঐ সকল পরিবর্তনশীল বস্তু সমূহের উপর নির্ভর করে, তাহাও যে পরিবর্তনশীল হইবে, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব আকাশ পরিবর্তনশীল। ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে, বাহ্য জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত না হইতেছে।

আকাশের পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। যখন "অহং" "ত্বং" অর্থাৎ "আমি" "তুমি" অথবা "তৎ" "ইদম্" অর্থাৎ "সেই" "এই" ইত্যাকার জ্ঞান না হয়, তখন আকাশোপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। যখন দ্বৈত জ্ঞান না থাকে, যখন এক নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বাতীত ভাবমাত্র বিরাজ করে, তখন দেশকাল বা নিমিত্ত এ তিনের কিছুই থাকে না। অতএব স্থান, দেশ বা আকাশ উপলব্ধির জন্য বস্তুদ্বয়ের একান্ত আবশ্যক। "এই" "সেই" এই বিশেষণদ্বয় বিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ই আকাশ জ্ঞানের মূল ভিত্তি বলিয়া বলিতে হইবে যে, বস্তু সত্তায় আকাশের সত্তা, বস্তুর অসত্তায় আকাশেরও অসত্তা। বস্তু পরিবর্তনশীল, সুতরাং আকাশও পরিবর্তনশীল।

আর একটি কথা, যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহা স্বাধীন নহে; পরাধীন। যদ্দ্বারা পরিবর্তন কার্য সম্পন্ন হয়, পরিবর্তনশীল বস্তু তাহারই অধীন। ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যাহা স্বাধীন, তাহা পরিবর্তনশীল নহে, কিন্তু নিত্যস্থির এবং একরস। এরূপ স্বাধীন, নিত্যস্থির বস্তু এ জগতে কোথাও নাই, ইহা অতঃপর স্পষ্ট বুঝা গেল। এখন দেখা যাউক, এই পাঞ্চভৌতিক দেহবিশিষ্ট যে "আমি" আমার ভিতর এরূপ কোন নিত্য বস্তু আছে কিনা। আমি যদি দেহ হই তাহা হইলে আমার জন্ম মরণ আছে, সুতরাং আমায় অনিত্য হইতেই হইবে। কিন্তু দেহাত্মভাবের সহিত আমার আর একটি স্বভাব আছে, যাহাতে "আমি দেহ" সন্দেহ আনিয়া দেয়। "আমার হস্ত" "আমার পদ" আমার দেহ" এরূপ ভাবও আমার স্বভাবসিদ্ধ। অতএব যাহা "আমার" তাহা "আমি" হইবে কিরূপে? আমার সহিত দেহের কতিপয় দিবসের জন্য সম্বন্ধ রহিত। আমি যদি মন হই, তাহা হইলে আমি যে নিত্য পরিবর্তনশীল হইতে পারিতাম। কিন্তু "আমার মন" এরূপ স্বাভাবিক ভাব থাকাতে তাহা মন হইতে আমায় পৃথক করিয়া দেয়। যদিও এক স্বভাবের বশবর্তী হইয়া আমি দেহ ও মনের সহিত এক হইয়া যাই; তথাপি অন্য এক স্বভাব বলে দেহ ও মন হইতে আমি পৃথক হইয়া পড়ি। যদি আমি দেহ বা মন হইতাম, তাহা হইলে কখনই আপনাকে দেহ বা মন হইতে পৃথগ্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। শর্করা যেরূপ মিষ্টতা, লবণ যেরূপ লবণত্ব ত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ দেহও কখনও দেহত্ব, চিত্তও কখনও চিত্তত্ব, ত্যাগ করিতে পারে না। আমি ও দেহ এক হইলে, আমার আমিত্ব ত্যাগ করার ন্যায় দেহত্ব ত্যাগ করাও অসম্ভব হইত। কিন্তু যখন আমি অনায়াসে দেহ হইতে আপনাকে পৃথক্ বিবেচনা করিতে পারি, তখন আমি নিশ্চয়ই আমি এ দুইটি হইতে ভিন্ন। পুনশ্চ দেহ ও মনের প্রকৃতির সহিত আমার প্রকৃতির তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, শৈশব, বাল্য, যৌবন প্রভৃতির সহিত আমার দেহ ও মন পরিবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু যে আমি এক সময়ে শিশু, বালক, যুবা ছিলাম, সেই আমি এক্ষণে প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইয়াছি, আমার দেহ মনের পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি সেই আমিই আছি। আমার পরিবর্তন নাই। সর্বাবস্থাতেই আমার একরূপ। স্বপ্নাবস্থাতেও আমি স্বাপ্নিক দেহ-মনের সাক্ষী। বলিতে পার, সুষুপ্ত্যবস্থায় তোমার সত্তা কোথায়? তখন তোমার আমি জ্ঞান কিছুই থাকে না। এরূপ বলিতে পার না, কারণ সুষুপ্তিকালে যে আমার নাশ হইত, তাহা হইলে আমায় আর জাগিতে হইত না, কারণ যাহার নাশ হয়, তাহার আর সত্তা থাকে

না। বলিতে পার সুষুপ্তির পর আর এক নূতন আমি-র সৃষ্টি হইল। তাহা হইলে এ আমি-র সহিত পূর্ব আমি-র কোন সম্বন্ধ না থাকায়, ইহা পূর্ব আমি সম্বন্ধীয় সর্ব বিষয়েই অনভিজ্ঞ থাকিত। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতই হইয়া থাকে। অর্থাৎ জাগরিত ব্যক্তি আজন্ম যাহা কিছু করিয়াছেন সকলই তৎকৃত বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং সুষুপ্তির পর আর নূতন আমি-র সৃষ্টি হয় না। ইহাতে বুঝা গেল যে, নিদ্রাবস্থায় আমি ছিলাম। আর একটি প্রমাণ এই জাগিবার পরই আমি স্মরণ করি যে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম। যাহা পূর্বদৃষ্ট, তাহারই স্মরণ হয়, যাহা কখনও পূর্বে দেখি নাই বা শুনি নাই, তাহা কখনও স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় না। সুতরাং "আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম" এই বোধটা নিদ্রাবস্থায় আমার ছিল, সেই জন্যই জাগ্রদবস্থায় তাহার স্মরণ হয়। যাহা পূর্বে বোধে আরূঢ় হইয়াছে, তাহারই পুনরুপলব্ধির নাম স্মৃতি। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার ন্যায় নিদ্রাবস্থাতেও আমি বোধ স্বরূপে বর্তমান ছিলাম। আমি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, একরস এবং নিরন্তর পরিবর্তনশীল বিশ্বরাজ্যের মধ্যে একমাত্র অপরিবর্তনীয় পদার্থ। পরিবর্তিত বা বিকৃত না হওয়াই আমার স্বভাব, অতএব আমি পরিবর্তনশীলদিগের ন্যায় পরাধীন নহি, কিন্তু স্বাধীন। স্বাধীন বলিয়া নিত্য। মরণে আমার একান্ত অনিচ্ছা, সুতরাং আমার উপর যদি কেহ শাস্ত না থাকে, যদি আমি সর্বতোভাবে স্বইচ্ছানুসারে কার্য করিতে পারি, তাহা হইলে অতীব হেয় মৃত্যুকে কখনও নিকটে আসিতে দিব না। সত্তানাশ বা না থাকার নামই মৃত্যু। সুতরাং আমি যদি মৃত্যুর অধিপতি হই, তাহা হইলে কখনই আমার সত্তার নাশ নাই। আমি দেহপ্রাপ্তির পূর্বেও ছিলাম, দেহত্যাগের পরেও থাকিব। আমি শাশ্বত ও সর্বগত, কারণ, যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহা এক অপরিবর্তনীয় পদার্থের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া পরিবর্তিত হইবে। আমি ভিন্ন সকলই পরিবর্তনশীল বা বিকারী। সুতরাং একমাত্র নির্বিকার আমার উপরেই বিকারাত্মক সমগ্র জগৎ অধিষ্ঠিত। আমি সর্বগত।

আমার নিত্যত্ব সম্বন্ধে আর এক প্রমাণ এই—

অস্তীত্যেবং অস্মিন্নর্থে কস্যাস্তি সংশয়ঃ পুংসঃ।
তত্রাপি সংশয়শ্চেৎ সংশয়িতা যঃ স এব ভবসি ত্বম্॥ —শ্রীশঙ্কর

অর্থাৎ "আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন্ পুরুষের সংশয় উপস্থিত হয়। তাহাতেও যদি তোমার সংশয় হয়, তাহা হইলে যিনি সংশয়কর্তা, তিনিই তুমি।" অতএব আপন অস্তিত্বে কাহারও সংশয় হওয়া উচিত নয়। পুরুষমাত্রেই সৎ পদার্থ। যাহা

সৎ, তাহা কখনও অসৎ হইতে পারে না, অর্থাৎ "না" হইয়া যাইতে পারে না। অতএব আমি নিত্য সর্বগত বলিয়া সর্বজ্ঞ এবং স্বাধীন বলিয়া পরমানন্দময়।

কিন্তু এ আমি সার্ধ ত্রিহস্তপরিমিত নহে। যে আমি-র নাম ও রূপ আছে, সে আমি ও এ আমি-তে আকাশ পাতাল ভেদ। এক আমি জন্ম-মৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষগ্রস্ত, অন্য আমি "নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।" এক আমি আপনাকে মনুষ্য, দেব, যক্ষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী বা ভিক্ষু বলিয়া মনে করিতেছেন, অন্য আমি সর্বোপাধিপরিশূন্য আপনাতে আপনি পরিতুষ্ট, নিত্যবোধ স্বরূপে বর্তমান। এক আমি সর্বদাই বিপদাশঙ্কায় শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত, অন্য আমি আপনার স্বরূপ জানিয়া "ন বিভেতি কুতশ্চন" এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম নামে অভিহিত। এক আমি কর্মের ভার মস্তকে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন, অন্য আমি ধর্মাধর্মের পারে অবস্থিত হইয়া পরমানন্দে স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। এক আমি নিত্যবিকারগ্রস্তা, অনির্বচনীয়া, মায়াবিনী প্রকৃতির দাসত্ব স্বীকার করিয়া ক্লেশে দিনপাত করিতেছেন, অন্য আমি সেই প্রকৃতির অধীশ্বর হইয়া তদ্দ্বারা সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়াত্মিকা লীলার অবতারণা করতঃ নিরতিশয় সুখভোগ করিতেছেন। এক আমি সত্ত্বরজস্তমোরূপ রজ্জুত্রয়ে বদ্ধ, অন্য আমি জগদতীত বলিয়া নিত্যমুক্ত। এক আমি সংসাররূপ কালসর্প কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া যন্ত্রণায় আত্মহারা হইয়াছেন, অন্য আমি সেই সর্পকে ভূষণরূপে ধারণ করিয়া পরম শোভার আস্পদ হইয়াছেন। এক আমি অপক্ক ও অশিবময়, অন্য আমি পক্ক ও শিবময়।

হে দেহাত্মাভিমানিন্, তোমার আমি অপক্ক অর্থাৎ কাঁচা। এই কাঁচা আমিকে যদি গুরুভক্তিরূপ রসায়ন যোগে সুপক্ক করিতে পার, তাহা হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে।

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথাগুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মভিঃ ॥"

যাঁহার দেব ও গুরুর প্রতি পরাভক্তি আছে, তিনিই মহাত্মাগণের হৃদয়ের মর্ম অবগত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন, অন্য কেহ নহে। সুতরাং গুরুভক্তি ভিন্ন কাঁচা আমি পাকাইবার আর উপায় নাই। যদি দেহ ও মনের পরপারে গমনপূর্বক ব্রহ্মবিদ হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে গুরুকে সদর রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া নিরন্তর তাঁহার পদসেবায় নিরত হও। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

(উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৫ই আষাঢ় ১৩১০, পৃঃ ২৯৪-৩০১)

সর্বধর্মসমন্বয়

(বঙ্গানুবাদ)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম

হে সুধিশ্রেষ্ঠগণ, শ্রীমদ্ভগবানের অনুগ্রহেই আপনাদের তুল্য সাধুগণের সহিত আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তিগণের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ হইতেই লোকের মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ও হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান হইতেই লোকের ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া পরম কল্যাণ স্বরূপ মুক্তিলাভ হয়। অসদ্বিষয়ের সঙ্গে লোকের কামনা উৎপন্ন হয়, সৎসঙ্গের দ্বারা কামনার নাশ হয়। শাস্ত্রে উক্তও হইয়াছে যে, সৎসঙ্গ হইতে মানুষ নিঃসঙ্গত্ব লাভ করে; নিঃসঙ্গ হইলে তাহার মোহের নাশ হয়; মোহ নাশ হইলে তত্ত্বজ্ঞানে নিশ্চলভাবে স্থিতি হয়; এই স্থিতি হইতেই জীবন্মুক্তি লাভ হয়। অতএব সৎসঙ্গই যে মোক্ষদ্বারের অর্গল উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়; ইহা কি আর বলিতে হইবে?

বর্তমানকালে এই ভারতবর্ষে তিনজন তত্ত্বনির্ণয়কার জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই দাক্ষিণাত্যভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সাক্ষাৎ শঙ্করমূর্তি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাঁহাদের মধ্যে প্রথম। সেই মহাত্মা "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে", এই তত্ত্ব সম্যগ্‌ভাবে নির্ণয় করেন। সেই ক্ষয়রহিত পরমব্রহ্মই নিত্য, তিনিই সর্বব্যাপী, অচল, দেশকাল ও কার্যকারণ সম্বন্ধের অতীত এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আর দেশকাল নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন জগৎ মিথ্যা—অনিত্য স্বরূপ। মিথ্যা শব্দের অর্থ যাহার আদি ও অন্ত আছে, যাহা শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদির ন্যায় অনিত্য, মিথ্যা বলিতে শূন্যমাত্রকে বুঝায় না—এই অর্থই সর্বত্র শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের অনুমোদিত, অতএব মিথ্যা শব্দে এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ। এই জীব অনাদি ভ্রান্তি বশে দেহে আত্মাভিমান করিয়া আমি স্থূল, আমি বৃদ্ধ, আমি কানা, আমি কুঁজো এবং মনে আত্মাভিমান করিয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী, এইরূপ মূঢ় ভাবগ্রস্ত হইয়া নিজের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ দোষযুক্ত, বিষয়বিষ মিশ্রিত তৃষ্ণারূপ সলিলপূর্ণ সংসারকূপে পতিত হইয়া নানাবিধ দুঃখ অনুভব করিয়া শেষে লোকক্ষয়কর কালের কবলে পতিত হয়। কাল কবলিত হইয়াও নিজ কর্মবশে সেই স্থানেই পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ নানাবিধ দুঃখ অনুভব করে। কখনও সৎকর্মবশে যদি

তাহার সাধুসঙ্গ হয়, তখন তাহার নিকট সাধনচতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান মুক্ত হয়। যেমন সূর্য উঠিলে অন্ধকার নাশ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানোদয়ে তাহার ভ্রমজনিত নানা দুঃখের নাশ হয়। সাধুসেবা ব্যতীত কখনই জ্ঞানলাভ হয় না। শ্রীমদ্ভগবানও বলিয়াছেন, "জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রণাম, প্রশ্ন ও তাঁহার সেবা করিয়া সেই জ্ঞান অবগত হইবে; তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।" জীব নিজ স্বরূপ জানিতে পারিলেই আপনাকে অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বুঝিয়া এই সংসার-কূপে আর পতিত হয় না। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ সম্যক্ প্রকারে বিচার করিয়া ভগবান শঙ্করাচার্য এই স্থির করিয়াছেন।

কালক্রমে তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত অদ্বৈতপথানুসারিগণ সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করাতে তাহাদের আর সাধনচতুষ্টয়ের শিক্ষা রহিল না, সুতরাং তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানেরও অভাব হইল। এই হেতু তাহারা মোহ ও অজ্ঞানবশে মহাবাক্য সমূহের ভিন্ন অর্থ কল্পনা করিয়া অশুচি নরকে পতিত হইল। ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণা (১) দ্বারা "তত্ত্বমসি", "অহংব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্য সমূহের অর্থ শোধন না করিয়া কেবল কথাগুলিমাত্র ধরিয়া বিপরীত অর্থ করিয়া এই সার্ধত্রিহস্ত পরিমিত, দুঃখময়, অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, আশক্তি পাশবদ্ধ, নামরূপ পরিচ্ছিন্ন সংসারী।

(২) আত্মাকে অক্ষয়, অসঙ্গ, পরমাত্মা জ্ঞান করতঃ সমুদয় বিধিনিষেধ ত্যাগ করিয়া চণ্ডালের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল, সুতরাং তাহারা নরদেহে পশুতুল্য হইয়া উঠিল। এই মৃত্যুর আগার স্বরূপ সংসার সমুদ্র হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য লোক-গুরু জগৎপিতা বিষ্ণু—গীতায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "যখন যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাবল্য হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃজন করিয়া থাকি," এই নিজ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য মহাভূত নগরীতে শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্যরূপে এবং উডুপি নগরীতে শ্রীমন্মধ্বাচার্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন জনগণ নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকশূন্য, ইহ পরলোকের ফলভোগকামী, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি রহিত এবং মুক্তিকাম নয়, সুতরাং তাহাদের জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানে অধিকার নাই, এই মনে করিয়া তাঁহারা উভয়েই তখনকার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাকে পুনঃ পুনঃ খণ্ডন, নিন্দা ও উপহাস করিয়াছেন।

শ্রীমদ্রামানুজ ঈশ্বরকে সর্বদাই চিৎ এবং অচিৎ বিশিষ্ট (১) ইহা প্রতিপাদন

করিয়াছেন, এই জন্য তন্মতানুসারিগণকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলে। অনন্ত অশেষ শুভগুণবিশিষ্ট, অশুভগুণশূন্য, সমুদয় জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাঁহার লীলা স্বরূপ এরূপ বিষ্ণুরূপধারী ভগবানকে তিনি শেষী বলিয়া এবং আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সমুদয় চিৎ বা চেতন জীব সমূহকে তিনি শেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই শেষগণ ভগবানের নিত্যদাস। তাহারা মোহ ও বিষয়ভোগবাসনাবশে শ্রীমদ্ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া কামনার দাস হইয়া পুনঃ পুনঃ এই মৃত্যুগ্রস্ত সংসার সাগরে পতিত হয়। সৎকর্ম করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় যখন তাহারা কামনার দাসত্ব ত্যাগ করিয়া ভগবানের দাসত্ব স্বীকার করে, তখন তাহারা নিরহঙ্কার হয়, তখন তাহারা আপনাদিগকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ও বিভুকে মহৎ হইতেও মহান জানিতে পারিয়া সেই ভগবানে পরমানুরক্তি লাভ করিয়া কায়মনোবাক্যে তদ্গত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করে; তখন "হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করিয়া তাহারা আর পুনর্জন্ম লাভ করে না", এই শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যানুসারে আর সংসারে পুনরাবৃত্ত হয় না, আর সংসারে পুনরাবৃত্ত হয় না।

শ্রীমন্মধ্বমুনিও ভগবদ্দাস্যকে সর্বোপরি স্থান দিয়াছেন। তিনি চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বরের এবং তাহাদের সম্বন্ধ সমূহের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বর যে চিৎ অচিৎ বিশিষ্ট, ইহা স্বীকার করেন নাই। যদি কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ও মনের চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া ভগবৎ কৃপাবলে বিষয় ভোগবাসনা ও কামনার দাসত্ব ত্যাগ করিয়া ভগবানের দাসত্ব করে, তবে তাহার সমুদয় দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, তখনই সেই ভাগ্যবানের পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয়। সে শ্রীভগবানের পাদমূল লাভ করিয়া আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয় না, আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয় না।

এই তিনজন মহাত্মাই মৃত্যুগ্রস্ত সংসারে অপুনরাবর্তনই জীবের প্রাপ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কি উপায়ে তাহা লাভ করা যায়, তাহার নির্ণয়ে যদিও তাহাদের সকলের বিভিন্নমত দেখা যায়, যেহেতু তাঁহারা বিভিন্ন মার্গেরই প্রবর্তন করাতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, তথাপি তাঁহারা সকলেই এই সংসারের অপর পারে গমনে ইচ্ছুক—তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য জগৎপতিকে লাভ, কারণ তাঁহাকে পাইলেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব। সংসার পারে কে গমন করিতে পারে? "যাঁহার পরমাত্মায় প্রগাঢ় ভক্তি এবং যেমন পরমাত্মায় ভক্তি, গুরুতেও তদ্রূপ, মহাত্মাগণের কথিত এই সকল উপদেশ তাঁহাদের হৃদয়েই প্রকাশিত হয়।"

"অভিমান ও মোহশূন্য, আসক্তিদোষরহিত, কামনাশূন্য, সুখদুঃখ রূপ দ্বন্দ্ববিমুক্ত অধ্যাত্মপরায়ণ জনগণই জ্ঞান লাভ করিয়া সেই নিত্য পদ লাভ করেন।" "জগৎকে কে জয় করিয়াছেন? না যিনি মনকে জয় করিয়াছেন"—এই জগৎ ইন্দ্রিয়জনিত। ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মশক্তিসমূহ স্থূল ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাদের হইতে মন শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে আবার পুরুষ শ্রেষ্ঠ, এই পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, ইনিই সকলের সীমা এবং ইনিই পরমগতি।" এইরূপ উপনিষদুক্ত সোপান পরম্পরা দ্বারা শান্ত, দান্ত, নিবৃত্তকর্মা, বিজিতাত্মাগণ সংসারের পারে গমন করিয়া সেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন; "যেখান হইতে বাক্য মনের সহিত তাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়।"

ঈশ্বর শক্তিতেই হউক বা নিজ শক্তি বলেই হউক, ভক্তি দ্বারাই হউক বা জ্ঞানের দ্বারাই হউক, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারিলেই তাহা হইতেই নিখিল দুঃখরাশি হইতে মুক্তিলাভ হয়। ইহা কেবল যে আমাদের ঋষিগণের মত, তাহা নহে, হূন, যবনদেরও এ বিষয়ে একমত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের তারতম্যবশত যদিও মানুষের পথ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক পথ একই। "বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত মত ও বৈষ্ণব মত, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত সম্বন্ধে কেহ একটিকে শ্রেষ্ঠ, কেহ অপরটিকে হিতকর বলে। সমুদ্র যেমন নদী সকলের একমাত্র গম্যস্থান, এইরূপ রুচিভেদে সরল কুটিল নানা পথগামী জনগণের তুমিও তদ্রূপ একমাত্র গম্য।" যদিও এই সকল পথ রুচিভেদে বিভিন্ন প্রতিভাত হয়, তথাপি ঐ সকলগুলিরই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া সকলেই যে সমীচীন মার্গ, ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। যেমন বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া ব্যাসার্ধ সকল এক কেন্দ্রের দিকে গমন করে, সেইরূপ ধর্মমার্গ সকল বিভিন্ন হইলেও তাহারা সেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়বার্তা, লোকগুরু, চরাচর পিতা, সর্বভূতের হৃদয় নিবাসী, সর্বকর্তা, হৃদয়গুহাবাসী, সর্বময় এক, সর্বব্যাপীদেবের নিকট যাইতেছে। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন, "যিনি আমাকে যেরূপে ভজনা করেন, আমিও তাঁহাকে তদ্রূপে ভজনা করিয়া থাকি। হে পার্থ, মনুষ্য সর্বপ্রকারেই আমার পথের অনুসরণ করিতেছে।" যেমন বহুরূপী নিজের ইচ্ছায় আপনার বর্ণ পরিবর্তন করে, কখনও বা তাহার কোন বর্ণই থাকে না, তদ্রূপ শ্রীভগবানও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনাকে নানারূপে প্রকাশ করেন। এক সময়েই তিনি সাকার ও নিরাকার, কর্তা ও অকর্তা। ভগবানও বলিয়াছেন, "তাহার কর্তা হইলেও আমাকে অব্যয় ও অকর্তা বলিয়া জানিবে।" ভক্তিতে সহজে তাঁর

পাদমূল লাভ করা যায়। "হে পার্থ, আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা পাপজন্মা, এমন স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র পর্যন্ত পরম গতি লাভ করে। পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণের আর কথা কি? এই অনিত্য ও অসুখকর জগতে আসিয়া আমার ভজনা কর।" সেই ভক্তি কেবল ভারতবর্ষেই আছে, আর কোথাও নাই, একথা বলিবেন না, কারণ, হূন ও যবনগণও ভক্তিমার্গ অনুসরণ করেন। বৌদ্ধগণেরও বুদ্ধে ভক্তি দেখা যায়। "হে বুদ্ধ দেহধারী বিষ্ণো, আহা, তুমি দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া পশুহত্যারূপ নিন্দনীয় কর্ম সঙ্কুল বলিয়া যজ্ঞবিধানাত্মক বেদ সমূহকে নিন্দা করিয়াছ। হে জগদীশ, হে হরে তোমার জয় হউক।" এখানে শ্রীজয়দেব বুদ্ধদেবের অবতারত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ সকল উহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সকল ধর্মই শ্রীভগবানের পাদমূলে যাইতে সমর্থ। একথা বলা হইল বলিয়া "স্বধর্মে নিধনও ভালো, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ" একথা যেন কেহ ভুলিবেন না।

যখন এইরূপই সিদ্ধান্ত হইল, তখন যে ব্যক্তি কেবল নিজধর্মেরই সত্যত্ব ও অন্য ধর্ম সমূহের অসত্যত্ব ও অসমীচীনত্ব প্রতিপাদন করেন ও তাহা প্রমাণ করিতে যত্ন করেন, সেই মূঢ়ের জন্য দুঃখ হয়। দম্ভ, অভিমান ও অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া আমার মতো আর কে আছে, এইরূপ অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া যে কেবল আপনাকেই ভগবানের প্রিয়তম মনে করে। এই সকল ক্রূর, নিজ ভ্রাতার শোণিতে আর্দ্রকলেবর, পঙ্গপালের ন্যায় পৃথিবীতলে সমাচ্ছন্ন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীমদ্‌বিবেকানন্দ স্বামীজীর গুরুদেব, আচার্য শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্রামকৃষ্ণাখ্য কোন অতুলনীয়, জ্ঞানভক্তিময় বিগ্রহ, বঙ্গভূমির অলঙ্কার স্বরূপ পুরুষোত্তম বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সম্প্রতিই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে ভিন্নরুচি অতএব ভিন্নমার্গানুসারিগণের প্রয়োজনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্ম যে অবশ্যম্ভাবী, অতএব সকলই সমীচীন, ইহা প্রসিদ্ধই, সেই মহাত্মাও ইহা প্রতিপাদন করেন। সেই সনাতন ধর্মরূপী তিনি সনাতন ধর্মের সার্বভৌমিকত্ব ও সর্বকালে সর্বজন প্রয়োজনীয়ত্ব সম্যক্ প্রকারে দেখিয়াছেন।

স্থূল দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ মানবগণ কিন্তু এই সনাতন সার্বভৌমিক, বেদমূলক ধর্ম কোন সম্প্রদায়ের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই বিধাতা বিধান করিয়াছেন, সকলের রক্ষার জন্য নয়, এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। শাস্ত্রজ্ঞানাভাবই এই সঙ্কীর্ণতার কারণ। উত্তমরূপে শাস্ত্র পাঠ ও চিন্তা করিলে কাহারও এই অপসিদ্ধান্তে রুচি হইবে না।

আপনারা মহাপণ্ডিত, সর্বশাস্ত্রকুশল এবং পরের দুঃখ দেখিতে পারেন না, ইহা মনে করিয়া দাস আমি আপনাদের সমীপে আসিয়াছি। কেবল শাস্ত্রপাঠের অভাববশতই সর্বলোক হিতাকাঙ্ক্ষী আর্যবংশধরগণের বর্তমান সন্তানগণ ক্ষুদ্রচিত্ত ও সঙ্কীর্ণমনা হইয়া এক্ষণে অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। আপনাদের করুণা কটাক্ষের দ্বারাই কেবল তাহাদের সুমতি হইবে; ইহা মনে করিয়া আজ আমি তাহাদের শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইবার জন্য আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। দানের দ্বারাই বিদ্যার উৎকর্ষ হয়। যাঁহারা জ্ঞানদানে কৃপণ, তাঁহারা শোকের পাত্র। আপনাদের সকরুণ কটাক্ষের প্রতীক্ষা করিয়া এক্ষণে তূষ্ণীভূত হইলাম। হরি ওঁ।

(উদ্বোধন, ৫ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩১০, পৃঃ ৬১৫-৬২১)

শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বাভাস

সর্বলোকললামভূত, বিজ্ঞানময়বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট স্বীয় বিভূতির কিয়দংশ বর্ণন করিয়া কহিলেন, "এ জগতে যে কোন জীবে বিশেষ শক্তি, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও মহত্ত্ব দেখিতে পাইবে, তাহাকে মদীয় অনন্ত তেজোরাশির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিও।" সনাতন ধর্মের আশ্রয়ভূতা এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সনাতন ধর্মাবলম্বী পুরুষমাত্রেই দেবকীনন্দনকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে কেহ কেহ আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি পাঠ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। এমনকি, কেহ কেহ আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। কিন্তু পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বোঝা যাইবে যে, নাস্তিকতা বা সন্দেহবাদ অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধিদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। হে মানব, যদি তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে তাহাই পাইতে, তাহা হইলে, আমি তোমায় ঈশ্বর আখ্যা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। যদি তোমায় বাধা দিবার শক্তি কাহারও না থাকিত, যদি তুমি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া মৃত্যুভয় অতিক্রমপূর্বক পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিতে, যদি তোমার জ্ঞান পিপাসা নির্বাণ করিবার শক্তিকে আশ্রয় করিয়া তুমি অজ্ঞান অন্ধকারের সমূলে উন্মূলন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিতে, যদি তুমি সর্বকাল, অনায়াসে, স্বেচ্ছানুসারে তোমার অসংখ্য প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করিতে পারিতে, তাহা হইলে ঈশ্বর তুমিই হইতে। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি ঠিক ইহার বিপরীতাবস্থাপন্ন কিনা? তুমি কি আপনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর দেখিতে চাও না? কিন্তু হায়! তোমার রূপ তোমার অভিমত নয়। তুমি কি কোটিপতির সন্তান হইয়া স্বয়ং কোটিপতি হইতে চাও না? কিন্তু হায়, তোমার অনিচ্ছাক্রমে তুমি দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি তোমার স্বেচ্ছাক্রমে এই সংসার নগরে অবতীর্ণ হইবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তুমি দরিদ্রের কুটির দ্বার দিয়া কখনও ইহাতে প্রবেশ করিতে না, ধনাঢ্যের অশেষ কারুকার্য সমন্বিত, সুবিপুল সিংহদ্বার দিয়াই এখানে আসিতে। তুমি কখনও অশেষ রোগের নিলয়ভূত, ভগ্ন, কদাকার, দুর্গন্ধময় দেহকে আশ্রয় করিতে না, বিপুল বীর্যসম্পন্ন, সর্বসৌন্দর্যের আশ্রয়ভূত, সুস্থ, সৌরভময় দেহকেই অধিকার করিতে। কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলেও

তোমায় কখনও কখনও রুগ্ণ, অন্ধ, বধির হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, দুর্ভাগ্যের দ্বিতীয় বিগ্রহ বলিয়া আপনাকে স্বীকার করিতে হয়। তুমি সকলের উপর আধিপত্য করিতে চাও, কিন্তু প্রাণসম পুত্রগণ ও প্রিয়তম সহধর্মিণীও কখনও কখনও তোমার আজ্ঞা পালন করিতে চাহেন না, অন্যে তো তোমার কথায় কর্ণপাত করিতেও ইচ্ছুক নহে, এ অবস্থায় নিরীশ্বর হইয়া আপনাকে ঈশ্বর জ্ঞান করা কেবলমাত্র বাতুলতার কর্ম। যে শক্তি তুমি বাধা দিতে পার না, কিন্তু যাহা অবাধে তোমায় বাধা দিতেছে, সেই মহাকাল শক্তি কালীর অধীনে শুদ্ধ তুমি নও, চরাচর সমস্ত জগৎ চালিত হইতেছে। কালক্রমে মহাবীর্যশালী, মহাযশস্বী, মহাবদান্য, মহাধার্মিক, সৌন্দর্য মাধুর্যের প্রিয়তম নিলয়ভূত রাজ্যচক্রবর্তীকেও ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া শ্মশানের পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাঁহার জীবিতাবস্থার যাবতীয় আশা, উদ্যম, লোকহিতচিকীর্ষা, রিপুকুলবিমর্দনেচ্ছা, তৎসমস্তই চিতাগ্নি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে, কারণ কালশক্তি কালীকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেন না; "কালো হি দুরতিক্রমঃ" কালে ধনী নির্ধনী এবং নির্ধনী ধনী হইতেছে, সর্বলোকঘৃণ্য সর্বলোকপূজ্য এবং সর্বলোকপূজ্য সর্বলোকঘৃণ্য হইতেছে। মহাকাল ভিন্ন কে এই কালশক্তির বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হয়? অতএব হে মানব, তুমি এই মহাশক্তির প্রভাব যখনই বিস্মৃত হইয়া আপনাকে স্বাধীন জ্ঞান কর, তখনই তুমি মহাভ্রমে পতিত হও, তখনই উক্ত ভ্রমবশত মনে কর "কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া" আমার মতো আর কে আছে? তখনই তোমার জ্ঞানচক্ষু, অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই কালশক্তিই ঈশ্বর নামে অভিহিত। কালশক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জননী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনিই ব্রহ্ম নামে অভিহিত 'যন্মাদস্য যতঃ।'

যেখানে এই কালশক্তির বিকাশ সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, সেইখানেই ঈশ্বরত্বের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ভিতর এই মহাকালীর বিকাশ যে প্রভূত পরিমাণে ছিল, ইহা যে কেহ তাঁহার জীবনী শ্রীমদ্ভাগবতাদি পরম পবিত্র পুরাণসমূহে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কোন মহাশক্তিই তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি তাৎকালিক যাবতীয় রাজশক্তিকে পদানত করিয়া, নিজ অভিমত ধর্মপ্রাণারাজশক্তিরই অভ্যুদয় সাধন পূর্বক গীতোক্ত স্ববাক্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" অর্জুন,

যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি অবতীর্ণ হই। সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ এবং ধর্মের জয় সাধনের জন্যই আমি প্রতিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।" বিশ্বরূপ দর্শন পূর্বক পরম ভীত হইয়া অর্জুন যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ। বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥" "দেববর, প্রসন্ন হউন, আমি আপনাকে নমস্কার করি, উগ্ররূপধারী আপনি কে? আপনি চরাচর বিশ্বের আদিভূত। আপনার অভিলাষ কি তাহা জানি না বলিয়া, আমি আপনার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।" এইরূপে পৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবান কহিলেন, "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" "আমি সর্বলোক সংহারকারী অনাদিকাল।" আবার কহিলেন, 'ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে', 'তোমার ন্যায় কতিপয় ধর্মপ্রাণ লোক ভিন্ন আর কাহাকেও রক্ষা করিব না।' এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে অনাদি মধ্যান্ত কাল ধর্মেরই পক্ষপাতী, কারণ ধর্মসংস্থাপনই ইঁহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিকই কালশক্তি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইনি অনাদিকাল হইতে ধর্মেরই অভ্যুদয় সাধন করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ধর্মের জয় লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু কলিতে ধর্মের চারিটি পাদের মধ্যে কেবল একটি বর্তমান আছে বলিয়া অধুনা অধর্মেরই জয় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এ সিদ্ধান্তটি সত্য নহে, কারণ যদিও মিথ্যাবাদ, চৌর্য, নৃশংসতা ও অধার্মিকতাকে আশ্রয় করিয়া কখনও কখনও কোন কোন মনুষ্যকে সুখলাভ করিতে দেখা যায়, তথাপি যদি তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে ব্যক্তি ধর্ম বা অধর্ম দ্বারা অর্থ সঞ্চয়পূর্বক পার্থিব সুখ ভোগ লাভে সমর্থ হইয়াছে, সে কখনও আপনাকে অধার্মিক বলিয়া পরিচয় দিবে না। পরন্তু তুমি তাহার ধার্মিকতায় সন্দিহান হইয়াছ বলিয়া তোমার প্রতি বিশেষ রুষ্ট হইবে। অধর্ম এখনও নিশাচর পেচকের ন্যায় রজনীযোগেই বাহির হয়, দিবাভাগে লোকসমক্ষে বাহির হইবার শক্তি তাহার কখনও ছিল না এবং হইবেও না। এখনও জগতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুল, ধর্মরক্ষক শ্রীবিষ্ণুর অবতারসমূহ, শঙ্করাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য, শেষাবতার শ্রীমদ্রামানুজাচার্য, আঞ্জনেয়াবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য, পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ধর্মময় বিগ্রহ জরথুষ্ট্র, ঈশা ও মহম্মদ এবং জ্ঞানময়বিগ্রহ পূজ্যপাদ শাক্যসিংহ শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব সমগ্র জগৎকে শাসন করিতেছেন। ইঁহারা বর্তমান সম্রাট ও রাজগণের উপর এখনও আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। অতএব কালশক্তি যে ধর্মেরই পক্ষপাতিনী, ইহা নিঃসন্দেহ এবং ইহার বিকাশ যাঁহাতে প্রভূত পরিমাণে লক্ষিত হয়, তাঁহাকে লোকে

ঈশ্বরাবতার না বলিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ঈশ্বর শব্দটি যদি প্রভুবাচী হয়, তাহা হইলে যিনি সকলের পরিচালক, কিন্তু স্বয়ং পরিচালিত নহেন, তাঁহাকে প্রভু বা ঈশ্বর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে শিক্ষা দিলেন যে, "এ জগতে যে কোন জীবে বিশেষ শক্তি, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও মহত্ত্ব দেখিতে পাইবে, তাহাকে মদীয় অনন্ত তেজোরাশির অংশ সম্ভূত বলিয়া জানিও।" কারণ, বিশেষ সৌন্দর্যসম্পন্ন, ঐশ্বর্যবান, বিশালহৃদয় মহাত্মাগণই এখানে প্রভুর স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। মানবগণ স্বেচ্ছানুসারে তাঁদের পদানত হইয়া আপনাদের কৃতার্থ মনে করেন। যে কেহ এতাদৃশ মহাপুরুষের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইয়াছে বা হইবে, তাহাকে সর্বতোভাবে অপদস্থ ও সকলের ঘৃণাভাজন হইয়া জীবনযাপন করিতে হইয়াছে বা হইবে। ইহজীবনেই যে তাহাকে এরূপ নরকভোগ করিতে হয় তাহা নহে, পরজীবনেও তাহার সুখের আশা কোথায়? যাহার মন বিস্তীর্ণমনা মহাপুরুষগণের অনুগামী হইতে পারিল না, তাহা যে নিরতিশয় জঘন্যপ্রবৃত্তিপরায়ণ সুতরাং তাহাতে যে কখনও সুখ-শান্তি আসিতে পারে না, ইহা কি প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে? মলিনহৃদয় দুঃখেরই নিবাসভূমি ও নির্মল হৃদয় সুখের আবাস স্থান, ইহা সর্বলোক প্রত্যক্ষ। তিনটি বস্তু জগতে বড় দুর্লভ—মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। সুতরাং মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহারা ইহজীবনে আপনাদিগকে দুঃখজননী মলিনতার হস্ত হইতে উদ্ধার পূর্বক কৃতার্থ হইতে পারিল না, তাহারা নিতান্ত শোচনীয়। মহাপুরুষগণ কালশক্তির মূলস্থান অধিকার করিয়া আছেন; কারণ, সমগ্র জগৎ আবহমান কাল হইতে তাঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কালশক্তি কালী যেমন সর্বলোকশাসনকর্ত্রী, মহাপুরুষগণও তেমনি সর্বলোক শাসন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাক্যই শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, বাইবেল, কোরাণ, ত্রিপিটক, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি আকার ধারণ করিয়া নিত্যকাল জগতের যাবতীয় নর নারীর কল্যাণ বিধান করিতেছে। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখময়সংসারে তাঁহারাই মানব মনে বল ও আশার সঞ্চার করিয়া থাকেন। তাঁহারাই ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের পথ জনসাধারণের গোচর করিয়া এবং নিজেরা সেই পথের পথিক হইয়া কত শত নরনারীকে যে চিরশান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহারাই যথার্থ পিতৃনামের যোগ্য। পার্থিব পিতা জন্মদাতা মাত্র, কিন্তু তাঁহারা নিত্য সুখ শান্তিপ্রসবিনী, অপবর্গকারণভূতা পরমাবিদ্যা দান করিয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহারা

গুরুপদবাচ্য। এই জন্যই গুরুকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী কালশক্তির স্বরূপ ও তদতীত বলিয়া পূজা করা হয়, যথা গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। কালশক্তি বিরূপা বা রুষ্টা হইলে গুরু মানবকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু "গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন"। অর্থাৎ গুরু রুষ্ট হইলে আর কাহারও উদ্ধার করিবার শক্তি নাই।

বর্তমানকালে এই কালশক্তির মহাকালীর মূল স্থান কোন্ মহাপুরুষ অধিকার করিয়া আছেন, কাহার শ্রীচরণতরণী আশ্রয় করিলে সংসারসাগরে মগ্নপ্রায় শত শত নরনারী নিষ্কৃতি লাভ করিবে? নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদরূপ রাক্ষসদ্বয়ের করাল কবলে পতিত অন্ধ, বিপন্ন মানবগণকে কোন্ মহাবীর রক্ষা করিতে সমর্থ? বর্তমান মহান ধর্মবিপ্লবের সময় অজ্ঞানান্ধকার তিতীর্ষু সত্যপিপাসুগণ উদ্গ্রীব হইয়া কাহার প্রত্যাশায় রহিয়াছেন? মাতৃকণ্ঠ নিঃসৃত অমৃতময় বাক্যতুল্য কোন্ স্নেহময়ী গুরুমূর্তির সুললিত, সরল বাক্যামৃতবিন্দু ত্রিতাপতপ্তের নৈরাশ্যময় হৃদয়ে স্বর্গের জ্যোতি বিস্তার করিতে সমর্থ? বিজ্ঞানময় বিগ্রহ, ভক্তিরস পরিপ্লুত অলৌকিক ভাবরাশির অদ্বিতীয় আধার, কোন্ লোকোত্তর পুরুষের নিরক্ষতার সম্মুখে, অদ্য পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলী ভীতভীতের ন্যায়, শিষ্য-প্রশিষ্যের ন্যায় যুক্তকরে অবস্থিত? কোন্ ছদ্মবেশী মায়াধিনায়ক আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া শ্রীমদ্বিবেকানন্দরূপ স্বকীয় বিজ্ঞান দীপ্তি দ্বারা অদ্য সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন?

বস্তুতঃ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সকলই অলৌকিক। তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি, 'যে ঘরের উল্টো চাবি' অর্থাৎ জ্ঞানের ঘরে প্রবেশ পূর্বক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পার্থিব উপায় অবলম্বন করিলে চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণও এরূপ উপদেশ দিয়াছেন যথা, 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী' ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্র উক্ত উপদেশের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ইহা মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। কারণ লোকে যাহাকে ভালো বলে, তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে মন্দ, লোকে যাহাকে সুখশান্তির কারণ বলিয়া জানে, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহা দুঃখ ও অশান্তির হেতু। তাঁহার শক্তি দুর্নিবার্যা ও অতুলনীয়া। এ সকল বিষয় উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইলে তাঁহার পরম পাবন জীবনের দুই চারিটি ঘটনার আভাস দেওয়া আবশ্যক। পূর্বে বলিয়াছি যেখানে শক্তির বিকাশ, সেখানেই ঈশ্বরত্ব পরিদৃষ্ট হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, নিরক্ষর সপ্তমুদ্রামাত্র বেতনভোগী জনৈক পুরোহিতের এমনকি শক্তি থাকা সম্ভব, যদ্দ্বারা লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর

বলিয়া পূজা করিতে পারে? মনুষ্য দৃষ্টিতে অসম্ভব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহা যদিও কিছুকাল পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তি লোকবুদ্ধির অগোচর ছিল, অধুনা সভ্যজগতে এমন কেহই নাই, যিনি উক্ত মহাশক্তির পূজা না করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? এতদুত্তরে আমরা বলি যে, নিরক্ষরতা ও নির্ধনতাই তাঁহার অতুল শক্তির পরিচায়ক, উপায় দ্বারাই উপেয় বস্তুকে লাভ করা যায়, সাধন দ্বারাই সাধ্য বস্তু আয়ত্তাধীন হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি বিনা উপায়ে বিনা সাধনে সাধ্য বস্তুকে আপন আয়ত্তে অনায়াসে আনিতে পারেন, তিনি যে বিপুল শক্তিসম্পন্ন, ইহা বুঝিতে কি আর প্রমাণ প্রমেয়ের আবশ্যক হয়? অস্ত্রশস্ত্র ও বিপুলবাহিনী সহায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়, কিন্তু যিনি অস্ত্রশস্ত্র বিহীন হইয়া একাকী বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন অসংখ্য সৈন্য সহায় বাহিনীপতিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয়েন, তিনি যে ঈশ্বরীয় শক্তির আধার ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। বর্তমানকালে পণ্ডিত হইতে হইলে লোকে গ্রন্থরাশির আশ্রয় লয়েন। যিনি যত পরিমাণে গ্রন্থাভ্যাস করিতে শিখিয়াছেন, তিনি তত পরিমাণে পণ্ডিত বলিয়া গণনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রন্থপাঠ একেবারে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কখনও কখনও গ্রন্থকে গ্রন্থিস্বরূপ বলিতেন। কারণ অনেক স্থলে গ্রন্থপাঠ পাণ্ডিত্যাভিমানের কারণ হয় ও তজ্জন্য নানাবিধ গ্রন্থিল বন্ধন মানবমনকে সংসারে আবদ্ধ রাখে। যুবাকালে জনৈক বুদ্ধিমান বেদান্ত শাস্ত্রাধ্যায়ীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এ ব্যক্তির নিকট তিনি সর্বদাই জগতের মিথ্যাত্ব, অবস্তুত্ব এবং ব্রহ্মের সত্যত্ব ও বস্তুত্ব সম্বন্ধে শুনিতেন এবং উক্ত বেদান্তাধ্যায়ী যে সর্বতোভাবে সাংসারিক বাসনাশূন্য, ইহা তাহার তর্ক ও যুক্তিপূর্ণবাক্য দ্বারা একপ্রকার স্থিরই করিয়াছিলেন। কিন্তু যৎসামান্য তণ্ডুলের লোভে একদা তাহাকে হীন পৌরহিত্যকর্মে ব্রতী হইতে দেখিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, গ্রন্থপাঠে জ্ঞানলাভ হয় না, তাহার অন্য উপায় নিশ্চয়ই আছে। এইরূপে তিনি গ্রন্থপাঠে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। সামাজিক পণ্ডিতগণ সভামধ্যে বেদান্ত শাস্ত্রের অপার্থিব সত্যসমূহের আলোচনা করিতেছে দেখিলে তিনি তাহাদিগকে সুদূর গগনগামী গৃধ্রাদি খেচর সমূহের সহিত তুলনা করিতেন। কারণ তাহারা গগন প্রদেশের মহোচ্চস্থান অধিকার করিলেও সর্বদা পূতিগন্ধময় মৃত জীবদেহের অন্বেষণে পৃথিবীর অতি কদাকার স্থান সমূহে ন্যস্ত দৃষ্টি হইয়া থাকে। তদ্রূপ পণ্ডিতগণের বদন হইতে তত্ত্ববাক্যের স্রোত প্রবাহিত হইলেও তাহাদের মন সর্বদা অর্থের উপর পতিত থাকে। একদা জনৈক মূর্খ শিষ্য তাঁহার সংসারতারিণী অভয়দায়িনী সেবা পরিত্যাগ করিয়া ফার্সি গ্রন্থপাঠে অভিনিবিষ্ট

হইলে তিনি মধুরবাক্যে তাহাকে কহিয়াছিলেন, "বৎস, ঈদৃশ গ্রন্থপাঠে মন বিক্ষিপ্ত হয়। এমনকি ইহাতে ভগবদ্ভক্তির হানি হয়।" তাঁহার এই শাসন বাক্যে উক্ত শিষ্যের চৈতন্যলাভ হইয়াছিল।

বহু গ্রন্থ অভ্যাস করিলে মানব মন অন্যের চিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ হয় ও স্বকীয় চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে। গ্রন্থপাঠ যদি কাহারও চিন্তার সহায় হয়, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই উপাদেয়; কিন্তু যদি তাহা কাহারও চিন্তাশক্তির নাশক হয়, তাহা হইলে সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার পরম পবিত্র মনোমধ্যে সুগুপ্ত অতুল জ্ঞানরাশির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে এত জ্ঞানধনের অধিকারী হইলেন যে স্বীয় অক্ষয় কোষ হইতে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে তাহা অহরহ অবাধে বিতরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধনী তাঁহার অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে জ্ঞানধন লাভ করিয়া আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতেন।

আমরা উপনিষদে পাঠ করিয়াছিলাম যে, দুই প্রকারের বিদ্যা আছে, পরা ও অপরা। তথায় বেদ বেদান্তাদি পাঠ অপরা বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা তখন আমরা ভালো হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বুঝিলাম, পরা বিদ্যা কাহাকে বলে। এই পরাবিদ্যা বলেই তিনি মহাপণ্ডিত হইতে মহামূর্খেরও মোহ আবরণ অপসারিত করিতে পারিতেন। এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্বের বিশেষ পরিচায়ক।

ইদানীং ধন না থাকিলে জগতে কাহারও সম্মানলাভের সম্ভাবনা নাই। ধনে মূর্খকেও পণ্ডিত করায়। ধনে অসম্ভব সম্ভবপর হয়। সুতরাং অধুনা সর্বত্র অর্থশক্তিরই পূজা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থকে সর্বানর্থের মূল জানিয়া তাহার ধাতুময়ী মূর্তির প্রতি এতাদৃশ ঘৃণাপরায়ণ হইয়াছিলেন যে, কোনও ধাতুময় দ্রব্য তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন না, তাহা করিলে তাহার হস্ত অসাড় হইয়া যাইত। তিনি এইরূপ ধনস্পর্শলেশশূন্য ছিলেন বলিয়াই মহাধনিগণ তাঁহার দাসত্ব করিয়া তাঁহার জন্য বিপুল অর্থব্যয় করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। যিনি অর্থ চাহেন না, অর্থ যে আপনা আপনি তাঁহার নিকট আইসে, অলৌকিক শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন পর্যালোচনা দ্বারা ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

ভবিষ্যতের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করা অত্যাবশক, কারণ, অভাবময় মনুষ্যজীবনে কখন কি অভাব হইবে তাহা কাহারও জানা নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমুহূর্তের জন্যও কিছু সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। একদা তিনি শম্ভুচরণ মল্লিকের উদ্যান বাটিকায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত মল্লিক মহাশয় তাহাকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন। এই জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার উদ্যানে গমন করিয়া ক্ষণকাল সংলাপ করত স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন। মল্লিক মহাশয় এক দিবস তাঁহার অজ্ঞাতসারে তদীয় ব্যবহারার্থ কিঞ্চিৎ অহিফেন বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন; প্রত্যাগমনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্ট দিবালোকে গৃহদ্বার অন্বেষণ করিতে সমর্থ না হইয়া বিপথে গমন করিতেছেন দেখিয়া মল্লিক মহাশয় কহিলেন, "বাবা দ্বার তো ওদিকে নয়।" তাহাতে তিনি কহিলেন, "আমার সমুদয় অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। তুমি কি আমার কাপড়ে কিছু বাঁধিয়া দিয়াছ?" মল্লিক মহাশয় কহিলেন, "আপনার ব্যবহারার্থ কিঞ্চিৎ অহিফেন দিয়াছি।" পরে তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া লইতে তিনি প্রকৃত দ্বার দেখিতে পাইলেন। সঞ্চয় সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ এরূপ উদাসীন ছিলেন। এইজন্যেই তাঁহার জন্য অন্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিত। আমরা গীতায় পাঠ করিয়াছিলাম—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"

"যাঁহারা অন্য সর্ব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্তগণের জন্য আমি দ্রব্য আহরণ ও সঞ্চয় করিয়া থাকি।" তখন ইহা বোধগম্য হয় নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবন ইহা স্পষ্ট বোঝাইয়া দিয়াছে।

এ জগতে বন্ধনই একমাত্র সহায় ও সুখের কারণ। প্রেমবন্ধন আছে বলিয়া সাংসারিক জীবন এত সুখকর হইয়াছে। গৃহনির্মাণে, বস্ত্র বয়নে, পেটিকাদি করণে বন্ধন অপরিহার্য। গৃহদ্বারে বন্ধন না দিলে চোরের ভয়। বেশ বিন্যাসে বন্ধন আবশ্যক। যাহার কোন বিষয়ে বন্ধন নাই তাহাকে অচিরাৎ পথের ভিক্ষুক হইতে হইবে। এমনকি ভিক্ষুকও আপনার চীরখণ্ডগুলিকে একত্র বন্ধন করিয়া রাখে, পাছে হারাইয়া ফেলে। অতএব বন্ধন সাংসারিক লোকের পরম সহায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বন্ধনের কথায় ভয় পাইতেন। বন্ধন মনুষ্যকে পৃথিবীতে বাঁধিয়া রাখে, ভগবৎ পাদপদ্মে যাইতে দেয় না। বন্ধনে মানব স্বাধীনতা ধন হইতে বঞ্চিত হয়। বন্ধন হৃদয় কমলকে প্রস্ফুটিত হইতে দেয় না। সুতরাং যে কেহ

ভগবৎ পাদপদ্মের মধুপান করিতে সমুৎসুক, যে কেহ স্বাধীনতা লাভ করিয়া অকুতোভয়ে মহামায়ার রাজ্যে আনন্দে বিহার করিতে অভিলাষী, তিনি কখনও বন্ধনকে হৃদয়ে স্থান দিবেন না। এইরূপে তিনি বন্ধনকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন যে, কোন দ্রব্যে তিনি বন্ধন দিতে পারিতেন না। বস্ত্র পরিধানে বন্ধন আবশ্যক, সুতরাং স্বয়ং পারিতেন না বলিয়া অন্যে তাঁহাকে বস্ত্র পরাইয়া দিত। পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় তাঁহার স্বভাব ছিল, সুতরাং জগজ্জননী কালশক্তি কালী তদীয় সেবার্থ অনেক দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারা সেই মহাপুরুষের সেবা করিয়া আপনাদের পরম ভাগ্যবান মনে করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎপ্রসূতি কালীকেই আপনার জন্মদাত্রী বলিয়া জানিতেন। শিশু যেমন কোন মাতৃ অঙ্ক পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তিনিও সেইরূপ কখনও মাতৃ অঙ্ক হইতে উত্থিত হইতে চাহিতেন না। অহরহ মাতৃসমক্ষে থাকিয়া নির্ভয়ে আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতেন এবং জানিতেন, এ সংসারে মাতৃ-পাদমূল ভিন্ন আর কুত্রাপি নির্মল আনন্দভোগের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই তিনি আনন্দপ্রিয় মানবগণকে নিজ জননীর নিকট লইয়া যাইতে চাহিতেন। বাস্তবিক যতদিন স্ত্রীজাতির প্রতি তোমার মাতৃভাব থাকে, ততদিন তাঁহারা তোমায় সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়া থাকেন, কিন্তু যখনই তাঁহাদের প্রতি তুমি কামভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ কর, তখনই বিবাহেচ্ছা তোমার হৃদয়ে বলবতী হয়। বিবাহের পর নারীকে পত্নীরূপে লাভ করিলে লালন পালনের ভার আর নারীতে থাকে না, তাহা তোমার উপর আসিয়া পড়ে, পত্নী ভার্য্যা বা ভরণীয়া হয়েন। এতদিন বালকের ন্যায় লালিত পালিত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, এক্ষণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চিন্তারূপ জ্বরে শরীর মনকে মলিন করিয়া দুঃখময় সংসারে দুঃখের ভার মস্তকে ধারণ করত অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেছে। নির্মল ললাটে চিন্তার রেখা দেখা দিল, হৃদয় হইতে শান্তি চিরকালের জন্য তিরোহিত হইয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ এইজন্য বলিতেন যে, "দেখ, নবজাত গোবৎস কেমন সুন্দর, কত আনন্দময়, ইতস্তত কেমন লম্ফঝম্ফ দিয়া বেড়াইতেছে। যেন জগতে কেবল আনন্দ ভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যেদিন হইতে উহার গলায় রজ্জু সংলগ্ন হইবে, সেই দিন হইতেই উহার রূপ ও আনন্দ উভয়ই ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইবে। বিবাহ বন্ধনের পূর্বে মানব সন্তানও ঐরূপ আনন্দে জীবনযাপন করে, কিন্তু সংসারের রজ্জু গলদেশে একবার সংলগ্ন হইলে, সে সুখ কোথায় পলাইয়া যায়।"

স্বাধীনতাই সুখের মূল। স্বাধীনতাই মানবকে অমিততেজসম্পন্ন করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্বাধীনতাধন কখনও নষ্ট করেন নাই। কোনও রূপ বন্ধন তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ করিতে পারে নাই। তাঁহার হৃদয় অনন্ত আকাশের ন্যায় বিশাল ছিল। এই হেতুই তিনি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিতেন। তিনি কহিতেন, "ভগবানের কখনও ইতি করিও না। কেহ কখনও তাঁহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয় নাই, হইবেও না। তিনি চিৎ সমুদ্রস্বরূপ, শিব শুক সনক নারদাদি সেই সমুদ্রের এক এক ফোঁটা জল পান করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সাকার নিরাকার ও এতদুভয়ের অতীত, ইহা জানিয়াছি। আর যে তিনি কি তাহা জানি না। পৃথিবীতে যত ধর্ম্মমত আছে, তৎসমস্তই তাহার শ্রীপাদমূলে যাইবার এক একটি পথ। তুমি যে পথে আজন্ম স্থাপিত হইয়াছ, সেই পথ দিয়াই অগ্রসর হও। কালক্রমে চিরশান্তি নিকেতন বিভুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর আমিত্ব ছিল না। তিনি "আমি, আমার" এই দুই কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। যে স্থলে সচরাচর লোকে "আমার" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, তিনি সেই স্থলে নিজ হৃদয়ে হস্ত স্থাপন পূর্বক "এখানকার" শব্দ প্রয়োগ করিতেন যথা "আমার ভাব এরূপ নয়" বলিতে হইলে তিনি "এখানকার ভাব এরূপ নয়" ইহা বলিতেন। তাঁহার নিজের আমিত্ব তাঁহার ভিতর ছিল না বলিয়া জগৎপ্রসূতি কালীর আমিত্বই তাহার ভিতর দিয়া সর্বতোভাবে প্রকাশ পাইত। অর্থাৎ বিশ্বজননী লীলাময়ী কালীই শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহার অসংখ্য পুত্রকন্যাগণকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে মানব, শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস আমি তোমায় দিলাম। আমার ন্যায় নগণ্য ক্ষুদ্র জীব তাঁহার অনন্ত শক্তির এক কণাও বিবৃত করিয়া বলিতে সমর্থ নয়। তুমি যদি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হও, তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বলোকপাবন নিখিল সন্তাপহর চরিত্র সাগরে অবগাহন কর। ক্রমে তত্ত্বস্ফূর্তি দ্বারা তোমার হৃদয় সমুদ্ভাসিত হইবে। প্রাণে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হইবে। মন আনন্দময় হইয়া যাইবে ও তুমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে।

(উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫ ফাল্গুন ১৩১২, পৃঃ ৯৭-১০৭)

অম্বা-স্তোত্রম্

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ-বিরচিতম্।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক অনুবাদ সহিত)

(১)

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্মিভঙ্গৈঃ।
শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাং
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে॥

তুলি ঘোর ঊর্মিভঙ্গে, মহাবর্ত তার সঙ্গে,
এ ভবসাগরে কে মা, খেলিতেছ বল না?
শিবময়ী মূর্তি তোর, শুভঙ্করি, এ কি ঘোর,
সুখ দুঃখ ধরি করে কর সবে ছলনা!
এতই কি তোর কাজ, সদা ব্যস্ত বিশ্বমাঝ
অশান্ত ধরায় কি গো শান্তি দান বাসনা?

(২)

সম্পাদয়ন্ত্যবিরতং ত্ববিরামবৃত্তা
যা বৈ স্থিত্বা কৃতফলং ত্বকৃতস্য নেত্রী।
সা মে ভবত্বনুদিনং বরদা ভবানী
জানাম্যহং ধ্রুবমিয়ং ধৃতকর্ম্মপাশা॥

যে ছিঁড়েছে কর্ম্মপাশ, তারে করি চিরদাস,
নিত্যশান্তি সুধারাশি পিয়াতেছ, জননি,
কার্য করি ফল চায়, কৃত ফল দিতে তায়
সদাই আকুল তুমি ওগো হরঘরনি,
জানি মা, তোমায় আমি, কর্ম্মপাশে বাঁধো তুমি,
বেঁধো না বরদে, মোরে, নাশো দুঃখরজনী।

(৩)

কো বা ধর্মঃ কিমকৃতং ক্ক কপাললেখঃ
কিম্বাদৃষ্টং ফলমিহাস্তি হি যদ্বিনা ভোঃ।
ইচ্ছাপাশৈর্নিয়মিতা নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈঃ
যস্যাঃ নেত্রী ভবতু সা শরণং মমাদ্যা ॥

কি কারণে কার্যচয়, জগতে প্রকট হয়,
সুকৃত দুষ্কৃত কিম্বা ললাট-লিখিত রে,
কেহ না দেখিয়া কূল, কহয়ে অদৃষ্ট-মূল,
ধর্মাধর্মে সুখ-দুঃখ এ নহে নিশ্চিত রে,
স্বতন্ত্র বিধানে যাঁর, বদ্ধ আছে এ সংসার,
সে মূল শক্তির আমি সদাই আশ্রিত রে।

(৪)

সন্তানয়ন্তি জলধিং জনিমৃত্যুজালং
সম্ভাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্।
যস্যা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ
নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ ॥

যাঁহার বিভূতিচয়, লোকপাল সমুদয়,
যাঁদের অমিতশক্তি কোন বাধা মানে না,
জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধি, যে সাগরে নিরবধি
সে অনন্ত জলনিধি যাঁহাদের রচনা,
প্রকৃতি-বিকৃতিকারী, এইসব কর্মচারী,
যাঁর বলে বলীয়ান, কর তাঁরি অর্চনা।

(৫)

মিত্রে রিপৌ ত্ববিষমং তব পদ্মনেত্রং
স্বস্থে দুঃস্থে ত্ববিতথং তব হস্তপাতঃ।
মৃত্যুচ্ছায়া তব দয়া অমৃতঞ্চ মাতঃ
মা মাং মুঞ্চন্তু পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে ॥

মা তোমার কৃপাদৃষ্টি, সমভাবে সুধাবৃষ্টি,
শত্রুমিত্র সকলের উপরেই করো গো,

সমভাবে ধনী দীনে, রক্ষা কর নিশিদিনে,
মৃত্যু বা অমৃত, দুয়ে তব কৃপা ঝরে গো,
যাচি পদে, নিরুপমে, ভুলো না মা এ অধমে,
শুভদৃষ্টি তব যেন সর্বতাপ হরে গো ॥

(৬)

কাম্বা শিবা ক্ব গৃণনং মম হীনবুদ্ধেঃ
ধর্তুং দোর্ভ্যামিব মতির্জগদেকধাত্রীম্।
শ্রীসঞ্চিন্ত্যং সুচরণং ত্বভয়প্রতিষ্ঠং
সেবাসারৈরভিনুতং শরণং প্রপদ্যে ॥

বিশ্বপ্রসবিনী তুমি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব আমি,
করিব তোমার স্তুতি বৃথা এই কল্পনা।
সীমাহীন দেশকালে, ধরে আছ বিশ্বজালে,
তোমায় ধরিতে হাতে উন্মাদের বাসনা,
অকিঞ্চন ভক্তিধন, রমাভাব্য যে চরণ,
সে পদে শরণ পাই, এই মাত্র কামনা।

(৭)

যা মামাজন্ম বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
আসংসিদ্ধেঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ।
যা মে বুদ্ধিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা সর্বা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা ॥

স্বরচিত লীলাগার, মনোহর এ সংসার,
সুখ দুঃখ ল'য়ে সদা নানা খেলা খেলিছ,
পূর্ণজ্ঞান দিবে তাই, জন্ম হ'তে সুখ নাই,
দুঃখপথ দিয়া মোর করে ধরি চলিছ,
সফল নিষ্ফল হই, কভু বুদ্ধিহারা নই,
তোমারি প্রসাদে তুমি সদা মোরে রাখিছ,
তুমি গতি মোর, তাই স্নেহে মা গো পালিছ।

ইতি শ্রীমদ্বিবেকানন্দস্বামিপাদবিরচিতং অম্বাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

(উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১৫ আশ্বিন ১৩০৭, পৃঃ ৪৮২-৪৮৪)

জ্ঞান ও ভক্তি*

জ্ঞান ও ভক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে জানিবার আকাঙ্ক্ষা সতত বিদ্যমান আছে। মানবের জ্ঞান পিপাসা প্রায় অতর্পণীয়—যখন সে বলিতে পারে "আমি সমস্তই জানিয়াছি, আমার জ্ঞেয় বস্তু আর কিছুই নাই", কেবলমাত্র তখনই তাহার জ্ঞান পিপাসা পরিতৃপ্ত হয়। অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কিছুতে সে সন্তোষ লাভ করে না। জ্ঞানের অর্থ, সেই পরমোজ্জ্বল অবস্থা, যাহাতে সর্ব বস্তু সম্যগ্‌রূপে বিদিত হওয়া যায়। মানুষ এই জ্ঞান সৃষ্টি করে না—ইহা সর্বদাই তাহার অন্তরে বিরাজমান। প্রত্যেক জীবেরই অন্তরে জ্ঞান বর্তমান, কিন্তু তাহা নিবিড় অজ্ঞান মেঘে আবৃত বলিয়া আমরা তাহা দেখিতে পাই না। পঞ্চকোষই (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহংকার) পঞ্চমেঘ, উহারাই সত্যকে লুক্কায়িত রাখে। কেহ কেহ বলেন, কেবল জ্ঞানের দ্বারা এই সকল মেঘ বিদূরিত করা যায়—শুধু অসৎকে অস্বীকার করিয়া আমরা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে ভক্তি না থাকিলেও জ্ঞানের দ্বারা লোকে ভগবানকে জানিতে পারে। ভক্তি ব্যতীত কোন মনুষ্যের পক্ষে স্বয়ম্ভূ-স্বয়ং-প্রকাশ-তত্ত্ব বা ভগবানকে উপলব্ধি করা এবং তাঁহার সহিত নিজের একাত্মবোধ সম্ভব কিনা তাহা দেখা যাউক।

আমরা যে 'অহং' বা আমির কথা বলি সেটি কি? প্রথমে আমরা দেহের সহিত আমাদের তাদাত্ম্য স্থাপন করি অর্থাৎ দেহ হইতে আপনাদিগকে অভিন্ন জ্ঞান করি। কিন্তু দেহের পূর্বেও এই অহং ছিল। মনে কর কোন ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করিল, তাহা হইলেই কি সে ভগবানকে জানিতে পারিবে?—না। যদিও সে বুঝিতে পারে যে দেহ হইতে সে ভিন্ন এবং দেহ হইতে দেহান্তরে গমনক্ষম, তথাপি সে সান্ত বা সীমাবদ্ধ জীবই থাকে, সান্ত জীবই স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে সক্ষম। অনন্ত, অসীমের পক্ষে কি স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব? না। অনন্ত সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকে, সুতরাং এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিবে কিরূপে? প্রকৃত জ্ঞানও অনন্ত। এক্ষণে এই 'অহং'—যাহা এ জন্মে রাম, পূর্বজন্মে শ্যাম

---

* স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'WISDOM AND DEVOTION' নামক পুস্তিকা হইতে শ্রীকেশব চন্দ্র নাগ, বি.এ. কর্তৃক অনূদিত।

এবং পরজন্মে হয়তো হরি হইবে, ইহার পক্ষে কি কখনও অনন্ত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব?—না। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, সুতরাং ইহা সান্ত। কিন্তু তোমরা বলিতে পার যে, প্রতিনিয়ত ইহার জ্ঞানের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, সুতরাং পরিশেষে ইহা এমনকি স্বয়ং ভগবানকেও জানিতে পারিবে। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ, বহুকল্প পরেও ইহার জ্ঞানের পরিমাণ সসীমই থাকিয়া যায়, অতএব অনন্তের সহিত তুলনায় তাহা অতি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর, সুতরাং অনন্ত জ্ঞানকে উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

তাহা হইলে কিরূপে ইহার উপলব্ধি সম্ভব? সর্ব বিষয় জ্ঞাত হওয়া, এই সীমাবদ্ধ 'অহং' এর পক্ষে সম্ভব নহে—তথাপি কিন্তু সর্বজ্ঞ হইবার আকাঙ্ক্ষা সর্বদা বিদ্যমান থাকে। কিরূপে এই বাসনা পূর্ণ হইবে? স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পূর্বোক্ত প্রণালীটি ঠিক নহে। কারণ সান্ত মনের পক্ষে নিখিল বিশ্বতত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব—অনন্ত কালের জন্য উহা সান্তই থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কিন্তু শিক্ষা দিয়াছেন যে সান্ত ব্যক্তিগত 'অহং' মানবের প্রকৃত স্বরূপ নহে। মানবের উচ্চাভিলাষী আত্মা অংশমাত্রে সন্তুষ্ট হইবে না। যতক্ষণ না সে বলিতে পারে, আমার জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই, আমি সমস্তই জানিয়াছি, ততক্ষণ সে শান্ত হইবে না। তাহা হইলে এই জ্ঞান কি প্রকারে লাভ করা যায়? দ্বৈতবাদীরা বলেন, ইহা লাভ করা যায় না। ভগবান সেই নিত্য সর্বজ্ঞ পুরুষ, অনন্তকালের জন্য সে স্থানে (অর্থাৎ স্বর্গে), আর আমরা চিরকালের জন্য এস্থানে (অর্থাৎ মর্তে)। তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। "তিনি অনন্ত শক্তিমান, আমি দুর্বল। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিলে আমি কষ্টভোগ করিব। অতএব তিনি যাহাতে অসন্তুষ্ট না হন তদ্বিষয়ে আমায় যত্নবান হইতে হইবে। কিরূপে আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ হইতে পারি? শাস্ত্রে তাহার কতিপয় বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। সেই বিধিগুলি পালন করিলে ক্রমশ আমার অন্তরে প্রেমের উদয় হইবে এবং আমি প্রভুর আদেশ পালনে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিব। তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিব। এমনকি যদি তিনি আব্রাহাম ও আইজ্যাকের (Abraham and Isac) ন্যায় আমায় পুত্রহত্যা করিতে বলেন, তাহা হইলে প্রফুল্লচিত্তে তাহাকে তৎসমীপে বলি দিব—মনে করিব ভগবান তাঁহার নিজ সন্তানকে গ্রহণ করিয়াছেন।"

যিনি এরূপ মানসিক অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বে যাহা কিছু ঘটে

তাহার নিন্দা করেন না, কারণ সমস্তই ভগবদিচ্ছায় সংঘটিত হয়। অতএব সর্বদা সেই পরম ইচ্ছার বশীভূত হইয়া তিনি ভগবানের সহিত একাত্ম হইয়া যান—যদিও প্রভু হইতে ভৃত্যের ন্যায় ভগবান হইতে আপনাকে পৃথক রাখেন। ভৃত্য প্রকৃতপক্ষে প্রভুরই প্রক্ষেপণ (projection), অর্থাৎ প্রভুরই প্রক্ষিপ্ত স্বরূপ মাত্র। একজনে যাহা করিতে পারে মানুষ তদপেক্ষা অধিক কিছু করিতে চাহে, সেজন্য তৎসাধনকল্পে সে অন্য একটি দেহ মন ক্রয় করে। সেই দেহমন অপরের, কিন্তু সে তাহা ঠিক নিজের ন্যায় ব্যবহার করে, সুতরাং প্রভু ও ভৃত্য বাস্তবিক স্বতন্ত্র নহে। কিন্তু তাহারা আবার প্রকৃতপক্ষে এক বা অভিন্নও নহে। দেহের সহিত হস্তের যে সম্বন্ধ তাহাদেরও সেই সম্বন্ধ। হস্ত দেহেরই একটি অংশ, তাহারই সেবা করে ও আদেশ মত চলে, তথাপি কিন্তু উহা হইতে ভিন্ন। ইহাকেই বলে ভক্তি বা অনুরাগ। আমিত্বের নাশ ও স্বার্থপর স্বভাব ধ্বংস হইলে মানুষ ইহা লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি গল্পের দ্বারা ঐ সম্বন্ধটি বিশদরূপে বোঝাইতেন। দুইটি ক্ষেত্র। একটি অন্যটি অপেক্ষা অধিক উচ্চ। উচ্চক্ষেত্রটি জলপূর্ণ, নিম্নক্ষেত্রটি শুষ্ক। নিম্ন ভূমিটিতে জল দিতে হইলে ভূ-স্বামী জলপ্রবাহের জন্য উভয়ভূমির মধ্যে একটি খাল খনন করে। যতক্ষণ না নিম্নভূমির জল উচ্চভূমিস্থ জলের সহিত সমতল হয়, ততক্ষণ উহা অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে, কিন্তু যখন উভয় ভূমির জল সমতল হয়, তখন জলপ্রবাহ বন্ধ হয় এবং উভয়ে মিলিয়া এক অখণ্ড জলরাশিতে পরিণত হয়। তখন একটি ক্ষেত্রতলের প্রতিতরঙ্গ অন্যটিতে সঞ্চালিত হয়। প্রকৃত ভক্তেরও ঠিক ইহাই হইয়া থাকে। তিনি যখন ভগবৎস্তরে উন্নীত হন, তখন দুয়ে এক হইয়া যান এবং ভগবানের চিন্তাস্রোতগুলি ভক্তের মনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। আমাদের ঠাকুর আর একটি গল্পও বলিতেন—তিনটি পুতুল। একটি পাথরের, একটি কাপড়ের, আর একটি লবণের। পরস্পরের বিশেষ বন্ধুত্ব। একদিন তাহাদের সমুদ্রস্নানের বাসনা হইল। প্রথম পুতুলটি সমুদ্র স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল—তাহার কিছুই পরিবর্তন হইল না। দ্বিতীয়টি সমুদ্রে নামিয়া স্নানান্তে অতিকষ্টে আপনাকে তীরে তুলিল। তীরে আসিয়া সে সমুদ্রের আঘ্রাণ ও স্বাদ পাইতে লাগিল—তাহার সমগ্র দেহ সমুদ্রজলময় হইয়া গেল। তৃতীয়টি সমুদ্র হইতে আর ফিরিল না। প্রথমটি সংসারাসক্ত জীব, দ্বিতীয়টি ভক্ত—ভগবৎপ্রেমে ও আনন্দে ভরপুর, তৃতীয়টি একজন জ্ঞানী—যিনি আপন আত্মাকে বিশ্বাত্মায় লীন করিয়া দেন।

কে ভগবদ্ গুণকীর্তনের যোগ্য?

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

যিনি আপনাকে দীন হীন, তৃণাপেক্ষা নীচ মনে করেন, বৃক্ষের ন্যায় যাঁহার সহিষ্ণুতা (বৃক্ষ ছেদককেও শীতল ছায়া দান করে) এবং যিনি আপনাকে সম্মানের যোগ্য মনে না করিয়া নিম্নতম সৃষ্ট জীবকেও সম্মান করেন, তিনিই যোগ্য। ভক্ত আপনাকে অতি অযোগ্য ও হীন মনে করেন। গৃহে আপনার পরিবারবর্গের মধ্যে থাকিয়া কেহ নিজেকে অতি গণ্যমান্য মনে করিতে পারে, কিন্তু বাহিরে গিয়া তদপেক্ষা অধিকতর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইলে তাহার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। তখনও সে যে দেশে বাস করে তাহার জন্য গর্ববোধ করে, কিন্তু যখন সে জানিতে পারে যে লন্ডনের তুলনায় মাদ্রাজ কত ছোট, লন্ডন পৃথিবীর তুলনায় কত ক্ষুদ্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান গোচর ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় পৃথিবীও একটি বিন্দুমাত্র, তখন ক্রমশ তাহার গর্ব দূরীভূত হইতে থাকে। এবং অবশেষে সে উপলব্ধি করে যে বিশ্বেশ্বরের তুলনায় সে কিছুই নহে। প্রকৃতি শূন্যকে ঘৃণা করে—অর্থাৎ প্রকৃতিতে কোন স্থান শূন্য থাকে না। অতএব, ভক্ত আপনাকে 'অহং' বা আমিত্ব শূন্য করিলেই ভগবান সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করেন। তিনি কোন কর্ম করিলে মনে করেন, উহা তিনি করেন নাই—ভগবান করিয়াছেন এবং কোন বিষয়ে সাফল্য লাভ করিলে ভাবেন, উহা তাঁহার নহে—ভগবানের। "নাহং নাহং—তুঁহু, তুঁহু—ইহাই তাহার আসল ভাব এবং ইহাই আদর্শ সন্ন্যাসীর স্বরূপ।

যিনি জ্ঞানী তিনি অন্য এক প্রণালী অবলম্বন করেন। তিনি এই জগতের শূন্যত্ব ও অসারত্ব উপলব্ধি করেন। আপনাকে আর দেহ হইতে অভিন্ন জ্ঞান না করিয়া তিনি ভগবানে আত্মবিসর্জন করেন, তখন তাঁহার আর পৃথক সত্তাবোধ থাকে না। বিচারের দ্বারা তিনি এই অবস্থা লাভ করেন। সংস্কৃত 'অহংকার' শব্দটির অর্থ অস্মিতা বা অহংবোধ। এই 'অহং' কাহার? ইহা কি আমার, না অপরের অধীন? জ্ঞানী বলেন, আমি নিজের অধীন হইলে আমি আমার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিতাম। কিন্তু সত্যই কি আমি আমাকে পরিচালিত করি, না অন্য কোন বহিঃশক্তি দ্বারা পরিচালিত হই? বাস্তবিক যদি জন্মাবধি আমি নিজেকে পরিচালিত করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি আমাকে রাজপ্রাসাদ, সুস্থ দেহাদি লাভের জন্য আদেশ করিতাম, কিন্তু আমি

হয়তো কুটিরবাসী ও দুর্বলদেহ! রাজপ্রাসাদে বাস করিতে কে না ইচ্ছা করে? রাজার পুত্র হইতে কাহার না সাধ হয়? নিউটনের ধীশক্তি লাভ করিতে কাহার না বাসনা হয়? কিন্তু মানুষ এগুলি তো পায় না। তাহার নির্বাচনের অধিকার থাকিলে, প্রত্যেক বিষয়ে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট তাহাই সে নির্বাচিত করিত—কিন্তু তাহার পিতা তাহার মনোমত নহে, জীর্ণ কুটিরে তাহার বাস এবং হীন খাদ্য আহার। হয়ত অধ্যয়নের জন্য তাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু অর্থাভাব। সমস্তই তাহার বিপক্ষে। তবে কি এ নির্বাচন তাহার নিজের? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, সে স্বয়ং নির্বাচন করিতে পায় নাই, নতুবা তাহার মনোনয়ন আরও ভালো হইত—যে সকল বস্তুলাভে সে সুখী হইতে পারে, তাহাই নিশ্চয় সে মনোনীত করিত।

এইরূপে অহংকে বিশ্লেষণ করিবার সময় আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, আমার বলিতে কিছুই নাই—এমনকি এ দেহ পর্যন্ত আমার বলিতে পারি না। এখানে আমরা এক দুর্জ্ঞেয় শক্তির অধীন, উহা আমাদের সকল কর্মই নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব আমাদের অহমিকা ত্যাগ করা উচিত। কে আমি? সত্যই কি সেই শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার আমার কোন ক্ষমতা নাই? কিসে আমাকে এরূপ পরতান্ত্রিক বা পরাধীন করিয়াছে? আমি ক্ষুধার্ত, সুতরাং আমাকে আহারের জন্য তাঁহার সৃষ্টিরই অন্বেষণ করিতে হইবে। আমি তৃষ্ণার্ত, সুতরাং আমাকে জলের জন্য তাঁহার সৃষ্টিরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। কিন্তু জ্ঞানী জিজ্ঞাসা করেন "আমি কি প্রকৃতই ক্ষুধার্ত? সত্যই কি আমি তৃষ্ণার্ত? ক্ষুধা তৃষ্ণার অধিষ্ঠান কোথায়? ইহা কি সত্য নহে যে দেহের মৃত্যু হইলে যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা আর থাকে না, তখনও আমি জীবিত থাকি? অতএব আমি দেহ হইতে ভিন্ন। দেহ ও আমি দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা। নক্ষত্রাবিষ্কারকারী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় এই দেহ আমার নিকট যন্ত্রস্বরূপ, উহা স্বয়ং একটি জড়পদার্থ মাত্র। সুতরাং দেহে যাহা সংঘটিত হইতেছে তাহা আমাতে সম্পাদিত হইতেছে ভাবিব কেন? এই সকল বাসনার স্থান কোথায়?—দেহেতেই ক্ষুধা, দেহেই তৃষ্ণা; দেহকে সজীব রাখিতে হইলে চারা গাছের ন্যায় উহাতে জল সিঞ্চন করিতে হয়, তাহা না করিলে পত্রের ন্যায় উহা স্খলিত হইবে। কিন্তু 'আমি' ত নষ্ট হয় না। কথিত আছে, মায়া একদিন কোন জ্ঞানীর নিকট আসিয়া বলিল, "আমি কি অতিশয় শক্তিশালিনী নহি? দেখ, আমি এতগুলি জগৎ, চন্দ্রতারকাদি সৃষ্টি করিয়াছি এবং এরূপ প্রকাণ্ড বিশ্বের অধীশ্বরী।" জ্ঞানী উত্তর করিলেন "তুমি শূন্যের রানি।" তাহার মহত্ত্বের প্রতি এরূপ অসম্মানের জন্য মায়া অত্যন্ত কুপিতা হইল এবং

সেই জ্ঞানী পুরুষকে স্পর্শ করিয়া একটি উষ্ট্রে পরিণত করিল। তখন তাঁহাকে মরুভূমিতে গিয়া উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া গুরুভার বোঝা সকল বহন করিতে হইল এবং তাঁহাকে এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিতে হইত যে অবশেষে মায়া স্বয়ং দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে মুক্তি দিল। তৎপরে মায়া জিজ্ঞাসা করিল যে তিনি তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার পূজা করিবেন কিনা? তিনি হাসিয়া বলিলেন—"উষ্ট্রের দেহ বা মন কিছুই আমার নহে। তুমি আমার কোনই অনিষ্ট করিতেছ না, বরং নিজের গণ্ডদেশে নিজেই চপেটাঘাত করিতেছ।" মায়া রোষভরে বলিয়া উঠিল, "এখনও তুমি অসংশোধনীয়?" তখন সে পুনরায় তাহাকে স্পর্শ করিয়া একটি গর্দভে পরিণত করিল। গর্দভ হইয়া তিনি প্রহৃত হইতে লাগিলেন এবং দুর্গন্ধভার বহন ও অতি দুঃখে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপরে আর একবার মায়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার পদানত হইতে আদেশ করিল। তিনি বলিলেন, "কেন হইব? আমি তো কষ্ট ভোগ করিতেছি না—গর্দভের দেহ তোমার আমার নহে।" অবশেষে মায়া বুঝিল যে তাঁহার মনের প্রশান্তভাব নষ্ট করা তাহার সাধ্যাতীত এবং তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিল "আপনিই মহত্তর।"

উহাই জ্ঞানীর প্রকৃত ভাব। তাঁহার নিকট আত্মা ও দেহ স্বতন্ত্র, আত্মা ও মন দুইটি বিভিন্ন বস্তু এবং তিনি জানেন যে দেহ কিংবা মনের ধর্ম বা বিকার তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সেজন্য তিনি কাহাকেও ভয় করেন না—মৃত্যুকেও না। কেন করিবেন? তিনি কি পূর্ণ নহেন—অনন্ত নহেন? তিনি বরং বলেন "প্রভু এ সমস্ত আপনিই দিয়াছেন, এক্ষণে প্রতিগ্রহণ করুন। এইরূপে ত্যাগই তাঁহার আদর্শ হইয়া থাকে। তিনি জানেন যে তিনি দেহ কিংবা মন নহেন এবং যখন তিনি দেহ ও মনের সহিত তাঁহার একত্ব স্থাপনে বিরত হন, তখন তাঁহার অনন্ত স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তখন তিনি অনুভব করেন যে তিনি ও ভগবান এক। এইরূপে তিনি সর্ববস্তু ত্যাগ করিয়া সর্ববস্তু লাভ করিয়াছেন, কারণ সকলেরই অধিকারী ভগবান, আর তিনি ও ভগবান অভিন্ন। তিনি কিন্তু নিজের বাহিরে উহা প্রাপ্ত হন না—অবশ্য সাধারণ লোকে পরিচ্ছদ বা আহার্য ক্রয় করিবার জন্য অর্থসহ বাজারে যায়; এ সমস্ত জিনিসই তাঁহার ভিতরে বর্তমান। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পূর্বে তিনি ছিলেন ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে ধনী হইয়াও আহারের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহার প্রতিবেশিগণ তাহাকে ধনী বলিয়া জানে এবং অবসাদ বায়ুগ্রস্ত বা বাতুল মনে করে। তাহার যথেষ্ট অর্থ আছে, একথা

তাহাকে সকলে বলিলেও সে আপনাকে নিতান্ত নিঃস্ব জ্ঞান করে। আমরাও এই বাতুলতাগ্রস্ত। আমরা আমাদিগকে দেহ মনে করি এবং ভাবি যে প্রাণ ধারণের জন্য আমাদের আহার ও বায়ুর আবশ্যক। কিন্তু মানুষ যখন ঠিকভাবে আত্মবিশ্লেষণ করে তখন দেখে যে প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন অভাব নাই—সে স্বপর্যাপ্ত! কিসে আমাদিগের এই জ্ঞান রোধ করে? অহং জ্ঞানই আমাদিগকে স্বস্বরূপ অবগত হইতে দেয় না। আমিত্বকে দূরে নিক্ষেপ করে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে ভগবান ও মনুষ্য এক—অভিন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, জলমধ্যে একখণ্ড যষ্ঠি স্থাপন করিলে, জলটি দুইভাগে বিভক্ত মনে হয় এবং একটি দক্ষিণ ও একটি বামগামী স্রোত দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ যষ্টিখণ্ড তুলিয়া লও—তৎক্ষণাৎ সমগ্র জল এক হইয়া যাইবে, তখন আর দক্ষিণ ও বামভাগ থাকিবে না। আমরাও ঐরূপ এক, অভিন্ন। তাহা যে নহি কিসে আমাদের সে ধারণা জন্মায়? আমাদের মনোরূপ জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত অহং যষ্টিই ন্যায়-অন্যায়, সদসৎ, আলোক-অন্ধকার, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বস্রোতের ধারণা উৎপন্ন করে। ঐ যষ্টি তুলিয়া লও—অহংকে দূরে নিক্ষেপ কর। যদি মুহূর্তের জন্য ইহা করিতে পার, তবে জানিতে পারিবে তোমার প্রকৃত স্বরূপ কি। ইহাকেই বলে স্বানুভূতি বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অবস্থা। ঐ যষ্টি বহিষ্কৃত ও স্রোতধারা এক হইয়া গেলেই এই অবস্থা লাভ হয়—ইহাই জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য।

অতএব, জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পথেই মানবকে অহং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। ভক্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন যে এই 'অহং' তাঁহাতে অধিগত নহে। তিনি ইহাকে বিরাট 'অহং'-এ নিমজ্জিত করেন—তখন তাহার ক্ষুদ্র আমিত্ব লোপ পায়। তিনি ভাবেন, "আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর, হীনাদপি হীনতর—আমি নগণ্য।" ইহাই ভক্তের রীতি। জ্ঞানী বলেন, মন, দেহ বা পঞ্চকোষে আমি সম্বন্ধ নহি। আমি সর্বদাই একরূপ। আমাতে এই সকল তরঙ্গের অস্তিত্ব নাই, ইহারা মদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে—জড় পদার্থে কিংবা মায়ায় অবস্থিত।" অতএব এই আমিত্ববোধ, এই 'অহম্' প্রত্যয়কে দেহ মনের স্তরে অবনত করার পরিবর্তে তিনি দেখেন যে ইহা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত (Self-existent)। মানবের জড়প্রকৃতির সহিত ইহার একত্ব স্থাপন করা যায় না। তিনি এইভাবে প্রকৃত 'অহং' এর স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—"ইহা মানুষ বা দেবতা নহে, গৃহী বা সন্ন্যাসী নহে, ধনী বা দরিদ্র নহে—ইহা নামরূপ হীন।" এইরূপে তিনি আত্মবিচার করিয়া অবশেষে বুঝিতে পারেন যে, যাহাকে তিনি দেহের সহিত অভিন্ন মনে করিতেছিলেন তাহা নিরবচ্ছিন্নভাবে চৈতন্যই ছিল।

উহা কেবল একটি মাত্র উপায়ে সিদ্ধ হয়। দেহ ও মনের সহিত তাদাত্ম্য স্থাপনকারী সীমাবদ্ধ 'অহং'ই মানবের পরম শত্রু। মানবকে উহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। ইহার দুইটি উপায় আছে। স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া জ্ঞানীকে নম্রভাবে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল 'অহং' ভাব ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি "আমি ব্রাহ্মণ" এই বোধ তাঁহার ছিল। তদ্বিনাশের জন্য তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সম্মার্জনী হস্তে চণ্ডালের গৃহ পরিষ্কার করিতেন। কেবলমাত্র সেবা দ্বারাই লোকে অহংশূন্য হইতে পারে। কিন্তু ভক্তিহীনভাবে সেবা করিতে চাহিলে এরূপ শুষ্কজ্ঞানে কোনই ফল হইবে না। সভক্তি সেবা দ্বারাই 'অহং' ভাব হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু যে পর্যন্ত কেহ গর্বিত হইয়া মনে করেন 'আমি বিদ্বান ও মহৎ' সে পর্যন্ত সে ঠিক ঠিক সেবা করিতে পারে না।

আমরা জ্ঞানী হই আর ভক্তই হই, আমাদের এক সাধারণ শত্রু বর্তমান—অহংজ্ঞান। "আমি কিছুই নহি, ভগবানই সব" এইরূপ চিন্তা করিয়া ভক্ত উহার হস্ত হইতে রক্ষা পান। আর "আমি দেহ নহি, মন নহি, ইন্দ্রিয় নহি।" এইরূপ নেতি নেতি করিয়া জ্ঞানী উহা হইতে মুক্ত হন। কিন্তু উভয়কেই সেবাপরায়ণ হইতে হইবে। আমরা সকলেই কোন না কোন ভাবে সেবা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা সুখ বা লাভের আশায় করি। কিছু লাভের আশা না থাকিলে সেরূপ আগ্রহের সহিত আমরা সেবা করি কি?—না। কিন্তু এইরূপ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবার ভাব আমাদের থাকা চাই। একমাত্র উহা দ্বারাই আমরা অহংভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি—আর, এই অহং নাশ হইলে তবে ভগবদনুভূতি সম্ভব হয়।

(উদ্বোধন, ২৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩০, পৃঃ ২৪-৩৩)

ধ্যান

ধ্যানের অর্থ সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। ঠিক ঠিক ধ্যান করতে হলে প্রত্যেকের অহং ত্যাগ আবশ্যক। তোমরা জান যে দাস-আমির পূর্বে ক্ষুদ্র অহং দূরীভূত হয়। সুতরাং ভগবানের উজ্জ্বল ঐশ্বর্য প্রকাশের পূর্বে ক্ষুদ্র আমিত্বের পূর্ণ নাশ হয়—যেমন নাকি সূর্য উদয়ে তারা অদৃশ্যমান হয়। যে মুহূর্তে তুমি সব কিছু ত্যাগ করবে এবং বুঝতে পারবে যে তুমি কত অসহায়, সেই মুহূর্তেই ঈশ্বর-দর্শন হয়। যদি তুমি এই অবস্থা লাভ করতে পার এবং কিছুক্ষণ এই ভাবটিকে ধরে রাখতে পার, তাহলে অনুভব করবে যে তোমার মনের মধ্যে ঈশ্বরীয়ভাব উদয় হবে। আর যদি তুমি এই অবস্থায় অবস্থান কর, তাহলে ভগবান তোমার অন্তরে সদা বিরাজ করবেন।

কিন্তু তুমি বলতে পার যে আমি আমার এই চক্ষু দিয়ে তাঁকে দেখতে পাই না, এই কর্ণ দিয়ে তাঁর কথা শুনতে পাই না, এই হস্ত দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করতে পারি না। তাহলে কিভাবে তাঁকে আমি অনুভব করব? তুমি কিন্তু কখনও তাঁকে এভাবে অনুভব করতে পারবে না। এই ইন্দ্রিয়গুলি তৈরি হয়েছে সৃষ্টির জন্য, সৃষ্টিকর্তার জন্য নয়। সৃষ্টিকর্তার দর্শন পেতে হলে এসব ইন্দ্রিয়গুলিকে ছুঁড়ে ফেলা আবশ্যক। কারণ, এগুলি সৃষ্টির দিকে সরাসরি ধাবিত হয়। মনের বা ইন্দ্রিয়ের সহায়তা নেওয়া মোটেই উচিত নয়। উভয়কেই সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। যতক্ষণ এসবের প্রয়োজন আছে বলে তুমি মনে কর, ততক্ষণ তোমার মধ্যে অহং প্রবল পরাক্রান্ত হবে। ধ্যান আর হবে না। যখন তুমি এই অহং দূরীভূত করতে সমর্থ হবে এবং তোমার মনও ইন্দ্রিয়াতীত হবে, তখনই তোমার ধ্যান হবে। এইটি লাভ করার সহজতম পথ—"নাহং নাহং, তুঁহু, তুঁহু।"

প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজমান। তিনি আমাদের অত্যন্ত নিকটে, কিন্তু মন জাগতিক বিষয়ে এত লিপ্ত যে ঈশ্বর-দর্শন সুকঠিন হয়। সুতরাং জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা সব জাগতিক আসক্তি খণ্ডন করতে হবে। লোকেরা প্রায়ই আমাকে বলে ঃ "আমি মনকে একাগ্র করতেই পারি না। আমার মন ব্যবসাতে, গৃহকর্মে লিপ্তই থাকে। ভগবানে ধ্যান করা অসম্ভব।" উত্তর "মন তোমার

অধীন নয়। তোমার মনকে তুমি বিক্রি করেছ ব্যবসাতে, গৃহকর্মে। সুতরাং কিভাবে আশা কর—তুমি মনকে আদেশ করবে? বিক্ষিপ্ত মনের দ্বারা তুমি কখনও একাগ্র ও ধ্যান করতে পারবে না। এজন্য সত্যদর্শন অলভ্য। যিশু বলেছেন যে একমাত্র পবিত্র হৃদয়ে প্রভু দেখা দেন। পবিত্রের অর্থ বিশুদ্ধ সমরূপ ও এক। মন তখনই পবিত্র হবে যখনই মন একটি মাত্র বস্তুতে মগ্ন থাকবে। আমরা মন বলতে বুঝি—বাসনার পুটলি, বাসনায় ভর্তি। স্বার্থপূর্ণ বাসনা থেকে মুক্ত হলেই পরমাত্মার বা শুদ্ধ আত্মার দর্শন হবে। শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ আত্মা এক—কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং তুমি যদি ঈশ্বর-দর্শন করতে চাও, তাহলে একমাত্র পথ নির্বাসনা হওয়া। যিশু বলেছেন ঃ "যখন তোমার চক্ষু এক হবে, তখন তোমার দেহ হবে আলোময়।"

অবশ্য, মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করার বিভিন্ন উপায় আছে। কিন্তু এই পথগুলিও যান্ত্রিক। তোমার হৃদয় ভক্তিতে সংপৃক্ত হলেই মন হবে ঈশ্বরমুখী। কারণ, যা তুমি ভালোবাস, তাই চিন্তা করবে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মানুষই প্রেমময় ঈশ্বর। প্রত্যেক মানুষ ভালোবাসে শাশ্বত জীবন, সর্বজ্ঞান, সর্ব আনন্দ। আর এইটি হলো ঈশ্বর। কিন্তু কম লোকই জানে যে তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসছে। যেমন নাকি, কেউ সারাজীবন ধরে আমের কথা শুনেছে, কিন্তু কখনও দেখেনি। এমনকি আম খেয়েও জানতে পারে না যতক্ষণ না কেউ বলে দেয় যে এটি আম। সুতরাং সব মানুষই প্রেমময় ঈশ্বর। কিন্তু যতক্ষণ কেউ না এসে তাকে বলে, তাহলে সে জানতে পারে না। যাই হোক, যখন তুমি অনুভব করবে যে ঈশ্বর, যাঁকে তুমি চাচ্ছ—তিনি সর্বব্যাপী তখন তাঁকে ভালোবাসতে অসুবিধা হবে না। তোমার চিন্তাধারা স্বতই তাঁর প্রতি ধাবিত হবে এবং সহজেই ধ্যান হবে।

('The Message of the East' হতে সংকলিত,
বেদান্ত কেশরী, ভলিউম তিন, সংখ্যা দুই, জুন ১৯১৬, পৃঃ ৬৮-৬৯)

পূর্ণত্বের পথ

আমাদের প্রত্যেক কর্মোদ্যোগই কোন অভাবজাত এবং এই সচেতন কর্মশীলতাই জীবন বা প্রাণশক্তি নামে পরিচিত। কর্মশীলতা সচেতন হইলেই আমরা তাহাকে প্রাণ বা জীবন বলি, কিন্তু বাষ্পীয় যান ও যন্ত্রের ন্যায় অচেতন হইলে উহাকে প্রাণশক্তি বলিয়া গণ্য করি না। আর প্রত্যেক কর্মশীলতাই কোন না কোন অভাব প্রণোদিত। কিসে আমাকে কর্মশীল করিয়াছে?—কোন বস্তুলাভের বাসনা। কেন তোমরা এখানে আসিয়াছ?—কারণ তোমরা ভাবিয়াছ যে এখানে কোন প্রকার জ্ঞান বা সাহায্য লাভ করিবে। কিছু লাভ বা উপলব্ধি করিবার আশা না থাকিলে আমরা এক পদও অগ্রসর হই না। প্রত্যেক কর্মোদ্যমের পূর্বে চঞ্চলতা বর্তমান থাকে এবং অভাব হইতেই এই চঞ্চলতার উদ্ভব। যতক্ষণ সেই চঞ্চলতা তোমার মধ্যে আছে ততক্ষণ তোমায় কর্মশীল হইতেই হইবে, তুমি তোমার আন্তরিক অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেই।

কিন্তু বাস্তবিক কি মানুষের কোন অভাব আছে? শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহান নরদেব এবং যিশুখ্রিস্ট ও বুদ্ধের ন্যায় অবতারগণ অন্যরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদের মানব সংজ্ঞা অতি অদ্ভুত। তাঁহারা বলেন, মানব জন্মমৃত্যুরহিত, অভাবশূন্য, আনন্দময়, স্বয়ম্ভূ ও স্বয়ংপ্রকাশ। এমন কি শিবের ত্রিশূলেরও তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার শক্তি নাই—সে স্বভাবত নিত্য ও অবিনশ্বর। ইহাই যদি মানবের সংজ্ঞা হয় তবে আমি কি? আমিও মানব নামে অভিহিত, কিন্তু আমি মাত্র সার্ধত্রিহস্ত দীর্ঘ, আমি জন্মগ্রহণ করি, মৃত্যুমুখে পতিত হই, আমার বহু অভাব আছে! দীনতম শ্রমজীবী হইতে শ্রেষ্ঠ সম্রাট পর্যন্ত এমন একজনকেও কি দেখাইতে পার যে অভাবে পরিপূর্ণ নহে? মানুষ বাস্তবিকই অভাবগ্রস্ত জীব। যে মুহূর্তে শিশু মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় সেই মুহূর্তেই সে ক্রন্দন করে। কেন? কারণ সে অভাবগ্রস্ত। মানুষ জন্মে অভাবের মধ্যে, প্রাণধারণ করে অভাবের মধ্যে এবং অভাবেই সে মরে। অভাব হইতেই তাহার উদ্ভব, অভাবেই তাহার স্থিতি এবং অভাব হইতেই তাহার মৃত্যু।

তাহা হইলে ঐ দুই প্রকার মানবের মধ্যে কি সম্বন্ধ? কিরূপে একটি অপরটির সমান হইতে পারে? কিরূপে একটি অন্যটির সহিত একীভূত হইতে

পারে? একটি সমস্ত অভাব ভীতি ও জন্ম মৃত্যুর অতীত, আর অপরটি সর্বপ্রকার ভীতি ও বাসনা পরিপূর্ণ এবং জন্মমৃত্যুর অধীন। দৃষ্টতঃ দুই বিপরীত মেরুস্থিত এই দুই শ্রেণির মানবের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকা কিরূপে সম্ভব? তথাপি কিন্তু উহাদের সম্বন্ধ আছে। এই যে জন্ম মৃত্যু বিশিষ্ট মানব, এই শান্ত ও পরিচ্ছিন্ন মানবই তাহার অনন্ত স্বরূপ নির্দেশ করিতেছে। মানুষ সতত চঞ্চল, সর্বদা স্থান হইতে স্থানান্তরে গতিশীল। কেন? কারণ সে কখনও সন্তুষ্ট নহে; কারণ—কিছুই তাহাকে নিত্য সন্তোষ দিতে পারে না। আর সে যে তাহার সান্ত স্বভাবে সন্তুষ্ট নহে তাহাতেই বোঝা যায় যে, উহা তাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। তাহার অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অদমনীয় ক্ষুধা থাকাতেই প্রমাণিত হয় যে সে স্বরূপত অনন্ত এবং সেই জন্যই যাহা কিছু সান্ত তাহাতে সে সর্বদা অপরিতৃপ্ত। যে কোন ব্যক্তির নিকট যাও, দেখিবে যে সে তাহার সসীম অবস্থায় অতৃপ্ত। তোমাদের মধ্যে একজনও প্রকৃতপক্ষে পরিতুষ্ট নও। তুমি হয়তো বলিতে পার যে তুমি তোমার মাসিক এক শতটাকায় তুষ্ট, কিন্তু উহা আলস্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আলস্যকে সন্তোষ বলিয়া ভুল বুঝিও না। প্রকৃত সন্তোষ কি তাহা নচিকেতা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। যমরাজ তাঁহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য, বিশাল রাজ্য ও সুন্দরী রমণী দিতে চাহিলেন। কিন্তু নচিকেতা জানিতেন যে একমাত্র সত্যই তাঁহাকে সুখী করিবে—তিনি অন্য কিছুই কামনা করেন নাই; কিন্তু যদি কেহ তোমাকে একশতের পরিবর্তে দুইশত টাকা দিতে চাহেন তবে কি তুমি তাহা গ্রহণ করিবে না? ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে তোমার বর্তমান অবস্থায় তুমি সন্তুষ্ট নও। যদি তুমি আত্মবিশ্লেষণ কর তাহা হইলে দেখিবে যে তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। কখন তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ হইবে? যখন তুমি বলিতে পারিবে, "আমি সকলের প্রভু, সমগ্র বিশ্ব আমার অধীন, আমার কোন অভাব নাই, আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছি, আমার কোন দায়িত্ব নাই।" যতক্ষণ না এই ভাব আসিবে ততক্ষণ তোমার উচ্চাভিলাষ তোমায় ত্যাগ করিবে না। তুমি সসীমতা হইতে মুক্ত হইতে চাও, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি বলিতে পার যে, তুমি সীমাহীন, মৃত্যুশূন্য ও অবিনশ্বর ততক্ষণ তুমি শান্ত হইতে পারিবে না।

ইহাকেই বলে মুক্তি বা মোক্ষ। অতএব এই ক্ষুদ্র মানব, সেই মহামানব সেই অনন্ত পুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া বোধ হইলেও যে পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র মানব সেই অনন্ত পুরুষের সহিত একীভূত না হয়, সে পর্যন্ত সে কখনই স্থির ও শান্ত হইবে না; ইহাতেই বোঝা যায় যে, অনন্তই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। যদি

তুমি একটি মৎস্য লইয়া উহাকে ভারত সম্রাট সাজাহানের ময়ূর সিংহাসনে বসাও এবং তাহাকে প্রণাম ও পূজা কর তাহা হইলে সে কি সুখী হইবে? তাহা নহে বরং সে বলিবে, "আমায় বরং একটি মলকুণ্ডে নিক্ষেপ কর তবু যেন জলের বাহিরে রাখিও না।" কারণ, জলই (অপ) তাহার স্বাভাবিক আলয় তুমিও ঠিক ঐভাবেই তোমার নষ্ট স্বরূপের জন্য অস্থির।

এমন কেহই নাই যে চঞ্চল নহে। কিসের জন্য চঞ্চল?—তাহার নষ্টস্বভাব, তাহার অনন্ত স্বরূপ ফিরিয়া পাইবার জন্য। যে ব্যক্তি তাহার বর্তমান (সসীম) অবস্থায় অতৃপ্ত সেই ধন্য, যে তাহাতে পরিতৃপ্ত সে মহা হতভাগ্য। ঐরূপ পরিতৃপ্ত ব্যক্তি মনুষ্য নামের যোগ্য নহে—সে পশুতুল্য; তুমি একটি হস্তীকে সারা জীবন বদ্ধ রাখিতে পার, কিছু আহার পাইলেই সে নিশ্চিন্ত। যাহারা ঐরূপে পরিতৃপ্ত তাহারা পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে? নীচ পশুর ন্যায় আমাদেরও আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন আছে; সুতরাং যদি আমরা উহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু না করিতে পারি তবে পশু হইতে আমাদের পার্থক্য কোথায়?

যেখানে অসন্তোষ সেইখানেই জানিবে মহত্ত্বের বীজ নিহিত আছে। যে কোন মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিলে দেখিবে তিনি সতত কিরূপ কর্মশীল ও চঞ্চল ছিলেন—সর্বদা অধিকতর বস্তু লাভের জন্য সচেষ্ট। আর যে সকল আরামপ্রিয় লোকের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহারা কুলি হইবার জন্য নির্ধারিত। ইহারা ঠিক কলুর বলদের ন্যায় সমস্তদিন ঘানির চারিদিকে ঘুরে, কখনো নির্দিষ্ট পথরেখা পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই সকল ব্যক্তি যখন বিদ্যালয়ে ছিল তখন তাহারা শিক্ষায় যত্নবান ছিল না—নিজ নিজ শ্রেণির সর্বনিম্নপ্রান্তে থাকিয়াই সন্তুষ্ট ছিল; আর উহাদের সহিত কতকগুলি ছিল শিক্ষার জন্য ব্যাকুল ও উচ্চাভিলাষী—তাহারাই এখন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বর্তমানে গণ্যমান্য ব্যক্তি। মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ কর, দেখিবে তাহারা ব্যাকুল ও চঞ্চল ছিলেন বলিয়াই মহৎ হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রম বিমুখ হইও না।

কখনও অল্পে সন্তুষ্ট থাকিও না। তুমি অসীম, তুমি পূর্ণ এবং যতক্ষণ না তুমি তোমার অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করিবে ততক্ষণ ক্ষান্ত হইও না। মনে করিও না তোমার বুদ্ধিশক্তি সীমা বিশিষ্ট—সক্রেটিসের মস্তিষ্ক, নিউটনের ধীশক্তি তোমার ভিতরে বর্তমান। কেবল ধূলি ও আবর্জনায় তাহা তুমি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ। ধৌত কর সেই ধূলিরাশি, জাগ্রত কর তোমার উচ্চাভিলাষ, উত্তেজিত কর তোমার কর্মশক্তিকে, আর স্মরণ রাখিও যে অনন্ত শক্তি তোমার

ভিতরে সুপ্ত আছে। তুমি সীমাবদ্ধ নও—কখনোই না। যে সকল বরেণ্য সাধুপুরুষ জগদীশ্বর হইতে স্থান ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন তাঁহাদের মতোই তুমি সীমাহীন—অনন্ত।

আমাদের শাস্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, কোন ব্যক্তিকে পাপী বলাই সর্বাপেক্ষা মহাপাপ। যখনই তুমি নিজেকে পাপী ও দুর্বল মনে কর তখনই তুমি তোমার অনন্ত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া দেহ ও মনের সহিত তোমার একত্ব ও তাদাত্ম্য স্থাপন কর। দেহ ও মনের সহিত আত্মার এই একত্ব জ্ঞানই, এই অধ্যাসই সকল দুঃখের মূল। যদি তোমার অনন্ত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চাও তবে তোমার শান্ত স্বভাবের সহিত সকল সংস্রব দূর কর, তোমার দেহ ও মন ভুলিয়া যাও। তোমার আত্মাকে দেহ ও মন হইতে বিচ্ছিন্ন কর। বস্তুত তুমি সর্বদাই উহা করিতেছ। তুমি কি সর্বদা ভাব "আমি দীর্ঘ বা খর্ব, আমি কৃষ্ণ বা গৌরবর্ণ, আমি ক্ষীণ বা স্থূল?" কেবল যখন দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হও তখন ঐ সকল ভাব তোমার মনে উদিত হয়। স্বাস্থ্য কাহাকে বলে? যখন মানুষের স্মরণ থাকে না যে সে দেহবিশিষ্ট, তখনই সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। শিরঃপীড়া হইলেই তোমার স্মরণ হয় তোমার একটি মস্তক আছে। পায়ে যখন ব্যথা হয় তখনই তোমার মনে হয় যে তোমার পা আছে। তুমি চৈতন্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ। দেহবুদ্ধি তোমাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও তোমাকে উহা (দেহ) বিস্মৃত হইতেই হইবে। যখন তুমি কোন সুন্দর দৃশ্য বা সুমধুর সঙ্গীত উপভোগ কর, তখন তুমি দেহ ভুলিয়া যাও; অর্থাৎ সেই সময়ের জন্য তুমি দেহাতীত হও। ইহাই তোমার সত্যস্বরূপ এবং সেইজন্যই তুমি সে সময় সুখী। যখন তুমি শান্ত স্থির চিন্তামগ্ন তখন তুমি দেহ বিস্মৃত হও। আর যখন হঠাৎ কিছু আসিয়া তোমার সেই অবস্থার প্রতিবন্ধক হয়, তখন তুমি উহাকে যাতনা বল।

চিন্তা আনন্দে লয় হয়, যখন তুমি চিন্তারত, যখন তোমার কোন দেহ-জ্ঞান থাকে না, তখন তুমি কোথায় অবস্থান কর? তখন তুমি দেহের বাইরে মনের বাহিরে বর্তমান এবং উহাই আনন্দাবস্থা। আনন্দই তোমার প্রকৃতস্বরূপ, সেইজন্য তুমি আনন্দ ভালোবাস। মানুষ সর্বদা সুখের জন্য অস্থির—অস্থির, কারণ, কোন না কোন দুঃখ তাহাকে কষ্ট দিতেছে। মানুষ অবিরত আনন্দ অন্বেষণ করিতেছে এবং সে কেবল তাহার নষ্ট আনন্দ পুনরায় লাভ করিবার জন্যই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ও দেশ হইতে দেশান্তরে ছুটিয়া বেড়ায়। আনন্দের জন্য এই অন্বেষণ ও ভগবদন্বেষণ একই; কারণ ভগবান ও আনন্দ অভিন্ন ও একার্থবোধক। সেই

জন্যই বলা হয় "মূর্খে বলে তাহার অন্তরে ভগবান নাই কারণ ভগবান হইতেই সমস্ত সুখের উদ্ভব, যে কেহ সুখ অন্বেষণ করে সে তাঁহাকেই অন্বেষণ করে। আনন্দই আমাদের ভগবৎ সংজ্ঞা। এমন কোন নাস্তিক নাই যে আনন্দ চায় না, সেই আনন্দই ভগবান। আনন্দ হইতেই নিখিল সৃষ্টির উদ্ভব, আনন্দেই উহার স্থিতি, আনন্দেই উহার বিলয়। ভগবান হইতে আমরা ও সমগ্র বিশ্ব উদ্ভূত; আমরা তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছি, আবার তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইব।" সুতরাং আনন্দ ও ভগবান একই। অতএব কেহই বলিতে পারে না যে সে নাস্তিক; কারণ প্রত্যেকেই আনন্দে বিশ্বাস করে। আর সেই আনন্দই তো ভগবান। বাস্তবিক প্রত্যেক মনুষ্যই সুখ খুঁজিতেছে। কোন্ সুখ তুমি চাও? যে সুখের কদাপি বিরাম নাই। তুমি তৃপ্তি চাও সেইজন্য ক্ষণিক পার্থিব সুখ গ্রহণ করিতে চাও, কারণ উহা তোমাকে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি দান করে; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখই তোমার আদর্শ।

যে আনন্দের বিরাম নাই তাহাই ভগবান নামে অভিহিত, আর যে সুখের অন্ত আছে তাহার নাম ইন্দ্রিয় সুখ। তোমার ক্ষণিক তৃপ্তি বিধানে সমর্থ এই সসীম সুখে তুমি ক্ষণকালের জন্য তুষ্ট হইতে পার, কিন্তু অক্ষয় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই তোমার আদর্শ। উহা তোমাকে অনুভব করিতে হইবে। যে ব্যক্তি দ্রুত আহার শেষ করিয়া কর্মস্থানে ছুটিতেছে ও সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিতেছে সে আনন্দেরই অন্বেষণ করিতেছে। আর ঐ যে ব্যক্তি নির্জনে উপবেশন করিয়া মনঃ সংযম করিতেছেন এবং তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিবার ও স্বীয় অন্তরে ভগবদ্দর্শন লাভের চেষ্টা করিতেছেন, উনিও সেই আনন্দের জন্য ব্যাকুল।

এক্ষণে ঐ প্রণালী দুইটি বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রথমোক্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে অর্থের জন্য ব্যগ্র। কারণ, উহা তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আহার স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ প্রদান করিবে। অতএব সে অর্থ ও শক্তি অর্জনের চেষ্টা করিবে। সে ভাবে সে শক্তির সাহায্যে সে প্রকৃতিকে তাহার সকল অভাব পূরণ করিবার জন্য বাধ্য করিবে। কিন্তু ঐ প্রণালী অতি অনিশ্চিত। সে অর্থলাভ করিতে পারে। কিন্তু তদুৎপন্ন আহার বা স্বাচ্ছন্দ্য সে জীর্ণ বা উপভোগ করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। আমি কলকাতার এক লক্ষপতিকে জানিতাম। তিনি মাত্র বার্লি জল পরিপাক করিতে পারিতেন। সুতরাং ভোগ হিসাবে তাঁহার হীনতম ভৃত্যের তুল্যও তিনি ভাগ্যবান ছিলেন না। তাহার পর অর্থ থাকিলেই

বা ঐ ব্যক্তি কতকাল তাহা ভোগ করিতে সমর্থ হইবে?—কেবল যতদিন তাহার দেহ থাকে। আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীতে জীবনের ন্যায় অনিশ্চিত আর কিছুই নাই। দোলনার শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র সকলেরই নিকট যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু আসিতে পারে। যখন আমরা আমাদিগকে দেহ হইতে অভিন্ন জ্ঞানে মনে করি যে দেহ বা মনের সন্তোষ আমাদের প্রকৃত সন্তোষ, তখন আমরা বুঝিতে পারি সুখ কিরূপ ক্ষয়শীল।

প্রত্যেক ব্যক্তিই বহুবিধ বিকারের অধীন। গর্ভে শিশু ছিল, তাই শিশুর আবির্ভাব। যখন তাহার জন্ম হইয়াছে তখন অবশ্যই তাহার আকার বৃদ্ধি ও সর্বপ্রকারে পরিবর্তন হইবে। সে ক্রমে বালক, যুবা ও বৃদ্ধ হইবে। তারপর? ক্রমশ ক্ষয়, চক্ষুদ্বয় শক্তিহীন হইবে; কর্ণদ্বয় আর শুনিবে না, হস্তপদ নিষ্ক্রিয় ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইবে। ইহাই প্রত্যেক প্রাণীর জীবনেতিহাস। যে জীব এরূপ দেহবদ্ধ, যাহার মন এরূপ সংশয়পূর্ণ সে কিরূপে অনন্ত জীবন আশা করিতে পারে?

তথাপি কেহই মরিতে চাহে না। মানুষের নিকট মৃত্যুর ন্যায় ঘৃণ্য আর কিছুই নাই। অতএব এই বর্তমান জীবনই যদি আমাদের একমাত্র জীবন হয়, তাহা হইলে মানুষ তো মৃত্যুর হস্ত হইতে কখনোই নিস্তার পাইবে না, সুতরাং সে তো সুখী হইবার আশা করিতে পারে না। কিন্তু জীবনের সংজ্ঞা কি? জীবন অর্থে অস্তিত্ব বা সত্তা এবং মৃত্যু অর্থে অনস্তিত্ব বা অসত্তা বোঝায়। আমরা কিন্তু জানি যে অস্তিত্ব হইতে অনস্তিত্বের উদ্ভব অসম্ভব, যাহা সৎ তাহা অসৎ হইতে পারে না। সুতরাং জীবন কখনও মৃত্যুরূপে বা মৃত্যু কখনও জীবনরূপে পরিবর্তিত বা বিকারপ্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব মানুষ যখন জীবন-বিশিষ্ট তখন সে মরিতে পারে না। কিন্তু যে জীবন কখনও মৃত্যুরূপ বিকারপ্রাপ্ত হইবে না, সে জীবন মানুষ কোথায় পাইতে পারে? সে জীবনের সন্ধানে তাহাকে দেহ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে এবং যদি সে দেহের অতীতে যাইতে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় হইতে পারে, তবে সে অবশ্যই সমগ্র বিশ্বের অতীত হইবে, কারণ তোমার এই ক্ষণভঙ্গুর আকারেও সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্ব বর্তমান। তোমার নয়নে সমস্ত রূপজগৎ, শ্রবণে সমস্ত শব্দজগৎ এবং রসনায় সমগ্র রসজগৎ অবস্থিত।

নিদ্রা ব্যাপারটি হইতে উহা সহজেই প্রমাণিত হয়। যতক্ষণ চক্ষুদ্বয় দর্শন করে ততক্ষণ তোমার নিকট রূপের অস্তিত্ব, যতক্ষণ নাসিকা আঘ্রাণ লয়, ততক্ষণ তোমার নিকট গন্ধের অস্তিত্ব, যতক্ষণ কর্ণদ্বয় শ্রবণ করে ততক্ষণ

শব্দের অস্তিত্ব, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই এইরূপ। যখন তুমি তোমার চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থিত তখন তোমার জাগ্রত-অবস্থা। তারপর একটি চিন্তাময়ী অবস্থা আছে, তখন তুমি মনোমধ্যে অবস্থিত। কিন্তু আরও একটি অবস্থা আছে—যখন তুমি ইন্দ্রিয়গণের বাহিরে ও মনোরাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাও সেই অবস্থার নামই সুষুপ্তি। তখন কোন বন্ধু তোমার পার্শ্বে বসিয়া মধুর স্বরে সঙ্গীত করিলেও তুমি তাহা শুনিতে পাইবে না, কারণ তুমি তখন তোমার কর্ণে অবস্থিত নও। তুমি তোমার দেহে বর্তমান বটে, কিন্তু কর্ণ বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত তোমার সংযোগ নাই। তুমি কিন্তু সে সময় মন বা ইন্দ্রিয়গুলির অতীত হইলেও দেহের মধ্যেই অবস্থিত; কারণ তখন তোমায় সজোরে আঘাত করিলে তুমি জাগ্রত হও। এই জাগরণের অর্থ কি? ইহার অর্থ, মনে বা ইন্দ্রিয়ে তোমার প্রত্যাবর্তন। যখন তুমি নিদ্রিত ছিলে তোমার স্ত্রী তোমার পার্শ্বে ছিল, কিন্তু তুমি তাহা জানিতে পার নাই। তোমার চতুর্দিকস্থ সমগ্র বস্তু ও নিখিল বিশ্বের সহিতও তোমার ঠিক ঐ ভাব হইয়াছিল। অতএব বিশ্বের অস্তিত্ব এই মন ও এই ইন্দ্রিয়গ্রামে তোমার অবস্থিতির উপরই নির্ভর করিতেছে। যখন তুমি নিদ্রিত ছিলে তখন কি তোমার নিকট কোন বিশ্বের বা স্মৃতির অস্তিত্ব ছিল? না। সুতরাং এই দেহ নিঃসন্দেহরূপে ক্ষণভঙ্গুর হইলেও ইহাই সমগ্র বিশ্বের অবলম্বন। সেই জন্য বিশ্বাতীত হইতে হইলে আমাদিগকে মন ও ইন্দ্রিয় অতিক্রম করিতে হইবে। তাহা হইলেই অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়া যায়। এইভাবেই তোমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের অনন্ত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদিগকে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মনকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তুমি যদি তাহা করিতে পার তবে তৎক্ষণাৎ অনন্ত জীবন উপলব্ধি করিবে এবং বিশুদ্ধ কেবলানন্দের অধিকারী হইবে—ইহাই মোক্ষ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে একটি উপায় তোমাদিগকে বিপথে এবং অপরটি গন্তব্যস্থানে লইয়া যায়। অর্থোপার্জনরূপ যে উপায়টি তোমরা অনুসরণ করিতেছ তাহা মিথ্যা, কারণ উহাতে তোমরা একমাত্র দেহ দেবতারই সেবা ও পূজা করিতেছ। এবং এই দেবতাকে পূজা কর বলিয়াই তোমরা তোমাদের স্ত্রী, উত্তম খাদ্য, সুন্দর দৃশ্য ও মধুর শব্দ প্রভৃতি ভালোবাস। আর তোমরা কোন প্রভুর সেবা করিলে পারিশ্রমিক আশা করিয়া থাক। কিন্তু এই দেহ দেবতার সেবা করিয়া কি পাও? যাহা তোমরা অত্যন্ত ঘৃণা কর—সেই মৃত্যুতেই উহা তোমাদিগকে লইয়া যায়। বহুজন্ম ধরিয়া তোমরা এই দেবতার সেবা করিতেছ। আর প্রত্যেকবার মৃত্যুরূপ পুরস্কার লাভ করিয়াছ। অতএব ইহা নিশ্চয়ই ঠিক

সেবা নহে। যদি প্রকৃত পুরস্কারের জন্য যথার্থ সেবা করিতে চাও তবে সত্য দেবতার সেবা কর। তাহা হইলে অনন্ত জীবন পাইবে।

সেবার পথ অন্তর্মুখী, বহির্মুখী নহে। অন্তর্গামী কর্মশক্তি সমূহের অনুশীলন বা নিয়োগই অনন্ত জীবন উপলব্ধি করিবার উপায়। তোমাকে তোমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে। তাহা না পারিলে তুমি নিচ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ। প্রকৃত জীবন অন্তরে—বাহিরে নহে। কিন্তু তাহা লাভ করিতে হইলে তোমায় কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। কত জন্ম তুমি এই দেহ দেবতার সেবা করিতেছ, হঠাৎ প্রকৃত দেবতার পূজা আরম্ভ করা সহজ নহে। নিজের মন জয় করা অপেক্ষা সমগ্র পৃথিবী জয় করা সহজ। সেই জন্যই অর্জুনের ন্যায় মহাযোদ্ধাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, তিনি বহু রাজ্য জয় করিলেও স্বীয় মন জয় করিতে অক্ষম। কেন? অর্জুন যে বীর ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে কখনও কার্য করেন নাই বলিয়া নিজেকে অক্ষম ভাবিয়াছিলেন; আমরা এ বিষয়ে অর্জুনের তুল্য। কিন্তু এই জীবনে তোমার অনন্ত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তোমাকে এই পথই অবলম্বন করিতে হইবে—"নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে সর্বাপেক্ষা সুখী ধনী ও ক্ষমতাশালী হইবার উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন কিসের প্রয়োজন? ইচ্ছা। যদি এই পথ অনুসরণ করিবার ইচ্ছা না থাকে তবে উহা জানা বৃথা। কিরূপে সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিতে হয় তাহা তুমি জানিতে পার, কিন্তু যদি পাকশালায় গিয়া তাহা প্রস্তুত না কর তবে তোমার জ্ঞান নিষ্ফল। এই পথ অন্তর্বর্তী কেবলমাত্র সেই জ্ঞান দ্বারা তোমার কোন সাহায্য হইবে না। তোমার বিশেষ চেষ্টা দ্বারা সেই অন্তরে যাইতে হইবে। অতএব ধর্ম জিনিসটা সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠানমূলক (Practical)। তর্ক বা বিচারের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। তোমার নির্দিষ্ট পথটার অনুসরণেচ্ছা জন্মিবার পূর্ব পর্যন্ত উহাদের আবশ্যকতা থাকিতে পারে মাত্র। তুমি অজ্ঞতম হইতে পার, কিন্তু তথাপি যদি তোমার ভগবানের নিকট যাইবার প্রবল বাসনা থাকে তবে কোনরূপ বিদ্যা না থাকিলেও তুমি তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পার। তখন মহাশিক্ষিত ব্যক্তিগণও আসিয়া তোমার পাদমূলে উপবেশন করিবেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় নিরক্ষর ছিলেন, তথাপি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সংশয় দূর করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন। ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার তীব্র বাসনা ছিল এবং

তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এ বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য করিতে সক্ষম হইতেন। 'কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ ও পরীক্ষায় কৃতকার্যতার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়' তাহার জীবনী এই ধারণাটির জ্বলন্ত প্রতিবাদ স্বরূপ। জ্ঞান সম্বন্ধে উহা খুবই হীন ধারণা। তোমার জীবনব্যাপী চেষ্টার পরও প্রকৃতপক্ষে তোমার কিছুই জ্ঞান হয় না। সক্রেটিস বিজ্ঞতম ব্যক্তি ছিলেন, কারণ তাহার জানা ছিল যে তিনি কিছুই জানিতেন না।

এরূপ মহাপুরুষ যে কেবল নিজে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন তাহা নহে, অপরকেও প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ বাল্যকালে ক্রমাগত এমন এক ব্যক্তির অন্বেষণ করিতেন যিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিতে পারেন। তিনি বলিতেন, প্রত্যক্ষ না করিলে ভগবানের অস্তিত্বে কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? যখনই তিনি কোন বড় সাধু বা ধর্মোপদেষ্টার নাম শুনিতেন তখনই তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—"ভগবান কি আছেন?" উত্তর হইত "হ্যাঁ"। তৎপরে তিনি প্রশ্ন করিতেন, "আপনি কি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?" এবং "না" উত্তর পাইয়া সেস্থান ত্যাগ করিতেন। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিতে পারেন এমন কোন লোক তিনি কোথাও পান নাই, সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ভগবান কাল্পনিক বস্তু। তৎপরে একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরের সেই ধর্মগুরু, সেই নিরক্ষর মহাসাধুর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি ভগবানকে দেখিয়াছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "হাঁ"। "আমায় দেখাইতে পারেন?" ভগবান তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন "পারি।" অবশেষে স্বামীজী তৃপ্ত হন এবং এই জন্যই তিনি তাঁহার সমস্ত পুস্তকে বার বার বলিয়াছেন যে, ধর্ম অনুভূতির বস্তু। বাস্তবিক ধর্ম সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধির বিষয়।

ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এবং উহা যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষ। বহুজন্ম ধরিয়া মিথ্যা দেবতার সেবা করিয়া যে সকল সংস্কার রাশি সংগ্রহ করিয়াছ প্রথমে সেগুলিকে দমন করিতে হইবে—মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে জয় করিতে হইবে। যিশুখ্রিস্টের মতো এই দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্রুশবিদ্ধ করিতে না পারিলে তোমার উন্নতির অর্থাৎ এই নির্জীব দেহ হইতে নিজেকে উত্থিত করিবার আশা নাই। যদি আপনাকে উন্নত করিতে চাও তবে দেহ ক্রুশবিদ্ধ ও ইন্দ্রিয় জয় কর। ইহা প্রত্যেককেই করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইহার উৎকৃষ্ট উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইন্দ্রিয় জয় করিতে চাও তো ভগবানকে

পূর্ণতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। তুমি সৌন্দর্যের অনুরাগী। কিন্তু ভগবানে যে অনন্ত সৌন্দর্য বর্তমান তাহা তুমি কোথায় পাইবে? তুমি বাগ্মিতা প্রিয়, কিন্তু যে ভগবান হইতে সমগ্র বেদের উদ্ভব তাঁহার অপেক্ষা বাগ্মী আর কে আছেন? তুমি শক্তিকামী, কিন্তু ভগবানের ন্যায় শক্তিশালী কে? মনুষ্য মাত্রেই এইগুলির কোনটি ভালোবাসে এবং ভগবানে সমস্তগুলিই অসীম পরিমাণে বর্তমান। তুমি হয়তো কোন সুন্দরী রমণীকে ভালোবাসো, তাঁহার রূপ তো ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ভগবানের সৌন্দর্য নিত্য। অতএব যদি অক্ষয় সৌন্দর্য অবিনশ্বর জীবন, অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান লাভ করিতে চাও তবে ভগবানের নিকট চাও। তাঁহার নিকট যাইতে হইলে অর্থের কোন প্রয়োজন নাই—তোমায় কোন টিকিট কিনিতে হইবে না। তাঁহার নিকট গমন করিবার জন্য তোমার পদের, তাঁহাকে দর্শনের জন্য তোমার চক্ষুর এবং তাঁহার বাণী শ্রবণের জন্য তোমার কর্ণের কোনও প্রয়োজন নাই। তিনি তোমার অন্তরে, তথায় পৌঁছিতে হইলে তোমায় সকল দ্বার রুদ্ধ করিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিতে হইলে তোমার চক্ষু মুদ্রিত, তাঁহার বাণী শুনিতে হইলে কর্ণরুদ্ধ এবং তাঁহার নিকট যাইতে হইলে বাহ্য কর্মশীলতা ত্যাগ করিতে হইবে।

অতএব এই ইঙ্গিত ও নির্দেশ অবলম্বনে স্বীয় অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভগবানকে উপলব্ধি কর—তবেই তুমি প্রকৃত মানুষ হইবে। কিন্তু ইহার জন্য চাই তোমার প্রবল ও তীব্র বাসনা। যদি তুমি একবার ভগবানের সহিত তোমার সম্বন্ধ অনুভব করিতে পার, যদি উপলব্ধি করিতে পার যে তিনিই তোমার প্রকৃত পিতামাতা ও অকৃত্রিম বন্ধু ও সহচর এবং যদি তাঁহার নিকট গমন করিতে পার, তাহা হইলে অনন্ত পুরস্কার লাভ করিবে, তোমার যত্ন ও প্রতিপালনের জন্য তিনি এমন কি তোমার ভৃত্য স্বরূপ হইবেন। অতএব যদি বাতুল না হও তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই তাহাতে মনে প্রাণে অনুরাগী হইবে, কারণ কেবল তাঁহার নিকট হইতেই তুমি পূর্ণ আনন্দ ও পরাজ্ঞান লাভ করিবে।

(উদ্বোধন,২৫ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃঃ ৩৮৯-৪০১;
কেশবচন্দ্র নাগ কর্তৃক ইংরেজি হইতে অনূদিত)

ঈশ্বরের ও বিষয়ের সেবা এক সঙ্গে হয় না

হৃদয়ে যথার্থ ভগবৎ প্রেমের বিকাশ না হইলে কেহ ধার্মিক হইতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি টান যখন সাংসারিক আকর্ষণের অপেক্ষা প্রবল হয় তখনই হয় ধর্মের আরম্ভ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, দেহের ভিতর দুইটি চুম্বক পাথর রহিয়াছে—একটি নিচে, অপরটি উপরে। আর মাঝখানে মন যেন এক টুকরো লোহা। নিচের পাথরটির আকর্ষণ প্রবল হইলে মনকে নিচের দিকে টানিয়া আনে—আর উপরের পাথরটি যদি অধিকতর শক্তিশালী হয় তাহা হইলে উহা মনকে টানিয়া উপরে তোলে। বেশির ভাগ লোকেরই ঐ নিচের পাথরটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তাই সহজেই মনকে নিচে টানিয়া রাখে—আর উপরের পাথরটি তমোগুণে আচ্ছন্ন অর্থাৎ অজ্ঞান ও অশুচিতায় ধূলি ধূসরিত, তাই ইহার আকর্ষণী শক্তিও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। ঐ তমোগুণের ধুলাবালি ঝাড়িয়া ফেল, দেখিবে মন স্বতই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। বিষয়ী লোকেদের সকলেরই মনের গতি ইন্দ্রিয় ভোগ্য সুখ ও সাংসারিকতার প্রতি। নিচের চুম্বক পাথরের আকর্ষণ শিথিল হইলে বুঝিতে হইবে অপর কোন প্রবলতর শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। একমাত্র ঈশ্বরই সেই প্রবলতর শক্তি। ঈশ্বরোন্মুখ এই আকর্ষণের নামই ধর্ম। কাজেই যাহার প্রাণে প্রবল ভগবৎ প্রেমের উদ্রেক হয় নাই, যথার্থ ধর্মজীবন তাহার পক্ষে আরম্ভই হইতে পারে না। এই দুই আকর্ষণকে কিন্তু মিলিত করা যায় না। যেমন আলো ও অন্ধকারের একত্রীকরণ সম্ভবপর নয়, তেমনি ভগবান ও বিষয়ের ভজনা একসঙ্গে হয় না। পার্থিব আকর্ষণ অহমিকার নামান্তর পক্ষান্তরে ঈশ্বরানুরাগ অর্থে ভগবানে আত্মসমর্পণ। 'অহং' 'অহং' ভাব থাকা মানেই বুঝিতে হইবে যে মানুষ পার্থিব বন্ধনের দাস। পার্থিব বলিতে কি বোঝায়? বোঝায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ, ধনৈশ্বর্য, নাম ও যশ। বিষয় বস্তু নিয়তই আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িয়া আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে এবং আমরা বলিয়া উঠি "আমি ইহা চাই উহা চাই"। কিন্তু আরও হয়তো এমন শত শত ব্যক্তি রহিয়াছে যাহারা ঐ একই জিনিস চায়, কাজেই আমরা উহার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করি। এইরূপে আসে প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামের সূচনা। এই সংগ্রাম হইতে 'আমার' অধিকার, 'আমার' সম্পত্তি, 'আমার' সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি

ক্রমবর্ধমান স্বার্থবুদ্ধির উদ্ভব। কিন্তু ইহা অহমিকার সক্রিয় উদগ্র অবস্থা। পরন্তু ঈশ্বরীয় আকর্ষণের সূচনায় যে ভাবের অভ্যুদয় হয় তাহা হইল পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের। লৌহ যখন চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয় নিজে তখন সে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। সেইরূপ মানুষ যতক্ষণ স্বীয় অধিকারের জন্য সক্রিয় সংগ্রাম করে এবং ভাবে সেই সর্বকর্মের নায়ক ততক্ষণ সে ঈশ্বরীয় আকর্ষণ অনুভব করিতে পারে না। যখন সে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত মনে মনে বলে—"হে প্রভু, আমি তো শুধু যন্ত্রমাত্র—কী আমার ক্ষমতা। তুমিই যন্ত্রী, তুমি তোমার কর্ম কর"—সেই মুহূর্তেই উপরের চুম্বক পাথর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই ঈশ্বরে বিশ্বাস নিরবচ্ছিন্ন। কিরূপে ইহা জানা যায়? কারণ আমরা আমাদের মনে আতঙ্ক ও ভয় উঠিতে দিই। ভগবানে এবং তাঁহার অনন্ত ক্ষমতা ও অপার করুণায় বিশ্বাস থাকিলে আমরা কখনও কোন প্রকার ভয়ে অভিভূত হইতে পারি না। একমাত্র তিনিই আমাদিগকে বাসনা ও ভীতির নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। এইজন্যই তাঁহার নাম পরমপাবন। মন কিসে কলুষিত হয়? বাসনায়। মনকে বাসনামুক্ত কর—অমনি মন শুদ্ধ ও নির্মল হইয়া যাইবে। কিন্তু যাহার প্রাণে ঈশ্বরীয় ভাবের দ্যোতনা আসে নাই সে কখনও বাসনামুক্ত হইতে পারে না। সে বরং বলিবে, "বাসনাই আমার সর্বসুখের আকর। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে চর্ব্য চুষ্যাদি খাদ্য আস্বাদনের সুখ পাইতাম না; তৃষ্ণা যদি না থাকিত, তাহা হইলে স্নিগ্ধ পানীয়ের আনন্দ বুঝিতাম কি? অতএব বাসনার মাধ্যমেই আমি এই জগৎকে উপভোগ করি।" এইরূপ বিশ্বাসের ফলে সে কখনও বাসনা ত্যাগ করিতে চাহে না।

অপরপক্ষে যিনি ঈশ্বর প্রেমিক তিনি দেখেন যে এই সকল বাসনা সুখের আকর না হইয়া বরং মানুষকে বহুতর দুঃখে আচ্ছন্ন করে। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, একমাত্র ভগবানই নিঃসীম আনন্দের আধার, পার্থিব অপরাপর সুখ সীমাবদ্ধ ও ক্ষণস্থায়ী। আনন্দই হইতেছে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা। আর ভগবান যখন আনন্দস্বরূপ, তখন কেহই আর নাস্তিক নহে—কেন না, প্রত্যেকেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। মানুষ মাত্রেরই ঈপ্সিত আদর্শ সচ্চিদানন্দ—অনন্ত জীবন (চিরন্তন সত্তা)—অখণ্ড জ্ঞান—শাশ্বত আনন্দ। সে চাহে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে, সব কিছু জানিতে—সর্বপ্রকারে সুখী হইতে। সুতরাং ঈশ্বরই প্রকৃতপক্ষে সকলের ঈপ্সিত আদর্শ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—মানুষ তাহার অসীম স্বরূপ আগে জানুক, পরে সীমা

লইয়া খেলা করিবে। আগে ভগবান চাই, তারপর সংস্কার। ঈশদূত যিশুও বলিয়াছিলেন, প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের সন্ধান কর। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের চেয়ে অহং-এর ছটাকেই বেশি করিয়া প্রদীপ্ত করিয়া তুলি এবং ঈশ্বরকে নেপথ্যে ফেলিয়া রাখি। আমরা প্রথমে ছুটি বিষয় বস্তুর সন্ধানে—পরে ভাবি আত্মার কথা। ঠিক ইহার বিপরীত পথটিই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের অন্তরকে বিষয়বস্তুর স্বার্থবুদ্ধি হইতে মুক্ত করিতে হইবে। আমাদের ঈশ্বরানুরাগের উদ্দেশ্য যদি হয় পার্থিব সুখসম্পদ লাভ, তবে সেই অনুরাগ ঈশ্বরের জন্য নয়—পার্থিব বিষয়বস্তুর জন্য। তবে আমরা আর যথার্থ ভক্ত হইতে পারিব না। একনিষ্ঠ ভক্তের ঈশ্বরপ্রেম অহেতুক-প্রেমের আনন্দের জন্যই সে ভগবানকে ভালোবাসে—কেন না ঈশ্বরই তাহার একমাত্র প্রেমাস্পদ।

(ইংরেজি রচনা হইতে সঙ্কলন ঃ সান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতি।
বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীনৃত্যগোপাল রায়। উদ্বোধন, ৫৫ বর্ষ, ৯ সংখ্যা,
আশ্বিন ১৩৬০, পৃঃ ৪৫৩-৪৫৪)

আত্মজ্ঞান

মানুষের আত্মা অবয়বহীন ও সেই কারণে অনন্ত। অবয়ব থাকলেই তা সসীম। অতএব অবয়বহীন হলেই অনন্ত। আবার যা চেতন, তা অনন্ত চৈতন্য এবং সেকারণে সর্বজ্ঞ। তাই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষ স্বভাবতই সর্বজ্ঞ ও অনন্ত। বাস্তব জীবনে কিন্তু আমরা দেখি যে সে বদ্ধ। কেন? কারণ, সে দেহকে আত্মা মনে করে এবং সে দেহ ধারণ করতে চায়। সত্য ও অসত্য বস্তুর মধ্যে সে প্রভেদ করে না। কোন্ জিনিস সত্য? সর্বদা বিদ্যমান বস্তুই সত্য।

এখানে একটি চেয়ার রয়েছে। কোন এক সময়ে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। আবার ভবিষ্যতেও তা আর থাকবে না। অবশ্য যে উপাদান দিয়ে চেয়ার তৈরি হয়েছে, তা চেয়ার তৈরির পূর্বেও ছিল, আবার চেয়ার নষ্ট হয়ে যাবার পরেও কোনো না কোনোভাবে থেকে যাবে। পদার্থের বাস্তবিকই বিনাশ নেই, আমরা অবশ্য 'চেয়ার' নামক বিশেষ বস্তুর কথা বলছি। এর বিনাশ আছে। মনে রেখো যে, আমরা যখন কোন বস্তুকে অনিত্য বলি, আমরা এতে কখনও বলি না যে তা কোন না কোন আকারে ছিল না বা থাকবে না। অতএব সমগ্র বিশ্বই অনিত্য কারণ সে সদা পরিবর্তনশীল। বৃহৎ বিশ্ব তাই অনিত্য বলে দৃষ্ট হয়; আবার অনুবিশ্বও অনিত্য। কারণ তা বৃহৎ বিশ্বেরই অংশ। এই দেহকে মানুষ প্রকৃত আত্মা বলে মনে করে, তা আসলে অনিত্য। এর জন্ম হয়েছিল—আবার মৃত্যুও হবে। তবু আমরা এ দেহকে আঁকড়ে থাকি, জগতের একমাত্র মূল্যবান নিত্যবস্তু ভেবে।

এর থেকে আশ্চর্যের আর কি আছে? মানুষ প্রতিদিন নিজে হাজার হাজার লোককে মরতে দেখে, তবুও সে ভাবে যে কোন ভাবে তার মৃত্যু হবে না, সে বেঁচে থাকবে। দুঃখী-কুষ্ঠ রোগীও মৃত্যু চায় না। এইরকম দৃঢ়ভাবে শরীরটাকে আঁকড়ে থাকা কেন? কারণ, মানুষ সুখী হতে চায়। আর নিজেকে সে ভাবে

শরীরের সঙ্গে একান্ত বলে। সে ভাবে যতদিন তার শরীর থাকবে ততদিনই সে সুখী হবে। এই পদ্ধতিতে পাখিদের ধরা হয়—দড়িতে ছোট ছোট ফাঁপা বাঁশ ঝুলতে থাকে। এর দুটি প্রান্ত গাছের উঁচু ডালের সঙ্গে ভালোভাবে বাঁধা থাকে। পাখিরা তা দেখে ফাঁপা বাঁশটিকে পরম আশ্রয় মনে করে। আর দলে দলে এর উপরে বসে। কিন্তু বসার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশগুলি ঘুরতে শুরু করে। ফলে তাদের সকলের মাথা নিচের দিকে চলে যায়। তারা ঝুলতে থাকে। মৃত্যুভয় এমনই যে তারা তাকেই আঁকড়ে থাকে এবং নিজেদের ডানার সাহায্য নেয় না। নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টাই করে না। ফলে শিকারীর ঝুলিতে ধরা পড়ে। এই বোকা পাখিরা যেমন নিজেদের ডানার কথা ভুলে গিয়ে বাঁচার একমাত্র উপায় হিসেবে বাঁশগুলিকে আঁকড়ে থাকে ও শেষে ধরা পড়ে; মানুষও বোকামি করে ভাবে যে তার শরীরই একমাত্র আশার স্থল এবং শরীরের নাশ হলেই সুখও অদৃশ্য হয়ে যাবে। সে ভুলে যায় যে তার শরীর তার প্রকৃত স্বরূপ নয়, বরঞ্চ সে তার নিজের শরীরের কথা ভুললেই পরমানন্দ লাভ করবে।

সুখ লাভের ইচ্ছা, আর একমাত্র শরীরই সুখ দিতে পারে—এই বিশ্বাসেই সেই শরীরের প্রতি আসক্ত হয়। এই দুই কারণেই মানুষ অজ্ঞানে বদ্ধ হয়। এক সাধু এক ময়রার ওপরে প্রসন্ন হয়ে তাকে স্বর্গে পাঠাতে চাইল। কিন্তু সে তার ছেলেমেয়ে, তার দোকান, তার বাড়ি, তার জমিজমা এবং তার ধন-সম্পদকে খুবই আপন মনে করত। এত তার তীব্র আসক্তি ছিল যে, সে ময়রা হয়ে বেঁচে থাকাই শ্রেয় মনে করল। তার ছেলে-মেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপর বলদরূপে পুনর্জন্ম নিয়ে তার অকর্ষিত জমিতে চাষ করবে, তারপর কুকুর হয়ে নিজের ঘর পাহারা দেবে, তারপর সাপ হয়ে ধন-দৌলত আগলাবে। এসব শুনে করুণা পরবশ হয়ে সেই সাধু নিজেই ময়রাকে স্বর্গে পাঠান। কিন্তু এই আসক্তি কেন? যেহেতু এসব থেকে সে অত্যন্ত সুখ পায় সেজন্য সে অপার্থিব সুখের সম্বন্ধে অজ্ঞান ছিল। মৃত্যু কোন কিছুরই পার্থক্য করে না; তাই সব মানুষকেই মরতে হয়, কেউ আগে কেউ পরে। জরাগ্রস্ত মানুষ শরীর ত্যাগ করে। খুব অনিচ্ছার সাথেই ত্যাগ করে। কিন্তু যত অনিচ্ছাই থাক—তাকে ত্যাগ করতেই হয়।

অবশ্য সুখের, আনন্দের বাসনা স্বাভাবিক বাসনা। মাছকে যদি তুমি উদ্ধার করে প্রশ্ন করো—সে কি পৃথিবীর সম্রাট হতে চায়? নাকি নোংরা পুকুরে থাকতে

চায়? তার উত্তর কি হবে? সে অবশ্যই পুকুরকেই বেছে নেবে; কারণ, জলই তার উপাদান, জল ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। মানুষের পক্ষেও একই রকম। সে সুখী হতে চায়, কারণ, আনন্দই তার স্বরূপ। বাস্তবে সুখের থেকেই তার জন্ম, তাতেই তার অবস্থান ও তাতেই তার পরিসমাপ্তি। কিন্তু সে খুবই ভুল করে। নিজেকে সে শরীর ও শরীরজাত সুখকে এক মনে করে।

এভাবে যদিও বৌদ্ধিক ভাবে আমরা জানি যে আমরা স্বাধীন ও সর্বজ্ঞ; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা তখন ভীতু। আমরা খুব আন্তরিক হতে পারি, তবুও আমরা শক্তিহীন। মায়ার এমনই ভয়ংকর শক্তি। বেদান্তের কথা বলা সহজ, কিন্তু তা অভ্যাস করা সত্যিই খুব কঠিন।

সব ধর্মই এইজন্য বীরপূজার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেয়। বীর কাকে বলে? সেই বীর যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করেছেন, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে—কারণ ধর্ম কেবল আলোচনা, পুঁথিগত জ্ঞান বা বিশ্বাসের বস্তু নয়—তা উপলব্ধির বিষয়। সেরকম মানুষেরই কেবল ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করার অধিকার। বাকি (সকলেই এ বিষয়ে) অন্ধ। আর ভগবান সম্বন্ধে তারা যদি বলেন, তা হচ্ছে একজন অন্ধ মানুষকে আরেক জন অন্ধের পথ দেখানোর তুল্য। তাঁরা দুজনেই খানা-খন্দেতে গিয়ে পড়বেন। অনুভূতিসম্পন্ন মানুষই কেবল প্রকৃত আচার্য, গুরু। তাই তোমাদের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করতে হবে; তারপরে প্রকৃত গুরুর মাধ্যমে অনুভূতির চেষ্টা করতে হবে। বই এখন যেমন সহজলভ্য, আজকাল গুরুরাও এখন খুব সহজলভ্য হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের গুরুরা সাহায্য করতে পারেন না।

গুরুর প্রতি তোমার কিরকম মনোভাব হওয়া উচিত? তাঁকে অন্য সকলের চেয়ে, এমনকি নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে। তাঁর কথা তোমার কাছে আইনের সমান। এরকম হলেই তুমি তাঁর উপদেশকে মূল্য দেবে। তিনি যদি ক্রমাগত তোমাকে এই কথা বলেন ঃ 'বাছা এই জগৎ মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী এর পারে যাও তাহলে তুমি তা মেনে চলবে, আর ধীরে ধীরে তোমার মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হবে এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করবে। সুতরাং তোমার একজন গুরু নিশ্চয়ই প্রয়োজন। আর চাই গুরুভক্তি, গুরুর প্রতি নিষ্ঠা। তখনই হবে তোমার ধর্মজীবন শুরু। তুমি হয়তো বলবে, "এমন গুরু আমি কোথায় পাব?" আমি শুধুই বলব, "যেখানে ইচ্ছে আছে সেখানে উপায়ও আছে।" ধ্যান অভ্যাস কর। এক মাস বা তিন মাসের মধ্যে একটি দিন ঠিক কর যা হবে তোমার

সম্পূর্ণ নিজস্ব। সংসারের সেবা বাকি দিনগুলিতে কর। কিন্তু ওই দিনটি হবে একেবারে একান্তভাবে নিজের। কোন নির্জন স্থানে যাও আর ধ্যান কর। ধ্যান কর সংসারের অসারত্ব ও অস্থায়িত্বের উপর, নিজের সহজাত স্বাধীনতা ও জ্ঞানের উপর, মৃত্যু নিশ্চিত কাল বা আজ। মৃত্যু হতে কারুর রেহাই নেই। নগ্ন অবস্থাতেই মায়ের গর্ভ থেকে এসেছিলাম, আর নগ্ন অবস্থাতেই আমায় চলে যেতে হবে। সর্বদা আত্মার মহিমার কথা চিন্তা কর। তাঁর সঙ্গে থাকতে, তাঁর সাহচর্যে সুখ পেতে ও অপর কিছুর জন্য লালায়িত না হতে অভ্যাস কর। এইরকম করতে পারলে তুমি শক্তি লাভ করবে। আর এভাবে ধ্যানের সাহায্যে নিজেকে যখন উপযুক্ত করে তুলবে, তখন গুরুও লাভ হবে। আর তুমিও ধন্য ও আনন্দিত হবে।

(প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫, পৃঃ ৫৯-৬১,
অনুবাদক ঃ স্বামী ত্যাগরূপানন্দ)

মানুষের প্রকৃত স্বরূপ

জগতের প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বিশিষ্ট গুণাবলী সে বস্তুকে অন্য সকল জিনিস থেকে পৃথক করে দেয়—তার নিজস্ব সত্তা প্রদান করে। এই গুণাবলী, যেগুলি তাকে স্বাতন্ত্র্য দেয়, সেগুলিকেই বস্তুর প্রকৃতি বলা হয়। অতএব কেউ যদি একটি বস্তুর প্রকৃতি জানে, তাহলে সে ব্যক্তি বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে। বস্তুর এই জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলা হয়। অতএব একটি বস্তু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান পেতে হলে তার প্রকৃতি জানতে হবে। বস্তুর এই প্রকৃতিই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়। সেটি কিছুকে আকর্ষণ করতে চায়, আবার কিছু জিনিসকে প্রতিহত (বিকর্ষণ) করে। কোন কোন জিনিসের সঙ্গে সে যেন নিত্য প্রেমে আবদ্ধ হয়; আবার কিছু জিনিসের প্রতি সে সর্বদাই ঘৃণা পোষণ করে। বস্তু সকলকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—যথা জড় বস্তু ও চেতন বস্তু। জড় বস্তুর মধ্যেও এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের শক্তি দেখা যায়। যেমন আঁধারের সঙ্গে আঁধারেরই সহাবস্থান হয়, আলোর হয় না। অতএব, একই রকম প্রকৃতির বস্তু একত্রিত হয়, কিন্তু বিপরীত প্রকৃতির বস্তু নয়। জলীয় জিনিস তৈলাক্ত জিনিসের সঙ্গে মেশে না। কারণ, তাদের প্রকৃতি আলাদা। জলীয় বস্তু অপর জলীয় বস্তুর সঙ্গেই মিশে যায়; আবার তৈলাক্ত জিনিস অপর তৈলাক্ত জিনিসের সঙ্গে মেশে।

উদ্ভিদ জগতেও এই আকর্ষণ আর বিকর্ষণের শক্তি দেখা যায়। সেখানে বায়ু, আলো ও জলের সম প্রয়োজন হয়, আবার জলাভাব, অতিরিক্ত তাপ ও আঁধার খুবই অসুবিধা হয়। জল, আলো ও বায়ুর সাহায্যে যে লতা বেঁচে থাকে সেটি, যেদিকে সূর্যের আলো পাবে সেদিকেই বাড়তে চায়—যতই চেষ্টা কর, তুমি তাকে ছায়ার দিকে মোড় ফেরাতে পারবে না। আজকে যদি তুমি তাকে ছায়ার দিকে বসিয়ে দাও, পরের দিনেই দেখতে পাবে যে সেটির গতি আলোর দিকে বেঁকে গেছে। সূর্যের রশ্মির দিকে যাওয়া এবং ছায়া বা আঁধারকে এড়ানোই তার প্রকৃতি। অতএব, কোন সন্দেহ নেই যে জড়বস্তু ও উদ্ভিদ জগৎ দুইই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

একথা বললে বেশি বলা হবে না যে প্রাণীজগৎও আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, ভালোবাসা ও ঘৃণা, এই দুই শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। গরু প্রভৃতি তৃণভোজী জন্তুরা সবুজ ঘাস, লতা পাতা খায়; কিন্তু মাংসাশী জন্তু, যেমন বাঘ প্রভৃতিরা এগুলি খাওয়া পছন্দ করে না। প্রতিটি জন্তুই তার পছন্দ-অপছন্দের দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয়; আর তাদের প্রকৃতিকে এইসব পছন্দ-অপছন্দ দিয়েই নির্দিষ্ট করতে হবে। যদিও আমরা দুই শক্তি, ভালোবাসা ও ঘৃণাকে দেখতে পাই; প্রকৃতপক্ষে এগুলি একই শক্তি, ভালোবাসারই দুটি দিক। আমরা আলো পছন্দ করি বলে তার বিপরীত, আঁধারকে ঘৃণা করি। যেহেতু ঘৃণার উদয়ও ভালোবাসার কারণেই, আমাদের বলতে হবে যে ঘৃণা কেবল ভালোবাসারই আরেকটি দিক। ভালোবাসা আকর্ষণ করে, ঘৃণা প্রতিহত করে, তাই ভালোবাসা ইতিবাচক, আর ঘৃণা নেতিমূলক; অন্য কথায় ভালোবাসা সত্য আর ঘৃণা অলীক। সব বস্তুর স্বভাবই তাই ভালোবাসা। একজন যা চায়, তাই তার প্রকৃতি আর একজন যা ঘৃণা করে, তা তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। মাছেরা জলে থাকতে চায় এবং তাই তাদের প্রকৃতি। তারা আবার জলের বাইরের অস্তিত্বকে ঘৃণা করে, অতএব সেটি তাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

আমরা যদি মনুষ্য প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখি যে সেটিও ভালোবাসা ও ঘৃণার দ্বারা গঠিত। কোন্ মানুষের না সুখের জন্য ভালোবাসা আর দুঃখের জন্য ঘৃণা আছে? একই ভাবে, প্রত্যেককেই দেখা যায় জীবনকে ভালোবাসতে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করতে। বুদ্ধিমান মানুষ আবার সর্বদাই জ্ঞানের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়। সূর্য যেমন আঁধারকে অপছন্দ করে, সেও তেমনি অজ্ঞতাকে অপছন্দ করে। তার প্রকৃতিই হচ্ছে জ্ঞানকে ভালোবাসা এবং অজ্ঞতাকে অপছন্দ করা। তার এই পছন্দ দেখে আমরা সহজেই জানতে পারি যে সুখই তার প্রকৃতি, দুঃখ নয়; বাঁচাই তার প্রকৃতি, মৃত্যু নয়; জ্ঞানই তার প্রকৃতি, অজ্ঞতা নয়। পরম আনন্দই সুখ, অস্তিত্বই জীবন আর চেতনাই জ্ঞান। ঋষিরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে মানুষের প্রকৃত স্বভাব হচ্ছে অস্তিত্ব (সৎ), জ্ঞান (চিৎ) ও পরম আনন্দ (আনন্দ)।

যদি মানুষ এই সৎ, চিৎ ও পরম আনন্দ হয়; তাহলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে যা কিছু পরিবর্তনশীল বা নশ্বর, সেটি (প্রকৃত) মানুষ নয়। শরীরধারী ব্যক্তির জীবন ও মৃত্যু হয়, তাই এটিও প্রকৃত মানুষ নয় আবার যিনি কাজ করেন ও ভাবেন, যিনি কর্তা ও জ্ঞাতা, তিনিও প্রকৃত মানুষ নন—গভীর ঘুমের (সুষুপ্তি) অবস্থায় তাঁর অস্তিত্ব থাকে না; যা অস্তিত্ব স্বরূপ তার কখনও বিনাশ বা অনস্তিত্ব হতে পারে না। ঋষিরা তাই বলেন যে, প্রকৃত মানুষ পঞ্চকোষের (দৈহিক আবরণ) অতীত। যে মানুষ পাঁচটি আবরণের দ্বারা সীমায়িত সে আপাত-মানুষ মাত্র। প্রকৃত মানুষ এই পাঁচটি কোষের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়—তাই সে অসীম, সর্বব্যাপী, বৃহত্তমের চেয়েও বড়। এই হলো আর্য ঋষিদের সিদ্ধান্ত।

যদিও মানুষ তার প্রকৃত সত্তায় সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তবুও সব মানুষই নিজেদের নামরূপ বিশিষ্ট গুণযুক্ত ও মরণশীল শ্রী অমুক বা শ্রীমতী অমুক বলে মনে করে—আবার নিজেদের সম্পর্কে এই ধারণায় তারা সন্তুষ্ট। তারা শাশ্বত, নিরাবয়ব ও আনন্দপূর্ণ একথাও তাদেরকে দেখে মনে হয় না, ঘট প্রভৃতি বস্তুর মতো তারাও ভঙ্গুর, পারিপার্শ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত, সুখ ও দুঃখের দ্বারা আন্দোলিত, সদা কামনাশীল করুণার পাত্র। পান, আহার ও নিদ্রায় তাদের সব শক্তি খরচ হয়ে যায়, তারা সর্বদাই ভয়ের অধীন। যদি তাদের মধ্যে কারও একজনের ভিন্ন ধরনের জীবন যাপনের ইচ্ছা হয়, তাকে তা তখনই ছেড়ে দিতে হয়; স্ত্রী, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের মনোভাব দেখে। জগৎ এইরকম নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অনাদি কাল থেকে চলেছে, পানাহারে সদা মত্ত এই মানুষদের নিয়ে।

কখনও কখনও, অনেক দিনের বিরতির পরে, অল্প কিছু মানুষ জগতের ঢেউ এর অনেক উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান। আর সুউচ্চ কণ্ঠে ডাক দেন—"পশুর মতো বাঁচা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নয়। নিজের যথার্থ আত্মাকে উপলব্ধি করে দুঃখ সাগর থেকে নিজেকে উদ্ধার কর।" কয়েকজন এই কথা শুনে ঘুম থেকে নিজেদের তোলেন, আর এই আলোকিত মানুষদের করুণাঘন মুখ দেখে, তাদের সহজবোধ্য শিক্ষালাভ করে, নিজেরা নবজীবন ও শক্তি লাভ করে। এই দুঃখপূর্ণ পৃথিবীর ওপরে এরাও নিজেদের তুলে ধরে, এই মহাত্মাদের বাণী থেকে এটি অনুভব করে যে, তাদের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে যে একমাত্র বস্তু সেটি তাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে, আর এরই সন্ধানে তারা অসার পৃথিবীতে এতদিন কষ্ট পেয়েছে; সেই বস্তু ভয় ও দুঃখ দ্বারা পূর্ণ; এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পারে অবস্থিত। সত্যকে এইভাবে জেনে তারাও ধন্য হয়ে যায়। মাঝে মাঝে কিছু উপলব্ধিমান পুরুষের সাহায্যে এই দুঃখদায়ক পৃথিবীর মানুষেরা এর পারে যেতে পারে। এই মহাত্মারাও মাঝে মাঝে আসেন এই দুঃখী মানুষের উদ্ধারের জন্য। এইরকম মানুষ, যাঁদের হৃদয় অপরের দুঃখে ব্যথিত হয়, পৃথিবীতে মাঝে-সাঝে আসেন বলে এই দুঃখ জর্জরিত মানুষদের কষ্ট শেষ হয়। তা না হলে এই জগৎ পুরোপুরি নরক হয়ে যেতো, অজ্ঞানের অন্ধকার কখনই ঘুচত না।

(অনুবাদক ঃ স্বামী ত্যাগরূপানন্দ;
প্রবুদ্ধ ভারত, মে ১৯৩৫, পৃঃ ২১৬-২১৮)

শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মতাদর্শ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

প্রশান্ত পবিত্রতার প্রতিভূ দেওয়ান সাহেব এবং ভ্রাতা ও ভগিনীবৃন্দ,

আপনারা সবাই এইমাত্র বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু ধর্মগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য। অধুনা, আমার অভিজ্ঞতায় যতদূর জেনেছি, ঈশ্বরত্ব-ভাব একটি অত্যন্ত গৌণ চিন্তাধারা। আমরা আমাদের সম্মুখে দৃশ্যমান বিশ্ব-ভুবনকে একমাত্র প্রকৃত সত্যরূপে মান্য করে এবং ঐ প্রকৃত সত্যের দশ লক্ষ ভাগের একভাগও আমরা কখনও ঈশ্বরে আরোপ করি না। যদি তাই হতো, তবে সর্বাকর্ষণের উৎস ঈশ্বরকে ভালবাসার জন্য মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হতো। আমাদের শাস্ত্রসমূহে ঈশ্বর এইভাবে প্রশংসিত হয়েছেন এবং অনেক মহাপুরুষ ঈশ্বরোপলব্ধি করেছেন। তিনি অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ এবং অনন্ত মাধুর্য। যদি একজন মানুষও এতে প্রকৃত বিশ্বাস করত, তবে ঈশ্বরকে পরিহার করে কি করে সে দুঃখ ও মৃত্যুপ্রদায়িনী বিষয়-সুখে নিমজ্জিত থাকাতেই পরম সুখ মনে করে?

এই জগতের একটা রমণীয় বহিরাবরণ আছে, কিন্তু তার পশ্চাতে আছে মৃত্যু, গভীর বিষাদ, আর তমসা। খুব কম সংখ্যক লোকেরই সৌভাগ্য হয় মরণের পরপারের জন্য যাওয়া। আমাদের সামনে এই হচ্ছে জগৎ। কারণ এর থেকে শ্রেয়স্কর, মহত্তর কিছু লাভ করা যায়নি বলে সেই জগৎকেই আমরা আঁকড়ে ধরে থাকি। কিন্তু ঈশ্বর বলতে আমরা কি বুঝি? আমাদের মহান পূর্বপুরুষেরা ঈশ্বরকে অভিহিত করেছেন সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপে। আসুন বন্ধুগণ, আমরা এই জগৎকে বিশ্লেষণ করি। সৎ-এর অর্থ শাশ্বত জীবন, চিৎ-সর্বব্যাপী জ্ঞান এবং আনন্দ-এর তাৎপর্য পরমানন্দ। আপনারা নিজেদেরই এখন প্রশ্ন করুন কাকে বেছে নেবেন ঃ জীবন, না মৃত্যু? আমরা বাঁচতেই চাই, মরতে চাই না। আবার নিজেদের প্রশ্ন করুন, আংশিক জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকতে চান, না সর্বজ্ঞ হতে। আমরা সবকিছুই জানতে চাই। আমাদের আছে জানার জ্ঞান। আপনারা যদি তারকাদল সম্বন্ধে কিছু জানতে চান, তবে পরক্ষণেই আপনারা জানতে চাইবেন সমগ্র সৌরজগৎ সম্বন্ধে। যতক্ষণ না এসব জানব, ততক্ষণ আমরা জানতে চেষ্টা করব।

আপনারা নিজেদের এবার জিজ্ঞাসা করুন, আপনারা সুখী হতে চান, না দুঃখী হতে? প্রত্যাশিত উত্তর হবে ঃ চিরন্তন পরমানন্দলাভই আমার অভীপ্সিত লক্ষ্য। সুতরাং, আপনার অভীপ্সিত লক্ষ্য হবে শাশ্বত জীবন, অপার জ্ঞান, আর চিরন্তন পরমানন্দ। এই জ্ঞান আসে একমাত্র ঈশ্বর উপলব্ধিতে, যে ঈশ্বর স্বয়ং সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। তিনি সকল আপাত দৃশ্যমান জগতের একমাত্র প্রকৃত সত্তা। এই সত্তা আজ আছে, কাল নেই।

যখন আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাই, সে সময় সকলের জগৎ পিতা ঈশ্বর দেখেন যে তাঁর সন্তানেরা বিপথে যাচ্ছে, তখন সর্বানুস্যূত প্রেমময় ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। আমাদের দেওয়ান সাহেব এইমাত্র পবিত্র গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে বললেন, সেই সময় ঈশ্বর যথার্থই ধরায় অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। তাঁকে অবতীর্ণ হতেই হবে, কারণ এই জগৎ যে তাঁরই। এবং আপনারা এইমাত্র বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অদ্ভুত ঘটনাময় আমরা সকলেই জানি, যে ব্যক্তি যত বেশি বই পড়ে, সে তত বেশি বিদ্বান। কিন্তু এই মানুষটি প্রকৃত অর্থে অশিক্ষিত। তবে বর্তমান কালে সমগ্র পৃথিবীতে তিনি এক অসাধারণ পুরুষ, অনন্য বাগ্মী, এমনকি পাশ্চাত্যেও অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতাররূপে মানেন। তাঁকে কখনও কোথাও শিক্ষালাভ করতে যেতে হয়নি। তাহলে কি করে সম্ভব হলো যে তিনি সব প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করলেন এবং এমন একটা জ্ঞান প্রচার করলেন যার বিবরণ আমাদের শাস্ত্রে পর্যন্ত নেই?

উপনিষদে আমরা দুটি শব্দের উল্লেখ পাই ঃ পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যা-র অর্থ পরম জ্ঞান। আমাদের ঋষিরা এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ একমাত্র শাশ্বতকে উপলব্ধি করতে পারলে তুমি পরাবিদ্যা লাভ করতে সক্ষম হবে, যার দ্বারা জগতের সর্বজ্ঞ হওয়া যায়। অপরাবিদ্যা অর্থাৎ লৌকিক জ্ঞান অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ এবং অন্যান্য বেদসমূহের জ্ঞান। শ্রুতি স্বয়ং বলেন, পরম সত্য উপলব্ধির জন্য একমাত্র বেদপাঠ মানুষকে পরম সত্যের পথে নিয়ে যায় না। তাহলে কে পরম সত্য উপলব্ধি করেন? উত্তর—যিনি শুধুমাত্র সত্য চান, তাঁর কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এইটি প্রতিফলিত। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারি। তিনি পাঠশালায় একবার মাত্র গিয়েছিলেন। তাঁর পণ্ডিত বড়দা তাঁকে একবার ব্যাকরণ পড়তে বাধ্য করেছিলেন। আপনারা হয়তো জানেন যে তাঁর বড়দা

ছিলেন তৎকালীন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। তিনি তখন সবেমাত্র পড়াশুনা শুরু করেছেন। তিনি একদিন লক্ষ্য করলেন তাঁর বড়দার অন্যতম সেরা ছাত্র গামছা করে কি যেন নিয়ে যাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি নিয়ে যাচ্ছ?"

সে জবাব দিলে, 'পাশের বাড়িতে পুরুতগিরি করে কিছু চাল আর কাঁচা কলা পেয়েছি। এগুলো নিয়ে যাচ্ছি গামছায় বেঁধে।' এসব শুনে তাঁর মনে এক অসাধারণ উপলব্ধি হলো ঃ বেদান্তের মতে যদি ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তবে বেদান্ত-জ্ঞান আহরণের পরে একজন কি করে কেবল মাত্র জীবন রক্ষার জন্য পুরুতগিরি করে; তাহলে এই বেদান্ত কখনই যথার্থ বেদান্ত নয়। বেদান্ত বাইরের বস্তু নয়—ভেতরের কোথাও অন্বেষণ করতে হবে। সেইদিন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের পড়াশুনার পাঠ চুকে গেল—তিনি নিজেকে নিয়োজিত করলেন সত্যিকারের বেদান্ত-অধ্যয়নে। তাঁর পাঠ্যপুস্তক হলো সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি।

ফল কি? তিনি আত্মার উপলব্ধি করলেন এবং পরাবিদ্যার জ্ঞানের অধিকারী হলেন, যা জানলে সরকিছু জানা যায়। সেই পরম সত্য অনুভব করে তিনি হয়ে গেলেন সর্বজ্ঞ। একই সত্য সকলের অন্তরে বিরাজমান—"ঈশ্বর সকল জীবের অন্তরে থাকেন। তিনি বাইরে কোথাও থাকেন না। তিনি আমাদের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে রয়েছেন। সেই ঈশ্বরকে আমরা ভুলে যাব না।"

আমাদের চেয়ে ঈশ্বর আমাদের আরো নিকটে। আমাদের কাছে এটা ধাঁধা বলে মনে হলেও এটাই প্রকৃত ঘটনা। আপনি এখন বর্তমানে কোথায় আছেন? আপনি বাইরে ছড়িয়ে আছেন। নাম যেখানে, আপনি সেখানে, আপনার স্ত্রী-পুত্র এবং আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জনদের মধ্যেও আপনি ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজেকে। আপনি সেখানে সম্পূর্ণ একা। সুতরাং, যেহেতু আপনি নিজেকে বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেহেতু আপনাকেই নিজেকে অন্তরে আসতে হবে। এটা খুব সহজসাধ্য নয়। আপনি কি এক মিনিটের জন্যও নিজেকে অন্তঃস্তলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন? এই পরীক্ষা সত্যি বড় কঠিন। আপনি আপনার প্রকৃত সত্তা থেকে বাইরে চলে গেছেন। প্রকৃত সত্তায় ফিরে আসা সহজ নয়। কিন্তু ঈশ্বর সদা-সর্বদা আপনার মধ্যেই বিরাজমান। সেজন্যই আমি বলছি, ঈশ্বর আপনার কাছেই আছেন—আপনারা নিজে দূরে চলে গেছেন। আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো তাঁকে জানা।

একথা সত্য যে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন এই তত্ত্ব জগতে প্রসার ও প্রচার

করতে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে বই পড়ার জ্ঞান কোন জ্ঞানই নয়। এইটি তোমাকে জানতে হবে। তাহলে তুমি তোমার অন্তর জগতে প্রবেশ করতে পারবে, মনস্থির করতে পারবে, তখন তুমি অনুভব করতে পারবে। এই মহান সত্য তিনি জগতে প্রচার করতে এসেছিলেন।

কখনও বিশ্বাস করবেন না যে আপনি পাপী। মানুষকে পাপী মনে করাই পাপ। আপনারা সকলেই পবিত্র ও নিষ্পাপ। ঈশ্বর থেকে আপনারা এসেছেন। মানুষ থেকে মানুষের জন্ম হয়, ঘোড়া থেকে ঘোড়ার জন্ম হয়—এবং আপনারা যদি ঈশ্বর থেকে আসেন, তাহলে আপনারা সবাই ঈশ্বর। আপনি পাপী—এই শিক্ষায় বিশ্বাস করবেন না। অজ্ঞানতায় আপনি আপনার প্রকৃত স্বরূপ ভুলে গেছেন। একটি আয়না সর্বদা পরিষ্কার; কেবল সামান্য ময়লা পড়ে আছে; আপনার কর্তব্য আয়নার সেই ময়লা পরিষ্কার করা। এবং যে মুহূর্তে আপনার অজ্ঞানতা দূর হবে, আপনি অনুভব করতে পারবেন যে আপনার নতুন কোন সত্তার উদ্ভব হয়নি; আপনার প্রকৃত সত্তাই সঠিক সত্তা। কেবল সেখানে অজ্ঞানতা ছিল বলে নিজেকে অপবিত্র মনে হচ্ছিল। নিজেকে পাপী বলার অর্থ নিজেকেই প্রতারিত করা।

আরো একটা জিনিস শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করেছিলেন যে প্রত্যেক ধর্মই একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। বিশেষ করে, অতি অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে—প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজের ধর্মকেই একমাত্র সত্যপথ বলেন। আর অন্য সব ধর্ম অসত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনায় স্বয়ং অনুভব করেছিলেন যে হিন্দু ধর্মের প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের যা লক্ষ্য, সেই একই লক্ষ্য বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান, জরথুস্ত্র এবং জগতের আর বাকি অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও।

এইটি বেদান্তের সর্বজনীন ভিত্তি। এই ভিত্তিটি কি? এটি স্বাভাবিক প্রকৃতিগত ভিত্তি, যা আমি এইমাত্র বলেছি। বেদান্ত হলো মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে খুঁজে বের করা। এই তত্ত্বটি জানার পর বেদান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে প্রত্যেকেই তিনটি খুঁজে বেড়ায়—শাশ্বত জীবন, অপার আনন্দ ও সর্বানুস্যূত জ্ঞান। বেদান্ত এই সৎ-চিৎ-আনন্দের শাশ্বত তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এবং এই তত্ত্ব সকল ধর্মের ভিত্তিভূমি। প্রত্যেক আচার্যই এই তত্ত্বের উপযোগিতা দেখিয়েছেন। না হলে কেউ কি এই তত্ত্বকে গ্রহণ করবে?

এই তত্ত্বটি কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিলের দর্শন-নীতি নয়। এই তত্ত্ব অনাদি ও অনন্ত। আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এই তত্ত্ব আমাদের কি দেবে। দার্শনিক

কপিল এই তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। ধর্ম প্রত্যেককে উচ্চ আদর্শ বা তত্ত্বে নিয়ে যায়। খ্রিস্টান বলেন যে তাঁর ধর্ম এই উচ্চ আদর্শে নিয়ে যায়। এরকম বলেন মুসলমানেরা, শৈবরা, শাক্তরা, বৈষ্ণবরা ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষেরা। অনেকেই এই আদর্শকে আল্লা বলতে পারেন, কেউ বলবেন জিহোবা, কেউ ঈশ্বর ও এভাবে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা এক একটি নাম বলবেন। সার কথা কিন্তু একই বস্তু। উচ্চ আদর্শও তাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ জলের বিভিন্ন নাম। কিন্তু তা বলে জলের ধর্ম কখনও বদলায় না।

এভাবে কারুর আদর্শের বিভিন্ন নাম হতে পারে, কিন্তু এ সকল নামের পশ্চাতে একটিই সর্বোত্তম আদর্শ—তা হলো শাশ্বত জীবন, শাশ্বত আনন্দ, শাশ্বত সর্বজ্ঞতা। যদিও তিনি আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন, তবুও তিনি বলতেন যে প্রত্যেক মানুষের তাঁর নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা থাকবে—তাই তাঁর স্বাভাবিক। এভাবে শীঘ্রই তাঁর নিজের ধর্মকে উপলব্ধি করতে পারবেন। আমাদের জন্মগত ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা থাকবে। এইটি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের সঙ্গে মেলে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে অন্য ধর্মকে গ্রহণ করার চেয়ে প্রত্যেক মানুষ তাঁর নিজের ধর্মকে অনুসরণ করা মহত্তম।

আমি আর সময় নেব না। আপনারা আমাদের থাকবার জায়গা দিয়েছেন এবং আমরা এখানে সেবা কাজ করব। এখানেই আমরা আমাদের প্রিয় প্রভুর আদর্শ প্রচার করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মঠের উদ্বোধনী সভায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর ভাষণ, ২০ জানুয়ারি ১৯০৯। এই সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ উদ্বোধনী ভাষণ দেন এবং মাইসোর রাজার দেওয়ান স্যার ভিপি মাধবরাও, শ্রী কোপি পুট্টন্না চেট্টি ও সিস্টার দেবমাতা বক্তৃতা দেন।)

A Spiritual Centre Blossoms : Ramakrishna Math Bangalore First 100 Years (1904—2004) By M S Nanjundia, Ramakrishna Math Bangalore. First Edition : April 2007. Pages : 42-44

অনুবাদক ঃ শ্রীমোহিত রঞ্জন দাস, কলকাতা।

বিজ্ঞান ঃ আধুনিক এবং প্রাচীন

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

আধুনিক বিজ্ঞান শুরু হয়েছে দুটি প্রকল্পনা, অথবা এই বিজ্ঞানের ভাষায়, দুটি প্রাথমিক সত্য দিয়ে একটি হলো মানুষ এবং অন্যটি হলো তার চারপাশের এই মহাবিশ্ব। 'মানুষ' বলতে এই বিজ্ঞান কী বোঝে? একটি নির্দিষ্ট জাতীয়তা, ধর্মবিশ্বাস এবং সম্প্রদায়-বিশিষ্ট একটি সত্তা। সংক্ষেপে, 'মানুষ' এই কথাটি বলতে বিজ্ঞান বোঝে এই পৃথিবীর একজন সাধারণ মানুষ—যার বেশ টনটনে সাধারণ জ্ঞান রয়েছে। এমন একজন—যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখে, শোনে, ঘ্রাণ নেয়, স্বাদ গ্রহণ করে ও স্পর্শ করে; নিজের মন দিয়ে চিন্তা করে, অনুভব করে এবং ইচ্ছাপ্রকাশ করে। সেই হলো মানুষ। এবং এইসব ইন্দ্রিয় দিয়ে সে যা কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং যা কিছু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারে—সেগুলিকেই সে সত্য এবং বাস্তব বলে মনে করে। বাস্তব বলে প্রতিভাত হওয়ার জন্য সবকিছুকেই তার এইসব ইন্দ্রিয়ের গোচরে আসতে হবে, কেননা পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে কোন কিছুর অস্তিত্ব সপ্রমাণ করার ক্ষমতা একমাত্র এইসব ইন্দ্রিয়েরই রয়েছে।

মানুষ আরো দেখে, তার মধ্যে রয়েছে হাজারো অভাববোধ, অথবা বলা ভাল, তার সারাটি জীবন প্রায় অগণিত একগুচ্ছ অভাবের পরম্পরা মাত্র। এবং একই সঙ্গে সে আশ্বস্ত হয় এই দেখে যে, তার চারপাশের জগতের এইসব অভাব দূর করার ক্ষমতাও রয়েছে। কিন্তু মুশকিল হলো, এইসব অভাব দূর করার যথেষ্ট সামর্থ্য এই জগতের থাকলেও তাকে দিয়ে জোর করে এটা করিয়ে নিতে হবে। সে যা চায় তা পাওয়ার জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হবে চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে। শুধুমাত্র মনভোলানো কথা দিয়ে তার কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। সে যা কিছু চায় তা পাওয়ার জন্য তাকে এর সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হবে। এজন্যই আধুনিক বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইনের ভাষায় জীবন হলো 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম', এবং তাঁর মতে কেবলমাত্র যোগ্যতমরাই এই সংগ্রামে জয়ী হয়। কবিও সরল অথচ জোরালো এই কটি ছত্রে জগৎকে বর্ণনা করেছেন একটি যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে ঃ

"জগতের এই বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে
উন্মুক্ত আকাশতলে রাত্রিযাপন-সর্বস্ব এই জীবনে
মূক, তাড়িত গবাদি পশুর মতো হয়ো না
এই সংগ্রামে হও একজন নায়ক!"

মানুষ চাক বা না চাক, তার চরিত্রের গঠন অনুযায়ী সে কখনো এখানে শান্ত হয়ে থাকতে পারে না, কারণ তার কাছে এর অর্থ মৃত্যু। সে ক্ষমতা অর্জন করতে চায় এবং সে দেখে, জ্ঞানই তার কাছে এই অতি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এনে দিতে পারে। আগে মনে করা হতো, বিদ্যুৎ একটি ধ্বংসাত্মক শক্তিমাত্র। কিন্তু এখন মানুষ বিদ্যুৎ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করার ফলে একে একটি অতি প্রয়োজনীয় বন্ধুতে পরিণত করে ফেলেছে। এই বিদ্যুৎ এখন তাদের বার্তাবাহক, তাদের যানবাহনের চালিকাশক্তি এবং এর মাধ্যমে তাদের নগর ও জনপদ আলোকিত হয়। বাষ্পশক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জিত হওয়ায় এখন অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাতায়াত সম্ভব হয়েছে। এবং এসবের ফলে এখন মানুষ প্রচণ্ড আশাবাদী হয়ে উঠেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে এই বিশ্ব সম্বন্ধে আরো জ্ঞান অর্জন করে যাবতীয় প্রয়োজনই মেটানো সম্ভব হবে। এজন্যই এখন মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে চলছে অবিরাম সংগ্রাম আর এই সংগ্রামের ফলে মানুষ বিজ্ঞান বা প্রাণী ও বস্তু সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে। মহাজাগতিক বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে জানতে গিয়ে মানুষ উদ্ভাবন করেছে জ্যোতির্বিদ্যা; প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের অন্বেষণে উদ্ভব হয়েছে প্রাণিবিদ্যার; গাছপালা সংক্রান্ত কৌতূহল থেকে জন্ম নিয়েছে উদ্ভিদবিদ্যা। এইভাবে, কোন্ কোন্ মৌল পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়েছে এই পৃথিবী, তার চারপাশে যাকিছু দৃশ্যমান—সেসব কোন্ কোন্ নিয়মের বশবর্তী, তার শরীরের গঠন এবং কার্যপ্রণালী কী, যে পৃথিবীতে সে বাস করে, কী তার গঠনতন্ত্র? তার এইরকম অনেক কৌতূহল থেকে একে একে উদ্ভব হয়েছে রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার।

পদার্থ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করে মানুষ তার অবিনশ্বর প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে পেরেছে। মোমবাতি জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর এই দগ্ধ বাতি থেকে নির্গত গ্যাসীয় পদার্থ ওজন করে সে দেখেছে, এর একটি কণাও নষ্ট হয়নি। সুতরাং পদার্থ অবিনশ্বর বলে এ বাস্তব, আর এই কারণেই সমস্ত জড়পদার্থও

বাস্তব। এই মহাবিশ্ব যেহেতু নানান জড়পদার্থ দিয়ে তৈরি, তাই এও অবশ্যই বাস্তব হবে। এই পদার্থময় মহাবিশ্ব সম্বন্ধে অধ্যয়ন করে আমরা যা চাই, তাই পেতে পারি। সুতরাং এ সম্পর্কে অধ্যয়ন অত্যন্ত দরকারি। আত্মার শাশ্বত প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা একবারেই নিরর্থক, কেননা অপার্থিব বলে আত্মাকে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় আনা সম্ভব নয়। এখন এই আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের কাছে কোন্ ধরনের মহাবিশ্বের ধারণা দিয়েছে? অবশ্যই আত্মাহীন এক মহাবিশ্ব। এ এক মহাবিশ্ব, যা আমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। আমাদের জাগতিক বা মানসিক যাকিছু চাহিদা—সেসব আমাদের নিজেদেরই এর কাছ থেকে আদায় করে নিতে হয় জোর করে। আবার এই মহাবিশ্ব এত অসীম, এত বিরাট এবং আমাদের ক্ষমতা এত শোচনীয়ভাবে সীমিত যে, একে সম্পূর্ণভাবে জানার চিন্তা আমাদের পক্ষে বাতুলতামাত্র এবং এর ফলে এই মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সর্বদাই আংশিক থেকে যেতে বাধ্য, যা আদৌ অভিপ্রেত নয়।

পদার্থের অবিনশ্বরতার কথা আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি-ঋষিদের কাছে অজানা ছিল না। কপিল, গৌতম, কণাদ, পতঞ্জলি, জৈমিনি এবং আরো অনেকে পদার্থের এই অবিনশ্বর প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। উদাহরণ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসংবরণ এবং তাঁর সন্তানসন্ততিদের নিধনের মাধ্যমে সমগ্র যদুবংশের প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপাখ্যানটি স্মরণ করা যেতে পারে।

সর্বশক্তিমান বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে তাদের সবরকম সঙ্কটে পরিত্রাতা হিসাবে জেনে গিয়ে যদুবংশের সন্তানসন্ততিরা ক্রমশ উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল ও বেয়াদব হয়ে উঠছিল। চটুল আমোদে-প্রমোদেই তারা বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করত। শ্রীকৃষ্ণের সন্তানদের মধ্যে শাম্ব ছিল সবচেয়ে রূপবান এবং সুন্দর। একদিন শ্রীকৃষ্ণের অন্য কয়েকজন সন্তান শাম্বের উদরের ওপর একটি লৌহপিণ্ড বেঁধে দিয়ে তাকে পরিপাটি করে একজন গর্ভবতী মহিলা সাজাল। তারপর তাকে দ্বারকার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে নিয়ে গেল। উদ্দেশ্য—অতি পরিচিত শাম্বকে প্রতিবেশীরা এই নতুন ছদ্মবেশে চিনতে পারে কিনা সেটা পরখ করা। চিনতে না পারলেই দলটি ঐসব প্রতিবেশীদের নিয়ে মেতে ওঠে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-মশকরায়। এইভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে দলটির সঙ্গে দেখা দুর্বাসা মুনির। তাদের দুর্মতি এবং ধৃষ্টতা রেয়াত করল না মুনিবরকেও—তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বসল ঃ এই মহিলা কি সন্তান প্রসব করবে? কোপনস্বভাব এই ঋষি তাঁর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ধাপ্পাটির ব্যাপারে সবকিছুই জানতে পারলেন। উত্তর

দিলেন ঃ ওরে অর্বাচীনের দল! তোদের এই সাজানো মহিলা যে-সন্তানের জন্ম দেবে, সে তোদের সকলকে সবংশে ধ্বংস করবে! একথা শুনে সকলে ভীষণভাবে চমকে গেল। তাদের ঔদ্ধত্য ও বেয়াদপি যে তাদের সমগ্র বংশের ওপর ব্রাহ্মণের কঠোর অভিশাপ এনে দিয়েছে—একথা বুঝতে পেরে তারা ভীষণ ভয় পেয়ে সোজা ছুটল বলরামের বাড়ি। কীভাবে এই সর্বনাশা অভিশাপের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তার উপায় বাতলানোর জন্য তাঁকে ধরে পড়ল। সবকিছু শুনে বলরাম তাদের পরামর্শ দিলেন ঃ লৌহপিণ্ডটা একটা পাথরে ঘসে ঘসে খইয়ে ফেল। তাহলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না, কেননা তোমাদের দুশ্চিন্তার মূল কারণ এই লৌহপিণ্ডটাই যখন আর থাকছে না তখন কে আর তোমাদের অনিষ্ট ঘটাবে? পরামর্শমতো দলটি ছুটল কাছাকাছি এক নদীর ধারে। সেখানে একটি পাথর খুঁজে নিয়ে তার ওপর ঘষে ঘষে লৌহপিণ্ডটির প্রায় সবটাই খইয়ে ফেলল। সামান্য একটা ছোট টুকরো অবশিষ্ট ছিল, সেটা কোন ক্ষতি করতে পারবে না ভেবে নিয়ে টুকরোটা নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রফুল্লমনে বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু হতভাগারা জানতে পারেনি, ঘর্ষণের ফলে পিণ্ডটি থেকে নির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব লৌহকণা নদীতীরে শরগাছের এক বিশাল জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়। আর যে টুকরোটি নিরীহ মনে করে তারা নদীতে ফেলে দিয়েছিল, সেটি গিলে ফেলে একটা মাছ এবং মাছটি ধরা পড়ে এক জেলের জালে। মাছটি কাটা হলে তার পেট থেকে বেরোয় লৌহকণাটি। জেলে এক ব্যাধকে দিয়ে দেয় সেটি এবং ব্যাধ সেটি দিয়ে তৈরি করে একটি তীরের ফলা।

কয়েক সপ্তাহ পরে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পরিবারের সব লোকজনদের নিয়ে বনভোজনে গেলেন নদীর ধারে—যেখানে লৌহপিণ্ডটি ঘষা হয়েছিল, তার কাছাকাছি একটি জায়গায়। সেযুগে বনভোজনের রীতি অনুযায়ী সবাইকে ঢালাও সুরা পরিবেশন করা হলো। প্রথম প্রথম সবাই খুব হৈ-হুল্লোড় করতে লাগল হালকা মেজাজে। তারপর শুরু হলো একে অন্যের দোষ-ত্রুটি ধরা, সেখান থেকে বিবাদ এবং শেষপর্যন্ত মারামারি, রক্তপাত। যার কাছে যা অস্ত্র ছিল, সব ফুরিয়ে গেল একে একে। পরস্পরকে আঘাত করার মতো যখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, তখন সকলের দৃষ্টি পড়ল শরগাছের জঙ্গলটার ওপর। প্রত্যেকে একগাছা করে শরকাঠি তুলে নিল হাতে, তাই দিয়ে আঘাত করতে লাগল প্রতিপক্ষকে। এই শরকাঠির সামান্যতম আঘাত যার ওপর পড়ল—সে-ই পতিত হলো মৃত্যুমুখে—কারণ, দুর্বাসার অলঙ্ঘ্য অভিশাপ।

দেখতে দেখতে যদুবংশের প্রায় সবাই ধ্বংস হয়ে গেল—বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া। এঁরা কলহে অংশ না নিয়ে একপাশে নিশ্চুপ হয়ে বসে সন্তানসন্ততিদের নিধনপর্ব প্রত্যক্ষ করছিলেন। এইভাবে সমগ্র এলাকাটিকে যখন মৃত্যুর করাল ছায়া গ্রাস করল, বলরাম যোগবলে দেহত্যাগ করলেন। সম্পূর্ণ একা হয়ে গিয়ে বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ আরোহণ করলেন একটি অনতি উচ্চ ডুমুর গাছে, গাছটির একটি ডালে বসলেন এক পা ঝুলিয়ে। শ্রীকৃষ্ণের ঐ ঝুলন্ত সুন্দর চরণ দূর থেকে চোখে পড়ল এক ব্যাধের, সেটি দেখে তার ভ্রম হলো আলতারঙা বুক আর নীল ডানাবিশিষ্ট একটি চমৎকার পাখি বলে। সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে তীর সংযোগ করে ব্যাধ সেটি নিক্ষেপ করল ঐ লক্ষ্যবস্তু নিশানা করে। এটি হলো সেই তীর, যার ফলাটি তৈরি হয়েছিল মাছের পেট থেকে পাওয়া লৌহপিণ্ডের অবশিষ্ট অংশটি দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ মাটিতে পড়ে গেলেন। কিন্তু তখনি দেহত্যাগ করলেন না, কারণ তিনি সখা অর্জুনের সাক্ষাৎ চাইছিলেন। যাতে তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতা এবং পত্নীদের দেখাশোনার ব্যাপারে তাঁকে কিছু নির্দেশ দিয়ে যেতে পারেন।

এই উপাখ্যানটি থেকে দেখা যাচ্ছে, পদার্থ অবিনশ্বর। একে ধ্বংস করতে যত চেষ্টাই হোক না কেন, সেসব ব্যর্থ হতে বাধ্য। কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, তাঁরা পদার্থের অন্তিম বিভাজনে সক্ষম হয়েছেন। এই কণার আরো বিভাজন সম্ভব নয় এবং সেই কারণে এর নাম দিলেন 'পরমাণু' বা 'atom' (গ্রিক a-র অর্থ 'না', temnein-এর অর্থ কর্তন বা বিভাজন করা)। কিন্তু কিছুদিন পরে ইলেক্ট্রন আবিষ্কৃত হওয়ায় এই তত্ত্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেল; কারণ, ইলেকট্রন হলো অ্যাটমের থেকে সূক্ষ্মতর। আবার পরে এল ইথারীয় কণা, যা দেখা গেল ইলেক্ট্রন থেকেও সূক্ষ্ম। হয়তো পরে সূক্ষ্মতর আরো কিছু আসবে যা দেখে মনে হবে, ইথারকণাও যথেষ্ট স্থূল। অর্থাৎ পদার্থকে যতই বিভাজন করা যাক না কেন, তাকে কখনোই শূন্যে পর্যবসিত করা সম্ভব হবে না। এ সবসময় কোন না কোন আকারে থেকেই যাবে—একে ধ্বংস করার যেকোন চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক বস্তুবিজ্ঞান পদার্থের অন্তিম বিভাজন এখনো করে উঠতে পারেনি, ফলে এই বিজ্ঞান পায়ের নিচে শক্ত মাটি পায়নি এখনো। তাই এর ওপর নির্ভর করা যায় না—এটি এখনো পর্যন্ত গবেষণার স্তরেই রয়ে গেছে বলা যায়।

কিন্তু বিজ্ঞান কী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং তা থেকে আমাদের কিছু বোধগম্য

হয় কিনা দেখা যাক। বিজ্ঞান আমাদের জানিয়েছে পদার্থের অবিনশ্বরতার কথা, এর প্রতিনিয়ত অবয়ব পরিবর্তনের কথা, এর পরিবর্তনশীল প্রকৃতির কথা। পদার্থের যেকোন আকার পরিবর্তনশীল। উত্তাপে তা প্রসারিত হয়, শৈত্যে হয় সঙ্কুচিত। যতবার খুশি এর বিভাজন ঘটানো যায়। বড় অংশগুলিকে ছোট করা যায়, ছোটগুলিকে আরো ছোট—এইভাবে। সুতরাং এটি নিয়ত পরিবর্তনশীল। এখন এই পরিবর্তনের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাক। যখনি কোন অবয়ব পরিবর্তিত হয়ে আরেকটি রূপ ধারণ করে, তখন পুরনো অবয়বটির আর কোন অস্তিত্ব থাকে না বা তার মৃত্যু ঘটে নতুন একটি অবয়ব দেখা দেয় বা বলা যায় 'জন্মায়'। সুতরাং 'জন্ম' ও 'মৃত্যু'—এই কথাদুটি 'পরিবর্তন' কথাটির জায়গায় বসানো যেতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জন্ম-মৃত্যু বা পরিবর্তন-কথিত একটি আধারে পদার্থের প্রতিটি অবয়বের অবিরাম পরিবর্তন বা জন্ম-মৃত্যু ঘটছে। জন্ম-মৃত্যুহীন এই শাশ্বত আধারটির জন্যই অবিরাম পরিবর্তনশীল পদার্থের যেকোন অবয়ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়, নানাবিধ টানাপোড়েনের মধ্যেও অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকে এই আধারটির সঙ্গে।

এবার দেখা যাক, এই শাশ্বত আধারটি কী ধরনের বস্তু। এ কি কোন অবয়ববিশিষ্ট? প্রশ্নটির উত্তর—'না', কেননা সেক্ষেত্রে এর ওপর অবস্থিত যেকোন পদার্থের মতোই এরও 'মৃত্যু' থাকতে হবে। সুতরাং এ অবশ্যই নিরবয়ব। এবং যেহেতু প্রতিটি অবয়ব সসীম, তাই যা কিছু নিরবয়ব সীমাহীন বা অসীম হতে বাধ্য। এখন যদি সসীম একটি অবয়ব অসীম কোন আধারে অবস্থান করে, তাহলে শেষেরটির অবস্থান কোথায়? তাহলে কি এর অবস্থান মহাকাল বা মহাশূন্যে? কিন্তু তাও সম্ভব নয়। কারণ, মহাশূন্যের অস্তিত্ব বিভিন্ন বস্তুর সহাবস্থানের ওপর নির্ভরশীল, আর মহাকালের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ঘটনাপরম্পরার ওপর; তাই মহাশূন্য এবং মহাকাল পরস্পরের অনধীন নয় এবং এদের শুরু ও শেষ রয়েছে। অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে, এরা সসীম। তাহলে অসীম কোন কিছু কীভাবে সসীমের মধ্যে অবস্থান করবে? বস্তুপুঞ্জের সহাবস্থানের সঙ্গে মহাশূন্যের অস্তিত্বের শুরু এবং এই সহাবস্থান চলে গেলে মহাশূন্যেরও অবলুপ্তি। দুটি ঘটনা একটার পর একটা ঘটলে মহাকালের অস্তিত্বের সূচনা এবং এরকম কোন ঘটনাপরম্পরা না থাকলে মহাকালও অস্তিত্বহীন। আবার যখন দুটি বস্তুর সহাবস্থান ঘটে, তারা যে একত্রে আছে এটা জানতে হবে। এর অর্থ—এদের একটি হবে জ্ঞাতা, অন্যটি জ্ঞেয়। এবং সেই জ্ঞানসঞ্চারের জন্য মনেরও অস্তিত্ব থাকা দরকার। অর্থাৎ মহাশূন্যের ধারণা

জন্ম নেবে মনে। ঘটনাপরম্পরার সঙ্গে আসে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন ধারণা এবং এর জন্যও মনের অস্তিত্ব আগে থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়, কেননা মনের অস্তিত্ব না থাকলে কোন ধারণার জন্ম হবে কেমন করে? সুতরাং মহাশূন্য ও মহাকাল—এই দুইয়েরই অস্তিত্ব মনের মধ্যে। কিন্তু মন কি সসীম, নাকি অসীম? মন যে সসীম—এটা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, সুতরাং অসীম কোন কিছুকে এর মধ্যে ঢোকানো যায় না। তাহলে মন, মহাশূন্য, মহাকাল এবং মহাবিশ্ব ছাড়া আর কি আছে, যা এসব ধারণ করে আছে? উত্তর—একমাত্র আত্মা, যা পড়ে থাকে। এই আত্মা কি সসীম, নাকি অসীম? আত্মা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের, অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীর-সমন্বিত পঞ্চকোষের অতীত। কিছুই একে সীমাবদ্ধ করতে পারে না, তাই এ অসীম। অতএব এখানে আমরা সসীম সব পার্থিব অবয়ব স্থাপন করতে পারি এই অসীম আধারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এসম্ভাবনাও দেখা দেবে—দুটি অসীমের মধ্যে পরস্পর বিরোধ বাধতে পারে। তাই তারা এক এবং অভিন্ন সত্তা হিসাবে অবস্থান করতে পারে না, তাদের অবশ্যই বাস করতে হবে আলাদা আলাদাভাবে। এই যুক্তি স্বীকার করে নিয়ে এবার এর সত্যতা যাচাই করা যাক।

দুটি অসীমের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে—একটি সচেতন, যা সমস্ত ব্যক্তিসত্তার আধার; অন্যটি অচেতন, যা সমস্ত বস্তু অবয়বের আধার। ধরা যাক, এরা যথাক্রমে ক ও খ। আমরা ইতোমধ্যেই দেখিয়েছি, ক ও খ উভয়েই স্থান ও কালের অতীত। তাহলে আমি-আপনি যেমন আলাদা আলাদা থাকি, ক ও খ সেভাবে থাকবে—এটা আমরা ধরে নেব না। আমার-আপনার মধ্যে রয়েছে স্থান, যা একটি বড় ধরনের বিভাজক। ফলে আমাকে আপনার থেকে আলাদা করা সম্ভব। আমার-আপনার মধ্যে যদি কোন স্থান না থাকে, তাহলে আমরা উভয়ে অভিন্ন হয়ে যাব। তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে, এভাবে অভিন্ন হয়ে গেলেও আমাদের দুজনের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা বজায় থাকবে এবং এভাবেই ক ও খ—এই দুইয়ের মাঝ থেকে যদি সমস্ত স্থান সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে তাদের অভিন্ন দেখালেও বাস্তবে তারা থাকবে দুটি আলাদা সত্তা হয়ে। শুধু যদি স্থানের কথা বলা যায়, তাহলে এই যুক্তি সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু স্বীকরণ অনুযায়ী আমাদের ক ও খ-এর মাঝ থেকে স্থানের মতো আরেক বিভাজক সময়কেও সরিয়ে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে ক ও খ দিয়ে দুটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ধারণা বোঝানো যাবে না, কারণ একটির পর আরেকটি আসা ধারণা দুটি সময়ের অস্তিত্ব জীইয়ে রাখবে, যা আমরা সরিয়ে দিতে চাই। সুতরাং ক

ও খ অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে অভিন্ন, অর্থাৎ অসীমমাত্রই সম্পূর্ণরূপে এক। এবং এই অভিন্নতা, অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-শূন্যতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এক অনন্ত শাশ্বত আনন্দময় অনুভূতি। মন ও বস্তুর, অন্তর্বিশ্ব এবং বহির্বিশ্বের এ হলো একটিই আত্মা। ইলেকট্রন বা ইথারকণার মতো যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, এমন কোন বস্তুকণা নেই, যা এই আত্মার অঙ্গীভূত নয়। একারণেই আমাদের পূর্বপুরুষরা এই মহাবিশ্বের সর্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতেন। যদিও সমগ্র মহাবিশ্বের এটি একটি নিরবয়ব আধার, বিভিন্ন অবয়বে এটি বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়। একজন সাধারণ মানুষ—যে একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তু থেকে, একটি অবয়বকে আরেকটি অবয়ব থেকে আলাদা করে দেখে, যার কাছে সূর্য আর চন্দ্র এক নয়, পুরুষ আর নারী আলাদা—তার কাছে এর প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। এর ওপর একজন সাধারণ মানুষের চিন্তা যেসব অবয়ব সে গভীরভাবে ভালবাসে, তাদের নিয়ে। পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী এবং এই জগতের যেখানে যাকিছু সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক অবয়ব চোখে পড়ে—তাদের সবকিছুই সে ভালবাসে। একারণেই শিক্ষক হিসাবে অবতীর্ণ হয়ে সেই অসীম, অদ্বৈত আমাদের শিখিয়েছেন ঃ "পর্বতসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়, বৃক্ষরাজির মধ্যে আমি পবিত্র ডুমুরবৃক্ষ... ইত্যাদি। যা কিছু বিরাট এবং মহীয়ান, চিত্তাকর্ষক এবং রাজকীয়—হে অর্জুন! জেনো, সেসব কিছুই আমার অনন্ত শক্তির অংশ থেকে উদ্ভূত।" একারণেই আমরা স্মরণাতীত কাল থেকে নিসর্গের অন্তর্গত মহিমময় এবং বিরাট সবকিছুকেই পূজা করতে শিখে এসেছি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের করুণার চোখে দেখে থাকেন, কারণ তাঁদের মতে 'এইসব বালখিল্যদের' ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না, তাই নিসর্গের নানান নিষ্প্রাণ শক্তির ওপর তাঁরা দেবত্ব আরোপ করতেন। আমরা এতক্ষণ যাকিছু আলোচনা করলাম তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই দোষারোপ একেবারেই ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে করুণার পাত্র সে-ই, যে তার অজ্ঞতার দরুণ সমগ্র মহাবিশ্ব থেকে আত্মাকে বহিষ্কার করে দিয়ে নিজেকে একটি মৃতদেহের মধ্যে স্থাপন করেছে এবং এভাবে নিজেকে এই মৃতদেহটির মতোই আত্মাহীন এবং মৃত করে তুলেছে। বৈদিক ঋষিরা কখনোই নৈসর্গিক শক্তির ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করেননি। এই ব্যক্তিত্ব আরোপের ব্যাপারটি কল্পনামাত্র। এ হলো আসলে যেখানে প্রাণ নেই, সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করা। কিন্তু কেউ যদি কোন সপ্রাণ বস্তুকে সজীব বলে

দেখেন, তাহলে সেটা ব্যক্তিত্ব আরোপ হতে পারে না। বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতপক্ষে একটি জীবন্ত সূর্য, একটি জীবন্ত চন্দ্র—বরং বলা যায়, একটি জীবন্ত মহাবিশ্ব—প্রত্যক্ষ করতেন। প্রহ্লাদ কি প্রস্তরস্তম্ভের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরের 'কল্পনা' করেছিলেন? এ যদি কল্পনামাত্র হতো তাহলে স্তম্ভের ভিতর থেকে সপ্রাণ কোন কিছুর নির্গত হওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ কল্পনামাত্রই তো সর্বৈব মিথ্যা। কল্পনা নয়, প্রহ্লাদ ঐ স্তম্ভের মধ্যে তাঁর জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর এজন্যই ঈশ্বরকে স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর প্রিয় ভক্তকে রক্ষা করতে হয়েছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর শাশ্বত এবং অসীম। এখন প্রশ্ন, তিনি কি আমাদের আত্মার সঙ্গে রয়েছেন? তা যদি হতো, আমরা প্রত্যেকেই তাঁর মতো সর্বজ্ঞ হতাম এবং আত্মার কোনরকম বিভিন্নতা থাকত না। কিন্তু সেটা সত্য নয়। কোন মানুষই মানুষ হিসাবে সর্বজ্ঞ নয়। এই জীবনেই যদি কেউ যোগবলে দেহ ও মনের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন, তিনি তখন আর মানুষ থাকেন না—হয়ে যান অসীম, অদ্বৈতের সঙ্গে একাত্ম এবং সেকারণে সর্বজ্ঞ। কিন্তু নিজের সীমাবদ্ধ দেহ ও মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া একজন সাধারণ মানুষের কেবলমাত্র সীমিত জ্ঞানই থাকা সম্ভব এবং সেটুকুই তার সম্বল। সে কি তার জীবনেও সীমাবদ্ধ? যতদিন নিজের দেহের সঙ্গে তার একাত্মবোধ থাকে, ততদিন তার জন্ম-মৃত্যু থেকে যায়। কিন্তু সে শুধুমাত্র দেহসর্বস্ব একটি প্রাণী নয়, সে চিন্তাশীলও বটে। অর্থাৎ সে শুধুমাত্র তার দেহের সঙ্গে নয়, তার মনের সঙ্গেও একাত্মবোধ করে থাকে। অথবা তার সুস্থ অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় সে কিন্তু নিজের দেহের সঙ্গে একাত্মবোধ করে না, কারণ তার যে একটা দেহ রয়েছে সেটা মনে পড়ে তখনি যখন কোথাও ব্যথা-বেদনা দেখা দেয়; যেমন মাথার যন্ত্রণা অথবা যখন প্রবল জ্বরে সারা শরীর যেন পুড়ে যেতে থাকে—এইরকম অবস্থায়। তার যে একটা দেহ আছে, সেই ধারণা কেবল শরীরের অসুস্থ বা অস্বাভাবিক অবস্থাতেই তার কাছে আসে। সুস্থ, স্বাভাবিক অবস্থায় নিজের দেহ তার অনুভবের মধ্যেই আসে না। সুতরাং একজন স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে তার দেহ থেকে মনই প্রবল। এই মনের সাহায্যে সে শাশ্বতের সঙ্গে অশাশ্বতের, বস্তুর সঙ্গে অবস্তুর তফাত বুঝতে পারে। এই মনের সাহায্যে নিজেকে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে, সে তিনটি উপাদানে গঠিত—সে নিজে, তার দেহ এবং তার মন। সে আরো দেখে, তার দেহটি খুবই পরিবর্তনশীল। এটি ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে—ভ্রূণ

অবস্থা থেকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন পেরিয়ে পূর্ণবয়স্ক মানুষে এবং সে আরো আবিষ্কার করে, দেহের সঙ্গে সঙ্গে তার মনটিও একইভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু তার দেহ ও মনের পরিবর্তন ঘটলেও সে নিজেকে জানে একই মানুষ হিসাবে—একসময় ছিল ছোট্ট শিশু, পরে কিশোর, যুবক এবং শেষপর্যন্ত এখন পূর্ণবয়স্ক মানুষ। সে জানে, তার দেহ ও মনের এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং সে দেখে, অন্য দুটি নিয়ত পরিবর্তনশীল উপাদানের পাশাপাশি সে নিজে একমাত্র অপরিবর্তনীয়। এখন আমরা যখন কোন কিছুকে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে একইভাবে আচরণ করতে দেখি, তখন আমরা বিশ্বাস না করে পারি না যে, এটি সবসময় এভাবেই চলবে। কারণ, মানুষই হোক বা মনুষ্যেতর কোন নিম্নবর্গের প্রাণীই হোক যেকোন সপ্রাণ সত্তা ঘিরে প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপের অপরিবর্তনীয়তার ব্যাপারে আমাদের একটা দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। এই স্বতোলব্ধ বিশ্বাসই আমাদের প্রতিটি বস্তুর প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে, আমাদের কাছে বিজ্ঞানের অস্তিত্বও সম্ভব করে তোলে। সুতরাং যখন আমি দেখি, সারা জীবন ধরে আমার দেহ ও মনের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সত্ত্বেও আমি নিজে থেকে গেছি অপরিবর্তিত, তখন আমার প্রকৃতি যে অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত এবং জন্ম-মৃত্যু-রহিত—এরকম সিদ্ধান্তে না এসে পারি না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ কিছুটা আত্মসমীক্ষার সূত্রে নিজের শাশ্বত প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে পারে। তবে যতক্ষণ না সে তার দেহ ও মনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারে, ততক্ষণ তার প্রকৃতির অসীমতা সম্বন্ধে তার কোন উপলব্ধি হয় না। এই উপলব্ধিতে উত্তরণ অবশ্য মানুষের সবচেয়ে দুর্লভ কৃতিত্ব।

পরের বিবেচ্য বিষয় হলো, মানুষ যদি শাশ্বত হয় তাহলে এই বর্তমান জন্মের আগেও তার অস্তিত্ব থাকার কথা এবং এই জন্মের পরেও তাঁর অস্তিত্ব থাকবে। তাহলে প্রশ্ন, অস্তিত্বের আগের অবস্থাতেও কি সে একই রকম দেহ ও মনের অধিকারী ছিল? আবার একটু আত্ম-অনুসন্ধান করলে প্রতিটি মানুষই বুঝতে পারবে, সে তার কর্মফল ভোগ করে মাত্র। তার সৎ কাজ ভাল এবং কাঙ্ক্ষিত ফল আনবে; আর কাজ যদি অসৎ হয়, ফলও হবে মন্দ এবং অনভিপ্রেত। আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার। আমরা এইমাত্র যা দেখলাম—এই শাশ্বত এবং অসীম সত্তা, যাঁকে আমরা ঈশ্বর বলি, তিনি সর্বত্র সমভাবে

বিরাজমান, সমস্ত সপ্রাণ সত্তার প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি থাকার কথা। তাঁর মধ্যে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে না। কারণ, তিনি নিজে অসীম হওয়ায় সকল প্রাণীর জন্য তাঁর ভালবাসাও হবে অসীম। এইরকম একজন ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা কখনোই সন্তানদের প্রতি তাঁর আচরণে কোনরকম বৈষম্য আশা করতে পারি না। সেটা সঠিক হলে তাঁর সন্তানদের এই যে বিভিন্ন রকম অবস্থা—এর ব্যাখ্যা কী? আমরা দেখি, কারো অবস্থা অত্যন্ত সচ্ছল, পাশাপাশি আরেকজন প্রায় জন্ম থেকেই অনাহারে অর্ধাহারে কাটাচ্ছে; কেউ বেশ সম্মানের অধিকারী এবং শ্রদ্ধাভাজন, আরেকজনকে লোকে সবসময় টিটকারি দেয়, গালমন্দ করে; একজন সুখী, আরেকজনের অবস্থা শোচনীয়; একজন বেশ শক্ত-সমর্থ, আরেকজন অপটু, দুর্বল। অবস্থার এইসব তারতম্য যেহেতু ঈশ্বরের সন্তানদের বিভিন্ন ধরনের নিজস্ব কৃতকর্মের ফলশ্রুতি, অতএব এই কৃতকর্মের বিভিন্নতা ঘটেছে তাদের পূর্ববর্তী কোন অস্তিত্বে বা জন্মে। এবং যেহেতু দেহ ও মন ছাড়া কোন কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়, তাই বর্তমান স্বরূপের আগের অবস্থাতেও আত্মার অনুরূপ একটি দেহ এবং মন নিশ্চয়ই ছিল। সুতরাং আমার এই বর্তমান দেহ অবশ্যই এসেছে অতীতের একটি দেহ থেকে, সেই দেহও আবার এসেছিল তার আগে বিরাজমান কোন দেহ থেকে—এইভাবে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে।

আমাদের অস্তিত্বেও ভবিষ্যৎ অবস্থাও বর্তমানের এই দেহময় অবস্থার মতোই হবে, কেননা আমরা ইহজীবনে শত চেষ্টা করেও যেসব অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে সফল হই না, এই দেহত্যাগ করার সময় সেসব সঙ্গে নিয়ে যাই। এইসব অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায় আরেকটি দেহের সন্ধানে, যাকে আশ্রয় করে এইসব আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হতে পারে। এইভাবেই আমাদের একটার পর একটা দেহ ধারণ করে যেতে হবে—যতদিন না সকল আকাঙ্ক্ষা, সবরকম চাহিদা থেকে মুক্ত আমাদের সর্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি জাগ্রত হয়। সুতরাং পুনর্জন্মগ্রহণ একটি প্রমাণিত সত্য। এটি হলো প্রাচীন বিজ্ঞানের আবিষ্কার। এই সত্যের ওপর সমগ্র বেদ প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্ম এবং অনুরূপ আর দু-একটি ধর্ম ছাড়া পৃথিবীর আর সব ধর্ম থেকে বৈদিক ধর্মের পার্থক্য এখানেই।

এতক্ষণে আমরা প্রাচীন ধর্ম বা বেদকে অনুধাবন করার মতো অবস্থায় এসেছি। বিজ্ঞান এবং বেদ এমন সব মূল থেকে উদ্ভূত, যাদের অর্থ অভিন্ন। প্রাচীন বিজ্ঞান অর্থাৎ বেদ মনে করে, আমাদের অন্তর্বিশ্ব ও বহির্বিশ্ব ঈশ্বরে

আচ্ছন্ন এবং এখানেই আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তার পার্থক্য। সদা-সহায়ক বেদ একজন সাধারণ মানুষের মনের সীমিত সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে তার জন্য অসীম ঈশ্বরের পরিবর্তে ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশের যতটুকু সে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারে বা ভালবাসতে পারে এবং তারপর অনুধাবন করতে পারে—ততটুকুরই ব্যবস্থা করেছে। মানুষের রয়েছে অসংখ্য চাহিদা এবং অসীম প্রেমের আধার ঈশ্বরেরও রয়েছে এইসব এবং আরো বেশি চাহিদা পূরণ করার অসীম ক্ষমতা। তাঁর এই ক্ষমতার পিছনে রয়েছে তাঁর অস্তিত্ব, সুতরাং এইরকম প্রতিটি ক্ষমতাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা মনে করা যেতে পারে, যাঁরা একসূত্রে গ্রথিত রয়েছেন এই মহাবিশ্বের সর্বময় প্রভুর সঙ্গে। এর অর্থ বহু-ঈশ্বরবাদ নয়। সুতরাং পৃথিবীর অন্য যেকোন ধর্মশাস্ত্রের তুলনায় বেদ ঈশ্বরকে সকল মানুষের সুবিধার জন্য তাদের ঘরের অনেক কাছাকাছি এনে দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষ এবং শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই অনেক তুচ্ছ ও মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছে বাকি বিশ্বকে এসব থেকে বঞ্চিত করে। অপরপক্ষে প্রাচীন বিজ্ঞান দেখেছে সেই অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান সর্বসুন্দর সত্তাকে, যা সারা মহাবিশ্বকে এবং যেসব সজীব প্রাণী এখানে বাস করে তাদের সকলকে আচ্ছন্ন ও প্রাণময় করে রেখেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবক্তাকে তার ছোট সীমাবদ্ধ সত্তার যাবতীয় সচেতন শক্তি প্রয়োগ করতে হয় এই বিশ্বকে শাসন করে তাকে নিজের পদানত করার জন্য। প্রাচীন বিজ্ঞানের প্রবক্তা প্রকৃত জ্ঞান এবং সেখান থেকে উৎসারিত আনন্দময় অবস্থা অর্জন করার জন্য নিজের অহংকে শাসন করে শুধু নিজেকেই সাহায্য করে না, তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন সত্তার মধ্যে প্রকাশিত সেই প্রাণময় ঈশ্বরেরও কৃপালাভ করে। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে জন্ম ও মৃত্যু দিয়ে উভয়দিকে গণ্ডি দেওয়া একটি সীমাবদ্ধ জীবন মাত্র দিয়েছে। অন্যদিকে প্রাচীন বিজ্ঞান তাকে দিয়েছে একটি অনন্ত জীবন। তাকে দেখিয়েছে, মৃত্যু আরেকটি জীবনে প্রবেশের দুয়ার মাত্র। স্পষ্ট করে তাকে বলেছে, এই জন্মের আগেও তার অস্তিত্ব ছিল ও তার কয়েকটি জন্ম ঘটেছে এবং এর পরেও তাকে আরো অনেকবার জন্ম নিতে হবে—যতক্ষণ না সে তার প্রকৃতির অসীমত্ব অনুধাবন করতে পারে। উচ্চতর সামর্থ্যের অধিকারী মানুষদের জন্য প্রাচীন বিজ্ঞান শাশ্বত ও অনন্ত সত্তাকে অর্চনা করার অধিকার সংরক্ষিত রেখেছে। এইরকম অন্য কারোর জন্য আবার সংরক্ষিত রেখেছে সর্বোচ্চ জ্ঞান, যার বলে স্থান-কাল-কারণের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তাঁরা সেই অসীম সত্তার সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারেন।

ঈশ উপনিষদ তাই আমাদের এক সর্বময় আত্মার দ্বারা আচ্ছন্ন এই বিশ্বের সবকিছুতেই পরিবর্তন বলে দেখতে শিখিয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকটি আমাদের শেখায়, যদিও বস্তুর ত্রিবিধ প্রকাশ নিজেদের মধ্যে পরিবর্তনশীল এবং অপসৃয়মান, তবু তাদের পশ্চাতে যে অদ্বিতীয় বাস্তব বিরাজমান, তার মতো এদেরও বাস্তব বলে মনে হয়। স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের প্রাচীন দ্রষ্টাদের কাছে এই বিশ্বের ঘটনাবহুল প্রকৃতির ব্যাপারটি জানা ছিল। এইসব ঘটনার কিছু কিছু অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করে তাঁরা এই জ্ঞানে উপনীত হন যে, এই মহাবিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন এক সর্বময় সত্তা। দেখা যাক, তাঁদের পক্ষে এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল। আসলে 'ঘটনা' কী? এটির প্রকৃতি কি সরল বা মামুলি, নাকি এটি যৌগিক? যেহেতু এটি একটি বাহ্য অবয়ব মাত্র, যার কাছে এর উপস্থিতি প্রতীয়মান হবে এমন একজন জ্ঞাতা ছাড়া এর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এবং উপস্থিত হওয়ার মতোও কিছু থাকতে হবে। তাহলে এদের সম্মিলনেই কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা বা উপস্থিতি সম্ভব। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এটা যৌগিক এবং তিনটি উপাদান দিয়ে এটি তৈরি—দ্রষ্টা, দ্রষ্টব্য এবং যা এদের মিলন ঘটায়। সংস্কৃতে এদের বলা হয় 'অধ্যাত্ম', 'অধিভূত' এবং 'অধিদৈব'। এখন আমরা দেখছি, কোন দ্রষ্টা বা আত্মা ছাড়া কোন ঘটনার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সুতরাং কোন ঘটনাই আত্মাহীন নয় অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে প্রতি ঘটনাই আত্মাময় অর্থাৎ সজীব। এই বিশ্ব অসংখ্য অবয়ব, স্পর্শ, স্বাদ, ঘ্রাণ এবং শব্দ—যাদের ঘটনা বলা হয়—সেসব দিয়ে তৈরি। তুমি হচ্ছ এসবের এক আত্মা—যার অস্তিত্ব শুরু হয়েছিল তোমার জন্ম দিয়ে, শেষ হবে তোমার মৃত্যুর সঙ্গে। সুতরাং তোমার সঙ্গেই পৃথিবীর উদয়, তোমার সঙ্গেই এর অস্ত। কিন্তু তুমি জান, তোমার জন্মের আগেও এই পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল, তোমার মৃত্যুর পরেও এ থাকবে। বাস্তবিক তুমি একে জান সূচনাহীন, সমাপ্তিহীন হিসাবে—কখনো এ প্রকাশমান, কখনো আবার নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখে; কারণ এটির একটি উপাদান 'পদার্থ', যাকে আমরা এইমাত্র জেনেছি—সংস্কৃতে বলে 'অধিভূত'। যদি সূচনাহীন ও সমাপ্তিহীন এই সৃষ্টি অসংখ্য ঘটনার সমাহার হয়, তাহলে এও আত্মাহীন হতে পারে না। এরও অবশ্যই নিজস্ব একটা আত্মা থাকবে, যা হবে জন্মমৃত্যু-রহিত অর্থাৎ শাশ্বত এবং যেহেতু এর ব্যাপ্তি সমগ্র সৃষ্টি জুড়েই, তাই—এ সর্বব্যাপী অর্থাৎ অসীম। এই শাশ্বত এবং অসীম আত্মাকেই আমরা 'ঈশ্বর' বলি—যিনি এই মহাবিশ্বের শাশ্বত সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। সুতরাং এই মহাবিশ্ব কখনোই

ঈশ্বরবিহীন বা আত্মাবিহীন নয়। এ মহামায়ার মূর্ত ও জীবন্ত অবয়ব—তোমার আমার সজীব দেহ অপেক্ষা যে আরো সজীব এবং অনন্ত গুণ বেশি শক্তিশালী। যেমন, যতক্ষণ আমরা নিজেদের মানুষ বলে মনে করি, ততক্ষণ যেমন নিজেদের আমাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না—তেমনি পারি না তাঁকে এই মহাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। ভগবান ব্যাসদেব সমগ্র মহাবিশ্বকে ঈশ্বরের দেহ বলে বর্ণনা করেছেন—স্বর্গ হলো তাঁর মাথার মুকুট, পাতাল তাঁর পদতল এবং মর্ত্য তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশ। এই বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এরকম একজন বিরাট ঈশ্বর বাস করেন মানুষের মধ্যে—তাঁর জন্য তোমাকে বহুদূরে খুঁজতে হবে না। এবং কেবলমাত্র তিনিই তোমার সমস্ত অভাব পূরণ করতে পারেন, তোমার সমস্ত সংশয় দূর করতে পারেন, তোমাকে অনন্ত আনন্দ এবং শান্তি দান করতে পারেন, তোমার হৃদয়ে জ্ঞানের শাশ্বত আলো জ্বালিয়ে তোমাকে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে চিরদিনের জন্য রক্ষা করতে পারেন। এই হলো প্রাচীন বিজ্ঞানের শিক্ষা। একে কি স্থবির এবং অসত্য বলা যাবে—আধুনিক বিজ্ঞান যা বলতে চায়? আধুনিক জীববিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে, আমাদের এই গ্রহে কয়েক হাজার বছর আগে মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। অন্ধ আত্মা রাখা ছিল অ্যামিবার প্রোটোপ্লাজম-সর্বস্ব দেহের মধ্যে, যা কালক্রমে অসংখ্য বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানাবিধ সংগ্রামে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখে বর্তমান মানুষ হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে। অতএব এই তত্ত্ব অনুসারে আত্মার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে ক্রমশ বেশি বেশি আলোয় উত্তরণ ঘটেছে, এবং সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ কোন কিছুর ক্রমবিকাশ থেকে উদ্ভূত বলে একে সবসময় সসীম অবস্থাতেই থাকতে হবে। এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মতও নয়—যা আমরা দেখেছি—এবং অভিপ্রেতও নয়। প্রাচীন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আমাদের শেখায়, সমগ্র বিশ্বচরাচর এর সমস্ত সজীব সত্তাসমেত আবির্ভূত হয়েছে যাবতীয় প্রাণ, আলো, শান্তি ও আনন্দের উৎস ঈশ্বরের অসীম প্রজ্ঞা থেকে। একে, সুতরাং, আমরা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারি না। তিনি আমাদের আত্মার পরমাত্মীয়—আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই আমরা যা চাই, তা-ই পেতে পারি। সুতরাং হাজারো সৌন্দর্যে ভরা এই পৃথিবীকে আমরা যতখানি ভালবাসি, অর্থাৎ আমাদের সমস্ত পার্থিব বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় উপভোগের বস্তু—বরং বলা ভাল, আমাদের নিজেদের—যতখানি ভালবাসি, তার থেকে বেশি ভালবেসে তাঁর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একবার একটা চমৎকার গল্প বলেছিলেন। গল্পটা

এইরকম—একদিন সকালে দুজন অল্পবয়সি বন্ধু ভ্রমণে বেরিয়েছে। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা একটা সুন্দর বাগান দেখতে পেল। বাগানের গেট খোলা, কোন দারোয়ানও ছিল না যে, তাদের আটকাবে। সুতরাং খানিকটা প্রলুব্ধ হয়ে তারা ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভেতরের সবকিছু এত চমৎকার, পরিবেশ এত বন্ধুত্বপূর্ণ যে, তারা বাগানের মধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। এদের মধ্যে একজন ছিল খানিকটা হিসেবি প্রকৃতির। একসময় সে বন্ধুকে বলল ঃ "দ্যাখো, আমি এই চমৎকার বাগানটির কত দাম হতে পারে একটু কষে দেখতে চাই। জানতে চাই এই বাগানে কত আমগাছ আছে, কত নারকেল গাছ—এইসব। সুতরাং বন্ধু, তুমি বরং খানিকটা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াও, ততক্ষণে আমি হিসেবটা করে ফেলি।" এই বলে সে বন্ধুকে ফেলে চলে গেল। বন্ধুটি একা পড়ে গিয়ে কী আর করবে, অগত্যা আরো খানিকটা এগোতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে সে দেখতে পেল, একজন মালি বাগানে কাজ করছে। তার কাছে গিয়ে জানতে চাইল, বাগানের মালিক কে। সহৃদয় মালিটি তার প্রভুর প্রভূত প্রশংসা করে বলল ঃ "আমার প্রভুর কাছে যেই যায়, তার সঙ্গেই তিনি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন। তিনি কখনো এই বাগান ছেড়ে যান না। তুমি চাইলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পার। আর কয়েক পা এগোলেই তুমি একটা ছোট্ট সুন্দর প্রাসাদ দেখতে পাবে। সেখানেই তিনি সবসময় থাকেন।" এসব শুনে মালিকে ধন্যবাদ দিয়ে বন্ধুটি এগোতে লাগল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল প্রাসাদটিতে। ভেতরে ঢুকে সে মালিককে দেখতে পেল—সৌম্যদর্শন, সরল এবং মিষ্টপ্রকৃতির এক ভদ্রলোক সামনের ঘরে বসে রয়েছেন যেন তারই প্রতীক্ষায়! সে ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র তিনি উঠে দাঁড়িয়ে যত্ন করে তাকে পাশে বসালেন। তার সঙ্গে এমন আন্তরিক সহৃদয়তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মালিক তাঁর নতুন বন্ধুটির হাত ধরে তাকে বাগানের সুন্দর সুন্দর লতাগুল্ম, গাছপালা, বিরল ফুল ও ফল—এসব দেখাতে লাগলেন। খেতে দিলেন কিছু সুস্বাদু ফল, বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য উপহার দিলেন বিরল প্রজাতির কিছু সুন্দর ফুল। তাকে অনুরোধ করলেন মাঝে মাঝে আসার জন্য। তাঁর উষ্ণ সান্নিধ্য কিছুক্ষণ উপভোগ করে যুবকটি এই সহৃদয় ব্যবহারের জন্য মালিককে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিল। ফেরার পথে তার হিসেবি বন্ধুটির সঙ্গে দেখা—বিধ্বস্ত চেহারা, বিশাল বাগানটিতে বিভিন্ন ধরনের কত গাছ তার হিসেব করে উঠতে না পেরে বেচারা ফিরে আসছে বিফল মনোরথ হয়ে।

বন্ধুর আনন্দে উদ্ভাসিত মুখ, হাতে চমৎকার ফুলের গোছা দেখে সে অবাক হয়ে কী ব্যাপার জানতে চাইল। মালিকের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কথা, তাঁর চমৎকার সহৃদয় ব্যবহারের কথা—এসব শুনে হিসেবি বন্ধুটি আপশোসে ভেঙে পড়ল ঃ "হায়, হায়! এভাবে সময় নষ্ট করে আমি কী বোকামিই না করেছি! বন্ধু, তুমিই প্রকৃত জ্ঞানী। তোমার পথ প্রকৃত আনন্দ উপভোগের পথ, আমারটা কেবলই কষ্টের!"

নীতিগল্পটি থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আধুনিক বিজ্ঞানের হিসেবি ধ্যানধারণা কখনোই তার কাছে কোন সুনির্দিষ্ট জ্ঞান পৌঁছে দেবে না। এবং প্রকৃতির অল্প কিছু শক্তির বিরুদ্ধে হাতে গোনা তার কয়েকটি আংশিক জয় সত্ত্বেও চিরকাল তাকে একইরকম অন্ধকারে পড়ে থাকতে হবে। সুতরাং যদি আমরা প্রকৃত সুখী বা প্রকৃত জ্ঞানী হতে চাই, আমরা যদি এই বারবার জন্মমৃত্যু থেকে মুক্তি পেতে চাই, তবে আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞান বা বেদের পথ অনুসরণ করা উচিত। বেদের অনুশাসন যাঁরা মেনে চলেন, তাঁরাই ধন্য। কারণ, একমাত্র তাঁরাই পার্থিব, অপার্থিব সমস্ত রকম ভোগবিলাসের অসারতা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পেরে শেষপর্যন্ত আলোকপ্রাপ্ত হন এবং রক্ষা পেয়ে যান। কারণ, যিনি বেদের উপদেশ অনুসারে অনন্ত সুখের অধিকারী হতে চান, তিনি কয়েকবার স্বর্গীয় জীবনযাপন করেও উপলব্ধি করেন যে, স্বর্গও তাঁর বহুকাঙ্ক্ষিত আবাসস্থল হওয়ার যোগ্য নয়; যথাসময়ে তিনি বেদের পরবর্তী অংশে প্রাপ্তব্য উচ্চতর শিক্ষণীয় বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এইসব শিক্ষা আত্মস্থ করে শেষপর্যন্ত তাঁর প্রকৃত আত্মোপলব্ধি ঘটে এবং তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন।

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ হতে প্রকাশিত পুস্তক ঃ 'The Soul of Man' (১৯১০, পৃঃ ১-৩২) থেকে 'Science : Modern and Ancient' নামক বক্তৃতাটি অনুবাদ করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজের রাশিবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ বিশ্বনাথ দাস। উদ্বোধন, আশ্বিন শারদীয়া ১৪১৪, পৃঃ ৬২৫-৬৩২]

"ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছানোর উপায়"
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

আলো যেমন অন্ধকারের সাথে থাকতে পারে না, তেমনি ঈশ্বর ও ধন-দৌলত একসাথে হয় না। এই জগতের প্রতি আকর্ষণ মানেই অহংকারের এলাকা। ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণের অর্থ শরণাগতি। অহংকার আছে মানে বুঝতে হবে সে ইন্দ্রিয়ের দাস। জগৎটা কি? কিছু ইন্দ্রিয় সুখ, অর্থ, নাম, যশ। আমি কিছু একটা আকর্ষণীয় জিনিস দেখলাম আর মনে হলো "এটা আমার অবশ্যই চাই।" কিন্তু আমার মতো হয়ত আরো শত শত মানুষও ওটা চাইছে। সুতরাং প্রতিযোগিতা, ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এলো। আর এই প্রতিযোগিতা থেকেই আসে 'আমার অধিকার', 'আমার সম্পত্তি', 'আমার ক্ষমতা', আর ক্রমবর্ধমান অহংকারের মত্ততা। কিন্তু এটা হলো মনের ক্রিয়াশীল ও অশান্ত অবস্থা। আর বিপরীতে হলো প্রথমে যা বলা হলো অর্থাৎ ভগবানের প্রতি আকর্ষণ ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। লোহা যখন চুম্বকের আকর্ষণী এলাকার মধ্যে থাকে তখন তার আর কোন ক্রিয়া থাকে না।

(বেদান্ত কেশরী, আগস্ট, ১৯৫৪, পৃঃ ৯২)

সিস্টার দেবমাতার 'Days in an Indian Monastery' থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর কয়েকটি উপদেশ অনূদিত করা হলো।

১. তুমি তোমার কর্তব্য করে যাও, কখনও উদ্বিগ্ন হয়ো না এবং ভবিষ্যতের চিন্তা করবে না। যখনই তোমার মধ্যে উদ্বিগ্নতা আসবে তখনই তুমি নাস্তিক হবে। ঈশ্বরের যে তোমার প্রতি দৃষ্টি আছে তা তুমি বিশ্বাস করবে না। যদি তোমার প্রকৃত বিশ্বাস থাকে, তাহলে উদ্বিগ্ন হবে না।

২. আমাদের প্রকৃত সত্তা হলো কাঁচখণ্ডের মতো যা আমাদের প্রকৃত সত্তাকে কমবেশি প্রকাশ করে। ঘষা কাঁচকে বলে দুঃখ—কারণ এটি আমাদের সুখকে ঢেকে রাখে। স্বচ্ছ কাঁচকে বলে উজ্জ্বল শিখা—যা আমাদের আনন্দ দেয়। কিন্তু শিখা আমাদের অন্তরকে পুড়িয়ে দেয়, বাইরে নয়।

৩. যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বর আবিষ্কৃত করেননি। বুদ্ধও নয়, মহম্মদও নয়। সর্বময় তিনি নিজেই আবির্ভূত হন। অনন্তকাল ধরে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত এবং আগামী কালের পরিসরে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হবেন।

৪. যিনি ঈশ্বর দর্শন করেন তিনি শাশ্বত কালব্যাপীও তাঁকে দর্শন করবেন। কোন ব্যক্তিই তাঁকে ভুলাতে পারবে না।

৫. ঈশ্বর দর্শন আমাদের কেন হয় না? আমাদের অহংকার। যতই অহংকারের নাশ হবে ততই আমরা ঈশ্বরের সমীপে অগ্রসর হব। যদি আমরা একেবারে অহংকার নাশ করতে পারি, তাহলে মুক্তি আমাদের করতলগত। যতই তোমার মন ঈশ্বরে নিমগ্ন হবে, ততই তাঁর সামীপ্য লাভ করবে।

৬. আমি বলতে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। কোনটিকে আমি চক্ষু বলি, কোনটিকে আমি কান বলি, কোনটিকে আমি পা বলি। এভাবে আমার নিজ সত্তায় পা যা করতে পারে, চোখ তা পারে না। আবার চোখ যা করতে পারে, কান তা পারে না। সুতরাং আমি এক হয়েও বহু। কেন্দ্রে আছে একটি সত্তা। আর এগুলি ব্যাসার্ধের মতো প্রকাশিত হয়। সুতরাং ঈশ্বর এক। তবুও তিনি বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। আপাত বহির্দৃষ্টিতে তিনি বহু, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি এক। বৃত্তের ব্যাসের দিক থেকে বহু ব্যাসার্ধ, কিন্তু কেন্দ্রে সবগুলি এক।

৭. আবার মানুষ যখন একটি বস্তুকে দেখে কখনও কখনও তা বহু। যখন এক বহুরূপে প্রতিভাত হয় তখন মনে ন্যাবা দর্শিত হয়। সুতরাং সত্য একই, জাগতিক দৃষ্টিতে তা বহু।

৮. পাশ্চাত্যে ক্রমবিকাশ আছে, আর প্রাচ্যে আছে সৃষ্টি বা সংসার চক্র। আমরা জেনেছি সব কিছু চক্রবৎ আবর্তিত হয়। এক সপ্তাহে আছে সোম, মঙ্গল, বুধ ইত্যাদি। মাসগুলিও পরপর আছে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ। ঋতুও পরিবর্তিত হয়। সূর্য উদয় ও অস্ত হয়। স্বর্গেও প্রতিবস্তু চক্রাকারে ঘোরে। এভাবে সমগ্র প্রকৃতিতে আমরা দেখি সব কিছু চক্রবৎ ঘোরে। সুতরাং ক্রমবিকাশ তত্ত্ব শেষ কথা নয়। যদিও আমরা ধরে নিই যে ক্রমবিকাশ অনন্তকাল ধরে চলবে, তবুও ফল হবে অসীম। অসীমের তুলনায় এটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

৯. আমরা মনে করি যে আমাদের দেহ ষোল বা আটঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন আমরা ঘুমাই তখন কিন্তু আমার দেহ বলে মনে করতে পারি না। একইভাবে যখন সৃষ্টিকর্তা ঘুমায়, তখন জগতের প্রলয় হয়। যখন জাগ্রত হন তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়। আমাদের জীবন যেমন দিন রাত্রির সমষ্টি তেমনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের সমষ্টি। এই আবর্তন অনন্ত।

১০. ধর্মের কোন হানি হয় না, মানুষের অবনতি হয়। ধর্ম শাশ্বত ও সর্বদা এক। তুমি যদি দেয়ালের সামনে দাঁড়াও তাহলে তোমার প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হবে না। কিন্তু তুমি যদি আয়নার সামনে দাঁড়াও, তুমি নিজেকে দেখতে পাবে। সুতরাং ধর্ম সর্বদা অপরিবর্তিত। কিন্তু কখনও মানুষ একে প্রতিফলিত করে, কখনও করে না।

১১. খ্রিস্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধের মতো মহান অবতারেরা হলেন একেবারে স্বচ্ছ আয়না—যার দ্বারা ভগবান বা সত্যের সম্পূর্ণ প্রতিফলন হয়। যিশুর পূর্বে খ্রিস্টধর্ম ছিল—খ্রিস্ট ছিলেন এর প্রবক্তা। মহম্মদের পূর্বে ইসলাম ছিল, মহম্মদ শুধুমাত্র প্রবক্তা। প্রত্যেকেই শাশ্বত সত্যের প্রতিফলক। একজন খ্রিস্টের কাছ থেকে আলোর সন্ধান পান এবং বলেন "যিশু আমাকে সত্য দিয়েছেন। আমি যিশুর অনুগামী, আমি খ্রিস্টান।" আর একজন মহম্মদের মাধ্যমে আলো দেখেন এবং বলেন, "আমি মুসলমান।" তৃতীয় জন বলেন "বুদ্ধ সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন আমি বৌদ্ধ। সুতরাং প্রত্যেক মহান অবতারের শিষ্যদল আছে, যাঁরা বিশ্বাস করেন সত্য একমাত্র তাঁর কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু সকল অবতাররা সেই একই সত্য প্রকাশ করেন।

১২. মানব প্রকৃতি সব এক, পোশাক বিভিন্ন। একজন কোট ও পাজামা পরেন, আমি সাধারণ ধুতি পরি। কিন্তু প্রকৃতি এক। পোশাকে কি আছে? মাতৃগর্ভ থেকে আমি নগ্ন হয়ে এসেছি, নগ্ন হয়ে আবার যেতে হবে। কিন্তু সকল পোশাক সকল অনুষ্ঠান, সকল উৎসবের পশ্চাতে একটি মাত্র লক্ষ্য ভগবান লাভ করা। হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান সকলেই তা স্বীকার করে। ধর্মের লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন করা। প্রত্যেক ধর্মের আদর্শ ঈশ্বর ও একমাত্র ঈশ্বর। সুতরাং আমরা অন্য ধর্মের দোষ বা এর বাহ্যিক আচার আচরণের দোষ দেখব না।

১৩. আমাদের জীবনযুদ্ধে ভগবান অসীম আর জড় হলো সসীম। সসীমের উপর অসীমের জয় অনিবার্য। অর্থাৎ চৈতন্য জড়কে জয় করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জড় চৈতন্যকে অতিক্রম করে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। পরিণতিতে অসীমের জয়।

১৪. মন বৃহৎ আয়নার মতো যা আমাদেরই সম্পূর্ণ প্রতিফলন হয়, কিন্তু আয়নাতে ঘন ময়লা থাকলে কিছুই দেখা যায় না। তুমি যতই ধুলো মুছবে ততই তোমার নিজের প্রতিফলন দেখতে পাবে। প্রতিকৃতির ধুলোটি কি? স্বার্থময় বাসনা।

১৫. একদা একজন ত্যাগী ছিলেন। তিনি জগতে কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করতেন না, একমাত্র তাঁর একটি কৌপীন ছিল। গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখতেন। মাঝে মাঝে ইঁদুররা এসে সেটি ছিঁড়ে দিত। এতে তিনি খুব বিরক্ত হতেন। তিনি বলতেন ঃ "কি, এজগতে এই কৌপীন ছাড়া আমার আর কিছুই নেই—আর ইঁদুররা তা নিয়ে গেছে! সুতরাং তিনি ইঁদুরদের তাড়াবার জন্যে বেড়াল রাখলেন। বেড়াল দুধ খায়। ফলে তিনি তাঁর এক শিষ্যকে বললেন গাই আনতে। গাই এর আবার খাবারের প্রয়োজন। আবার তিনি শিষ্যকে বললেন জোড়া বলদ আনতে যা দিয়ে কিনা ঘাস-চাষ হবে। এভাবে তিনি একটির পর একটি চাইতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু কোনটাই যত্ন করতে পারলেন না। সবশেষে তিনি বিয়ে করলেন—তাঁর স্ত্রী সব কিছু দেখাশোনা করবেন।

১৬. আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে যখন তুমি স্থির জলের তলাতে লতাকে টান তাহলে পুরো আধারটাই চলে আসবে। সুতরাং যদি তোমার স্বার্থযুক্ত বাসনা থাকে তাহলে সমগ্র জগতে জড়িয়ে পড়বে। প্রত্যেক স্বার্থময় বাসনা থেকে মুক্ত হও। এই হলো পবিত্রতা। পবিত্রতার অর্থ একাকীত্ব। বাসনা ভয়ঙ্কর বস্তু। কখনও কখনও আমরা মনে করি যে বাসনাকে জয় করেছি। কিন্তু আমাদের মনের কোথাও কোনস্থানে তা সুপ্ত থাকে। তা থেকে বাসনার বাড় বেড়ে যায়, যেমন ছোট্ট আগুন এর শিখা থেকে বিরাট আগুন বেরোয়। ছোট্ট বাসনা থেকে বড় বাসনার উৎপত্তি হয়।

১৭. ধ্যানের অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে আত্মমগ্ন হওয়া। তোমরা জান যে বৃহৎ আলোর উদ্ভবে ক্ষুদ্র আলো অপসৃত হয়। ঈশ্বর-মহিমা প্রকাশের সঙ্গে

সঙ্গেই ক্ষুদ্র অহংকার পুরোপুরি অপহৃত হয়। সূর্যোদয়ে নক্ষত্রের আলো দৃষ্ট হয় না। সুতরাং তুমি তোমার অন্তরে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের অনুভব করার অভ্যাস কর।

১৮. তুমি বলতে পার 'আমি আমার এই চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে পারি না। এই কান দিয়ে তাঁকে শুনতে পাই না। তাহলে কিভাবে তাঁকে অনুভব করব? এভাবে তুমি কখনও তাঁকে পাবে না। সৃষ্টিকর্তার কাছে যেতে গেলে এমন কয়েকটি বস্তু আছে যেগুলির দ্বারা সরাসরি যাওয়া যায়। অবশ্যই তোমাকে মন ও ইন্দ্রিয়াতীত হতে হবে—তার পরে ধ্যান। অন্তর্দৃষ্টি পাওয়ার এটিই একমাত্র পথ। আর ইন্দ্রিয়গুলি তৈরি হয় সৃষ্টির জন্য, সৃষ্টিকর্তার জন্য নয়।

১৯. ঈশ্বরদর্শন সর্বদা সুন্দরভাবে হয় দুটি বিপরীত মেরুর সংযোগস্থলে। তিনি আলোও নন, অন্ধকারও নন—তিনি এই দুটির অতীত। এই দুটির সংযোগস্থলে তাঁকে দেখা যায়। এজন্য ব্রাহ্মমুহূর্ত—ঊষা ও সায়ংকাল—দিন রাত্রির সংযোগ হলো ধ্যানের প্রশস্ত সময়। ঠিক দুপুরও খুব ভালো সময়—সূর্য তখন সর্বোচ্চ বিন্দুতে অবস্থান করে। তারপরই রাত্রির জন্য এগিয়ে যায়। স্বর তখন উচ্চগ্রামে ওঠে এবং এমনকি হকারদের উচ্চ তীক্ষ্ণ চিৎকার—চেঁচামেচিতেও শব্দ ও মন পরস্পর সংযুক্ত। শব্দ মনের প্রথম বিকাশ। দুপুরে মনও উচ্চগামী হয়।

২০. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "ঈশ্বর কি আমাদের অজ্ঞান হতে মুক্তি দেবেন না যদি তিনি ইচ্ছা করেন?" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আশ্বস্ত করলেন ঃ "নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি এমন অনন্ত প্রেমময় যে তিনি আমাদের উত্ত্যক্ত করতে চান না। একমাত্র যখন আমাদের সকল বাসনা তাঁর প্রতি হবে, তখন তিনি আমাদের কাছে আসেন এবং আমাদের স্বার্থপরতা ও অজ্ঞান দূর হয়। কিন্তু আমরা মনকে ছলনা করব না। আমরা বাসনা হতে মুক্ত হবার ভান করব না। ভাব হবে আন্তরিক, শঠতা বা ছলনা থাকবে না। যদি তুমি ভগবানকে চাও তাহলে একমাত্র পথ হচ্ছে মনকে একাগ্রমুখী করা। যদি আমরা সর্বান্তকরণে ভগবানের নিকট সঠিকভাবে প্রার্থনা করি, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আসবেন। আমরা ডাক্তারের কাছে আমাদের স্বাস্থ্যের, দোকানদারের কাছে খাদ্যের আমাদের প্রয়োজনানুযায়ী অন্য কারুর কাছে অন্য জিনিসপত্রের কথা বলি। ঠিক এভাবে আমরা

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব আমাদের আধ্যাত্মিক আলো ও জ্ঞানের জন্য। যখন আমরা তাঁর দিকে তাকাই এবং প্রার্থনা করি—অন্য কারুর কাছে নয়।' তখন তিনি আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেবেন যদি আমরা প্রার্থনা নিরন্তর আন্তরিকভাবে করি।"

২১. আমরা নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ বস্তুর জন্য চেষ্টা থেকে বিরত হব না, যদিও তা লাভ করা কঠিন। আমরা অবশ্যই ভগবানকে আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য রূপে রাখব—যা আমাদের ধরে রাখবে।

[স্বামী তপস্যানন্দ রচিত Swami Ramakrishnananda : The Apostle of Sri Ramakrishna to the South India (1972), Ramakrishna Math, Madras (pp: 238-255)]

নির্দেশিকা